দুরন্ত



আশ্বিন,
১৩৪৫

চতুরঙ্গ

প্রথম বর্ষ,
প্রথম সংখ্যা

সাম্যবাদের উৎপত্তি ও পরিণতি

সুশোভন সরকার

এক

ইউরোপের সাম্প্রতিক ইতিহাস ১৯১৭ সালের রুষবিপ্লব থেকে আরম্ভ করা কিছু অন্যায় হয় না। এই বিপ্লবের পিছনে একটা বিশিষ্ট মতবাদ ও এক দীর্ঘ আন্দোলন ছিল। সে-মতবাদ এবং প্রচেষ্টা উভয় অর্থেই কমিউনিজ্‌ম্ অথবা সাম্যবাদ কথাটির ব্যবহার আছে। উভয়কেই রূপ দিয়েছিলেন কার্ল্ মার্ক্স্ ও তাঁর আজীবন সহকর্ম্মী ফ্রিড্‌রিশ্ এঙ্গেল্‌স্। এই সাধনা তাঁদের মৃত্যুর বহুপরে আজকের ইউরোপে এক প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত হয়েছে; এমন কি তার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই ফাশিজ্‌ম্-এর উৎপত্তি। রুষবিপ্লবের নেতা লেনিনের প্রধান কীর্ত্তি, মার্ক্স্‌বাদের প্রকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম করে' তার উপযুক্ত প্রয়োগ। মার্ক্স্-এর চিন্তা ও কর্ম্মের সঙ্গে তাই পরিচয় না থাকলে আধুনিক ইতিহাস বোঝা অসম্ভব।

সাম্যের স্বপ্ন পৃথিবীতে চিরকালই চলে' এসেছে, প্রতি যুগেই চিন্তাশীল লোকে বৈষম্যবিহীন সমাজের আদর্শ এঁকেছেন; কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে যোগ না থাকায় ইতিহাসে এ-সব প্রাচীন কল্পনার বেশী সার্থকতা নেই। ধনতন্ত্রের প্রভাবে আর্থিক সম্পদ ও ক্ষমতার বৈষম্য অত্যধিক হয়ে ওঠার পরই সমাজতন্ত্রবাদ বা সোশ্যালিজ্‌ম্ মূর্ত্ত প্রশ্নের রূপ নিল। তার আক্রমণের লক্ষ্য হ'ল ধনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গগুলি। প্রতিযোগিতায় সামাজিক শক্তির অপচয়, একচেটিয়া কর্ত্তৃত্ব যেখানে সম্ভবপর সেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে তার অপব্যবহার, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে আর্থিক প্রভুত্বের সমাবেশ, শুধু মালিকদের লাভের জন্যই পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন, অর্থবলের কল্যাণে মাত্র এক শ্রেণীর লোকেদের জীবন উপভোগ করবার ব্যবস্থা,

জনসাধারণের ভাগ্যে আজীবন পরিশ্রমের পরিবর্ত্তেও কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ—ধনতন্ত্রের এই বিবিধ অমঙ্গল বর্জ্জন করে' নূতন সমাজগঠনের আদর্শ তখন অনেককে আকৃষ্ট করতে লাগ্‌ল।

পূর্ব্বগামী সোশ্যালিষ্ট্‌দের মার্ক্স্ ইউটোপীয় বা অবাস্তব আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁরা আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখলেও সেদিকে অগ্রসর হবার উপযুক্ত পথ বা কর্ম্মপ্রণালী দেখাতে পারেন নি। তাছাড়া তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ ভাবপ্রবণ। অতীতের স্বর্ণযুগে ও প্রকৃতির মঙ্গলময়তায় তাঁদের বিশ্বাস ছিল। মানুষ বুদ্ধির দোষে প্রাকৃতিক বিধান ত্যাগ করে' দুঃখে নিমগ্ন হয়েছে। ন্যায় বুদ্ধির সাহায্যেই আবার সত্যমঙ্গলের আদর্শকে ফিরিয়ে এনে দুঃখমোচন সম্ভব। শান্ত অহিংস প্রচারকার্য্যের তাই প্রয়োজন, পশুবল উপদ্রব মাত্র। প্রচারের ফলে ও প্রকৃত শিক্ষার গুণে ধীরে ধীরে কঠিন হৃদয় দ্রব এবং অজ্ঞান তিমির অপসারিত হবে। তখন নূতন সমাজের আদর্শ আপনা থেকেই জয়যুক্ত হ'তে বাধ্য। স্পষ্টই বোঝা যায় যে ইউটোপীয় সোশ্যালিজ্‌ম্-এর সঙ্গে ধর্ম্মবিশ্বাসের একটা আন্তরিক যোগ আছে, যদিও নেতারা অনেকে প্রচলিত ধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন না। যে আঠারো শতকের যুক্তিবাদ থেকে এর উৎপত্তি ঐতিহাসিক সম্বার্ট্ সবিস্তারে দেখিয়েছেন, তার মূল বিশ্বাস হ'ল প্রকৃতির চিরন্তনী বিধানের অস্তিত্ব, মানুষের তার থেকে বিচ্যুতি এবং যুক্তি দিয়ে পূর্ব্বাবস্থার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা।

মার্ক্স্ দেখ্‌লেন যে তাঁর পূর্ব্বগামীরা বুঝতে চান নি যে ইতিহাসে একটা ক্রমবিকাশ আছে, তদনুসারে অবস্থা ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, সামাজিক ইতিহাস পাপের দোষে স্বর্গ থেকে বিদায় এবং পুণ্যের জোরে স্বর্গে পুনঃ প্রবেশের কাহিনী না। তাঁর মনে হ'ল যে নূতন সমাজ গঠনের বাধা অজ্ঞানান্ধকার নয়, ধনিকদের স্বার্থ মাত্র, কারণ বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সঙ্গতিবান শ্রেণীর সন্তুষ্ট থাকবার যথেষ্ট হেতু আছে। পরিবর্ত্তন তাই আসতে পারে তাদেরই উদ্যমে যারা শ্রমিক হিসাবে সমাজ ব্যবস্থার খারাপ ফলটাই ভোগ করছে এবং সে-পরিবর্ত্তনে ধনিক ও সংশ্লিষ্ট শ্রেণীগুলি স্বার্থের খাতিরে বরাবরই বাধা দেবে। নৈরাশ্যের বদলে মার্ক্সের মনে কিন্তু আশা এল, কেন না ক্রমবিকাশের একটা ধারা তাঁর মাথায় রূপ নিচ্ছিল যার প্রভাবে বিশ্বাস হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে শ্রমিকবিপ্লব অনিবার্য্য।

ইতিমধ্যে যন্ত্রশিল্পের প্রভূত প্রসারে শ্রমিক অসন্তোষ দেশে দেশে দেখা গিয়েছিল। ইউটোপীয়েরা এর প্রকৃত তাৎপর্য্য ধরতে পারেন নি—রবার্ট ওয়েনের চার্টিষ্ট্‌দের সঙ্গে অসহযোগ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রমিকেরাও কিন্তু নিষ্ফল

আক্রোশে শক্তি ক্ষয় করছিল—কোন নির্দ্দিষ্ট পথ তারা খুঁজে পায় নি। ইংরাজ চার্টিষ্ট্‌দের বৃথা আস্ফালন ও ফরাসী কারিগরদের অযথা দাঙ্গায় মৃত্যুবরণ তার উদাহরণ। মার্ক্স্‌ ও এঙ্গেল্‌সের জীবনের প্রধান কাজ হ'ল সোশ্যালিজ্‌মের নূতন রূপ সাম্যবাদের সঙ্গে শ্রমিক-আন্দোলনের সংযোগ-স্থাপন। এর প্রভাব সহজেই অনুমেয়। ষ্টালিনের ভাষায় বলা যায় যে ব্যবহার-বর্জ্জিত থিওরি বন্ধ্যা আর মতবাদশূন্য প্র্যাক্‌টিস্‌ অন্ধ আচরণ মাত্র।

মার্ক্স্‌ ও তাঁর সহযোগীর জীবন বৃত্তান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক। প্রায় ছাত্রাবস্থায় তাঁরা জার্মানিতে রাষ্ট্রিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং প্রাণভয়ে তাঁদের ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় নিয়ে সেখানেই সারাজীবন কাটাতে হয়। তার পূর্ব্বেই ১৮৪৭ এর শেষে সাম্যবাদের ঘোষণা-পত্রিকায় তাঁরা নিজেদের বিশিষ্ট মতামত লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তারপর বহুকাল ধরে' সে-মতবাদের প্রসার ও প্রচারে তাঁদের সময় কাটে। জার্মানে লেখা তাঁদের রচনা প্রথমতঃ সে-দেশেই সাড়া পায়। ইংল্যাণ্ডে তখন ভিক্টোরীয় সমৃদ্ধির যুগে তাঁদের সমাদর না হবারই কথা। ডাস্‌ কাপিটাল্‌ গ্রন্থরচনা মার্ক্সের শেষজীবনের প্রধান কীর্ত্তি কিন্তু সাম্যবাদ বুঝতে বোধ হয় তাঁর ছোট ছোট পুস্তিকাগুলি বেশী সাহায্য করে। কিন্তু মার্ক্স্‌কে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে অধ্যয়নরত পণ্ডিত হিসাবে দেখা উচিত নয়। তিনি শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনিই প্রথম ১৮৬৪ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করেন। পরে বাকুনিনের সঙ্গে তীব্র মতভেদের ফলে এই সভা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। বাকুনিন্‌ আধুনিক নৈরাজ্যবাদ বা এনার্কিজ্‌ম্‌-এর জনক। সেই থেকে মার্ক্স্‌বাদী ও বাকুনিন্‌-পন্থীদের প্রকাশ্য ও গোপন বিবাদ আজ পর্য্যন্ত চলে এসেছে। পরবর্ত্তী ইতিহাসের দিক থেকে মার্ক্সের চিন্তা বা কর্ম্মধারার একটা বৈশিষ্ট্য প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। সারা জীবন তিনি দুই শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করে' চলেছিলেন—একদিকে অতিমাত্রায় সাবধানী রক্ষণশীলতা এবং অন্যদিকে অধীর ভাববিলাসের অতিদ্রুত অগ্রসর আকাঙ্ক্ষা। সমসাময়িক বাদানুবাদে লেনিন্‌ ষ্টালিন্‌কেও এই দুই শত্রুর সঙ্গে লড়তে হয়েছে।

মার্ক্সবাদের প্রাণবস্তু একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী, তাকে ডায়ালেক্‌টিক্‌ আখ্যা দেওয়া হয়। এই ডায়ালেক্‌টিক্সের উৎপত্তি একদিকে আদর্শবাদের শীর্ষস্থানীয় হেগেলের চিন্তাপ্রণালী ও অন্যদিকে জড়বাদের দার্শনিক বিশ্বাসের মধ্যে। বিশ্বসংসারকে স্থিতিশীল না ভেবে ক্রমবিবর্ত্তনের নিয়মানুগ মনে করা হেগেলের

বিশেষত্ব ছিল—সেই পরিবর্ত্তনের মূল-সূত্রকে তিনি প্রাচীন বাদানুবাদ পদ্ধতির স্মরণেই বোধ হয় ডায়ালেক্‌টিক্স্ নাম দেন। ভাববাদী হেগেলের কাছে ক্রমবিকাশ ছিল অবশ্য আইডিয়ারই রূপান্তর। শিষ্যস্থানীয় মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্‌স্ কিন্তু জড়বাদের মূল-বিশ্বাস—বিদেহীজ্ঞানের আগে জড়বস্তুর অস্তিত্ব—ত্যাগ করতে পারলেন না। পুরাতন জড়দর্শন তাঁদের কাছে অত্যন্ত যান্ত্রিক মনে হচ্ছিল—নূতন কিছুর উদ্ভবের সঙ্গত ব্যাখ্যা তার মধ্যে তাঁরা পেলেন না। তাই হেগেলের ডায়ালেক্‌টিক্ দৃষ্টিভঙ্গী তাঁরা জড়বাদের মধ্যে এনে তাকে নূতন রূপ দিলেন। পরমমনের আইডিয়ার ক্রমবিকাশ তাই প্রকৃত বস্তুর বিবর্ত্তন বিশ্বাসে পরিণত হ'ল—তার মধ্যে অবশ্য জীবের মানসিক ক্রিয়ারও স্থান রইল। হেগেলের সঙ্গে মার্ক্সের তফাৎ মূলবস্তু নিয়ে, তাঁদের মিল ক্রমবিকাশের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশ্বাসে। সে-ধারাকে থিসিস্, অ্যান্টিথিসিস্, ও সিন্‌থেসিস্ নাম দেওয়া হয়।

মার্ক্স্‌দর্শনের সত্যাসত্য যাই হোক না কেন, তার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বোঝা বিশেষ শক্ত না। এ-মত অনুসারে বিশ্লেষক ব্যাপক দৃষ্টির কাছে চিরস্থিরতা নেই; মানুষের সকল বিধিব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান, এমন কি আইডিয়ার ক্ষেত্রেও এই গতি লক্ষিত হয়। পরিবর্ত্তনের বীজ, বস্তুর মধ্যেই অন্তর্নিহিত পরস্পরবিরোধী শক্তির সঙ্ঘর্ষের ফল; কিন্তু এভলিউশন্ আকস্মিক বা লক্ষ্যহীন নয়—তার একটা বিশেষ ঝোঁক থাকাই স্বাভাবিক। বিবর্ত্তন প্রণালীর ধাঁচ হচ্ছে—বস্তুবিশেষের অবস্থান, অন্তর্নিহিত বিরোধী শক্তির সঙ্ঘাত, তারপর সামঞ্জস্য; সেই সমন্বয় থেকে আবার নূতন পরিবর্ত্তন ধারার সূত্রপাত। একই সময়ে পরস্পরবিরোধী শক্তির পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে একত্র অবস্থান সম্ভব কিন্তু পরিণামে ভারসাম্য ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য, তাই বিরোধই হচ্ছে সামঞ্জস্যে অগ্রসর হবার উপায়—শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়ে এভাবে শ্রেণীভেদের অবসান হ'তে পারে। পরিবর্ত্তনের ধারা অনেকটা কম্বুরেখা বা স্পাইরালের মতন—বৃত্তাকার বা সরলরেখা নয়; অর্থাৎ প্রতিপদেই উন্নতির সোপান অধিরোহণ হয় না অথচ সিন্‌থেসিসের সময় আমরা ঠিক গোড়ার অবস্থায় ফিরে যাই না। গতির বেগ কখনও দ্রুত, কখনো বা মৃদুমন্দ; পরিবর্ত্তন কিন্তু অবিচ্ছিন্ন স্রোত নয়—স্তর থেকে স্তরান্তরে যাওয়াতে একটা উল্লম্ফন থাকে; সিন্‌থেসিসের মধ্যে নূতন কোন গুণ দেখা যায়—আর এই বিপ্লব ইতিহাসের অপরিহার্য্য অঙ্গ।

এঙ্গেল্‌স্ দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে এই ডায়ালেক্‌টিক্ প্রকৃতি, ইতিহাস ও চিন্তাধারা তিন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইতিহাস চর্চ্চায় এই দৃষ্টিভঙ্গীকে

নাম দেওয়া হ'ল ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা। কথায় যাই বলুন না কেন, ঐতিহাসিক মাত্রেই ইতিহাসের ধারার খোঁজ করেন এবং প্রতি ইতিহাস রচনার মধ্যে একটা দেখবার ধরণ বা মূল বিশ্বাস থাকতে বাধ্য। ভাববাদীরাও এ নিয়ম থেকে বাদ পড়েন না। যান্ত্রিক জড়বাদের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা এক বা একাধিক জড়বস্তু বা অবস্থার (খাদ্যের প্রকারভেদ, ভৌগলিক সংস্থান প্রভৃতি) প্রভাব-নির্ণয়ে পর্য্যবসিত হয়। অথচ সে-নিয়মে পরিবর্ত্তনের সঙ্গত ব্যাখ্যা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। মার্ক্স্‌বাদে ইতিহাসের মূলসূত্র ধনোৎপাদনে মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিবর্ত্তনশীল সম্বন্ধের মধ্যে। সেই সম্বন্ধ সমাজে ভিন্ন ভিন্ন স্তর অর্থাৎ শ্রেণীর রূপ নেয়। তাদের ঘাতপ্রতিঘাত ও ক্রমবিকাশ ইতিহাসের মূলকথা। যুগ-বিশেষে শ্রেণীসম্বন্ধের উপরই তৎকালীন বিধি-ব্যবস্থা, আইন-কানুন, ধারণা-সমষ্টি ও পরিশীলন-সম্পদ গড়ে ওঠে। শ্রেণীসম্বন্ধ সমাজমন্দিরের ভিত্তি অথবা কাঠামো—তার উপর বা মধ্যে বৈচিত্র্যের লীলাকে মার্ক্স্‌ কখনোই অস্বীকার করেন নি। কিন্তু মূলসূত্রের সাহায্যে মার্ক্স্‌ ইউরোপের ইতিহাসে একটা পর্য্যায়ক্রম দেখতে পেলেন—যার প্রাণবস্তুই হ'ল শ্রেণীর উত্থানপতন অর্থাৎ শ্রেণীসম্বন্ধের ক্রমবিকাশ। দাসত্ব-প্রথা, ফিউডাল্‌ সমাজ ও তারপর ধনতন্ত্রের প্রথমে পুষ্টিসাধন ও পরে ক্ষয়োন্মুখ অবস্থা—ইউরোপের ক্রমবিকাশ এই পথেই চলেছে। এর পর সোশ্যালিজ্‌মের আগমন তাই মার্ক্সপন্থীদের কাছে ইতিহাসের স্বাভাবিক পরিণতি বলেই মনে হ'ল। মার্ক্স্‌ এ-কথা বলেন নি যে সে-পরিণাম হবেই হবে কারণ ইউরোপীয় সভ্যতা ধ্বংস হ'য়ে যাবার সম্ভাবনাও তাঁর মনে উদয় হয়েছিল। আর তিনি একথাও বলেন নি যে সোশ্যালিজ্‌ম্‌ মানুষের বিনা চেষ্টাতেই আপনা থেকে হাজির হবে। শেষোক্তরূপ অদৃষ্টবাদের সঙ্গে শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের থিওরি খাপ খায় না, এ-কথা বলা বাহুল্য।

দর্শন অথবা ইতিহাস ছেড়ে অর্থনীতি বা রাষ্ট্রচর্চ্চায় মার্ক্সের মূল বিশ্বাসের প্রয়োগই অবশ্য বেশী পরিচিত। ব্যক্তিবিশেষ যাই করুক না কেন, শ্রেণীবিশেষের অস্তিত্ব তার বিশিষ্ট স্বার্থের উপর নির্ভর করছে, সে-স্বার্থলোপ শুধু সেই শ্রেণীর লুপ্তির মধ্যে। সেইজন্য শ্রেণীভেদ থাকলে শ্রেণীস্বার্থ এবং শ্রেণীসঙ্ঘর্ষও থাকতে বাধ্য। সীমারেখা স্পষ্ট না হ'লেও শ্রেণীর পৃথক অস্তিত্ব নিঃসন্দেহ। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় প্রধান প্রতিপক্ষ—ধনিক ও মজুর শ্রেণী ; অন্য সকলে সংশ্লিষ্ট পার্শ্বচর মাত্র। ধনতন্ত্রের যুগে অন্য সামগ্রীর মতন শ্রমশক্তিও ক্রয়বিক্রয়ের বস্তু কিন্তু এই ক্রীত শ্রমশক্তির সাহায্য ছাড়া নূতন ধনোৎপাদন অসম্ভব। সমগ্র

সমাজের দিক থেকে দেখতে গেলে শ্রমশক্তিই পণ্যোৎপাদনের মূল। যদি কোনও কারণে শ্রম বন্ধ হয়ে যায় তা'হলে সঞ্চিত মূলধনের কোন মূল্য থাকে না, এ-কথা বোঝা শক্ত না। শ্রমিকের পারিশ্রমিক উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের চাইতে কম বলেই মূলধনী মালিকের ব্যবসায় লাভ থাকে। কিন্তু এই অতিরিক্ত সম্পদ ন্যায্যতঃ ধনিকশ্রেণীর চাইতে সমস্ত সমাজেরই প্রাপ্য। ধনতন্ত্রের প্রচলিত ব্যক্তিগত লাভের জন্য উৎপাদন-পদ্ধতিকে মার্ক্স্ তাই শোষণ আখ্যা দিলেন। তাঁর এ-কথাও মনে হ'ল যে সকল ষ্টেট্ বা রাষ্ট্রই শ্রেণীবিশেষের স্বার্থরক্ষার উপায় মাত্র। শ্রেণীভেদ যতদিন থাকে ততদিন সেখানে দেশ বা জাতির সম্মিলিত স্বার্থ শুধু কথার কথা এবং সে-কথা আসলে শাসকশ্রেণীর প্রভুত্বের আবরণ মাত্র। এইজন্যই মার্ক্স্ সকল দেশের শ্রমিকদের একজোট হ'তে আহ্বান করেছিলেন। সে-একত্রীকরণের পরিণতি শ্রমিকবিপ্লবে আর তখন ধনিকদের উচ্ছেদসাধনের পর শ্রেণীবর্জ্জিত সমাজগঠনই শ্রমিকদের মুক্তির একমাত্র উপায়। মার্ক্স্ তার নাম সাম্যতন্ত্র দিলেন ; তাঁর মতে শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের নিষ্পত্তি এইভাবে আস্‌বে।

পূর্ব্বতন সমাজতন্ত্রবাদের থেকে মার্ক্স্-প্রচারিত সাম্যবাদের দুস্তর পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। পরবর্ত্তী শ্রমিকনেতা সোশ্যালিষ্টেরা তাই অধিকাংশই মার্ক্সপন্থী হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতেন। জার্মানির বিশাল সোশ্যাল্ ডেমক্রাট্ পার্টি গোঁড়া মার্ক্স্বাদী বলে' নিজেদের গণ্য করে' গর্ব্ব অনুভব করত। কিন্তু কার্য্যতঃ তাদের মধ্যে বিপ্লবচেষ্টার সাধনা ক্ষীণ হয়ে শান্তিপ্রিয় কর্ম্মপদ্ধতিতে পর্য্যবসিত হ'ল। সেই থেকে সোশ্যাল্ ডিমক্রাসির একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী উদ্ভূত হয় যার সঙ্গে মার্ক্স্ ও এঙ্গেলসের চিন্তার ধরণের মিল ক্রমশঃ কমে' আসে। প্রাক্‌সামরিক যুগে জার্মান্ পণ্ডিত কার্ল্ কাউট্স্কি দেশে বিদেশে মার্ক্স্বাদের প্রধান পুরোহিতরূপে পূজা পেতেন। ১৮৮৯ সালে স্থাপিত শ্রমিকদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ক্রমে তিনিই গুরুর স্থান নেন। বের্ণষ্টাইন্ মার্ক্স্কে সংশোধন করবার প্রস্তাব আনলে, তাঁর অনুচররা দল থেকে বহিষ্কৃতপ্রায় হ'ল অথচ আসলে কাউট্স্কিও যে মার্ক্স্বাদকে ভদ্র ও বিকৃত করে' ফেল্‌ছিলেন সেকথা অনেকদিন ধরা পড়ে নি।

মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্-এর প্রকৃত মতামতের পুনরুদ্ধার হ'ল লেনিনের চেষ্টায়। যুদ্ধের পর বাদানুবাদে কাউট্স্কি এমন পরাস্ত হলেন যে এখন তাঁর ব্যাখ্যাকে মার্ক্স্-পন্থা ভাববার ভুল অতি অল্প লোকেই করবেন। উপরে সাম্যবাদের পরিচয়ে তাই লেনিনকে অনুসরণ করা হয়েছে। তাঁর প্রভূত অধ্যবসায়ে

মার্ক্স্‌বাদের কয়েকটি অঙ্গ প্রথম পরিস্ফুট হ'ল। প্রথম সোপান হিসাবে শ্রমিকদের সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া শ্রেণীবর্জ্জিত নূতন সমাজ গঠনের অন্য উপায় নেই; সুতরাং বিপ্লব সম্ভব ও সার্থক করে' তোলার সাধনাই শ্রমিকপ্রতিভূ সাম্যবাদীদের কর্ত্তব্য। এই বিশ্বাসের জন্যই আজ প্রায় প্রতি দেশে মার্ক্স্‌বাদের দমনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বিপ্লবের পর নূতন সমাজ গড়ে তোলার জন্য বহুদিনের পরিশ্রম চাই। লেনিনের ব্যাখ্যায় সে-যুগসন্ধির সময় শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য প্রয়োজন—অর্থাৎ তখন গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রশ্রয় সম্ভব না। এইখানে কাউট্‌স্কির সঙ্গে ঘোর মতানৈক্যের ফলে সোশ্যাল্ ডিমক্রাসি ও সাম্যবাদ পরস্পরবিরোধী হয়ে পড়ল। লেনিন্ আরও বল্লেন যে বিপ্লবের পর ক্রমে ক্রমে শ্রেণীভেদ শেষ হ'য়ে গেলে, এঙ্গেল্‌সের ভাষায় ষ্টেটের নিষ্পেষণযন্ত্র শুকিয়ে যাবে। তখনই পূর্ণ সাম্যতন্ত্র আসতে পারবে আর তার সঙ্গে নৈরাজ্য-বাদের ঈপ্সিত অবস্থা সম্ভবপর হবে। এইভাবে লক্ষ্যে পৌঁছবার পদ্ধতিই লেনিনের সাম্যবাদ এবং মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তা' অভিন্ন।

দুই

আঠারো শতক থেকে রাশিয়া ইউরোপে প্রধান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আসন পেয়েছে। উত্তরোত্তর তার শক্তি অনেকদিন বৃদ্ধি পেল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রুষসম্রাট জারদের রাজ্যমধ্যে স্বেচ্ছাচার ও বাইরে প্রতাপ প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়। ১৯১৭ তে সে-শক্তির উচ্ছেদসাধন সুতরাং সম্পূর্ণ আকস্মিক হ'তে পারে না। বস্তুতঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর থেকে রুষরাজ্যের প্রসার অনেকখানি বাধাপ্রাপ্ত হ'তে লাগল। দেশের মধ্যে সংস্কার কামনার উদয়ও প্রায় সেই একই সময়ে। প্রথম নিকোলাসের রাজত্বে, অর্থাৎ ঠিক একশত বৎসর আগে, রুষ চিন্তারাজ্যে প্রখর বাদানুবাদের পর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপাসক শ্লাভোফিল্ দলের চাইতে সংস্কারক পশ্চিমপন্থীদের প্রভাব প্রবলতর হ'তে লাগ্‌ল। ক্রমে সে-ভাবধারা রাষ্ট্রিক আন্দোলনে পরিণত হ'লে দ্বিতীয় আলেক-জাণ্ডার রাষ্ট্রশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে' নেবার জন্য কয়েকটি সংস্কার করলেন। ব্যবস্থাগুলি বহুপূর্ব্বে আসা উচিত ছিল—সে জন্য, এবং তাদের মধ্যেও উদারতার অভাবের ফলে দেশে কিন্তু অসন্তোষ লাঘব হ'ল না। কৃষকসাধারণ অর্দ্ধদাসত্ব প্রথা লোপের পর দেশের কিছু জমি পেলেও পূর্ব্বতন প্রভুদের ক্ষতিপূরণের

ভার তাদের উপরই পড়ল। রাজ্যশাসনেও অবাধ রাজতন্ত্রের তখনও অবসান হয়নি। তাই চরমপন্থীদের সঙ্গে শাসকদের প্রবল সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল। এ-সময়ের আন্দোলন (গত শতকের তৃতীয় পাদে) নারোদ্‌নিকি নামে খ্যাত। একদিকে রাজার অত্যাচার, অন্যদিকে নিহিলিষ্ট্‌ নামে পরিচিত সন্ত্রাসবাদ রাশিয়াকে তখন মথিত করে। বাকুনিনের প্রভাবান্বিত এসার দল রাশিয়ায় প্রথম সোশ্যালিজ্‌মের ধ্বজা তুল্‌ল কিন্তু তার কিছু পরে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে মার্ক্সের অনুগামী সোশ্যাল্‌ ডেমক্রাট্‌দের উদ্ভব হয় প্লেকানভের নেতৃত্বে। তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ও দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে ওদিকে দমননীতির পরাকাষ্ঠা দেখা গেল। শুধু সন্ত্রাসবাদীরা নয়, সকল প্রকার সোশ্যালিষ্ট্‌, এমন কি উদার মতাবলম্বী লোকেরা এবং সংখ্যান্যূন জাতিদের নেতারা পর্য্যন্ত দণ্ডিত হতেন। দমন ও বিপ্লব প্রচেষ্টার সঙ্ঘাত তখনকার রুষসাহিত্যে পটভূমিকা ; সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন-দণ্ডের কথাও সুপরিচিত।

বিদেশে লণ্ডনে রুষ সোশ্যাল্‌ ডেমক্রাটদের দ্বিতীয় মহাসভায় দলভঙ্গ হ'ল—মেন্‌শেভিক্‌ মত অগ্রাহ্য করে' লেনিনের অনুচরেরা তাদের সে-সভায় সংখ্যাধিক্যের জন্য বল্‌শেভিক্‌ নামে খ্যাত হয়। মতভেদের কারণ লেনিনের মতামত—তিনি মার্ক্সীয় দলটিকে বিপ্লবব্রতী রূপে সঙ্গঠিত কর্‌তে চান আর অনেক বিষয়ে মার্ক্স-বাদের প্রচলিত ব্যাখ্যা তাঁর ভুল মনে হতে লাগ্‌ল। প্লেকানভ্‌ ক্রমশঃ মেন্‌শেভিক্‌ ভাবাপন্ন হ'য়ে পড়েন, তাই লেনিন্‌ই বলশেভিক্‌দের প্রকৃত নেতা হন। তাঁর স্বদেশে ফেরার উপায় ছিল না কিন্তু ষ্টালিন্‌ প্রভৃতি বল্‌শেভিক্‌ কর্ম্মীরা দেশের মধ্যে গোপনে প্রচার চালালেন। মেন্‌শেভিক্‌দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে রাশিয়া আর্থিক হিসাবে অনুন্নত বলে' প্রথমে পশ্চিম ইউরোপের অনুরূপ উদার গণতন্ত্র সে-দেশে স্থাপিত হবে, তারপর কালে সোশ্যালিজ্‌ম্‌ স্থাপন সম্ভব হবে। বল্‌শেভিক্‌ মতে মার্ক্স্‌ কখনও এমন যান্ত্রিকভাবে বিবর্ত্তনের কল্পনা করেন নি। লেনিন্‌ দেখালেন যে ধনতন্ত্র এখন পৃথিবীব্যাপী, কাজেই রাশিয়া অন্য দেশের মতন অগ্রসর না হলেও সেই আর্থিক ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে পড়েছে। বিরোধের ফলে ধনতন্ত্র ভেঙ্গে পড়াকে লেনিন্‌ টানের চোটে শৃঙ্খল ছেঁড়া রূপে কল্পনা করেছিলেন। শিকল ছিঁড়বে নিশ্চিত জান্‌লেও ঠিক কোথায় ছিঁড়বে আগে থাকতে তা জানা যায় না, তবে এটুকু বলা সম্ভব যে দুর্ব্বলতম স্থানটিই আগে ছিন্ন হবে। কাজেই কোনও কারণে ধনতন্ত্রের ব্যবস্থা কোথাও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়লে সেখানেই শ্রমিক-বিপ্লব ঘটতে পারে। যুদ্ধের ফলে রাশিয়ায় তাই হ'ল কিন্তু বল্‌শেভিক

মতবাদ আগে থাকতেই সে-সম্ভাবনা ধরতে পেরেছিল। ১৯১২ সালের মধ্যে বল্‌শেভিকেরা মেন্‌শেভিক্‌দের সম্পূর্ণ ছেড়ে পৃথক দল গঠন করল।

জাপানের হাতে পরাজয়ের পর রাশিয়ায় তুমুল আন্দোলন হয় (১৯০৫)—নানা দলের মিলিত চাপে সম্রাটকে বাধ্য হ'য়ে নিয়মতন্ত্র অঙ্গীকার করতে হ'ল। ডুমা অর্থাৎ প্রতিনিধি সভা এভাবে স্থাপিত হ'লেও গণ্ডগোল অবসানের পর ধীরে ধীরে তার সব ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। কিন্তু দেশের মধ্যে অসন্তোষ আরও পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠতে লাগল। তারপর এল মহাসংগ্রাম (১৯১৪)।

মার্ক্স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ বরাবরই বলেছিলেন যে তাঁরা শুধু মূলসূত্র ও বিশ্লেষণ-প্রণালীর উদ্ভাবন করেন, তাঁদের মতবাদ মুখস্থ বিদ্যা নয়, বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী মাত্র। কাউট্‌স্কির প্রামাণ্যতা অগ্রাহ্য করে' লেনিন্‌ ইতিমধ্যে পারিপার্শ্বিকের পর্য্যালোচনায় মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়োগ করেছিলেন। ধনতন্ত্রের সমসাময়িক রূপকে তিনি সাম্রাজ্যবাদ আখ্যা দিলেন—তার চালক শক্তি হচ্ছে ফিনান্স্‌ ক্যাপিটাল, তার ঝোঁক মনোপলি বা একচেটিয়া কর্তৃত্বের দিকে। শক্তিশালী দেশ মাত্রই তাই আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধনিকদের তাড়নায় কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়তে উদ্যত। স্বভাবতঃই পৃথিবী-ভাগাভাগি কাড়াকাড়িতে পরিণত হলে যুদ্ধের উদয় হবে—আর তখনই আসবে শ্রমিকদের সুযোগ। ধনিকতন্ত্রের শান্তভাবে সমাজতন্ত্রে পরিণত হবার প্রত্যাশা কাউট্‌স্কির মনে ছিল। সে-আশা ইংরাজ ফেবিয়ান্‌দের মন্থর পরিবর্ত্তনের ধারণা থেকে অভিন্ন। লেনিন্‌ ঘোষণা করলেন যে সাম্রাজ্যতন্ত্র তিন দিক থেকে চাপের জন্য অচিরে ভেঙ্গে পড়বে—দেশের মধ্যে শ্রমিকদের অসন্তোষ, অধীন অনুন্নত জাতিদের মুক্তিপ্রয়াস এবং মহাশক্তিদের স্বার্থপ্রণোদিত সঙ্ঘর্ষে। লেনিনের ধারণাগুলিকে, ষ্টালিনের ভাষায়, সাম্রাজ্যতন্ত্রের যুগোপযোগী মার্ক্সবাদ রূপে অভিহিত করাই সঙ্গত।

মহাযুদ্ধের সময় জারতন্ত্রের অক্ষমতা বারবার প্রকাশ পাওয়াতে অসন্তোষ ও সংস্কারকামনা আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। রাস্‌পুটিন্‌ নামে এক খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী রাজপরিবারের শনিরূপেই সম্রাট সম্রাজ্ঞীর অপ্রিয়তাবৃদ্ধির কারণ হ'ন। তাঁর মৃত্যুর পর সম্রাটের শিথিল হাত থেকে রাজদণ্ড খসে' পড়বার উপক্রম হ'ল। ১৯১৭ সালের প্রথমে রণক্লান্তি, খাদ্যাভাব, ধর্ম্মঘট, দমনচেষ্টা অবস্থা সঙ্গীণ করে' তোলে। পেট্রোগ্রাডে মার্চ্চের প্রথমে সৈন্যেরা শ্রমিকদের উপর গুলি চালাতে চাইল না। তারপর বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়াতে, ডুমাসভার এক

সমিতি রাজ্যভার গ্রহণ করে এবং সম্রাটকে পদত্যাগ করতে হয়। ইতিহাসে এর নাম ১৯১৭ সালের প্রথম বা মার্চ্চ্ বিপ্লব।

ক্রমে এসার নেতা কেরেন্স্কি দেশের শাসক হয়ে পড়েন, কিন্তু নানা দলের মিলিত কর্ত্তৃত্ব নূতন সাধারণতন্ত্রকে তখন চালাতে থাকে। স্থির হয় যে সমস্ত জনসাধারণের এক বিরাট প্রতিনিধিসভা ভবিষ্যৎ শাসন পদ্ধতি ঠিক করবে আর নূতন রাষ্ট্রশক্তি আগের মতনই যুদ্ধ চালাতে থাকবে। ইতিমধ্যে লেনিন্ ও নির্ব্বাসিত অন্য সকল নেতাদের দেশে ফেরা সম্ভব হয়েছিল। মেন্শেভিকেরা তাদের মতানুসারে দেশে পরবর্ত্তী পর্য্যায় হিসাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্র স্থাপন প্রত্যাশা করছিল। কিন্তু লেনিনের মনে হ'ল ধনিকদের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে শ্রমিক বিপ্লবের সুবিধা উপস্থিত হয়েছে।

তিনি তৎক্ষণাৎ নূতন কর্ম্মপদ্ধতির উদ্ভাবন করে' ফেলেন। সময়োপযোগী ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন মার্ক্স্পন্থার একটা বৈশিষ্ট্য। ১৯০৫ এর বিপ্লবে পেট্রোগ্রাডে শ্রমিকেরা সোভিয়েট্ নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়েছিল। ১৯১৭-র মার্চ্চে তার পুনর্স্থাপন হয় এবং অন্যান্য স্থানেও অনেক সোভিয়েট্ দেখা যায়। সোভিয়েট্ শুধু শ্রমজীবিদের সমিতি—কিন্তু নির্ব্বাচনের কেন্দ্রগুলি বাসস্থান অনুযায়ী পল্লীসমূহ নয়, কারখানা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মস্থল হিসাবে প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা এর বিশেষত্ব। যে-কোনও মুহূর্ত্তে পুরাতনের জায়গায় নূতন প্রতিনিধি পাঠাবার ক্ষমতা থাকায় সোভিয়েটে শ্রমিকদের ইচ্ছা সক্রিয় থাকতে পারে। লেনিনের আন্দোলনের মন্ত্র হ'ল এখন যে সোভিয়েট্গুলির হাতে সকল ক্ষমতা দেওয়া হোক। সহসা সমগ্রদেশের প্রতিনিধিসভার আদর্শ খর্ব্ব করে' শ্রমিক শ্রেণীর প্রাধান্যের কলরব উঠ্ল। কৃষকদের দলে টানবার জন্য লেনিন্ দাবী করলেন যে জমিদারের জমি কেড়ে চাষীদের হাতে দেওয়া হোক। অত্যাচারিত সংখ্যান্যূন অনেক জাতির রুষদেশে বসবাস; লেনিনের তৃতীয় প্রস্তাব, এদের পূর্ণ আত্মকর্ত্তৃত্ব দেওয়া। আর সমস্ত দেশের গুপ্ত ইচ্ছা মূর্ত্ত হ'ল তাঁর চতুর্থ প্রস্তাবে—যুদ্ধ থামিয়ে তৎক্ষণাৎ শান্তির আয়োজনে।

জুলাই মাসে বিদ্রোহের একটা চেষ্টা ব্যর্থ হ'লে লেনিন্কে অজ্ঞাতবাসে থাকতে হয়। সেই দারুণ উদ্বেগের সময় তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকা—রাষ্ট্র ও বিপ্লব—রচনা হ'ল। তারপর নভেম্বরে বিপ্লবচেষ্টা করল সাফল্যলাভ। নবাগত ট্রট্স্কির সাহায্যে লেনিন্ ও তাঁর সহকর্ম্মীরা শাসনযন্ত্র অধিকার করলেন। এই সময়ে দশটি স্মরণীয় দিনের প্রত্যক্ষ বিবরণ রীড্ নামে এক আমেরিকান্ লিপিবদ্ধ

করে' রেখেছেন। যে-চার প্রস্তাবে লেনিন্ জনমতকে উত্তেজিত করেছিলেন, বল্‌শেভিক্‌দের প্রথম কর্ত্তব্য হ'ল সেগুলি অনুমোদন এবং কাজে পরিণত করবার প্রয়াস। জাতীয় প্রতিনিধি সভার বদলে শ্রমিক সমিতি বা সোভিয়েট্‌গুলি নূতন রাষ্ট্রের অঙ্গ হওয়াতে রাশিয়া সোভিয়েট্ ইউনিয়ান্ নামে পরিচিত হ'ল। ইতিমধ্যে অবশ্য সোভিয়েট্‌সমূহ বল্‌শেভিক্‌দের হাতে এসে পড়েছিল।

১৯১৭-র নভেম্বর থেকে ১৯১৮ সালের জুন পর্য্যন্ত আট মাস বল্‌শেভিক্ শাসনের প্রথম অধ্যায়। লেনিনের প্রস্তাবের কিছু কিছু সোশ্যালিষ্ট্ আদর্শের আপাতবিরোধী হ'লেও তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে প্রথম কর্ত্তব্য হ'ল শাসনযন্ত্র অধিকার এবং দ্বিতীয় হচ্ছে সে-অধিকার অটুট রাখার চেষ্টা। তাই কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করা হয় এবং ছোট ছোট জাতিরা স্বায়ত্তশাসন পেল আর ব্রেষ্ট্‌লিটভ্‌স্কের সন্ধিতে রাশিয়া রাজ্যক্ষয় করেও শান্তি আনে। ধনিকদের একেবারে উচ্ছেদ তখনও হয়নি; কেন্দ্রীয় আর্থিক পরিষদ ও ফ্যাক্টরিগুলিতে শ্রমিক প্রতিনিধি নিয়ে পরিচালক সমিতি গঠন আর্থিক ব্যাপারে প্রথমটা ধনিকদের সহযোগে একরকম দ্বৈতশাসনের প্রবর্ত্তনা করে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯১৮-র জুন থেকে ১৯২১-র আগষ্ট্ পর্য্যন্ত। এই সময়টা বল্‌শেভিক্‌দের অগ্নিপরীক্ষার যুগ। অন্তর্বিরোধ আরম্ভ হ'ল—বল্‌শেভিক্‌বাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে নানা দিকে বিদ্রোহ দেখা দিতে লাগ্‌ল। উত্তরে যুডেনিচ্, দক্ষিণে ডেনিকিন্ ও রাঙ্গেল্, পূর্ব্বে কল্‌চাক্ বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন। জারতন্ত্রের ঋণ শোধে বল্‌শেভিকেরা অস্বীকার করার নজিরে মিত্রশক্তিরা সোভিয়েটের শত্রুদের সাহায্যে উদ্যত হ'ল। ইংরাজ, ফরাসী, জাপানী ও মার্কিন সৈন্য রুষদের আক্রমণ করে। বল্‌শেভিক্‌দের দৃঢ়তা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হয়। মধ্য ইউরোপে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা, রাশিয়াকে আক্রমণ করাতে পশ্চিমে শ্রমিকদের অসন্তোষ ও সোভিয়েটের গৃহশত্রুদের অকৃতকার্য্যতা শেষ পর্য্যন্ত মিত্রশক্তিদের অভিযান ব্যর্থ করে। পোলেরা শুধু এই সুযোগে রাজ্য-বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল। এই জীবনমরণের সমস্যার সময়ই লেনিন্‌কে বাধ্য হ'য়ে সামরিক সাম্যতন্ত্রের ব্যবস্থা করতে হয়। নূতন রাষ্ট্রশক্তি তখন সমস্ত আর্থিক ব্যবস্থা নিজের হাতে নেয়। ধনিকদের উচ্ছেদ হ'ল, যন্ত্রশিল্প এল ষ্টেটের কর্ত্তৃত্বে, কৃষকদের সঙ্গে শস্যের পরিবর্ত্তে অন্য পণ্য সামগ্রী সরবরাহের চুক্তি হয়। রাষ্ট্রশক্তির সর্ব্বৈব কর্ত্তৃত্ব যুদ্ধজয়ে সাহায্য করল বটে কিন্তু এতে দেশের ভিতর অভাব ও গণ্ডগোল বহুল বৃদ্ধি পেল।

১৯২১-এ লেনিন্ নূতন আর্থিক ব্যবস্থা—সংক্ষেপে নেপ্-পদ্ধতির আশ্রয় নিলেন। সাম্যবাদের অবসান হ'ল চারিদিকে তখন এই রব উঠলেও বোঝা সহজ যে বল্‌শেভিকেরা শুধু নানা সাময়িক উপায়ে নিজেদের কর্ত্তৃত্ব দৃঢ়তর করছিল, মূল লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয় নি। পরে ১৯২৮-এ আর্থিক নীতি পরিবর্ত্তন একথা সপ্রমাণ করে। নেপের আমলে কৃষকদের এবং ব্যবসায়ীদের স্বাধীনতা অনেকখানি ফিরে আসে আর বিদেশী ধনিকদেরও কিছু কিছু সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু ধনতন্ত্রের পূর্ব্বাবস্থায় দেশ ঠিক ফিরে যায় নি মনে রাখতে হবে। বড় কারখানাগুলি এবং বহির্বাণিজ্যের কর্ত্তৃত্ব নেপের আমলেও রাষ্ট্রের হাতে থাকে। তাই ধনিকদের ক্ষমতা কিছু ফিরে এলেও আর্থিক ব্যবস্থা একেবারে সোভিয়েট্ শক্তির মুষ্টিচ্যুত হ'ল না। নেপ্‌কে বস্তুতঃ নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর হিসাবে দেখা উচিত। কিন্তু এরই মধ্যে ১৯২৪-এর প্রথমে লেনিনের মৃত্যু হ'ল।

লেনিনের শাসন সম্পর্কে আর দুইটি বিষয়ের—বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ এবং নূতন রাষ্ট্রশক্তি সঙ্গঠনের উল্লেখ ক'রেই এ-প্রসঙ্গ শেষ করতে হবে। ১৯১৮—১৯-এ শ্রমিকবিপ্লব নানা দেশে ছড়িয়ে পড়বার খুবই সম্ভাবনা ছিল। বল্‌শেভিকেরা মার্ক্সের ব্যবহৃত সাম্যবাদী নাম গ্রহণ করে' কমিন্‌টার্ন অথবা তৃতীয় শ্রমিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করল—সর্ব্বত্র বিপ্লবের প্রসার ছিল তার লক্ষ্য। যুগসন্ধির সময় কিন্তু পাশ্চাত্য জগৎ লেনিন্‌কে অগ্রাহ্য করে' উইলসন্-পন্থা-ই অনুসরণ করে। কিছুদিনের মধ্যে সাম্যবাদীরা পর্য্যন্ত বুঝ্‌ল যে ধনিকতন্ত্র টল্‌মল্ করে' উঠ্‌লেও খানিকটা সাম্‌লে নিয়েছে। হাঙ্গারিতে বেলাকুনের বল্‌শেভিকি আধিপত্য ধনিকেরা ধ্বংস করল রোমানিয়ার সৈন্যের সাহায্যে। জার্মানিতে বিপ্লবের পর ধীরে ধীরে মধ্যশ্রেণীর কর্ত্তৃত্ব পুনর্প্রতিষ্ঠ হ'ল। রাশিয়ার মধ্যে বিপ্লব জয়যুক্ত হ'লেও শেষ পর্য্যন্ত বাইরে তার পরাজয় হয়। ১৯২৩-এর পর আমেরিকার আর্থিক সাহায্যের সম্ভাবনা-ই পশ্চিমে বিপ্লবের ভয় অপসারণ করতে পেরেছিল। কিন্তু সে-সম্ভাবনার অনেক আগে থাকতেই সোভিয়েট্ রাশিয়া বিদেশ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ-নীতি অবলম্বন করে। ১৯২০ সালে-ও চিচেরিন্ মার্কিণ গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে জানান যে সোভিয়েট্ শক্তি অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। জারদের সুবিদিত অগ্রসর নীতি তাই প্রথম থেকে সযত্নে পরিত্যক্ত হয়েছিল। তার উদাহরণ—ব্রেষ্ট্-লিটভ্‌স্কের রাজ্যক্ষয় অঙ্গীকার পালন, দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র জাতিগুলির স্বায়ত্ত-শাসন অধিকার প্রদান এবং একদিকে তুরস্ক অন্যদিকে চীনের উপর চাপ দেবার লোভ

সম্বরণ। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে শান্তিপ্রিয়তা শুধু এখন নয়, লেনিনের আমল থেকেই সোভিয়েট্ ইউনিয়ানের বিশেষত্ব। এর কারণ বোধ হয় আভ্যন্তরীণ সঙ্গঠন কার্য্যে ব্যস্ততা এবং বিদেশে ছড়িয়ে পড়বার আর্থিক তাগিদার অভাব। তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্থানের সঙ্গে রুষদের নূতন সদ্ভাব ১৯২১-এর সন্ধিগুলির থেকে আরম্ভ; চীনের সঙ্গেও মৈত্রী হ'ল ১৯২৪-এ। ক্রমে ক্রমে পশ্চিমের প্রতিবেশীদের সঙ্গেও সন্ধি-স্থাপন হয় যদিও সীমান্ত নিয়ে পোল্যাণ্ড ও রোমানিয়ার সঙ্গে কিছু মনোমালিন্য থেকে গেল। এ-সময় বড় রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েট্‌কে অস্পৃশ্য করে' রাখাতে জার্মানির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল। (রাপালোর সন্ধি, ১৯২২)।

নূতন রাশিয়ার আভ্যন্তরিক অবস্থার আলোচনা স্থানাভাবে এখানে সম্ভব নয়। অশেষ দুর্গতি ও অনেকখানি অত্যাচারের মধ্য দিয়েও এক সম্পূর্ণ নূতন ব্যবস্থা গড়ে' উঠবার সূত্রপাত হ'ল। রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তিতে স্থানীয় সোভিয়েট্‌গুলি গ্রামে গ্রামে ও প্রতি নগরে বিরাজ করতে লাগ্‌ল। তাদের প্রতিনিধি নিয়ে প্রাদেশিক সোভিয়েট্ এবং প্রদেশগুলির প্রতিনিধি দিয়ে সোভিয়েট্ কংগ্রেস গঠিত হ'ল—এই কংগ্রেসই দেশের ব্যবস্থা পরিষদ। কংগ্রেস দুইভাগে বিভক্ত এক সংসদ্ নির্ব্বাচন করে, তার একভাগে দেশান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও আসন পেল। এর থেকে আবার কমিসার অথবা মন্ত্রীদের সমিতির নিয়োগ। ১৯২৩-এর শাসন-পদ্ধতি অনুসারে সোভিয়েট্ রাষ্ট্র এক ফেডারেশন অথবা সংহত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এতে আসল রাশিয়ার সঙ্গে আরও ছয়টি সোভিয়েট্ রেপাব্লিক্ সংযুক্ত হ'ল; তাদের নাম—শ্বেতরাশিয়া, উক্রেন্, ট্রান্স্‌ককেশিয়া, তাজিকিস্থান, উজ্‌বেকিস্থান, এবং তুর্ক্‌মানিয়া। মূল রুষদেশেও আবার নানা অঞ্চলে স্থানীয় আত্মকর্ত্তৃত্বের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু এই জটিল বন্দোবস্ত চালাতে লাগল এক মূল শক্তি—এবং সে চালক হচ্ছে সাম্যবাদী দল। প্রকৃত নেতৃত্ব রইল পার্টিকংগ্রেস ও তার সমিতির হাতে। শেষ পর্য্যন্ত পলিট্-বুরো নামক সাম্যবাদী কর্ম্মসমিতি-ই রাশিয়ার শাসক—মন্ত্রী প্রভৃতিরা তাদের-ই আশ্রিত। রুষ অধিনায়ক ষ্টালিন কেবল সাম্যবাদীদলের কর্ম্মসচিব ও পলিট্‌বুরোর সভ্য মাত্র।

লেনিন্-গঠিত যন্ত্রের মূল কথা ছিল শ্রমিক আধিপত্য—তার রূপ হ'ল সোভিয়েট্‌গুলি। কিন্তু শ্রমিক-সাধারণকে ঠিক পথে চালাবার জন্য নেতার প্রয়োজন। সে-অভাব দূর করে সাম্যবাদী দল। বিরোধীদের তাই দেশমধ্যে

দমন করা হ'ল। এই চণ্ডনীতির কোন সার্থকতা থাকলে, মার্ক্স্ ও লেনিনের মতবাদে বিশ্বাস থেকেই তার উৎপত্তি।

তিন

যুদ্ধান্তের জগতে সব চেয়ে আশ্চর্য্য ঘটনা—সোভিয়েট্ ইউনিয়ানের সৃষ্টি; ১৯৩৭-এর নভেম্বরে তার কুড়িবছর পূর্ণ হয়েছে। বিপ্লবের পর থেকে রাশিয়া শ্রমিক-রাষ্ট্ররূপে গণ্য হয়েছে এবং অন্য সকল দেশ থেকে তার পার্থক্য এইখানেই। এর পূর্ব্বগামী অনুরূপ রাষ্ট্র ১৮৭১-এর প্যারিস্-কমিউন্ আকারে ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী ছিল। চারিদিকের পৃথিবীব্যাপী ধনতন্ত্রকে ছাড়িয়ে নূতন আর্থিক ব্যবস্থা ও নবীন শ্রেণীবর্জ্জিত সমাজ গড়ে' তোলবার প্রচেষ্টা সোভিয়েট্ রাশিয়ার বৈশিষ্ট্য। মার্ক্সের মতে সাম্যতন্ত্র গঠন একটা সম্পূর্ণ যুগের কাজ, ধনিকতন্ত্রও যেমন একদিনে ফিউডাল্ ব্যবস্থার স্থান নিতে পারে নি। রাশিয়ায় তাই এখনই সাম্য-তন্ত্রী সমাজ দেখার প্রত্যাশা, আদর্শ কতখানি কৃতকার্য্য হ'ল তার সঠিক পরিমাণ নির্দ্দেশ কিম্বা রুষ অভিজ্ঞতার থেকে সে-আদর্শের সম্ভাবনীয়তা অথবা দোষগুণ বিচার—এ সমস্তই অনেকখানি অবান্তর আলোচনা ও পণ্ডশ্রম মাত্র। ঐতিহাসিকের চোখে পড়ে শুধু একটা বিরাট সুসম্বদ্ধ উদ্যম, তার ফলাফল এখনও ভবিষ্যতের অন্ধকারে। সে-উদ্যমের প্রাণ হচ্ছে মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বাস। বল্‌শেভিকেরা থিওরি এবং প্র্যাক্‌টিসের অঙ্গাঙ্গী যোগ মানে, তাই তাদের আচরণের বিচার শেষ পর্য্যন্ত একটি প্রশ্নে গিয়ে দাঁড়ায়—মার্ক্সের নির্দ্দিষ্ট পন্থা থেকে তারা ভ্রষ্ট হচ্ছে কি না। রুষ বিপ্লবের পর গোঁড়া মার্ক্সীয় নামে খ্যাত কাউট্‌স্কি অভিযোগ আনলেন যে লেনিন্ মার্ক্সবাদকে বিকৃত করেছেন। তখন বহু বাদানুবাদ হয়েছিল, তার ফলে আজকের দিনে আর কেউ এ-কথা বলেন না। কিন্তু গত কয়েক বছর বার বার কথা উঠেছে যে ষ্টালিন্ নির্দ্দিষ্ট আদর্শ ও পন্থা থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন—এখন প্রধান অভিযোগকারী লেনিনের সহযোগী স্বয়ং ট্রট্‌স্কি। এ-তর্কবিতর্ক এখনও চলেছে কিন্তু মার্ক্সতত্ত্বে অভিজ্ঞ অধিকাংশের মতে ষ্টালিনই মার্ক্সের প্রকৃত শিষ্য। সাম্যবাদের চিন্তাধারার প্রকাশ বোঝাতে গেলে তাই মার্ক্স্-এঙ্গেল্‌স্-লেনিন্-ষ্টালিন্ এঁদেরই নির্দ্দেশ অনুসরণ করা সঙ্গত।

লেনিনের মৃত্যুর (১৯২৪) পর, তিনজন নেতার হাতে রাজ্যভার এসে পড়ে। তাঁরা তখন ত্রয়ী নামে খ্যাত হয়েছিলেন—সে-তিনজন জিনোভিয়েভ্, কামেনেভ্ এবং ষ্টালিন্। বহির্জগতে লেনিনের সহকর্ম্মীদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতি লাভ

করেছিলেন ট্রট্স্কি। বিপ্লবের সময় ট্রট্স্কির উপর নেতৃত্বের ভার অনেকখানি পড়ে এবং পরে নূতন লোহিতবাহিনীর সৃষ্টিকর্ত্তা হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধ হন। কিন্তু ট্রট্স্কি বহুদিন মেন্‌শেভিক্ ছিলেন, লেনিন্-বিবৃত মার্ক্স্-তত্ত্ব তাঁর ঠিক দুরস্ত ছিল না। থিওরির ব্যাপারে এখন পর্য্যন্ত তাঁর দুর্ব্বলতা থেকে গেছে, তাঁর লেখাতে ডায়ালেক্‌টিক্ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব সুবিদিত। তাছাড়া তাঁর স্বভাব ছিল রোমান্টিক ধরণের, কমিউনিষ্ট্ দলের নেতৃত্বের তিনি ঠিক উপযোগী ছিলেন না। ট্রট্স্কির মনের গড়নই আদর্শবাদ, বিপ্লব-বিলাস ও নৈরাজ্যতন্ত্রের অনুকূল। লেনিনের ব্যক্তিত্ব তাঁকে আচ্ছন্ন করে' থাকলেও, অবিসম্বাদী নেতার মৃত্যুর পর কমিউনিষ্ট্ দল তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারে নি। নেতার পার্শ্বচর হিসাবে তিনি খ্যাত হলেও, লেনিনের যথার্থ মতবাদ হৃদয়াঙ্গম করে' প্রচার ট্রট্স্কি করেন্ নি—সে কাজ ষ্টালিনের। ষ্টালিন্ বিপ্লবের বহু পূর্ব্ব থেকে রাশিয়ায় দলের গুপ্ত প্রচার কার্য্যে জীবন সংশয় করে' পরিশ্রম করেছিলেন। বিপ্লবের পর তিনি নির্দ্দিষ্ট কাজ যোগ্যতার সঙ্গেই সম্পন্ন করতেন। বক্তৃতায় ও লেখায় লেনিনের মতবাদ তিনিই পরিস্ফুট করেন। দলের কর্ম্মসচিব হিসাবে তিনি কমিউনিষ্ট্দের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন।

লেনিনের মৃত্যুর সময় রাশিয়াতে নেপের আমল চল্‌ছিল। ট্রট্স্কি তার প্রকৃত রূপ বুঝ্‌তে না পেরে গণ্ডগোল আরম্ভ করলেন ; নেপ্ আরম্ভ হবার এত পরে তাঁর এই অভিযান নূতন নেতাদের বিব্রত করবারই উপায় মনে হয়। বহির্জগতের অভিমত প্রতিধ্বনিত করে' ট্রট্স্কি বল্‌লেন যে রাশিয়ায় বিপ্লবের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, ফরাসী বিপ্লবে যেমন রোব্‌স্পিয়ারের মৃত্যুর পর থার্মিডরের প্রতিক্রিয়া এসেছিল এখন তেমনি রুষদেশেও বিপ্লবীদল পশ্চাৎগমন করছে। তখন দলের মধ্যে তর্ক উঠ্‌ল কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ে। ট্রট্স্কির মতে শুধু একদেশে অর্থাৎ রাশিয়ায় নূতন সমাজগঠনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। তার আগে পৃথিবীর নানা দেশে শ্রমিক-বিপ্লব সঙ্ঘটিত হওয়া প্রয়োজন। বিপ্লবকে আগুণের মতন দেশ থেকে দেশান্তরে না নিয়ে যেতে পারলে সব ব্যর্থ হবে। শ্রমিকবিপ্লব জগদ্ব্যাপী করা আবশ্যক, তাই প্রধান কাজ হ'ল কমিন্‌টার্নের সাহায্যে সর্ব্বত্র বিপ্লব আনয়নের চেষ্টা। ট্রট্স্কির মতবাদে তাঁর অবাস্তবতা সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে—মার্ক্স্তত্ত্বের জটিলতা আয়ত্ত্ব না করে' তিনি তাকে মন্ত্রের রূপ দিতে এবং বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে ছেলেখেলায় পরিণত করতে চাচ্ছিলেন। ষ্টালিনের মতে সাম্যবাদীদের কর্ত্তব্য সর্ব্বদা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার। লেনিন্‌ও লক্ষ্য অবিচলিত রেখে স্থানকাল অনুসারে কর্ম্মপদ্ধতি

পরিবর্ত্তিত করতেন। অধীর আস্ফালনকে তিনি এক বিখ্যাত পুস্তিকায় শৈশব-সুলভ ব্যাধি নাম দিয়েছিলেন। এরও বহু আগে স্বয়ং মার্ক্স্ ব্ল্যাঙ্কির নির্ব্বিচার বিপ্লবের উচ্ছ্বাস ও ষ্টার্ণার-এর উগ্রপন্থার নিন্দা করেন। দেশে নিশ্চেষ্টতা ও বিদেশে শক্তিক্ষয়ের মধ্য দিয়ে ট্রট্স্কির নীতি নামে চরমপন্থা ও কাজে পশ্চাদ্গমনে পর্য্যবসিত হবে। ১৯২৪-এ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল যে ধনতন্ত্র অনেকখানি টাল সাম্লেছে। এ-অবস্থায় রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ সঙ্গটন দলের প্রধান কর্ত্তব্য। লেনিন্ নিজেই তার পথপ্রদর্শন করেছিলেন। রাশিয়ার মতন একদেশেও নূতন সমাজের প্রথম অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব—তার মূলসূত্র হচ্ছে যে প্রত্যেককে শ্রম করতে হবে এবং প্রত্যেকে শ্রমের উপযুক্ত মূল্য পাবে। এই প্রথম অবস্থাকে সমাজতন্ত্র নাম দেওয়া যায়। পূর্ণ সাম্যতন্ত্র এর পরের অবস্থা—আর সে-অবস্থায় পৌঁছতে গেলে সম্ভবতঃ বিপ্লবের সর্ব্বদেশে প্রসার প্রয়োজন। শ্রমিক-কর্ত্তৃত্ব জগদ্ব্যাপী হ'লেই নূতন শ্রেণীবিহীন সমাজের পূর্ণগঠন সম্ভব আর তখনই এঙ্গেল্সের প্রতিশ্রুত ষ্টেটের নিষ্পেষক যন্ত্রের সম্পূর্ণ লোপ হ'তে পারবে। এই দ্বিতীয় অবস্থাকেই সাম্যতন্ত্র নাম দেওয়া হ'ল—এর মূলসূত্র হবে যে প্রত্যেকে শক্তি অনুসারে শ্রম করবে বটে কিন্তু সমাজের কল্যাণে সে পাবে তার যা কিছু প্রয়োজন সমস্তই।

১৯২৬-এ জিনোভিয়েভ্ ও কামেনেভ্ হঠাৎ পূর্ব্ববৈরী ট্রট্স্কির দলে যোগ দিলেন, অবশ্য এঁদের দুজনের মতিস্থিরতার অভাব বল্শেভিক্দের পূর্ব্ব ইতিহাসেও লক্ষ্য করা যায়। ১৯২৭-এ বিস্তর আলোচনার পর কমিউনিষ্ট্দল ষ্টালিনের মতই গ্রহণ করল—আর সেই সময় ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ্, কামেনেভ্, রাডেক্, রাকভ্স্কি দল থেকে বহিষ্কৃত হলেন। পরে অন্য সকলে ভুল স্বীকার করে' দলে ফিরে আসেন কিন্তু ট্রট্স্কি অবিচলিত থাকায়, তাঁর নির্ব্বাসন হয় (১৯২৯)। ১৯৩১-এ দার্শনিক বিচারের ক্ষেত্রে এর অনুরূপ সঙ্ঘর্ষ দেখা দেয়। ডেবোরিন্, কারেভ্ প্রভৃতি দার্শনিকদের বিরুদ্ধে মিটিন্ ইত্যাদি অভিযোগ আনেন যে তাঁরা চিন্তার রাজ্যে আদর্শবাদের দিকে ঝুঁক্ছেন। ট্রট্স্কির মতন ডেবোরিন্ও পরাস্ত হ'লেন।

মার্ক্স্ ও লেনিনের সময়ও সাম্যবাদকে দুইদিকের বিকৃতির ঝোঁক সাম্লাতে হয়েছিল। এখনও ট্রট্স্কির পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উল্টোদিকের চরমপন্থাকেও ষ্টালিন বর্জ্জন করেন। ১৯২৮-এ বুকারিন্, টম্স্কি, রাইকভ্ প্রভৃতি নেতারা ষ্টালিনের নীতিকে অতিমাত্রায় দুঃসাহসিক মনে করলেন। ট্রট্স্কির অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই বিপদ ছিল মার্ক্স্বাদের বিকৃতি। এবারও সাম্যবাদীদল ষ্টালিনকে সমর্থন করে। এই বাদানুবাদের সময়ই সুবিখ্যাত

পঞ্চবার্ষিক সংকল্পের সাহায্যে দেশের মধ্যে নূতন সমাজের প্রথম স্তর গড়ে তুলবার উদ্যোগ হয়েছে।

১৯২৮-এর নবপদ্ধতির দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথম লক্ষ্য, যন্ত্রশিল্পের প্রভূত প্রসার, রাশিয়াকে এখন আমেরিকা বা জার্মানির মতন যন্ত্রপ্রধান দেশের পর্য্যায়ে উন্নীত করেছে। আজকের দিনের সোভিয়েট্ রাষ্ট্রের লোহা, ইস্পাত বা কেমিক্যালের কারখানা, কয়লার খনি কিম্বা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা বিস্ময়ের বস্তু। আরও আশ্চর্য্য এই যে এত বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের অভ্যুত্থান এদেশে জনসাধারণের সম্মিলিত চেষ্টার ফল—এর পিছনে স্বদেশী বা বিদেশী ধনিকের লাভের জন্য অর্থনিয়োগ নেই। দ্বিতীয় লক্ষ্য, কৃষিকার্য্যে রাশিয়ার অনুন্নতির অপবাদ ঘোচানো। সমগ্র দেশ এতদিন লক্ষ লক্ষ কৃষকের খণ্ডসম্পত্তিতে বিভক্ত ছিল। বিপ্লবের পর কৃষকদের জমির উপর অধিকার অটুট ছিল, এমন কি জমিদারদের জমিও তাদের হাতে দেওয়া হ'ল কৃষকদের সহায়তা লাভের জন্য। সামরিক সাম্য-তন্ত্রের যুগে কৃষকদের চেপে রাখার চেষ্টা নেপের আমলে বর্জ্জিত হয়, ফলে অবস্থাপন্ন কৃষক অথবা কুলাক্‌দের গ্রামে সম্পদ ও শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু কুলাক্‌দের নীচে মধ্যবিত্ত কৃষক এবং আরও নীচে গরীব চাষীদের দুরবস্থা ও অসন্তোষ তখনও কমে নি। পঞ্চবার্ষিক সংকল্পে কুলাক্‌শ্রেণীর উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয়। দেশে ষ্টেট্ পরিচালিত কয়েক হাজার আদর্শ ফার্মের সৃষ্টি হ'ল, কিন্তু সব জমির হঠাৎ এভাবে সরকারী চাষ সম্ভব হয় নি। সুতরাং একত্রিক কৃষিকার্য্যের উদ্ভব হ'ল—অর্থাৎ স্থানীয় সব কৃষকদের জমি একত্র করে' চাষের ভার তাদেরই সম্মিলিত সমিতিদের হাতে দেওয়া হয়। একত্রিক চাষের সুবিধা সহজেই বোঝা যায়—সম্মিলিত কৃষিকার্য্যে যন্ত্রের সাহায্যে শ্রমলাঘব চলে, স্বতন্ত্র চাষে যন্ত্রের বহুল ব্যবহার অসম্ভব। সরকারী চাষ ও একত্রিক কৃষিকার্য্য এইভাবে রাশিয়ার গ্রামে যুগান্তর আনল। এই ব্যবস্থা সাম্যবাদের ইতিহাসে ষ্টালিনের এক প্রধান কীর্ত্তি হিসাবে স্থান পাবে। কৃষকেরা স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ও ভূমিসম্বন্ধে লোভী—সোশ্যালিজ্‌মের বাধা হিসাবেই তাদের এতদিন দেখা হয়েছে। ষ্টালিনের নীতি মোটামুটি সফল হ'লেই সে বাধা অপসারণের এক উপায় হবে।

নেপের আমলে রাশিয়ার বাইরে বিশ্বাস ছিল যে সে-দেশে আর্থিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়েছে। বিদেশী ধনিকদের লাভের জন্য টাকা খাটাবার সুযোগ কিন্তু নেপের সময়ও হ'ল না। পঞ্চবার্ষিক সংকল্পের সময়ও যন্ত্রনির্ম্মাণের টাকা আসতে লাগ্‌ল জনসাধারণ ও শ্রমিকদের আয় ও ব্যয়-সঙ্কোচের

মধ্যে। রাশিয়ায় তাই প্রচুর অভাব রইল, কিন্তু অভাবের ফলে শ্রমিক-অসন্তোষ প্রবল হ'য়ে ওঠে নি। তার কারণ অবশ্য সোভিয়েট রাষ্ট্রশ্রমিকদেরই নিজস্ব এই ধারণার অস্তিত্ব। শ্রমিকেরা কষ্টস্বীকারে প্রস্তুত ছিল, যতদিন তাদের অভাবের ভিতর দিয়ে সঞ্চিত অর্থ অল্পসংখ্যক ধনিকের ভোগে না এসে দেশের উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধনে নিয়োজিত থাকবে। অশেষ কষ্টের মধ্যে গোড়াপত্তন এভাবে হবার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক সংকল্প এল। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য, উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি—আর তার মধ্যে নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের প্রাচুর্য্য স্থান পেল। ক্রমে রাশিয়াতে এখন সাধারণ জীবনযাত্রা স্বচ্ছলতর হ'য়ে এসেছে। বিদেশী পর্য্যটকেরা অনেকে সম্প্রতি এই পরিবর্ত্তনকে ধনতন্ত্রের প্রত্যাবর্ত্তন ভেবেছেন কিন্তু আর্থিক উৎপাদন পদ্ধতিতে এর অনুযায়ী পূর্ব্ব ব্যবস্থা ফিরে আসার লক্ষণ দেখা যায় না। পণ্যোৎপাদন প্রসার চেষ্টার মধ্যে ষ্টাকানভ্ আন্দোলনের উল্লেখ করা উচিত। শ্রমিকদের মধ্যে কর্ম্মকুশলতা ও শ্রমশীলতার উৎসাহবিধান এর বৈশিষ্ট্য। সে-উৎসাহ প্রকাশ্য সম্মানের মধ্য দিয়েই বেশী আসে, কিন্তু আর্থিক পুরস্কারও রয়েছে। কিন্তু মাহিনার অসমতা আর ধনতন্ত্র এক কথা নয়। স্বতন্ত্র ধনিকশ্রেণীর অস্তিত্ব, তাদের উদ্বৃত্ত অর্থের লাভের জন্য খাটাবার সুবিধা, পণ্যোৎপাদনে ধনিকদের প্রভুত্ব, আর্থিক মূলধনের জন্য তাদের উপর নির্ভর—এইগুলি সব রুষদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত বিপ্লবের আমলের অবসান হবে না।

নূতন রাশিয়ার বর্ণনা এখানে অসম্ভব। ওয়েব্-দম্পতির বিখ্যাত গ্রন্থে তার অনেক পরিচয় এখন সহজেই পাওয়া যায়। কেবলমাত্র মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখই স্বল্পকলেবর আখ্যানে স্থান পেতে পারে। আর্থিক ব্যবস্থায় দেশব্যাপী প্ল্যানিং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—কিন্তু পৃথিবীর অন্যত্র এর যত অনুকরণ প্রস্তাবিত হয়েছে, তার সঙ্গে এ-উদ্যমের মূলগত পার্থক্য হচ্ছে এই যে এর পিছনে একটা বিশিষ্ট মতবাদের সাধনা রয়েছে, যার সঙ্গে এ-সংকল্পের অঙ্গাঙ্গী যোগ। রাষ্ট্রিক ব্যাপারে প্রথমে শ্রমিকদের প্রতিভূ সাম্যবাদীদলের অধিনায়কত্ব ছিল; বিরোধীদের স্বাধীনতা লোপ হয়েছিল, স্বীকার করতেই হবে। ১৯৩৬-এর নূতন শাসন-পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক উদারনীতি অনেকখানি ফিরে এসেছে। থিওরি এই যে ধনিকশ্রেণীর উচ্ছেদসাধনের পরই এই নীতি প্রথম সার্থক হতে পারে, আর রাশিয়ায় সে-অবস্থা আগতপ্রায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে নিরক্ষরতাদূর রাশিয়ার মত দেশে এক বিপুল কীর্ত্তি। রাষ্ট্রশক্তি তাদের নিজস্ব,

এই বিশ্বাস শ্রমিক ও কৃষকদের মনে বিরাজ করছে। তাদের আর্থিক সুবিধা-বিধান ষ্টেটের এক প্রধান কর্ত্তব্য। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য সাদরে রক্ষিত হচ্ছে—এদের পরস্পরের সদ্ভাব ষ্টালিনের আমলের আর একটি কীর্ত্তি।

কিন্তু বিরোধের অবসান এত সহজে হয় না। ট্রট্স্কির পরাজয়ের পরও তাঁর মতবাদ অসংখ্য লোকের মনে সন্দেহের কারণ হয়ে রইল। ষ্টালিনের মূল বিশ্বাসে ভুল থাকলে দেশও ভুল পথে চল্‌ছে বলতে হবে। আর্থিক উন্নতিকে অভ্যর্থনা করে' ষ্টালিন বলেছিলেন যে রাশিয়ায় এতদিনের পরিশ্রমের পর জীবনে আনন্দ ফিরে আস্‌ছে। ট্রট্স্কির চোখে দেখলে সে-আনন্দ বিপ্লব-অবসানের মুখোষ নয় ত'? ১৯৩৩-এর পর বহির্জগতে পরিবর্ত্তনের ফলে সমস্যা উপস্থিত হ'ল। জার্মানি বা জাপানের হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে ষ্টালিন্ যখন ব্যস্ত, তখন অনেক পূর্ব্বতন নেতা আবার ট্রট্স্কি-পন্থার দিকে গোপনে ঝুঁকলেন। তাঁদের ব্যবহারে পরস্পর-বিরোধী আচরণ থিওরির দুর্ব্বলতা-ই প্রমাণ করে। কেউ কেউ ভাবলেন জার্মানি ও জাপানকে কিছু রাজ্য ছেড়ে দিলে গোল চুক্‌বে। অন্যদের মনে হ'ল এই সুযোগে ফাশিষ্ট্‌দের সাহায্যে ষ্টালিন্‌কে ধ্বংস করা সম্ভব। কারো মতে যুদ্ধ এলে ভালই—তাতে বিপ্লবেরই সুবিধা। অন্যরা বিদেশে গণ্ডগোল সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। দু'টি বৈশিষ্ট্য এঁদের আচরণে ধরা পড়ে—ফাশিষ্ট্-বিপদকে সামান্য জ্ঞানে তুচ্ছ করা এবং ষ্টালিনের পতনের জন্য ষড়যন্ত্র। গুপ্ত অভিসন্ধি প্রকাশ পাওয়াতে রাশিয়ায় এই ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার ও দণ্ডবিধান সম্প্রতি সমস্ত জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

১৯৩৪-এর ডিসেম্বরে কিরভ্ নিহত হ'লেন। ষ্টালিনের প্রাণনাশের চেষ্টা হয়, তাঁর প্রধান সহকর্ম্মীদের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র হয়েছিল। দেশে নানা গণ্ডগোল সৃষ্টির প্রয়াস দেখা গেল। মস্কোর বিচারে দণ্ডিত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ-গুলির অধিকাংশই যে সাজানো নয়, বিচারের সম্পূর্ণ প্রতিলেখন পাঠে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। দণ্ডিত নেতারাও অনেকে প্রায় দশবছর ধরে' সাম্যবাদীদলের আচরণে সন্দেহ পোষণ করে' এসেছেন। তাঁরাই খাঁটি প্রাচীন বল্‌শেভিক্, একথা অমূলক। ষ্টালিনের প্রধান সমর্থক—কাগানোভিচ্, ভোরোশিলভ্, মোলোটভ্, লিট্‌ভিনভ্ প্রভৃতি সকলেই দলের পুরাতন সভ্য। দণ্ডিত নেতারা কেউ কেউ লেনিনের সময়ও ভুলনীতির অনুসরণ করেন—লেনিনের সময় তাঁরা উচ্চপদে

থাকলেও ট্রট্স্কি-ষ্টালিনের দ্বন্দ্বে তাঁরা ষ্টালিনের নেতৃত্বে খানিকটা সন্দিগ্ধ হ'য়ে পড়েন। ষড়যন্ত্রকারীদের তাই সাধারণ ভাবে ট্রট্স্কিপন্থী বল্‌লে অন্যায় হবে না, তাঁদের পরস্পর-বিরোধ সে-পন্থার-ই দৌর্বল্যের পরিচায়ক। মতের কথা ছেড়ে দিলেও অভিযোগগুলি যে সম্ভবতঃ সত্য সে সম্বন্ধে ক্রমশই জনমত প্রবল হচ্ছে।

মস্কোতে সম্প্রতি চারটি বড় বিচার হয়ে গিয়েছে। দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন—জিনোভিয়েভ্ ও কামেনেভ্ (আগষ্ট, ১৯৩৬); রাডেক্, সকল্‌নিকভ্ ও পিয়াটোকভ্ (জানুয়ারী, ১৯৩৭); মার্শাল্ তুকাচেভ্স্কি ও অন্য কয়েকটি সেনাপতি (জুন, ১৯৩৭); বুকারিন্, য়াগোডা ও রাকভ্স্কি (মার্চ্চ, ১৯৩৮)। রাডেক্ ও তুকাচেভ্স্কি ব্যতীত এঁদের প্রভাব বহুদিন আগেই রাশিয়াতে প্রায় ম্লান হয়ে এসেছিল। দেশের মধ্যে ষ্টালিনের সমর্থক যে অজস্র সে-কথা ভোলাও উচিত না। অভিযুক্তেরা বিখ্যাত ও অভিযোগ অপ্রত্যাশিত হ'লেও এক্ষেত্রে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। উৎপীড়ন বা প্রলোভনের সাহায্যে যে বন্দীদের কাছ থেকে দোষস্বীকার আদায় করা হয়েছিল, এর কোন প্রমাণই নেই। দোষ স্বীকার অনিবার্য্য হ'য়ে পড়েছিল প্রমাণের প্রাচুর্য্যে, এ-কথাই বরং বেশী বিশ্বাসযোগ্য।

পঞ্চবার্ষিক সংকল্পের সাফল্য অপ্রত্যাশিত হওয়াতে রব উঠেছিল যে ষ্টেটকর্ত্তৃত্ব ও শ্রমিকদের দাসত্বের জন্যই এ-সংকল্প ব্যর্থ হয় নি। প্রচলিত অর্থনীতি কিন্তু বহুদিন বলে' এসেছে যে রাষ্ট্রশক্তি কখনও আর্থিক কর্ত্তৃত্ব সুচারুভাবে করতে পারে না এবং দাসশ্রমে উৎপাদন কার্য্য ভাল চলে না। জগদ্ব্যাপী আর্থিক সঙ্কট রাশিয়াকে বিশেষ বিচলিত করল না, এটাও বিস্ময়ের কারণ। কিন্তু সোভিয়েট্ ইউনিয়ানের অগ্রগতি অবাধ বা নিরঙ্কুশ হয় নি। এর ভবিষ্যৎ আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন। যুদ্ধে পরাজয় হয়ত রাশিয়ার সকল প্রচেষ্টা একদিন ব্যর্থ করবে আর তখন সাম্যবাদীদের আবার প্রথম থেকে পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হ'তে হবে। ১৯৩৩-এ হিট্‌লারের অভ্যুদয় এই বিপদের সূচনা করল। দুই প্রতিপক্ষ—জার্মানি ও জাপান—রাশিয়ার দুই দিকে অবস্থান করছে। উভয়েই ফাশিষ্ট্ ও সাম্যবাদের ঘোর শত্রু। উভয়েই সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত তাড়নায় প্রসরোন্মুখ। এরা পরিণামে রাশিয়াকে বিধ্বস্ত করবে কি না, সমসাময়িক কালের প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সমস্যা। ট্রট্স্কি হয় এ বিপদ বোঝেন না, নয়ত সোভিয়েটের পতন তাঁর কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু রাশিয়ার আত্মরক্ষা পৃথিবীর শ্রমিক সমাজের কাছে সামান্য কথা হতে পারে না।

লেনিনের আমলেও রাশিয়া আন্তর্জাতিক শান্তিপ্রয়াসী ছিল। তারপর অস্ত্রত্যাগের জল্পনার সময়ও রুষরাষ্ট্রের চেষ্টা ছিল সেই দিকেই। ১৯৩৩-এর নাৎসি-বিপ্লবের পর শান্তি-সংরক্ষণ সোভিয়েট্ বৈদেশিক নীতির মূলকথা হ'ল আত্মরক্ষার খাতিরে। লিট্‌ভিনভ্ ১৯৩৪-এ বৃথাই প্রস্তাব করলেন যে অস্ত্র-ত্যাগের বৈঠককে শান্তিরক্ষক সভারূপে পুনর্গঠিত করে' আক্রান্ত কোন দেশের তৎক্ষণাৎ সাহায্যের জন্য সকলে অঙ্গীকারবদ্ধ হোক। ১৯৩৪-এ রাশিয়া বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দেয়—আর ১৯৩৫-এ ফ্রান্স ও রাশিয়া পরস্পরের সাহায্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হ'ল। এই চুক্তিতে যোগ দেবার প্রস্তাব জার্মানিই অস্বীকার করেছে। ফ্রান্স ও রাশিয়া উভয়েই চেকো-শ্লোভাকিয়াকে রক্ষা করবার কথা দিয়েছে এবং সেইজন্যই হিট্‌লার এ-দেশ অধিকার করতে ইতস্ততঃ করছেন। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ বিকল হয়ে পড়াতে সোভিয়েট্ রাশিয়া স্পেন ও চীনে ফাশিষ্ট্-প্রগতি আটকাবার জন্য সাহায্য পাঠিয়েছে। জগদ্ব্যাপী ফাশিষ্ট্-বিরোধী আন্দোলন গড়ে' তোলাই এখন সাম্যবাদীদের প্রধান লক্ষ্য। ফাশিজ্‌মের অগ্রগতি আটকাতে পারলে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলে তার পতন হবে এই বিশ্বাস সাম্যবাদের মজ্জাগত। পৃথিবীর সকল দেশের সাম্যবাদীদের উপস্থিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হ'ল ১৯৩৫-এ কমিন্‌টার্ণের অধিবেশনে। এই সভায় ডিমিট্রভ্ ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট্ অথবা একত্রীভূত দলসমষ্টির আদর্শ প্রচার করলেন। প্ল্যানিং-এর মতন এ-কথাটিও আজ সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে অথচ এর প্রকৃত স্বরূপ সর্ব্বদা মনে রাখা হয় না। সম্মিলিত গণশক্তি গঠনের একমাত্র আদর্শ ফাশিজ্‌মের প্রতিরোধ; ফাশিষ্ট্ আমলের চাইতে গণতন্ত্রে শ্রমিকদের সুবিধা, এই জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষার চেষ্টা এই কর্ম্মপদ্ধতিতে স্থান পায়। শ্রমিকদের মধ্যে গৃহবিবাদ-বর্জনই সাধারণ শত্রুকে আটকাবার উপায়; তাই সোশ্যাল্ ডেমক্রাট্‌দের সঙ্গে অযথা কলহের অবসান এখন বিধেয়, কিন্তু তাই বলে' সাম্যবাদীদলের পৃথক অস্তিত্বের কোথাও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকৃত হয় নি। সাময়িক কারণে উদার মতবাদীদের সঙ্গেও এখন সহযোগীতা আবশ্যক ও সম্ভব এই বিশ্বাসও ইউনাইটেড্ ফ্রণ্টের উদ্ভাবনার কারণ। ফ্রান্সে ও স্পেনে পপুলার ফ্রণ্ট্ গঠন নূতন পদ্ধতির প্রধান সাফল্যের নিদর্শন।

নারী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বাতন্ত্র্য স্পর্ধায় মত্ত পুরুষেরে করিবারে বশ
যে-আনন্দ রস
রূপ ধরেছিল রমণীতে,
ধরণীর ধমনীতে
তুলেছিল চাঞ্চল্যের দোল,
মদির হিল্লোল,
তাহারি সংকল্পচ্ছবি বিধাতার মনে
আছে তাঁর তপস্যার সংগোপনে।
সেই আদি ধ্যান-মূর্তিটিরে
সন্ধান করিছে ফিরে ফিরে
রূপকার।
পলাতকা লাবণ্য তাহার,
বাঁধিবারে চেয়েছে সে আপন সৃষ্টিতে
প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে।
দুর্বাধ্য প্রস্তরপিণ্ডে দুঃসাধ্য সাধনা
সিংহাসন করেছে রচনা
অধরাকে করিতে আপন
চিরন্তন।
সংসারের ব্যবহারে যত লজ্জা ভয়
সংকোচ সংশয়,—
বচনের ঘের,
ব্যবধান বিধি বিধানের
সকলি করিয়া দূর
ভোগের অতীত মূল সুর
নগ্নতা করেছে শুচি;
দিয়ে তারে ভুবনমোহন শুভ্ররুচি।

পুরুষের অনন্ত বেদন
মর্ত্তের রূপের মাঝে স্বর্গের সুধারে অন্বেষণ,—
তারি চিহ্ন যেখানে-সেখানে,
কাব্যে গানে,
ছবিতে মূর্তিতে,
দেবালয়ে দেবীর স্তুতিতে।
কালে কালে দেশে দেশে শিল্পস্বপ্নে দেখে রূপখানি,
নাহি তাহে প্রত্যহের গ্লানি ;
দুর্বলতা নাহি তাহে, নাহি ক্লান্তি
টানি' লয়ে বিশ্বের সকল কান্তি,
যেন সর্ব পুরুষের নির্বাসিত মন
রূপ আর অরূপের ঘটায় মিলন।
মনে পড়ে যেন কবে ছিল অন্যলোকে
অপূর্ব আলোকে।
তারি ছবি আনে ধ্যানে ধরি'
সেথায় যে ছিল তার চিরসহচরী।

মুদ্রারাক্ষস

বিষ্ণু দে

আমাকে আজ বিদায় দাও ভাই।
চুকেছে কৌটিল্য পাশ ঘেঁষা
মারণাচারে ইষ্টঅন্বেষা।
মেনেছি হার, তুলেছি দেখ হাই।
ঘরের খেয়ে রাজনীতি কি পেশা ?

মার্কস্ না মথি শুনেছি নাকি বলে,
কল্কি যবে বৃহন্নলাবেশে
চালাবে রথ, মাড়াবে দলে দলে,

শুনবি তাতে ইতিহাসেরই হ্রেষা।
তাইতো ভুলে রাজনীতিকে পেশা।

কুহকী আশা, হারাই ভাষা, ছলা
কতই তার, সে চিরচঞ্চলা!
অর্থ যে রে অনর্থেই মেশা!
ধর্না দেওয়া আশ্রিতের পেশা!
রেষারেষিতে ইতিহাসের নেশা।

ছুটল বুঝি, ফুটল ত্রিলোচন।
মন্ত্রী খুঁজে তবু বেড়াস্ মন?
নানামুনির নানাদলের বন
হায়েনা আর শিবার দলে ঠাসা
সেখানে কিবা অমাত্যের পেশা?

যেখানে যাই মৌরসী পাট্টা রে!
নগরপাল হবার চাল নেই।
ধারে তো নয়, আশ্রিতের ভারে
রাজন্যেরা গুপ্তচরে মেশা।
বিদ্যাদানও বংশগত পেশা।

তোমাতে, মাগো, ইষ্ট খুঁজি তাই,
নির্বিকার সোহমে যাবে মেশা।
নির্বিচারে হৃদয়ে ঢালো নেশা
বাহুতে তুমি শক্তি মাগো তাই
ছেড়েছি আজ গণেশ ঘেঁষা পেশা।

একান্নটি প্রণাম করে' যাই,
আমাকে আজ বিদায় দাও ভাই।

ফুটপাথে

জীবনানন্দ দাশ

অনেক রাত হয়েছে—অনেক গভীর রাত হয়েছে ;
কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—
কয়েকটি আদিম সর্পিণী সহোদরার মত এই যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ
অনুভব করে হাঁটছি আমি।
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে,—কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস ;
কোন্ দূর সবুজ ঘাসের দেশ নদী জোনাকীর কথা মনে পড়ে আমার,—
তারা কোথায় ?
তারা কি হারিয়ে গেছে ?
পায়ের তলে লিক্‌লিকে ট্রামের লাইন,—মাথার ওপরে
অসংখ্য জটিল তারের জাল
শাসন করছে আমাকে।
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস ;
এই ঠাণ্ডা বাতাসের মুখে এই কলকাতার শহরে এই গভীর রাতে কোনো
নীল শিরার বাসাকে কাঁপতে দেখবে না তুমি ;
জলপাইয়ের পল্লবে ঘুম ভেঙে গেল বলে কোনো ঘুঘু তার কোমল নীলাভ
ভাঙা ঘুমের আস্বাদ তোমাকে জানাতে আসবে না।
হলুদ পেঁপের পাতাকে একটা আচম্‌কা পাখী বলে ভুল হবে না তোমার,
সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা ব'লে বুঝতে পেরে চোখ নিবিড় হয়ে উঠবে না তোমার !
পেঁচা তার ধূসর পাখা আমলকীর ঠালে ঘষবে না এখানে,
আমলকীর শাখা থেকে নীল শিশির ঝ'রে পড়বে না,
তার সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকীর মত খসিয়ে আনবে না এখানে,
রাত্রিকে নীলাভতম করে তুলবে না !
সবুজ ঘাসের ভিতর অসংখ্য দেয়ালি পোকা ম'রে র'য়েছে দেখতে
পাবে না তুমি এখানে,

পৃথিবীকে মৃত সবুজ সুন্দর কোমল একটি দেয়ালি পোকার
মত মনে হবে না তোমার,
জীবনকে মৃত সবুজ সুন্দর শীতল একটি দেয়ালি পোকার মত মনে হবে না ;
পেঁচার সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকীর মত খসিয়ে আনবে না এখানে,
শিশিরের সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকীর মত খসিয়ে আনবে না,
সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা ব'লে বুঝতে পেরে চোখ নিবিড় হয়ে উঠবে না তোমার।

অনাবশ্যক

হেমচন্দ্র বাগচী

সে কা'রো প্রয়োজনে লাগ্‌ল না,
কাজের উত্তাপ যেখানে, যেখানে সদাচঞ্চলতার আবর্ত্ত,
সেখানে তা'র প্রবেশের অধিকার রইল না—
তা'র ললাটে লেখা রইল, সে অনাবশ্যক !

ভারি একটা মজা হ'ল তারপর,
যে অবাধপ্রসারিত বিধাতার জগৎ প্রাণহিল্লোলে স্পন্দমান
যেখানে পিঁপ্‌ড়েরা সারি বেঁধে যায় বনতলের অন্ধকারে,
যেখানে সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পাখীর একতানধ্বনি
সেই অলখলোকে তা'র মনের চল্‌তে লাগ্‌ল লীলা।

সেখানে ঝিঙেফুল ফুটে থাকে—বৃষ্টিতে ভেজা হল্‌দে ঝিঙে ফুল,
কোনো অজ্ঞাতনামা পতঙ্গের দংশনপীড়ায় পাতাগুলি ক্ষত বিক্ষত
ভিজে মাটির উপরে লাফ দিয়ে আগিয়ে চলে সবুজ গঙ্গাফড়িং
তা'র চোখের ঔজ্জ্বল্যে আছে বিদ্যুতের বেগ, গতিতে নিঃসঙ্কোচ দ্রুততা,
মনের অন্ধকার রহস্যময় মণিকোঠার মত ছায়াচ্ছন্ন বাঁশের বন,
আর সেখানে বর্ষার নদী, মধ্যাহ্নের অগাধ ক্লান্তিতে উদাস,
সেই অলখলোকে তা'র মনের চল্‌তে লাগ্‌ল লীলা।

মনের মাঝখানে কোথাও কি আছে কোনো মহাদেশ
যেখানকার সীমাহীন স্পন্দন এসে লাগে বাইরের জগতে—
তা'র সমস্ত বেদনা কি সেই অলক্ষিত দেশের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত ?
সে কি সেই দুরভিসারী কলস্বাস—
চিরপরিচিত সাধারণ জগতে যা'র তৃপ্তি হ'ল না !
বিধাতা তা'কে দিলেন নির্ব্বাসন তা'র মনের মধ্যে—
একাকীত্বের এই দুঃসহ ভার তা'র কাছে বোঝা হ'য়ে রইল না !

একদিকে তা'র প্রাণহিল্লোলে স্পন্দমান অবাধপ্রসারিত জগৎ—
আর একদিকে সন্ধ্যার প্রচ্ছন্ন অন্ধকারে
দু'টি ঘনপক্ষ্ম আঁখির অতলস্পর্শী মৌনতা
এই তার সারাজীবনের পাথেয়।

বিরোধ

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নিরাপদ এই নীড়ে বাঁধ্‌লাম নিজেকে
জানালায় নীল আকাশ দিলাম টানিয়ে,
মনের ঘোড়াকে ঘরের দেয়াল ডিঙিয়ে
চিনিয়ে দিলাম সীমানাহীনের ঠিকানা।

সুবাসিত তেল কেশারণ্যের গভীরে
স্নান চলে বেশ নিরীহ টবের জলেতে—
শুক্‌নো ডাঙায় নির্ভয়ে দিই মনকে
অতলান্তিক সাগরে সাঁতার কাটতে।

শাদা ডিশ্‌টায় স্বাদু হরিণের মাংস,
মনের হরিণ সোনা হ'লো কার নয়নে ?
নরম চটির গুহায় গোপন পা দুটি
নিয়েছে কখন্ যাযাবরদের সঙ্গ !

পুরু বিছানায় ডেকেছি ফ্যানের হাওয়াকে
নীল আলোটায় নীলিমার নীল স্বপ্ন
হৃদয়ে উধাও বোশেখি ঝড়ের ঝাপ্‌টা,
কালো কুয়াশায় দিগ্বধূ কূল হারালো।

কখনো আবার মেরুযাত্রার কাহিনী
টেনে নেয় মন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে—
এখুনি বিরল বলয়ের ক্ষীণ শব্দে
দুঃসাহসিক স্বপ্নে পড়বে ছেদ কি?

ঈশ্বর, এই শরীর মনের দ্বন্দ্বে
একি নিষ্ঠুর নীরব গ্রহণ ক'রেছো?
যেখানে ভাবনা তোমারে সৃষ্টি ক'রেছে
দৃষ্টি সেখানে দাঁড়ালো প্রতিদ্বন্দ্বী!

ব্যাঙ্

বুদ্ধদেব বসু

বর্ষায় ব্যাঙের ফুর্তি। বৃষ্টি শেষ, আকাশ নির্বাক;
উচ্চকিত ঐক্যতানে শোনা গেলো ব্যাঙেদের ডাক।

আদিম উল্লাসে বাজে উন্মুক্ত কণ্ঠের উচ্চস্বর,
আজ কোনো ভয় নাই—বিচ্ছেদের, ক্ষুধার, মৃত্যুর।

ঘাস হ'লো ঘন মেঘ; স্বচ্ছ জল জ'মে আছে মাঠে
উদ্ধত আনন্দগানে উৎসবের দ্বিপ্রহর কাটে।

স্পর্শময় বর্ষা এলো; কী মসৃণ তরুণ কর্দম!
স্ফীতকণ্ঠ, বীতস্কন্ধ—সংগীতের শরীরী সপ্তম।

আহা কী চিক্কণ কান্তি মেঘস্নিগ্ধ হলুদে-সবুজে!
কাচস্বচ্ছ উর্ধদৃষ্টি চক্ষু যেন ঈশ্বরেরে খোঁজে

ধ্যানমগ্ন ঋষি-সম। বৃষ্টি শেষ, বেলা প'ড়ে আসে,
গম্ভীর বন্দনাগান বেজে ওঠে স্তম্ভিত আকাশে।

উচ্চকিত উচ্চস্বর ক্ষীণ হ'লো ; দিন মরে ধুঁকে ;
অন্ধকার শতচ্ছিদ্র একচ্ছন্দা তন্দ্রা-আনা ডাকে।

মধ্যরাত্রে রুদ্ধদ্বার আমরা আরামে শয্যাশায়ী,
স্তব্ধ পৃথিবীতে শুধু শোনা যায় একাকী উৎসাহী

একটি অক্লান্ত স্বর ; নিগূঢ় মন্ত্রের শেষ শ্লোক
নিঃসঙ্গ ব্যাঙের কণ্ঠে উৎসারিত—ক্রোক, ক্রোক, ক্রোক।

বাংলার কাব্য

হুমায়ুন কবির

বাংলা কবিতার দেশ। একমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বৈচিত্র্যই বাঙালীকে কবি করে নি—তার কাব্যপ্রতিভার মূলে মননরীতির বৈশিষ্ট্যও সমানই পরিস্ফুট। বাংলার আকাশে যাঁরা নিদাঘ রৌদ্রের নিষ্ঠুর দীপ্তি দেখেছেন, আষাঢ়ের ঘনবর্ষার মেঘসম্ভারের মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও মহিমা এবং শ্রাবণের রাত্রিদিনহীন অবিরাম বর্ষণ-ধারার সঙ্গীতে হৃদয়াবেগের প্রতিচ্ছবি পেয়েছেন—তাঁরা জানেন যে বাঙালীর কবিমানসের উৎস কোথায়। শরতের নীলাকাশে কূলে কূলে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে, কাশের শ্বেতহাসিতে নদীকূল ভরে ওঠে, হেমন্তের পরিপূর্ণ প্রশান্তির মধ্যে আকাঙ্ক্ষা ও দ্বন্দ্বের নিরসন মেলে। শীতার্ত্ত কুহেলী রাত্রির অবগুণ্ঠিত, মায়াজালে নিদ্রিত ধরণীর যে জড়িমা, মানুষের আশা ও নিরাশার অঙ্কুর তারই মধ্যে প্রথম প্রকাশিত, বসন্তের বাতাসে নতুন উন্মাদনার সঙ্গে নবীন জীবনের সঞ্চার তারই মধ্যে নিহিত। ছয়টি ঋতুর এ বিচিত্র খেলা, প্রকৃতির চঞ্চল পরিবর্ত্তনশীল সৌন্দর্য্যের সে ঐশ্বর্য্য যে বাঙালীর মনকে কাব্যজগতে আকর্ষণ করেছে, তাতে বিচিত্র কি ?

কেবলমাত্র ঋতুর লীলা বলে নয়—বাংলার নৈসর্গিক সংগঠনের বৈচিত্র্য কম নয়। সমুদ্রমেখলা সোনার বাংলা, মাথায় তার হিমালয়ের কিরীট, আকটিকণ্ঠ-জড়ানো গঙ্গা-পদ্মা-যমুনা-মেঘনার তার মালা। পশ্চিম বাংলার শালবন আর কাঁকরের পথ—দিগন্তে প্রান্তর দৃষ্টিসীমার বাইরে মিলিয়ে আসে। শীর্ণ জলধারার গভীর রেখা কেটে দীর্ঘ সংখ্যাহীন স্রোতস্বিনী। বাতাসে তীব্রতার আভাস, তপ্ত রৌদ্রে কাঠিন্য, দিনের তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট দীপ্তির পর অকস্মাৎ সন্ধ্যার মায়াবী অন্ধকারে সমস্ত মিলিয়ে যায়। রাত্রিদিনের অনন্ত অন্তরাল মনের দিগন্তে নতুন জগতের ইঙ্গিত নিয়ে আসে, তপ্ত রৌদ্রালোকে মূর্চ্ছাহত ধরণী অন্তরকে উদাস করে তোলে। পশ্চিম বাংলার প্রকৃতি তাই বাংলার কবিমানসকে যে রূপ দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে লোকাতীত রহস্যের আভাস, অনির্ব্বচনীয়ের আস্বাদে অন্তর সেখানে উন্মুখ ও প্রত্যাশী, জীবনের প্রতিদিনের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টাকে অতিক্রম করে প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণ।

পূর্ব্ব বাংলার নিসর্গ হৃদয়কে ভাবুক করেছে বটে কিন্তু উদাসী করে নি। দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের অভাব সেখানেও নেই, কিন্তু সে প্রান্তরে রয়েছে অহোরাত্রি জীবনের চঞ্চল লীলা। পদ্মা-যমুনা-মেঘনার অবিরাম স্রোতধারায় নতুন জগতের সৃষ্টি ও পুরাতনের ধ্বংস, প্রকৃতির বিপুল শক্তি নিয়তই উদ্যত হয়ে রয়েছে, কখন আঘাত করবে তার ঠিকানা নেই। কূলে কূলে জল ভরে উঠে, সোনার ধানে পৃথিবী ঐশ্বর্য্যময়ী আর সেই জীবন এবং মরণের অনন্ত দোলার মধ্যে সংগ্রামশীল মানুষ। প্রকৃতির সে ঔদার্য্য, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের সেই সংহত শক্তি ভোলার অবসর কই? চরের মানুষ জলের সাথে লড়াই করে, জলের ঐশ্বর্য্যকে লুটে জীবনের উপাদান আনে। তাই লোকাতীতের মহত্ত্ব হৃদয়কে সেখানেও স্পর্শ করে, কিন্তু মনের দিগন্তকে প্রসারিত করেই তার পরিসমাপ্তি, প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণের সেখানে অবকাশ কই?

বাংলার কাব্যের যে দুইটী ধারা, মননরীতি ও প্রকাশভঙ্গির যে দুইটী রূপ, বাংলার নিসর্গগঠনের বৈচিত্র্যের মধ্যে তার খানিকটা পরিচয় মেলে। কিন্তু কেবলমাত্র নিসর্গগঠন দিয়েই সে বৈচিত্র্যকে পরিপূর্ণভাবে বোঝা যায় না। বাঙালীর জাতিগত ইতিহাসের মধ্যেও তার অঙ্কুরের সন্ধান রয়েছে, সে কথা ভুললে চলবে না। ঐতিহাসিক গবেষণার সময় নেই, এবং সে গবেষণার যোগ্যতাও আমার নেই। কিন্তু একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না যে ভারতবর্ষের কোন দেশেই বাংলার মতন রক্তের মিশ্রণ হয় নি। বাংলার আদিম অধিবাসী হয়তো নিগ্রয়েড্, কিন্তু অতি পুরাতন কাল থেকেই তার মধ্যে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় রক্ত মিশেছে। মঙ্গোলীয় মনোবৃত্তির যে অহিংস্রতা সকলেই লক্ষ্য করেছেন, বাঙালীর স্বভাবে তারও পরিচয় মেলে, কিন্তু তারই সঙ্গে মিশেছে অবিকশিত মনোবৃত্তির আকস্মিক উত্তেজনা। দ্রাবিড় রক্ত বাংলার কাব্য, সাহিত্য ও সভ্যতায় কি দান এনেছে, সে কথা বলা কঠিন; হয়তো গোষ্ঠিপ্রীতি দ্রাবিড় এবং মঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণেরই ফল। তারপর এসেছে আর্য্য, কিন্তু বারে বারে আর্য্য আক্রমণ ও বিজয় সত্ত্বেও আর্য্যরক্তের অংশ বাঙালীর মধ্যে অল্প। নিসর্গপ্রীতি আর্য্যমানসের অঙ্গ, সংগ্রামশীলতা এবং আত্মপ্রত্যয় তার স্বভাব। বাংলার কাব্যলোকে যে নিসর্গপ্রীতি, প্রকৃতির প্রকাশের মধ্যে লোকাতীতের যে সন্ধান, তাকে আর্য্যরক্তের দান মনে করলে বোধ হয় অন্যায় হবেনা। ইতিহাসের আরম্ভ থেকে মোগল রাজত্বের প্রায় অবসান পর্য্যন্ত বারে বারে যে আর্য্য আক্রমণ, বাংলার কাব্যসৃষ্টিতে তার প্রভাব কম নয়। নানান দিক

থেকে বাংলার মানসকে সংসারমুখী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে বাংলা কাব্যসাহিত্যের অপরূপ বিকাশে তা সহায়তা করেছে।

ধর্ম্মের বিপ্লবের মধ্যেও বাংলার কাব্যরূপ নতুন নতুন উপাদান পেয়েছে। বৌদ্ধবিপ্লব বাংলা দেশে যে ভাবে জাতির মজ্জাগত হয়ে উঠেছিল, আর কোথাও বোধ হয় তার নিদর্শন মেলেনা। পূর্ব্ব বাংলায় সে মনোবৃত্তি কেন বেশী ছড়িয়েছিল, তাও সহজেই বোঝা যায়। প্রকৃতির শক্তির উদ্যত আঘাতের সম্মুখে সংগ্রামশীল মন, নদীপ্রবাহের ভাঙ্গাগড়ায় গৃহসৃষ্টির ব্যর্থতাবোধ এবং মঙ্গোলীয় রক্তের অহিংস্রতা মিলে পূর্ব্ব বাংলাকে বৌদ্ধমানসের উপযোগী ক্ষেত্র করে রেখেছিল। পশ্চিম বাংলায় স্থিরতা বেশী, রাজশক্তির প্রভাবও সেখানে অধিকতর কার্য্যকরী, তাই বৌদ্ধযুগের অবসানে যেদিন হিন্দু অভ্যুত্থানে বৌদ্ধমানসকে ধ্বংস করবার চেষ্টা প্রবল হয়ে উঠে, প্রাক্তন মজ্জাগত জাতিবিচারের পূর্ব্বস্মৃতির মধ্যে পশ্চিম বাংলায় তা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ভঙ্গুর, বিপ্লবী, পরিবর্ত্তনশীল পূর্ব্ব বাংলায় জাতিসৃষ্টির প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারে নি। তাই হিন্দু অভ্যুত্থানের বিজয়ের দিনে, কৌলীন্য ও জাতিবিচারের প্রাবল্যের মধ্যেও পূর্ব্ব বাংলায় বৌদ্ধ মনোবৃত্তির অহিংস্রতা ও সাম্য প্রচ্ছন্ন হয়ে বেঁচে ছিল; মোস্‌লেম বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আত্মপ্রকাশ করে পূর্ব্ব বাংলার ধর্ম্মীয় রূপ বদলে দেয়।

বাংলার বৌদ্ধবিপ্লব উত্তর ভারতীয় আর্য্যসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছিল, সেই বিদ্রোহের মধ্যে পেয়েছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেরণা। তার ফলে সংস্কৃতের হ'ল পরাজয়, প্রাকৃত ও দেশভাষার দিকে পড়ল ঝোঁক। ভারতের বিভিন্ন ভাষার সূত্রপাত তারই মধ্যে, বাংলা ভাষারও গোড়াপত্তন সেইখানে। হিন্দু অভ্যুত্থানের প্রাবল্যের যুগে কালপ্রবাহকে ফেরাবার চেষ্টা হয়েছিল, সংস্কৃতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে বাংলার মানসকে সংস্কৃতের মধ্য দিয়ে প্রকাশের চেষ্টাও প্রবলতর হ'ল, কিন্তু বিপ্লবী পূর্ব্ববাংলায় বৌদ্ধমানস জনসাধারণের অবচেতনার মধ্যে মজ্জাগত, সেই প্রচ্ছন্ন চিত্তসংগঠন বদলাতে হলে যতখানি সময়, যতখানি সুবিধা এবং সুযোগের প্রয়োজন, বাংলার হিন্দু অভ্যুত্থান তা পায় নি। তাই মোস্‌লেম বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার সংস্কৃতভাষাকে প্রতিষ্ঠার সে চেষ্টা পরাজিত হ'ল। বাঙালীর চিত্তও মুক্তি পেল। তাই বাংলার কাব্যসৃষ্টির প্রথম প্রকাশ বৌদ্ধ দোঁহায়, তারই মধ্যে উত্তরভারতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বাঙালীর বিদ্রোহ আপনাকে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করল।

সে যুগের বাংলা কাব্যের প্রেরণা ধর্ম্মের মধ্যে। পশ্চিম বাংলার নিসর্গের স্থিরতা এবং দিগন্তপ্রসারী প্রান্তরের ইঙ্গিতের কথা আগেই বলেছি। সংসারকে অতিক্রম করে লোকাতীতের দিকে হৃদয় আকর্ষণ করা তার স্বভাব। বাংলার প্রথম কাব্যপ্রচেষ্টা তাই লোকাতীতের জন্য মানুষের যে সাধনা, তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে। বাংলার মাটীতে বৈষ্ণব কবিতার সে আবির্ভাব বিস্ময়কর। কিন্তু তাকে আকস্মিক মনে করা চলে না। বৌদ্ধবিপ্লব বৌদ্ধ দোঁহা ও গানের মধ্যে বাংলার মানসকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছে, তা আমরা দেখেছি, সে চেষ্টা পূর্ব্ব বাংলার মতন পশ্চিম বাংলায় অতখানি সার্থক না হলেও তার প্রভাব জাতির অবচেতনার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। ইসলামের সাম্যবাদ যখন এসে বাঙালীর মনকে আহ্বান করল, প্রথম মোস্‌লেম রাজ্য গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তখন অবনমিত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমনোবৃত্তি আবার আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়ে জেগে উঠ্‌ল। পশ্চিম বাংলায় সে বৌদ্ধবিপ্লবের শক্তি অপেক্ষাকৃত কম ছিল বলে হিন্দুসমাজের সংগঠন তাতে ভাঙ্গল না, অথচ হিন্দু সমাজমানস তাতে সাড়া না দিয়েও থাকতে পারল না। ইসলামের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার আহ্বান এবং পশ্চিম বাংলার নিসর্গসংগঠনের মধ্যে ব্যক্তির দিগন্তকে অতিক্রম করে অনন্তের মধ্যে আত্মবিস্মরণ—এই দুই বিরুদ্ধ ভাবপ্লাবনের যে সংঘর্ষ, তারই ফলে বাঙালীর মন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠ্‌ল। পশ্চিম বাংলায় সেদিন বৈষ্ণব কবিতার যে বিকাশ দেখা দিল, পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে তার স্থান বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে লোকাতীতের মিলন। সীমার মধ্যে অসীমের সন্ধানের আকুতিতে তাই বৈষ্ণব কবিতা প্রাণবন্ত; যে ঐশ্বর্য্য বাঙালীর মানসে সেদিন জমে উঠেছিল, তারই অভিব্যক্তির পরাকাষ্ঠা চণ্ডীদাস। সে যুগের বৈষ্ণব কবিতার বিস্তারিত আলোচনার স্থান আজ এখানে নেই, কেবলমাত্র বৈষ্ণব কাব্যবিকাশের ঐশ্বর্য্যের কারণ নির্দ্দেশ করেই আমার কাজ শেষ। তারই মধ্যে মিলনে বিরহে রাগ-অভিমানে বাঙালীর চিত্ত সুখদুঃখ-উদ্বেল হয়ে উঠেছিল; জাতির সমাজস্মৃতির মধ্যে আজও তার পরিচয় প্রতিপদে সুস্পষ্ট।

ধর্ম্মের প্রভাব বাঙালীর কাব্যে চিরদিন প্রবল, বৈষ্ণব কাব্যে রয়েছে তার গীতিমুখর ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রকাশ। সে প্রকাশ প্রতি পদে ব্যক্তিকে অতিক্রম করে গেলেও তাই সাধারণ মানুষ তার বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজের হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি দেখে, আপনার দুঃখসুখের বিচিত্র লীলার সন্ধান পায়। ধর্ম্মের সামাজিক প্রকাশ রূপ নিয়েছিল রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদের মধ্যে। ইংরাজি সাহিত্যের যাঁরা ছাত্র, তাঁরা জানেন যে কি ভাবে ইংরেজের মানস বাইবেলকে

কেন্দ্র করে ইংরেজের গদ্য সাহিত্য, ইংরেজের রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সৃষ্টি করে তুলেছিল। বারে বারে তাই বাইবেলের অনুবাদ হয়েছে, বারে বারে চেষ্টা হয়েছে যে তার শিক্ষা, তার সংস্কৃতি, তার সম্পদ ইংরেজের মানসসংগঠনের অঙ্গীভূত হয়ে যাক। মোস্‌লেম রাজত্বের প্রারম্ভে বাংলা দেশেও হয়েছিল তাই। একদিকে পাঠান সুলতান বাংলাকেই স্বদেশ করে তার চিত্ত জয় করতে উন্মুখ, অন্যদিকে সেদিনকার হিন্দু চিন্তানায়ক ইসলামের বিপুল সংহতিশক্তির আঘাতের সম্মুখে হিন্দুসমাজকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য ব্যস্ত। তাই মুসলমান রাজা সেদিন চেয়েছেন যে বাংলার হিন্দুর মনোজগতের পরিচয় চাই, অন্যদিকে হিন্দুনায়কের চেষ্টা যে জনসাধারণ যেন আত্মবিস্মৃতির দরুণ যখন তখন আত্মপরিচয়ের অভাবে ইস্‌লামের বিজয়প্লাবনে ভেসে না যায়। এই যুগ্মদাবী মেটাবার জন্যই তাই সেদিন বাংলা মহাভারত-রামায়ণের সৃষ্টি। মোস্‌লেম রাজসভায় তার সুরু, কিন্তু বাংলার বিপুল হিন্দু-সমাজের মধ্যে তার পরিব্যাপ্তি। তাই সেদিন কাশীরাম দাস এবং কৃত্তিবাস ওঝা কেবলমাত্র রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদই করেন নি, বাঙালীমানসের মধ্যে তাদের প্রতিষ্ঠা করে মহাভারতের ও রামায়ণের বাংলা রূপ সৃষ্টি করেছেন।

ধর্ম্মের ব্যক্তিগত ও সামাজিক রূপ তাই বাংলা কাব্যের প্রেরণা যুগিয়েছে, কিন্তু মোস্‌লেম বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন দিগন্তও খুলে গেল। মানুষের সাংসারিক দিকের পরিচয় যে বৈষ্ণব কবিতা বা রামায়ণ মহাভারতে নেই, তা নয়, কিন্তু এ সাংসারিক দিক সেখানে গৌণ। সে কাব্যসৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য অনন্তের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে আত্মপ্রতিষ্ঠা, অথবা সামাজিক ধর্ম্মভাবকে সংহত রূপ দান। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সেখানে অবান্তর হলেও গৌণ, গল্পসৃষ্টি ও গল্প উপভোগের প্রেরণা তার মধ্যে নেই। পাঠান সুলতানের কাছে কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের সামাজিক ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার চেয়ে গল্প হিসাবেই মূল্য বেশী, সমাজমানসকে বোঝবার জন্যই তাদের প্রয়োজন। পারশ্য এবং আরব্য সাহিত্যের গল্পসৃষ্টির সঙ্গেও তাঁদের পরিচয় সজীব ও সজাগ, তাই মোস্‌লেম রাজত্বের সময়েই বাংলা কাব্যে সামাজিক ও সহজ সাংসারিক রূপের প্রথম প্রকাশ। বৌদ্ধ দোঁহার মধ্যেও গল্প আছে, কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের মতই সেখানেও গল্পাংশ গৌণ। তাই মোস্‌লেম রাজসভায়ই মানুষকে সাংসারিক রূপ দিয়ে কাব্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা সুরু হ'ল, এবং পূর্ব্ব বাংলায়ই তার প্রথম পরিচয় মেলে।

পূর্ব্ব বাংলায় যে কেন এ ভাবে সাংসারিক অনাধ্যাত্মিক কাব্য আত্মপ্রকাশ করল, তার ইঙ্গিত আমাদের আলোচনার মধ্যেই রয়েছে। পশ্চিম বাংলার নিসর্গের মধ্যে যে লোকাতীতের সদাজাগ্রত ইঙ্গিত, পূর্ব্ব বাংলার প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য ও মহিমা সত্ত্বেও সেখানে তা প্রবল হয়ে উঠতে পারে নি। কারণ নিসর্গের সঙ্গে সংগ্রামশীল মানুষ মুহূর্ত্তের জন্যও নিজের কাজ ভুলে থাকতে পারেনি। বৌদ্ধবিপ্লবে যে সাম্যবাদ পূর্ব্ব বাংলার মজ্জাগত, মোস্‌লেম বিজয়ে তা আরও আত্মবিকাশ ক'রল, এবং সেই সঙ্গে জেগে উঠ্‌ল নতুন আত্মপ্রত্যয়, নতুন ব্যক্তিত্ববোধ এবং স্বাধিকারের জ্ঞান। আরাকানের রাজসভায়ই তাই বাংলার সামাজিক কবিতার পত্তন এবং পরবর্ত্তী যুগে মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের গীতিকার মধ্য দিয়ে কেমন ভাবে তা সমস্ত সমাজসত্ত্বাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, সে সম্বন্ধে আরো আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে। সেই সঙ্গে আরো দেখতে হবে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কাব্যসৃষ্টির যখন মন্দা পড়ে এসেছে, সেই মুহূর্ত্তে কি ভাবে পশ্চিমের সংস্পর্শে বাংলা কাব্যের নবযুগের সূচনা। তার আলোচনা আজ থাক্।

অল-ইণ্ডিয়া রেডিয়োর সৌজন্যে।

রাজনীতি, সংস্কৃতি ও শান্তি

বুদ্ধদেব বসু

অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে কবি কি শিল্পীর পক্ষে রাজনীতির চর্চা অবৈধ। পেশাদার রাজনৈতিকের প্রতি সাহিত্যিকের অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা জগতে সাহিত্যের সূত্রপাত থেকেই পাওয়া যায়। রাজনীতির সঙ্গে কূটবুদ্ধি, গুপ্ত ষড়যন্ত্র, বিবেকহীন আত্মবৃদ্ধি ও পরের সর্বনাশ, এ-সব জিনিসই জড়িত হ'য়ে এসেছে, এবং সেটা অন্যায়ও নয়। শিল্পীর মন যে এতে বিদ্রোহ করবে, সেটাও স্বাভাবিক। সুতরাং, ও-সব ব্যাপার নিকৃষ্টশ্রেণীর হীনবুদ্ধি লোকদের জন্য, এই বিশ্বাসে নির্ভর ক'রে শিল্পীরা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই স্বতন্ত্র জগতে বাস ক'রে এসেছেন। রাজনীতির প্রতি শিল্পী-মনের অবজ্ঞামিশ্রিত ঘৃণা আনাতোল ফ্রাঁস অতি সুন্দর প্রকাশ করেছিলেন, যখন তিনি তাঁর এক চরিত্রকে দিয়ে বলিয়েছিলেন, 'I am not so devoid of talent, madam, as to take any interest in politics.'

অবশ্য এরও ব্যতিক্রম দেখা যায়। সমসাময়িক সমাজের তীব্র সমালোচনা ও নতুন মানবসমাজের পরিকল্পনা, উভয়ই সাহিত্যিকের প্রদেশভুক্ত। ল্যাংল্যাণ্ড, টমাস মোর, সুইফ্‌ট্‌, শেলি, উইলিয়ম মরিস (কয়েকজনের মাত্র নাম করলুম)—ইংরিজি সাহিত্যে এঁদের কোনো-কোনো সৃষ্টি প্রত্যক্ষভাবেই রাজনৈতিক। সুইফ্‌ট্‌ রাজনৈতিক কর্মীও ছিলেন। কিন্তু রাজনীতি সম্বন্ধে যাঁরা একেবারেই উদাসীন, সংখ্যা হিসেবে ধরলে তাঁরাই অনেক বেশি। অবশ্য যে-কোনো লেখকই সমাজ-জীবনকে বিশ্লেষণ ও পরোক্ষে শোধন করেছেন, কিন্তু সে-কথা আলাদা। এখানে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সচেতনতার কথা হচ্ছে।

এটাই আমরা দেখতে পাই যে বেশির ভাগ শিল্পী 'জনতার কোলাহলে'র বাইরে স্বতন্ত্র জগতে আত্মআশ্রয়ী। অন্তত খুব সম্প্রতি ইয়োরোপের সমস্ত লেখক যে রকম প্রকাশ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে নেমেছেন, এমন বোধ হয় পৃথিবীতে আগে কখনো দেখা যায়নি। তার কারণ কী? কেন তাঁরা সেই 'স্বতন্ত্র জগত' থেকে

The Mind in Chains (Frederick Muller Ltd., 5/-).
In Letters of Red (Michael Joseph Ltd., 6/-).
An Encyclopædia of Pacifism—Aldous Huxley (Chatto & Windus, 6d.).

বেরিয়ে এসে রাজপথের ভিড়ে ভিড়লেন ? তার উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা ছাড়া কিছু নয়। কেননা শিল্পীর স্বাধীনতা ও 'স্বতন্ত্র জীবন' আজকের জগতে ঘোরতর বিপদগ্রস্ত। তার সর্বনাশ হয়-হয়। রাজনৈতিক প্রচার-কার্যে না নামলে—ও জয়ী না-হ'লে—তাঁদের অস্তিত্বই বহুযুগের মতো সমূলে উৎপাটিত হ'তে পারে, ইয়োরোপের লেখকরা আজ এটা নিষ্ঠুরভাবেই উপলব্ধি করেছেন। যাতে তাঁরা বেঁচে থাকতে পারেন, এবং সাহিত্যসৃষ্টির অক্ষুণ্ণ অবসর ও স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেন, তারই জন্যে তাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা। এবং এ-চেষ্টা শুধু তাঁরা লেখা ও বক্তৃতার দ্বারাই করছেন না ; তরুণ ইংরেজ লেখকদের মধ্যে অনেকেই স্পেনে স্বেচ্ছা-সৈন্য হ'য়ে গিয়েছিলেন, এবং তাঁদের মধ্যে দু'জন নিহত হয়েছেন তা আমরা জানি।

লেখা ও বক্তৃতা—অর্থাৎ প্রোপাগাণ্ডার মূল্যও কম নয়। নিগ্রো অভিনেতা পল রোবসন স্পষ্টই ব'লে দিয়েছেন যে আজকের দিনের শিল্পীকে শুধু শিল্পচর্চা নিয়েই থাকলে চলবে না, জগতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনায় নিজেকে দিতে হবে, নয় তো সমস্ত শিল্প ও সাহিত্যের বিনাশ ধ্রুব। বর্তমান জর্মানি ও ইটালির দিকে তাকালে এ-কথা মোটেই অযৌক্তিক মনে হয় না। ফাশিষ্ট শক্তি আজ জগতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিশ্রুত শত্রু। মানবজাতিকে আবার বর্বরিত ক'রে তোলাই তার উদ্দেশ্য। আইনষ্টাইন ও ফ্রয়েড থেকে আরম্ভ ক'রে জর্মানির প্রত্যেক মনীষী, প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও শিল্পী আজ বিতাড়িত কি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী। এক নাৎসি 'পণ্ডিত' আবিষ্কার করেছেন যে যীশুখৃষ্ট 'আরিয়ান' ছিলেন, এবং তাঁর জন্ম ফ্র্যাঙ্কফোর্টের কাছে। নাৎসি পাণ্ডিত্য আরো আবিষ্কার করেছে যে আমেরিকা কলম্বসের আবিষ্কার নয়, পেনিং নামীয় এক নর্ডিক মহাপুরুষের। ঐ একই মতে পীতত্বক জাপানিরা আর্যসন্তান। হিটলারের দক্ষিণহস্ত জেনারেল গোয়েরিং স্পষ্টই ব'লে দিয়েছেন, 'Whenever I hear the word culture, I feel for my revolver.' জর্মান ফাশিষ্টদের, আর যা-ই হোক্, স্পষ্টবাদিতা আছে।

সুতরাং, সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁরা আস্থাবান, সংস্কৃতির রক্ষণ ও বিকাশ যাঁরা প্রয়োজন মনে করেন, ফাশিষ্ট বর্বরতাকে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট না হ'য়ে তাঁদের আজ উপায় নেই। ইয়োরোপের অনেক লেখক ও মনীষী আজ তাই বাধ্য হ'য়েই বামপন্থী। তাঁরা অনেকেই রাজনৈতিক আবর্ত থেকে দূরে থাকতে পারলেই হয়তো খুসি হতেন, কিন্তু নিরপেক্ষ থাকলে একদিন বেয়নেটের খোঁচায় সাহিত্যিকজীবনের

অবসান হ'তে পারে, এ-কথা স্বীকার করবার সাহস তাঁদের আছে। 'এইজন্য,' তাঁরা বলেন, 'আমরা আজ সংস্কৃতিরক্ষার যুদ্ধে অবতীর্ণ, তাতে আমাদের বিনাশ যদিই বা হয়, জগতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বাঁচবে।'

এ-কথার যাথর্থ্য অস্বীকার করা যায় না। এটা ক্রমশই অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে যে সভ্যজগতের বাসিন্দারা আজ দু'দলে বিভক্ত: ফাশিষ্ট ও সাম্যবাদী। মাঝামাঝি কোনো রাস্তা নেই। আপনি যদি বুদ্ধিমান ব্যক্তি হন, ও স্বেচ্ছা-অন্ধ না হন তাহ'লে আপনার স্বার্থ ও শিক্ষা অনুসারে দুদিকের একদিকে আপনাকে ঝুঁকতেই হবে। যাঁরা বলেন, কোনোদিকেই তাঁদের ঝোঁক নেই, মনে-মনে তাঁরা ফাশিষ্ট। এর চমৎকার উদাহরণ বর্তমান ইংলণ্ডের শাসক-সম্প্রদায়। 'শক্তির ভারসাম্য' রক্ষার যে-প্রহসন ইংলণ্ড (অর্থাৎ, ইংলণ্ডের শাসকশ্রেণী) কিছুকাল ধ'রে জগতকে দেখিয়ে আসছে, তাতে একদিকে তার শক্তিহীনতা ও অন্যদিকে তার ফাশিষ্ট ঝোঁকই বেরিয়ে পড়ছে। ইংলণ্ডের বিখ্যাত উদারপন্থা আজ নপুংসকতারই ছদ্মনাম।

সুখের বিষয়, ইংলণ্ডের শাসক-সম্প্রদায়ই ইংলণ্ড নয়। আজকের এই ধনতন্ত্র-সাম্যবাদের দ্বন্দ্বে ইংলণ্ডের দায়িত্ব বৃহৎ সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই; ইংলণ্ডের উপরেই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভরশীল। সুতরাং সে-দেশের মনীষীরা—বিশেষ যাঁদের বয়েস অল্প—তাঁদের বামপন্থিতা পৃথিবীরই ভরসাস্থল। 'The Mind in Chains' বইটির লেখকরা সকলেই সাম্যবাদী। সম্পাদক স্বনামধন্য আধুনিক কবি ডে লুইস। বইটিকে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আধুনিক সংস্কৃতিক জীবনের বিচার বলা যায়। শিক্ষা, সাহিত্য, নীতি, বিজ্ঞান, রেডিও, সিনেমা, নাটক, চিত্রশিল্প ও মনস্তত্ত্ব—প্রত্যেকটি বিষয়েই বিভিন্ন লেখক একটি ক'রে প্রবন্ধ লিখেছেন। সম্পাদক ও লেখকদের বিশ্বাস যে ক্ষীয়মাণ ধনতন্ত্রের অধীনে মানুষের মন শৃঙ্খলিত; সে-শৃঙ্খল সোভিয়েট ইউনিয়নে ভেঙেছে, সমস্ত পৃথিবীতেই ভাঙা দরকার, নয় তো সংস্কৃতির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই যে লক্ষ লক্ষ কর্মী, যারা 'have nothing to lose but their chains and have a world to win,' তাদের সঙ্গে শক্তিযোগ করা ছাড়া কোনোই উপায় নেই। তাঁরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে এ-পর্যন্ত মানুষের মনীষার কোনো সৃষ্টিরই স্বাধীনতা ছিলো না; ইয়োরোপের মধ্যযুগে ধর্মযাজক, ও ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়ের পর থেকে বণিক-শাসক মানুষের শিক্ষা শিল্প সাহিত্যের উপর নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য স্বেচ্ছাচারী শাসন চালিয়েছে, স্বীয় স্বার্থহানির সুদূর সম্ভাবনা দেখলেও শিল্পী কি বৈজ্ঞানিককে নির্যাতন

করতে ত্রুটি করেনি। এর কতগুলো খুব মোটা প্রমাণ অবশ্য আমাদের সকলেরই চোখের সামনে আছে। কোপরনিকস ও গ্যালিলিওর কথা ভাবুন। মধ্যযুগের রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতদের শিল্পকলার মস্ত বড়ো মুরুব্বি ব'লে আমাদের ভাবতে শেখানো হয়েছে; কিন্তু, সত্যি কথা কি এটাই নয় যে মাইকেলেঞ্জেলো বাধ্য হ'য়েই ধর্মবিষয়ক মূর্তি গড়েছিলেন, রাফায়েল ম্যাডোনাকে আঁকবার অছিলায় তাঁর অবৈধ শয্যাংশিনীকেই এঁকেছিলেন? বিষয়বস্তু নির্বাচনের স্বাধীনতা ধর্মরাজ কি বণিকরাজ কখনো দিতে পারে না, এবং শাসকসম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী যে-কোনো শিল্প কি শিক্ষাকে লৌহহস্তে নিষ্পেষণ নিছক আত্মরক্ষার জন্যেই তাঁদের করতে হয়। এ-অত্যাচার ধর্মরাজে প্রত্যক্ষ ছিল, বণিকরাজে পরোক্ষ হয়েছে। আপনি যদি এমন কোনো বই লেখেন বা ছবি আঁকেন যার মর্ম শাসকসম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী তবে আজকের দিনে আপনাকে (ইংলণ্ড কি ফ্রান্সের মতো গণতান্ত্রিক দেশে) জেলে পাঠানো হবে না, কি বিষ খাওয়ানো হবে না; কিন্তু আপনার বই কি ছবি মোটেও বিক্রি হবে না। কেন হবে না? শিক্ষা ও প্রোপাগাণ্ডার সমস্ত উপায় শাসকশ্রেণীর করতলগত, তাঁরা জনগণকে বাল্যকাল থেকে এমনভাবে 'তৈরি' করেন যাতে সেইজাতের শিল্পই 'জনপ্রিয়' হ'তে পারে যাতে সমসাময়িক সামাজিক সত্য কিছুমাত্র প্রতিফলিত হয়নি। অর্থাৎ যে-শিল্প মিথ্যা কথা বলে, খোসামোদ করে, দিবাস্বপ্নের অলীক পরিপূর্ণতা আনে, সেই শিল্পই সাধারণ লোক গ্রহণ করে। তার আর একটা খুব বড়ো কারণ আছে। ধনতান্ত্রিক দেশে বেশির ভাগ লোকই অতি কষ্টে নিতান্ত হীন জীবন যাপন করে, ইচ্ছাপূরণ-শিল্পেরই তাই সব চেয়ে বেশি চাহিদা। যে-শিল্প সমসামায়িক সমাজজীবনের সত্য উদ্ঘাটন করে তা সাধারণের চোখে অপ্রিয় ও কুৎসিত ঠেকে, এবং শিল্পীরও তাই দুর্দশার সীমা থাকে না। নির্যাতিত অপমানিত এমনকি নিরন্ন লেখক ও শিল্পীর কথা সব দেশে সব সময়েই আমরা শুনতে পাই; তাঁদের ট্র্যাজিডির মূল কথাটা এই। কবির দারিদ্র্য প্রবাদবাক্যে দাঁড়িয়ে গেছে এই কারণেই।

'The Mind in Chains'-এর লেখকদের বিশ্বাস যে শিল্পীর আত্ম-প্রকাশের অক্ষুণ্ণ ও অপরিমিত অধিকার সাম্যবাদী সমাজেই সম্ভব। যতদিন সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকটি ব্যক্তি প্রভুস্থানীয় ও অন্য সমস্ত লোক জ্ঞানে কি অজ্ঞানে তাঁদের দাস, ততদিন সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র শিল্পের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে অনুধাবন করলে এ-কথাই মনে হয় যে ফিউডল সমাজে প্রত্যক্ষভাবে ও ক্যাপিটালিষ্ট সমাজে পরোক্ষভাবে সমস্ত শিল্পকলা শিক্ষা ও সংস্কৃতি

কয়েকটি কর্তাব্যক্তির স্বার্থ-শাসিত ; এবং পৃথিবীতে এ-পর্যন্ত জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পের যেটুকু উন্নতি হয়েছে তা হয়েছে কর্তাদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, এবং এই শাসন থেকে মুক্ত হ'তে পারলে তবেই মানবসমাজে সংস্কৃতির বিপুল সম্ভাবনা পূর্ণ হবে। এ-দিক থেকে বার্বারা নিক্সনের নাটক সম্বন্ধে লেখাটি উল্লেখযোগ্য ; খুব অল্প কথায়, এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, ইংরিজি নাটকের এই ইতিহাস কয়েকটি গভীর সত্য সম্বন্ধে আমাদের চোখ খুলে দেয়।

এই বই আসল যে-সত্যটি আমাদের বলে, সে-বিষয়ে এ-দেশে আমরা বেশির ভাগ লোকই জন্মান্ধ, কি স্বেচ্ছান্ধ। সে-সত্যটি শুধু এই যে শিল্পকলা জ্ঞান-বিজ্ঞান যা-ই বলুন, সব জিনিসেরই ভিত্তি মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে, সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়। আপনি কি বলবেন যে কথাটি এত বেশি সত্য যে তা না বললেও চলে ? কিন্তু আমরা ভারতীয়রা এই অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধে সচেতন একেবারেই নই। আমরা মনে করি যে শিল্পকলা ইত্যাদি মানুষের 'আধ্যাত্মিক' জীবনের অংশ ; ক্ষুধিত জঠরে 'সত্য শিব সুন্দরে'র পূজাই শিল্পী-জীবনের 'মহৎ আদর্শ' ব'লে ঘোষিত। ছবি কবিতা কি গান 'ঐশ্বরিক' অনু-প্রেরণার ফল, বাস্তব জীবনের ক্ষুদ্র সুখদুঃখের শিল্পী অনেক উর্ধে, পশুশক্তির চেয়ে অনেক প্রবল 'আধ্যাত্মিক' শক্তি, এ-সব বিশ্বাস আমাদের এখনো আছে। এ একরকমের আত্মবঞ্চনা মাত্র, পতিত, পরাজিত ও চরিত্রহীনের আত্মরতি। আসলে মানবজীবনই সাহিত্য ও শিল্পের বিষয়, সত্য শিব ও সুন্দর নয় ; এবং মানবজীবন অতি ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা গঠিত, তাছাড়া ক্ষুধিত জঠর হত্যা কি আত্মহত্যা ছাড়া আর-কোনো আবেগের উদ্রেক করতে পারে না। শুধু যে শিল্প আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন থেকে উৎসারিত তা নয় ; ছবি, কবিতা কি গান অন্যান্য কারিগরের তৈরি যে-কোনো জিনিসের মতোই পণ্যদ্রব্য ; এবং ইকনমিক্সের নিয়মাধীন। কথাটা শুনতে খারাপ লাগে, কিন্তু বাজার-দরের ওঠা-পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই শিল্পবস্তুর প্রগতি কি অধোগতি দেখা যায়। ভারতবর্ষের লেখক ও শিল্পীদের এ-বিষয়ে এখন সচেতন হবার সময় এসেছে।

অন্য একটি বইতে এরিক গিল্ একটি কথা বলেছেন : সমস্ত আর্ট-ই প্রোপাগাণ্ডা। আমাদের দেশের যাঁরা প্রোপাগাণ্ডা বলতেই আঁৎকে ওঠা কি নাক শিঁটকিয়ে চুপ ক'রে থাকা কর্তব্য মনে করেন, তাঁরা শুনলে মর্মাহত হবেন যে তাঁদের ঐ আঁৎকে ওঠা ও নাক শিঁটকোনোও প্রোপাগাণ্ডারই ফল।

কোনো-না-কোনো জিনিসের স্বপক্ষে কি বিপক্ষে কোনো মন্তব্য না ক'রে কিছু লেখা কি আঁকা অসম্ভব, এরিক গিল্-এর এ কথা অগ্রাহ্য নয়। নির্বাচনে ও সজ্জাতেই আর্ট; এবং সেই নির্বাচনে ও সজ্জাতেই প্রোপাগাণ্ডা ধরা পড়ে। অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রোপাগাণ্ডা সচেতন ইচ্ছাপ্রসূত নয়। কিন্তু কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অত্যন্তই সচেতন ও ইচ্ছাপ্রসূত, যেমন আজকের দিনের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, খবরের কাগজে ও সিনেমায়। ইস্কুল কলেজে আমাদের ইচ্ছে ক'রেই ভুল ইতিহাস, ভুল ভূগোল, ভুল অর্থনীতি, ভুল সাহিত্যসমালোচনা ও জীবনদর্শন শেখানো হয়, খবরের কাগজে আসল খবর অল্পই থাকে, এবং যেটুকু থাকে তাও বিকৃতভাবে, আর সিনেমায় জীবনের যে-ছবি সাধারণত দেখানো হয় তা লক্ষ লক্ষ লোকের মনে আফিমের কাজই করে। এখানেও সেই সমস্যা: বেশির ভাগ খবরের কাগজ, সিনেমা কোম্পানি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মালিক তাঁরাই, শাসকশ্রেণীর সঙ্গে যাঁদের স্বার্থ অভিন্ন। উঠতে বসতে, খেতে-শুতে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বহুবিধ প্রোপাগাণ্ডার দ্বারা মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে এ-কথা যদি বলি যে প্রোপাগাণ্ডা অতি তুচ্ছ ও বাজে জিনিস তাহ'লে এটাই প্রমাণ করা হয় যে নেশার একেবারে তুরীয় অবস্থায় এসে পৌঁচেছি। ঘুম-ভাঙানো, নেশা-ছোটানো বিপরীত প্রোপাগাণ্ডা চালাবার যাঁরা পক্ষপাতী তাঁদের পক্ষে এটুকু নিশ্চয়ই বলবার আছে যে সমগ্র মানবজাতির মহত্তম স্বার্থরক্ষার জন্যই তাঁদের চেষ্টা, সমগ্র মানবজাতির মূল্যে ক্ষুদ্র এক শ্রেণীর স্বার্থবৃদ্ধির জন্য নয়।

'The Mind in Chains'-এ কল্ডর-মার্শল সিনেমা সম্বন্ধে যে মূল্যবান প্রবন্ধটি লিখেছেন, তাতে ধনতান্ত্রিক প্রোপাগাণ্ডার স্বরূপ খুলে দেখানো হয়েছে। বিলেতে স্পেনের যুদ্ধের একটি নিউজ-রীল দেখানো হয়, তাতে গবর্মেণ্ট-দলের কয়েকজন সৈন্য যীশুখৃষ্টের একটি মূর্তিকে গুলি করছে। ক্যামেরা মিথ্যে কথা বলে না, সুতরাং যীশুর মূর্তিকে গুলি তারা নিশ্চয়ই করছিলো। ঐ ছবিটি যত লোক দেখেছিলো তাদের মনে স্পেনের গবর্মেণ্ট-দল সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ ভাব জন্মাবে এটাও স্বাভাবিক। কিন্তু এ-কথা অবশ্য তারা কেউ জানতো না যে ছবিওলা আগে প্রত্যেক সৈন্যকে পাঁচটি ক'রে রৌপ্যমুদ্রা দিয়েছিলো, তবে তারা গুলি ছুঁড়েছিলো, এবং তবেই এই ছবি নেয়া সম্ভব হয়েছিলো। মুখে যাঁরা বলেন, 'আমরা ফাশিষ্টও নই, কমিউনিষ্টও নই, আমরা শুধু নিরপেক্ষ সত্য কথা শোনাচ্ছি', এই সব গুপ্ত কারসাজির আশ্রয় তাঁরাই নিয়ে থাকেন। ক্যামেরাকে দিয়েও মিথ্যে কথা বলানো যায়, অন্তত ভুল কথা তো অনায়াসেই বলানো

যায় ও সর্বদাই বলানো হচ্ছে। এই নিউজ রীলই তার চমৎকার উদাহরণ।

'In Letters of Red' বইটিতে রবর্ট হেরিং এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে নিউজ রীলগুলো আগাগোড়াই ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রোপাগাণ্ডা; তাতে ফ্যাশানের ও সৈন্যদের কুচকাওয়াজই বড্ড বেশি, আজকের দিনের মানুষের সত্যিকারের খবর যেগুলো, সেগুলো প্রায় থাকেই না, কি থাকলেও এমনভাবে থাকে যাতে লোকের মনে তার ছাপ গভীর হ'য়ে না পড়ে।

'In Letters of Red' বইটি বিভিন্ন লেখকের গল্প, কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধের সংগ্রহ। লেখকদের মধ্যে অনেক নামজাদা লোক আছেন। বইয়ের গোড়াতেই Low অঙ্কিত চমৎকার কার্টুনটি থেকে আরম্ভ ক'রে শেষের পাতা পর্যন্ত সবগুলি রচনারই মূল সুর এক। 'The Mind in Chains'-এর মতো আঁটোসাঁটো ও এককেন্দ্রিক না-হ'য়েও এ-বইয়েরও উদ্দেশ্য ফাশিজ্‌ম্‌-এর বিরুদ্ধে ও সাম্যবাদের স্বপক্ষে প্রচারকার্য। বিষয়বস্তুর ও সাহিত্যরূপের বিচিত্রতায় সাধারণ পাঠকের পক্ষে বইটি উপভোগ্য, এদিক থেকে ছুটির দিনে পড়বার মতো বই। যাঁরা প্রোপাগাণ্ডা ও 'আর্ট'কে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এমনকি পরস্পর-বিরোধী সংজ্ঞা ব'লে বিশ্বাস করেন, তাঁরা এ-বই পড়তে-পড়তে এই ভেবে অবাক হবেন যে এ দুয়ের মধ্যে সীমারেখা কোথায়, যদি কোনো সীমারেখা আদৌ থাকে। ডে লুইস-এর 'News Reel' কবিতা প্রোপাগাণ্ডার শেষ কথা, অথচ কবিতাও নিঃসংশয়ে প্রথম শ্রেণীর। অডেন-এর 'Dover' কবিতাটি সম্বন্ধেও সেই কথা। এ-শ্রেণীর রচনায় যা পাবেন আপনার ইচ্ছে হ'লে তাকে প্রোপাগাণ্ডা বলতে পারেন, কিন্তু আধুনিক সামাজিক জীবন সম্বন্ধে সচেতনতা বললেই বোধ হয় ঠিক সত্যটি বলা যায়। এ-সব কবিতা হচ্ছে এডওয়ার্ড অপওয়র্ড-এর ভাষায় 'true to the fundamental realities of today.' অপ্‌ওয়র্ড 'The Mind in Chains'-এ তাঁর সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধে বেশ একটু গোঁড়ামির ভাবেই বলেছেন যে 'no book written at the present time can be "good" unless it is written from a Marxist or near Marxist viewpoint.'। পরে তিনি বিস্তৃতভাবে বুঝিয়েছেন কেন সাম্যবাদী না হ'লে প্রতিভাশালী লেখকও আজকের দিনে ভালো বই লিখতে পারবেন না। এই প্রসঙ্গ জড়িয়ে অন্তহীন তর্ক উঠতে পারে, তার ভিতর

আপাতত যেতে চাইনে। তবে ফলেই যদি গাছের পরিচয়, তবে এটা বলতেই হয় যে আজকের দিনে ইংলণ্ডের বামপন্থী তরুণরাই সব চেয়ে ভালো লিখছেন। লরেন্স মৃত, অল্ডস হক্সলি নিঃশেষিত, বৃদ্ধদের মধ্যে একমাত্র মহাকবি ইয়েট্‌স্‌ই এখনো সজীব মনের পরিচয় দিচ্ছেন, এবং সেটাও নতুন কালের সঙ্গে তাঁর যোগস্থাপনের ফল। এলিয়ট্‌ ও পাউণ্ডকে বাদ দিয়ে ইংরেজি ভাষায় আজ যে-ক'জন উল্লেখযোগ্য লেখক, সকলের মধ্যেই অপ্‌ওয়র্ড-এর উক্তির সমর্থন মিলবে। অডেন, ডে লুইস, কল্ডর-মার্শল প্রভৃতির কবিতায় ও গল্পে নতুন একটা উদ্দীপনা আছে যার তুলনায় বয়স্ক প্রথিতযশাদের রচনা ম্লান ও নিঃসার মনে হয়, তাছাড়া আঙ্গিকের দিক থেকেও তাঁদের অভিনব পরীক্ষাশীলতায় বিস্মিত হ'তে হয়। তবে অপ্‌ওয়র্ড শেষের দিকে বলেছেন যে যাতে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ব্যাপারে নির্লিপ্ত থেকে আমরা লেখকরা সমস্তটা সময় ও শক্তি অব্যাহত-ভাবে লেখাতেই দিতে পারি, সেইজন্য আপাতত আমাদের নিজেদের প্রকৃত কাজের, অর্থাৎ লেখার, ক্ষতি ক'রেও শ্রেণীহীন সমাজ গ'ড়ে তোলবার জন্য কাজ করতে হবে। শ্রেণীহীন সমাজে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থাকবে না—সাহিত্যিক তাঁর সমসাময়িক জীবনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন না হ'য়েও তাঁর লেখার কাজেই সমস্তটা মন দিতে পারবেন—আর, তার চেয়ে সুখের জীবন লেখকের পক্ষে আর কী হ'তে পারে? এতে আমরা আমাদের প্রথম প্রস্তাবেই ফিরে এলুম যে শিল্পীর পক্ষে রাজনীতি ব্যাপারটাই বিরক্তিকর, কিন্তু আজ যে তাঁকে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে যোগ দিতে হচ্ছে তা অন্য উপায় নেই ব'লে, নিছক আত্ম-রক্ষারই প্রেরণায়।

আত্ম-রক্ষার আর-একটা দিকও আছে। শিল্পী ও লেখক হিসেবে বাঁচবার আগে জীব হিসেবে বাঁচা দরকার। ইয়োরোপে আর-একটি মহাযুদ্ধ অনিবার্য মনে হচ্ছে, এবং আগামী যুদ্ধে স্ত্রীলোক কি শিশু, কবি কি দার্শনিক কারুরই বাঁচবার নিশ্চয়তা নেই। সমস্ত ইয়োরোপে আজ করাল আতঙ্কের ছায়া। এ-অবস্থায়, যাতে যুদ্ধ আর না লাগে, সকলেরই সে-চেষ্টা করা দরকার। কিন্তু কী অবস্থা হ'লে যুদ্ধ আর লাগবে না? জর্মানি, ইটালি ও জাপানের সাম্রাজ্য-ক্ষুধা প্রশমিত করা হোক্‌, স্পেনে ফ্র্যাঙ্কোর জয় হোক, তবেই সব মিটমাট হবে, অনেকে এ-রকম মত পোষণ করেন। কিন্তু তখন সম্মিলিত ফাশিষ্ট-শক্তির কাছে ইয়োরোপ ও এশিয়ার অন্য সমস্ত দেশকে যে দাসত্ব স্বীকার করতে হবে না, তার বিশ্বাস কী? 'রাগের মার থামে, লোভের মার থামে না'; সাম্রাজ্যক্ষুধিত দেশ-গুলোকে কিছু টুকরো ছেড়ে দিলেই যে তারা চুপ ক'রে থাকবে, এমন ভরসা

নেই। অন্যপক্ষে, জর্মানি কি ইটালিকে অতিরিক্ত পরাক্রান্ত হ'য়ে উঠ্‌তে ইংলণ্ড কি ফ্রান্স কখনোই দেবে না, চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। জোড়াতালি দিয়ে, রাজনৈতিক 'চাল' মেরে কিছুদিন হয়তো যুদ্ধ থামিয়ে রাখা যাবে, কিন্তু বেশিদিন যাবে না, এটা নিশ্চিত।

ইংলণ্ডে আর-একদল আছেন, যাঁরা অহিংসা দ্বারা পশুশক্তিকে জয় করতে বদ্ধপরিকর। তাঁরা শান্তিধর্মী, বা প্যাসিফিষ্ট। অল্ডস্ হক্সলি মহাশয় তাঁদেরই একজন। তাঁর শেষ উপন্যাস 'Eyless in Gaza'-তেই তাঁর প্যাসিফিজ্‌ম্-এর উপর ঝোঁক দেখা গিয়েছিলো, এবারে একেবারে পুরোদস্তুর প্যাসিফিষ্ট হ'য়ে একটি ছোটোখাটো অবতারের মতো আমাদের সামনে দেখা দিয়েছেন। Peace Pledge Union-এর পক্ষ থেকে সম্প্রতি তিনি একটি 'Encyclopædia of Pacifism' ছ' পেনি মূল্যে প্রণয়ন করেছেন। বইটি প'ড়ে বিমূঢ় হ'য়ে যেতে হয়। প্রথমে ভেবে অবাক লাগে, অল্ডস্ হক্সলির মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কী ক'রে এ-বই লিখলেন। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে তাঁর প্রাক্তন বইগুলি থেকে এ-বইটি বিচ্ছিন্ন নয়। কেননা যদিও তিনি মানবজীবন সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত বিষয়েই কিছু-কিছু বলেছেন, তবু কখনোই মুহূর্তের জন্যও কোনো বিষয়েই মন স্থির করতে পারেন নি। এক ধরণের নীরক্ত অপক্ষপাত এঁর সমস্ত লেখায় বর্তমান—এবং সেই কারণে রচনার সমস্ত চতুরালি সত্ত্বেও তিনি চিন্তাশীল লেখক হিসেবে শেষ পর্যন্ত অতৃপ্তিকর। এই কিছুতেই মন স্থির করতে না-পারার শেষ শূন্যগর্ভ ফল হ'লো প্যাসিফিজম্।

অল্ডস হক্সলির তথা প্যাসিফিষ্টদের মত এই যে জগতের সব লোকই যদি শান্তিব্রত গ্রহণ করে তাহ'লেই আর যুদ্ধ হবে না। যুদ্ধ কয়েকজন রাজনৈতিকদের—আরো বেশি, হাতিয়ার-নির্মাতাদের ষড়যন্ত্রের ফল মাত্র, কোনো দেশেরই জনসাধারণ যুদ্ধ চায় না। সুতরাং যথাসময়ে যদি তারা জীবনপণ ক'রেও অস্ত্রগ্রহণে অস্বীকার করে তবেই প্রবল শাসকশ্রেণীর সমস্ত চক্রান্ত ভণ্ডুল ক'রে জগতে শান্তি স্থাপিত হবে। 'যুদ্ধ আমরা কিছুতেই করবো না', এ-কথা সব লোক মিলে জোর ক'রে একবার বলতে পারলেই হ'লো।

যুদ্ধনিবারণের এমন চমৎকার সহজ উপায়ের কথা শুনে আপনারা নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবেন। অবশ্য শুধুই শান্তিব্রতের প্রচার যথেষ্ট নয়, হক্সলি সে-কথাও মানেন। যুদ্ধের অর্থনৈতিক কারণও আছে। সাম্রাজ্য নিয়েই তো ঝগড়া? সাম্রাজ্য কেন দরকার? মাল বেচতে। তা সমস্ত দেশ ফ্রী ট্রেড করলেই পারে। তাছাড়া,

উপনিবেশগুলির যারা খাস বাসিন্দা, তাদের কথাও ভাবতে হয়। আজকের দিনে তাদের পরাধীন ক'রে রাখা অন্যায়। সুতরাং ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশকে স্বাধীন ক'রে দেয়া হোক্, কিংবা (যদি মনে হয় তারা স্ব-রাজের অযোগ্য) তবে একটি আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষ সমিতির হাতে তাদের শাসনভার দেয়া হোক্। এদিকে শ্রেণী-বিরোধ ব'লে একটি জিনিস আজকালকার জগতে আছে এ-রকম কথা হক্সলি শুনেছেন। সত্যিই তো, শ্রমিকদের এ-ভাবে শোষণ করা বড়ো অন্যায়। তবে তারা কনস্যুমর্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি ক'রে নিজেদের অবস্থার অনেক উন্নতি করতে পারে—ব্রিটেনে ও আয়র্লণ্ডে করেছে। ক্যাপিট্যালিষ্টরা তাঁদের মুনফার একটা মোটা অংশ শ্রমিকদের ছেড়ে দিলেই তো পারেন। কমিউনিজ্‌ম্-এর কোনো দরকার নেই, যদি তাতে বলপ্রয়োগের আশঙ্কা থাকে, কেননা 'violence breeds violence' এবং 'a good result can never be obtained by violent means.' ইংলণ্ডের উদারপন্থী গণতন্ত্রই সব চেয়ে ভালো এবং ধনতন্ত্রকে কিছু-কিছু শোধন ক'রে নিয়ে স্বচ্ছন্দে কাজ চলতে পারে, হক্সলির এই বিশ্বাস বেশ স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। যুদ্ধনিবারণের প্রেস্কৃপশন্ তাহ'লে (১) ফ্রী ট্রেড ও (২) কনস্যুমর্স কো-অপারেটিভ।

সত্যি বলতে, এই বইটির আগাগোড়া টি, এইচ্ হক্সলির এই প্রচণ্ড পৌত্র কখনো বালকের মতো, কখনো খৃষ্টের মতো কথা বলেছেন। জড়বাদী পিতামহের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে এতদিন গল্পাদি লিখে আজ তিনি বহু পরিশ্রমে এইটে প্রমাণ করেছেন যে যীশু যুদ্ধবিরোধী ছিলেন! চীন ও ভারতের সমস্ত প্রাচীন সম্প্রদায় অহিংসধর্মী ছিলো আবিষ্কার ক'রে তাঁর কী উল্লাস! যে ব্যক্তিকে একদিন তিনি 'mild graminovorous Mahatma' আখ্যা দিয়েছিলেন, সেই গান্ধির নন্-কো-অপারেশনের প্রশস্তি পদে-পদে। অবশ্য মানুষের মত বদলাবার অধিকার আছে, এবং আন্তরিক বিশ্বাস জন্মালে নির্ভয়ে সেটা ঘোষণা করাও ভালো। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকারই মধ্যে দুর্বল যুক্তি ও আত্ম-প্রতিবাদ প্রতি পৃষ্ঠায়। একটি দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। 'So-called class-war' সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য :

> '. . . the idea of class war is based on conditions which no longer exist. In a world of economic scarcity, the wealth of one group means the poverty of another. But we live in an age of potentially unlimited plenty. There is, therefore, no economic reason for the class struggle.'

শ্রেণী-বিরোধের কোনো অর্থ নৈতিকে কারণ নেই, এ-কথা বলবার সময় হক্সলি ভুলে

যাচ্ছেন যে তাঁর নিজের স্বীকৃতিতেই পৃথিবীর অপরিমিত সচ্ছলতা এখনো 'potential', সম্ভাবনা মাত্র। সে সম্ভাবনা সার্থক হবে কেমন ক'রে? সে-বিষয়ে প্যাসিফিষ্টদের কোনো গ্রাহ্য নির্দেশ নেই। হক্সলি নিশ্চিন্ত মনে বলেছেন যে আসল কারণটা 'economic' নয়, 'psychological' যথা :

> 'There is, however, a psychological factor. Some men desire power over others. This lust for power is the principal source of evil, and it is essential to combat it by every means, psychological as well as political.'

কিন্তু এই 'lust for power'-এর উৎস কোথায়? শ্রেণী স্বার্থেরই সংরক্ষণে। হক্সলি বলেছেন, শিক্ষা-পদ্ধতি বদলে দিতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অর্থনৈতিক ক্ষমতা যাঁদের হাতে, শিক্ষাপদ্ধতিও তাঁদেরই সৃষ্টি, তাঁরা নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার উদ্দেশ্য মনে রেখেই দেশের তরুণদের গঠন করবেন। 'The economic power in the hands of individuals must be limited.' (*Must* কথাটা কি প্যাসিফিষ্টনীতির বিরোধী নয়?) কিন্তু সেটা কেমন ক'রে হ'তে পারে? হক্সলি নিরুত্তর। ব্যক্তিবিশেষের অর্থনৈতিক ক্ষমতা কমানো মানেই কি শ্রেণী-বিরোধ নয়?

এখানে 'In Letters of Red'--এর একজন লেখকের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করতে পারি। 'National Hypnotism' নামক প্রবন্ধে জেফ্রি মাসটন বলছেন :

> 'It (capitalism) changed that world of scarcity into a world of abundance. It solved the problem of production. . . . It created abundance. And then, when confronted with the task of distributing that abundance equitably and efficiently it failed. It was inevitable that it should fail.

খুব পরিষ্কার কথা। ধনতন্ত্র উৎপাদনের সমস্যার সমাধান করেছে, কিন্তু সঙ্গত বিতরণের ব্যবস্থা তার পক্ষে অসম্ভব। দয়া, দাক্ষিণ্য কি সমবায় সমিতি দ্বারা বিতরণের ব্যবস্থা হবে না। তার জন্যেই সাম্যবাদের প্রয়োগ দরকার। ধনিকরা যদি আজ হক্সলির নির্দেশমতো তাঁদের মুনফার অংশ ছেড়ে-ছেড়ে দিতে থাকেন তাহ'লে তাঁদের ধনিকত্বই আর বজায় থাকবে না। নিজেদের অস্তিত্বের স্বেচ্ছায় অবসান করতে রাজি হবার কোনোই জীবতাত্ত্বিক কি মনস্তাত্ত্বিক কারণ নেই।

বরং, আসন্ন সর্বনাশের মুখে টিঁকে থাকবার তাঁদের যে শেষ ভয়াবহ চেষ্টা তারই নাম ফাশিজ্‌ম্‌।

ধনতন্ত্র পৃথিবীতে যে অপরিমিত সচ্ছলতার সৃষ্টি করেছে তা বাস্তবিকই অভূতপূর্ব। এখন সেই সচ্ছলতা যাতে সকলেই সঙ্গতভাবে ভোগ করতে পারে, তার জন্যেই সাম্যবাদের প্রয়োগ। এ ছাড়া উপায় নেই, কেননা ধনোৎপাদনের সমস্ত উপায়ের মালিক যতদিন দেশের সমস্ত লোক না হয়, ততদিন সেই সঙ্গত বিতরণ অসম্ভব। বিতাড়িত জর্মান লেখক লিয়ন ফক্টভাগ্‌নার গোঁড়া মার্ক্সিষ্ট ব'লে মনে হয় না। সোভিয়েট রুশদেশের কোনো-কোনো জিনিস তাঁর চোখে বিসদৃশ ঠেকেছে। কিন্তু 'In Letters of Red'-এ 'Democracy and Dictatorship' প্রবন্ধে তিনি মানতে বাধ্য হয়েছেন যে যে-দেশে ধনোৎপাদনের উপায় জনগণের হাতে নেই সে-দেশে গণতন্ত্র প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃত শক্তি যেখানে, তা যদি সমস্তই কয়েকটি ব্যক্তিবিশেষের হাতে আবদ্ধ, তাহ'লে দেশের সমস্ত ব্যাপার তাঁদের ইচ্ছা ও সুবিধে অনুসারেই চলবে, জনসাধারণের কোনো ইচ্ছাই টিঁকবে না। ভোট দেবার ক্ষমতাটা ছেলে-ভুলোনো চুষি মাত্র। অর্থনৈতিক শক্তির বাইরে রাজনৈতিক শক্তির অস্তিত্ব নেই, এ-কথা আজ পৃথিবীর বেশির ভাগ লোক বুঝে ফেলেছে।

ফক্টভাগ্‌নার-এর প্রবন্ধটি আর একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। হিটলার কি মুসোলিনির সঙ্গে ষ্টালিনের পার্থক্য কোথায় তা তিনি দেখিয়েছেন। রুশদেশে বিস্তৃত ভ্রমণ ও ষ্টালিনের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় থেকেই বলেছেন। আমাদের দেশে অনেকেরই বোধ হয় ধারণা যে ষ্টালিন হিটলার কি মুসোলিনির মতোই অবাধ স্বেচ্ছাচারী। অল্ডস্‌ হক্সলিরও মনে-মনে তাই বিশ্বাস ব'লে মনে হয়। ফাশিজ্‌ম্‌ ও কমিউনিজ্‌ম্‌ উভয়েরই তিনি বিরোধী। কমিউনিজ্‌ম্‌ অহিংসধর্মী নয়, সুতরাং তা ফাশিজ্‌ম্‌-এর মতোই দূষ্য! তাঁর মতে, সাম্যবাদ যদি যুদ্ধই করে, এবং যুদ্ধ দ্বারাই জয়ী হয় তবে তা আর সাম্যবাদ থাকলো না, ফাশিজ্‌ম্‌ হ'য়ে গেলো।

> ('The defence of Socialism against Fascism by military means entails the transformation of the socialist community into a fascist community.')

এই যুক্তি অনুসারে চীনেরা আজকাল ফাশিষ্ট, স্পেনের গবর্মেণ্টের দলও ফাশিষ্ট! হক্সলির মতো পণ্ডিতের মুখ থেকে এ-রকম একটা হাস্যকর কথা

শুনতে পাবো কখনো ভাবিনি। ষ্টালিন অন্য সমস্ত দেশকে জোর ক'রে সাম্যবাদ গ্রহণ করাতে ইচ্ছুক নন ব'লেই ট্রটস্কি আজ নির্বাসিত; কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি শত্রুর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে না থাকে, তাহ'লে যে-কোনো মুহূর্তে পৃথিবীর একমাত্র সাম্যবাদী দেশ ফাশিষ্ট শক্তির চাপে বিধ্বস্ত হ'য়ে যেতে পারে, এবং তার ফলে হয়তো পৃথিবীর আর একটি অন্ধকার বর্বর যুগেরই সূত্রপাত। এ-বিষয়ে ফক্টভাগ্‌নার বলছেন :

> 'It is an actual fact that there (in U. S. S. R.) the people and not individuals are in possession of the means of production, and it is a fact, too, that whilst the democratic nations, by their empty talk of disarmament and their continual compromise, were encouraging the Fascist States to commit more and more acts of violence, the Soviet Union alone, with its systematic armament, was preventing Fascism from beginning its war against an inadequately armed world.'

ফক্টভাগ্‌নার ব্যক্তিগতভাবেও ষ্টালিন সম্বন্ধে লিখেছেন। হিটলার মুসোলিনির দামামা আজ সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিদিন নানাভাবে বাজছে, কিন্তু ষ্টালিন সেদিক থেকে অত্যন্ত সংযত। তাঁর নিজের দেশের লোকও তাঁর ব্যক্তিগত কি পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কিছু জানে না। তিনি কোনো বিরাট খেতাব নেননি, তাঁর আখ্যা 'Secretary of the Central Committee'। যেখানে সমস্ত অর্থনৈতিক শক্তি দেশের লোকের হাতে, সে-দেশে তাদের ইচ্ছাই চরম হ'তে বাধ্য, এবং ষ্টালিন ইচ্ছে করলেও সেই ইচ্ছার প্রতিনিধি ছাড়া কিছু হ'তে পারেন না। অবশ্য রুশদেশে ষ্টালিন-পূজা অত্যন্ত ব্যাপক, ফক্টভাগ্‌নারের সেটি ভালো লাগেনি। কিন্তু এই পূজা সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও নতুন অবারিত জীবনের জন্য স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতারই উচ্ছ্বাস। ষ্টালিন নিজেও জানেন যে এই উচ্ছ্বাসের উদ্দেশ্য তিনি নন, তাঁর প্রবর্তিত নীতি। উপরন্তু, নেতাদের অহৈতুক পূজার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই আন্দোলন সুরু হয়েছে।

'নেশন এণ্ড নিউ ষ্টেটসম্যান্' পত্রিকার সম্পাদক কিংসলি মার্টিন 'In Letters of Red -এ স্পেন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে তিনি বলেছেন যে যে-তিনশ্রেণীর লোক স্পেনে ফ্যাঙ্কোর জয় কামনা করে, প্যাসিফিষ্টরা তাদের অন্যতম। কথাটা প'ড়ে প্রথমে অবাক হয়েছিলুম, কিন্তু হক্সলির পুস্তিকাটি

প'ড়ে বুঝতে পারলুম, কথাটা কত সত্য। যুদ্ধ কিছুতেই নয়, ভয়ঙ্কর হত্যা-লীলার অবসান চাই, তার জন্য যে-কোনো আদর্শ পরাস্ত হয় তো হোক। ফ্র্যাঙ্কো জিৎলে যদি যুদ্ধ থামে ফ্র্যাঙ্কোরই তবে জয় হোক্। এতে এটাই প্রমাণ হয় যে আসলে তাঁরা শান্তিপন্থী নন, কিংবা কী হ'লে জগতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে সে-বিষয়ে তাঁদের ধারণা অস্পষ্ট। ফ্র্যাঙ্কো জয়ী হ'লে তাঁর বর্ধিত বিক্রম সভ্যতার শত্রুদেরই শক্তি বাড়াবে, স্পেন জয়ী হ'লে সভ্যতার যুদ্ধ-লোলুপ শত্রুদের পরাজয়। বর্তমান যুগে যুদ্ধের ভয়াবহতা অতুলনীয় তা সকলেই জানে, কোনো প্রগতিপন্থীই যুদ্ধ চান না, চাইতে পারেন না; কিন্তু এমন অবস্থাও আসে যখন যুদ্ধ করা উচিত কি উচিত নয়, সে-কথাই ওঠে না। ভারতবর্ষে ব'সে আমাদের পক্ষে, কিংবা ইংলণ্ডের এখনো নিরাপদ রাজধানীতে ব'সে অহিংসা পরমো ধর্ম বুলি আওড়ানো সোজা, কিন্তু বিদেশী ভাড়াটে সৈন্য বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যখন একটা দেশকে ধ্বংস করতে উদ্যত, তখন সে-দেশের লোক কী করবে? স্পেনের অবস্থা দেখে এসে কিংসলি মার্টিন তাই লিখছেন:

> 'On such occasions it is useless to argue whether men ought to fight. They know no alternative.'

সভ্যতাকে যদি বাঁচাতে হয় তবে জগতে যুদ্ধের অবসান নিশ্চয়ই দরকার। তবে তার উপায় প্যাসিফিজ্‌ম্ নয়। হক্সলির বইটি প'ড়ে এ-বিশ্বাসই দৃঢ় হয় যে এই শান্তিপন্থা পলায়নেরই নামান্তর। বর্তমান জগতের আসল সমস্যাগুলো এঁরা দেখছেন না, কি দেখতে ইচ্ছে করছেন না, কি দেখলে নিজের অসুবিধা হয় ব'লে চোখ বুজে আছেন। অল্ডস্ হক্সলি নিজে ইচ্ছে ক'রে অন্ধ হ'য়ে আছেন এ-কথা বিশ্বাস করা শক্ত। তবে কিনা আজকালকার মানবজীবনের সত্যগুলো এতই রূঢ় ও নির্মম যে তার সঙ্গে কোনোরকম আপোষ চলে না, এবং সেগুলো প্রত্যক্ষ দেখতে গেলে প্রচণ্ড ঘা খেতে হ'তে পারে। হয়তো সেইজন্যেই হক্সলি চোখ বুজে আছেন। কিন্তু নিদারুণ সর্বনাশের মুখে চোখ বুজে থেকে ক'দিন চলবে? আশা করি অল্ডস্ হক্সলিকে শিগগিরই আমরা পণ্ডিচেরিতে কি আলমোড়ায় দেখতে পাবো; তাঁর বৈষ্ণবত্বকে পূর্ণ করতে এখন শুধু একটি কাঠের মালা দরকার।

প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মাঝামাঝি কোনো রাস্তা আজ নেই, এ-কথা একবারে স্বীকার ক'রে নেয়াই ভালো। মাঝামাঝি রাস্তা খুঁজতে গেলেই বুদ্ধির কত বড়ো বিপর্যয় ঘটে, হক্সলি তার উদাহরণ। পৃথিবী এখন কালের সঙ্গমস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে। এ-সময়ে প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকেরই চোখ খোলা রেখে চারদিকে

তাকিয়ে নিজের বিশ্বাস গঠন করা কর্তব্য। যাঁরা আপোষ করবার চেষ্টায় লোকের দৃষ্টির পরিচ্ছন্নতা নষ্ট ক'রে দেবেন, তাঁরা আজ সমগ্র মানবজাতির অনিষ্টই করবেন। যুদ্ধের কারণ দূর না হ'লে যুদ্ধ দূর হবে না, এবং পৃথিবীতে সর্বত্র ধনোৎপাদনের উপায় সমস্ত সমাজের লোকের হাতে না এলে যুদ্ধের কারণও দূর হবে না। যুদ্ধ উপনিবেশের জন্য, উপনিবেশ দরকার জিনিস বেচতে; একমাত্র সমাধান হয় যদি স্বদেশেই সমস্ত উৎপন্ন বস্তুর খদ্দের জোটে। সেটা সম্ভব একমাত্র সকলেরই যদি সঙ্গত আয় থাকে, ও কারুরই এত বেশি না থাকে যা দিয়ে ভূমি কি ধনোৎপাদনের অন্য-কোনো উপায়ের মালিক হওয়া যায়। এবং এ-ব্যবস্থা সাম্যবাদী সমাজেই সম্ভব। যাঁরা বলেন, সাম্যবাদই জগতে স্থায়ী শান্তিস্থাপনের একমাত্র উপায়, সব দিক ভেবে দেখতে গেলে তাঁদের কথা বিশ্বাস না ক'রে উপায় থাকে না। তা ছাড়া, একমাত্র শ্রেণীহীন সমাজেই 'lust for power'-এর সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি সম্ভব।

বোমা

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীর কত জায়গায় কত বোমাই তো ফাটছে, হিসাব রাখা কেবল অসম্ভব নয়,—অন্যায়। তাতে পৃথিবীর অনেক যায়গায় এখনকার মত অসংখ্য বোমা ফাটায় বাধা হতে পারে। বোমার চেয়ে মানুষকে বেশী কাবু করে হিসাব। বোমা ফাটার অতি আন্দাজী অতি বেঠিক হিসাবও হয়ত অনেকগুলি মানুষকে করে দেবে অনেকগুলি জীবন্ত প্রশ্ন ঃ এত বোমা ফাটে কেন ?

জীবন্ত প্রশ্ন জবাব আবিষ্কার করবেই। তার ফলে পৃথিবী জুড়ে হয়ত বোমা ফাটাফাটি সম্বন্ধে এমন কড়া ব্যবস্থাই হবে যে বোমা আর একরকম ফাটবেই না।

আর তার ফলে হয়তো পৃথিবী জুড়ে এমন ভীষণ নিঃশব্দ শান্তি বিরাজ করবে যে গোপালের পর্য্যন্ত মনে হবে আর একবার পৃথিবীটা পাক দিয়ে আসা যাক। ঘরের চেয়ে বাইরের শান্তি বেশী হলে অশান্ত মানুষের কি ঘরের টান থাকে ?

আহা, এত ভাল মানুষ হয়েছে গোপাল, দোতলা একটা বাড়ীতে এত যত্নে সে এমন নিবিড় শান্তিপূর্ণ সংসার পেতেছে, রোজ রাত্রে নীল আলো জ্বালা ঘরে তাকেই বিবসনা করার অধিকার পেয়েছে, যার জন্য একবার পৃথিবীটাই সে পাক দিয়ে এসেছিল, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বোমার ফাটাফাটিতে উড়ে যেতে হলেও কি আর তাকে ঘরছাড়া করা উচিত ?

এই ধরণের ভাবনাই সুধা ভাবে,—সম্পূর্ণ অন্য ভাবে। সে এমন ভীরু আর চালাক মেয়ে যে আরও কয়েকটা বছর গোপালের দিনান্তের কর্ম্মান্তিক অবসাদের সঙ্গে ঘরের আবহাওয়ার সামঞ্জস্য সে বজায় রাখবেই। এখনও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা সে পছন্দ করে না। এখনও হিষ্টিরিয়াকে সে ঘেন্না করে। কারণ সুধার স্নায়ু এখনও বড় দুর্ব্বল। মাঝে মাঝে এখনও তার হিষ্টিরিয়া হয়। কিন্তু স্নায়ু তো একদিন সবল হবে ? হিষ্টিরিয়া তো একদিন সেরে যাবে ? নিজমূর্ত্তি ধারণ করলে কি বিপদটাই না জানি তখন তার হবে !

পৃথিবীর আর কোন জীবন্ত প্রাণী বাঁচুক মরুক কিছুই তার এসে যায় না

এমনভাবে সুধাকে গোপাল ভালবাসে, রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি থেকে আরম্ভ করে নৈতিকনীতি পর্য্যন্ত চুলোয় পাঠান যায় এমনভাবে গোপাল সুধাকে ভালবাসে, তবু সুধার ভয় আর চালাকির শেষ নেই। আবার যদি গোপাল পৃথিবী পাক দিতে চলে যায়? কিছুতেই মুখ ফুটে বিয়ের কথাটা বলছিল না বলে কথাটা বলাবার জন্যই অন্য একজনের কাছে আত্মসমর্পণের ভাণ করায় কুমারী অবস্থায় তাকে ত্যাগ করে সাত বছরের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে আর ভাণটা কার্য্যে পরিণত করা সত্ত্বেও সাত বছর পরে ফিরে এসে সেই আর একজনের বিধবা অবস্থায় বিনা বাক্যব্যয়ে যে তাকে বিয়ে করে ফেলতে পারে, তাকে বিশ্বাস নেই। সে সব পারে। একা সে তাকে বেশী দিন বেঁধে রাখতে পারবে না। সেজন্য ছেলে মেয়ে চাই!

যে দুটি ছেলে তার আছে তারা নয়। গোপালের নিজের ছেলে মেয়ে।

ছেলে সুধার হল,—পর পর তিনটি। স্নায়বিক দুর্ব্বলতাও সুধার কমে গেল, হিষ্টিরিয়াও বিদায় হল। কিন্তু দুই আর তিনে যে পাঁচ হয় এই হিসাবটাই তাকে করে রেখে দিল কাবু। পর পর পাঁচ ছেলে কোলে পাওয়া যে কোন মেয়েমানুষের পক্ষে সাংঘাতিক ব্যাপার,—অদ্ভুত অকথ্য রহস্য। মেয়ে কই? কেন মেয়ে হয় না তার? গোপাল ছাড়া এ জগতে কার কাছে কবে সে কি অপরাধ করেছে যে তার মেয়ে হয় না,—হয়ত হবে না?

এবারও যদি ছেলে হয়?

টের পাওয়ার একমাসের মধ্যে সুধা দুর্ভাবনায় শুকিয়ে গেল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, অসুখ নয়, অন্য কিছু, এরকম হয়, ভাবনার কিছু নেই, টনিক খেলেই ঠিক হয়ে যাবে, চেঞ্জের ব্যবস্থা করতে পারলে—

সুধা রাগ করে বললে, 'চেঞ্জ না হাতী। ছুটি তো তোমার একদিনও পাওনা নেই, কার সঙ্গে যাব?'

'তোমার দাদার সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, তোমাকে ফেলে রেখে দাদার সঙ্গে চেঞ্জে যাব—অত সখে আমার কাজ নেই।'

পাঁচবার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, পাঁচবার ছেলে হয়েছে। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার জন্য এবার যদি মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনাটা একটু বাড়ে, স্বাস্থ্য ভাল করার চেষ্টা করাটা কি উচিত হবে? সুধা টনিকও খেল না, চেঞ্জেও গেল না, খারাপ শরীর খারাপ করেই রেখে দিল। এমন কি বেশীরকম চুল উঠে যেতে

আরম্ভ করায় চুলের সঙ্গে জীবনটাই যেন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে মনে হতে লাগল বটে তবু চুলের জন্য পর্য্যন্ত টনিকের ব্যবস্থা করল না।

ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে গোপালকে জিজ্ঞাসা করল, 'এবারও যদি ছেলে হয় ?'

গোপাল উদাসভাবে বলল, 'হলে হবে।'

খানিকটা ঝিমিয়ে সুধা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা এমন কি কোন উপায় নেই, যাতে লোকে ছেলে চাইলে ছেলে পায়, মেয়ে চাইলে মেয়ে পায় ?'

গোপাল হঠাৎ সচেতন হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা কি শুনি ? তোমার হয়েছে কি ?'

সুধা রেগে বলল, 'ব্যাপার পরে শুনো, আগে যা বললাম তার জবাবটা দিয়ে নাও।'

জবাব গোপাল কি দেবে ? এ তো জীবন্ত প্রশ্ন নয় যে মানুষ প্রশ্ন করতে শিখবার পর অনেককাল কেটে গিয়েছে বলেই জবাব একটা আবিষ্কৃত হয়ে থাকবে,—জীবনের এ একটা সাধারণ প্রশ্ন, সাধারণ কৌতূহল। গোপাল তাই চিরন্তন যুক্তি দেখিয়ে বলল, 'হয়তো উপায় আছে, মানুষ তা জানে না।'

মানুষ কেন জানেনা এরকম কুটিল প্রশ্ন করার মত জটিল মনোবিকার সুধার জন্মে নি, সে তাই বিনা প্রতিবাদে প্রতিদিন রোগা হয়ে যেতে আরম্ভ করল। রোগা হতে হতে মাস দেড়েকের মধ্যে এমন রোগাই হয়ে গেল যে জন্মাবার আগেই মেয়েটি তার গেল মরে।

সুধা কেঁদেই অস্থির। হায়, মেয়ে মেয়ে করে পাগল হয়ে মেয়েকেই সে হারিয়ে বসল ! মাথা খারাপ না হলে মেয়ে কিনা জানার আগে মেয়ে নয় মনে করে মানুষ এমন ব্যাকুল হয় ? কদিন খুব কাঁদাকাটা করে সুধার মন শান্ত হবার আর স্নায়ু অবসন্ন হবার সুযোগ পেল। তার ফলে ধীরে ধীরে এল স্থায়ী বিষাদ, যা অনেকটা পরিতৃপ্তির সামিল।

পরের বার একটি মেয়ে হল সুধার। অনেকদিন পরে—প্রায় চারবছর।

এইখানে উনিশ বছরের ছেদ দেবার সুযোগে সুধার মেয়ে হওয়ার সঙ্গে পৃথিবীর বোমা ফাটাফাটির সম্পর্কটা সংক্ষেপে একটু ব্যাখ্যা করি। এটা অবশ্য একটা চরম দৃষ্টান্ত কিন্তু সেজন্য কিছু এসে যায় না। দুয়ে আর দুয়ে যে যুক্তিতে চার হয় দু'লাখে আর দু'লাখে সেই যুক্তিতেই হয় চারলাখ। তুলনামূলকতার ঘোরপ্যাঁচ ছাড়া এর মধ্যে আর কোন বিস্ময়কর অসত্য নেই,—অতি সহজ কথা। এ যুগের চরম আর পরিণত দৃষ্টান্ত হিসাবে না ধরে সুধাকে ছেঁটে কেটে যদি

সেযুগের মৌলিক্ আর অপরিণত দৃষ্টান্তে দাঁড় করান যায়, তবু দেখা যাবে এই সুধার এভাবে মেয়ে হওয়ার মত সেই সুধার অতি সামান্য রকম এভাবে মেয়ে হওয়ার জন্যই মানুষের দাঁত আর নখে বোমার রক্ত পিপাসা জেগেছিল। নখের আঁচড় আর বোমার বিস্ফোরণের মধ্যে যে পার্থক্য নেই, এই ধারণা পোষণ করাই প্রত্যেকের উচিত। তা না হলে তুলনামূলক ঘোর প্যাঁচের ফাঁদে পড়ে মানুষ তর্ক আর হাতাহাতি করে,—কোন সময় নখ দিয়ে আচড়ায় আর দাঁত দিয়ে কামড়ায়, কোন সময় এক ঝাঁক এরোপ্লেন পাঠিয়ে বোমা বৃষ্টি করায়।

মন্দা একদিন সুধাকে বলল, 'মা, আজ বাড়ী থেকো, সন্দেবেলা অনাদি আসবে। বাবাকে বলতে পারবে না, তোমায় বলবে। তুমি বাবাকে বোলো।'

সুধা ভয়ানক চিন্তিত হয়ে বলল, 'অনাদি ? তাই তো।'

মন্দার মুখ গম্ভীর হল, চোখ বড় হল, দৃষ্টিতে তীব্রতা এল। ভীরু মাকে একটি আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, তুমি ভাব এখনও আমি কচি খুকীটি আছি, না ? কিছু বোঝো না, কেন ভেবে মর, কি দরকার তোমার এত ভাবনার ? কাল সন্দেবেলা সমীর আসবে—আসতে বলেছি।'

সুধার বয়স প্রায় পঞ্চাশে এসে ঠেকেছে, বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের জটিলতাগুলি সরল হতে আরম্ভ করায় ভয় পরিণত হয়েছে বুকের ধড়পড়ানিতে আর চালাকি পরিণত হয়েছে প্রায় নির্বুদ্ধিতায়। কিছুই যেন সহজে বোধগম্য হয় না। গল্পের মাঝখানে আমার গল্প ব্যাখ্যা করার মত সুধাকে তাই আবার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে হয়।

'আমি ওপরে থাকব। সমীর এলেই অনাদির কথাটা বলবে—বেশ হাসিমুখে বলবে, তোমাদের যেন মত আছে এমনিভাবে, বুঝলে ? তারপর সমীরকে ওপরে আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবে, বুঝলে ?

সুধা কাতরকণ্ঠে বলল, 'এসব তুই কি বলছিস মন্দা ? আজ অনাদি কাল সমীর—এসব কোন দেশী কাণ্ড ?'

সুধার তখনকার মুখ দেখেই যে কোন বুদ্ধিমতীর রাগ করার কথা, তবু সুধার কথা শুনেই যেন হঠাৎ নিজের বিপন্ন অবস্থাটা খেয়াল করে মন্দা একেবারে ঝিমিয়ে গেল। গম্ভীর মুখ ম্লান হল, বড় চোখ স্তিমিত হল, দৃষ্টি ভিজে এল। কাঁদ' কাঁদ' হয়ে বলল, 'কেন ভাবছ তুমি ? ভেবোনা। সমীরের জন্যেই তো—না বলালে কোনদিন মুখ ফুটে বলবে ভেবেছ ?'

বলে সুধাকে হাত ধরে বসিয়ে তার পাশে বসে কোলে মুখ গুঁজে মন্দা আরম্ভ করে দিল কান্না। সুধার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। আহা, সমীরের জন্য মেয়ে যখন তার এমন করে কাঁদছে, সমীরকে নিয়েই সে তার নীড় বাঁধুক। কি আসে যায় একটু যদি একগুঁয়ে মানুষ হয় সমীর, অনাদির সঙ্গে কবে একটু বাড়াবাড়ি করেছিল বলে মেয়েকে যদি এতকাল একটু পীড়ন করেই থাকে সমীর? সব ভাল যার শেষ ভাল।

প্রগতি ও পরিবর্ত্তন

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

মনোবিকলনে ধরা পড়ে যে মানুষমাত্রেই পরিবর্ত্তনবিমুখ। অথচ প্রতিনিয়ত না বদ্‌লালেও, সে বাঁচতে পারে না। যে-জগতে তার বাস, সেখানে স্থিতি তো অনুকল্প বটেই, এমনকি, এক যোগবিভূতির কিংবদন্তী বাদ দিলে, শুধু আধিদৈবিক উৎপাতই তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় না, নিজের দেহবিকারেও সে সদাসর্ব্বদা অস্থির। ফলত বিবর্ত্তনে মনের আদিম অদ্বৈত ঘুচিয়ে সে আজ অচৈতন্যের উপরে চাপিয়েছে আত্মবিপর্য্যয়ের তত্ত্বাবধান আর চৈতন্যকে নিযুক্ত করেছে অবস্থান্তরের নিয়মনিরূপণে; এবং তার বিশ্বাস যে বুদ্ধির দিগ্বিজয়ে বাধা না পড়লে, সে অচিরে বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যে এ-রকম এক কার্য্যকারণশৃঙ্খলার সন্ধান পাবে যে চরাচরের ওলট-পালট আর তাকে প্রাণে মারবে না, ভবিষ্যতের সংসারযাত্রাও তার মন জুগিয়েই চলবে। বলাই বাহুল্য তার এ-আশা একেবারে বিফলে যায়নি। বহিঃ-প্রকৃতি যদিও কোনোদিনই তার কাল্পনিক হেতুবাদের তোয়াক্কা রাখে না, তবু বারম্বার ঠেকে ঠেকে সে এখন প্রকৃতির ধরণ-ধারণ অল্প-বিস্তর বুঝতে শিখেছে; এবং এই অনিশ্চয় অভিজ্ঞতার কল্যাণে তার সভ্যতাও আপাতত সমৃদ্ধ। কিন্তু এত ভুগেও তার স্বভাব শোধরায়নি, তার অন্তরস্থ পুরাণ পুরুষ বিপ্লবে ঠিক আগের মতোই সন্ত্রস্ত; এবং থামা অসম্ভব ব'লে, এই আতঙ্ক সত্ত্বেও যেমন অগত্যা তার পায়ের বিরাম নেই, তেমনি সাধ থাকলেও, অবচেতন প্রতিবন্ধকের প্রতিপক্ষে এগোনো অধিকাংশ মানুষেরই সাধ্যে কুলয় না। এইজন্যেই আধুনিক সমাজে মনোব্যাধির প্রাদুর্ভাব এত বেশি; এবং বিশেষজ্ঞদের মতে হিষ্টিরিয়া শুধু অবলাদের প্রবলাস্ত্র নয়, অনেক সময়ে পুরুষের কাছেও রোগের ভাণ স্থিতিস্থাপকতার চেয়ে অধিক প্রীতিকর।

এত দূর পর্য্যন্ত মনোবিজ্ঞানীদের প্রায় বিবাদ নেই। কিন্তু ফ্রয়েড্ নিজে এখানে থামতে অনিচ্ছুক। তিনি যেহেতু তত্ত্বত জড়বাদী, তাই তাঁর বিশ্বাস যে জড়সম্ভূত জীবের মধ্যে নিশ্চেষ্টাসংরক্ষণের পৈতৃক প্রবৃত্তি স্বধর্ম্মানুযায়ী আত্মরক্ষার অগ্রগণ্য। অর্থাৎ তাঁর বিবেচনায় আধি-ব্যাধির মানস গ্রন্থি কোন্ ছার, ম'রেও মানুষ বর্ত্তমান থেকে পালিয়ে অতীতের অঙ্কে বিশ্রাম চায়; এবং এই মুমূর্ষাকে তিনি

কেবল নৈরাশ্যের চরম অভিব্যক্তি হিসাবে দেখেন না ; রিরংসার মতো জিজীবিষু প্রবৃত্তিও মৃত্যুকামনার সংক্রাম কাটাতে পারে না ব'লেই, প্রণয়ীরা ধর্ষণ আর মর্ষণ—এই দ্বিবিধ রতির দোটানায় রাত্রি-দিন উদ্ব্যস্ত। অবশ্য মনস্তত্ত্ব এখনো বিজ্ঞান-পদবাচ্য নয় ; এবং প্রেম ও ঘৃণার স্বতোবিরোধী সমন্বয় সম্প্রতি সে-শাস্ত্রে স্বীকৃত হলেও, উক্ত ধ্রুবদ্বয় এ যাবৎ একাধারে শুধু কাব্য-নাটকেরই আশ্রয় জুগিয়েছে। কিন্তু কবিকল্পনা-সম্বন্ধে বুদ্ধিমানের অবজ্ঞা অনুচিত ; এবং কল্পনার নির্দেশ ন্যায়ের বিধান মানুক বা না মানুক, বাস্তব জগতের প্রতি কবির পক্ষপাত আসলে হয়তো বৈজ্ঞানিকদের চেয়ে বেশি। অন্ততপক্ষে ভূয়োদর্শী নৃতত্ত্ববিদও এ-প্রসঙ্গে ভাব-প্রবর্ত্তিম কবির সঙ্গে একমত যে যুদ্ধ আর পুত্রেষ্টির আনুষ্ঠানিক সাদৃশ্য যেকালে সুস্পষ্ট, তখন সে-দুই প্রকরণের প্রেরণাও খুব সম্ভব অভিন্ন ; এবং ফ্রয়েড্-এর মনে বিন্দু-বিসর্গ সন্দেহ নেই যে অবচেতনের নৈরাজ্যে একাধিক স্বতোবিরোধ একত্রে বিদ্যমান।

তাহলেও স্বতোবিরোধের অস্তিত্বস্বীকার শক্ত ; এবং যাঁরা স্থান-কাল-পাত্রের অতীত ভূমানন্দে অনধিকারী, তাঁদের অভিজ্ঞতায় যত বৈষম্যই থাক না কেন, তাতে তর্কশাস্ত্রের প্রথম নিষেধ বিনা ব্যতিক্রমে মর্য্যাদা পেয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও অবশ্যমান্য যে ব্রহ্মবিদ্যাই নেতিবাদের একমাত্র পরিণতি ; এবং যেহেতু নিয়মানুবর্ত্তিতা ব্রহ্মোপলব্ধির মতো শুধু অগতির গতি না হয়ে অনেক সময়েই অভিষ্টসিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়, তাই অবৈধতার অভাবে বিধানপ্রমাণের চেষ্টা অনুপকারী। সেজন্যে সদর্থক সাক্ষ্যের প্রয়োজন ; এবং নিয়ম আর নিষেধের পারস্পরিক মুখাপেক্ষা তো সন্দেহজনক বটেই, এমনকি নিয়ম ও দৃষ্টান্তের সম্পর্কও শৌণ্ডিক আর মাতালের সুপরিচিত সহযোগের সঙ্গেই তুলনীয়। সুতরাং অব্যবস্থার অবর্ত্তমানে ব্যবস্থার ব্যাপ্তি দেখা হঠকারিতার পরাকাষ্ঠা ; এবং নিয়ম-সম্বন্ধে নিরুক্তি কেবল তখনই সম্ভব, যখন দৃষ্টান্ত বা বৈপরীত্য নয়, কোনো সামান্য বিধান থেকে নাতিপ্রশস্ত বিধিতে অবরোহণ সহজ ও সুকর। দুঃখের বিষয় ন্যায়শাস্ত্রের মূল সূত্র তিনটি এ-রকম কোনো সাধারণ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় ; এবং সেই কারণে অবিরোধকে অভিজ্ঞতার অপরিহার্য্য লক্ষণ ব'লে বুঝেও আমরা মরমীদের প্রলাপে অর্থ খুঁজি।

সুতরাং স্বতোবিরোধ না হোক, অন্তত বিরোধের সঙ্গে মানুষমাত্রেই সুপরিচিত ; এবং আমরণ জীবনের ধাক্কা খেলেও, সে যদিও সংঘর্ষের মধ্যে অস্তি-নাস্তির তাৎকাল্য মানতে বাধ্য নয়, তবু একবার ভাবতে বসলে, সে আর অস্বীকার

করে না যে সদসদের বিকল্প ব্যতীত প্রাণযাত্রা অচল। সময়ে বিরোধে তার ভয় ভাঙে; এবং সে ইতিহাস প'ড়ে বোঝে যে স্বতোবিরোধ সুদ্ধ অস্থায়ী। অর্থাৎ জিজ্ঞাসুর অনভিজ্ঞতা বা নির্বুদ্ধির দরুন আজ যে সমস্যাকে অগভীর দৃষ্টিতে স্বতোবিরোধী লাগে, কাল জ্ঞান বাড়লে, তার ন্যায্য সমাধানে আর তিলার্দ্ধ সংশয় থাকে না। তখন হঠাৎ তার নিরাশা দুরাশায় বদলায়; এবং বর্ত্তমানের ভাবনা ভুলে সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে তাকিয়ে ভাবে যে সে না টিঁকলেও, সভ্যতার প্রগতি কোনোদিনই থামবে না, আধুনিক প্রতর্ক আগামী প্রমিতির প্রসাদ পাবে। তার পর কী ঘটবে, তা আর নিছক কল্পনাবিলাসের গোচরে আসে না। কাজেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীর দ্বারে অগত্যা ধর্ণা দিতে হয়; এবং সে-দৈবজ্ঞের কথায় শুভবাদের উপজীব্য জোটে না, জানা যায় যে এণ্ট্রোপি-র চক্রবৃদ্ধি জগৎসংসারকে প্রলয়ের দিকে পাঠাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কানে বাজে বিশ্ববিকীরণের ধ্বংসতীব্র আকাশবাণী; এবং তারই তালে তালে চলে পরমাণুর খেয়ালী তাণ্ডব, যাতে য়ুরেনীয়ম্ সীসায় না নেমে নিঃশ্বাস নেয় না। অবশেষে উদ্বর্ত্তনের সমর্থনে ডাক পড়ে জীবলোকের। কিন্তু সেখানেও কোনো আশ্বাস মেলে না; প্রাণিবিদ্যা শেখায় যে অভিব্যক্তির উৎস এখনো শূন্যে না মিশলেও, জাতিবিশেষের বেলায় ক্ষয়ই এ যাঁবৎ জিতেছে।

অনন্তর প্রগতির সঙ্গে প্রকৃতির অহি-নকুল-সম্বন্ধ আর ঢাকা থাকে না; এবং প্রথমে প্রতিবেশপরাজয়ের অভিলাষ পোষণ ক'রে ক্রমশ আমরা যখন বুঝতে পারি যে শীতের প্রকোপে আপাদমস্তক রোমশ পরিচ্ছদে মুড়ে আমরা উন্নতির শিখরে উঠছি না, বিবর্ত্তনের সোপানমার্গে প্রয়োজনমতো ধাপ কয়েক নেমে আসছি, তখন বুদ্ধিগত বিরোধকে আর সাময়িক লাগে না, দেখা যায় যে মানুষী চিন্তার মুষ্টিমেয় পদার্থ-প্রত্যয়াদি চিরনির্দ্দিষ্ট ব'লেই, প্রবর্দ্ধমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগ ব্যাসকূটের রঙ্গভূমি। অবশ্য তৎসত্ত্বেও ফলিত বিজ্ঞানের প্রসার থামে না; এমনকি প্রতিযোগী অর্থাপত্তির আপত্তি-বিপত্তিও মনীষার যোগাযোগে নাকি ক্বচিৎ-কদাচিৎ মেটে; এবং উদাহরণত উল্লিখিত হয় আলোকের স্বরূপ-সম্বন্ধে কণাবাদীদের সঙ্গে তরঙ্গধর্ম্মীদের বাদ-বিতণ্ডা, যার মীমাংসা ক'রে লুই দ ব্রোগ্লি আজ বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু এ-রকম পরিকল্পনার দ্বারা গণিতের মান যতই বাড়ুক না কেন, অণু আর ঊর্ম্মির বাস্তবিক সাযুজ্য কিছুমাত্র এগোয় না, বরং আমার মতো মূর্খের মনে স্বতই সন্দেহ জাগে যে সমুৎপন্ন সর্ব্বনাশে আধুনিক পণ্ডিতেরা আর অর্দ্ধত্যাগে নিস্তার পান না, চিরাচরিত প্রথায় সমস্যার সমাধান অসম্ভব ভেবে সমস্যার সঙ্গে গতানুগতিক কাণ্ডজ্ঞানকেও যথাসত্বর ঝেড়ে ফেলেন।

সে যাই হোক, য়ুং-এর মতো স্থিতপ্রজ্ঞের মতেও বিরোধভঞ্জনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম ; এবং যারা দারুণ দ্বিধায় দিশা হারিয়ে তাঁর কাছে পরামর্শ চায়, তাদের তিনি অধ্যবসায়ের শত নাম শোনান না, অবিলম্বে সে-দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যত্র তাকাবার উপদেশ দেন। কারণ তাঁর ধ্যানলব্ধ সিদ্ধান্তের সঙ্গে পাভ্‌লোভ্‌-এর প্রয়োগপ্রতিষ্ঠ অনুমানের এখানে কোনো বৈষম্য নেই যে ব্যক্তি আধিজৈবিক প্রয়োজনের নিমিত্তমাত্র ; এবং সেইজন্যে তার বিশ্ববীক্ষার প্রতীকাদি এক দিকে যেমন নির্ব্বিকার তেমনি অন্য দিকে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাতন্ত্র্য অবস্থাবিশেষে অধিকারভেদের শাসনমুক্ত। নচেৎ স্যুরিখ্‌-এর কূপমণ্ডূকেরা তদ্‌গতচিত্তে ছবি আঁকতে গিয়ে তিব্বতী অলাতচক্রে ঘুরে মরতো না ; নতুবা খাদ্যের পরিবর্ত্তে রঙীন আলো দেখে কুকুরের জিহ্বায় লালা ঝরতো না ; নয়তো আমের বীজে জাম জন্মাতো, ভিন্ন জাতির নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রী ভিন্ন আকার ধরতো, সীজার-নেপোলিয়ন্‌-এর অনুকরণ ছেড়ে মুসোলীনি পেতো আত্মসমাহিতির প্রয়াস। কিন্তু সোহংবাদের প্রাচীনতা সত্ত্বেও নিঃসম্পর্ক নূতন ইহলোকে দুর্লভ ; এবং এই অনেকান্ত পৃথিবীর যোগসূত্র যদিও কাকতালীয় ন্যায়ের চেয়ে দৃঢ়তর নয়, তবু ইতিহাস পুনরুক্তিময় ব'লেই, স্বদেশপ্রত্যাখ্যাত প্রবক্তারা অন্তত বিদেশে সমাদর কুড়োয়। আসলে পূর্ণতা ও সত্তার ব্যতিহার-সম্বন্ধে খৃষ্টান দার্শনিকদের নিঃসংশয় হয়তো একেবারে অমূলক নয় ; এবং আমানুষ প্রাণী স্বভাবত ইষ্টানিষ্টের পার্থক্য না চিন্‌লে, তার পাট তো ইতিপূর্ব্বে উঠতোই, এমনকি বহিঃপ্রকৃতিও এত দিন তার প্রাক্তন প্রবৃত্তির সঙ্গে তাল রেখে না চললে, সে নিশ্চয়ই নিমেষের বেশি টিঁকতো না।

দুর্ভাগ্যবশত স্বভাব প্রায়ই অচেতন ; এবং মজ্জাগত অনীহার অঙ্গীকার শুধু আমাদের আত্মপ্রসাদেই বাজে না, আমাদের দেহধর্ম্মেও বাধে। কাজেই পারেতো মানুষের অধিকাংশ ক্রিয়া-কর্ম্মে অসঙ্গতির লীলা দেখেছেন ; এবং তাঁর মতে একা বিজ্ঞানই যেহেতু উদ্দেশ্য, উৎপত্তি ও উপলক্ষ্যের সামঞ্জস্য সাধে, তাই শুধু সেই চর্চ্চাকে তিনি অযৌক্তিকের এলাকায় আনেন নি। অবশ্য পারেতো এমনি অন্তর্মুখী ছিলেন যে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত বেঁচেও বিজ্ঞানের শোচনীয় পরিণাম তাঁর চোখে পড়ে নি, তিনি বুঝেও বোঝেন নি যে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার জন্যে জন্মে বিজ্ঞান যদি অজ্ঞাতসারে মৃত্যুর মন জোগাতে গিয়ে সারা সভ্যতার সঙ্গে মরে, তবে অন্যায় উপাধি সর্ব্বাগ্রে তারই প্রাপ্য। কিন্তু সামাজিক কার্য্যকলাপের জাতি-বিচারে তিনি অনুরূপ আরো অনেক ভুল করেছেন ব'লেই, তাঁর মূল প্রতিপাদ্য অসার্থক নয় ; এবং তাঁর মতো অহংসর্ব্বস্ব হলে, আমরাও মানবো না বটে যে

আমাদের অদ্বিতীয় অভিমত পূর্ব্বসূরিদের প্রতিধ্বনি, তবু তাঁর মতো দিব্যদৃষ্টি থাকলে, আমরা নিশ্চয়ই জানবো যে ব্যক্তি তথা গোষ্ঠীর আচার-ব্যবহারে যুগে যুগে পরিবর্ত্তন ঘটলেও, তার সংস্কার কোনোকালেই বদলায় না। কারণ এই সংস্কার বা "রেসিডিউ" অহৈতুক, লক্ষ্যহীন বা স্বগত ; এবং মানুষ এরই প্রেরণায় চল্‌লেও, তার কার্য্যক্রম এর দ্বারা ধার্য্য নয়, শুধু তার মানস প্রতিক্রিয়াই এর আজ্ঞাধীন। অর্থাৎ একই সংস্কারের বশে নানা মানুষ নানা কাজে লাগে ; কেউ ভাবে ডাইনীদের না পোড়ালে, দেশের, দশের মঙ্গল নেই, কেউ ধ'রে নেয় নিরীহ-নিগ্রহের নিপীড়নই হিতৈষণার আত্মকৃত্য ; এবং উভয়ত্রই এই কুসংস্কার প্রকাশ পায় যে অকল্যাণ একটা সাময়িক উৎপাত যার প্রতিবিধান শক্তিমানের ইচ্ছাসাপেক্ষ।

এই সংস্কার ছয় পর্য্যায়ের অন্তর্গত ; এবং মৌরসী সমাজব্যবস্থার পক্ষে সেগুলোর প্রত্যেকটাই অপরিহার্য্য বটে, কিন্তু গোটাকয়েক আপাতত পরস্পর-বিরোধী ব'লে, সব কটাকে একসঙ্গে একজনের মধ্যে মেলে না। ফলে কোনো সমাজই চিরকাল টিঁকে নি ; এবং শুধু তাই নয়, সমস্ত সংস্কারের একত্র সমাবেশ যেকালে অসম্ভব, তখন সমাজমাত্রেই অনিকামত শ্রেণিবিভক্ত আর শ্রেণিবিশেষের প্রাধান্য স্বভাবত স্বল্পায়ু। কারণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আবশ্যিক পারম্পর্য্যে একটা সংস্কার কিছু দিন চললে, তার বিপরীত সংস্কার তো আপনা থেকে জাগেই, উপরন্তু সমাজপতিরা যেহেতু অমর নয় এবং প্রতিভাবানের ঔরসেও নিষ্প্রতিভ সন্তান জন্মায়, তাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে আজ যে-দল জেতে, নিসর্গের স্বয়ম্বরসভায় কাল আর তার মাল্য জোটে না ; এবং তখন সে যদি নিজের অক্ষমতা মেনে নিয়ে অপাংক্তেয়দের স্বপক্ষে স্থান দেয়, তবেই তার মঙ্গল, নচেৎ আসন্ন কুরুক্ষেত্রে তার সপরিবার নিপাত নিশ্চিত। এই কথাকেই ঘুরিয়ে বলা যায় যে এক আদর্শ সমাজ ব্যতীত অন্য কোথাও বিস্তারের ইচ্ছা আর সংরক্ষণের প্রবৃত্তি—এই অন্যোন্যবিমুখ প্রাথমিক সংস্কার-দুটো যুগপৎ কার্য্যকর নয় ; এবং সাধারণত রাষ্ট্রপরিচালকেরা হয় এত সাবধান যে আত্মীয়ের অসারতা দেখেও তাঁরা তাঁদের ক্ষাত্র দুর্গে অন্ত্যজের প্রবেশ অপছন্দ করেন, নয় এমন বৈশ্যভাবাপন্ন যে শত্রু আগত জেনেও তাঁরা তাঁদের খোলা হাটে বেড়া লাগান না। সেইজন্যে বিপ্লবের রক্তগঙ্গায় আভিজাতিক শাসকগোষ্ঠীকে ডুবিয়েও মনুষ্যসংসার প্রজাতন্ত্রে এসে কূল পায় না, গণনায়কদের বেবন্দোবস্তে একাধিক যুদ্ধবিগ্রহে হেরে আবার স্বৈরাচারীর আশ্রয় চায় ; এবং আমাদের সাময়িক অভিভাবকেরা প্রতিবার শক্তিহস্তান্তরের আগে ও পরে

জনহিতের ডঙ্কা পিটলেও, এই নিরন্তর পরিবর্ত্তন সর্ব্বসম্মতির অপেক্ষা রাখে না, কেবল একাগ্র অনুচরদের প্রতি পক্ষপাত দেখায়।

এমনকি বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গলও একটা কথার কথা ; এবং শুভবুদ্ধির সঙ্গে আত্মম্ভরিতার সম্পর্ক এত নিকট যে অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্য-ব্যতিরেকে ইষ্টানিষ্টের বিচার পারেতো-র বিদ্রূপ জাগাতো। কিন্তু গণিতের পদ্ধতি যতই নিরপেক্ষ হোক না কেন, তার প্রয়োগ নির্ব্বিকল্প নয় ; এবং সেইজন্যে তার নির্দ্দেশেও বিবিধ সমাজব্যবস্থার মধ্যে কোনো একটার নির্ব্বাচন অসম্ভব, সে-উপায়ে হয়তো কেবল এইটুকুই জানা যায় যে উপস্থিত বিধান ভবিষ্যতে কেমন দাঁড়াবে। অর্থাৎ ভালো-মন্দের বাছাই ন্যায়াতিরিক্ত ব্যাপার, সেখানে বিবেক-নামক ব্যক্তিগত খেয়ালই সর্ব্বেসর্ব্বা ; এবং সমাজতত্ত্ব যেকালে প্রামাণিক বিজ্ঞানের পদপ্রার্থী, তখন কোনো রকম হার্দ্দ্য বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়া তার উচিত নয়, কোন্ সমাজের উপকারিতা কতখানি—সে-প্রসঙ্গ অমীমাংসিত রেখে, সমাজবিশেষের উপযোগিতা কোথায় ও কিসে—সেই আলোচনায় মনোনিবেশই তার একমাত্র কর্ত্তব্য। পারেতো-র বিবেচনায় উক্ত গুণ-দুটির সমীকরণ প্রায় অসাধ্য। অন্ততপক্ষে রাষ্ট্র যত দিন সাম্প্রদায়িক আধিপত্যের শ্রীক্ষেত্র থাকবে, তত দিন পর্য্যন্ত আমরা শেষোক্ত গুণের বিচারেই আবদ্ধ। কারণ এই উপযোগিতার নিকষ প্রজারঞ্জনের ব্যাপকতায় নয়, এর পরিমাণ অন্যান্য সমাজের অনুপাতে সমাজবিশেষের প্রবলতর অস্ত্র-শস্ত্রে বা প্রশস্ততর বাণিজ্যে। প্রথমটার সম্বন্ধে এ-ধরণের বহিরাশ্রিত হিসাবনিকাশ একেবারেই অচল ; এবং কেন অচল, তা বোঝার জন্যে নানা মুনির নানা মত কিম্বা ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি ইত্যাদি প্রবাদবাক্যগুলো স্মরণীয় নয়, শুধু এইটুকু ভেবে দেখলেই যথেষ্ট হবে যে কোনো অঞ্চলের প্রজননবৃদ্ধি আবশ্যক না অনাবশ্যক—এই শাশ্বত সমস্যারও সনাতন সমাধান নেই এবং রাষ্ট্র যুদ্ধব্যবসায়ীদের কবলে পড়লে, যেমন এ-প্রশ্নের উত্তর—হাঁ, তেমনি রাজদণ্ড শ্রেষ্ঠীদের হাতে এলে, এর জবাব—না। অতএব মানবচৈতন্য সদাসর্ব্বদা উভয়-সঙ্কটের সম্মুখীন ; এবং উভয়সঙ্কট স্বভাবতই গতিপরিপন্থী ব'লে, মানুষের সংস্কার শত সহস্র বৎসর ধ'রে নির্ব্বিকার রয়েছে।

পারেতো-র জন্ম ও মৃত্যু, দুই দুটো রাষ্ট্রবিপ্লবের অব্যবহিত আগে আর পরে ; এবং পিতা-পুত্রের অনিবার্য্য বৈপরীত্যের ফলে তিনি আজীবন মাৎসীনি-মার্কা উদারনীতির বিপক্ষে কলম চালিয়ে শেষ কালে যেহেতু বাহুবলের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে বিস্তর বাক্যব্যয় করেছিলেন, তাই এক দিকে যেমন ফাশিষ্ট্‌রা তাঁর প্রশংসায়

শতমুখ, তেমনি অন্য দিকে তিনি বামাচারীদের চক্ষুশূল। কিন্তু রাসেল্-এর মতে মানুষমাত্রেই যখন ঝোঁকের মাথায় হাঙ্গাম বাধিয়ে বুদ্ধির সাহায্যে সে-গোলোযোগ মেটাতে চায়, তখন একদেশদর্শী ভিন্ন আর কেউই ভাববেন না যে রাজনৈতিক পক্ষপাতের স্পর্শদোষ একা পারেতো-র সমাজতত্ত্বেই বর্ত্তমান; এবং জ্ঞানপাপী হেগেল্ যদি ধ্রুব স্বৈরাচারের ডায়ালেক্‌টিক্ আবশ্যিকতা দেখিয়েও শুধু তত্ত্বের জোরে গুরুবাদী বিপ্লবীদের পূজা পেতে পারেন, তবে তথ্যের গুণে পারেতো-ও নিশ্চয় সদাশয়ীদের প্রণিধানযোগ্য। উপরন্তু তিনি আসলে ফাশিষ্ট্ নৃশংসতার অগ্রদূত নন, পরিবর্জ্জিত মনুষ্যধর্ম্মের অন্তিম মুখপাত্র; এবং মনুষ্যধর্ম্ম পশ্চিমাকাশেই অস্ত গিয়েছিলো বটে, কিন্তু তার উদয় খুব সম্ভব প্রাচ্যে। অন্ততপক্ষে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মতো বৌদ্ধ ভাবুকেরাও বুঝেছিলেন যে জীবের বিবর্ত্তন অনিবার্য্য ব'লেই, তার বৃত্তি অস্থায়ী নয়, বরং বৃত্তি না থাকলে সংসারযাত্রায় ঘন ঘন পূর্ণচ্ছেদ পড়তো, কেউই কখনো প্রতীত্যসমুৎপাদের চেষ্টায় মাথা ঘামাতো না, এবং হয়তো সেইজন্যেই তাঁরা সত্য ও শুভের অলৌকিক আদর্শে আস্থা হারিয়ে সক্রেটিস্-এর সঙ্গে সমস্বরে মেনেছিলেন যে শ্রেয়োবোধ প্রত্যেকের মধ্যে বদ্ধমূল, চিত্তশুদ্ধির অভাবেই তা আমাদের গোচরে আসে না। আমার বিশ্বাস পারেতো-র "রেসিডিউ" এই বৃত্তিরই নামান্তর; কারণ বৃত্তির ন্যায় "রেসিডিউ"-ও মানস জগতের স্বতঃসিদ্ধ আদিভূত।

কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় সম্প্রতি লিখেছেন যে ফাশিষ্ট্ রাষ্ট্র মুমূর্ষু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শেষ আস্ফালন হলেও ফাশিষ্ট্ দর্শন নাকি বেদ-বেদান্তের সমবয়সী; এবং কিছু কাল পূর্ব্বে অধ্যাপক ক্রস্‌ম্যান্ দেখিয়েছিলেন যে আসলে প্লেটো-ই এই অনর্থের জন্মদাতা। সুতরাং পারেতো-র প্রায়শ্চিত্তে গ্রীক্ বা বৌদ্ধ মনীষীদের ডেকে আনা হয়তো সঙ্গত নয়, স্বয়ং মার্ক্‌স্-এর শরণ নেওয়াই সমীচীন; এবং উপসংহারে এঁদের যতই অমিল থাক না কেন, অন্তত উপক্রমণিকায় উভয়েই বোধহয় একমত। কারণ মার্ক্‌স্-এর মতো পারেতো-ও বুঝেছিলেন যে ধনবিজ্ঞানই সমাজজীবনের একমাত্র নিয়ন্তা; এবং সেই হেতুপ্রভব বিদ্যার সংজ্ঞা-সম্পর্কে তাঁদের পার্থক্য যদিও সুপ্রকট, তবু অর্থনীতির আনুকূল্যেই যে শাসকবর্গ ক্ষমতাশালী—এ-বিষয়ে কোনো পক্ষেরই সন্দেহ ছিল না। ফলত তাঁরা দুজনেই অহিংসার নিন্দা রটিয়েছেন; এবং তাঁদের বিবেচনায় অর্থনীতি যেহেতু প্রাকৃতিক নিয়মেরই প্রকারভেদ, তাই উৎপাদিকাশক্তির হস্তান্তরে রক্তপাত তাঁদের কাছে দূষণীয় ঠেকে নি। অবশ্য সে-আদ্যাশক্তি কী রকম, জড় বা চেতন—কোন্ বিশেষণ তার প্রাপ্য,

তাতে পরিবর্ত্তন না প্রগতি—কিসের সাক্ষ্য মেলে, এ-সব প্রসঙ্গে তাঁরা আপাতত বিপরীতগামী ; এবং মার্ক্‌স্ যেখানে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রচারক, পারেতো সেখানে অবাধ প্রতিযোগের পতাকাবাহী। কিন্তু মার্ক্‌স্-এর বিরুদ্ধে বাকুনিন্-এর অন্যতম অভিযোগ এই যে তিনি বাহ্যত সাম্যবাদের প্রতি পক্ষপাত দেখালেও, তাঁর উপদেশে কান পাতলে ষ্টেট্ সোশ্যালিজ্‌ম্-এর সাধারণ স্বত্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে পিষে মারবে ; এবং পারেতো মুখে স্বপ্রাধান্যের গুণ গাইলেও, সর্ব্বগ্রাসী ফাশিষ্ট্ রাষ্ট্র যে তাঁরই আদর্শসম্ভূত, এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা উদারনীতিকদের মধ্যে খুবই সুলভ। অপরন্তু উন্নয়নে আস্থা স্বত্ত্বেও মার্ক্‌স্-এর জিহ্বায় যেমন ভবিষ্যদ্বাণী আটকায় নি, তেমনি কর্ম্মকাণ্ড থেকে কার্য্যকারণের বালাই চুকিয়েও পারেতো স্বসমুত্থবাদে পৌঁছন নি, সমাজতত্ত্বই লিখে গেছেন।

অর্থাৎ প্রকাশ্যে না হোক, অন্তত প্রকারান্তরে মার্ক্‌স্-ও বৃত্তির দুর্মরতা মেনে নিয়েছিলেন ; এবং তৎসত্ত্বেও তিনি যদিচ প্রগতির অস্বীকার কর্ত্তব্য মনে করেন নি, তবু নিশ্চয় এই বিশ্বাস থেকেই তাঁর বিরাট মতবাদের সূত্রপাত যে সভ্যতার প্রত্যেক পর্য্যায়েই মানুষ একই প্রয়োজনের দাস ; কিন্তু সেই প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় অন্যের আয়ত্তে ব'লে, সমানাধিকার নৈরাজ্যবাদের আগে সে কোনোমতেই থামতে পারবে না। উপরন্তু উক্ত কৈবল্যপ্রাপ্তির দিন-ক্ষণ অঙ্কশাস্ত্রের ধার ধারে না বটে, কিন্তু তার অবিশ্যিকতা কায়মনোবাক্যে না বুঝলে, মনুষ্যজাতির উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী ; এবং মার্ক্‌স্-এর অনুসারে এই অভ্রান্ত দূরদৃষ্টি শুধু তাঁর ন্যায়-পরায়ণতার পরিচায়ক নয়, তাঁর বস্তুনিষ্ঠাও তাঁকে অন্য কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দেয় না। কারণ নিজের সম্বন্ধে মানুষের যত উচ্চ ধারণাই থাক না কেন, সাবধানে ইতিহাস পড়লে অবিলম্বে দেখা যায় যে তার আত্মিক সম্পদ বা ভাবের ঔদার্য্য তার ঐহিক অবস্থার উৎকর্ষ বাড়ায় নি, বরং তার ধনোৎপাদনপদ্ধতি ও পণ্যবিনিময়ের প্রথা তার বুদ্ধি ও ব্যুৎপত্তির সঙ্কোচ ঘুচিয়েছে। সুতরাং বিপ্লবের হেতু মনীষীদের শ্রেয়োবোধে বা দার্শনিকদের জীবনবেদে অন্বেষ্টব্য নয়, তার কার্য্যকারণশৃঙ্খলা দ্রষ্টব্য তখনকার ধনবণ্টনে কিম্বা তদানীন্তন অর্থশাস্ত্রে। আসলে প্রচলিত বিধি-বন্দোবস্তে যখনই আমাদের আস্থা ঘোচে, তখনই ধরা পড়ে যে নূতন ধনোৎপাদন তথা পণ্যবিনিময় পদ্ধতির সঙ্গে গতানুগতিক সমাজ ব্যবস্থার তাল কেটেছে ; এবং মানুষের বিবেক বা বোধি এই বিরোধ-নিরাকরণের উপায় জানে না, যে-অবস্থান্তরের ফলে বিরোধবিশেষের উৎপত্তি তার মধ্যেই সামঞ্জস্যসাধনের প্রকরণও মেলে। এমনকি যে-ব্যক্তি বা সম্প্রদায়

এই নিত্য সংঘাতের নিমিত্ত, শান্তি তার সাধ বা সাধ্যের তোয়াক্কা রাখে না, উৎপাদিকাশক্তি আর উৎপাদনপ্রণালীর অসঙ্গতি যেমন অতিমানুষিক, উভয়ের সন্ধিও তেমনি বস্তুজাত। আমাদের ভাবনা-বেদনা খুব জোর সেই প্রাকৃত ডায়ালেক্‌টিকের মুকুরমাত্র; এবং সেইজন্যে অবরোহী চিন্তার দ্বারা সে-নিয়মের আবিষ্কার সম্ভবপর নয়, ঘটনানিয়ন্ত্রিত আরোহী অভিজ্ঞতাই বার বার ঠেকে তাকে চিনতে শেখে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে মার্ক্‌স্ জড়বাদী না জীববাদী, কিম্বা তাঁর সম্বন্ধে রাসেল্-এর অনুমানই সত্য এবং তিনি ডিউই-প্রচারিত উপযোগবাদের আদিপুরুষ, এ-সমস্ত সমস্যার উত্থাপন ও সমাধান বর্ত্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক। এখানে আমার এইটুকই বক্তব্য যে বিষয়-সম্পর্কে তাঁর আর বর্ক্‌লি-র সিদ্ধান্ত যতই এক রকম শোনাক না কেন, তত্রাচ বিশ্বব্যাপারে তিনি বিশুদ্ধ চৈতন্যের লীলা-খেলা দেখেন নি, ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাই তাঁর কাছে অবশ্যস্বীকার্য্য ঠেকেছিলো। তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে বিষয় বিষয়ীর প্রভাবে বদলায় বটে, কিন্তু বিষয়ীর কর্ম্মপ্রবর্ত্তনা যেকালে বিষয় থেকেই আসে, তখন তত্ত্বত বিষয়ী গৌণ আর বিষয় মুখ্য; এবং বিষয়ীর সংস্পর্শে বিষয়ের বিকার অনিবার্য্য ব'লে, তার স্বরূপ যদিও কারোই ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তবু তার নির্গুণ সত্তা না মানলে আমাদের এক মুহূর্ত্তও চলে না। এইজন্যেই ফয়ের্বাখ্-এর বিরুদ্ধে গিয়েও মার্ক্‌স্ নিজেকে জড়বাদী আখ্যাই দিয়েছিলেন; এবং তাঁর প্রধান শিষ্যদ্বয় এঙ্গেল্‌স্ ও লেনিন্ বিজ্ঞানবাদের প্রতি গুরুর প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত লক্ষ্য সুদ্ধ করেন নি, জ্ঞানত না হোক, অন্তত অজ্ঞাতসারে মেকিয়াভেলি-র বস্তুপ্রত্যয়কেই বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। কারণ মেকিয়াভেলি-ও ইতিহাসের ভিতরে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ তন্মাত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন; এবং তাই মধ্য যুগের অতিজীবিত সমাজব্যবস্থা তাঁর দুঃসহ লেগেছিলো, তিনি ভজিয়েছিলেন যে ইতিহাসের সাহায্যে উপাধির আপদ কাটিয়ে একবার অব্যয়, অক্ষয় দ্রব্যগুণে পৌঁছতে পারলে, এমন এক আদর্শ রাষ্ট্র আপনা আপনি গ'ড়ে উঠবে যাতে ব্যক্তিত্বের বিসংবাদ থাকবে না, স্বত্বের সংঘর্ষ বাধবে না, ত্রিকালদর্শী পদার্থবিদের নেতৃত্বে ও দ্রব্যের নির্বিশেষ ঐক্যে মানুষ মানুষকে ভাববে ভাই। অর্থাৎ এখানেও সেই বৃত্তিই একেশ্বর; এবং তারই ফলে মেকিয়াভেলি-র বৈশেষিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান একাধারে সাম্য আর স্বাতন্ত্র্যের পরিপোষক, গতি ও স্থিতির মুখাপেক্ষী; তারই ফলে অহিংসায় মেকিয়াভেলি-র অভক্তি মার্ক্‌স্ ও পারেতো-র চেয়ে বেশি বই কম নয়।

সত্য বলতে কী, এ-ধরণের দ্বৈধ জড়বাদীর পক্ষে অনতিক্রম্য ; এবং জীববাদীদের অধিকাংশই যেহেতু ফিশ্‌তে-কীর্ত্তিত আত্মলীলার প্রতিভূকল্প নয়, সার্ব্বকালীন সাধারণ্যের ভুক্তভোগী, তাই তাঁরাও অভিব্যক্তিকে ন্যায়সঙ্গত করতে পারেন নি, ভেবেছেন যে অনুক্রমের নাম জপলেই বুঝি প্রগতির রথ নিরাপদে এগোবে। তাহলেও এ-রকম দার্শনিকদের অনুসারে, সংস্কৃতিবিশেষ কোন্ ছার, সমগ্র মানবসভ্যতা সুদ্ধ প্রাগ্রসর কিনা সন্দেহ ; এবং এঁদের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেকালে মানস ধাতুতে গঠিত আর মন স্বভাবতই পরিণামী, তখন জাগতিক ক্রমবিকাশে মানুষও অপাংক্তেয় নয় বটে, কিন্তু নিরবধি কালের তুলনায় মনুষ্য-জাতির পরমায়ু এতই সংক্ষিপ্ত যে সভ্যতার বিবিধ পর্য্যায়ের মধ্যে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যের চেয়ে অনেক বেশি। অবশ্য তৎসত্ত্বেও হেগেল্ মানুষের ঐকান্তিক বিবর্ত্তনে আস্থা হারান নি, দেখিয়েছিলেন যে সমাজজীবনের আকার-প্রকার যেমন দেশে দেশান্তরে তথা যুগে যুগান্তরে অবিকার থাকে, তেমনি সেই সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যে-উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের উপরে স্থাপিত, তার নিয়ত পরিবর্ত্তন কোনোমতেই থামানো যায় না ; এবং টয়েনবি-র বিশ্বাস যে সভ্যতায় সনাতন জড়প্রকৃতির স্থূল হস্তাবলেপ যতই পরিষ্কার হোক না কেন, তবু বস্তুর অভ্যাঘাতে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া তো চিরনির্দ্দিষ্ট নয়ই, এমনকি বিষয়-বিষয়ীর সম্পর্কে বৈচিত্র্য অনিবার্য্য ব'লেই, একই প্রতিবেশে ভিন্ন যুগের মানুষ ভিন্ন চিৎপ্রকর্ষে পৌঁছতে বাধ্য। কিন্তু এ-কথা মানলেও প্রগতির পূজা আমাদের আদ্যকৃত্য নয় ; এবং তথ্যের গরজে যদি সংস্কৃতির স্তরভেদ স্বীকার্য্যই ঠেকে, তবু সত্যের খাতিরে এমন সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য যে সভ্যতার পর্য্যায়পরম্পরায় কোনো কালাতীত গুণের তারতম্য ধরা পড়ে অথবা সেগুলোর জাতিবিচারে অগ্র-পশ্চাৎ ব্যতীত অপর কোনো পার্থক্য দ্রষ্টব্য।

অন্য সকল সিদ্ধান্ত আপাতত জাত্যভিমানের ফল ; এবং জাত্যভিমান কেবল নাৎসী বিজিগীষারই শনি নয়, দুর্দ্দমনীয় জার্মানির মতো পরাধীন ভারতও নিজেকে সভ্যতার জন্মভূমি ভাবে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সম্প্রতি যেমন মহেঞ্জো-দড়োর খবর শুনেছেন, তেমনি মায়া সংস্কৃতির বার্ত্তাও আর তাঁদের কাছে গোপন নেই ; এবং মিশর আর মায়ার অদ্ভুত সাদৃশ্য সত্ত্বেও, অব্যাহত আদান-প্রদানের অসুবিধা দেখে আমরা যখন সে-দুই ভূখণ্ডের আত্মীয়তা অস্বীকার করি, তখন নীলনদের গভীর কর্দ্দমে সিন্ধু প্রদেশের মুদ্রানুসন্ধান হয় অসাধ্যসাধনের নামান্তর, নয় আত্মপ্রসাদের সাক্ষ্য। আসলে ইতিহাসে কার্য্যকারণশৃঙ্খলার আরোপ

হঠকারিতার পরাকাষ্ঠা ; এবং প্রাচীন পৃথিবীও একেবারে দুর্গম ছিলো না ব'লে, এক স্থানের সামগ্রী পর্য্যটকদের মারফৎ স্থানান্তরে যেতো বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীরা অপরিচিত বস্তুর বা ভাবের যথাযথ ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই শিখতো না, প্রায়ই তাকে নূতন কাজে লাগাতো। উদাহরণত জ্যামিতির পুরাবৃত্তান্ত স্মরণীয় ; এবং অহিন্দু গবেষকদের অনেকেও যদিচ বৈদিক সাহিত্যেই তার সাক্ষাৎ পেয়েছেন, তবু সেই ভূয়োদর্শনের সাহায্যে গ্রীক্‌রা শুধু বেদি বানায়নি, সে-নিষ্প্রমাণ প্রাচ্য বিদ্যার ভিত্তিতে তারা গ'ড়ে তুলেছিলো প্রাশ্চাত্ত্য প্রজ্ঞার অটল কীর্ত্তিস্তম্ভ। হিন্দুস্তানী গাড়ু, ঘটি বা বদ্‌নার ভাগ্যবিপর্য্যয় আরো রোমহর্ষক ; এবং অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ানের সঙ্গে কালাপানি পেরিয়ে সেই লজ্জাকর শুদ্ধিপাত্র আর আঁস্তাকুড়ের এক পাশে প'ড়ে থাকে না, সগৌরবে স্থাপিত হয় ড্রইং রুমের সমুচ্চ শেল্‌ফে। অবশ্য উত্তমর্ণ আর অধমর্ণের এতখানি বৈপরীত্য সর্ব্বত্র চোখে পড়ে না ; দুই পক্ষ যেখানে একই অঞ্চলের বাসিন্দা, সেখানে সমীক্ষার বিস্তার কমালে, একটা ধারাবাহিকতার আভাস মিললেও বা মিলতে পারে ; এবং সেইজন্যেই হোয়াইট্‌হেড্‌-প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞানীরা পশ্চিমের দর্শন-বিজ্ঞানে আজও প্লেটো-র স্বাক্ষর খোঁজেন। কিন্তু এ-কথা তাঁদের মুখেও বাধে যে আধুনিক য়ুরোপ প্লেটোনিক এথেন্স্‌-এর প্রতিচ্ছবি ; এবং ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণের পরেও চীন ও জাপানের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবন যে পরিমাণ স্বকীয়, য়িহুদি-প্রস্তাবিত খৃষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে মুস্‌লিম্‌-প্রচারিত মনুষ্যধর্ম্ম ঢুকিয়ে প্রতীচ্য ততোধিক স্বতন্ত্র।

কারণ জাত্যভিমান্ যতই নিন্দনীয় হোক না কেন, জাতির বৈশিষ্ট্য নিরতিশয় নিশ্চিত ; এবং এই পার্থক্যের কষ্টিপাথরে যদিও উত্তম-অধমের যাচাই চলে না, তবু মানুষের আচার-ব্যবহার তথা মতিগতি এর দ্বারা এতখানি নির্দ্ধারিত যে দেখে শেখা প্রায়ই তার সাধ্যে কুলয় না, সে সাধারণত ঠেকেই শেখে। অথচ সে যেহেতু মানুষ, তাই মানুষী সমস্যার সবগুলোই তাকে আজীবন ঘিরে থাকে ; কেবল সমাধানের বেলায় পরের মুখে ঝাল খাওয়া তার বারণ ; প্রত্যেকটা নিজের বুদ্ধিতে বুঝে, নিজের উপায়ে সকলের দাবি না মেটালে সে নিজেকে সজাগ রাখতে পারে না, জীবন্‌মৃত্যুর অগাধে তলিয়ে যায়। সেইজন্যেই সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন ব্যক্তির বৈষম্যে মন্দা পড়ে, তখন জাতির যৌবনসুলভ তেজ ফুরিয়ে তাকে বর্ত্তায় বার্দ্ধক্যোচিত অনীহা, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের প্রেরণা ভুলে সে মজে স্মৃতির কুহকে, স্বাবলম্বীদের নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে সে ওঠে বসে সংখ্যাধিকের

পরামর্শে ; এবং তার পর প্রতিবেশীদের দৃষ্টান্ত তার গোচরে আসে না, উপযাচকের আবেদন তার কানে ঢোকে না, সে ম'রে প্রেতত্ব পায় আর কণ্ঠহারা ছায়ামূর্ত্তি নিয়ে জীবিতদের সামনে প্রহেলিকার মতো ভেসে বেড়ায়। অন্ততপক্ষে তাই ভিকো-র বিশ্বাস ; এবং সেই বিশ্বাসের পিছনে মনোবিদেরা ভিকো-র নিঃসহায় শৈশব ও অক্ষম জরার খোঁজ পেয়েছেন বটে, কিন্তু গত দু শ বছরের গভীর গবেষণাতেও এমন কোনো অবিসংবাদিত তথ্য বেরোয় নি যার ফলে এলিয়ট্-স্মিথ্-এর "সংস্কৃতিব্যাপন" আজ সর্ব্ববাদিসম্মত। বরঞ্চ সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্বে আমাদের জ্ঞান বাড়ায় আমরা নিঃসংশয়ে জেনেছি যে মানুষের ঐতিহ্যবোধ ইতিহাসের চেয়েও পুরাতন ; এবং "সাফোক্ অস্থিস্তর"-এর উপরে দাঁড়িয়ে ময়র, লীকি প্রভৃতি পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন যে প্লায়োসীন্ যুগেই ডার্ম্‌স্‌ডিনিয়ন্, আইসিনিয়ন্ ও প্রীশেলিয়ন্-নামক তিন-তিনটি সংস্কৃতি বহু সহস্র বৎসর ধ'রে পূর্ব্ব এংলিয়া-তে পাশাপাশি বাস ক'রেও কিছুমাত্র বদলায় নি বা পরস্পরের স্বাতন্ত্র্যে হাত দেয় নি।

উপরন্তু সংস্কৃতির অপেক্ষিকতা শুধু প্রাগিতিহাসের সাক্ষ্যেই গ্রাহ্য নয়, ভিকো-র গুরুবিস্মৃত শিষ্য স্পেংলার সভ্য জাতিদের ইতিহাসেও অনুরূপ অবৈকল্যের সাক্ষাৎ পেয়েছেন ; এবং মুখ্যত পশ্চিমের ও গৌণত প্রাচ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতঃসিদ্ধ সংস্কৃতিধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ক'রে তিনি দেখিয়েছেন যে মানবসভ্যতা কোনো শাখা-প্রশাখা-যুক্ত মহামহীরুহ নয়, তাকে নিরবচ্ছিন্ন কম্বুরেখাতেও আঁকা যায় না, তার একমাত্র উপমান অবচ্ছিন্ন ব্যক্তি, উত্থান-পতন-শীল, যৌবন-জরা-সম্পন্ন স্বল্পায়ু ব্যক্তি এমনকি এ-তুলনাও আংশিক ভাবেই সত্য, এবং বংশরক্ষার ক্ষমতা আছে ব'লে মুমূর্ষু মানুষ যদিচ খানিকটা মৃত্যুঞ্জয়, তবু জাতিগত সভ্যতা সর্ব্বত্রই অপুত্রক, তার মৃত্যু পুরোপুরি বিলুপ্তি। সুতরাং সভ্যতা মণ্ডলাকার ও সীমাবদ্ধ, এবং তার স্বভাব চক্রবর্ত্তী ও আত্মঘাতী। অর্থাৎ তার জীবনের প্রথমার্দ্ধ বর্দ্ধিষ্ণু আর শেষার্দ্ধ ক্ষীয়মাণ ; যেখানে তার যাত্রারম্ভ, সেখানেই তার যাত্রাশেষ ; তার উন্নতি তথা অবনতি একই অন্তঃপ্রেরণার অবশ্যম্ভাবী ফল। স্পেংলারী পরিভাষায় উক্ত আরোহণ-পর্ব্বের নাম সংস্কৃতি আর অবরোহণটা সভ্যতা-অভিধেয় ; এবং তাঁর বিশ্বাস যে এই নাগরদোলার ওঠা-পড়া মনুষ্যজাতির জন্ম থেকে আজ পর্য্যন্ত যেহেতু কোথাও কখনো থামে নি, তাই এর গতিবিধি নিরাসক্ত মনে বুঝে নিলে, সৃষ্টির মূল রহস্য আমাদের কাছে ধরা পড়বে। কারণ কীর্ত্তিমান মনুষ্যগোষ্ঠীর এক একটা এক একটা নক্ষত্রের মতো, যার প্রত্যেকটাই বিকর্ষণগুণে

অন্যদের থেকে একেবারে পৃথক বটে, কিন্তু আচরণে ও আয়তনে তাদের মধ্যে এতখানি সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান যে অপর সকলের প্রতিমান হিসাবে কোনোটাই নগণ্য নয়। শুধু তাই নয়, স্পেংলার-এর মতে সকল সভ্যতার কার্য্যক্রম যেমন এক, তেমনি সেই কার্য্যক্রমের নির্ব্বাহকেরা সমানধর্ম্মী, হয়তো বা আকৃতিতেও অভিন্ন, এবং সেইজন্যে দুটো সভ্যতার সংমিশ্রণ বা অন্তঃপ্রবেশ অনাবশ্যক ও অভাবনীয় হলেও, আবেষ্টনবিশেষের অবরোধে আর পাঁচটা পরিবেশের পরিকল্পনা সার্থক ও সম্ভবপর।

তবে সভ্যতার ব্যষ্টিসমূহ তুল্যমূল্য শুধু সমস্যার দিক থেকে; সমাধানের উপরে জোর দিলে, তাদের বৈচিত্র্য সুপ্রকট; এবং এই প্রভেদ প্রতিপাদনের জন্যে পাউলি-প্রস্তাবিত ব্যাবর্ত্তনবিধির ঐতিহাসিক প্রয়োগ প্রশস্ত নয়, সকল জাতির জীবনেই যদৃচ্ছার চাপ যত সমমাত্রিক হোক না কেন, ভবিতব্যের বিচারে তাদের বৈষম্য স্বতঃপ্রমাণ। এই পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে স্পেংলার প্রাচীনদের বিশ্বাত্মিক পটভূমির সঙ্গে অর্ব্বাচীনদের আধ্যাত্মিক পরিপ্রেক্ষিতের বৈরূপ্য দেখিয়েছেন; এবং তাঁর বিশ্বাস সভ্যতার এ-দুই পর্য্যায়ে অনুরূপ প্রয়োজন আনুষ্ঠানিক সৌসাদৃশ্য ঘটিয়েছে বটে, কিন্তু গ্রীকো-রোমান্‌দের দৈবানুগত্য আর আধুনিক য়ুরোপীয়ানদের স্বাবলম্বন স্বভাবত এতই পরস্পরবিরোধী যে কবিরা উভয়ত্র একই তাগিদে ট্র্যাজেডি লিখলেও সে-দু রকম ট্র্যাজেডির তাৎপর্য্য একেবারে আলাদা। অবশ্য দুটো সম্পূর্ণ সভ্যতাব্যষ্টির বৈপরীত্যও কালাবর্ত্তের বৃত্তাভাস কিনা অথবা ভূত-ভবিষ্যতের সকল সভ্যতাকে পাশাপাশি সাজালে, একটা চিরন্তন উত্থান-পতন ধরা পড়ে কি পড়ে না; সে-সম্বন্ধে স্পেংলার-এর দর্শনে কোনো হঠোক্তি নেই; এবং সারোকিন্-এর বিরাট পাণ্ডিত্য যদিও পারেতো-র প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না পেরে মানুষের অতীত বিবর্ত্তনে একটা একান্তর ছন্দের সন্ধান পেয়েছে, তবু সে-ছন্দের মূল সূত্র জানবে হয়তো মনুষ্যগোষ্ঠীর সর্ব্বশেষ প্রতিনিধি। কিন্তু ইতিমধ্যে রুথ্ বেনিডিক্ট্ প্রাক্‌সভ্য সমাজেও স্বাতন্ত্র্য ও সমগ্রতাই প্রত্যক্ষ করেছেন; এবং তাঁর মতে সেই রেড্ ইণ্ডিয়ান্ রূপক অক্ষরে অক্ষরে সত্য, যাতে প্রত্যেক জাতি একই প্রাণপ্রবাহ থেকে তৃষ্ণার জল তুলেছিলো ঈশ্বরদত্ত বিভিন্ন মৃৎপাত্রে। কারণ মানুষের সামনে অনন্ত সম্ভাবনা খোলা থাক বা না থাক, পরের মুখ চেয়ে বাঁচতে গেলে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের অর্জ্জন তার পক্ষেও আবশ্যিক; এবং আমাদের কণ্ঠ থেকে যত আওয়াজ বেরোয়, আলাপের সময়ে সে-সবগুলোকে কাজে লাগালে যেমন অর্থ-বোধের আশা বিড়ম্বনা, তেমনি শক্যতামাত্রেই শক্তি-রূপে ফুটে উঠলে বাইবেলী

সৃষ্টিবর্ণনার সঙ্গে ভূপঞ্জর বিদ্যার বিবাদ কোনোদিনই বাধতো না, প্রাণিবিজ্ঞানীরাও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে ভাগবত দাক্ষিণ্যেরই গুণ গাইতেন।

মানুষী জ্ঞানের বর্ত্তমান জটিলতায় সে-রকম সারল্য আর পোষণীয় নয় ব'লেই, টয়েনবি-র মতো সাম্যবিলাসীও আজ মান্‌তে বাধ্য যে পরিবেশের ক্রিয়া যদিও সকল জাতির পক্ষে সমান, তবু ক্ষেত্রবিশেষে তার প্রতিক্রিয়া স্বভাবতই পৃথক; এবং সারা পায়ে জুতোর ঘর্ষণ লাগলেও যখন কড়া পড়ে শুধু দু-একটা জায়গায়, সেকালে চার দিক থেকে অনুরূপ আক্রমণ সয়েও ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে তাদের জোর দেখালে বিস্ময়প্রকাশ অসঙ্গত। কেননা জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সাদৃশ্য এখানেও সুপরিস্ফুট; এবং আড্‌লার-এর মতে একই উত্তরাধিকারে জন্মে, একই শিক্ষা পেয়ে দুই ভাই যেমন তাদের নিজস্ব দেহের অসম্পূর্ণতাবশত দু ধরণের মেজাজ বেছে নিয়ে সেই মৌলিক ক্ষতিপূরণের প্রয়াস পায়, তেমনি টয়েন্‌বি-র বিবেচনায় দুটো জাতির বাহ্য পরিমণ্ডলে আপাতত কোনো তারতম্য না থাকলেও তাদের বিশ্ব-বীক্ষায়, তাদের জীবনবেদে, তাদের শ্রেয়োবোধে সারূপ্যের কোনো আভাস মেলে না। তৎসত্ত্বেও টয়েন্‌বি প্রগতিতে আস্থাবান; এবং তাঁর বিচারে সভ্যতার মশাল বারম্বার হাত বদলালেও, প্রত্যেক আলোকপ্রাপ্ত জাতি তাকে আপন আগুনে জ্বালে নি, উদ্বর্ত্তনের কুটিল পথে অগ্রগামীরা বয়সোচিত অবসাদে ধূলোয় লুটলে, কোনো পশ্চাদ্বর্ত্তী তরুণদল ছুটে এসে তাদের বোঝা আরও দু-এক পাক এগিয়ে দিয়েছে। তখন অনুসন্ধানে জানা গেছে যে এই অজ্ঞাতকুলশীল স্বেচ্ছাসেবকেরা পরমায়ুতে ও পরাক্রমে পুরশ্চারীদের সমকক্ষ হলেও, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে এদের সম্বন্ধ যেহেতু অগ্রজদের চেয়ে অনেক বেশি স্থিতিস্থাপক, তাই ক্ষিপ্রতার প্রতিযোগিতায় এদের সাময়িক উৎকর্ষ হয়তো বা অনিবার্য্য। তাহলেও স্থিতিস্থাপকতার সীমা তথা প্রকারভেদ আছে; এবং সম্প্রতি জেরাল্ড্‌ হর্ড্‌ লিখেছেন বটে যে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করতে পেরেই মনুষ্যেতর প্রাণিজগতের প্রাগ্রসর শাখা এখন মনুষ্যপদে প্রতিষ্ঠিত, তবু কীথ্‌-এর ন্যায় সাধারণিক নৃতত্ত্ববিদ্‌ও সৌজাত্যবিদ্যার ঠেলায় আজ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে মানুষের জাতিগত বিভাগ প্রাঙ্‌মানুষিক অনৈক্যের পরিণাম।

বলাই বাহুল্য এই প্রভেদ অতিভৌগোলিক; এবং নিসর্গের নির্দ্দেশ এ-রকম নেতিবাচক যে দ্বৈপায়ন জাতিমাত্রেই নৌবহরে ইংলণ্ডের প্রতিযোগী নয়, শুধু যে-দেশের ত্রিসীমানায় জলের নাম-গন্ধ নেই, সেখানে পোতনির্ম্মাণের প্রয়োজনও স্বভাবত অনুপস্থিত। এমনকি শ্বেত, কৃষ্ণ ও পীত—এই তিন মহাজাতির বিশেষ বিশেষ দৈহিক

দোষ-গুণও যে অন্তর্বিবাহের পরে একাকার হয় না, এমন নিরুক্তি শুধু নাৎসীদেরই সাজে ; এবং যদি তর্কের খাতিরে মানাও যায় যে নীল চোখ, কটা চামড়া, সোনালী চুল ইত্যাদি উপলক্ষণগুলো মেণ্ডেলীয় নিয়মেরই আজ্ঞাধীন, তবু আমাদের বুদ্ধি ও ব্যুৎপত্তি, আমাদের মেধা ও মনীষা যে প্রকৃতির দান নয়, পালনের ফল, এ-বিষয়ে আজ আর বোধহয় খুব বেশি তর্ক-বিতর্ক নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-প্রসঙ্গেও বিশেষজ্ঞেরা একমত যে রক্তের চাতুর্ব্বর্ণ্যে সঙ্করের উদ্ভব অসম্ভব এবং যে-পুরুষানুক্রমিক রোগ মাথার আকৃতি বা নাসার খর্ব্বতার মতো একাধিক ক্রোমোসোম্-এর বশবর্ত্তী, বহির্বিবাহের দ্বারাও তার প্রতিকার দুঃসাধ্য। উপরন্তু সন্তানপোষণের রীতি-নীতি শুধু পিতা-মাতার ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়, তার উপরে প্রতিবেশীদের প্রভাবও যথেষ্ট ; এবং যে-নিগ্রোর মার্কিনে জন্ম, সে যেমন বর্ণবৈষম্য সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গদেরই কুটুম্ব, তেমনি মিশনারী প্রচেষ্টা কাফ্রিদের এখনো সাহেব বানাতে পারে নি, তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান যে-পরিমাণে অনুপকারী, স্বদেশী ইন্দ্রজাল সেই অনুপাতেই মঙ্গলময়। অবশ্য আবহ সকল ক্ষেত্রে সমান ক্ষমতাশালী নয় ; এবং বর্ত্তমান জগতে পশ্চিমের প্রতিপত্তি এত পরিব্যাপ্ত যে প্রবাসী য়ুরোপীয়দের ছেলে-মেয়েরা আপাতত স্বধর্ম্মানুসারেই বেড়ে ওঠে। কিন্তু আজীবন প্রাচ্যে কমঠবৃত্তি বজায় রেখে তারা যখন শেষ বয়সে স্বজনের মাঝে ফেরে, তখন তাদের অনেকেই আর স্বস্তি পায় না, নিজ বাসভূমিতেও তারা কাল কাটায় বিদেশিসুলভ সঙ্কোচে। হয়তো সেইজন্যেই জীববিদ্যার পূর্ব্বাচার্য্যেরা পারিপার্শ্বিককে কুলসংক্রামের উপরে স্থান দিয়েছিলেন ; এবং যান-বাহনের ক্ষিপ্রতায় আর যন্ত্রপাতির আশীর্ব্বাদে পৃথিবীর প্রাথমিক বৈচিত্র্য ক্রমেই মিলিয়ে আসছে বটে, কিন্তু মানুষের শরীরে যত দিন জল-বায়ুর প্রভুত্ব খাটবে, তার ব্যবসা যত দিন সামবায়িক সঙ্কল্পের মুখ চাইবে, তত দিন সে যে কী ক'রে গোষ্ঠীর গণ্ডি খণ্ডাবে, তা অন্তত আমার কাছে দুর্ব্বোধ্য।

অবশ্য আমার বোধশক্তি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ; এবং আমি বুঝি বা না বুঝি, ভূমাবাদী হেগেল্-এর মতো ভূয়োদর্শী মার্ক্স্-ও নির্ভাবনায় রটিয়েছিলেন যে গুণ তো গণনার অমোঘ পরিণতি বটেই, এমনকি পরস্পরবিরোধী পদার্থের সমন্বয় সেধেই সৃষ্টি কৈবল্যের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু মর্য্যাদাবিচারে আমার স্থান উক্ত তত্ত্বজ্ঞদের যত নিচেই হোক না কেন, তবু তাঁদের সিদ্ধান্তও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অথবা অক্ষমতার ফল ; অন্তত পক্ষে তার পিছনে কোনো সর্ব্ববাদিসম্মত যুক্তির সমর্থন নেই ; এবং বিপরীতধর্ম্মী পিতা-মাতার সঙ্গম সন্তান-সম্ভাবনার একমাত্র উপায় ব'লে, যদি

আরিষ্টটেলী তর্কশাস্ত্র অর্ব্বাচীনদের কাছে অস্বীকার্য্যই ঠেকে, তবে অশ্বেতরের ক্লৈব্যও নিশ্চয় ডায়ালেক্‌টিক্‌ ন্যায়দর্শনের পরিপন্থী। হয়তো এ-আপত্তির আশঙ্কা মার্ক্‌স্‌-এর মনেও সতত জাগরূক ছিলো; এবং সেইজন্যেই তিনি কখনো আন্বীক্ষিকী নিয়ে মাথা ঘামান নি, সেই শ্রেণিসংরক্ষিত রহস্যের সামান্যীকরণ শিষ্যদের দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে নিজে ডায়ালেক্‌টিকের ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহে প্রাণপাত করেছিলেন। তবে অত গবেষণার পরেও ডায়ালেক্‌টিকের ঐকান্তিক প্রগতি অদ্যাবধি অপ্রমাণিত রয়েছে; এবং গত পাঁচ শ বছরের পাশ্চাত্য ইতিবৃত্তে তার সাক্ষ্য যেমন নিঃসন্দেহে মেলে, তেমনি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগ তথা অত্যাধুনিক কাল স্পষ্টতই মার্ক্‌সীয়দের বিপক্ষে। তাছাড়া ইতিহাস একা য়ুরোপেরই একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, তাতে পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ডেরও স্বত্ব আছে; এবং উন্নতিসূচক নির্দ্বন্দ্বের দাবি যখন রোম সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেই অশোভন, তখন অন্যত্র সে-আদর্শের গুণগান ভূতের মুখে রামনামের চেয়েও শ্রুতিকটু। আসলে মানুষের বয়স এত অল্প যে তার মতিগতিনিরূপণের সময় এখনো আসে নি; এবং ইতিমধ্যে তার সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জেনেছি, তাতে তার উদ্বর্ত্তন আর পরাবর্ত্তন—এ-দুটোর কোনোটাই নিঃসংশয়ে ধরা পড়ে না, কেবল এই পর্য্যন্ত বিনা প্রশ্নে মানা যায় যে স্বভাবসিদ্ধ দুর্ব্বলতার প্রতিবিধানকল্পে সমষ্টিবদ্ধ জীবনযাত্রায় পৌঁছেও সে যেহেতু শ্রমবিভাগ ব্যতীত সামাজিক শক্তির অপব্যয় আটকাতে পারে নি, তাই তার বিধিলিপিতে সঙ্কলনের প্রবৃত্তি যত না প্রবল, বিকলনের প্রয়োজন ততোধিক প্রকট।

আমার অনুমানে মানুষের জাতিগত বৈষম্য উক্ত শ্রমবিভাগের ফল; প্রকৃতি-পূজার আধিক্য আমার চোখে হাস্যকর ঠেকলেও, প্রাণিমাত্রেই যেকালে শ্রেয়োবোধের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেয়, তখন শ্রমবিভাগের বৃহত্তম সংস্করণ বোধহয় বহুলাঙ্গ জীবলোকে। এমনকি জড়জগতেও কেউ কেউ শ্রমবিভাগের সন্ধান পেয়েছেন; এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে অভিব্যাপ্ত বস্তুর আদিম অদ্বৈত কেবল আয়তনগুণেই আজ অসংখ্যাত নীহারিকায় বিদীর্ণ। কিন্তু বিচ্ছেদই শ্রমবিভাগের সার কথা নয়, যোগ-বিয়োগের তাৎকাল্যেই তার প্রতিষ্ঠা; এবং বস্তুবিশ্বে আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রতিসাম্য ঘটলেও, তার দুর্নিবার বিস্ফোটন শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক তারাপুঞ্জকেই যেহেতু নিঃসঙ্গ ক'রে তুলবে, তাই জড়ের রাজ্যেও সহযোগপ্রসূত শ্রমবিভাগের সুব্যবস্থা খোঁজা আমার বিবেচনায় পণ্ডশ্রম। কারণ শ্রমবিভাগ আর গৃহবিবাদের মধ্যে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের ব্যবধান বর্ত্তমান; এবং আদার ব্যাপারীকে জাহাজের খবর আনতে পাঠালে,

অন্ততপক্ষে সময়নষ্ট অবশ্যম্ভাবী ব'লে, সমাজভুক্ত জীব যদিও বিভিন্ন বৃত্তির স্বাতন্ত্র্য মানে, তবু অনধিকার চর্চ্চার লোভ সে সামলায় শুধু এই প্রত্যাশায় যে সে নিজের গতর খাটিয়ে অপরের একটা প্রয়োজন মেটালে, অন্যেরা তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার সকল অসুবিধা ঘোচাবে। অর্থাৎ যথোচিত শ্রমবিভাগে অন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান নেই; এবং কৃষক যেমন মোটর চালাতে না পেরে লাঙল ধরে না, হলচালনায় সে স্বভাবত ব্যুৎপন্ন ভেবেই স্বেচ্ছায় মাটি চষে; তেমনি চীনজাতিও শৌর্য্যের অভাববশত তিতিক্ষার মন্ত্র জপে অন্তঃপ্রেরণার প্ররোচনায় সৌজন্যকে পৈশুন্যের চেয়ে শুভঙ্কর বুঝেই তারা বর্ব্বরদের আস্ফালন যথাসাধ্য সয়। তবে নিরুপায় হলে শিল্পীরাও হিসাব লিখতে বাধ্য, চীনেরা বন্দুক ছুঁড়তে অপারগ নয়; এবং সে-অবস্থায় পৌঁছলে, ডায়ালেক্‌টিক সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত দেখা যায় বটে, কিন্তু সভ্যতা যে প্রাগ্রসর এ-রকম মন্তব্য কানে কেমন বেসুরো বাজে।

ফলত আজকাল অনেকের মনে সন্দেহ জেগেছে যে মার্ক্‌স্ হয়তো হেগেল্-কে ঠিক পায়ের উপরে দাঁড় করাতে পারেন নি, বরং সেই চেষ্টার দরুন নিজেও উল্‌টে পড়েছিলেন; এবং সেইজন্যেই তিনি বোঝেন নি যে সত্যই যদি ডায়ালেক্‌টিক থাকে, তবে তার গতি বিরোধ থেকে সমন্বয়ে অথবা দুই থেকে একে নয়, তার শ্রেণী অখণ্ড থেকে খণ্ডে, শৃঙ্খলা থেকে সংঘাতে, সদ্ভাব থেকে অভাবে। অর্থাৎ যে-নিয়মে জীবকোষ নিরন্তর বাড়তে পায় না, একটা প্রাক্‌নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় পৌঁছলেই দু ভাগে ভাঙে, সেই বিধির অনুসারেই জাতি তথা ব্যক্তির প্রাথমিক একাগ্রতা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত বুদ্ধির জন্ম দেয়; এবং সেই দ্বন্দ্বে জাতির বেলা যেমন বর্ণাশ্রম বদলায় শ্রেণিসংঘর্ষে, তেমনি ব্যক্তির—বিশেষত শিল্পী ব্যক্তির—ক্ষেত্রে কল্পনা হারায় সঙ্কল্পে। অবশ্য কেন এমন ঘটে, তার নৈয়ায়িক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমার অজ্ঞাত; এবং আমি যখন স্বয়ং হেগেল্-এর অপ্রমেয় প্রত্যয় মানতে অসম্মত, তখন আমার স্বপক্ষে সোরেল্-এর সাক্ষ্য নিশ্চয়ই কেউ শুনতে চাইবেন না। কিন্তু সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে, সুখ-শান্তির প্রলোভনে চোখ বুজে, ধনিকদের চক্রান্তপ্রসূত রামরাজ্যের মায়া কাটিয়ে, রূপকথার নিয়োগে প্রতিনিয়ত মাতিয়ে বেড়ানো শ্রমিকদের কর্ত্তব্য হোক বা না হোক, ক্ষীয়মাণ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার রোগনিদানে সোরেল্-এর মতখণ্ডন খুব সম্ভব অসাধ্য; এবং ষ্টালিন্-ভক্তির আতিশয্যে তা দু-চার জনের সাধ্যে কুলালেও, গত কয়েক বছরের রুষ রাষ্ট্রদ্রোহীদের নাম, সংখ্যা ও স্বীকারোক্তি

দেখার পরে অন্তত বস্তুনিষ্ঠেরা আর বলবেন না যে ত্রিভুজই জীবযাত্রার যথাযথ প্রতিকৃতি, তার ধর্ম্ম বাদী, ও বিবাদীর বিসংবাদমোচন। কারণ প্রাণপ্রবাহ আসলে একটা ঘূর্ণাবর্ত্ত, যার কেন্দ্রে অবস্থিত নাস্তি আর পরিপার্শ্বে বর্ত্তমান অহেতু শূন্যতা; এবং চক্রচর সমাজ শুধু অর্দ্ধ পথে গন্তব্যবিমুখ নয়, এমনকি অন্তর্বিক্ষোভের প্রাবল্যে তার খানিকটা ছিঁট্‌কে গেলেও, সে-ছিন্নাংশ যেহেতু ভ্রমিমূলক, তাই কলামাত্রেই একাধারে আত্মস্থ ও আত্মবিস্মৃত।

সম্ভবত সেইজন্যেই কাথলিক্ ও প্রটেষ্ট্যাণ্টের প্রাথমিক মতান্তর কালক্রমে ব্যাপকতর ধর্ম্মানুষ্ঠানে সঙ্গত হয় নি, তাদের মনান্তর যুগে যুগে এত বেড়েছে যে ইদানীং তারা পরস্পরের অস্তিত্ব ভুলে নিজ নিজ সম্প্রদায়ে নব নব সংঘাতের সৃষ্টি করছে। সেইজন্যেই ধনতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সম্পর্ক আজ বিলুপ্তপ্রায়; এবং সমানাধিকারে উভয়ের সমন্বয় দূরের কথা, সম্প্রতি ধনতন্ত্র যেমন অবাধ প্রতিযোগ ও একচেটিয়া ব্যবসার দোটানায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, তেমনি সমাজতন্ত্র আবার ট্রট্‌স্কি-ষ্টালিন্-এর দ্বৈরথ যুদ্ধে কণ্ঠাগতপ্রাণ। সেইজন্যেই নাৎসী পাশবিকতা হয়তো চিরদিন টিঁকবে না; অন্ধ বা অসবর্ণ উদারনৈতিকেরা তাকে না বুঝে যতই প্রশ্রয় দিন্, কোনো পুনরুজ্জীবিত রোয়েম্-ই তার সর্ব্বনাশ সাধবে। তার পর আসবে কোনো কনিষ্ঠতর ব্যষ্টির পালা; এবং সে-আপদ চুকতে না চুকতে ঘুণ ধরবে পশ্চাদ্বর্ত্তী পর্য্যায়ের সর্ব্বাঙ্গে। কারণ হয়তো এণ্ট্রোপি-ঘটিত তাপ-মৃত্যুতে সুদ্ধ এ-বৈকল্যের শেষ নয়; এবং সংসারের বিশ্লেষ অব্যবস্থার চরমে পৌঁছেই থামবে না, এমনকি বৌদ্ধ সংবর্ত্তের মহাশূন্যেও ঘুরে বেড়াবে নিরবলম্ব বৃত্তি। ইতিমধ্যে সেই অবশ্যম্ভাবী পরিনির্ব্বাণের অকাল বোধন যাঁদের অনভিপ্রেত তাঁরা প্রগতির প্ররোচনাতেও পরকীয় স্বভাবসংশোধনের প্রয়াস পাবেন না, মানবেন যে জনসাধারণকে এক ছাঁচে ঢেলে সাজালেও যখন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘোচবার নয়, তখন আত্মম্ভরিতার চেয়ে আত্মচিন্তাই নিশ্চয় বেশি লাভজনক এবং প্রতিবেশীর উপরে গায়ের জোর ফলালে তাকে যদিও দাবানো যায়, তবু তার স্বাচ্ছন্দ্য ব্যতীত আপন স্বায়ত্বশাসনের আশাও বিড়ম্বনা। আমার বিশ্বাস, সাযুজ্য নয়, এই দ্বৈত-বোধের উপরেই সাম্যবাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা; এবং যে-মানুষ সত্যই নিজেকে চেনে, তার কাছে যেমন স্বীয় ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সে এ-জ্ঞানেও বঞ্চিত নয় যে জীবমাত্র বৈশেষিক ব'লেই তার বৈশিষ্ট্য অবশ্যস্বীকার্য্য। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই সম্পূর্ণ একক, আমরা অদ্বিতীয় শুধু নাতিসামান্য ক্ষমতার জোরে; এবং ক্ষমতাবিশেষ যেহেতু বিশেষ অক্ষমতার প্রতিবাদী, তাই সর্ব্বত

সকলের মূল্যই সমান, ব্যষ্টিও আসলে সাধারণ দোষ-গুণের দেশ-কাল-গত সমষ্টি।

অথচ এই আত্মদর্শনের ফলে আত্মধিক্কার জাগে না, বরং আত্মপ্রসাদ চোকার সঙ্গে সঙ্গেই যথার্থ আত্মপ্রত্যয়ের উপলক্ষ্য জোটে। কারণ মানুষ যখন দেখে যে তার ইন্দ্রিয়ার্থ আর অন্য সকলের ইন্দ্রিয়ার্থ তুল্যমূল্য, পার্থক্য শুধু অবস্থানে, সে যখন জানে যে তার জন্মসংস্কার আর অন্য সকলের জন্মসংস্কার মুখ্যত অনুরূপ, প্রভেদ কেবল সেই সংস্কারসমূহের পদবিন্যাসে, এবং এই রকম বিশ্লেষণে একটার পর একটা উপসর্গ খসাতে খসাতে সে যখন আপনার মূল ধাতুতে গিয়ে পৌঁছয়, তখন আর তার সন্দেহ থাকে না যে সে এমন একটা অনির্ব্বচনীয় আদিভূতের সম্মুখীন যা তার আয়ত্তের বাইরে, যাকে সে কোনোদিনই মানে নি, অথচ যার বাধা তাকে আজীবন যথেচ্ছাচারে বিরত রেখেছে। অতঃপর তার চোখে প্রকৃতি-পুরুষের একাকার ঘটে, স্বরূপ বিশ্বরূপে বদলায়, এবং সে বোঝে যে এ-দুটোর একটাও যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, প্রত্যেকেই অন্যোন্যনির্ভর, তাই ব্যক্তির পক্ষে অর্জ্জন-বর্জ্জন তো সমান বটেই, এমনকি, শুধু মরমী সাধক কেন, মানুষমাত্রেই ম'রে বাঁচে। কিন্তু এই আত্মবিসর্জ্জনজাত আত্মোপলব্ধি যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হলে লাভ নেই, তার সমর্থন চাই কায়মনোবাক্যে। নচেৎ সে-ত্যাগ বৃদ্ধের চিত্তবৃত্তিনিরোধের মতোই শোচনীয়, ক্ষীয়মাণ সংস্কৃতির পরিণাম ম্রিয়মাণ সভ্যতার মতোই লজ্জাকর; এবং ফাশিষ্ট্ রাষ্ট্র একাধারে বহির্জ্জগতের প্রতিপালনসাপেক্ষ ও অন্তর্জ্জগতের দৌর্ব্বল্যসূচক ব'লে, তার সংস্রবে পৃথিবীর বিসংবাদ কমছে না, অনৈক্যই বাড়ছে। পক্ষান্তরে কম্যুনিষ্ট্দের প্রভাব অনেক বেশি শান্তিময়; এবং তারা যদিচ নিত্যের মর্য্যাদা দেয় না, মিথ্যা মিথ্যা ভাবে যে নিমিত্তের তারতম্য ঘুচলেই ব্যক্তিত্বের বিষ ফুরোবে, তবু তাদের বিশ্বাস যে সেই স্বভাবারোপিত সাম্যও অবিবেকীর প্রাপ্য নয়, সেটা সামবায়িক সঙ্কল্পের পুরস্কার, নিঃস্বার্থপরতার পারিতোষিক। তবে এইটুকুই যথেষ্ট নয়; সার্ব্বভৌম প্রভুত্বের মায়া কাটিয়ে, স্বাবলম্বনে ব্যক্তি ও জাতির জন্মগত অধিকারস্বীকার না করলে কম্যুনিষ্ট্ দর্শন বোধহয় বিশ্বমানবের মন পাবে না। অপ্রমেয় প্রগতিতে আস্থাস্থাপন হয়তো দোষের নয়, শুধু সেই সঙ্গে মনুষ্য-ধর্ম্মের অমর বাণীও স্মরণে রাখা অবশ্যকর্ত্তব্য যে মানুষের মধ্যে উৎকর্ষ-অপকর্ষ উভবলী এবং একটার বাদে অন্যটার কোনো মানে নেই।

গল্প

নেহাত গল্প নয়

আবুলমন্‌সুর আহ্‌মদ

(১)

আদুভাই চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করতেন। ঠিক অধ্যয়ন করতেন না বলে অবস্থান করতেন বলাই ভাল।

কারণ ঐ বিশেষ শ্রেণী ব্যতীত আর কোনো শ্রেণীতে তিনি কখনো পড়েছেন কিনা, পড়ে থাক্‌লে ঠিক কবে পড়েছেন, সে কথা ছাত্ররা কেউ জান্‌তো না। শিক্ষকরাও অনেকে জান্‌তেন না বলেই বোধ হতো।

শিক্ষকরাও অনেকে তাঁকে 'আদুভাই' বলে ডাক্‌তেন। কারণ নাকি এই যে, ওঁরাও এককালে আদুভাইর সমপাঠী ছিলেন, এবং সবাই নাকি এক চতুর্থ শ্রেণীতেই আদুভাইর সঙ্গে পড়েছেন।

আমি যখন চতুর্থ শ্রেণীতে আদুভাইর সমপাঠী হলাম, ততদিনে আদুভাই ঐ শ্রেণীর পুরাতন টেবিল ও ব্ল্যাক বোর্ডের মতই নিতান্ত অবিচ্ছেদ্য এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক অঙ্গে পরিণত হয়ে গিয়েছেন।

আদুভাইর এই অসাফল্যে আর যেই হতাশ হোক, আদুভাইকে কেহ সেজন্য কখনো বিষণ্ণ দেখেনি। কিম্বা নম্বর বাড়িয়ে দেবার জন্য তিনি কখনো কোনো শিক্ষক বা পরীক্ষককে অনুরোধ করেন নি। যদি কখনো কোনো বন্ধু বলেছে: "যান না আদুভাই, যে কয় সাবজেক্‌টে শর্ট আছে, শিক্ষকদের বলে'কয়ে' নম্বরটা নিন না বাড়িয়ে।", তখন গম্ভীরভাবে আদুভাই জবাব দিয়েছেন: সব সাবজেক্‌টে পাকা হয়ে উঠাই ভাল।

কোন্ কোন্ সাবজেক্‌টে শর্ট, সুতরাং পাকা হওয়ার প্রয়োজন, আছে তা কেউ জান্‌তো না, আদুভাইও জান্‌তেন না; জানবার জন্য চেষ্টাও কখনো করেন নি; জানবার আগ্রহও যে তাঁর আছে, তাও বোঝবার উপায় ছিল না। বরঞ্চ তিনি যেন মনে করতেন, ও-রকম আগ্রহ প্রকাশ করাই অন্যায় ও অসঙ্গত। তিনি বল্‌তেন: যেদিন তিনি সব সাবজেক্‌টে পাকা হবেন, প্রমোশন সেদিন

তাঁর কেউ ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারবে না। সে শুভ দিন যে একদিন আসবেই, সে বিষয়ে আদুভাইর এতটুকু সন্দেহ কেউ কখনো দেখে নি।

কত খারাপ ছাত্র প্রশ্ন-পত্র চুরি করে, অপরের খাতা নকল করে আদু-ভাইর ঘাড়ের উপর দিয়ে প্রমোশন নিয়ে চলে গিয়েছে, এ ধরণের ইঙ্গিত আদুভাইর কাছে কেউ করলে তিনি গর্জ্জে উঠে বলতেন : জ্ঞানলাভের জন্যই আমরা স্কুলে পড়ি, প্রমোশন লাভের জন্য পড়ি না।

সেজন্য অনেক সন্দেহবাদী বন্ধু আদুভাইকে জিজ্ঞেস করেছে : আদুভাই, আপনার কি সত্যই প্রমোশনের আশা আছে ?

নিশ্চিত বিজয়-গৌরবে আদুভাইর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি তাচ্ছিল্যভরে বলেছেন : আজ হোক, কাল হোক, প্রমোশন আমাকে দিতেই হবে। তবে হাঁ, উন্নতি আস্তে আস্তে হওয়াই ভাল। যে গাছ লক্‌লক্ করে বেড়েছে, সামান্য বাতাসেই তার ডগা ভেঙেছে।

সেজন্য আদুভাইকে কেহ কখনো পেছনের বেঞ্চিতে বস্‌তে দেখে নি। সামনের বেঞ্চিতে বসে তিনি শিক্ষকদের প্রত্যেকটী কথা মনোযোগ দিয়ে শুন্‌তেন, হা করে গিল্‌তেন, মাথা নাড়তেন ও প্রয়োজনমত নোট করতেন। খাতার সংখ্যা ও সাইজে আদুভাই ছিলেন শ্রেণীর একজন অন্যতম।

শুধু ক্লাসের নয়, স্কুলের মধ্যে তিনি সবার আগে পৌঁছুতেন। এ ব্যাপারে কি শিক্ষক কি ছাত্র কেউ তাঁকে কোনো দিন হারাতে পেরেছে বলে শোনা যায় নি।

স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভায় আদুভাইকে আমরা বরাবর দুটো পুরস্কার পেতে দেখেছি। আমরা শুনেছি, আদুভাই কোন্ অনাদিকাল থেকে ঐ দুটো পুরস্কার পেয়ে আস্‌ছেন। তার একটী, স্কুল কামাই না করার জন্য ; অপরটী, সচ্চরিত্রতার জন্য। শহরতলীর পাড়া-গাঁ থেকে রোজ পাঁচ মাইল রাস্তা তিনি হেঁটে আসতেন বটে, কিন্তু ঝড়-তুফান, অসুখ-বিসুখ কিছুই তাঁর এ কাজে অসুবিধে সৃষ্টি করে উঠ্‌তে পারে নি। চৈত্রের কাল্-বোশেখী বা শ্রাবণের ঝড়-ঝঞ্ঝায় যেদিন পশু-পক্ষীও ঘর থেকে বেরোয় নি, সেদিনও ছাতার নীচে মুড়িসুড়ি হয়ে, বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে আদুভাইকে স্কুলের পথে এগোতে দেখা গিয়েছে। মাইনের মমতায় শিক্ষকরা অবশ্য স্কুলে আস্‌তেন। তেমন দুর্য্যোগে ছাত্ররা কেউ আসে নি নিশ্চিত জেনেও নিয়ম রক্ষার জন্য তাঁরা ক্লাসে একটী উঁকি মারতেন। কিন্তু তেমন দিনেও অন্ধকার কোণ থেকে 'আদাব, সার' বলে যে একটী ছাত্র শিক্ষককে চমকিয়ে দিতেন, তিনি ছিলেন

আতুভাই। আর চরিত্র? আতুভাইকে কেউ কখনো রাগ কিম্বা অভদ্রতা করতে কিম্বা মিছে কথা বল্‌তে দেখে নি।

স্কুলে ভর্ত্তি হবার পর প্রথম পরীক্ষাতেই আমি ফার্ষ্ট হলাম। সুতরাং আইনতঃ আমি ক্লাসের মধ্যে সব চাইতে ভাল ছাত্র এবং আতুভাই সবার চাইতে খারাপ ছাত্র ছিলেন। কিন্তু কী জানি কেন, আমাদের তুজনার মধ্যে একটা বন্ধন সৃষ্ট হলো। আতুভাই প্রথম থেকেই আমাকে যেন নিতান্ত আপনার লোক বলে ধরে নিলেন। আমার উপর যেন তাঁর কতকালের দাবী!

আতুভাই মনে করতেন, তিনি কবি ও বক্তা। স্কুলের সাপ্তাহিক সভায় তিনি বক্তৃতা ও কবিতা পাঠ করতেন। তাঁর কবিতা ও বক্তৃতা শুনে সবাই হাস্‌তো। সে হাসিতে আতুভাই লজ্জাবোধ করতেন না, নিরুৎসাহও হতেন না। বরঞ্চ তাকে তিনি প্রশংসা-সূচক হাসিই মনে করতেন। তাঁর উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যেতো।

অন্য সব ব্যাপারে আতুভাইকে বুদ্ধিমান বলেই মনে হতো। কিন্তু এই একটী ব্যাপারে তাঁর নির্ব্বুদ্ধিতা দেখে আমি তুঃখিত হতাম। তাঁর নির্ব্বুদ্ধিতা নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক সবাই তামাসা করছেন, অথচ তিনি তা বুঝ্‌তে পারছেন না, দেখে আমার মন আতুভাইর পক্ষপাতী হয়ে উঠ্‌লো।

গেল এইভাবে চার বছর। আমি ম্যাট্রিকের জন্য টেষ্ট্ পরীক্ষা দিলাম। আতুভাই কিন্তু সেবারও যথারীতি চতুর্থ শ্রেণীতেই অবস্থিতি করছিলেন।

(২)

ডিসেম্বর মাস।

সব শ্রেণীর পরীক্ষা ও প্রমোশন হয়ে গিয়েছে। প্রথম বিবেচনা, দ্বিতীয় বিবেচনা, তৃতীয় বিবেচনা ও বিশেষ বিবেচনা ইত্যাদি সকল প্রকারের 'বিবেচনা' হয়ে গিয়েছে। 'বিবেচিত' প্রমোশন-প্রাপ্তের সংখ্যা অন্যান্য বারের ন্যায় সেবারও পাশ-করা প্রমোশন-প্রাপ্তের সংখ্যার দ্বিগুণেরও উর্দ্ধে উঠেছে।

কিন্তু আতুভাই এসব বিবেচনার বাইরে। কাজেই তাঁর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। নির্ব্বাচন-পরীক্ষা দিয়ে আমরা টিউটরিয়েল ক্লাস করছিলাম। ছাত্ররা শুধুশুধি স্কুল-প্রাঙ্গণে জটলা করছিল—প্রমোশন-পাওয়া ছেলেরা নিজেদের

কীর্ত্তি-উজ্জ্বল চেহারা দেখাবার জন্য, না-পাওয়া ছেলেরা প্রমোশনের কোনো প্রকার অতিরিক্ত বিশেষ বিবেচনার দাবী জানাবার জন্য।

এমনি দিনে একটু নিরালা জায়গায় পেয়ে হঠাৎ আদুভাই আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেল্‌লেন। আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। আদুভাইকে আমরা সবাই মুরুব্বি মান্‌তুম, তাই তাঁকে ক্ষিপ্রহস্তে টেনে তুলে প্রতিদানে তাঁর পা ছুঁয়ে বল্‌লাম ঃ কী হয়েছে আদুভাই, অমন পাগ্‌লামো করলেন কেন?

আদুভাই আমার মুখের দিকে তাকালেন। তাঁকে অমন বিচলিত জীবনে আর কখনো দেখি নি। তাঁর মুখের সর্ব্বত্র অসহায়ের ভাব!

তাঁর কাঁধে সজোরে ঝাকি দিয়ে বললাম ঃ বলুন, কী হয়েছে?

আদুভাই কম্পিত কণ্ঠে বললেন ঃ প্রমোশন।

আমি বিস্মিত হলুম, বল্‌লুম ঃ প্রমোশন? প্রমোশন কী? আপনি প্রমোশন পেয়েছেন?

—না, আমি প্রমোশন পেতে চাই।

—ও ঃ পেতে চান? সে ত সবাই চায়।

আদুভাই অপরাধীর ন্যায় উদ্বেগ-কম্পিত ও সঙ্কোচ-জড়িত অনেক প্যাচ-মোচড় দিয়ে যা বললেন, তার মর্ম্ম এই যে, প্রমোশনের জন্য এত দিন তিনি কারো কাছে কিছু বলেন নি; কারণ, প্রমোশন জিনিষটাকে যথাসময়ের পূর্ব্বে এগিয়ে আনাটা তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে এবার তাঁকে প্রমোশন পেতেই হবে। সে নির্জ্জনতায়ও তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে সে কারণটী বল্‌লেন। তা এই যে, আদুভাইর ছেলে সেবার চতুর্থ শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছে। নিজের ছেলের প্রতি আদুভাইর কোনো ঈর্ষ্যা নেই। কাজেই ছেলের সঙ্গে এক শ্রেণীতে পড়ায় তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু আদুভাইর স্ত্রীর তাতে গুরুতর আপত্তি আছে। ফলে, হয় আদুভাইকে সেবার প্রমোশন পেতে হবে, নয় ত পড়াশোনো ছেড়ে দিতে হবে। পড়াশোনো ছেড়ে দিয়ে আদুভাই বাঁচবেন কী নিয়ে?

আমি আদুভাইর বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারলাম। তাঁর অনুরোধে আমি শিক্ষকদের কাছে সুপারিশ করতে যেতে রাজী হলাম।

প্রথমে পারসী-শিক্ষকের কাছে যাওয়া স্থির করলাম। কারণ তিনি আমাকে খুব ভালবাস্‌তেন। এক পরীক্ষায় তিনি আমাকে মোট একশত নম্বরের মধ্যে একশ পাঁচ নম্বর দিয়েছিলেন। বিস্মিত হেডমাষ্টার তার কারণ জিজ্ঞেস করায়

মৌলবী সাব বলেছিলেন ঃ ছেলে সমস্ত প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর দেওয়ায় সে পূর্ণ নম্বর পেয়েছে। পূর্ণ নম্বর পাওয়ার পুরস্কার স্বরূপ আমি খুশী হয়ে তাকে পাঁচ নম্বর বখ্‌শিশ দিয়েছি। অনেক তর্ক করেও হেডমাষ্টার মৌলবী সাবকে এই কার্য্যের অসঙ্গতি বুঝাতে পারেন নি।

মৌলবী সাব আদুভাইর নাম শুনেই জ্বলে উঠলেন। অমন বেতমিজ ও খোদার নাফরমান বান্দা তিনি কখনো দেখেন নি বলে আস্ফালন করলেন এবং অবশেষে টীনের বাক্স থেকে অনেক খোঁজে আদুভাইর খাতা বের করে আমার সাম্‌নে ফেলে দিয়ে বল্‌লেন ঃ ছাখো।

আমি দেখলাম, আদুভাই মোটে তিন নম্বর পেয়েছেন। তবু হতাশ হলাম না। পাশের নম্বর দেওয়ার জন্য তাঁকে চেপে ধরলাম।

বড় দেরী হয়ে গিয়েছে, নম্বর সাবমিট্ করে ফেলেছেন, বিবেচনার স্তর পার হয়ে গিয়েছে, ইত্যাদি সমস্ত যুক্তির আমি সন্তোষজনক জবাব দেবার পর তিনি বললেন, তুমি কার জন্য কী অন্যায় অনুরোধ করছ, খাতাটা খুলেই একবার দেখ না।

আমি মৌলবী সাবকে খুশী করবার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং অনাবশ্যক বোধেও খাতাটা খুল্‌লাম। দেখুলাম ঃ পারসীর পরীক্ষা বটে, কিন্তু খাতার কোথাও একটা পারসী অক্ষর নেই। তার বদলে ঠাসাবুনোনো বাঙ্‌লায় অনেক কিছু লেখা আছে। কৌতূহলবশে পড়ে দেখ্‌লাম ঃ এই বঙ্গদেশে পারসী ভাষা আমদানীর অনাবশ্যকতা এবং ছেলেদের উহা শিখোবার চেষ্টার মূর্খতা সম্বন্ধে আদুভাই যুক্তিপূর্ণ একটী 'থিসিস' লিখে ফেলেছেন।

পড়া শেষ করে মৌলবী সাবের মুখের দিকে চাইতেই তিনি জয়ের ভঙ্গিতে বললেন ঃ দেখেছ বাবা, বেতমিজের কাজ? আমি নিতান্ত ভাল মানুষ বলেই তিনটে নম্বর দিয়েছি, অন্য কেউ হলে রাস্‌টিকেটের সুপারিস করতো।

যাহোক শেষ পর্য্যন্ত মৌলবী সাব আমার অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। খাতার উপর ৩ এর পৃষ্ঠে ৩ বসিয়ে ৩৩ করে দিলেন।

আমি বিপুল আনন্দে অঙ্কের পরীক্ষকের বাড়ী ছুট্‌লুম।

সেখানে দেখলুম ঃ আদুভাইর খাতার উপর লাল পেন্সিলের একটী প্রকাণ্ড ভূমণ্ডল আঁকা রয়েছে। ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝেও আমার উদ্দেশ্য বল্‌লাম। অঙ্কের মাষ্টার ত হেসেই খুন। হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি আদুভাইর খাতা বের করে আমাকে অংশবিশেষ পড়ে শোনালেন। তাতে আদুভাই

লিখেছেন যে, প্রশ্নকর্ত্তা ভাল ভাল অঙ্কের প্রশ্ন ফেলে কতকগুলো বাজে ও অনাবশ্যক প্রশ্ন করেছেন, সেজন্য এবং প্রশ্নকর্ত্তার ত্রুটী সংশোধনের জন্য আদুভাই নিজেই কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রশ্ন লিখে তার বিশুদ্ধ উত্তর দিচ্ছেন, এইরূপ ভূমিকা করে আদুভাই যে সমস্ত অঙ্ক কষেছেন, শিক্ষকমশায় প্রশ্ন-পত্র ও খাতা মিলিয়ে আমাকে দেখালেন যে, প্রশ্নের সঙ্গে সত্যি আদুভাইর উত্তরের কোনো সংশ্রব নেই।

প্রশ্ন-পত্রের সঙ্গে মিল থাক্ আর নাই থাক্, খাতায়-লেখা অঙ্ক শুদ্ধ হলেই নম্বর পাওয়া উচিৎ বলে আমি শিক্ষকের সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তি করলাম। শিক্ষক মশায়, যাহোক, প্রমাণ করে দিলেন যে, তাও শুদ্ধ হয়নি। সুতরাং আমার অনেক অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও তিনি পাশের নম্বর দিতে রাজী হলেন না। তবে তিনি আমাকে এই আশ্বাস দিলেন যে, অন্য সব সাব্‌জেকটের শিক্ষকদের রাজী করতে পারলে তিনি আদুভাইর প্রমোশনের সুপারিশ করতে প্রস্তুত আছেন।

নিতান্ত বিষণ্ণ মনে অন্যান্য পরীক্ষকদের নিকট গেলাম। সর্ব্বত্র প্রায় একরূপ। ভূগোলের খাতায় তিনি লিখেছেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে এমন গাঁজাখুরী গল্প তিনি বিশ্বাস করেন না। ইতিহাসের খাতায় তিনি লিখেছেন যে, কোন্ রাজা কোন্ সম্রাটের পুত্র এসব কথার কোনো প্রমাণ নেই। ইংরাজীর খাতায় তিনি নবাব সিরাজদ্দৌলা ও লর্ড ক্লাইভের ছবি পাশাপাশি আঁকবার চেষ্টা করেছেন—অবশ্য কে যে সিরাজ, আর কে যে ক্লাইভ নীচে লেখা না থাকলে তা বুঝা যেত না।

হতাশ হয়ে হোষ্টেলে ফিরে এলাম। আদুভাই আগ্রহ-ব্যাকুল প্রাণে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

আমি ফিরে এসে নিষ্ফলতার খবর দিতেই তাঁর মুখটী ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তবে আমার কী হবে ভাই?—বলে তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

কিছু একটা করবার জন্য আমার প্রাণও ব্যাকুল হয়ে উঠলো। বল্‌লাম: তবে কি আদুভাই আমি হেডমাষ্টারের কাছে যাবো?

আদুভাই ক্ষণেক আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বললেন: তুমি আমার জন্য যা করেছ, সেজন্য ধন্যবাদ, হেডমাষ্টারের কাছে তোমার গিয়ে কাজ নেই। সেখানে যেতে হয় আমি যাব। হেডমাষ্টারের কাছে জীবনে আমি কিছু চাই নি। এই প্রথম প্রার্থনা তিনি আমার ফেল্‌তে পারবেন না।

—বলেই তিনি হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে গেলেন। আমি একদৃষ্টে দ্রুতগমনশীল আদুভাইর দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি দৃষ্টির আড়াল হলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে নিজের কাজে মন দিলাম।

(৩)

সেদিন বড়দিনের বন্ধ আরম্ভ। শুধু হাজিরা লিখেই স্কুল ছুটী দেওয়া হল।

আমি বাইরে এসে দেখ্‌লাম: স্কুলের গেটের সাম্‌নে একটা পোস্তার উপর একটা উঁচু টুল চেপে তার উপর দাঁড়িয়ে আদুভাই হাত পা নেড়ে বক্তৃতা করছেন। ছাত্ররা ভিড় করে তাঁর বক্তৃতা শুন্‌ছে এবং মাঝে মাঝে করতালি দিচ্ছে।

আমি শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

আদুভাই বল্‌ছিলেন: হাঁ, প্রমোশন আমি মুখ ফুটে কখনো চাই নি। কিন্তু সেজন্যই কি আমাকে প্রমোশন না দেওয়া এঁদের উচিৎ হয়েছে? মুখ ফুটে না চেয়ে এতদিন আমি এঁদের আক্কেল পরীক্ষা করলাম; এঁদের মধ্যে দানাই বলে কোনো জিনিষ আছে কিনা, আমি তা যাচাই করলাম। দেখ্‌লাম, বিবেচনা বলে কোনো জিনিষ এঁদের মধ্যে নেই। এঁরা নির্ম্মম, হৃদয়হীন। একটা মানুষ যে চোখ বুজে এঁদের বিবেচনার উপর নিজের জীবন ছেড়ে দিয়ে বসে আছে, এঁদের প্রাণ বলে কোনো জিনিষ থাক্‌লে সে কথা কি এঁরা এতদিন ভুলে থাক্‌তে পারতেন?

আদুভাইর চোখ ছল্‌ছল্‌ হয়ে উঠ্‌লো। তিনি বাম হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছে আবার বল্‌তে লাগলেন: আমি এঁদের কাছে কী আর বিশেষ চেয়েছিলাম? শুধুমাত্র একটা প্রমোশন। তা দিলে কী এমন এঁদের লোক্‌সান হতো? মনে করবেন না, প্রমোশন না দেওয়ায় আমি রেগে গিয়েছি। রাগ আমি করি নি। আমি শুধু ভাবছি, যাঁদের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর হাজার হাজার বাপ-মা তাঁদের ছেলেদের জীবনের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁদের আক্কেল কত কম, তাঁদের প্রাণের পরিসর কত অল্প।

একটু দম নিয়ে আদুভাই আবার আরম্ভ করলেন: আমি বহুকাল এই স্কুলে পড়ছি। একদিন এক পয়সা মাইনে কম দেই নি। বছর বছর নতুন নতুন পুস্তক ও খাতা কিন্‌তে আপত্তি করি নি। ভাবুন, আমার কতগুলো টাকা গিয়েছে। আমি যদি প্রমোশনের এতই অযোগ্য ছিলাম, তবে এই দীর্ঘ

দিনের মধ্যে একজন শিক্ষকও আমায় কেন বল্‌লেন না যে : 'আদু মিঞা, তোমার প্রমোশনের কোনো চান্‌স্ নেই, তোমার মাইনেটা আমরা নেব না।' মাইনে দেবার সময় কেউ বারণ করলেন না, পুস্তক কিনবার সময় কেউ নিষেধ করলেন না, শুধু প্রমোশনের বেলাতেই তাঁদের যত নিয়ম-কানুনে এসে বাধ্‌লো ? আমি চতুর্থ শ্রেণীতে পাশ করতে পারলুম না বলে তৃতীয় শ্রেণীতেও যে পাশ করতে পারতুম না, একথা এঁদের কে বলেছে ? অনেকে ম্যাট্রিক-আইএতে কোনোমতে পাশ করে বি-এ, এম-এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত আমি অনেক দেখাতে পারি। কোনো কুগ্রহের ফলে আমি চতুর্থ শ্রেণীতে আট্‌কে পড়েছি, একবার কোনো মতে এই শ্রেণীটা ডিঙোতে পারলে আমি ভাল করতে পারতাম, এটা বোঝা মাষ্টার বাবুদের উচিত ছিল। আমাকে একবার তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন দিয়ে আমার লাইফের একটা চান্‌স্ এঁরা দিলেন না।

আদুভাইর কণ্ঠরোধ হয়ে এলো। তিনি খানিক থেমে ধুতির খুঁটে নাক-চোখ মুছে নিলেন। দেখ্‌লাম, শ্রোতৃগণের অনেকের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়্‌ছে।

গলা পরিষ্কার করে আদুভাই আবার আরম্ভ করলেন : আমি কখনো এতসব কথা বলতাম না। আজ বল্‌লাম শুধু এই জন্য যে, আমার বড় ছেলে এবার চতুর্থ শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছে। সে-ও এই স্কুলেই পড়তো। এই স্কুলের শিক্ষকদের বিবেচনায় আমার আস্থা নেই বলেই আমি গতবারই আমার ছেলেকে অন্য স্কুলে ট্রান্সফার করে দিয়েছিলাম। যথাসময়ে এই সতর্কতা অবলম্বন না করলে, আজ আমাকে কি অপমানের মুখে পড়তে হতো, তা আপনারাই বিচার করুন।

আদুভাইর শরীর কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল।

এই সময় স্কুলের দারোয়ান এসে সভা ভেঙে দিল। হৈচৈ করতে করতে ছাত্ররা যে যার পথে চলে গেল। আমিও আদুভাইর দৃষ্টি এড়িয়ে চুপে চুপে সরে পড়লাম।

তারপর যেমন হয়ে থাকে—সংসার-সাগরের প্রবল স্রোতে কে কোথায় ভেসে গেলাম, কেউ জান্‌লাম না।

* * * *

আমি সেবার বি-এ পরীক্ষা দিব। খুব মন দিয়ে পড়ছিলাম। হঠাৎ লাল লেপাফার এক পত্র পেলাম। কারো বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র মনে করে খুল্‌লাম।

ঝরঝরে তকতকে সোনালী হরফে ছাপা পত্র। পত্র-লেখক আদুভাই। তিনি লিখেছেন, তিনি সেবার চতুর্থ শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছেন বলে বন্ধুবান্ধবদের জন্য কিছু ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করেছেন।

দেখলাম, তারিখ অনেক আগেই চলে গিয়েছে। বাড়ী ঘুরে এসেছে বলে পত্র দেরীতে পেয়েছি।

ছাপা চিঠির সঙ্গে হাতের-লেখা একটী পত্র। আদুভাইর পুত্র লিখেছে: বাবার খুব অসুখ, আপনাকে দেখ্‌বেন তাঁর শেষ সাধ।

পড়াশোনো ফেলে ছুটে গেলাম আদুভাইকে দেখ্‌তে। এই আট বছর তাঁর কোনো খবর নেই নি বলে লজ্জা-অনুতাপে ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম।

ছেলে কেঁদে বললে: বাবা মারা গিয়েছেন। প্রমোশনের জন্য তিনি এবার দিনরাত এমন পড়া আরম্ভ করেছিলেন যে তিনি শয্যা নিলেন তবু পড়া ছাড়লেন না। আমরা সবাই তাঁর জীবন সম্বন্ধে ভয় পেলাম। পাড়াশুদ্ধ লোক গিয়ে হেডমাষ্টারকে ধরায় তিনি স্বয়ং এসে বাবাকে প্রমোশনের আশ্বাস দিলেন। বাবা অসুখ নিয়েই পাল্কী চড়ে স্কুলে গিয়ে শুয়ে শুয়ে পরীক্ষা দিলেন। আগের কথা মত তাঁকে প্রমোশন দেওয়া হল। তিনি তাঁর প্রমোশন উৎসব উদ্‌যাপন করবার জন্য আমাকে হুকুম দিলেন। কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করতে হবে, তার লিষ্টও তিনি নিজ হাতে করে দিলেন। কিন্তু সেই উৎসবে যাঁরা যোগ দিতে এলেন, তাঁরা সবাই তাঁর জানাজা পড়ে বাড়ী ফিরলেন।

আমি চোখের পানি মুছে কবরের কাছে যেতে চাইলাম। ছেলে আমাকে গোরস্থানে নিয়ে গেল। দেখলাম, আদুভাইর কবরে খোদাই-করা মার্ব্বেল পাথরের টেবলেটে লেখা রয়েছে:

> Here sleeps Adu Mia who was promoted from Class VII to Class VIII.

ছেলে বল্‌লে: বাবার শেষ ইচ্ছেমতই ও-ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইংরাজী সাহিত্য

বর্ত্তমানের ইংরাজী সাহিত্য

যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগের ইংরিজি সাহিত্যের পরিচয় অল্প পরিসরের মধ্যে দেওয়া সম্ভবপর নয়, কারণ নানান দিকে তার বিকাশ এতখানি ছড়িয়ে পড়েছে যে একজন লোকের পক্ষে তার হিসাব রাখাই কঠিন। তারই দু'চারটী ধারার আজ এখানে খানিকটা আলোচনা ক'রব।

যুদ্ধের আগেই ইংরিজি সভ্যতার ভাঙন সুরু হয়েছিল, কিন্তু কেবলমাত্র অল্প কয়েকটি মনীষীর দৃষ্টিতেই তা ধরা পড়ে। ভিক্টোরিয়া যুগ ইংরেজের বৈজয়ন্তীর যুগ, সে বিজয় অভিযানে প্রথম ধাক্কা লাগে বুয়র যুদ্ধের সময়। তার আগে দেশবিদেশে চলেছে ইংরেজের বাণিজ্যের রথ দুনিয়ার সমস্ত ঐশ্বর্য্যসম্ভার এসে লুটিয়েছে ব্রিটিশ লক্ষ্মীর পদতলে। মনোজগতেও সবদিন ইংরেজের জয়জয়কার। স্বাধীনতার সঙ্গে নিয়মতন্ত্রের, রাজার সঙ্গে জনসাধারণের এমন মিলন কোনদিন কোনখানে দেখা যায় নি, সমস্ত পৃথিবীর লোক ইংরেজের শাসনতন্ত্র, ইংরেজের প্রতিষ্ঠান নিজের দেশে দেখবার জন্য সেদিন উন্মুখ। কিপলিং তাই সেদিন ইংরেজের কবি এবং বিদেশী কনরাডের রচনায়ও তারই ছায়া মেলে।

বর্ত্তমান শতকের গোড়াতেই কিন্তু ইংরেজের সে সহজ আত্মবিশ্বাসে নাড়া লাগে। হার্ডির নৈরাশ্যবাদ কোন বিশেষ ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাঁর কবিচিত্ত বিশ্বসৃষ্টির অর্থহীনতা ও অপব্যয়ের ভারে জর্জ্জর, তাই ইংরেজ ইতিহাসের বিজয়ের দিনেও তাঁর বিষাদ ঘুচে নাই। ওয়েলসের রচনায় প্রথম সন্দেহ ও বিদ্রোহের ছায়া পড়ল—টোনো বাঙ্গে কিপস প্রভৃতি বইয়ে যে বিদ্রোহ, তার মধ্যে সমাজসংগঠনের অন্যায় ও অবিচারের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। গলসওয়ার্দ্দির প্রাঞ্জল এবং একটানা বর্ণনার মধ্যেও সমালোচনার আভাস, মধ্যবিত্ত সমাজের ছবি আঁকতে আঁকতেই তিনি তার প্রতি কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। যুদ্ধের বিভীষিকা রাত্রিও সহজে কাটে নি—ইংরেজের মন শতাব্দির স্বীকৃতি ও আশ্বাসের মধ্যে পালিত, সেখানে এল বিভীষিকার মতন যুদ্ধের আর্ত্তনাদ। অনেক স্বপ্ন লুটিয়ে পড়ল, অনেক আশ্বস্তি ভেঙে গেল, ইংরেজের মন গৃহহারা হয়ে নতুন আশ্রয়ের খোঁজে বেরুল। লরেন্সের প্রেরণার সূত্র তার মধ্যে না মিললেও যুদ্ধের ফলে যে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির ধারা বদলে গেল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লরেন্স যুদ্ধে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন, এই অস্বীকৃতির ফলে বিলেতের বাসিন্দা ইংরেজ হয়েও তিনি বিদেশীর চেয়েও বেশী পর হয়ে গেলেন। পরিচিত বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বাস করেও নির্ব্বাসনের যে গ্লানি তার মনে তা গভীর দাগ কেটেছিল—মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নিয়ে তাই তাঁর এত ভাবনা। নরনারীর সহজ মিলনের মধ্যে তিনি সমাজের স্বাস্থ্য

লাভের স্বপ্ন দেখেছিলেন, ইয়োরোপের পীড়িত সভ্যতার বেদনাই যে তাঁর চিত্তকে এদিকে আকর্ষণ করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

লরেন্স মুক্তি খুঁজেছিলেন যৌনবোধের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনের মধ্যে। বুদ্ধির পরাজয় তাঁকে আকর্ষণ করেছে, কিন্তু যুদ্ধ পরবর্ত্তীযুগের অন্য লেখকের মনে এসেছে বুদ্ধির বিজয়স্বপ্ন। যারা যুদ্ধের নরক থেকে ফিরে এল, তাদের কোন মোহ ছিল না, জীবনের কোন আশা ছিল না। তারা বুদ্ধির প্রখরতার মধ্যে জীবনের ক্লেদ এবং গোঁজামিল ভুলে থাকবার চেষ্টা করল। জয়েস জীবনকে খণ্ড-খণ্ড করে দুঃখসুখকে আকস্মিক করে তুললেন। মুহূর্ত্তের জন্য যার বিকাশ, তাকে নিয়ে ভেবে লাভই বা কি? সেই আকস্মিক জীবনের মধ্যে নিজেকে ভোলা যায়, সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির পরিহাসকে ভুলে থাকা যায়। অলডুস্ হাক্সলি, ভার্জ্জিনিয়া উলফ্ তারই আরো পরিণতি। হাক্সলির জগতে মানুষ বুদ্ধিমান, কিন্তু বুদ্ধিজীবী নয়। যে বুদ্ধির মধ্যে একদিন ওয়েলস এবং তার সমসাময়িক লেখক পৃথিবীকে নতুন করে গড়বার সম্ভাবনা দেখেছিলেন, হাক্সলির মতে সেই বুদ্ধিও কেবলমাত্র বিলাস, বুদ্ধির বিশ্লেষণে যে গলদ ধরা পড়ে, তা দূর করবার শক্তিটুকুও বুদ্ধির নেই। অন্ধপ্রবৃত্তির মধ্যে কখনো বা মুহূর্ত্তের জন্য জীবনের স্বাদ মেলে, কিন্তু তার মধ্যেই বা পরিপূর্ণতা কই? ভার্জ্জিনিয়া উলফের কাছে বুদ্ধিরও ঐক্য টিকল না—সমস্তই মুহূর্ত্তের খেলা, বুদ্ধির গর্ব্বেরও সেখানে তাই কোন স্থান নেই। ব্যক্তিত্ব, অতীত অভিজ্ঞতা সমস্তই বদলে যাচ্ছে, বুদ্ধির নিজের অস্তিত্বই সন্দেহের বিষয়। যুদ্ধের পরে যে ভঙ্গুর জগতে সমস্ত কিছু সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারই ছায়া পড়েছে উলফের রচনায়, তার অর্লেণ্ডোর জীবন ইতিহাসে।

এই পরিবর্ত্তনের মধ্যেও মানুষ স্থৈর্য্য চায়—আঁকড়ে ধরে থাকবার মতন একটুখানি আশ্রয় চায়। তার পরিচয় পাই মুরের প্রশান্ত রচনায়। মুরেরও এককালে বিদ্রোহী জীবন কেটেছে, সমাজ, সংসার, রাজনীতির বিরুদ্ধে, সে বিদ্রোহের অবসানে তিনি শান্তি খুঁজেছিলেন প্রাচীন অথচ চিরন্তন কাহিনীর মধ্যে। জীবনের বৈচিত্র্য ও জটিলতার মধ্যে অশান্তি ও সংঘাত, তাই জীবনকে সহজ ও সরল করে আত্মার শান্তি হয়তো মিলবে। কেবল ব্রুক কেরিথ বলে নয়, যে সমস্ত বইয়ে আবেগ ও উন্মাদনার সম্ভাবনা বেশী, তারও মধ্যে তিনি সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতাই খুঁজেছেন। দূর জগতের প্রশান্তি ও ছায়াগভীরতা তাই তাঁর রচনার মধ্যে এসেছে—তারা সব কথাই বলে, মন্দস্বরে একটানা স্রোতে কোন কথাই বাকী রাখতে চায় না, অথচ সেই বহুল উক্তির মধ্যেও বচনাতীতের ইঙ্গিত থেকে যায়। আমাদের দেশের নিদাঘ মধ্যাহ্নে আলো এবং প্রাণের প্রাচুর্য্যের মধ্যেও যেমন বিশ্রান্তি ও অবসাদ, মুরের রচনাও তেমনি সুপ্তির মায়াজালে আচ্ছন্ন। মুর কিন্তু বর্ত্তমান ইংরিজি সাহিত্যে বিদেশী—তাঁর সেই নিস্তরঙ্গ সৌন্দর্য্যপ্রীতি আধুনিক জগতের দ্বন্দ্বসংঘাত, চাঞ্চল্য এবং বিক্ষোভের মধ্যে স্বপ্নদ্বীপের মত, তাই বর্ত্তমানের সাহিত্যে অলডুস্ হাক্সলি এবং উল্‌ফকেই প্রতীক বলে ধরতে হয়—লরেন্সের মোহাচ্ছন্ন তীব্রতাও যেন সেখানে অবান্তর। মনোজগতের স্তরের পর স্তরের আজ বিকলন চলেছে—ফকনার প্রভৃতির রচনায় তারও ছায়া পাওয়া যায়।

কাব্যজগতে ও অধুনার সাহিত্যে এ বিক্ষোভ এবং আত্মপ্রত্যাবর্ত্তন ধরা দেয়। যুদ্ধের যুগে ইংরেজের চেতনা আচ্ছন্ন—ইয়েটস যাকে বলেছেন নিষ্ক্রিয় দুঃখভোগ—সেই বেদনা অনুভূতিতেই সে-যুগের ইংরেজ কাব্য ভরপূর। তারপরে এলিয়টের পালা। ইয়োরোপের সভ্যতা ভেঙে পড়ছে, পোড়াজমি অনাবাদী পড়ে ছিল, তারই মধ্যে কাঁটা কাঁকড়ের ছড়াছড়ি। ফসলের সেখানে আভাস নেই, রয়েছে কেবল ফণিমনসার নিষ্ফলতা। বিমূঢ় মানুষ হতাশা ও দিকভ্রান্তির মধ্যে ঘুরে বেড়ায়—দিশা পায় না, মুক্তি কোথায়? মানুষগুলিরই বা পরিচয় কি? সব ফাঁপা মানুষের দল, কাণা কড়িতে তাদের কারবার, জীবনের হাটে তারা দেউলে। বিদ্রোহের শক্তিও সেখানে নেই, রয়েছে কেবল বিরক্তি ও বিফলতাবোধ। জীবনের নিষ্ফলতার ছায়া হাউসমানের হৃদয়কেও স্পর্শ করেছিল, কিন্তু তাঁর কবিতায় হতাশার মধ্যেও যেটুকু সান্ত্বনা রয়েছে, এলিয়টের মধ্যে তারও আভাস নেই। বুদ্ধির অভিযানে সমাজ-সংসার সব ভেঙে যায়, চারদিকের প্রতিষ্ঠিত জীবনের খণ্ডগুলি কুড়িয়ে নিয়ে আবার সভ্যতা রচনারও উৎসাহ থাকে না। কিন্তু নৈরাশ্যবাদে মানুষের মন টিকে থাকতে পারে না—নৈরাজ্যের পরিণতি হয় স্বৈরতন্ত্রে, নিরাশার মধ্যে মানুষ খোঁজে চরম আশ্বাস। তাই এলিয়টের স্বাভাবিক বিকাশের ফল ধর্ম্মের প্রতি অন্ধ এবং বিবেচনাহীন আগ্রহে, সমস্ত প্রশ্নের নিরসন হয় রোমিয় ধর্ম্মমতের নিষ্প্রশ্ন স্বীকৃতির মধ্যে।

এলিয়ট তো রোমকে স্বীকার করে আত্মার সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন, কিন্তু সকলে তা পারে নি। দ্বন্দ্ব এবং সন্দেহের দোলায় কাব্য জীবন থেকে বিচ্যুৎ হয়ে পড়ল—নতুন কবি যাঁরা এলেন, তাঁরা বল্লেন যে মুহূর্ত্তকে কেন্দ্র করেই আমাদের কাব্য। উলফের উপন্যাসে যেমন ব্যক্তি বিশ্লেষণের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে, আধুনিক কবিদের মধ্যে অনেকের রচনায়ও ঠিক তাই হয়েছে। সংবেদনার মুহূর্ত্তিক যে সত্য এবং তীব্রতা, তারা তারই মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চাইল, কিন্তু সে আশাও যে কেবলমাত্র দুরাশা, তা বুঝতে বেশীক্ষণ লাগে না। সাম্প্রতিক সাহিত্যে তার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ জেগেছে—আধুনিকতম কবিরা কেবলমাত্র কল্পলোকে মুহূর্ত্তিক জীবনের মধ্যে বন্দী থাকতে আর রাজী নন। যে জীবন-সমুদ্রে তরঙ্গ উঠে পড়ে, যেখানে মানুষের সমাজ রূপ নেয়, রূপ বদলে ফেলে, সেই সমাজজীবনের সঙ্গে যোগ রেখেই কবির কাব্য। তাই ইংরেজ কাব্যে নতুন এক রাজনৈতিক প্রেরণা এসেছে, স্বপ্নবিলাসী কবিদের রচনায়ও আজ তাই নতুন বাস্তবপ্রীতি, পৃথিবীর রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বার, তার বাণীকে ধ্বনিত করে তোলবার নতুন প্রয়াস।

নাট্য-সাহিত্যেও এ যুগ পরিবর্ত্তন ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিপ্লব ধরা পড়ে। যুদ্ধের পরে চলেছে কিছুদিন বিশ্বহিতৈষণার যুগ—জার্ণিস এণ্ডে সেদিন তাই ইংরেজ তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছিল, ভেবেছিল যে খণ্ড খণ্ড পৃথিবীকে জোড়া দিয়ে আবার জগতকে সৃষ্টি করবে। সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল বুদ্ধির বিদ্রোহ ও নিষ্ফল আক্রোশ। সমাজকে আঘাত করেছে, আঘাত পেয়েছে, তারই পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল নোয়েল কাওয়ার্ডের প্রতিষ্ঠা। এলিয়টের রকেও নতুন প্রেরণার আভাস মেলে, যে প্রেরণায় এলিয়ট কাব্যে অন্ধবিশ্বাস ও স্বীকৃতি ফিরিয়ে এনেছিলেন, তারই ছায়া রয়েছে

তাঁর এ নতুন নাট্য রচনায়। আজো নাট্য-সাহিত্যের গতি স্পষ্ট হয়ে নির্দ্দিষ্ট হয়নি, আজো সমালোচনার ক্ষেত্রে মতবাদের সঙ্গে মতবাদের বিরোধ, অস্বীকৃতি ও স্বীকৃতির দ্বন্দ্ব, এবং সন্দেহ ও সংশয়ের নৈরাজ্য। নতুন সমালোচকেরও অভিযান এসেছে, তাঁরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের দিক থেকে সাহিত্যকে বিচার করতে, যাচাই করতে চাচ্ছেন—সব দিকেই চলেছে পরীক্ষা ও প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। এই যুগসন্ধির ক্ষণে তাই ইংরেজের সাহিত্য আমাদের কৌতূহল ও আনন্দ জাগায়, তার ভবিষ্যতের সম্বন্ধে সন্দেহ ও আশা দুই-ই যুগপৎ জেগে ওঠে।

ভারতীয় সাহিত্য

উর্দ্দু ভাষার উদ্ভব

আমাদের জাতীয়তার যে সমস্যা সে সমস্যার সঙ্গে ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষার সমস্যাও অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। যদি ভারতবর্ষে একটি অখণ্ড জাতির উদ্ভবই আমাদের উদ্দেশ্য হয় (বিভিন্ন জাতীয়তার নয়), ভাষা ও কৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও যদি আমরা একই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধিবিধানের মধ্যে থাকতে চাই তবে এমন একটি ভাষা উৎপাদন করা আমাদের কর্ত্তব্য যা আমাদের বংশধরেরা নির্ব্বিবাদে 'ভারতীয় ভাষা' বলে স্বীকার করবে।

সাম্প্রদায়িক মনোভাব গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে গড়ে উঠেছে; সেহেতু প্রায় সকলেই আজকাল উর্দ্দুকে মুসলমানের ও হিন্দীকে হিন্দুদের ভাষা বলে মনে করে। কোলাহলের উত্তাপে অনেকেই উর্দ্দুর উদ্ভবের কথা ভুলে গেছেন, এমন কি মহাত্মা গান্ধীর মত বিচক্ষণ ও জ্ঞানী লোকও উর্দ্দুকে মুসলমানের ভাষা বলে অভিহিত করেছেন, যা কোরাণ শরিফের অক্ষরে লেখা হয়।

উর্দ্দু ভাষায় ফারসী শব্দের বাহুল্য, ফারসী-ঘেঁষা পদবিন্যাস ও সেমিটিক অক্ষর, এ সব সত্ত্বেও উর্দ্দু পশ্চিমা হিন্দীরই ভাষা, যা মিরাট ও দিল্লী অঞ্চলে অনেক শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হয়ে এসেছিলো। উর্দ্দু ভাষা 'সৌরসেনি প্রকৃত'-এরই একটি 'শাখা'। আরম্ভ থেকেই উর্দ্দু ভাষার ব্যাকরণ ও গঠনের যে রূপ তার পরিবর্ত্তন অদ্যাপি হয় নাই, যদিও ভাষায় বহু হিন্দী শব্দ ও ইডিয়ম আছে। এই সব হিন্দী শব্দ ও ইডিয়ম, যা উর্দ্দু ভাষার মধ্যে প্রবেশলাভ করেছে, সংস্কৃতেরই সমগোত্র। উর্দ্দু এবং হিন্দীর উদ্ভব একই মূল থেকে, যা বোঝাবার জন্য আমি কয়েকটা শব্দ নিজের খেয়ালমত চয়ন করেছি।

সংস্কৃত	—	ভাসপা	—	উর্দ্দু
বেরক্‌শা	—	পেরখা	—	পারেখ
লক্ষণ	—	লুছমান	—	লুছ্‌ন
মাতা	—	মাতা	—	মা
দুঃখণ	—	দুখাণ	—	দুক্কান
পেরসা	—	পেরখা	—	পেরখা
রাক্ষস	—	রাকুস	—	রাকুস
পুরু	—	পুরহা	—	পুরুষ

এই সব শব্দের সংখ্যা ইচ্ছে করলে আরও অনেক বাড়ান যায়। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, হিন্দীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্যই উর্দ্দু উদ্ভূত হয় নাই, হিন্দীর সমগোত্র ভাষা হিসেবেই এর উদ্ভব হয়। এ ভাষা মুসলমানদের সক্রিয় সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল এটা ইতিহাসের

মর্জ্জি। কারণ দিল্লী, যেখানে এ ভাষার প্রচলন ছিল, তখন মুসলিম-ভারতের রাজধানী। দিল্লী বাজারে যে সব ভাষার প্রচলন ছিল সেই সব ভাষার সম্মিলিত অবদানেই উর্দ্দু ভাষার উদ্ভব এবং উর্দ্দু ভাষা, অষ্টাদশ শতাব্দীর এক বৃদ্ধ উর্দ্দু কবির মতে 'is a mongrel pigeon form of speech. দিল্লী বাজারের এই সব বিভিন্ন ভাষা উর্দ্দুকে এমনভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলো যা হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেই বুঝতে পারে। (উর্দ্দু তুরস্ক দেশীয় একটি শব্দ যার মানে নিজের অনুচরদের সঙ্গে 'হল্লা' করা) দিল্লী অঞ্চলে যে উর্দ্দু ভাষার প্রচলন ছিল তা পশ্চিমা হিন্দীর অপভ্রংশ এবং পশ্চিমা হিন্দীর উদ্ভব 'প্রকৃত' থেকে আধুনিক হিন্দীতে অনেক দীর্ঘ সংস্কৃত শব্দ ও ইডিয়মটিক গঠন, যা মোটেই সুষ্ঠু নয়, প্রবেশলাভ করেছে। ফারসী-ঘেঁষা শব্দগুলি বাদ দিয়ে আধুনিক হিন্দীতে সংস্কৃত-উদ্ভূত শব্দের বাহুল্য দেখা যাচ্ছে—এ নিয়ম যদি আর কিছুদিন ধরে চলতে থাকে তবে হিন্দী ভাষার কোন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আর থাকবে না, সংস্কৃত-উদ্ভূত এক শাখা ভাষা বলেই তখন একে গণ্য করা হবে। হিন্দী এবং উর্দ্দু উভয়েই একই মূল থেকে উদ্ভূত কিন্তু এই দুই ভাষা দুই বিভিন্ন জিনিষ থেকে পেয়েছে, হিন্দী সংস্কৃত থেকে ও উর্দ্দু তার প্রেরণা পুরাকালের সেই রূপ থেকে যা তাকে নমনীয়তা, লালিত্য, এবং অন্যান্য ভাষা-উদ্ভূত শব্দকে নিজের মধ্যে টেনে নেবার অসামান্য ক্ষমতা দিয়েছিলো। উর্দ্দু ভাষা যখন সবেমাত্র গড়ে উঠছে তখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু সহযোগিতা উর্দ্দু ভাষায় অজস্র ফারসী শব্দ ঢুকবার সহায়তা করেছিলো। আকবরের সময়ে এটা আরও ব্যাপক রূপ ধারণ করে, যখন তাঁর হিন্দু রাজস্ব-সচিব তোডরমল্ল সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের ফারসী ভাষায় কথা বলতে বাধ্য করেন ও যখন ফারসী ভাষা ভারতবর্ষের সরকারী ভাষা হয় তখন তা উর্দ্দু ভাষায় ইডিয়ম ও পদবিন্যাসের ওপর যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো। এরকম হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। এ্যাংলো স্যক্সনরাও নর্ম্মাণ-আধিপত্যের সময় ঠিক এ রকম অবস্থারই সম্মুখীন হয়। মুসলমান আক্রমণকারীরা যে ফারসী ভাষা সঙ্গে করে ভারতবর্ষে নিয়ে এসেছিলেন তা শিভালরী, যুদ্ধ ও প্রেম-এর ভাষা; এবং ধ্বনিময় ও মাধুর্য্যময় শব্দে সে ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল।

একটি জাতির জীবনে এমন একটি সময় মাত্র একবারই আসে যখন সে জাতির কাছে তাদের নিজের ভাষা বিস্ময়কর মনে হয়। বিস্ময়কর মনে হয় শব্দের সজীবতা ও নববলের জন্য, ভাষার প্রাথমিক স্তরে অবস্থানের জন্য, অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনার জন্য। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর উর্দ্দু লেখকগণ ফারসী মহাকাব্য ও পংক্তি কাব্যের মহিমা এবং লালিত্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন, ফলতঃ তাঁরা সরল ও সহজবোধ্য শব্দ-ব্যবহারে অপারগ হন। ফারসী ভাষার মার্জ্জিত শব্দ তাঁদের মোহাচ্ছন্ন করে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর ইংরেজী কাব্য ও গদ্যের ল্যাটিন-ঘেঁষা লিখনভঙ্গীর অন্তর্নিহিত কারণ উর্দ্দু লেখকদের ফারসী-ঘেঁষা লিখনভঙ্গীর কারণের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত। ইংরেজী সাহিত্যে ল্যাটিনের প্রভাব এবং উর্দ্দু সাহিত্যে ফারসীর প্রভাবের কারণ ভিন্ন নয়।

উর্দ্দু লেখকেরা ফারসী ব্যাকরণ ও পদবিন্যাসের অনুকরণ করেন। Governing এবং governed শব্দের তাঁরা স্থান পরিবর্ত্তন করেন এবং এই সব শব্দ যে বিশেষণ ও

substantive-কে qualify করত' তাদেরও স্থানপরিবর্ত্তন তাঁরা করেন এবং ফারসী বাক্যাংশকে 'বা' preposition-এর সঙ্গে ব্যবহার করেন। এই সব পরিবর্ত্তন সনাতন ব্যাকরণের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। কিন্তু ফারসী ভাষার প্রভাব উর্দ্দু ভাষাকে চলতি ভাষার গোত্র থেকে এক সমৃদ্ধপূর্ণ ও কৃষ্টিমূলক ভাষার গোত্রে উন্নীত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্দু ভাষাকে বিভিন্ন সূক্ষ্ম সঙ্কেত ও বৈচিত্র্য-মূলক জ্ঞান প্রকাশের পক্ষে উপযোগী করে তোলে। ফারসী ভাষার সঙ্গে পর্ত্তুগীজ ও ইংরেজী ভাষা উর্দ্দু শব্দ-ভাণ্ডারের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজরা ভারতবর্ষের প্রধান বন্দরগুলিতে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে এবং তখন প্রাচ্যে তারাই সব চেয়ে অগ্রগামী বণিক-সম্প্রদায় ছিল। 'মিশনারি' হিসেবে পর্ত্তুগীজরা এদেশের লোকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসে, ফলে পর্ত্তুগীজ ভাষা এ দেশের বিভিন্ন ভাষাকে প্রভাবান্বিত করে—যথা আসামী, উড়িয়া, মারহাটি এবং দাক্ষিণাত্যে-প্রচলিত উর্দ্দু ভাষা। ঔরংজীবের শাসনকালে সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন ভারত-বর্ষের সরকারী কার্য্যস্থল দাক্ষিণাত্যে স্থানান্তরিত হয় তখন দক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সংযোগ স্বভাবতঃই ঘনিষ্ঠতর হয় ও পর্ত্তুগীজ ভাষার কয়েকটি শব্দ খুব বেশী ব্যবহার হেতু ক্রমে ক্রমে দেশীয় ভাষার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশে যায়। নিম্নলিখিত শব্দগুলির উদ্ভব যে পর্ত্তুগীজ ভাষা থেকে তা এখন আর কজন ভাবেন।—

তাম্বাকু চা সাগু বালতি আলমারি বোতুল সাবুন কার্ত্তুজ
(তামাক) (চা) (সাগু) (বালতি) (আলমারি) (বোতল) (সাবান) (কার্ত্তুজ)
ক্যাপ্তান তোয়ালে গির্জ্জা কামিজ ইংরেজ আয়া পাগার
(ক্যাপ্টেন) (তোয়ালে) (গির্জ্জা) (সার্ট) (ইংরেজ) (নার্স, আয়া) (মাহিনা)
কামরা রুপিয়া।
(কামরা) (টাকা)।

উর্দ্দু ভাষায় ইংরেজীর প্রভাব পর্ত্তুগীজের চেয়ে বিস্তৃততর। ইংরেজী খালি উর্দ্দু 'ভাষার' ওপরই প্রভাব বিস্তার করে নাই পরন্তু উর্দ্দু গদ্য, প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা, heroic poem ও নাটকের ওপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। সেক্সপীয়ার ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রভাব উর্দ্দু কবিদের ওপর সমধিক। পাশ্চাত্ত্য-দর্শনের জটিল ভাবসমূহ ও বৈজ্ঞানিক তথ্য ইত্যাদি প্রকাশ করবার শক্তি উর্দ্দু ভাষার যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। প্রমাণস্বরূপ ধরা যেতে পারে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়—যেখানে প্রথম শ্রেণীর কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্র ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা উর্দ্দু ভাষার মধ্যস্থাতেই দেওয়া হয়। হায়দ্রাবাদের অনুবাদ-সমিতি বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য দেশের বিজ্ঞান-বিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদ করে কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে। ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটীর ডিগ্রী অক্সফোর্ড, ক্যাম্ব্রিজ ও পাশ্চাত্ত্য দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞান-বিষয়ক শব্দের অভিধান থেকে এ কথাটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে উর্দ্দু তার সনাতন রীতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেই নানা ভাষা হতে শব্দ আহরণ করেছে—যথা হিন্দী, সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক, ইংরেজী ইত্যাদি। শব্দ আহরণের সময়ে একটা বিষয়ে নজর রাখা হয়। প্রতি শব্দ যেন ঠিক সেই অর্থ ই অভিব্যক্ত করে যার জন্য সে শব্দকে চয়ন

করা হয়েছে এবং উর্দ্দু ভাষার গঠন-পদ্ধতির খুব বেশী পরিবর্ত্তন যাতে না হয়। কংগ্রেস-শাসিত গভর্মেণ্টসমূহ এমন একটা ভাষা (হিন্দুস্থানী) গড়ে তুলবার পক্ষপাতী যা মার্জ্জিত ফারসী ভাষাও নয় এবং দীর্ঘশব্দ-বিব্রত আধুনিক হিন্দীও নয়। নির্দ্দেশমত ভাষা তৈরী করা যায় এই আদর্শের যথার্থ্য, সময়ই মাত্র স্থির করতে পারে; যদিও এমন একটা ভাষা প্রয়োজনমত গড়ে তোলা হয়ত সম্ভব যে ভাষায় ভারতবর্ষের সকল লোক কথাবার্ত্তা বলতে পারে। কিন্তু উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষা উভয়েই এখন এত বেশী অগ্রসর যে এখন আর এই দুই ভাষা পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক হয়ে যেতে পারে না। উর্দ্দু ও হিন্দীর গতি ও লক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। কিন্তু হিন্দুস্থানী, তা রোমান অক্ষরে বা অন্য যে কোন অক্ষরেই লেখা হোক না কেন, এ দেশের লোকদের সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে কিছুতেই উপযুক্ত হতে পারে না। আর যে ভাষার সাহিত্য নাই সে ভাষা প্রাণহীন হতে বাধ্য। হিন্দুস্থানীর মত কৃত্রিম-ভাবে গড়ে তোলা ভাষায় মহৎ সাহিত্যসৃষ্টি কদাপি সম্ভব নয়, কারণ যিনি যুগপৎ স্রষ্টা ও শিল্পী তিনি সেক্সপীয়ারের আর-মাণ্ডোর মতই হবেন,

"One when the music of his own vain Tongue
Doth ravish like enchanting harmony."

ইস্‌রাৎ হোসেন জুবেরী

তামিল গদ্য

যে গদ্য সাহিত্য সৃজনকারী তামিল ভাষায় সে গদ্যের আবির্ভাবের কথা খুব বেশী দিনের নয়। পণ্ডিতরা অবশ্য বলেন, তামিল ভাষায় গদ্যের আবির্ভাব দুহাজার বছরেরও পুরণো কথা—এক দিক দিয়ে তাঁদের এ কথাটা ঠিক। 'শিলাপ্পাধিকরম', এবং 'বারথ ডেবা' প্রভৃতি বহু প্রাচীন মহাকাব্যে কাহিনীমূলক পদ্যাংশগুলিকে সংবদ্ধ করতে গদ্যের চলন ছিল। পুরাকালের ভাষ্যকারেরা যে গদ্য ব্যবহার করতেন তা অনেকটা সুসংলগ্ন ছিল ও তাঁদের গদ্য সম্পূর্ণরূপে কাব্য-ঘেঁষা ছিল না। কিন্তু মহাকাব্যের গদ্য-সূত্র বা ভাষ্যকারের গদ্য, এদের কোনটাকেই সাহিত্য সৃজনকারী গদ্য বলে উল্লেখ করা যায় না। প্রায় ৫০০ বৎসর আগে জৈনরাই সর্ব্বপ্রথমে তামিল গদ্যে গল্প লেখেন। তখন থেকেই তামিল-গদ্যের আরম্ভ বলে ধরা যেতে পারে।

পুরাকালের গদ্য-লেখকেরা কাহিনী এবং উপকথা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ ও 'বিরাম মুণিবর'এর কাহিনী-সমষ্টি সে কালের গদ্যের উল্লেখযোগ্য অবদান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রবন্ধ ও উপন্যাসের উদ্ভব হয়। 'প্রতাপ মুদালিয়ার চরিথিরাম' তামিল ভাষায় সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস বলে আমার ধারণা। বইটা চমৎকার, যদিও উপন্যাস বলে একে স্বীকার করতে খুব কম লোকই রাজী হবেন। প্রাচীন লেখকেরা এতদিন ধরে গদ্যকে যে উপেক্ষা করে এসেছেন, এটা লক্ষ্যযোগ্য। সাধারণ কথাবার্ত্তায় গদ্যের প্রচলন অবশ্যি ছিল, যদিও এর পক্ষে কোন স্থির ও নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ নেই। কিন্তু কোন বিশেষ প্রমাণের

প্রয়োজনীয়তাও এ ক্ষেত্রে খুব বেশী নয়। কারণ তামিল ভাষার জটিল পদবিন্যাস সম্বন্ধে সম্যক্ সচেতন হয়ে সাধারণ লোকে কথাবার্ত্তা বলছে, এরকম ধারণা হাস্যোদ্দীপক। তখনকার দিনে যাঁরা তামিল ভাষা শিখেছিলেন, তাঁদের শিক্ষার পদ্ধতিটা একটু বিশিষ্ট ছিল, এবং শিক্ষা-পদ্ধতির এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তাঁদের গদ্যের প্রতি উপেক্ষার কিছুটা কারণ মেলে। এইসব শিক্ষার্থীরা কাব্য-রচনার অতি প্রাবল্য দেখে স্বভাবতঃই এর প্রতি আকৃষ্ট হতেন, এমন কি পদ্য-রচনার বিভিন্ন রূপের নিত্য-নৈমিত্তিক অনুশীলনেও তাঁদের বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হ'ত। সুতরাং স্বভাবতঃই তাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস পদ্য-রচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু পদ্যের প্রতি তাঁদের এই অনুরাগ কোন উৎকৃষ্ট ধরণের সাহিত্য-রচনায় সার্থকতা লাভ করে নাই। তামিল পদ্য, বিশেষ করে কয়েক শতাব্দীর আগেকার তামিল-পদ্য, অত্যন্ত মামুলি ও কর্কশ ধরণের, তাদের মধ্যে কোন কোন রচনার সাহিত্যিক মূল্য নেই বললেই চলে, তবে সাহিত্যিক কসরত হিসেবে, তারা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। পদ্যের বিভিন্ন কৃত্রিম রূপের নির্ব্বোধ অনুকরণ ও-শ্রেণীর কবিদের রচনায় ভূরি ভূরি দেখা যায় এবং পদ্য-রচনার এই প্রাচুর্য্যই (যদিও ফাঁফা ও অসার্থক) এই সব কবিদের পদ্যের প্রতি অনুরাগের পরিচয় দেয়। সন্তরতঃ কোন লেখকই সে সময়ে গদ্যকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না এবং গদ্যে সাহিত্য-রচনা করা তাঁদের পক্ষে অভাবনীয় ছিল। ভাষ্যকারকেই 'লেখক' বলে অভিহিত করা তখনকার রীতি ছিল, উঁচুদরের শিল্পীদের আখ্যা ছিল 'কবি'। অতি সাধারণ ভাবাদর্শের অভিব্যক্তির জন্যও গদ্যের বদলে তখন পদ্যের প্রচলন ছিল। এমন কি, খবরও পদ্যে লেখা হ'ত। হয়ত পদ্যের প্রতি এই অদ্ভুত ও বিচিত্র অনুরাগের জন্যই তামিল ভাষায় গদ্যের আবির্ভাব বিলম্বিত হয়েছে, কিন্তু চল্‌তি তামিল-গদ্যের উদ্ভব যে গত শতাব্দীতেই, এটা নিশ্চয় করে বলা যেতে পারে।

যে গদ্যের ইতিহাস এত সম্প্রতিকালের সে গদ্যে অনেক-কিছু দোষ-ত্রুটি থাকা মোটেই আশ্চর্য্যের নয়। পরন্তু তামিল-গদ্য যাঁদের রচনায় বর্ত্তমান রূপ নিয়েছে তাঁদের সংখ্যা খুবই কম। এই অল্প-সংখ্যক লেখকদের মধ্যে বারথিই সর্ব্বপ্রধান। পরবর্ত্তী অনেক লেখক এদের অনুকরণ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন, ফলে তাঁদের ভাষা হয়েছে কৃত্রিম ও প্রাণহীন। 'উদ্দেশ্যমূলক' প্রবন্ধ বা পদ্ধতিহীন 'প্রবন্ধ' (এ রকম লেখাকে 'প্রবন্ধ' আখ্যা দেওয়া যায় কিনা, সন্দেহ আছে) তা ছাড়া তামিল ভাষায় আজকাল কোন উল্লেখযোগ্য গদ্য-রীতি চোখে পড়ে না ; ছোট গল্প সস্তা নাটকীয়ানায় ভর্ত্তি, বিদ্রূপমূলক রচনা সব অপাঠ্য, নভেলগুলি অসম্ভব রোমান্‌টিক কাহিনীর সমন্বয়ে হাস্যকর, ভড়ং ও বিরক্তিকর দৈর্ঘ্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তারপরে অবশ্য 'জীবনী'। দক্ষিণ ভারতের যেখানেই যাওয়া যাক সেখানেই এই 'জীবনী'র কলরব। মহৎ লোকদের (অন্য দেশের) জীবনী। অবান্তর তথ্যে ভরা, তারিখ, কীর্ত্তিকাহিনী এবং মহৎ লোকদের গ্রহণযোগ্য গুণাবলীর উদাহরণে জর্জ্জরিত।

এ কালের লেখকেরা এমন কিছু প্রবন্ধ লেখেন না, যা তাঁদের প্রকৃত মনের পরিচয় দেয়। দু'একজন মৃত লেখক প্রবন্ধ লিখবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আধুনিক

লেখকেরা এ সম্বন্ধে উদাসীন। এ উদাসীনতা শক্তিহীনতারই নামান্তর, কারণ প্রবন্ধ লিখবার মত সূক্ষ্ম প্রকাশভঙ্গী এঁদের নেই—এঁদের ভাষা অতিশয়োক্তির দোষে দুষ্ট এবং রচনা-রীতি সম্বন্ধে এঁদের ধারণা খুব বেশী রকমে প্রাথমিক। নাটক সম্বন্ধেও আধুনিক লেখকদের কোন আগ্রহ নেই। গত ত্রিশ বা চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এমন কোন নাটক রচিত হয় নাই যার কিছুটাও সাহিত্যিক মূল্য আছে। 'মননমণি' গ্রন্থটিই নাটক হিসেবে প্রথম ও শেষ, গ্রন্থটি পদ্যে লেখা ও সম্পূর্ণরূপে অপাঠ্য। গভীর ধরণের ছোট গল্পের অভাব তামিল-সাহিত্যের আর একটা বৈশিষ্ট্য, হাল্কা ধরণের সরস ও কৌতুকজনক গল্পের সংখ্যাও এ সাহিত্যে খুব বেশী নয়।

কিন্তু বৈচিত্র্যের অভাবই তামিল-গদ্যের প্রধান অভাব নয়। বাস্তবতার অভাবই এর সব চেয়ে গুরুতর বিচ্যুতি। যে ভাষার পদ্য এমন সমৃদ্ধ, সতেজ ও বাস্তবপন্থী সে ভাষার গদ্য কেন এত নিকৃষ্ট ধরণের, ভাবতে অবাক লাগে। তামিল গদ্য পদ্যের মত নীরস নিয়মকানুনের ভারে ক্ষতবিক্ষত নয়, তবুও বাস্তবতার গন্ধও তামিল-গদ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাব ও নিগূঢ় উত্তেজনা প্রকাশের পক্ষে তামিল ভাষার মত উপযুক্ত ভাষা খুব কমই আছে, তথাপি এ ভাষায় বর্ণনামূলক গদ্যের অস্তিত্ব একেবারেই নেই। বর্ণনামূলক গদ্য লিখবার চেষ্টা কখনও কখনও করা হয়েছে কিন্তু সফলতার সঙ্গে নয়; এরকম গদ্যকে বরং 'বীজ-তালিকা' গদ্য বলেই নির্দ্দেশ করা উচিত। এ শ্রেণীর গদ্য নাম ও বস্তুর পীড়াদায়ক তালিকায় কোণঠেঁষা ও অসম্ভবরকমে রোমান্টিক ও কৃত্রিম। বারথির প্রতিভা বর্ণনামূলক গদ্য-রচনায় নিয়োজিত হয়েছিল কিন্তু তিনিও উপযুক্ত পরিমাণে বাস্তবপন্থী ছিলেন না বা হতে পারেন নাই। বারথির অনুসরণকারী যাঁরা তাঁরা বারথির এই বাস্তবতার অভাবকেই মাত্র সাফল্যের সঙ্গে অনুকরণ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বারথির পক্ষে 'রিয়ালিষ্টিক' প্রকাশভঙ্গীর কোন দরকার ছিল না, যেমন দরকার ছিল না হান্স্ এ্যণ্ডারসনের পক্ষে। বর্ণনা ও শ্লেষ যে লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্য 'রিয়ালিষ্টিক' প্রকাশভঙ্গী সে বৈশিষ্ট্যকে বরং ব্যাহতই করে। সম্প্রতি অনেকে বাস্তবপন্থী হবার চেষ্টা করেছেন, ফলে তাঁদের গদ্য-রচনা অসম্ভবরকমে কাঁচা ও অমার্জ্জিত রূপ নিয়েছে। গেঁয়ো ভাষায় গদ্য-রচনাকেই এ শ্রেণীর লেখকেরা 'রিয়ালিষ্টিক' বলে মনে করেন এবং এ পন্থা অবলম্বন করে বাস্তবতার গোত্রে তামিল-গদ্যকে টেনে আনবার চেষ্টা এঁদের মধ্যে অনেকেই করেছেন। তাঁদের এই চেষ্টা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু সাহিত্য-রচনায় তবুও তাঁরা ব্যর্থকাম হয়েছেন। উৎকৃষ্ট গদ্য-রচনার যে সব বৈশিষ্ট্য, পরিপূর্ণতা, শব্দ-ব্যবহারের নিপুণতা, সংযম ও একপ্রকারের সঙ্কেত সে সব কোনটাই এঁদের রচনায় চোখে পড়ে না। ক্বচিৎ দেখা যায় দুএকটি লেখকের প্রকাশভঙ্গী বেশ সুস্পষ্ট ও সংহত। কিন্তু উপযুক্ত বস্তুর অভাবে তাঁদের সেই প্রকাশভঙ্গী পঙ্গু হয়ে পড়ে—লিখনভঙ্গী খালি শূন্যতার ওপর দাঁড়াতে পারে না। তবে 'নবীন তামিলের' লেখকেরা মনে করেন খালি লিখবার শক্তি থাকলেই বই রচনা করা যায়, বক্তব্য থাকুক বা না থাকুক তাঁদের পরোয়া নেই। এ ধারণার জন্যই তাঁদের রচনা বক্তব্যহীন, নূতনত্ব বর্জ্জিত। এঁদের লেখা অধিকাংশ গল্প ও প্রবন্ধ (?), হয় ছায়াবলম্বনে লেখা, নতুবা অনুদিত। এই অনুবাদ ও 'ছায়াবলম্বনের' জঞ্জালে

লিখনভঙ্গী কেমন করে উন্নত থাকতে পারে? সৃষ্টিমুখী প্রেরণা ছাড়া সাহিত্য রচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র, যাদের চিন্তা ও লিখনভঙ্গী নিজস্ব নয় তারা সাহিত্যিকও নয়। আসল রচনার যথাযথ ও বিশদ বিবরণ দেওয়াতেই অনুবাদ ও 'ছায়াবলম্বন' সাহিত্যের সর্ব্ববৃহৎ সার্থকতা। কিন্তু সাহিত্য-সৃষ্টি একে কেউ বলে না। 'নবীন তামিলের' লেখকদের একমাত্র কৃতিত্ব হল, 'রিয়ালিষ্টিক' গদ্যের এই ফাঁপা হুঙ্কারজনক অনুকরণ।

প্রাচীন কালের পণ্ডিতেরা পদ্য-রচনা করতেন বিদ্বান ও জ্ঞানী লোকদের জন্য, সাধারণের জন্য নয়। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ তাঁদের কাব্য-রচনার এই সীমাবদ্ধতা ও বিদ্যাভিমান। 'নবীন তামিলের' লেখকেরাও একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকদের জন্য লেখেন কিন্তু তাঁদের রচনা এত নিরীহ ধরণের যে বিদ্যাভিমানের দোষ তাঁদের কেউ দিবে না। সমশ্রেণীর লোকদের জন্যই এঁদের রচনা, যে রচনার কোন কোন সরল বাক্যে চলতি ভাষার ছাপ, কয়েকটি বাক্যে বাস্তবতার গন্ধ। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তামিল ভাষায় হাজার হাজার বই ছাপা হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে বেশীরভাগই অপাঠ্য, কেনার যোগ কোনটাই নয়—যদি না পিছন ফিরে কেউ বারথি ও তাঁর সমসাময়িক লেখকদের দিকে তাকায়।

তবে তামিল ভাষার 'পাঠ্য-বইগুলি' উদ্দেশ্যমূলক। অলসতা ও ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার মোহ থেকে এ-বইগুলি অনেকাংশে মুক্ত। কিন্তু তামিল-গদ্য এখনও তার শৈশব অতিক্রম করে নাই, সেহেতু আশা করা যেতে পারে, চল্‌তি ভাষার প্রতি এই মোহ কেটে গেলে তামিল ভাষায় এক নূতন ও উন্নত-ধরণের গদ্যের উদ্ভব হবে।

তামিল ভাষার এমন কিছু গুরুতর বিচ্যুতি নাই, সাহিত্য-রচনার যে কোন ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা সুপ্রচুর। প্রকৃত সৃষ্টিমুখী সাহিত্য-প্রেরণা ও নূতন কিছু বলবার শক্তি নিয়ে যখন লেখকদের আবির্ভাব হবে তামিল-গদ্যের উন্নতি তখন অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমানে যাঁরা আছেন, আপাততঃ তাঁদের ওপরই আমাদের ভরসা।

পদ্ম নাথন্

সঙ্গীত

উত্তর ভারতবর্ষে অখিল ভারতীয় সঙ্গীত অধিবেশন অত্যন্ত সাধারণ ও পরিচিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন কোন সহরে বছরে দু'তিনটে কনফারেন্স হতে দেখা যায়। জনসাধারণ ও উদ্যোক্তাদের উৎসাহ না থাকলে এটা সম্ভব হতনা। এককালে যখন বেতার-সঙ্গীতের পত্তন হয় নি, ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা এই সূত্রে বিশেষজ্ঞের সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে সাধারণ্যে প্রবাহিত হবার সুযোগ পায়। প্রথমে ওস্তাদী গান প্রীতির চেয়ে ভীতির উদ্রেকই করত বেশী, কিন্তু ক্রমশঃ অভ্যস্ত হওয়ার ফলে আসরে শ্রোতার নিদ্রাকর্ষণ বিরল হয়ে ওঠে। অবশ্য বিরক্তির কারণ এখনও আছে। কারণ অধিবেশনগুলি যে সর্ব্বত্র সুরুচি ও সুবিবেচনার প্রতি দৃষ্টি রাখে এমন নয়। তবু অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও যা বছরের পর বছর নিজের সত্তা বজায় রেখেছে, তার মধ্যে প্রাণশক্তির অস্তিত্ব থাকাই সম্ভব।

প্রথম অধিবেশনগুলির ঠিক মনোরঞ্জন মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। বরোদা, দিল্লী, বেনারস এবং লক্ষ্ণৌতে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের উদ্যোগে ১৯১৬, ১৯১৮, ১৯১৯ এবং ১৯২৫-এ যে অধিবেশন হয়, তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল রাগ এবং সঙ্গীতশাস্ত্রের মূলসূত্রগুলির আলোচনা করা। প্রচলিত রাগের রূপ বিধিবদ্ধ করা এবং অপ্রচলিত রাগগুলি সম্বন্ধে মতভেদ লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন ছিল। এবং এ সম্বন্ধে যা কিছু কাজ হয়, তার নিদর্শন প্রকাশিত রিপোর্টগুলি। সাঙ্গীতিক নানা প্রবন্ধ এবং খ্যাতিমান গাইয়ে বাজিয়ের সমাবেশে সবদিক থেকেই এ অনুষ্ঠানগুলির খুব বড় একটা সার্থকতা ছিল। ১৯২৫'র পর অধিকাংশ অধিবেশন দাঁড়িয়েছে গান বাজনার মজলিশ এবং ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষাস্থল। সঙ্গীত সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রায় উঠে গিয়েছে বল্‌লেই হয়।

ইওরোপে সঙ্গীত সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ ও সুগঠিত। সেখানে উচ্চসঙ্গীতের অনুরাগী শ্রোতার অভাব নেই, ছাত্রছাত্রীর জন্য সর্ব্বত্র সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান আছে, খ্যাতনামা গায়ক বাদক সহজেই যে কোন সহরে নিজের সাঙ্গীতিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন এবং সঙ্গীতালোচনার জন্যে পত্রিকারও অভাব নেই। আমাদের দেশে এ কোনটির সুবিধে নেই, সুতরাং অগত্যা কনফারেন্সের সাহায্যে কোনপ্রকারে এগুলি নির্ব্বাহিত হয়। যেদিন সঙ্গীতের সর্ব্বাঙ্গীণ অনুশীলনের সুব্যবস্থা হবে, অধিবেশনের এক মেলামেশা ছাড়া অন্য বিশেষ কোন উপযোগিতা থাকবে না। কিন্তু ভারতবর্ষে সে আগামী কাল দূরাবলম্বী এবং সেহেতু মধ্যবর্ত্তী অনুষ্ঠানগুলি শোভন ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার অপেক্ষা রাখে।

প্রথম কথা ওঠে অধিবেশনের সময় নিয়ে। সব সময়ে নিজের ত্রুটিগুলি আমরা দেখতে পাই না। বাইরে থেকে যে মতামত দেওয়া হয় তার এই কারণে একটি বিশেষ মূল্য আছে। বিদেশ থেকে অন্যায় সমালোচনাও হয়, তার প্রতিবাদ হওয়া উচিত কিন্তু সত্যি

কথাও কিছু থাকে। Aldous Huxley সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিত, মনে হয় সঙ্গীতেও তাঁর কিছু অধিকার আছে। ১৯২৫'র লক্ষ্ণৌ কনফারেন্সে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং সঙ্গীত সংক্রান্ত মন্তব্য তিনি যা তাঁর Jesting Pilate-এ পেশ করেছেন, ভারতীয় সঙ্গীতানুরাগীর সেগুলি ধীরভাবে বিবেচ্য। " At the end of the second day of the All-India Music Conference I declared strike. Accustomed to the ordinary three-hour day of the European concert-goer, I found myself exhausted by the seven or eight hours of daily listening imposed on me by the makers of the Lucknow programme. There was one long concert every morning, another every afternoon, a third at night. It was too much. After the second day I would not go again. Still, before I struck, I had had sixteen hours of Indian music—enough at home, to hear all the symphonies of Beethoven, with a good sprinkling of characteristic specimens of Mozart and Bach thrown in." আমি ভুক্তভোগী, সুতরাং Aldous'র অভিযোগ সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে আমার কোনও দ্বিধা হয় না। সৌন্দর্য্য উপভোগের চারিপাশে একটি অবকাশ থাকা উচিত। ফতেপুরশিক্রি অনেকের অত্যন্ত ভাল লাগে, তার কারণ তার চারিপাশে দিগন্তস্পর্শী প্রান্তরের আবেষ্টন। তাজমহল বা আগ্রা ফোর্ট এ ভাবে দেখার কোন সুযোগ নেই। সারা মাস অর্দ্ধাশনে থেকে দুদিন ক্রমাগত পোলাও কোর্ম্মা খেয়ে জীবন উপভোগ বা স্বাস্থ্যরক্ষা কোনটাই হয় না। বছরখানেক ভাল গান না শোনার শোধ তুলি তিন বেলা গান-বাজনা শুনে। যে দেশে তিনঘণ্টা ভাল অভিনয় দেখার চেয়ে সারারাত্রি তৃতীয় শ্রেণীর চীৎকার ও গান শোনা রসপ্রিয়তা বিবেচিত হয় সেখানে এর চেয়ে বেশী প্রত্যাশা করা হয়ত অসঙ্গত। সঙ্গীত অধিবেশনে নিকৃষ্ট গান-বাজনার আমদানি কম হয়ে ঘণ্টা তিন প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত শুনতে পাওয়া গেলে শ্রোতার নিদ্রান্ততা বা ক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ কমই ঘটত। কিন্তু কাগজে লিখে প্রতিকারের আশা কম, মার্জ্জিত রুচি উদ্যোক্তা এবং শ্রোতার সহযোগিতার উপরই উন্নতি নির্ভর করে বেশী।

দ্বিতীয় গুরুতর ত্রুটি উচ্চসঙ্গীতে হারমোনিয়মের ব্যবহার। Aldous লিখেছেন, " There were accomplished singers and celebrated players of every Indian instrument—including even the harmonium which, to my astonishment and greater disgust, was permitted to snore and whine in what I was assured was the very sanctuary of Indian music." সঙ্গীত সমালোচক Fox Straugways সাহেব তাঁর গ্রন্থে ও প্রবন্ধে একথা অনেকবার বলেছেন। বাংলা মাসিকপত্রেও এর প্রতিবাদ হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে কোন সুফল হয়েছে বলে মনে হয় না। বিদেশী কাগজপত্রে এবং পুস্তকে এ সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা ও মর্ম্মান্তিক পরিহাস হয়, সত্যকথা নিঃশব্দে হজম করতে হয়। দিন দিন শ্রবণ-সূক্ষ্মতা হারমোনিয়মের কল্যাণে তিরোহিত হচ্ছে, অথচ ভারতীয় তথা প্রাচ্য সঙ্গীতের অমূল্য সম্পদ ও বৈশিষ্ট্য হল সূক্ষ্মান্তর স্বর। মজা এই সাহেবরাই প্রথমে ভারতীয় বিশেষত্বের প্রতি সচেতন হন, তারপর আমরা সারিবেঁধে তাঁদের পশ্চাদ্গমন করি। ব্যাপার এইরকমই দাঁড়িয়েছে যে বিলিতি

সিনেমার যে কোন গায়ক বা গায়িকার কণ্ঠে ভারতীয় অধিকাংশ হারমোনিয়ম-পন্থী ওস্তাদের চেয়ে বিশুদ্ধ স্বর শোনা যায় এবং কিছুদিন পরে এও হয়ত সম্ভব হবে বিলিতি বেতার-সঙ্গীতে ভারতীয় শ্রুতির একমাত্র প্রমাণ আমরা কলকাতায় বসে শুনব। কিন্তু এতটা নিরাশ হবার হয়ত তত কারণ নেই। বরোদা, গোয়ালিয়রে ও লক্ষ্ণৌতে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানে তানপুরো ও সারেঙ্গি উচ্চসঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়। লক্ষ্ণৌ ম্যারিস কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর নবাব আলি ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ হারমোনিয়ম-বাদক ছিলেন কিন্তু উচ্চসঙ্গীতে হারমোনিয়মের ব্যবহার কোনদিন তাঁর কাছে অনুমোদন পায় নি। শান্তি-নিকেতনে সঙ্গীতে হারমোনিয়ম ব্যবহার নিষিদ্ধ। মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে সঙ্গীত-রতন নাসি-রুদ্দিন খাঁ কর্তৃক তানপুরোর সাহায্যে শুদ্ধস্বর বিশদীকৃত হয়েছিল। আব্দুল করিম প্রথমবার যখন কলকাতায় আসেন (১৯২৫ কিম্বা ২৬'এ) দু'টি তানপুরো দুপাশে তাঁর অকৃত্রিম স্বর-বিশুদ্ধতার সহযোগিতা করত। শ্রীমতী কেশর বাই সেদিন তানপুরো নিয়ে সারেঙ্গির সহযোগিতায় রাগরাগিণীর বিশুদ্ধ রূপ প্রকাশ করেছিলেন। কেশর বাইয়ের সমতুল্য গায়িকা কিছুদিন পূর্ব্বেও খুব দুর্লভ ছিল না। তার প্রমাণ গহরজান, শ্রীজান, জোহরা বাই প্রভৃতি। কিন্তু এঁরা কেউ তদনীন্তন সঙ্গীত-সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করেন নি, কারণ বড় গায়কের সংখ্যা তখন পর্য্যাপ্ত ছিল। মেয়েরা যে পুরুষের ন্যায় কোনদিন গাইবেন না এমন কোন কথাই নেই; যেখানে সূচনা আছে সেখানে সম্ভাবনাও থাকে। আজ কেশর বাইয়ের সমকক্ষ পুরুষ গায়ক ভারতে খুব সুলভ নয়। অবশ্য তানপুরোই কেশর বাইয়ের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, তাঁর শুদ্ধ রাগবিস্তার, সুমিষ্ট ও দুরুহ তান, রুচির আভিজাত্য তাঁর গানের সম্পদ। হারমোনিয়মের প্রতি আমার অজ্ঞানতাহেতু ঘৃণা বা বিদ্বেষ জন্মায় নি। অতি বাল্যাবস্থায় হারমোনিয়ম শিখে ও দীর্ঘকাল বাজিয়ে এর দোষগুণ ভাল করে পরখ করবার সুযোগ হয়েছে। বর্ত্তমানে ঠুংরি জাতীয় হিন্দি ও বাংলা গানে হারমোনিয়ম চলতে পারে কারণ শুধু তানপুরোয় হাল্কা গান শোভা পায় না। হারমোনিয়মের আর একটি সুবিধে আছে যন্ত্রটি নিজে বাজিয়ে গাওয়া চলে। কিন্তু এটা সাময়িকভাবে নিতে হবে, চাহিদা বাড়লে সারেঙ্গি বাজিয়ের অভাব হবে না। অবিলম্বে ওস্তাদী গান এবং অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত গান তানপুরো ও সারেঙ্গির সহযোগিতায় হবে এইটাই আদর্শ হওয়া উচিত।

ছেলেমেয়েদের পরীক্ষাই সঙ্গীত অধিবেশনে সবচেয়ে বিসদৃশ ঠেকে। কিন্তু ভাল সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা যতদিন না হয় এও থাকবে। তবে একটা কথা মনে রাখা উচিত যে ভারতীয় সঙ্গীতে Prodigy বা বালপ্রতিভার কোন স্থান নেই। আমাদের সঙ্গীতের মূলকথা হ'ল সৃষ্টি, যে মুহূর্ত্তে মনে হয় যে গায়ক বা গায়িকা মুখস্থ কাজ করে চলেছেন, গানের সমস্ত দীপ্তি নিভে যায়। ১৫।১৬ বছরে স্রষ্টাশিল্পী হওয়া যায় না। অথচ অধিবেশনে শ্রেষ্ঠ ওস্তাদদের সঙ্গে বালকবালিকাও সোনার মেডেল পান এবং এমনই এক আসরে একবার দেখেছি যে মুসলমান গায়ক সবচেয়ে ভাল গেয়েছিলেন, স্বর্ণ বা রৌপ্য পদক পাওয়া দূরে থাক, সামান্য প্রশংসাপত্রও তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। পৃথিবীতে Mozart-র মত অল্পবয়সে প্রতিভার স্ফুরণ

অল্প লোকেরই হয়েছিল, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধেও সমালোচকরা বলতে কুণ্ঠিত হন নি। "As Professor Deut observes in his book on Mozart's operas, 'there is nothing remarkable about La Finta Semplice except that it was the work of a boy' and this applies to all his earliest works . . . . . It was not until he reached about his twenty-fifth year that he began to write the music which was to ensure his immortality. This is early enough, no doubt, but certainly not without precedent in the history of art."—Gray.

তারপর আসে সঙ্গীত শাস্ত্রালোচনার কথা। কয়েকটি অধিবেশনে কিছু এবিষয়ে বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থা ভিন্ন দাঁড়িয়েছে। অধুনা গায়কের জীবিকা অর্জ্জন নির্ভর করে মেয়েদের গান সেখার উপর। বাংলাদেশে একটী রীতি আছে সব মেয়ের বিবাহোপযোগী গান শিখতে হবে এবং বরপক্ষের সামনে পরীক্ষা দেওয়ার পরদিন সব ভুলে যেতে হবে। এ প্রকার পটভূমিকায় গায়কদের সাধারণতঃ কি প্রকার গানের অনুশীলন রাখতে হয় তা সহজবোধ্য। তারপর বেনে সভ্যতার ঔদার্য্যে সিনেমায় যে শ্রেণীর গানের পরিবেশন হয় তাতে উচ্চসঙ্গীতের অস্তিত্ব বজায় রাখা সুকঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সহজ জনপ্রিয় গান গাইতে কারুর আপত্তি নেই, কিন্তু তাই বলে উচ্চসঙ্গীত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এও কাম্য নয়। এখন যদি গায়করা শাস্ত্র ত দূরের কথা, ভাল করে রাগরাগিণী শেখার যৌক্তিকতা বা সময় খুঁজে না পান, তবে সব দোষ কি বেচারী গায়কের স্কন্ধেই পড়বে? হারমোনিয়ম ব্যবহারের জন্য বেশী দায়ী আমাদের সামাজিক আবেষ্টন, খেলো সস্তা গান দিয়ে যেখানে অন্নসংস্থান ও সাধারণের রুচির পোষকতা করতে হয়। আমাদের শিক্ষিত সমাজে সাঙ্গীতিক কিছু যে বুঝবার বা ভাববার থাকতে পারে, তার প্রত্যয় করান দুষ্কর। ইউরোপে সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষণের ও গবেষণার ব্যবস্থা আছে এমন কি ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে বই প্রকাশ ও বিশ্লেষণের যা সুযোগ সেখানে আছে তা ভারতে নেই। সে দেশে সঙ্গীত অধিবেশনে গুটিকয়েক প্রবন্ধ পাঠ গবেষণার প্রহসন রূপে গ্রহণ করতে লোকের বাধে। ভাগ্যক্রমে সাহেবরা আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির সঙ্গীত বুঝতে পারেন নি, নইলে তাঁদেরই লেখা বই থেকে আজ ভারতীয় সঙ্গীত শিখতাম এবং তারপর ভারতীর সংস্কৃতি সম্বন্ধে সহসা গৌরাবান্বিত বোধ করতাম।

হেমেন্দ্রলাল রায়

সিনেমা

অভিনয় : শ্রীভারতলক্ষ্মী।
দেশের মাটি : নিউ থিয়েটার্স লিঃ।

বিংশ শতাব্দীর রূঢ় আলোক মানুষের মনে বুদ্ধি এবং বিচারের বনিয়াদ পাকা করে তুল্‌ছে। কিন্তু এখনো বাঙালীর মন রসাভাসে চৈতন্যযুগীয় অচেতনতায় বিমূঢ়। এই মানসিক অসুস্থতা ব্যবহারিক জীবনে যত প্রচ্ছন্নই থাক্ চারুকলার ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে তা উদ্‌ঘাটিত হবেই। সম্প্রতি ছায়া-চিত্রেও বাঙালীর এই মূর্ত্তিই দেখ্‌তে পাচ্ছি। সস্তা আবেগ বা জোলো ভাবালুতার প্রশ্রয় থাকলে ঘটনার অসম্ভাব্যতা কিম্বা গল্পের দুর্ব্বলতা নির্ব্বিকারচিত্তে বাঙালীদর্শক মার্জ্জনা করে যায়। তার প্রমাণ প্রাচীন 'সোনার সংসার' এবং বর্ত্তমান 'অভিনয়'। অভিনয়ে'র গল্পলেখক বাংলাদেশকে পঞ্চাশ বছর এগিয়ে নিয়ে গিয়েও বাঙালীর ছিঁচকাদুনে স্বভাবটাকেই লুণ্ঠন করেছেন—দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে বাঙালী জীবনের আর কোন বিবর্ত্তনই ঘটে নি ধরে নিতে হবে। দুর্ব্বল লেখক দর্শক ও প্রযোজকের মনস্তুষ্টি করেছেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু সমালোচকের কাছে তিনি অশ্রদ্ধাই পাবেন। প্রথমতঃ, ছায়াচিত্রের যে একটি সুস্থ ও বলিষ্ঠ দিক হতে পারে রুচি সংস্কারের দিক,—সুযোগ পেয়েও তাকে লেখক উপেক্ষা কর্‌লেন; দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে শত-কথিত জীর্ণ সমস্যা পরিবেশন করেছেন তার জন্য পঞ্চাশ বছরের মত সুদীর্ঘ কালের যাত্রা অপেক্ষা করবার প্রয়োজন হয় না—গল্পে তাঁর পঞ্চাশ বছরটা নিতান্তই অবান্তর। এই পঞ্চাশ বছরের সুযোগ অবিশ্যি পরিচালক তাঁর বুদ্ধির অনুপাতেই গ্রহণ করেছেন। তা না হলে 'অভিনয়'-এ মহার্ঘ 'সেট'গুলো দেখতে পাওয়া যেত না। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। তারপর পরিচালকের পরিকল্পনায় পঞ্চাশ বছর পরে বাংলাদেশ আংশিক-ভাবে আমেরিকা হয়ে' গেছে। পরিপূর্ণভাবে হ'তে পারে নি পরিচালকের ভ্রান্তির দরুণ। ১৯৩৮ সনের মডেলে যে তখন ট্রেণ কিম্বা মোটর থাক্‌বে না তাঁর মনে হয়ত সে কথা উদিত হয় নি। অভিনয়ের অভিনয়ে মাত্র তিনটি নাম উল্লেখযোগ্য—শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী, যাঁর অভিনয় অতি-অভিনয় ঘেঁষা আর সে জন্যই সাধারণের সাধুবাদ অর্জ্জনে সমর্থ—শ্রীযুক্ত তুলসী লাহিড়ি যাঁর অভিনয় প্রায় নির্দ্দোষ—শ্রীযুক্তা সাধনা বোস, অভিনয়ে যিনি আড়ষ্টতা মুক্ত হয়েছেন মাত্র, তাতে তিনি অভিনেত্রী হতে পেরেছেন কিন্তু তার ঊর্দ্ধে চরিত্রশিল্পী হতে পারেন নি। আলোকচিত্র কিম্বা শব্দগ্রহণ অপ্রশংসনীয় নয় কিন্তু সঙ্গীতগুলি শ্রবণেন্দ্রিয়ের তুষ্টিবিধান করে না।

অভিনয়ের গল্পে ত্রুটি যতই থাক্, শেষের দিকে ঘটনার জটিলতায় এবং দ্রুত আরোহণ-অবরোহণে তা ছায়াচিত্রের উপাদান হিসাবে একেবারে অযোগ্য হয় নি। কিন্তু 'দেশের

মাটি'র গল্প ছায়াচিত্রে গ্রহণের অযোগ্য। কোন ঘটনার চূড়ান্ত প্রকাশ তাতে নেই, এমন কি গল্পের স্বাভাবিক পরিণতিও স্থানে স্থানে ব্যাহত। হয়ত পল্লীসংস্কারের প্রচার গল্পের পঙ্গুতার জন্য আংশিকভাবে দায়ী কিন্তু সে প্রচারকার্য্যেরও পূর্ণ এবং নির্দ্দোষ রূপ গল্পে অনুপস্থিত। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বর্জ্জিত এবং দৈবপ্রভাবিত ঘটনাবলীতে চিত্রের যে দুঃস্থ অবস্থা কল্পনা করা যায় নিখুঁতভাবে তা 'দেশের মাটি'তে পরিস্ফুট হয়েছে। বলা বাহুল্য যে এ রকম গল্প পরিচালককে বিভ্রান্ত করবে। গল্পকে বিস্তার করতে গেলে প্রচার আঘাত পায়, প্রচারে মনোনিবেশ করলে গল্পকে হত্যা করতে হয়, তাছাড়া জনপ্রিয়তা অর্জ্জনের নেশা ত আছেই। শেষ পর্য্যন্ত এই বস্তুত্রয়ের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে দেখা গেল জনপ্রিয়তাই উপরস্থ হয়ে' পড়েছে। সঙ্গীত প্রাচুর্য্যে চিত্রখানাকে 'অপেরা' বলে ভ্রম করলে দর্শকদের দোষ দেওয়া যায় না। পরিচালকের পরিচালনার ব্যর্থতা এখানেই অভিব্যক্ত। পরিচালক রাসায়নিক নয়, উদজান এবং অম্লজানের মিশ্রণে তৃতীয় পদার্থ জল তার কাছে কেউ আশা করে না। অথচ এ অপ্রত্যাশিত ভোজবাজি 'দেশের মাটি'র গল্প এবং উদ্দেশ্যকে ম্লানতর করে দিয়েছে। অভিনয়ের ত্রুটির জন্যও দায়ী গতিহীন, নিষ্প্রভ সংলাপ। সুদক্ষ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর জনতাও তাই অভিনয়ের উজ্জ্বলতা দান করতে পারে নি। তবু শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী চন্দ্রাবতীকে সেই ব্যূহ ভেদ করে মাঝে মাঝে বাইরে চলে আস্‌তে দেখা যায়। কিন্তু শ্রীমতী উমাশশী অবরুদ্ধই রয়ে গেছেন। নায়ক সাইগল অচল এবং শ্রীযুক্ত অমর মল্লিক চার্লস্ লাটনের অনুকরণে হাস্যকর। তবে আলোকচিত্র বা শব্দগ্রহণ এবং সঙ্গীতকে নির্দ্দোষ বলা যায়—'দেশের মাটি' চিত্রে এই যা সান্ত্বনা।

সমালোচনা

কাদম্বরীর বাংলা তর্জ্জমা

(১)

শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দু ঠাকুর 'কাদম্বরী'র পূর্ব্বভাগের, অর্থাৎ যে অসম্পূর্ণ 'কাদম্বরী' বাণভট্টের রচনা তার একটি বাংলা তর্জ্জমা ক'রে প্রকাশ করেছেন। এই তর্জ্জমা বাংলা সাহিত্যে একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে, একাধিক কারণে।

অনুবাদক তাঁর 'নিবেদনে' এবং মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী গ্রন্থের 'ভূমিকায়' বাণভট্টের হয়ে আধুনিক পাঠকসমাজের কাছে একটু জবাবদিহি করেছেন। বাণভট্ট প্রাচীন কালের লেখক; তাঁর সময়কার সাহিত্যিক রীতি ও রুচির একালের সঙ্গে অনেক গরমিল; তাঁর গুণ-দোষের বিচারে সেকালের মাপকাঠি স্মরণ রাখতে হবে; তাঁর লেখার সম্পূর্ণ রস পেতে হলে মনকে বাঁধতে হবে বাণভট্টের কালের বিদগ্ধসমাজের মনের একসুরে—ইত্যাদি। এর কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। সাহিত্যের রচনাভঙ্গীর কালে কালে বদল হয়, ভিন্ন কালের সাহিত্যের রস ঠিক এক রস নয়—এর চেয়ে সুস্পষ্ট কথা আর কি আছে। এক দেশ ও এক কালের কোন দুই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের লেখার রীতি ও রস এক! সাহিত্যসৃষ্টির এই বৈচিত্র্যই সাহিত্যরসিককে নিত্য নূতন আনন্দের জোগান দেয়। এক অমৃতে তৃপ্ত থাকা হয় ত দেবতাতে সম্ভব, মানুষে নয়। মানুষের সৌভাগ্য যে প্রাচীনকালের সাহিত্য তার নিজের কালের সাহিত্যের মত নয়। যে পাঠকের মন তার সমসাময়িক লেখকদের, প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীবিশেষের লেখকের রচনা ছাড়া আর কোনও লেখায় রস পায় না, পায় কেবল অপরিচয়ের বিমুখতা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তার জন্য নয়—সেকালের কি স্বকালের। গতানুগতিকে অভ্যস্ত এই পাঠকদের কাছে 'কাদম্বরী'র রস বাণভট্টের ভাষায় "অর্করিপোরিবামৃতম্", রাহুর অমৃতপানের মত—হৃদয় না থাকায় গলার নীচে নামে না। দোষ 'কাদম্বরী'র প্রাচীনত্বের নয়, তথাকথিত আধুনিকতা যা আজ গেলে কালই হবে প্রাচীন, তার ক্ষীণদৃষ্টি সঙ্কীর্ণতার। এ তারুণ্য সেই স্থবিরত্বের ছদ্মনাম, অনভ্যস্ত কোনও কিছু যার কাছে বিরস।

(২)

'কাদম্বরী'র প্রকট এবং সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ রূপ হচ্ছে তার সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ। 'কাদম্বরী'র প্রস্তাবনায় বাণভট্ট এই রচনারীতিকে বলেছেন, "নিরন্তরশ্লেষঘনাঃ"—শ্লিষ্ট পদের নিরন্তর প্রয়োগে বাক্য যেখানে ঘনসন্নদ্ধ অর্থাৎ জমাটবাঁধা। এ শ্লেষশব্দের সুকৌশল বিন্যাসে অনেক পদকে যখন একপদ ব'লে মনে হয়, আলংকারিকেরা যার নাম দিয়েছেন 'বৈদর্ভী' শ্লেষ, ভাষার

সে মসৃণত্ব নয়, কারণ সে শ্লেষ সংস্কৃত গদ্য রচনায় একরকম অজ্ঞাত ; এ শ্লেষ হচ্ছে সমাসের আকর্ষণে ও চাপে বহু পদকে প্রকৃতই একপদে জমাট বেঁধে ভাষাকে গাঢ়বন্ধ করা। (১)। সংস্কৃত উচ্চারণের হ্রস্বদীর্ঘ ভেদে এবং অনুস্বার-বিসর্গের টংকার ও দামামা ধ্বনিতে ভাষায় যে বৈচিত্র্য ও গাম্ভীর্য্য আনে অর্থের বিলম্ববোধ্যতার ক্ষতি তা কিঞ্চিৎ পূরণ করে ; কিন্তু বাংলাতে এ রচনারীতি একেবারে অচল। সমাসের এই গুরুভার বাংলার ধাতে অসহ্য। সুতরাং 'কাদম্বরী'র বাংলা তর্জ্জমা পাঠ্য করতে হলে বাণভট্টের লেখার এই 'নিরন্তরশ্লেষঘনত্ব' বর্জ্জন করতে হবে।

রচনার এই ভঙ্গীই যদি হ'তো 'কাদম্বরী'র বড় কথা তবে বাংলা ভাষায় তার অনুবাদের চেষ্টাকে বৃথা শ্রম বলতে হ'তো। কিন্তু ভাষার দিক থেকেও এটা 'কাদম্বরী'র বহিরঙ্গ মাত্র। বাণভট্ট ভাষার যে দৃঢ়সন্নদ্ধ মালা গেঁথেছেন তার প্রতিটি পদ নিটোল মুক্তা। সমাসের সুতো সরিয়ে নিলেও তাদের ঔজ্জ্বল্য ও মসৃণত্বের কিছু ক্ষতি হয় না। শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দু ঠাকুর তাঁর তর্জ্জমায় এই সুতো খুলে ফেলেছেন, কিন্তু মুক্তাগুলিকে প্রায় বহাল রেখেছেন, এবং তা দিয়ে এমন মালা তিনি গেঁথেছেন বাংলার কণ্ঠ ও বুকে যা অতিশোভন। তাঁর তর্জ্জমা হয়েছে সুখপাঠ্য ও সুখবোধ্য, কিন্তু বাণভট্টের শব্দ-চয়নে রং ও রূপের যে মোহ তাকে অনেকটা বজায় রেখে। এ সম্ভব হয়েছে বিশেষ এই কারণে যে সমাসের গ্রন্থি কেটে দিলেও তর্জ্জমার ভাষা কিছুমাত্র শিথিলবন্ধ নয়, চমৎকার গাঢ়বন্ধ। বাংলায় অচল সমাসবদ্ধ শ্লেষ ত্যাগ ক'রে অনুবাদক সেই বৈদর্ভী শ্লেষে সিদ্ধিলাভ করেছেন, আলংকারিকেরা সংস্কৃত পদ্যে যার প্রশংসায় মুখর, কিন্তু সংস্কৃত গদ্য যার পথের সন্ধান পায় নি। সংস্কৃত গদ্যে যদি এ শ্লেষ চলতি থাকতো বাণভট্টের মত আর্টিষ্ট 'কাদম্বরী' লিখতেন দীর্ঘ সমাসবদ্ধ বাক্য দিয়ে নয়, এই অনুবাদের ভাষার রচনারীতিতে।

(৩)

তর্জ্জমার দু-একটা নমুনা দেখা যাক।

শবরসৈন্যের মৃগয়া-কোলাহল থেমে এলো ; যে মৃগয়ার ফলে 'কাদম্বরী'র গল্পের বক্তা শুক বৈশম্পায়নের পিতার হ'লো মৃত্যু, আর মুনিকুমার হারীত শুকশিশুটিকে নিয়ে গেলেন পিতা জাবালি মুনির আশ্রমে। 'অচিরাচ্চ প্রশান্তে তস্মিন্ মৃগয়াকলকলে নির্বৃষ্টমূকজলধর-বৃন্দানুকারিণি মথনাবসানোপশান্তবারিণি সাগর ইব স্তিমিততামুপগতে কাননে'—'ক্ষণপরেই কোলাহল শান্ত হয়ে গেল। হঠাৎ নিস্তব্ধ নিথর হল অরণ্য—ক্ষান্তবর্ষণ মেঘের মত মৌন, মন্থনশেষ সমুদ্রের মত ধীর'।

শবরসৈন্য বন থেকে চ'লে গেলেও বিকৃতদর্শন এক বৃদ্ধ শবর রয়ে গেল এবং বহু শুকপক্ষীর আশ্রয় অনেক তালতুঙ্গ শাল্মলী তরুতে অবলীলাক্রমে আরোহণ ক'রে শাখা থেকে শাখান্তরে

(১) ১৩৩৮ সালের কার্ত্তিকের ত্রৈমাসিক 'পরিচয়ে' "রীতি-বিচার-শ্লেষ" প্রবন্ধে এই দু রকম শ্লেষের একটু দীর্ঘ আলোচনা করেছি। কোনও পাঠক যদি দৈবাৎ তা পড়ে থাকেন, সম্ভব সে আলোচনা তাঁর মনে পড়বে।

বনস্পতির ফলের মত শুকশাবকদের গ্রহণ ক'রে তাদের বিগতপ্রাণ ক'রে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলতে লাগলো। তাদের, 'কাংশ্চিদুদ্ভিত্থমানপক্ষতয়া নলিনসংবর্ত্তিকানুকারিণঃ'—"কারোর পাখা সবে গজিয়েছে, সদ্যফোটা পদ্মের যেন এক একটি পাপড়ি"; 'কাংশ্চিল্লোহিতায়মানচঞ্চু-কোটীন্'—"কারোর চঞ্চুতে সবে দেখা দিয়েছে অরুণ আভা"। বৈশম্পায়নের মা মরেছিলেন বৈশম্পায়নের জন্মকালেই তার প্রসববেদনায়। কিন্তু স্ত্রী-বিয়োগব্যথাকে মনে নিরুদ্ধ রেখে তার পিতাই সন্তানকে একাকী পালন ক'রে আসছিলেন। জরায় তাঁর শরীর কাঁপত। এই সাক্ষাৎ যমকে দেখে 'দ্বিগুণতরোপজাতবেপথুর্মরণভয়াদুদ্‌ভ্রান্ততরলতারকঃ'—মরণভয়ে তাঁর "অঙ্গ কাঁপতে লাগল দ্বিগুণ; উদ্‌ভ্রান্ত হল চক্ষুর তরল তারা"। কিন্তু সন্তানের স্নেহবশে তাকে পক্ষপুটে ঢেকে কোলের মধ্যে নিয়ে বসে থাকলেন। 'অসাবপি পাপঃ শাখান্তরৈঃ সংচরমাণঃ কোটরদ্বারমাগত্য জীর্ণাসিতভুজংগভোগভীষণং প্রসার্য্য বিবিধবনবরাহবসাবিস্রগন্ধিকরতলং কোদণ্ডগুণাকর্ষণব্রণাঙ্কিতপ্রকোষ্ঠমণ্ডকদণ্ডানুকারিণং বামবাহুমতিনৃশংসো মুহুর্মুহুর্দত্তচঞ্চুপ্রহার-মুৎকুজন্তমাকৃষ্য তাতং গতাসুমকরোৎ'।

—"তারপর সেই পাপ···এল আমাদের বাসার শাখায়। আমাদের কোটরের মুখটায় দেখা দিল তার জঘন্য হাত।

সে কী হাত! শীর্ণ কৃষ্ণভুজঙ্গের মত ভীষণ। বুনো বরার চর্ব্বিমাখা। দুর্গন্ধ উঠছে। ব্রণ আর বলীতে ভরা। সাক্ষাৎ যমদণ্ড!

সেই বামবাহুর উপর পিতা মুহুর্মুহু চঞ্চু প্রহার করতে লাগলেন। কিন্তু কত ক্ষীণ! পিতাকে মুহূর্ত্তমধ্যেই হত্যা করলে সেই পাপ।"

যদি কারও ধারণা থেকে থাকে যে বাণভট্ট কেবল কোমল ও মধুর পদ ও ভাবের মালাকর, তাঁর নিজের কথায় 'স্ফুরৎকলালাপবিলাসকোমলা'—সেই ধারণানিরসনের জন্য এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করলেম। বৃদ্ধ শবরের প্রসারিত বাঁ হাত যে 'জীর্ণাসিতভুজংগভোগভীষণং', জীর্ণ কৃষ্ণ ভুজংগের দেহের মত ভীষণ—এ উপমার পারিপাট্য মহাকবিতেই সম্ভব। বৃদ্ধ শবরের কৃষ্ণবর্ণ বাহুর কুৎসিত অমসৃণত্ব ও যে-শুকপাখীদের দিকে সে হাত এগিয়ে আসছে তাদের মনের ভয় এক উপমায় নিঃশেষে প্রকাশ হয়েছে। 'মুহুর্মুহুর্দত্তচঞ্চুপ্রহারমুৎকুজন্তম্'—দুর্ব্বল অসহায় পাখীর আত্মরক্ষার নিষ্ফল চেষ্টার একখানা ছবি, যেমন স্বাভাবিক তেমনি করুণ। অনুবাদক 'উৎকুজন্তম্' কথাটা অনুবাদ থেকে বাদ দিয়েছেন কেন জানি না। ওতে বাণভট্টের ছবিটির অঙ্গহানি হয়েছে।

বাণের 'হর্ষচরিত' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে শুক বৈশম্পায়নের পিতার অপত্যস্নেহের চিত্রে বাণভট্টের আত্মজীবনের একটু ছায়া আছে। বাণভট্টের অতি বাল্যকালেই তাঁর মা রাজ-দেবীর মৃত্যু হলে তাঁর বাপ চিত্রভানু "জাতস্নেহস্তু নিতরাং পিতৈবাস্য মাতৃতাম্ অকরোৎ" —জাতস্নেহ পিতাই মাতার কাজ করেছিলেন।

(৪)

মূল 'কাদম্বরী'র অংশ ও তার অনুবাদ তোলার লোভ সংবরণ করতে হবে। কারণ এ কাজে প্রলোভনের শেষ নেই।

তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী পত্রলেখা কঞ্চুকী কৈলাসের অনুগামিনী হ'য়ে প্রথম আসছে রাজকুমার চন্দ্রাপীড়ের কাছে। 'প্রথমে বয়সি বর্ত্তমানয়া···কিংচিদুপারূঢ়যৌবনয়া'—"কিশোরী; যৌবনের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে।" 'রাজকুলসংবাসপ্রগল্‌ভয়াপ্যনুঝিতবিনয়য়া'—রাজকুলে বাসের ফলে কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভা, কিন্তু বিনয় ত্যাগ করে নি। 'শক্রগোপকালোহিতরাগেণাংশুকেন রচিত-গুণ্ঠনয়া সবালাতপয়েব পূর্বয়া ককুভা'—"শক্রগোপকীটের মত আরক্ত" অংশুকের অবগুণ্ঠন, যেন বালসূর্য্যে উদ্ভাসিত পূর্ব্বদিক। 'বহুলতাম্বুলকৃষ্ণিকান্ধকারিতাধরলেখয়া'—গাঢ় তাম্বুলরাগের কৃষ্ণিমায় অধররেখা অঙ্কিত। 'সমুপবৃত্ততুঙ্গনাসিকয়া'—"গোল হয়ে নেমে এসেছে উচ্চ নাসা, তার মাঝখানের রেখাটি কিছু বঙ্কিম।" 'পর্য্যুষিতধূসরচন্দনরসতিলকালংকৃতললাটপট্টয়া'—পর্য্যুষিত ধূসর চন্দনের তিলকে ঈষৎ বিস্তৃত ললাট চিত্রিত।

এখানে অনুবাদকের বিরুদ্ধে একটু অভিযোগ আছে। পত্রলেখার এই বর্ণনা হচ্ছে সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল সেই বর্ণনা যা যে কোনও কিংচিদুপারূঢ়যৌবনা কিশোরীর রূপ নয়, একমাত্র পত্রলেখার ছবি। কবি তাকে চোখে দেখে এঁকেছেন। এই বর্ণনাসংক্ষেপের জন্য অনুবাদে যা বাদ পড়েছে তাতে পত্রলেখা প্রায় হয়ে পড়েছে ঈষদুদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরী কিশোরীমাত্র। "তাম্বুলরাগে রক্তিম তার অধরের বাঁধুনি" বললে "বহুলকৃষ্ণিকান্ধকারিতাধরলেখা"র কিছুই বলা হয় না। "ভালে চন্দনের তিলক" এক, আর "বাসি চন্দনের ধূসর তিলক" অন্য জিনিষ। অনুবাদক তাঁর 'নিবেদনে' বলেছেন যে সাধারণ্যে যাকে অনুবাদ বলে তিনি তা করেন নি; 'খেয়ালের খাতায়' বীরবল যাকে তর্জ্জমা বলেছেন তাই করেছেন। বহুস্থানেই তাঁর এই "অক্ষরের উপাসনা-ত্যাগ" সমীচীন হয়েছে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু মনে হয় এ জায়গাটায় ও আরও স্থানে স্থানে অক্ষরকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে একটু বেশী পরিমাণে, যার ফলে "পদাবলী-লীন···রসের অনুবাদেও" ঘাটতি পড়েছে। শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দু ঠাকুর এই তর্জ্জমা গ্রন্থে ক্ষমতার যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে একটু চেষ্টা করলেই যে এ লাঘব নিবারণ করতে পারতেন তাতে সন্দেহ নেই।

এই ঈষৎ চটুলমূর্ত্তি কিশোরীর সঙ্গে তুলনার জন্য মহাশ্বেতার শুচিশুভ্র প্রণয়শোকে প্রশান্ত মূর্ত্তিটির পরিচয় দেবার লোভ কষ্টে সম্বরণ করতে হয়। যে দিব্যমূর্ত্তির বয়সের পরিমাণের কথা লক্ষ্যই হয় না, 'দিব্যত্বাদপরিজ্ঞায়মানবয়ঃ পরিমাণাম্।' মনে হয় 'পশুপতিদক্ষিণমুখ-হাসচ্ছবিমিব বহিরাগত্য কৃতাবস্থানম্'—"পশুপতির দক্ষিণ মুখের হাসিখানি যেন বেরিয়ে এসে বসে রয়েছে।" 'লাবণ্যেনাপি কৃতপুণ্যেনেব স্বচ্ছাত্মনা পরিগৃহীতাম্'—লাবণ্য যেন নির্ম্মল চিত্তের সুকৃতির ফলে সে তনুকে লাভ করেছে। 'রূপেণাপি রুচিরলোচনেন বিগতচাপলেনায়তনমৃগেণেব সেবিতাম্'—রূপ যেন বিগতচাপল্য আয়তচক্ষু গৃহহরিণের মত তাকে আশ্রয় করেছে।

কিন্তু আর নয়। পাঠক 'কাদম্বরী'র মূল ও এই অনুবাদ থেকে সে মূর্ত্তির পরিচয় নেবেন। শ্রম বিফল হবে না।

(৫)

'কাদম্বরী'র এই তর্জ্জমার বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে, বিশেষ বাঙ্গালী লেখক-সমাজে, বহুল প্রচার কামনা করি। বাণভট্টের শব্দপ্রয়োগের ঐশ্বর্য্য, তার পদগুলির রূপ রং ও প্রকাশের শক্তি একটা অদ্ভুত ব্যাপার। তার সঙ্গে নিকট পরিচয় হলে বাঙ্গালী লেখকের লেখার উপর ফল ফলবে নিশ্চয়। মূল 'কাদম্বরী' পড়ার আয়াস স্বীকারে যাঁরা রাজী নন, শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দু ঠাকুরের তর্জ্জমা তাঁদের সে ক্ষতি অনেকটা পূরণ করবে। এর এক বাধা তাঁর এই তর্জ্জমা গ্রন্থের দাম। যাঁরা 'কাদম্বরী' পড়লে বাংলা সাহিত্য ও ভাষার উপর তার প্রভাব পড়বে তাঁদের অনেকেরই পাঁচ টাকা দিয়ে এ গ্রন্থ কেনা কষ্টসাধ্য। এই চমৎকার কাগজ-ছাপা-বাঁধাই পুঁথির মূল্য একটাকা করলে শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দুর যে ক্ষতি হবে, বাংলা ভাষার লাভ হবে তার চেয়ে অনেক বেশী। বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের এ পুঁথি বিনামূল্যে উপহার দেবার কথা মনে এসেছিল, কিন্তু কে সাহিত্যিক এবং কে সাহিত্যিক নয় সেই মহাতর্কের নিদারুণ ভয়ে সে পরামর্শ দিতে সাহসী হচ্ছি নে।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

বাংলা কাব্যপরিচয়। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত ও তৎকর্ত্তৃক ভূমিকা সম্বলিত। বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'র প্রথম সংখ্যা।

বাংলা কাব্যসংগ্রহের একান্ত অভাব। একখণ্ডে স্বয়ং সম্পূর্ণ কাব্যসংগ্রহ এখনও বোধ হয় বেরোয় নি, যা নিজের সম্ভারে পাঠককে সন্তুষ্ট করিতে পারে। একাধিক খণ্ডে সম্পূর্ণ সংগ্রহও বোধ হয় নেই। শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেনের 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' গ্রন্থদুটি এতই বিরাট যে তাদের বিপুল কলেবর আয়ত্ত করে নিতে অনেক কসরৎ করতে হয়। তবুও খণ্ডদুটি মূল্যবান, দীনেশচন্দ্রের কীর্ত্তিস্তম্ভ। কিন্তু সে দুটিও অসম্পূর্ণ, ঊনিশ শতকের কিছু দূর এগিয়ে থেমে গিয়েছে, এবং তাতেও পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা স্থান পায় নি, নতুন সংস্করণের অভাবে। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব প্রমুখ কয়েকজন বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে চড়ুই ভাতি করতে করতে এক আধটি কাব্যসংগ্রহ বের করেছিলেন, কিন্তু সেগুলির খুব মূল্য আছে বলে সুধীগণ মনে করেন না। এক কথায়, বাংলা-কাব্যের একটি ভাল সংগ্রহ এপর্য্যন্ত হয় নি। অথচ বাংলাকাব্যের ভাণ্ডার এত বড় হয়ে উঠেছে যে তার কিছু কিছু ছোট হাতায় পরিবেষণ করা দরকার। যে-কোন কাব্যসাহিত্য শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রধান কবির কাব্যসমষ্টি নয়, তার ইতিহাসে গৌণ কবিরাও বেশ খানিকটা স্থান দখল করে থাকেন; কারণ তাঁদের বাদ দিলে সে-সাহিত্যের পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা করা কঠিন হ'য়ে ওঠে।

এক্ষেত্রে বাংলার তথা ভারতের কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অতি বৃদ্ধবয়সেও যে বাংলাসাহিত্যের একটি কাব্যসংগ্রহ বের করেছেন তাতে প্রত্যেক বাঙ্গালীরই, যাঁর কিছুমাত্রও নিজের দেশের কাব্যের প্রতি টান আছে, গর্ব অনুভব করা উচিত। কারণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের

মত বাংলাকাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আর কার থাকতে পারে! যিনি গত ষাট বছর ধরে' বাংলাসাহিত্যকে নিত্যনতুন গৌরবসমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, বাংলাকাব্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর মত ঘনিষ্ঠতা, নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে, আর কারুরই নেই। উপরন্তু তাঁর রুচির অভ্রান্ততা সম্বন্ধে সকলেই নিঃসংশয়, একথার পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র। অতএব তৎসম্পাদিত 'কাব্যপরিচয়'টিকে বাংলাকাব্যের প্রামাণ্য পরিচয় বলে গ্রহণ করতে সাধারণ পাঠক বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করবেন না। এবং বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় যতই ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক হতে থাকবে ততই তিনি এই 'কাব্যপরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথের বাংলাকাব্য-সম্বন্ধে অন্তর্জ্ঞান ও তাঁর সম্পাদনানৈপুণ্যে অভিভূত ও চমৎকৃত হবেন। 'বাংলা কাব্যপরিচয়' বাঙ্গালী-পাঠকের নিজের ভাষার কাব্যজ্ঞানের হবে কষ্টিপাথর (১)।

অবশ্য যে-কোন কাব্যসংগ্রহে পাঠকমাত্রেই কোন না কোন বিষয়ে হতাশ হবেন, একথা অবিসংবাদী। হয়ত এমন কবি বা কবিতা যা পাঠকের মনকে নাড়া দেয় তার কোন উল্লেখই থাকবে না, হয়ত এমন কবিতা ঢুকে যাবে যা অন্যকে বিরক্ত করবে। একথা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ভূমিকাতেই বলেছেন, সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই।

মোটামুটি কয়েকভাবে কাব্যসংকলন করা হয়। কোন ক্ষেত্রে সংকলনের পদ্ধতি হয় কবির গুরুত্বহিসাবে; যাঁর প্রভাব দেশের কাব্যের উপর যত বেশী এই ধরণের কাব্যসংকলনে তিনি তদনুপাতে স্থান অধিকার করেন। সংকলয়িতার উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে প্রতিপত্তিশালী কবির বিভিন্ন ধরণের লেখা ধরে দেখান, যাতে করে পাঠক পরবর্ত্তী বা সমসাময়িক যুগের গৌণ লেখকদের গতিবিধি বুঝতে পারেন ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিয়ে ঐতিহ্যধারাটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কোন সংকলনের উদ্দেশ্য হয় কাব্যসমুদ্র ছেঁচে কয়েকটি মাণিক তোলা; সে সংকলনের মাপকাঠি হয় কাব্যের বিশুদ্ধতা ও উৎকর্ষ; 'ইংরেজি সংকলন গ্রন্থে যেমন মাঝারি শ্রেণীর বিস্তর মাল বোঝাই' (২) থাকে এ-ধরণের সংকলনে সে-ধরণের মাল স্থান না পেয়ে পরিত্যক্তই হয়। (যদিও কোন কাব্য যে বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট সে বিচার করতে গিয়েই যত অনর্থ ও মাথা ফাটাফাটি ঘটে; এবং সে-ধরণের কাব্যবিচার বোধহয় চলেও না)। আর এক ধরণের কাব্যসংকলন হয়, যা নিছক উদ্দেশ্যমূলক; কাব্যসাহিত্যে কোন বিশেষ একটি যুগ বা ধারার আদ্যন্ত দেখানই সে-ধরণের সংগ্রহের উদ্দেশ্য; অথবা কোন-বিশেষ শ্রেণীর কাব্যধারার গতি কোন্‌দিকে তাই দেখান। এ-ধরণের সংগ্রহে অবশ্য অনেক মহারথীও বিনাবাক্যব্যয়ে বাদ পড়ে যান, অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যের উপরে পড়ে 'অতি লম্বা ক্ষতচিহ্ন'। আর এক ধরণের কাব্যসংকলন সম্ভব যা সংকলয়িতার ভাল লাগা মন্দ লাগার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর

(১) এই কাব্যের সম্পাদনাসম্বন্ধে সামান্য একটি অনুযোগ আছে। কালানুসারে কবিদের রচনা সাজালে ভাল হতো; অন্ততঃ প্রত্যেক কবির জন্মতারিখ অনুসারে, এবং সূচিতে নামের পাশে জন্মতারিখ থাকলেও ভাল হতো। এই কাব্যসংগ্রহে যেসব বৈষ্ণবপদাবলী উদ্ধৃত হয়েছে, তাদের রচয়িতাদের সম্বন্ধে অধুনা যে মতদ্বৈধ চলছে, দুঃখের বিষয় সে-আলোচনার কোন দাম দেওয়া হয় নি।

(২) 'ভূমিকা'

করে। (হিটলার বা মুসোলিনি তাঁর নিজের দেশের কাব্যের যদি একটি সংকলন বের করতেন তাহ'লে সেটি কেমন হতো, সে-সম্বন্ধে অনেকেরই প্রগাঢ় কৌতূহল আছে)। কোন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক যদি এই পদ্ধতিতে কাব্যসংকলন করেন, তাহ'লে তার দু'হিসাবে মূল্য হয়; সেই সংকলনে কবির মনের আভাষ পাওয়া যায় ও রুচিসম্মত কতকগুলি কবিতা একত্রে পাবার আশা করা যায়। 'বাংলা কাব্যপরিচয়' শেষোক্ত পদ্ধতিতে করা হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

'বাংলা কাব্যপরিচয়'কে এইভাবে দেখলে বইটির অনেক মোটামোটা অসম্পূর্ণতার কৈফিয়ৎ অতি সহজেই বেরোয় (৩)। কৈফিয়ৎটি এই যে সাধারণ পাঠকের চোখে যা অসম্পূর্ণ কবিশ্রেষ্ঠের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার মধ্যে পেয়েছে সম্পূর্ণতার সন্ধান। সাধারণের কাছে যা নিতান্তই ছেলেমানুষির পরিচায়ক ও প্রাপ্তবয়স্ক কোন লোকের একেবারে অনুপযুক্ত, কবির চোখে তাই দেখা দেয় বিশ্বলীলার একাংশ হ'য়ে; একের কাছে যা রুচিগর্হিত অপরের কাছে তা সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাই 'বাংলা কাব্যপরিচয়ে'র প্রথমেই কেন আলাওল স্থান পেলেন, তার বদলে বৌদ্ধদোঁহার দুএকটি কেন দেওয়া হ'ল না; ছড়া যখন দেওয়া হ'ল তখন খনা ও ডাকের বচন কেন বাদ পড়ল; শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের কোন কীর্ত্তনই কেন নেই; কাণা হরিদত্তকে কেন অন্ধের মত খুঁজেও পাওয়া যায় না; মালাধর বসুর গলায় কেন মালা পড়লো না; মুকুন্দরামের উৎকৃষ্ট ও তাঁর শক্তির যথার্থ পরিচায়ক অংশগুলির পরিবর্ত্তে কেন অতি নিকৃষ্ট ও বৈশিষ্ট্যহীন তিনটি ছড়া দেওয়া হল; কৃষ্ণদাস কবিরাজ যিনি সহসা বাংলাকাব্যকে নতুন শক্তি-সমৃদ্ধিভূষিত করেছিলেন তিনি কেন নীরব; বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের কয়েকটি ভাল দেবীবন্দনা কেন বাদ পড়ল; বংশীবদনের বাঁশী কেন একেবারেই শোনা গেল না; মহাকবি ভারতচন্দ্র কেন সভার একটি অতি সংকীর্ণ কোণ দখল করে রইলেন; গুপ্তকবি কেন স্বরূপ গোপন করেই রইলেন; যাঁর কাব্যে 'বাংলাভাষার যন্ত্রে মিল্‌টনীয় মীড়মূর্চ্ছনা' পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় মুগ্ধ হয়েছেন সেই মধুসূদনের মেঘনাদবধের প্রথম সর্গের ভারতী-বন্দনাটি কেন বাদ পড়ল; রামমোহন, কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেন পাদ্যঅর্ঘ্য দেওয়া হল না; মানকুমারী বসু, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতিরা মাল্যচন্দন হতে কেন বঞ্চিত হলেন; দীনবন্ধু ও দেশবন্ধুর কেন কোন খোঁজই পাওয়া গেল না; ইত্যাদি প্রশ্ন সাধারণ পাঠককে বিচলিত করতে পারে, এবং প্রায় শতাধিক কবির একটি করে কবিতা দেওয়ার কি মানে হতে পারে এই ভেবে তিনি ক্ষুব্ধ হতে পারেন বটে; তবে আমাদের অনুমান যে বাংলাকাব্য সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি এসব প্রশ্নের সমাধান আপনিই খুঁজে পাবেন। অন্যপক্ষে, কালিদাস রায়, বনফুল, কৃষ্ণধন দে, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, উমা দেবী, অপরাজিতা দেবী, দিলীপ সান্যাল, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ক্ষিতীশ রায় প্রভৃতিরা কেন যে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন, একথা ভেবে সাধারণ

(৩) সম্প্রতি ইয়েট্‌স্ আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের যে কাব্যসংগ্রহ বের করেছেন তাতেও অনেক অসম্পূর্ণতা আছে। তবে তাতে যেসব কবিতা স্থান পেয়েছে সবগুলিই অত্যন্ত রুচিসম্মত ও ইয়েট্‌সের ভূমিকাটি অতি মূল্যবান।

পাঠক কূলকিনারা পান না, মনে মনে ভাবেন মহাকবির কাছে সত্যের চেয়ে চক্ষুলজ্জাই বুঝি বা বেশী হ'য়ে দেখা দিল।

আধশতাব্দীর বেশী হ'য়ে গেল রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীজাতকে শিশুর মত হাতে ধরে চিন্তা-জগতের অলিগলি পাকা সড়কের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে চলেছেন; বাঙ্গালীজাতকে বল্‌তে গেলে একরকম তিনিই ভাবতে শিখিয়েছেন, সমস্যা জুগিয়েছেন, চিন্তার উপকরণ সংগ্রহ করে সামনে ধরে দিয়েছেন। সেইজন্য তাঁর সামান্য একটু গদ্য রচনারও দাম অনেক; আলোচ্যগ্রন্থের ভূমিকাটিও সেই হিসাবে মূল্যবান। তাই ভূমিকাটির কয়েকটি কথা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

"এই সংকলনের থেকে আদিরসের কবিতা বাদ পড়েছে।" আদিরস মানে এখানে বোধ হয় বুঝতে হবে নরনারীর মৌখিক প্রেমালাপ কিংবা প্রিয়াপ্রিয় সম্বন্ধে রচনা। অথচ প্রকৃত আদিরসের কাব্য বোধ হয় তাকেই বলা যাবে যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ভারতচন্দ্রের তথাকথিত অশ্লীল বর্ণনাগুলি। এ সত্ত্বেও কয়েকটি বৈষ্ণব আদিরসাশ্রিত কবিতা বেওজর স্থান পেয়েছে। যাই হোক আদিরসের কবিতা কেন বাদ পড়ল তার কৈফিয়ৎ দুটি। প্রেমের কবিতা কামোদ্দীপক এবং তা প্রকৃত রসবোধকে কুপথে চালিয়ে দেয়; এ-ধরণের উক্তিতে অবশ্য প্রত্যেক পাঠকই সকুণ্ঠ অস্বস্তিবোধ করেন। আর একটি যুক্তি পাঠককে বড় পীড়িত করে: "এ-বই অসংকোচে ও নির্বিচারে সর্বজনের হাতে দেওয়া যেতে পারবে।" এমন পাঠক থাকা খুবই স্বাভাবিক যিনি ২৫ বছর বয়সেও শিক্ষক শ্রেণীর কাছে নাবালকোচিত ব্যবহার পেয়ে লাঞ্ছিত হয়েছেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর বাংলা কাব্যক্ষেত্রে ঢুকতে গিয়ে অনুরূপ লাঞ্ছনা পাওয়া দুর্ভাগ্যের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ কি তবে সংকলনটি সুকুমারচিত্ত প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী শিশুদের জন্যে তৈরী করেছেন! বিখ্যাত সম্পাদক বৌডলারের হাতে শেক্সপীয়রের লাঞ্ছনার কথা বিশ্ববিদিত। বৌডলার নাকি পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, বধূ-জামাতা, পৌত্র-পৌত্রী যাতে একসঙ্গে বসে অসংকোচে শেক্সপীয়রের রসপান করতে পারে সেইভাবে বিশ্বকবির লেখার উপর কাঁচি চালিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সুরসিক অধ্যাপক একবার একটি উপভোগ্য টিপ্পনী কেটেছিলেন—যদি কোথাও একটা খাট থাকে, বৌডলার সেটিও ঘাড়ে করে তুলে নিয়ে যান।

ভূমিকায় আর একটি কথা আমরা পাই "এই সংকলন গ্রন্থে আধুনিক বাংলার গদ্যকাব্য থেকে সংগ্রহ করা হয় নি। সে-কাব্যের ভাণ্ডার অতি সংকীর্ণ, তার থেকে বাছাই করে নেওয়া সহজ নয়।" দ্বিতীয় বাক্যটি আমাদের হতবুদ্ধি করেছে। সাধারণ বুদ্ধিতে অবশ্য এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ভাণ্ডার যতই সংকীর্ণ হবে ততই বাছাই করে নেওয়া সহজ; কারণ—বাছাই করবার জিনিষের অপ্রাচুর্য্য। এবং গদ্যকাব্যলেখক বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝায় দুটি কবিকে; রবীন্দ্রনাথ ও সমর সেন। তা ছাড়া এই নিকৃষ্ট সংকলন গ্রন্থের সম্পাদনা কাজটি প্রকৃতই খুব দুরুহ ও আয়াসসাধ্য হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। গদ্যরীতি সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের পথপ্রদর্শক, সে সম্বন্ধে তাঁর বিচারই শিরোধার্য্য করে নিতে হবে। তবু নিশিকান্ত রায়চৌধুরীর 'পণ্ডিচারীর ঈশান কোণে ও দিনেশ দাসের 'মৌমাছি' রচনাটির রীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন

বা দন্দ মনে লেগেই থাকে। সে দুটি যদি ছন্দ হয় তবে গদ্যরীতির প্রতিষ্ঠাতা সমর সেনের রচনা যে আদ্যন্ত পদ্যছন্দোময় সে সম্বন্ধে কারুর কোন সন্দেহ থাকাই উচিত নয়। এবং সে যুক্তি অনুসরণ করলে সমর সেন যে কেন 'কাব্যপরিচয়ে' স্থান পেলেন না সেটা একটা রহস্য।

"উপসংহারে স্বীকার করব অনেক ভাল কবিতা আমার গোচর হয় নি বলেই এ গ্রন্থে তুলতে পারি নি। সে আমার অজ্ঞানকৃত ত্রুটি।"—রবীন্দ্রনাথের এ-ধরণের উক্তি প্রত্যেক পাঠকই ক্ষণিকের জন্যে নিজের প্রশ্নের ধৃষ্টতায় কুণ্ঠিত হবেন। তবুও অবাধ্য প্রশ্ন জাগে : সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অর্কেষ্ট্রা' ও 'ক্রন্দসী' নামে দুখানি বিখ্যাত ও মূল্যবান বই ত বেশ কিছুদিন হল বের হয়েছে, তার থেকে বাছাই না হ'য়ে 'তন্বী' নামে বিস্মৃতপ্রায় একটা ছোট বই থেকে দুটি বাজে কবিতার হঠাৎ কেন বরাৎ ফিরে গেল! আর বর্ত্তমান যখন বছর দশেক অতীত হয়ে যাবে তখন বিষ্ণু দের কাব্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিশ্চয়ই প্রথমশ্রেণীর বলে গণ্য হবে; কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর দুখানি বই 'উর্ব্বশী ও আর্টেমিস' ও 'চোরাবালি' প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কাব্যের অভাবে 'কাব্য-পরিচয়ে'র শেষের অংশটি যে নিতান্তই পঙ্গু হয়ে পড়েছে এবিষয়ে আর সন্দেহ কি! বুদ্ধদেব বসুর একদা যুগ প্রবর্ত্তনকারী 'বন্দীর বন্দনা' থেকে 'শাপভ্রষ্ট' কবিতাটির উদ্ধৃতিতে অবশ্য পাঠক মাত্রেই খুসী হবেন।

বইটির আদ্যন্ত চোখ বুলিয়ে গেলে নানান কথা মনে হয় বাংলা কাব্য সম্বন্ধে। ভূমিকার একটি কথা থেকে থেকে প্রায়ই মনকে নাড়া দেয় : "এই সাহিত্য দুই ভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এর দুই ধারা দুই উৎস থেকে নিঃসৃত। আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় ……।" বইএর মধ্যেও একটা পৃষ্ঠা অব্যবহৃত রেখে এই বিচ্ছেদের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য কাব্যের ইতিহাসে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারা কেমন করে কোন এক সালের এপিঠ আর ওপিঠে সারা ও সুরু হতে পারে এটা সমস্যা বটে। য়ুরোপীয় প্রভাব বন্যার মত এসে এমন পলিমাটি ফেলে গেছিল যাতে দেদার ফসল ফলতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় বন্যা এসে সরে যাওয়া পর্য্যন্ত কেউই অপেক্ষা করে হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন না, বরং নতুন আমদানীর সঙ্গে পুরাণোর কড়া মিশেল দিতেই ব্যস্ত ছিলেন। এবং এই ঋতুপরিবর্ত্তনের কালে যাঁরা (১৮৪৮—১৮৯০) এইরকম কড়া মিশেল দিতে পেরেছিলেন তাঁদের রচনা আজও উপভোগ্য, যাঁরা নতুন স্রোতে নিঃসংশয়ে গা ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁরা তলিয়ে গেলেন। প্রথম দলের লেখকের মধ্যে ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বিদ্যাসাগর, টেকচাঁদ; তাঁদের ছিল যাকে বলা যেতে পারে হিউমর, অর্থাৎ আত্মজিজ্ঞাসু মনের নিরপেক্ষতাভিলাষী দৃষ্টিভঙ্গী। এঁরা ছিলেন যাকে বলা যেতে পারে কড়া জান। এঁদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে পড়েন মুকুন্দরাম, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বংশীবদন, ভারতচন্দ্র, আলাওল। এধারা 'কাব্যপরিচয়ের' ৭৩ পৃষ্ঠাতেই হঠাৎ শেষ হয়ে যায় নি, বরং তা' কবিওলা ঈশ্বর গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র, মধুসূদন, দীনবন্ধু, টেকচাঁদ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন লেখায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু কিছু কাব্যে ও বিশেষ করে 'গোরা' ও 'গল্পগুচ্ছে', এসবের মধ্যে দিয়ে, অবশেষে বাংলাসাহিত্যের বিশেষ দুর্ভাগ্য-

বশতঃ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অমৃতলাল বসু ও অন্ত্যজ সাহিত্যের ভাঁড়ামিতে ভরাডুবি হয়েছে। অবশেষে এই ধারার পুনরুজ্জীবন দেখে আশ্বস্ত হই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দের কাব্যে। এ কাব্যধারার বৈশিষ্ট্য ছিল ভাবালুতামোহমুক্ত চিন্তাকাঠিন্য ও আত্মজিজ্ঞাসা। 'বীরবলে'র বীরবল হয়ত সাহিত্যে আরও ভাল কিছু দিতে পারত ('কাব্যপরিচয়ে' প্রমথ চৌধুরীর 'বর্ষা' ও 'কাঁঠালী চাঁপা' কবিতা দুটি উপভোগ্য) যদি না তা শিশুদের সঙ্গে মিথ্যা লড়াই করে শ্রান্ত হয়ে পড়ত। অন্য ধারা, যার তথাকথিত ভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায়, তা নিছক অনুকরণবশে ও অজ্ঞানতা নিবন্ধন কেমন করে দুর্ব্বল হতে দুর্ব্বলতর হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে তা আমরা ভাল রকমে দেখতে পাই এই 'কাব্যপরিচয়ে'র ১৬৫ পৃষ্ঠা থেকে ৩৪৬ পৃষ্ঠার মধ্যে। মোট কথা হয়ত এই যে য়ুরোপীয় অনুপ্রেরণা হয়ত এতই প্রবল যে তা আমাদের কবিদের স্রোতের মুখে কুটার মত ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, ভাবনা চিন্তার অবসর রাখে নি। তাই এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যেও এমন ধরণের নমুনা পাই যা অগোছালো ও অপরিচ্ছন্ন মনের পরিচয় দেয়। য়ুরোপীয় প্রভাব আমাদের দেশে অবশ্য গুটিকতক ইংরেজ বালক-কবির লেখাকেই বোঝায়—যেমন শেলী, কীট্‌স্, বায়রন, ব্রাউনিং ও সুইনবর্ণ। কারণ মধুসূদনের পরের আমলে দেশী সাহিত্যিকদের মধ্যে বিদেশী ভাষা চর্চ্চা ক্রমশঃই অত্যন্ত কমে আসে, এবং কতকগুলি অপরিণত ইংরেজ কবির কাব্যেই অবশেষে আমাদের দেশে য়ুরোপীয় প্রভাব আটকা পড়ে। তার পরে এল বিখ্যাত বাণী 'আর্ট ফর্ আর্ট্‌স্ সেক' ; তাতে ফল হল এই যে কাব্যে বিষয় আর বিষয়ীর কোন ভেদাভেদ বজায় রইল না। যাঁদের জীবনে কাব্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে তাঁরা বুড়ো খোকার ছড়া নিয়ে ছেনালি সইতে পারেন না। তাই নিছক ছেলেমানুষি কাব্যের মধ্যে পড়ে না। সেই জন্যে পাঠক এই 'কাব্যপরিচয়ে' 'ঘুমের রাণী' (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত), 'ডাকহরকরা' (যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত), 'দেখব এবার জগৎটাকে' (কাজী নজরুল ইস্‌লাম), 'ভাদুরাণী এসো ঘরে' (কালিদাস রায়), 'উড়ো চিঠি' (কিরণধন চট্টোপাধ্যায়), 'কালাপাহাড়' (মোহিতলাল মজুমদার), 'অগ্নিদূত' (সজনীকান্ত দাস), 'ছাত্রী ও ছাত্র' (বনফুল), 'ধুতুরা ফুলের ব্যথা' (কৃষ্ণধন দে), 'পল্লী মা' ও 'কিশোর' (গোলাম মোস্তাফা), 'ঝরণার গান' (রাধারাণী দেবী), 'ভাইফোঁটা' (অপরাজিতা দেবী), 'মজঃফরপুরে ভূমিকম্প' (রামেন্দু দত্ত), 'হারানো টুপী' (কাজী কাদের নওয়াজ), 'বিচিত্রা ধরণী' (প্যারীমোহন সেনগুপ্ত), 'যৌবন ধর্ম্মী' (আশু চট্টোপাধ্যায়), 'মৌমাছি' (দিনেশ দাস) ইত্যাদি চুষি চোষা ধরণের ব্যাপারে অত্যন্ত লজ্জিত ও ব্যথিত হল। মনে মনে খালি ভাবেন কতকাল কাঁচা থাকব, কবে আমাদের বড় বয়সের জ্ঞানবুদ্ধি হবে! এ সবের চাইতে সুকুমার রায় চৌধুরীর কবিতাত্রয় কত যে বেশী সরস তা কে বলবে! কেননা তিনি প্রাপ্তবয়স্ক লোক ইচ্ছে করে ছেলেমানুষ সাজছেন ; কিন্তু উপরোক্তরা সত্যশিবসুন্দরের আরাধনার থলি থেকে এ কী কাদালেপা বেড়াল বের করলেন! 'বাংলাসাহিত্যে কল্পনার এই স্বাভাবিক আবেগ স্রোতে' কালীপ্রসন্ন বর্ণিত জোয়ারের মুখে বিষ্ঠার মত এ কী জঞ্জাল!

ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি বাঙালী নাকি কাব্যপ্রিয় জাত। খুব সম্প্রতি বিশ্বপ্রিয় শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের মুখে শুনেছিলেম যে একটুখানি চাঁদের আলো, একটু গলার সুর পেলে বাঙ্গালীর মন অমনি কাব্যসরস হয়ে ওঠে। ভূমিকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ কথাই বলেছেন: "কাব্য বা শিল্প রচনায় বাঙালির কল্পনাবৃত্তির স্বাভাবিক আকর্ষণ ও লীলানৈপুণ্য আছে।—একথা বলতেই হবে, রস-রূপ সৃষ্টি করতে মানুষের যে-কল্পনাবৃত্তি আনন্দ পায় বাঙালির তা যথেষ্ট পরিমাণে আছে।" এ ধরণের আত্মঘোষণা অবশ্য লজ্জাদায়ক গ্লানিতে মলিন; এবং রসঘন আনন্দের পরিবর্ত্তে যখন নিছক ভাবালুতার মুক্তসত্র দেখি তখন মন বিরূপ হয়। উঠতি বয়সের ছেলের মধ্যে যে ভাব দেখে বাড়ীর মেয়ে 'কাব্যিপনা' আখ্যা দেন এই 'কাব্যপরিচয়ে' রবীন্দ্র পরবর্ত্তী অধিকাংশ কবির রচনায় সে ভাব দেখে পাঠক ক্ষুণ্ণ হ'ন। এই ধরণের কাব্যিপণা ও উপরোক্ত ছেলেমানুষ কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন রচনায় নেই। দেখে শুনে মনে হয় আদিরসের কবিতা বাদ পড়েছে ভালই হয়েছে, তা না হলে আরও অনেক ন্যাকামী ভরা ইনানো বিনানো কথায় পাঠককে ক্লিষ্ট করা হত। কেননা আমাদের সাহিত্যে প্রেমের কবিতার চাইতে প্রেমে-পড়ার কবিতাই আছে বেশী।

সাহিত্যের ইতিহাসে কয়েকজন লেখকের, তাঁদের রচনাসম্পদ ছাড়াও, আরেক ধরণের বিশেষ মূল্য থাকে, তাঁরা ইংরেজি ভাষায় যাকে বলা যায় releasing force. ইংরাজি সাহিত্যে একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ যেমন স্পেন্সার, আমাদের সাহিত্যে মধুসূদন দত্ত, অপেক্ষাকৃত গৌণহিসাবে, রামপ্রসাদ বা (৪) বিহারীলাল। আমাদের সহিত্যে এই ধরণের উৎসারী শক্তির পরিচয় দেন মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন। এই ধরণের শক্তির বিশেষ গুণ এই যে এই ধরণের শক্তিসম্পন্ন লেখকের আজ্ঞায় পড়ে তাঁদের পরবর্ত্তী লেখকরা লিখতে শেখেন। অর্থাৎ তাঁদের কাব্যস্রোত শুধু পুরাণো জঞ্জালের ধসেই ফেলেনা, অধিকন্তু পিছনে ভাল পলিমাটী ফেলতে ফেলতে এগোয়; সেই পলিমাটীতে আবার কিছুকাল ভাল ফসল ফলতে থাকে। বাংলাসাহিত্যের বিশেষ দুর্ভাগ্য এই যে রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তি শুধু বিরাট একটি অভ্রভেদী পাহাড় হয়েই উঠেছে, এবং সে পাহাড় বাংলার কাব্যধারার পথ আটকে রেখেছে, সুতরাং সে ধারাকে এখন পাহাড় পরিক্রমণ করে পথ খুঁজতে হচ্ছে। বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ যে releasing force হতে পারেন নি তার কারণই হচ্ছে তাঁর রচনাশৈথিল্য ও কীর্ত্তির বিরাটত্ব, যা অল্প ক্ষমতাপন্ন লেখকের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সেই জন্যেই তাঁর পরেই বাংলাকাব্যপূজারীদের এই শোচনীয় দুর্গতি। কবির কীর্ত্তি বিরাট হলেই যে তাঁকে releasing force হতে হবে তার কোন মানে নেই। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও সমর সেন যে পুনরায় সেই লুপ্তপ্রায় কাব্যধারার পথ বের করে নিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, ও কথঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করেছেন, সেটা প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষেই আশার বিষয়।

---

(৪) এ সংগ্রহে রামপ্রসাদের পরবর্ত্তী কবিওলাদের কাব্যসংকলনই উৎকৃষ্ট হয়েছে।

আগের একটি কথা আর একটুখানি টেনে যেতে ইচ্ছা করছে। মুকুন্দরাম, কৃষ্ণদাস, ভারতচন্দ্র, কবিওলা ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, টেকচাঁদ, দীনবন্ধু, বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্নের কাব্য ও গদ্য প্রভৃতির মধ্যে যে দৃঢ়তা, যে ভাবকাঠিন্য ও ঋজুতা দেখতে পাই তা কোথায় কবে, কেমন করে হারিয়ে গেল! আর তাঁদের রচনার সামর্থ্য, সংহতি, দৃঢ়বদ্ধতা, হিউমর, চিত্রময়তাও অবিসংবাদি! কিন্তু

কোথায় গেলেন তাঁরা
পাইনে কোন সাড়া!

তার পরিবর্ত্তে যে ভাবালুতা, কাব্যিপণা ও ন্যাকামীর আমদানী হয়েছে তারই বা উৎস কি? সে উৎস কি আমরা তবে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যেই খুঁজব এবং রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু কাব্য রচনায় এত শিথিল সমাধি, শব্দগুণের প্রতি এত ঔদাসীন্য, প্রকৃতিবর্ণনার আড়ালে মনের এত শূন্যতা, পদ্যগদ্যের এত অনবস্থাদোষ এবং রসেটীবর্ণিত 'fundamental brain-work'-এর এত অভাব হঠাৎ বাংলা কাব্যকে এত ঘুনধরা করে দিল কেমন করে। রবীন্দ্রনাথ এত ভেংচানি কেন সহ্য করলেন এবং নিজেকেই বা কেন এত অনুকরণ করলেন!

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রবচন মনে পড়ছে, উদ্ধৃত করাই ভাল ঃ

'Poetry ought to be as well written as prose.'

"Poetry" introduces a distinction between good verse and bad verse; but we have no one word to separate bad prose from good prose. As a matter of fact, much bad prose is poetic prose; and only a very small part of bad verse is bad because it is prosaic.'

'Poetry is composed of words.'

'Poetry is characterised by condensed affect এবং 'poetry is gist and pith.' 'Landscape is a passive creature which leads itself to an author's mood. Landscape is fitted too for the purposes of an author who is interested not at all in men's minds, but only in their emotions; and perhaps only in men as vehicles for emotions.'

আত্মশ্রেষ্ঠম্মন্যতা আসলে দুর্ব্বল লোকের হীনবোধেরই নামান্তর। বস্তুতঃ মনে হয় কাব্য সম্বন্ধে এত তো আত্মস্তুতি শুনে এসেছি, কিন্তু আমাদের বাংলাসাহিত্যের যথার্থ সম্পদ কতখানি? অনেক 'ইংরেজি সংকলন মাঝারি শ্রেণীর মালে বোঝাই' একথা ঠিক, কিন্তু 'কাব্যপরিচয়' কি ধরণের মালে বোঝাই! নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কারে আর কতদিন আমরা মত্ত হয়ে থাকব!

'ফাঁটা ডিমে আর তা দিয়ে কি ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবেনা ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে?
কেবল শূন্যে চলবেনা আগাগোড়া।

অশোক মিত্র

চোরাবালি—শ্রীবিষ্ণু দে প্রণীত। প্রকাশক : ভারতী-ভবন, দাম এক টাকা বারো আনা।

"উর্ব্বশী ও আর্টিমিস্" লিখে' বিষ্ণুবাবু বাঙ্‌লা কাব্যে যে উজ্জ্বলতা ও নূতনত্বের আভাস এনেছিলেন, তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "চোরাবালি"তে তা' স্বতন্ত্র সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। যাঁরা আধুনিক কাব্য-বিষয়ে উৎসুক বিষ্ণুবাবুর লেখা পড়ে' তাঁ'র অসামান্য প্রতিভায় নিশ্চয়ই তাঁরা মুগ্ধ হ'য়েছেন এবং তিনি যে আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি, ছন্দের ওপর দখল যে তাঁ'র অসামান্য, তাঁ'র কবিতায় ব্যঙ্গ যে অদ্ভুত শাণিত ও তীব্র এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই তাঁ'দের সন্দেহ নেই। অবশ্য বাঙ্‌লা দেশ ও বাঙলা কাব্য চিরকালই হতভাগ্য। ভালো কবিতা লেখার চেয়ে ঘোড়দৌড়ে হঠাৎ টাকা পেলে নাম হয় এখানে বেশী।

এ-বইয়ের প্রকৃত সমালোচনা লেখা আমার পক্ষে একেবারেই সহজ নয়। সে রকম পাণ্ডিত্য তো দূরের কথা, এঁর অনেক কবিতা বুঝ্‌তে পারার মতো লেখাপড়াও আমার নেই। তবে প্রকৃত যা' কাব্য সঙ্গীতের সঙ্গে বোধ করি তা'র তুলনা করা যেতে পারে : যে গানে প্রাণ আছে পাকা ওস্তাদকে তা' যেমন মুগ্ধ করবে, প্রায় তেমনি করবে অনেক জটিলতা থাকা সত্ত্বেও গান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ আনাড়িকে। ভালো কবিতা ও ভালো গান মনের এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে অনুভূতির ঝড় তোলে, তা' বোঝার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী বা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে অনেক-পুঁথি-পড়া বিদ্যের প্রয়োজন হয় না। এবং এই ভালো-লাগাটাই কাব্যের মূল কথা : কবিতা যদি ভালো লাগে সেখানেই তা'র চরম সার্থকতা—না-ই বা বোঝা গেল তার অনেক কথার মানে, অনেক ঐতিহাসিক-পৌরাণিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত। অবশ্য সেই সঙ্গে এ কথাটাও ঠিক, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান যদি প্রচুর থাকে তা' হলে পূর্ণ রস আস্বাদন করায় আনন্দের মাত্রাটা আরও বাড়বে—সেটা উপরি পাওনা। তবে একথাও সত্যি যে জ্ঞানের অভাব রসবোধের পথে বিঘ্ন হ'তে পারে না এবং সে কারণে কবিতার মূল আবেদন ব্যর্থ হয় না। এবং আমার মতে সেগুলিই হচ্ছে প্রকৃত ভালো কবিতা, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাক্‌লেও যা' ভালো লাগবার বিঘ্ন ঘটে না।

"চোরাবালি"র ভেতর এরকম কবিতার অভাব নেই, বরঞ্চ প্রাচুর্য্যই দেখ্‌তে পাই। বিষ্ণুবাবুর কবিতা সম্বন্ধে অনেকের মনেই একটা বিভীষিকা আছে। স্বীকার করি তাঁ'র কবিতায় অনেক শক্ত কথা, অনেক সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক-পৌরাণিক ইঙ্গিত, এমন কি বৈজ্ঞানিক মতবাদও আছে ; কিন্তু তা' সত্ত্বেও বেশীর ভাগ কবিতাই মুগ্ধ করে, যেমন এ-বইয়ের প্রথম কবিতা 'ঘোড়সওয়ার' :

দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী ! বর্শা তোলো।
কেন ভয় ? কেন বীরের ভরসা ভোলো ?
নয়নে ঘনায় বারবার ওঠাপড়া ?

চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি ?
হৃদয়ে আমার চড়া ?

চেষ্টা কর্‌লে এর ভেতর সাইকলজির ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই পাওয়া যা'বে, কিন্তু তা' না জান্‌লেও এর বলশালী দৃপ্ত ভঙ্গি ব্যর্থ হয় না। অন্যান্য কবিতা থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত কর্‌ছি :

হৃদয় আমার ঘরছাড়া যে গো ডাকে।
আমি চঞ্চল তাই, তাই সুদূরের পিয়াসী।
আমি তাই তো আকাশে কাণ
পেতে শুনেছি তোমার গান, হে মোনালিসা, হে সাইনারা !

* * *

বহু দূর দেশে জড়তার গ্লানি মেখে সহরের বুকে জরতী সন্ধ্যা নামে।
(কবিকিশোর—৫)
বৈশাখী মেঘ মেদুর হ'য়েছে সুদূর গগন কোণে

* * *

সময়ের খনি শতছিদ্র, বিস্মৃতি-কীট কাটে।

* * *

উষসী আকাশ ধূসর করেছে মরণের আনাগোনা।
(ক্রেসিডা)

এই সমস্ত অটুট ও সুন্দর ছন্দ, অদ্ভুত রূপক পড়্‌তে পড়্‌তে চম্‌কে উঠ্‌তে হয়।

কবিতাকে নদীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যেখান দিয়ে তা' বয়ে যায় সেখানকার আবেষ্টনীর ছায়া তা'তে পড়্‌বেই : কখনও নীল লাল আকাশ আর সোনালী দিগন্ত, মাস্তুলের আর ধূমধূলিধূসর পাণ্ডুর সন্ধ্যার কখনও বা। আধুনিক জীবনকে নিরাশা আর ব্যর্থতা হানা দিয়ে যায়, সভ্যতার শুক্‌নো আলোয় তা'র কঙ্কাল ওঠে স্পষ্ট হ'য়ে। বিষ্ণুবাবুর কবিতায় এ সব চিত্র চমৎকার ধরা পড়ে'ছে, রোমান্টিসিজ্‌ম্‌এর সান্ত্বনায় তিনি মুগ্ধ ও অন্ধ ন'ন :

প্রায়োপবেশনে শশকবিষাণ গোণা !
ভঙ্গুর স্নায়ু কণ্টক অগণন।
স্বপ্নেরা হ'ল ফণিমনসার বন।
জন্মে প্রণয়ে মরণে জীবন শেষ।

এই সব উজ্জ্বল লাইন পাশ্চাত্য কবি এলিয়ট্‌কে স্মরণ করিয়ে দেয় যেখানে তিনি বল্‌ছেন : This is the dead-land, This is cactus-land. এবং এ-দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে তাঁ'র বইয়ের নাম 'চোরাবালি' সম্পূর্ণ সার্থক হ'য়েছে।

তাঁ'র ব্যঙ্গ তীর্য্যক ও তীব্র। রবীন্দ্রনাথের অনেক বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ কবিতাকে তিনি তাঁর কার্য্যসিদ্ধির জন্যে অবলম্বন ক'রেছেন। যেমন :

এমনি করে' ফিরেছি পথে পথে
অনেক দূরে ফিটনে পদরথে।

ভস্ম-অপমান শয্যা ছেড়ে, পুষ্পধনু !
দিকে দিকে ঘুরে বেড়াও ডন জুয়ানের বেশে !

* * *

ড্রয়িংরুমে—হে অতনু ! বীরতনুতে সাজো

সত্য তো বটে শরীর-ধর্ম্ম লোপাট আজ।
আদিম স্নায়ুর প্রতিক্রিয়ায় মুক্তি নেই।

(নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ)

প্রেমের সেই আইডিয়্যালিস্‌টিক্ রূপকে তিনি ব্যঙ্গ ক'রেছেন, মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাই শুধু প্রেমও যেন ক্লান্তিকর। যেমন :

অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, ভালো তাই তো বাসি,

* * *

না হ'লে ঝঞ্ঝা ফেল্‌তো যে সারা জীবন ঘিরে'।

(গার্হস্থ্যাশ্রম—কন্‌ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স)

কিন্তু মানুষ কেমন করে' যে এই বাঁচে—
মানে, এই প্রেমে কাব্যি করেই সারাটা জীবন কাটিয়ে যে দেয় !

* * *

নতুন তো নেই কিছুই ! এখন কর্‌ব কি যে !

(মন-দেওয়া-নেওয়া)

অশয়নায়োগ্র ধমনীশিরার পরমতৃষা
নিদ্রাহীনের রজনীতে চায় চরমভোলা
স্নায়ুদাবদাহে যযাতিশিরার প্রবল গানে।

* * *

তাই তো হৃদয় নির্দ্দয় লোভে তোমারে মাগে
নাটকীয় সুরে প্রলাপ-কম্প্র তোমার গানে।

(যযাতি)

বিষ্ণুবাবুর কবিতায় পাঠককে যা' সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করে তা' হচ্ছে ছন্দ। এর বৈচিত্র্যে, এর কারুকার্য্যে মুগ্ধ হতেই হয়। কখনও শোনা যায় যেন ঘোড়ার খুরের ধ্বনি, কখনও বা তা' স্তব্ধ ও সমাহিত।

বিষ্ণুবাবু পণ্ডিত লোক, এবং তিনি শক্তিশালী কবি সন্দেহ নেই। নিপুণভাবে নিজের পাণ্ডিত্যকে তিনি কাব্যে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু এক-এক জায়গায় তাঁ'র পাণ্ডিত্য রসবোধের পথে কাঁটার মতো বিঘ্ন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; এই ধরণের চেষ্টিত গাম্ভীর্য্যের জন্যে কতগুলি কবিতা এমন দুর্ব্বোধ্য হ'য়ে প'ড়েছে যা'তে তাঁ'র মত পাণ্ডিত্য পাঠকের যদি না থাকে তা'কে নিরাশ হ'তে হ'বে। যে পাণ্ডিত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ, কীট্‌স্, শেলীকে বোঝা যায় তা'র সাহায্যে বিষ্ণুবাবুর কবিতা বোঝা কষ্টকর, এমন কি স্থানবিশেষে অসম্ভব। এবং এ' কারণেই তাঁ'র পাণ্ডিত্য কবিযশের পথে হয়তো প্রকাণ্ড একটা অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াবে।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। আমার তো মনে হয় এ' ধরণের ভূমিকার কিছুমাত্রও প্রয়োজন ছিল না। কবির প্রতিভা তাঁ'র নিজের রচনাতেই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। নিজের স্বাতন্ত্র্যে ও ঔজ্জ্বল্যে এই কবিতাগুলি যখন উজ্জ্বল তখন আর দীর্ঘ ভূমিকার সার্থকতা কী?

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অষ্টাদশী—হুমায়ুন কবির (নওরোজ পাবলিশিং হাউস), দাম এক টাকা।
মানস-বিরহ—শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী (বাগ্‌চী এণ্ড সন্স্‌), দাম আট আনা।

আঠারোটি সনেট নিয়ে "অষ্টাদশী" রচিত। প্রেমবিরহ, আশানিরাশা, আনন্দবেদনা এবং সর্ব্বোপরি কবিরের ভারতপ্রীতি প্রভৃতি ভাবাবেগে এই সনেটগুলি সমৃদ্ধ। যদিচ এই সমস্ত বিভিন্ন ভাবাবেগ কিছুটা মামুলি ধরণের তথাপি কোথাও কবিকে আয়াস অনুকরণ করতে দেখা যায় নি। এই সমস্ত পুরাতন বিষয়বস্তু নিয়ে লিখতে গিয়ে যেখানে সহজেই নাটকীয় ভণিতা এবং উচ্ছ্বাস আসা সম্ভব ছিল, সেখানে কবি যথাসম্ভব নিজেকে বাঁচিয়ে চলেছেন। ফলে সনেটগুলির কাঠামো পুরনো বিষয়বস্তুর আধার হয়েও অত্যন্ত দৃঢ়। এখানে বলা আবশ্যক যে, কবিরের প্রায় অধিকাংশ সনেটই ব্যক্তিগত মানসিক পরিস্থিতির সাক্ষ্য দেয়। কাজেই অধিকাংশ সনেট যদিচ ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে রচিত, তথাপি কবি তাঁর ভ্রমণকালে স্থানকাল ভুলে গিয়ে স্মরণ করেছিলেন ব্যক্তিগত পাত্রটিকে। ফলে হাইডেলবার্গ, গ্যটিঙ্গেন, ম্যুনসেন, প্যারিস ইত্যাদি স্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি যতটা না পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশী পাওয়া যায় তাঁর মানসিক স্মৃতিবিজড়িত জীবনের ইতিবৃত্ত। বলাই বাহুল্য যে, বিদেশ-ভ্রমণ-কালে যে কোনো কবির পক্ষেই এ মনোভাব আসা একেবারে অসম্ভব নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কি এর হাত থেকে একেবারে রেহাই পেয়েছেন? আমার বিবেচনায় কবির এই আত্ম-উপহতি কখনো কখনো তাঁর কাব্যে একটা 'obsession' হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে তাঁর

ব্যক্তিগত জীবনের virtue কাব্যে যদিবা কখনো vice-এ পরিণত হতে দেখা যায়, তাতে আর বিস্মিত হবার কোনো কারণ থাকে না। এবং :

ভুলিবারে করেছিলে, কে দিয়েছে ফুল।
সে কী সখি ভোলা যায়?—বাতাস আকুল
দোলায়ে ফুলের গুচ্ছ কয়ে যায় কানে
গোপনে কাহার নাম?

কিংবা

দেহের সীমানা টুটি তীব্র তিক্ত তপ্ত অশ্রুজলে
ব্যর্থকাম চিত্ত মম কাঁদিবে তোমার লাগি তবু
—নিবিড় মিলন মাঝে তোমারে যে নাহি পাই কভু।

অথবা

সে যদি থাকিত কাছে! এ দূর প্রবাসদেশে বসি
সকল হৃদয় ভরি একটী নিশ্বাস পড়ে খসি।

ইত্যাদি ধরণের স্মৃতিনিপীড়িত nostalgic লাইন ভাল সনেটের মধ্যে ক্বচিৎ কদাচিৎ হুঁচোট খেতে থাকে। অবশ্য এ ধরণের দুর্বল লাইনের সংখ্যা কম, এবং চেষ্টা করলেই কবির বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে পারতেন, এমন কি নিতান্ত মামুলি বিষয়বস্তু বজায় রেখেও। কবিরের ভাষা সতেজ ও সাবলীল হলেও স্থানে স্থানে দুষ্ট। ইচ্ছে করলেই এগুলি এড়িয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু যে কোনো ছিদ্রান্বেষীর পক্ষেও যে নিম্নোক্ত সনেটটি প্রথম শ্রেণীর বলে মনে হবে সে বিষয়ে কি কারুর সন্দেহ থাকবে?

দক্ষিণে পর্ব্বতখানি ব্যগ্র হয়ে তীক্ষ্ণ নাসা মেলি
সমুদ্রে পড়েছে ঝুঁকে। আদিম কালের অতিকায়
বিস্মৃত সরীসৃপও প্রাণঘাতী বিপুল তৃষায়
উদ্‌গ্রীব আবেগে দিল সিন্ধুজলে আপনারে ফেলি।
মাংসপেশীপুষ্ট দৃঢ় রোমহীন দীর্ঘ গ্রীবাখানি
রেখাসম প্রসারিত স্কন্ধ হতে সবল প্রয়াসে,
সিন্ধুবক্ষ তরঙ্গিত শ্রমশ্রান্ত প্রবল নিশ্বাসে
সফেদ ফেনার রেখা দিক হতে দিগন্তরে টানি।

যুগযুগান্তর পরে সে পশুর নাহি আজি প্রাণ।
সুতীব্র পিয়াসা তবু মেটে নাই সমুদ্রের জলে।
উদ্‌গ্রীব আবেগ তার পর্ব্বতের শীতল কঠিন
প্রস্তররেখার মাঝে জেগে থাকে দীর্ঘ রাত্রি দিন।

তাই আজো অগ্নি-দগ্ধ নিদাঘের দীপ্ত সূর্য্যতলে
পিপাসা শান্তির পথ একমনে করিছে সন্ধান।

ইদানীং "কবিতা"পত্রে হেমবাবুর কবিতা পাঠের পর "মানস-বিরহ" কাব্যগ্রন্থ আমার কাছে কিছুটা আশ্চর্য লাগল। যদিচ এই কবিতাগুলি দশবছর আগে লেখা, তথাপি তাঁর কাব্যের এতটা পার্থক্য সত্যই বিস্ময়কর। বলাই বাহুল্য যে, "কবিতা"পত্রে হেমবাবুর কবিতা পাঠ করবার পর আলোচ্য গ্রন্থের কবিতাগুলি পাঠককে নিরাশ করবে। যদিও ভাষা ও ছন্দের ওপর হেমবাবুর হাত খুবই দক্ষ, তবুও এই মননহীন স্বাচ্ছন্দ্যই পাঠককে সব চেয়ে বেশী পীড়া দেয়। কবিতাগুলি যে পরিমাণে ভাষা ও ছন্দে নিঁখুত সে পরিমাণে রসাত্মক ব্যঞ্জনাপূর্ণ নয়।

তুমি এসেছিলে কবে লঘুপদে চটুল চঞ্চল
আতাম্র আম্রের বনে মুগ্ধা বাসন্তিকা—
কত সুর-শিহরণ, কতদূর মূর্চ্ছনা উচ্ছল—
সদ্যস্ফুট বকুলের সুস্নিগ্ধ মালিকা।

এ লাইনগুলি কালিদাস রায় বা সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র লিখতে পারতেন, এবং তাতে আশ্চর্য হবার কিছু থাকত না। এখানে কাব্যের বিষয়বস্তু এতই পুরনো যে, ভাষা ও ছন্দের মাধুর্যও তাকে সজীব করে তুলতে পারে না। অতি সাধারণ মামুলি বিষয় নিয়ে কবির যে পরিমাণে মননের পরিচয় দিয়েছেন সে পরিমাণ মনন হেমবাবুর মধ্যে পাই না। বলাই বাহুল্য যে, আমার এ মত একমাত্র "মানস-বিরহ" সম্বন্ধেই খাটে, হেমবাবুর অন্যান্য কবিতা সম্বন্ধে আমার মত স্বতন্ত্র।

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চমী ও অন্যান্য গল্প—শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত। প্রকাশক—ভারতী ভবন। দাম পাঁচসিকা।

এই ছোট বইখানিতে সাতটি ছোট গল্প আছে। তার মধ্যে কতকগুলি নিতান্তই ছোট, আরম্ভ হ'তে না হতেই, গল্পের দানা বাঁধতে না বাঁধতেই শেষ হয়ে যায়; আর কতকগুলি রীতিমত উচ্চাঙ্গের সাহিত্য। এগুলি নানা সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় রচিত বলে বেশ বোঝা যায়।

বিমলাপ্রসাদ নিপুণ শিল্পী। তিনি জানেন মনোলোকের চিরবিলাসিনী আফ্রোদিতির জন্মমুহূর্ত্তে তার বরতনুর চারিদিকে কেমন করে' রহস্যের স্বচ্ছ কুয়াশা ঘিরে দিলে তা' আরও কাম্য হ'য়ে উঠে। "দম্পতী" গল্পের অরূপ নায়িকার আকর্ষণ প্রেমের প্রথম ধাপে এসে থেমে গেছে। কবি একটা চপল হাসির হাওয়ায় সাগরাম্বর-বিহারিণীর সকল মোহ উড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু পাঠকের সাধ হয়,—চোখ বুজে সেই অশরীরী বাণী যাঁর কণ্ঠ থেকে আসছে, তাঁর রূপ কল্পনা করতে। কবি হেসে বলছেন, সবটাই ভুল—নিতান্ত গল্প। ভুলে যখন আনন্দ পাওয়া যায়, তখন সে ভুল কে ভাঙতে চায় ও এই রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী বিপুল বিশ্বরচনাও ভুল, মায়ার বিজৃম্ভন, কিন্তু নিতান্ত বৈদান্তিক ছাড়া কে আর এভুল ভাঙতে চায়? শীতকালের প্রত্যূষে সূর্য্য

উঠেছে বলেই যে সুখশয্যার কবোষ্ণ আলিঙ্গন ত্যাগ করতে হবে এমন কিছু নিয়ম আছে কি? "দম্পতী" গল্পটি মনের এমন তারে আঘাত করে যায়, যার আনন্দের রেশ সহজে মিলায় না। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ ইহাকে বলতেন ধ্বনিকাব্য। এই গল্পটির আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, এর under plot-এর অশরীরী বাঙ্ময়ীর আকর্ষণ ছেড়ে দিলেও যে plot-এর মধ্যে তাকে জড়িয়ে পরিবেষণ করা হয়েছে তার রূপবতী কল্যাণী দেবীও বড় অল্প মনোহারিণী নন।

বইখানির অনেকগুলি স্ত্রী-চরিত্র বড়ই মনোজ্ঞ। "দীপ্তির মোহ" বোধ হয় কবিকে বিশেষ করে' আচ্ছন্ন করে' রেখেছে, তাই তার স্তব গান ক'রে গ্রন্থের অবসান করেছেন। এটি গল্প বেঁধে উঠে নি, একটু মনস্তত্ত্ব দিয়ে সাঁতলান বড় উপাদেয় বস্তু। গল্পগুলি সাজানর মধ্যে একটু রহস্য আছে তা' কবির ইচ্ছাকৃত কিনা তিনিই জানেন। গ্রন্থের সিংহদ্বারে "সুষ্যি ঠাকরুণের" পরুষ মূর্ত্তি 'দূরমপসর' বলে' ভ্রুকুটিভঙ্গী করে' সম্মার্জ্জনী তুলে দাঁড়িয়ে আছে, আর গ্রন্থের অন্তঃপুরে তথা স্বামীর অন্তরে বসে লীলাময়ী দীপ্তি চিন্তাশূন্য সরলতার সঙ্গে সানন্দে সংসারের খুঁটিনাটির মধ্যে নিমগ্ন আছে। মাঝে অনেকগুলা মহল পেরিয়ে আসতে হয়। পথটা সমস্তই যে স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন কুসুমসুরভিত তা' বলা যায় না। মুকুলিকা অনিমাকে ছেড়ে আসবার পর "পঞ্চমী"র দর্শন পাওয়া পর্য্যন্ত পথে কোনও সুন্দরী সহযাত্রিণীও মেলে না। "ডাকবাক্সের" কাছে অনেক্ষণ বৃথা অপেক্ষা করতে হয়, আর "নতুন পাঁচালীর" সুরে আস্তিন গুটিয়ে পাড়াগেঁয়ে বাস্ ঠেলে ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয়। "পঞ্চমী"র সরস স্নিগ্ধ আতিথেয়তায় কিন্তু সে ক্লান্তি সহজেই কেটে যায়।

গল্পগুলি সযত্নে মক্স করে' পরিপাটি করে' লেখা নয়, একটা সহজ অবহেলার ভাবে লেখা বলে' বোধ হয়,—লেখক যেন পাঠকের কাঁধে হাত দিয়ে ইচ্ছামত অনর্গল গল্প করে' যাচ্ছেন, তাঁর বাহবা পাবার জন্য একটুকুও উৎসুক নন। এই অনায়াস অনর্গল গল্পের মধ্যে যে শিল্পনৈপুণ্য ফুটে উঠেছে, তা' বিমলাপ্রসাদ স্বভাবশিল্পী বলেই ফুটেছে। অনেক স্থলে ভাষাবিদের মার্জ্জিত করবার প্রচুর অবসর আছে, কিন্তু তা'তে অবিরল বলার স্রোত বাধা পাবে মাত্র। শিল্পীর দানকে প্রসন্ন মনেই গ্রহণ করতে হয়। পাঠকের মনে আনন্দের অনুরণন জাগাতে পেরেছে বলেই তা' সার্থক হ'য়ে উঠেছে।

সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

Published and Printed by K. C. Banerjee at the Modern Art Press, 1/2, Durga Pituri Lane, Calcutta, Edited by Humayun Kabir and Buddhadeb Bose.

আশ্বিন, ১৩৪৫-এ চতুর্থ বর্ষ আরম্ভ

বার্ষিক ১৷৷০
ভি-পি ১৸৵০

কবিতা

প্রতি সংখ্যা
ছ' আনা

কবিতা ও কাব্যসমালোচনার ত্রৈমাসিক পত্র

সম্পাদক ঃ বুদ্ধদেব বসু ঃ সমর সেন

নিয়মিত লেখকদের নাম ঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন, বুদ্ধদেব বসু, হেমচন্দ্র বাগ্‌চী, নিশিকান্ত, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক বাংলার প্রত্যেক প্রতিভাবান কবি কবিতায় লেখেন, তাছাড়া অজ্ঞাততম তরুণ শক্তিশালীকে অঙ্গীভূত করা কবিতার বিশেষ লক্ষ্য। গত তিন বছরের মধ্যে এই পত্রিকা একাধিক নবীন কবিকে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছে। শুধু কবিতার পৃষ্ঠাতেই বর্ত্তমান বাংলা কাব্যের প্রগতি ও পরিণতি লিপিবদ্ধ। আপনি যদি কবিতা ভালোবাসেন, এই পত্রিকাটি না-হ'লেই আপনার চলবে না ; তাছাড়া সাহিত্যের ছাত্রের পক্ষেও কবিতা অবশ্যপাঠ্য।

প্রতি সংখ্যায় কবিতা ছাড়াও আধুনিক কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা ও কাব্যসংক্রান্ত প্রবন্ধ থাকে।

বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা

(বৈশাখ, ১৩৪৫)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত, সমর সেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণু দে, লীলাময় রায়, হমফ্রি হাউস ও হুমায়ুন কবির—এই এগারো জন লেখকের এগারোটি প্রবন্ধ সম্বলিত। কাব্যের ভাববস্তু ও আঙ্গিকের নানাদিক থেকে। এ-জাতীয় গ্রন্থন বাংলাভাষায় আর নেই। দামে আট আনা, কিন্তু যাঁরা তৃতীয় বর্ষ থেকে গ্রাহক হবেন তাঁরা বিনামূল্যে পাবেন! সাড়ে ন' আনার ডাকটিকিট পেলে ভারতবর্ষের যে-কোনো ঠিকানায় পাঠানো হয়। একটি ছাড়া কবিতার সমস্ত পুরোনো সংখ্যাই পাওয়া যায় ; ৪৵০ আনায় সমস্ত পুরোনো সংখ্যা (মোট বারোটি) দেয়া হয়—ডাকমাশুল লাগে না।

সম্পাদক ঃ কবিতা

কবিতা-ভবন—২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা

Copy.

চতুরঙ্গ

[পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা চৈত্র ১৩৪৯]

মুসলীম রাজনীতির হেরফের

হুমায়ুন কবির

সমস্ত পৃথিবীতেই বর্ত্তমানে আসন্ন বিপ্লবের পূর্ব্বাভাষ। মানুষের ভাগ্য নিয়ে যে খেলা চলেছে, তার পরিণতি কোথায় কে বলতে পারে? কেবলমাত্র একটী কথা নিঃসন্দেহ। পুরাতন পৃথিবীর পরিচিত চেহারা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়েছে। শুধু যে রাজ্য, দেশ ও জনপদের সীমানা বদলিয়েছে, তা নয়, সেই ভাবে অথবা হয়তো আরো গভীর ভাবে মানুষের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার রূপ ও প্রকৃতি পর্য্যন্ত চোখের সামনে রূপান্তরিত হচ্ছে। সমস্ত দুনিয়ার এ পরিবর্ত্তন যে ভারতবর্ষকেও পরিবর্ত্তিত করবে, এ কথা স্বতোসিদ্ধ। পৃথিবীর মানুষ পুরাতন আদর্শ ও আশ্রয়ের বন্দর ছেড়ে আজ অজ্ঞাত গন্তব্যের সন্ধানে দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়েছে। সে পথচলায় ভারতবাসীও ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, যোগ দিতে বাধ্য, এবং তারা যোগ দিয়েছে। সমস্ত পৃথিবীর মতন ভারতবর্ষও যুগসন্ধিক্ষণে আপনার পথ ও কর্ত্তব্য নির্ণয়ে উদগ্রীব।

ভারতবর্ষের জীবনে মুসলমান সম্প্রদায়ের গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। চারিদিকের আন্দোলন ও চাঞ্চল্যে তাদের মনেও সাড়া জেগেছে, কিন্তু অন্যের মত নানা দিকের নানা টানে তারাও বিভ্রান্ত। বিভিন্ন ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক আদর্শ যুগপৎ তাদের টানছে। ধর্ম্ম ও ঐতিহ্যের বিচিত্র শক্তি তাদের মনেও সক্রিয়, এবং এ সমস্ত আদর্শ ও আকর্ষণের গতি ও লক্ষ্যও বহুক্ষেত্রেই বিভিন্ন। বর্ত্তমানকে বুঝতে হলে তাই অতীত ইতিহাসের আলোচনা প্রয়োজন, কারণ বর্ত্তমানের সমস্যা ও সমাধান দুইয়েরই ভিত্তি সুদূর এবং অদূর অতীতের

মধ্যে নিহিত। নিখিল ভারত মুসলীম লীগের সূত্রপাত, পরিণতি ও বিকলনের পশ্চাদপটে ভারতীয় মুসলমানের সাম্প্রতিক অবস্থান ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার সন্ধান বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

গত দশ বৎসরে মুসলীম লীগের ভাগ্যবিপর্য্যয় বিস্ময়কর। বিত্তশালী মুষ্টিমেয় মুসলমান অভিজাতের উদ্যোগে ১৯০৬ সালে লীগের প্রতিষ্ঠা, এবং সূত্রপাতের সময় থেকেই রাজনৈতিক নিরাপত্তার দিকে তার দৃষ্টি। সে সময়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে বিপ্লবী মতবাদের সূচনা দেখা দিয়েছে, এবং সেই বিপদসঙ্কুল ও চরম রাজনৈতিক কর্ম্মপন্থা থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে দূরে রাখাই লীগ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য। মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থরক্ষার দাবী নিয়েই লীগের জন্ম, এবং কর্ম্মসূচীর গোড়াতেই লীগের প্রতিষ্ঠাতারা ঘোষণা করেন যে ইংরেজের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা সে স্বার্থরক্ষার একমাত্র উপায়। কারণ দেওয়া হয় যে তখনো শিক্ষা, অর্থ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায় এত পিছিয়ে রয়েছে যে ইংরেজের সহায়তা ভিন্ন তাদের নিজের স্বার্থরক্ষার শক্তি নাই। তখনকার দিনে অন্য বহু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মতন লীগও কিন্তু কেবলমাত্র বিতর্কসভা হয়েই রইল। দশ বছর অর্থাৎ ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত আবেদন ও নিবেদনের বোঝা বয়েই তার কর্ম্মধারার পরিসমাপ্তি। কংগ্রেসও ততদিনে বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লবী অধ্যায় শেষ করে আবার নিয়মতান্ত্রিক নিরাপদ রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছে—তাই ১৯১৬ সালে যে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সমঝোতা হবে এটা খুব আশ্চর্য্য নয়।

ভারতীয় রাজনীতির মোড় ঘুরবার সময় কিন্তু সেদিন আসন্ন হয়ে এসেছিল। তখন মহাযুদ্ধ চলছে এবং ১৯১৬-১৭ সালে তার প্রতিক্রিয়ায় মরানদীতে জোয়ারের সূচনা দেখা দিয়েছে। অন্নবস্ত্রাভাবে ভারতবর্ষের অদৃষ্টবাদী জনসমুদ্রেও যে চাঞ্চল্য ও আলোড়নের সুরু, জালিয়ানওয়ালাবাগের শোচনীয় ঘটনায় তার পরিণতি সমস্ত দেশে বিক্ষোভ তীব্রতর করে তুলল। তুরস্কের ভাগ্যবিপর্য্যয় সে বিক্ষোভে ইন্ধন জোগালো—ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় খেলাফতের পুনর্প্রতিষ্ঠার দাবীতে সক্রিয় আন্দোলনে যোগ দিল। ১৯২০-২১ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে অসহযোগ আন্দোলন আসমুদ্রহিমাচলের সর্ব্বত্র নতুন জীবনের প্লাবন এনেছিল, তাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ পর্য্যন্ত টলে উঠে। স্বাধীনতার সেই সংগ্রাম ঘোষণায় মুসলীম লীগও যোগ দিয়েছিল, কিন্তু সক্রিয় আন্দোলন সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে পড়ল। লীগের সংগঠন ও কর্ম্মসূচীতে

সক্রিয় আন্দোলনের স্থান ছিল না, তাই অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমানের যে কর্ম্মতৎপরতা মওলানা মহম্মদ আলীর নেতৃত্বে খিলাফৎ কমিটীর মারফতেই তা প্রকাশ পেয়েছে। ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলীম লীগের নাম প্রায় মুছে এল এবং লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই সরকারের অনুগ্রহপ্রত্যাশীর দলে নাম লেখালেন। সে অনুগ্রহ তাদের জুটলও—১৯১৯ সালের ভারতীয় শাসন সংস্কারে যাঁরা সরকারকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রায় সকলের ভাগ্যেই সরকারী প্রসাদ জুটেছে।

অসহযোগ আন্দোলন নানা কারণে সিদ্ধিলাভ করে নি। গান্ধীজীর এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজলাভের ভরসা নিরাশায় পরিণত হল—অবশেষে চৌরীচৌরার ব্যাপারে তিনি অকস্মাৎ আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। বাইরেও ঘটনাসংস্থান অপ্রত্যাশিতভাবে বদলে গেল। কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্ক যেদিন খিলাফতের বিলোপ ঘোষণা করল, সেদিন ভারতীয় খিলাফৎ কমিটীর অস্তিত্বের ভিত্তিও ধ্বংস হয়ে গেল। আন্দোলনের উৎসাহ ও উদ্দীপনার শেষে এল গভীর অবসাদ ও আত্মঅবিশ্বাস। রাষ্ট্রিক লক্ষ্যসাধনে ব্যর্থতার ফলে জনমানসে যে প্রতিক্রিয়া, সাম্প্রদায়িক সন্দেহ, অপ্রীতি ও সংঘর্ষে তা আত্মপ্রকাশ করল। সক্রিয় আন্দোলনের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হওয়ায় নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি আবার প্রকট হয়ে উঠল। খিলাফৎ কমিটীর অকালমৃত্যুতে মুসলীম লীগ আবার ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করল। অসহযোগ সংগ্রামের অবসানে রণক্লান্ত কংগ্রেসের মধ্যেও নিয়মতান্ত্রিকতা দেখা দেওয়ায় কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আবার নতুন করে বোঝাপড়ার চেষ্টা সুরু হল। সমস্ত দল ও সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ভারতের নতুন শাসনতন্ত্র রচনার চেষ্টাও প্রবল হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু নানা কারণে এ চেষ্টা সফল হতে পারেনি। একটী প্রধান কারণ এই যে ততদিনে কংগ্রেস ইংরাজের সম্বন্ধচ্যুত পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ভাবতে সুরু করেছে, কিন্তু সেদিনও লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন বৃটীশ আওতায় ডোমিনিয়ন রাজের প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেসের কর্ম্মধারাতে স্বাধীনতার আদর্শ নিয়ে গলদ ও মতভেদ ছিল। স্বাধীন ভারতের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে মতান্তর তো ছিলই, তা ছাড়াও রাষ্ট্রিক, আর্থিক ও সংস্কৃতিগত অনেক পার্থক্য সম্বন্ধেও সেদিন কংগ্রেস পূরোপূরি ভাবে সজাগ হয়নি। স্বার্থের যে ঐক্যকে ভিত্তি করে কংগ্রেসের স্বরাজসাধনা, সে ঐক্য অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠির স্বার্থবৈচিত্র্যের সমন্বয় করতে পারেনি, কিন্তু ঐক্যের মোহে সে পার্থক্যকে ভুলবার চেষ্টা করলেও পার্থক্য তাতে লুপ্ত হয়নি।

বোঝাপড়ার চেষ্টা চলছে, এরই মধ্যে এল পৃথিবীব্যাপী আর্থিক বিপর্য্যয়। ভারতীয় জনমানসে তার যে প্রতিক্রিয়া, তারই অভিব্যক্তি ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে আবার কংগ্রেস সর্ব্বভারতীয় মানসকে জয় করে নিল—সংগ্রামবিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষে আন্দোলনবিমুখ মুসলীম লীগের কথা তলিয়ে গেল। অসহযোগ ও খিলাফতের যুগে ভারতীয় মুসলমান যে উৎসাহে ও যে সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল, এবার তা ঘটল না বটে, কিন্তু এবার যারা যোগ দিল তারা এল নিছক রাজনীতির আহ্বানে। ১৯২০-২২ সালে অসহযোগের আন্দোলনে অনেকেই এসেছিল ধর্ম্ম প্রেরণায়। খেলাফতের যুগে মুসলীম নেতৃত্ব এনেছিলেন মওলানা মহম্মদ আলী, হাকিম আজমল খাঁ প্রমুখ সক্রিয় আন্দোলনে বিশ্বাসী কর্ম্মবীরের দল—এবার সীমান্ত প্রদেশের খোদাই খিদমতগার নেতা খাঁ আবদুল গফ্‌ফার খাঁর নেতৃত্বেই ভারতীয় মুসলমানের রাজনৈতিক চেতনা মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌ল। অহিংস ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ভিত্তিতে পাঠান জিরগাদের মধ্যে খোদাইখিদমতগার আন্দোলনের স্রষ্টা হিসাবে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে খাঁ আবদুল গফ্‌ফার খাঁর স্থান অবিস্মরণীয়।

১৯৩০-৩২ সালে মুসলীম লীগের যে দুরবস্থা, বোধহয় পূর্ব্বে কোনদিন তা হয়নি। লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মুসলীম কন্‌ফারেন্সের সৃষ্টি হয়, এবং সরকারী অনুগ্রহ এ সময় কন্‌ফারেন্সের ভাগেই বেশী জুটত। ১৯২৮-২৯ সালে লীগ পর্য্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে কিছুদিন একই সঙ্গে দুটী লীগ চলল। কলকাতায় আলবার্ট হলে যখন লীগের একটী অংশের বাৎসরিক সভা, ঠিক সেইদিন সেই সময়েই হাওড়ায় লীগের অন্য অংশের বাৎসরিক অধিবেশন। গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের কথাবার্ত্তা যখন হয়, তখনও লীগের কোন প্রতিনিধিকে সেখানে ডাকা হয়নি। জিন্না সাহেব প্রথম অবস্থায় লীগবিরোধী ছিলেন, কিন্তু ১৯১৬ সালে লীগে যোগদানের পরে ক্রমে ক্রমে তিনিই লীগের মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ান। প্রথমবারের গোলটেবিল বৈঠকে তাঁর আমন্ত্রণ হয়েছিল, কিন্তু পরে তাঁকে বাদ দেওয়া হয় এই বলে যে মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর তাঁর কোন প্রভাব নাই, কাজেই মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হবার তাঁর যোগ্যতা নাই। বৃটীশ রাজনৈতিকদের মুখের কথা ছিল এই, কিন্তু জিন্না সাহেবকে বাদ দেওয়ার আসল কারণ অন্য। ইংরেজের হাত থেকে ভারতীয়ের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী করেছিলেন বলেই যে তাঁকে আর পরে নিমন্ত্রণ করা হয়নি একথা নিঃসন্দেহ। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে লণ্ডনের টাইমস পত্রিকা তাঁর সম্বন্ধে

স্পষ্টভাবেই বলেছিল যে সমাগত প্রতিনিধিদের মধ্যে একমাত্র জিন্নাসাহেবের কণ্ঠেই বেসুর বাজছে। ইংরেজের কানে সেদিন জিন্না সাহেবের দাবী বেসুর বাজবে, এটা স্বাভাবিক। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস অংশ গ্রহণ করেনি—যাঁরা গিয়েছিলেন সকলেই নরমপন্থী নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি।

এ সময়ে ভারতীয় মুসলমানের রাজনৈতিক কর্ম্ম প্রক্রিয়ার তিনটী ধারা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দলে ছিলেন কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি। তাঁরা পূর্ব্বাপর ইংরেজের মুখাপেক্ষী এবং ইংরেজের অনুগ্রহেই তাঁদের পুষ্টি। স্যর ফজলি হোসেন এবং স্যর মহম্মদ শফীর নেতৃত্বে তাঁরা শাসনতন্ত্রে যোগ দিয়ে মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি পদ অধিকার করেছিলেন। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ যোগ ছিল না বটে, কিন্তু চাকরী প্রভৃতি নানা রকমের পৃষ্ঠপোষকতা হাতে থাকায় সাধারণের উপর খানিকটা কর্তৃত্ব করতে তাঁরা পারতেন। দ্বিতীয় দলে ছিলেন জাতীয়তাবাদী মুসলমান। তাঁরা কংগ্রেসের সদস্য অথবা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। প্রতিভাশালী লোকও তাঁদের মধ্যে মিলত, কিন্তু ১৯৩২ সালের পরে কংগ্রেসের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া এবং ইংরেজের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ফলে সর্ব্বত্র যে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য, তার ফলে তাঁদের কর্ম্মশক্তি অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়। তাঁদের বেলায়ও জনমানসের সঙ্গে সংযোগ গভীর হতে পারেনি, এবং এ ব্যাপারে কংগ্রেসের দুর্ব্বলতা তাঁদের আরো দুর্ব্বল করেছে। একমাত্র বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও গুজরাট ভিন্ন অন্য কোথাও কংগ্রেস জনসাধারণের মধ্যে শিকড় মেলতে পারেনি, এবং ফলে গণসংগঠন অপেক্ষা গণ-আবেগের ভিত্তিতেই কংগ্রেসের শক্তি গড়ে উঠেছিল। আবেগের প্রাবল্যে কিন্তু আশঙ্কা রয়েছে, কারণ প্রবল আবেগের প্রতিক্রিয়াও প্রবল হতে বাধ্য। হিন্দু জনসাধারণের বেলায় তাতে তত বেশী ক্ষতি হয়নি, কারণ হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানসিক ঝোঁকও কংগ্রেসের দিকে। তাই সঙ্কটের দিনেও হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী জনমানসকে কংগ্রেসের পথে টেনেছে, এবং অনেকখানি সফল হয়েছে। মুসলমান মধ্যবিত্তের বেলা ঘটনাসংস্থানে তাদের অধিকাংশই সরকারের অনুগ্রহপ্রত্যাশী। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পরে ভারতীয় মুসলমানের যে ভাগ্যবিপর্য্যয়, সে আঘাত আজো সমাজ পুরোপুরি কাটিয়ে উঠেনি। স্যর সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে ভাঙা কপাল জোড়া দেবার যে চেষ্টার সুরু, ১৯০৬ সালে লীগ প্রতিষ্ঠায় তারই দ্বিতীয় স্তর। আজো তাই মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের বিপুল অংশ সংগ্রামবিমুখ ও

সরকার-সমর্থক। ফলে মুসলমানের মধ্যে যারা কংগ্রেসপন্থী, জনসাধারণের সমর্থনের অভাবে তারা যে দুর্ব্বল হয়ে পড়বে, এবং সমস্ত কংগ্রেসকে দুর্ব্বল করে ফেলবে, তাতে বিচিত্র কি!

মুসলমানের মধ্যে একটী তৃতীয় দলের বিকাশও এই সময়েই দেখা দিতে সুরু করে। কংগ্রেসের স্বাধীনতার আদর্শ ও রাজনৈতিক কর্ম্মপন্থাকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেসের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্য্যক্রমে তাঁরা তুষ্ট হতে পারেন নি। বলেছেন যে সে কার্য্যক্রম যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রসরী ও ভবিষ্যৎপন্থী নয়। অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচীর কাঠামোকে দৃঢ়তর করবার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত দলের সৃষ্টি, তাদের মধ্যে বাঙলায় কৃষক-প্রজাসমিতি ও পাঞ্জাবে আহরার দল বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। অবস্থাপন্ন কৃষক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ভিত্তি করেই আহরার দলের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু ধর্ম্মমূলক সম্প্রদায়ের উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে মুসলমানের মধ্যেই আহরার আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। আর্থিক বিক্ষোভ ও ধর্ম্মোন্মাদনার মিলনে আহরারদের মধ্যেও বিপ্লবী সম্ভাবনা প্রচুর। বাঙলায় প্রজাসমিতি যে কেবলমাত্র কৃষকের অভাব অভিযোগ দূর করবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত তা নয়। ১৯৩০—৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পরে মুসলমান কর্ম্মীদের মনে যে সব প্রশ্ন ও সমস্যা উঠে, তার ফলেই কৃষক-প্রজা আন্দোলনের জন্ম। কংগ্রেসের প্রতি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিক ঝোঁক এবং তার ফলাফল বাঙলায় যত পরিষ্কার ভাবে ধরা দিয়েছে, অন্যত্র তার নিদর্শন মেলে না; এবং সেইজন্য কৃষিজীবী জনসাধারণের সঙ্গে প্রায় সম্বন্ধমুক্ত হয়েও বাঙলায় কংগ্রেস সক্রিয়, সবল ও শক্তিশালী। কিন্তু বাঙলার জনসাধারণের অধিকাংশ মুসলমান, এবং সেইজন্য কংগ্রেস যখন গণআন্দোলনের দিকে ঝুঁকল, তখন হুগলী, মেদিনীপুর অথবা ত্রিপুরা, এরকম দুয়েকটী স্থান ভিন্ন অন্যত্র সে আন্দোলন আশানুরূপ শক্তি লাভ করেনি। এই ঘটনা সংস্থানের সঙ্গে মিলেছিল বাঙলার চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত। তার ফলে বঞ্চিত ও নিরন্ন কৃষক বিদেশী রাজশক্তির সঙ্গে দেশীয় জনসাধারণের স্বার্থসংঘাত স্পষ্টভাবে দেখেনি—তার চোখে তীব্র ভাবে ধরা পড়েছে ধনিক ও জমিদারের দ্বারা জনসাধারণের শোষণ ও নিষ্পেষণ। বাঙলার ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনে বিত্তশালী শ্রেণীর অধিকাংশ হিন্দু এবং মুসলমান জনসাধারণের বিপুল অংশ কৃষক মজুর হওয়ায় সে স্বার্থসংঘাতকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়াও সহজ হয়েছে। ফলে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ভয়াবহ রূপ জনসাধারণের কাছে ধরা দেয়নি, সাম্প্রদায়িকও লক্ষ্যহীন শ্রেণীসংঘর্ষের মধ্যে

জনমানসের শক্তি নিষ্ফল ভাবে ব্যয় হয়েছে। রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধনে তাই মুসলমান কর্ম্মী ও চিন্তানায়কদের সাধনায় কৃষকপ্রজা আন্দোলনের জন্ম, কিন্তু মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলেও কৃষকপ্রজা আন্দোলন লক্ষ্য ও প্রকৃতিতে অসাম্প্রদায়িক, এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের শোষিত জনসাধারণেরই এ আন্দোলনে স্থান আছে।

আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতার পরেও পূর্ব্বের তিনটী মত ও দলের পরিচয় মুসলমান সমাজে মেলে—সেখানে মুসলীম লীগের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া কঠিন। জিন্না সাহেব অবশ্য লীগের পুনরুজ্জীবনের জন্য কয়েকবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বারবার ব্যর্থমনোরথ হয়ে তিনিও হতাশ হয়ে পড়েন। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে ভারতীয় রাজনীতির সংশ্রব ছেড়ে তিনি বিলেতে গিয়ে আইন ব্যবসায়ে মন দেওয়া স্থির করলেন। তাতে আশ্চর্য্য হবারও কিছু নেই—কারণ সে সময়ে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে জিন্না সাহেবের মতন নিঃসঙ্গ ও একক বোধহয় কেউ দ্বিতীয় ছিল না। একপক্ষে নরমপন্থী সরকার-ঘেঁষা দলের সঙ্গে তাঁর বনত না—কারণ কংগ্রেসের বাইরে থেকেও তখনও তিনি প্রায় ষোলআনা কংগ্রেসী। একমাত্র সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ আন্দোলন নিয়েই তো তাঁর কংগ্রেসের সঙ্গে মতভেদ। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা কংগ্রেসের সহযোগী বলে তাঁদের সঙ্গেও তিনি মিলতে পারলেন না। আর কৃষকপ্রজা বা আহরার প্রভৃতি অর্থনৈতিক আন্দোলনের তো কথাই নাই। জিন্না সাহেব কায়েমী স্বার্থেরই প্রতিনিধি, তাই জনস্বার্থের আদর্শে অনুপ্রাণিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্য্যক্রম তাঁর চোখে একেবারে রক্ত-বিপ্লবের নিশানা বলে মনে হয়েছে। সমস্ত দল ছাড়া হয়ে তাই জিন্না সাহেবও রাজনীতির পিচ্ছল পথ ছেড়ে আইনের স্বচ্ছল পথে যাত্রা সুরু করলেন।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় অন্য রকম। কোথায় সুদূর বিলাতে নির্ব্বাসন আর কোথায় রাজনৈতিক ধ্বংসের পরিবর্ত্তে মুসলমান সমাজের এক বিপুল অংশের কায়েদে আজমের লোভনীয় সম্মান। রাজনীতির ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী যে কি কঠিন, জিন্না সাহেবের ভাগ্যবিপর্য্যয় থেকেই তা বোঝা যায়। লীগের ভবিষ্যৎ যখন একেবারে অন্ধকার মনে হচ্ছিল, তখনই হঠাৎ ঘটনার আকস্মিক বিবর্ত্তনে লীগের এমন প্রতিষ্ঠা হল যে পূর্ব্বে কোনদিন কেউ তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। ঘটনা-গুলিও এমন যে তার উপর জিন্না সাহেব বা লীগের কর্ম্মকর্ত্তাদের কারু কোন হাত ছিল না। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠাশালী সর্ব্বভারতীয় মুসলমান নেতৃবৃন্দের অনেকেই মারা গেলেন, এবং তাঁদের স্থান নিতে পারেন, জিন্না সাহেব

ছাড়া এমন আর কেউ রইলেন না। হাকিম আজমল খাঁর মৃত্যু হয় ১৯২৮ সালে। কংগ্রেসের মুসলমান নেতাদের মধ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল অনন্যসাধারণ এবং তাঁর মৃত্যুতে যে ক্ষতি হল, সহজে তা পূরল না। মৌলানা মোহাম্মদ আলী গোলটেবিল বৈঠকের আমলে বিদেশেই মারা গেলেন। পরাধীন ভারতবর্ষে আর ফিরবেন না বলে তাঁর যে সঙ্কল্প, সে সঙ্কল্প এমনিভাবে পূর্ণ হল। ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর মত সর্ব্বজনপ্রিয় নেতার প্রয়োজন খুবই বেশী। কংগ্রেসী রাজনীতি থেকে অবশ্য তিনি খানিকটা সরে এসেছিলেন, কিন্তু তবু তিনি চরমপন্থী, এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের চিত্তসমর্পিত যোদ্ধা বলে তাঁর মৃত্যুতে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষতি অপরিমেয়। জাতিয়তাবাদী মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের পশরা পূর্ণ হল ডাক্তার আনসারীর অকাল মৃত্যুতে। তাঁর আজীবন সাধনা ছিল মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় অনুভূতি ও সাধনার উদ্বোধন এবং তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ততটা সুবিধা করতে পারেনি। মধ্যপন্থী সরকার-মুখাপেক্ষী দলগুলির নেতৃবৃন্দের মধ্যে কর্ম্মশক্তিতে স্যর ফজলী হোসেন ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্যর মহম্মদ শফীর প্রভাব প্রতিপত্তিও কম ছিল না, কিন্তু তাঁরা দুজনেই কয়েক বৎসরের মধ্যে মারা যাওয়ায় মধ্যপন্থী দলেও সর্ব্বভারতীয় নেতা কেউ রইলেন না। স্যর সিকন্দার হায়াৎ খাঁর রাজনীতি ক্ষেত্রে অভ্যুদয় এই সময়ে, কিন্তু তখনও সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্বের মতন প্রতিষ্ঠা বা যশ তাঁর হয়নি। অর্থ-নৈতিক ভিত্তিতে গঠিত দলগুলির তখনো ভাল করে দানা বাঁধেনি। বাঙলাদেশে প্রজা আন্দোলনের নেতা ফজলুল হক বক্তা হিসাবে প্রথম শ্রেণীর এবং রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণেও কুশলী। নেতৃত্বের অনেক গুণ তাঁর ছিল কিন্তু বুদ্ধির উৎকর্ষ সত্ত্বেও চরিত্রের স্থৈর্য্যের অভাবে তিনি তাঁর সদ্‌গুণের পূরো ব্যবহার করতে পারেন নি, তাছাড়া প্রজা আন্দোলনের তখনো এত শক্তি হয়নি যে সে আন্দোলনের ভিত্তিতে তিনি সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্ব অধিকার করতে পারেন। আহরার দলের বেলায় একথা আরো বেশী খাটে, এবং খাকসার আন্দোলনের তখন সবেমাত্র সুরু। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে জিন্না সাহেবের আর প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না, এবং সুযোগ বুঝে তিনি পূর্ব্বের সঙ্কল্প ত্যাগ করে অবিলম্বে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। ১৯৩৬ সালে তাঁর নেতৃত্বে আবার লীগের নতুন সংগঠন সুরু হল।

প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের ভিত্তিতে ১৯৩৬—৩৭ সালে সাধারণ নির্ব্বাচন হয়। জিন্না সাহেব তারই সুযোগ নিয়ে লীগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সর্ব্বত্র নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। প্রথমে তাঁর ইচ্ছা ছিল যে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের

বাদ দিয়ে স্বাধীনতাকামীদের নিয়েই তিনি লীগ গঠন করবেন। সেজন্য লীগের কর্ম্মসূচী ও উদ্দেশ্যেরও সংশোধন করা হল কিন্তু পুরোনো পেটরায় নতুন গয়না মানায় না। জিন্না সাহেবের কাছে যা চরম ও প্রগতিশীল মনে হল, সক্রিয় আন্দোলনের অভিজ্ঞতা যাঁদের ছিল, তাঁদের কাছে তাই মনে হল একেবারে জোলো ও অর্থহীন। ভারতীয় রাজনৈতিক সত্তা যে কুড়ি বৎসরে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, তাও জিন্না সাহেব বুঝলেন না, এবং আইনজীবীর মনের যে স্বাভাবিক গোঁড়ামি, তার ফলে কোন বিপ্লবী কার্য্যক্রম গ্রহণ করা লীগের পক্ষে সম্ভব হল না। যুক্ত প্রদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ভিন্ন রকম বলে সেখানকার মুসলমান জিন্না সাহেবের ডাকে সাড়া দিল। সেখানকার মুসলমান জমিদার ও বিত্তশালী এবং সংখ্যায় লঘু। অন্যান্য প্রদেশে এবং বিশেষ করে মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলিতে অবস্থা অন্যরূপ। মুসলমান সেখানে নিপীড়িত ও বিত্তহীন, তাই সমাজের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থারক্ষার ভিত্তিতে সংগঠিত লীগের কার্য্যক্রম তাদের আকর্ষণ করল না। এ সমস্ত প্রদেশে তাই বিত্তশালী প্রতিক্রিয়াশীল ধনিক বণিক জমিদারের দলই লীগের আহ্বানে সাড়া দিল। বাঙলায় প্রজা-লীগের নির্ব্বাচন সংগ্রামে চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথা ধ্বংস ও সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন নিয়েই দ্বন্দ্ব বাধল। লীগ চাইল পুরোনো প্রথার সংরক্ষণ, প্রজা আন্দোলনের লক্ষ্য হল পুরাতন সমাজ-সংগঠন ধ্বংস করে আর্থিক সাম্যের ভিত্তিতে নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠা।

নির্ব্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, নির্ব্বাচনের আন্দোলনেই জনশিক্ষা অনেকখানি এগিয়ে গেল। নির্ব্বাচনের ফলও মোটের উপর সর্ব্বত্রই আশাপ্রদ মনে হল। আইনসভাগুলির সংগঠনে সর্ব্বত্রই প্রতিক্রিয়াপন্থীদের পরাজয়ে দেশের শাসন সংস্কারের আশা প্রবল হয়ে উঠ্‌ল। হিন্দু নির্ব্বাচকদের তো কথাই নাই, কংগ্রেসের জয়জয়কারে পুরোনো সরকার-ঘেঁষা পাণ্ডাদের চিহ্ন প্রায় লুপ্ত হয়ে এল। মুসলমানদের মধ্যেও সর্ব্বত্রই প্রতিক্রিয়াপন্থীদের ধ্বংস না হলেও পরাজয় হল। বাঙলার লীগনেতা প্রজা-আন্দোলনের নেতার কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হওয়ায় বাঙলা দেশে কায়েমী স্বার্থের বনিয়াদে গড়া লীগের ভিত্তি টলে উঠল। পঞ্জাবেও লীগের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে স্যর সেকেন্দারের নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান মধ্যপন্থীদের সংগঠন জয়যুক্ত হল। একমাত্র যুক্ত প্রদেশেই লীগের খানিকটা সাফল্য দেখা যায় কিন্তু তাকেও প্রগতিপন্থীদের জয় বলতে হয়, কারণ সেখানে লীগের বিরুদ্ধে ছিল ছত্তারীর নওয়াবের

কায়েমী স্বার্থবাদীদের দল। সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের সামনে লীগ দাঁড়াতে পারেনি, সিন্ধু প্রদেশেও লীগ শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। এক কথায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই নতুন আদর্শ ও নতুন শক্তির জয়ের সম্ভাবনা দেখা দিল—মনে হ'ল যে মুসলমান ও হিন্দুর শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলির সম্মেলনে ভারতবর্ষে নবযুগের সূচনা হবে।

ভারতের সৌভাগ্যের দিন এত সহজে আসবার নয়। প্রগতিপন্থীদের সহযোগিতায় নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন সম্ভব হল না। যে শাসনতন্ত্র ১৯৩৭ সালে এদেশে প্রবর্ত্তিত হল, তার প্রায় সবখানিই ফাঁকি। পরাধীন জাতিকে এ রকম নিষ্ঠুরভাবে প্রতারণার তুলনা ইতিহাসে বেশী মেলে না। কাজেই কংগ্রেস যে এ ভূয়ো শাসনতন্ত্র বর্জ্জন করবে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। ক্ষমতা নেই অথচ দায়িত্ব আছে—প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের এ রকম পরিহাস সহ্য করাও কঠিন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কংগ্রেস শাসনভার গ্রহণ না করে বোধ হয় ভুল করল। শাসনতন্ত্র ধ্বংসের দিক দিয়েও মন্ত্রিত্ব গ্রহণের মূল্য ছিল, কারণ বাস্তব রাজনীতির রীতিই হল যে যেটুকু ক্ষমতা পাওয়া যায়, তা দখল করে আরো ক্ষমতালাভের জন্য সাধনা। অবশ্য পার্লামেণ্টারী রাজনীতি বাদ দিলে আর মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না, এবং তাহলে সংগঠন ও আন্দোলনমূলক কাজে পুরোপুরি ঝোঁক দেওয়া চলে। কিন্তু পার্লামেণ্টারী রাজনীতিতে যোগ দিয়ে মন্ত্রিত্ববর্জ্জনের বিশেষ কোন সার্থকতা থাকে না, এবং সেজন্য কংগ্রেস যে পথ অবলম্বন করল, তাতে দুটো অল্‌টারনেটিভেরই অসুবিধা ভোগ করতে হল অথচ কোনটীরই সুবিধা পাওয়া গেল না। মন্ত্রিসভার দৈনন্দিন কাজে লাটসাহেব বাধা দেবে না এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের অনেক চেষ্টাও হল, কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সে চেষ্টাও ব্যর্থ হল। বড়লাটের ভাষা হয় তো পূর্ব্বের চেয়ে মোলায়েম হয়ে এল কিন্তু কংগ্রেসের দাবীর সারমর্ম্ম স্বীকৃত হল না। তা সত্ত্বেও অনেক দ্বিধা ও বাদানুবাদের পরে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব মঞ্জুর করে নিল। প্রথমে স্থির হল যে, যে সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেসের সম্পূর্ণ সংখ্যাধিক্য, কেবলমাত্র সেই সমস্ত প্রদেশেই মন্ত্রিত্ব নেওয়া হবে। পরে স্থির হল যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দল হলেও মন্ত্রিত্ব নেওয়া চলবে, এবং শেষে চেষ্টা হল যে ক্ষুদ্র বৃহৎ যাই হোক না কেন, যেখানেই সম্ভব, সেখানেই কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব অধিকারের চেষ্টা করবে। কোনো অবস্থায় কোনো সর্ত্তে নামঞ্জুর থেকে এমনি ভাবে যেমন করে হোক এবং যে কোন সর্ত্তে মঞ্জুরীতে কংগ্রেসের নীতি আমূল বদলে গেল বটে, কিন্তু কংগ্রেসের কর্ম্মসূচীর এ পরিবর্ত্তনে বড় দেরী হয়ে পড়ল—পূর্ব্বের সে শুভমুহূর্ত্ত আর মিলল না।

২

কংগ্রেসের এ দ্বিধার ফল ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে মারাত্মক। তাতে যে কেবল কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা ও মতদ্বৈধ প্রকাশ পেল তা নয়, অন্যান্য প্রগতিপন্থী দলের সহায়তায় প্রাদেশিক শক্তিকেন্দ্র দখলের সুযোগও চলে গেল। বাঙলা দেশে কৃষকপ্রজা আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্বন্ধ ও সহযোগিতা স্বাভাবিক, কিন্তু ফজলুল হক সাহেবের ঐকান্তিক আবেদন সত্ত্বেও বাঙলার কংগ্রেস তাঁর সঙ্গে সহযোগিতায় মন্ত্রিত্বগঠন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলীর সহায়তার অঙ্গীকার দিতে পারলনা। মন্ত্রিত্বের প্রয়োজনে মুসলীম লীগের সঙ্গে তাঁর আবার সমঝোতা হল, এবং লীগে যোগদানের পরে লীগের মর্য্যাদা ও শক্তি বাড়াবার কৃতিত্বের অনেকখানিই তাঁর। জনসাধারণের সঙ্গে লীগের পূর্ব্বে যোগ ছিলনা বল্লেই চলে, সে গণসংযোগ স্থাপনও ফজলুল হকের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। স্যার সেকেন্দারও অবস্থাগতিকে লীগের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। সর্ব্বব্যাপারেই তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী, কিন্তু কংগ্রেসের সহযোগিতা না পেয়ে তিনিও ক্রমে প্রগতিবিরোধী দক্ষিণপন্থীদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনের পরে যে ছবি ফুটে উঠেছিল, প্রগতিশীল শক্তির সর্ব্বত্রই বিজয়ের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তার বদলে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠ্‌ল।

কয়েকমাস পরে কংগ্রেস কতগুলি প্রদেশে শাসনভার গ্রহণ করল, কিন্তু যে সুযোগ একবার মিলেছিল, তা আর ফিরলনা। ততদিনে প্রগতিবিরোধী শক্তিগুলিও প্রথম পরাজয়ের পরে আবার দানা বাঁধতে সময় পেয়েছে। তাছাড়া অভিজ্ঞতার অভাব এবং অন্যান্য কারণেও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে কংগ্রেস কয়েকটি গুরুতর ভুল করে বসল। মুসলীম লীগ মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের ভাগী হতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্র মুসলীম লীগের পরাজয়ে কংগ্রেস তাতে রাজী হয়নি। সেজন্য লীগনেতাদের রাগ ছিলই, এখন কংগ্রেসের ভুলের সুযোগ নিয়ে মুসলীম লীগ আবার জেগে উঠল। লীগের অভিযোগ বহু এবং ব্যাপক, কিন্তু তার মধ্যে ধর্ম্ম, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক চারটী অভিযোগই প্রবলভাবে প্রচারিত হল। লীগ বলল যে কংগ্রেস মুসলমানের ধর্ম্মে বাধা দিতে চায়, সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চায়, চাকুরী ও আইনসভায় উপযুক্ত অংশ দেয় না এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অপমান করে। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা অভিযোগগুলিকে অস্বীকার করেছে, এবং যে সমস্ত

কথা বা কাজকে ভিত্তি করে অভিযোগ আনা হয়েছে, তার ভিন্ন বিবরণও দিয়েছে। মন্ত্রিদের এ অস্বীকার গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁদের কথাকেও অবহেলা করা চলেনা, কিন্তু তবু একথাও সত্য যে মুসলমান জনসাধারণের মনে এ অভিযোগগুলি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক দলের কারসাজিতে তিলকে তাল করা যেতে পারে, কিন্তু তার জন্য অন্ততঃ তিল থাকা চাই। জনসাধারণের মনে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ছিল বলেই মুসলীম লীগের প্রচারকার্য্যও এত সত্বর সফল হয়েছে। বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে লীগমনোবৃত্তি যে ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাতেই বোঝা যায় যে অসন্তোষের ভিত্তিকে যারা কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দিতে চান, তাঁদের পক্ষেও সে অসন্তোষকে বাস্তব না বলে উপায় নেই।

ধর্ম্মীয় অধিকার নিয়ে যে সব প্রশ্ন তার মধ্যে মসজিদের সামনে বাজনা এবং গো-কোরবাণীর দুটী সমস্যাই সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠ্‌ল। আইনের দৃষ্টিতে রাজপথে হিন্দুর বাজনা বাজাবার এবং মুসলমানের গো-কোরবাণীর অধিকারের দুটীই সমান অনস্বীকার্য্য। কংগ্রেস প্রশ্ন দুটীর ঠিক সমাধান করতে পারেনি, জোর করে কোন কথা বলেনি। আইনের বলে কারু অধিকার ক্ষুণ্ণ করা অন্যায়, এবং আইনের ব্যবহার যদি করতেই হয়, তবে যারা অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধেই আইনের প্রয়োগ হওয়া উচিত। রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে সে অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা যায় বটে কিন্তু দুপক্ষের মধ্যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই তা সম্ভব। এ সম্বন্ধে কংগ্রেসের অবশ্য মুস্কিলও ছিল, কারণ নেতৃবৃন্দের মনোভাব যাই হোকনা কেন, সাধারণত সমর্থকদের মধ্যে ধর্ম্মীয় গোড়ামী এত প্রবল যে তাকে বাগ মানানো সহজ কথা নয়। বিশেষ করে পরাধীন দেশের সাংসারিক দুর্গতির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় পারলৌকিক পরমার্থের মোহ আরো প্রবল হয়ে উঠে।

কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা প্রাথমিক শিক্ষাসংস্কারের জন্য যে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তা নিয়েও লীগ আপত্তি তোলে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা রচিত হয়, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর গলদ ও দুর্ব্বলতা দূরই তার উদ্দেশ্য এবং সে পরিকল্পনায় সাম্প্রদায়িক কোন গন্ধ নাই। যে কমিটী তা রচনা করেছিল, জামিয়া মিলিয়ার প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত মোস্লেম শিক্ষাবিদ ডাক্তার জাকীর হোসেন তার সভাপতি এবং তার সদস্যের মধ্যে খৃষ্টানও ছিলেন। এ কথাও স্মরণীয় যে মরহুম ডাক্তার ইকবাল শিক্ষার যে পরিকল্পনা করেছিলেন, ওয়ার্দ্ধা স্কীমকে তারই কার্য্যকরী রূপ বলা চলে। এ পরিকল্পনার মূল কথাই হল মানসিক ও দৈহিক উৎকর্ষের সমন্বয় এবং কেবলমাত্র অক্ষরজ্ঞানে তুষ্ট না থেকে সংসার জ্ঞানের দিকে

শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ। আমাদের দেশে শিক্ষার গলদও এইখানে। কেবলমাত্র ভাষাশিক্ষার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দেওয়ায় করকৌশলের বিকাশ হয় না এবং তার ফলে আমাদের দেশে শিক্ষিতের অধিকাংশই সংসার কার্য্যে একান্ত অপটু। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সমাজ, শিক্ষা অথবা যে কোন সংস্কারের পথেই বহু সঙ্কট। নব জীবনের প্রেরণা যে কখন অজ্ঞাতে পুরাতনের পুনরুজ্জীবনে রূপান্তরিত হয় তার হদিসও মেলে না, অথচ সে রূপান্তরের ফলে পুরাতন অবিশ্বাস, সন্দেহ ও সংঘর্ষ নতুন করে জেগে উঠে। ওয়ার্দ্ধা স্কীমেও এ রকম অবান্তর আপত্তি এসে জুটল। কংগ্রেসের হিন্দু সমর্থকদের মধ্যে অনেকে চেষ্টা করল যে সে শিক্ষাপরিকল্পনা হিন্দুধর্ম্মমূলক ঐতিহ্যের বাহন হোক—মুসলমানদের আপত্তি তাতে দানা বাঁধবার আরো সুযোগ পেল। ধর্ম্মের আবহাওয়া শিক্ষার মধ্যে আনলে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তা যে হিন্দু সংস্কার ঘেঁষা হবে এটা অনিবার্য্য। ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের ভয় হল যে, যে সংস্কৃতি তাঁদের সৃষ্টি এবং তাঁরা যে সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত তা ধ্বংস হয়ে যাবে। মুসলীম লীগ তার বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করল, তাতে ওয়ার্দ্ধা স্কীমের দোষগুণের কথা চাপা পড়ে গেল এ সম্বন্ধে কংগ্রেসেরও খানিকটা দুর্ব্বলতা ছিল। যে দেশে বিচিত্র ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বাস, সেখানে রাষ্ট্রপরিচালিত শিক্ষাপ্রণালীতে ধর্ম্ম না আনাই ভাল। কামাল আতাতুর্ক এ কথা বুঝেছিলেন বলেই তুরস্কের শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণভাবে পার্থিব এবং ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ। ভারতীয় মুসলমান কামাল আতাতুর্কের নামে মূর্চ্ছা যায়। কিন্তু কামালের শিক্ষা এ দেশে প্রয়োগে তাদের ঘোর আপত্তি।

ভারতের রাষ্ট্র ভাষা নিয়েও ঝগড়া কম হয়নি। এখানেও সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানের মনে ভয় যে পাছে ফাঁকি দিয়ে তাদের ঘাড়ে হিন্দু সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হয়। সংস্কৃতির যে সম্প্রদায়গত রূপ নাই, দেশ-কালজ রূপই তার একমাত্র রূপ এবং জীবন্ত সংস্কৃতি সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য—একথা পরপদানত আত্মবিস্মৃত সম্প্রদায়ের স্মরণে থাকে না। সেজন্য ভারতের হিন্দু ভুলে যায় যে হিন্দু সভ্যতার গৌরবের দিনে তাই ছিল বিশ্বসভ্যতার বাহন। ভারতের মুসলমানও ভুলে যায় যে মুসলীম সংস্কৃতির যে দিন শ্রেষ্ঠ বিকাশ, সেদিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিচিত্র প্রভাব ও ঐতিহ্যকে আত্মস্বাৎ করে তাই ছিল বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক ও আদর্শ। উর্দ্দু হিন্দীর ঝগড়া এই আত্মবিস্মরণেরই ফল। মূলত উর্দ্দু ও হিন্দী একই ভাষা—তাদের ব্যাকরণ ও শব্দপ্রকরণ এক। তফাৎ কেবল দুটী। আরবী ফারসীর তুলনায় সংস্কৃত কথার অনুপাত হিন্দীতে বেশী, উর্দ্দুতে

কম। আর ভিন্ন হরফে উর্দ্দু ও হিন্দী লেখা হয়। কংগ্রেসের মধ্যেও অনেকে এ ঝগড়া মেটাতে বললেন যে বাইরের থেকে রোমান হরফ নিলে হিন্দু-মুসলমান কারু কিছু বলবার থাকেনা। রোমান হরফে লেখা পড়া সোজা, তুর্কীরাও তা গ্রহণ করেছে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তার চল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এবং বিভিন্ন প্রদেশবাসীদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনেও তা সহায়তা করবে। কংগ্রেসের মধ্যেও অনেকের এ ব্যবস্থা পছন্দ হল না। প্রাচীন যুগধর্ম্মী ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন যাদের লক্ষ্য, তারা রোমান হরফ গ্রহণে আপত্তি করবে এ সহজেই বোঝা যায়। দুই দলকেই খুসী করতে স্থির হল যে নাগরী ও ফারসী দু হরফই চলবে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান কেউ তাতে সন্তুষ্ট হলনা। মুসলমান সম্প্রদায়ের আপত্তি হল এই যে নামে দু হরফ চললেও কার্য্যত নাগরীর চাপে ফারসী লুপ্ত হয়ে এল। সেটা খানিকটা অনিবার্য্য, কারণ যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু, তারা এত বেশী সংখ্যালঘু যে নিজেদের দৈনন্দিন কাজের প্রয়োজনেই তারা নাগরী হরফ শিখতে বাধ্য হয়। ফলে হয় দু হরফ শেখার বোঝায় তাদের মানসিক উৎকর্ষে বাধা আসে, তা নইলে ফারসী ও নাগরী হরফের মধ্যে একটী ছাড়তে বাধ্য হয়ে পড়ে।

সামাজিক ব্যাপারে হিন্দু সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী সাম্প্রদায়িক কলহের অন্যতম প্রধান কারণ। সমস্ত অহিন্দুর প্রতিই গোঁড়া হিন্দুর খানিকটা অবজ্ঞা এবং রাজনৈতিক সম্বন্ধান্তরের পশ্চাদপটে সে অবজ্ঞা মুসলমানের বেলা আরো গভীর। মুসলমানের মনেও তার জন্য বিক্ষোভ তীক্ষ্ণতর। একেইতো রাষ্ট্রিক বা অর্থনৈতিক অবিচারের তুলনায় সামাজিক অবিচার অনেক বেশী প্রত্যক্ষ, এবং তার প্রতিক্রিয়া প্রবলতর। সামাজিক অন্যায়ের মূলেও হয় তো অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অসাম্য, কিন্তু তবু সংঘর্ষের ভিত্তির চেয়ে সংঘর্ষের বহিঃপ্রকাশেই বিপদ বেশী। হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা মুসলমানের চোখে কেবলমাত্র সামাজিক সংকীর্ণতা ও দম্ভ, এবং তার বিরুদ্ধে আক্রোশ স্বাভাবিক। আধুনিক অবস্থায় সমাজের পুরাতন কাঠামো টিকবে কিনা সন্দেহ। যন্ত্রশিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার এবং মোটরবাস রেলপথের প্রভাবে গ্রামের দূরত্ব বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ ও অন্যান্য অনেক পুরোনো সংস্কারও ভাঙবে কিন্তু যতদিন তা না ভাঙছে, ততদিন হিন্দু সমাজের ছুঁৎমার্গের ফলে দ্বন্দ্বসংঘর্ষের ক্ষেত্র তৈরী থাকবেই।

মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে সংঘর্ষের সর্ব্বপ্রধান কারণ কিন্তু চাকুরী ও আইন সভার ভাগাভাগি নিয়ে। রাজনৈতিক শক্তির ব্যবহারও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং সেজন্য বর্ত্তমান ভারতবর্ষের সঙ্কুচিত ও দরিদ্র জীবনই এই সংঘর্ষের প্রকৃত

কারণ। দেশে যেদিন ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন সরকারী এবং বেসরকারী সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই হিন্দু সম্প্রদায়ের দিকেই ইংরেজ ঝুকেছিল। ফলে আর্থিক ও রাষ্ট্রিক উভয় ক্ষেত্রেই মুসলমান পিছিয়ে পড়ে। এবং গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে তার প্রতিকারই মুসলমান নেতাদের একমাত্র লক্ষ্য। দেশের শিল্পবাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় চাকুরীর গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে এবং আজ যে চাকুরী নিয়ে সাম্প্রদায়িক কোন্দল, তার মূলে রয়েছে দেশের আর্থিক দুর্গতি। চাকুরীর অনুপাত নির্দ্দেশ ও অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচী নির্ণয় আইন সভার অধিকার এবং সেজন্যই আইন সভায় প্রতিনিধি সংখ্যা নিয়ে ঝগড়া। তলিয়ে দেখলে তাই সন্দেহ থাকেনা যে ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, তা প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তি ও সুবিধা নিয়ে ঝগড়া ভিন্ন কিছুই নয়। বাঙলা দেশে প্রায় দেড়শো বৎসর হিন্দু মধ্যবিত্তের ভাগেই সমাজের দুধসর জুটেছে, নবগঠিত মুসলমান মধ্যবিত্ত তার ভাগ চায় এবং হিন্দু আপত্তি করে বলেই বাঙলায় বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব। বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে তারই উলটো দিক দেখি। সেখানে মুসলমান মধ্যবিত্ত কায়েমী স্বার্থরক্ষা করতে চায়। সেই কায়েমী স্বার্থের ভাগ নেওয়া হিন্দুর চেষ্টা। সর্ব্বত্রই মধ্যবিত্ত শ্রেণী গণশক্তির ব্যবহারে আপন উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়। জনসাধারণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তারও মূলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একবার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবিকা ও ক্ষমতার সমস্যার সমাধান হলে তাই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের মূল কারণ অন্তর্হিত হবে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার আসল কারণ মনে থাকলে লীগের অভিযোগের এবং কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে তার উত্তরের তাৎপর্য্য বোঝা যায়। লীগের তরফ থেকে তিলকে তাল করবার চেষ্টা স্বাভাবিক। সেই উদ্দেশ্যে যে সমস্ত দ্বন্দ্ব ব্যক্তির বা শ্রেণী বিশেষের, তাদেরও সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। সমস্যা যতদূর সম্ভব এড়িয়ে থাকা চলে, কংগ্রেস তারই চেষ্টা করেছে। সব দেশেই আত্মীয়-প্রীতিজনিত পক্ষপাতের দৃষ্টান্ত মেলে—পরাধীন দেশে তার প্রকোপ আরো বেশী। ভারতবর্ষের মতন বিপুল দেশে তাই এ রকম পক্ষপাতের অনেক নমুনা মিলবে। কেবলমাত্র কংগ্রেসী প্রদেশ নিয়ে লীগ মাতামাতি করেছে কিন্তু বাঙলা ও পঞ্জাবেও এরকম অবিচার দেদার হয়েছে। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু বলে মুসলীম লীগ সে পক্ষপাতকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে পেরেছে। কংগ্রেসের বিপুল বিজয়ে কংগ্রেসপন্থী জনসাধারণের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে যে শক্তির অপব্যবহার হবে, তাও অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের আস্ফালনকে

মুসলমান স্বার্থের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে চালাতেও লীগ দ্বিধা করেনি। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের ভুলও হয়েছে এবং অনভিজ্ঞ মন্ত্রীর পক্ষে ভুল করা বিচিত্র নয়। কিন্তু সেই ভুলকে ফাঁপিয়ে বড় করে কংগ্রেসকে বিব্রত ও অপদস্থ করবার সুযোগ লীগ মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়েনি। বাঙলা দেশে লীগপন্থী মুসলমান প্রধানমন্ত্রীর আমলেও গো-কোরবাণী আইন করে বন্ধ হয়েছে কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি শোনা যায় নি। অন্যপক্ষে কংগ্রেসী প্রদেশগুলিতে মহাজন ও জমিদারের কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে যে সমস্ত আইন হয়েছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শোনা যায় নি। কিন্তু বাঙলার মন্ত্রিসভা যখনই কায়েমী স্বার্থে হাত দিয়েছে, বাঙলার হিন্দু সম্প্রদায় তার বিরুদ্ধে সরোষে গর্জ্জন করে উঠেছে। এ সমস্ত বাদবিতণ্ডা দ্বন্দ্ব যে মূলত রাজনৈতিক, শহীদগঞ্জের পরে সে সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রায় ৩০ জন খাকসার পুলীশের গুলি চালনায় প্রাণ দিল, অথচ সেই নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুসলমানের ক্ষীণ প্রতিবাদ উঠবার আগেই মিলিয়ে গেল।

[আগামী বারে সমাপ্য]

কোনো তার্কিকের প্রতি

বুদ্ধদেব বসু

দর্শন দুর্গম অতি, রাজনীতি কর্কশ জটিল ;
ক্লান্ত প্রাণ ঘুরে মরে বিতর্কের গোলকধাঁধায়,
মীমাংসার স্বর্ণমৃগ সন্ধানীরে নিত্যই কাঁদায়,
প্রতি পক্ষে পিত্ত জ্বলে, সত্তার কপাটে পড়ে খিল।
আমাকে ফিরায়ে নাও অজ্ঞতার মত্ততায় ; নীল,
নীল স্তব্ধতার অন্ধকারে, যেখানে বিশ্বের দায়
জ্বালায় ধ্যানের শিখা।—দাও সেই বুদ্ধিরে বিদায়
কৈলাসেরে লক্ষ্য ক'রে যে-দাম্ভিক ছোঁড়ে শুধু ঢিল।

বিতর্ক-বিরক্ত মন দ্বিখণ্ডিত দর্পণের মতো
বিড়ম্বিত প্রতিবিম্বে রাষ্ট্র করে বিশ্বের বিকৃতি,
পরস্পরে হত্যা করে প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তির সেনানী।
আমার আকাঙ্ক্ষা তাই কবিত্বের অদ্বিতীয়-ব্রত,
সংঘহীন, সংজ্ঞাতীত এককের আদিম জ্যামিতি—
স্তব্ধতার নীলিমায় আত্ম-জাত পূর্ণতার বাণী।

চন্দ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

এত দিন জানতাম চন্দনপঙ্ক,
ভালো লেগেছিলো তব আননকলঙ্ক।
সেটুকুতে ছিলো ধার,
ঢল ঢল রসভার,
অঙ্কশায়িনী ছিলো, ছিলো পর্যঙ্ক।

তব সাথে এত দিন প্রেম-রোম-অঞ্চ,
দেহমণ্ডলে ছিলো রতিরাসমঞ্চ।
আজি সব পাতাঝরা,
ছেঁড়া যত গাঁটছড়া,
পাখি সব বাসাহারা, ছিন্ন মালঞ্চ।

তোমারো সহসা আজ এ কি যতিভঙ্গ,
জঙ্গী হয়েছ দেখি ছেড়ে রসরঙ্গ।
তুমি কিনা বিদ্বিষ,
শায়কে মেখেছ বিষ,
ছড়ায়ে দিয়েছ রিষ অনলতরঙ্গ।

তব তরে মনে ছিলো কত না প্রশংস,
শর্বরী ছিলো শ্বেত উড্ডীন হংস।
হৃদয়ের ছিলে আলী,
একটি একটি ফালি
আনতো শেষের ডালি কামনাবতংস।

সেই তুমি মৃত্যুর হলে সূচীপত্র
যে তুমি একদা ছিলে আরোগ্যসত্র।
　　সেই সে রূপসী রাত
　　হয়ে গেছে উৎখাত,
আজ সে করালপাত প্রলয়পতত্র।

রাখো রাখো নাগরালি যত পরিবন্দ,
চুম্বনে দংশন—কপটপ্রবন্ধ।
　　আজকে করেছে ভিড়
　　যত সব নতশির,
গতশির সাহসীর স্কন্ধ কবন্ধ।

কুট্টিম সেই আছে আছে সে কুটঙ্ক
সঙ্কুল গিরিপথে কৃশ নদীবঙ্ক।
　　তৃষ্ণার জল নেই,
　　জীবনে দখল নেই,
ভিক্ষায় ফল নেই, আকাশে আতঙ্ক।

ছলছল এ ছলনা আর নয় সহ্য,
গদগদ তব ভাষে ভাব-আতিশয্য।
　　এ নিশি চান্দ্রমসী
　　হয়ে যাক সব মসী,
তুমি যদি যাও খসি, হই গতলজ্জ।

পরাস্ত তুমি চাঁদ হয়ে যাও অস্ত,
আবার ধরণী হোক নতুন পয়স্ত।
　　সেদিন প্রেমের যাগে
　　যদি বা তোমারে লাগে,
এসো তবে নবরাগে হয়ে ধোপদস্ত।

ততদিন থাকো বাদ চাঁদ দুর্দ্দশ,
তোমাকে দিয়ে যে আর মেটেনা এ তর্ষ।
পৃথিবীর তুমি বোঝা,
নেমে যাও বলি সোজা,
অমা আজ প্রিয়তমা—শোনো পরামর্শ।

সোনার বাঙলা

সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বাঙলা
কানন-কুন্তলা নদী-মেখলা বাঙলা আমার,
তোমায় প্রণাম করতে—
আজ আমার হাত ওঠে না,
মাথা নুয়ে পড়ে না তোমার পায়ে।

ইতিহাসের পাতায় পাতায়
তোমার কীর্ত্তি, তোমার মহিমা ;
কবির ছন্দে, বাউলের একতারায়
রাখালের বাঁশীর সুরে সুরে
তোমার কণ্ঠের সুর আছে মিলিয়ে,
কৃষকের লাঙলের দাগে দাগে
কৃষাণীর চরকার পাকে পাকে
ঘর-দুয়ারের আলপনায়, সন্ধ্যাদীপের স্নিগ্ধশিখায়
জড়িয়ে আছে তোমার কতদিনের কত
অপূর্ব্ব স্মৃতি।

দোয়েল শ্যামার ঝরা পালকে
সমাকীর্ণ হয়ে আছে আজ
লুপ্ত অতীতের সংকীর্ণ পথ।
তোমার গৌরব,, তোমার পুণ্য কাহিনী আজ
রূপকথা হয়ে লজ্জা দেয় বর্ত্তমানকে—
বেদনাহত ম্রিয়মান বর্ত্তমানকে।

ভবিষ্যতে হয়ত হবে তোমার কঙ্কালের পূজা
যখন ঝরা পাতার চিহ্ন রেখে
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তোমার
শ্যামায়মান বনশ্রী
স্নেহ-শীতল ছায়ায় ঢাকা পল্লীপথ :
ধেনুচরা শস্যেভরা মাঠে মাঠে তখন
ঘুরে বেড়াবে কাল-বৈশাখীর ঘূর্ণি হাওয়া।
ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের চোখে
তুমি হয়ে থাক্‌বে শুধু
অত্যাশ্চর্য্য এক গবেষণার বস্তু।
সে কঙ্কালের পূজা আমি কল্পনা করি
কিন্তু সইতে পারি না তার বাস্তব রূপ।
বেদনার বেদ-মন্ত্রে ঝঙ্কার যদি উঠে কোনোদিন,
বিক্ষোভের জ্বালা যদি মনে তোমার জাগায় বিদ্রোহ—
বিদ্যুৎ-প্রবাহের সেই দাবদাহের মধ্যে
সেই দিন জানাব তোমায় আমার প্রণাম।

নিরুপায়ে রিক্ত করেছ তুমি আপনাকে ;
বৈভব-অহঙ্কারে বিলিয়ে দিয়েছ তোমার
ধনমান, মর্য্যাদা ও স্বাধিকার,
আত্মবিস্মৃতির মোহে
বলিদান দিয়েছ তোমার
আত্মার পরমাত্মীয়কে।

কষাঘাতেও সম্বিৎ ফেরেনি তোমার
ক্লীবত্বের জয়ধ্বনি করেছ তুমি
নিজের অপরিমেয় দুর্ব্বলতায়।
নিরন্নের ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার পানীয়
আতিথেয়তার আনন্দে ঢেলে দিলে তুমি
লোভদৃপ্ত তস্করের তৃপ্তির আশায়—
এ তোমার দাক্ষিণ্য না দীনতা ?
এ তোমার গৌরব না লজ্জা ?
উৎসবের আঙিনা ছেড়ে
আজ তুমি দাঁড়িয়েছ এসে
পল্লী-শ্মশানের চিতার পাশে ;
চলে চলুক সেথায় তোমার কঙ্কালের পূজা,
ছন্দে গাঁথা কবির সঙ্গীতে
হয় হোক তোমার প্রশস্তি-পাঠ,
আমি সইতে পারি না
দেখতে পারি না
আত্মহত্যার সে মহা মহোৎসব ;
তুমি আমায় ক্ষমা করো
হে আমার রিক্তা, হৃতসর্ব্বস্বা
স্বর্ণপ্রসূ সোনার বাঙলা।

শিকড়

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

চায়ের দোকানে কাঁচা পয়সা—মুদীর কারবারে শুধু খাতা লেখাই সার—চেয়ে থাকো মাস কাবারের দিকে হাঁ করে। একটা বালতির উপরে উনুন সাজিয়ে চা-বিক্রীর ব্যবস্থাও তাই করে নিয়েছিল দীননাথ। মুদীখানা ত রইলই, ষ্টেশনের যাত্রীরা যেতে আসতে পাঁচ দশ কাপ যদি চালিয়ে দিয়ে যায় তাহলেই ব্যস্—আর কিছু সে চায় না। যাত্রী আসেও দু চারজন—গাঁয়ে ম্যালেরিয়া আছে তাই চায়ের নাম জানে, ফৌজদারী মোকদ্দমার সাক্ষী হয়ে কোর্টের মাঠে একটা বটগাছের নীচে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়, তাই চা খেতেও শিখেছে।

কিন্তু নৈত্যিক যার আসা সে হচ্ছে যশোদা রবার্টস্। শাড়ীর পাড়ের তালি দেওয়া একটা থ্রি-কোয়ার্টার খাকি প্যান্ট পাটের দড়ি দিয়ে কোমরে বাঁধা, খালি পা, গায়ে ঝোলান হাতা-ছেঁড়া একটা সার্ট। হাত পা'য়ের পেশী মজে এসেছে—পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস, এক গোছা দাড়ি আছে থুতনিতে, ঢেউ তোলা খাপি চুল, লাল্‌চে শিরা অজস্র শিকড় চালিয়ে গেছে চোখের সাদা ডিমের উপর—গায়ের কালো রং-টা পালিশ নয়, ধোঁয়াটে।

সাড়ে এগারোটায় আধ কাপ চা পাবে রবার্টস্ তাও যদি দীননাথের মেজাজ ভালো থাকে। কিন্তু বিক্রী জুতসই না হ'লে কয়লার দামটা রবার্টস্‌কে স্মরণ করিয়ে দেয় দীননাথ। ভোর আটটা থেকে অপেক্ষা করে করে সেদিন খালি মুখেই রবার্টস্ বাড়ি ফিরে যায়।

বিক্রী ভালো হলে দীননাথই উস্কে দেয় রবার্টস্‌কে: "তোর বাবা তাহলে এদিকটা সবই জঙ্গল দেখেছে?"

"জঙ্গল! টাউন বল্‌তে ছিল কি? দুটো আদালত-ফৌজদারী। টিমটিমে একটা থানা—জিলাস্কুল আর পাদ্রীসাহেবের কুঠি। ষ্টেশনে কেউ একা আস্‌তে সাহস করত না—শেয়াল-সাপ ত কম, এ জঙ্গল ছিল পাহাড় তক—বাঘও নাকি নাম্‌ত, বাবার মুখে শুনেছি।"

"সেদিনে ত টাউনে ভারি ভয় ছিল।—" হুঁকোর ধোঁয়া গিলে একটু আমেজ আসে দীননাথের।

"জঙ্গল আর বাঘের ভয়? আমাদের দেশ কোথায় সে খেয়াল আছে দীন-দা? মরিসস্ —বহু দরিয়া পেরিয়ে যেতে হয়। এ আর কি জঙ্গল এদেশে, বাবা বল্‌ত ওখানে মাটির গা-ই দেখা যায় না! বাবার কিছু ভয়ডর ছিল না। এসেছিল ত ঐটুকু ছেলে, রবার্টসন্ পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে দিন রাত ফিরত—সাহেবকে পাহারাই দিত বল্‌তে পারো।"

মতিরাম রবার্টস্‌কে মনে পড়ে দীননাথের। বেঁটে, হাড়-শক্ত লোকটা —আদালতে প্যায়দার কাজ করত। সত্যি কাফ্রির মত দেখতে—কিন্তু কথায়-বার্ত্তায় চালচল্‌তিতে কে বল্‌বে সে এ অঞ্চলের লোক নয়। বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করলে বল্‌ত: "ছিল মরিসস্—তার কথা কে মনে রাখে? দেশ আমার এ সহরেই—আছি এখানে, মরব এখানে আর দেশ বল্‌ব কি মরিসস্?"

এলুমিনিয়মের ডেক্‌চিতে জল টগবগ করে পাতলা সরাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়। যশোদা ছুটে যায় সেদিকে। ওম্নি হাঁ-হাঁ করে ওঠে দীননাথ: "ছুঁসনি—আমি আস্‌ছি।"

গাঢ় তামাটে মাড়িগুলো দেখিয়ে একটু হাসে যশোদা—তারপর ভাঙা টুলটার উপরই আবার বসে পড়ে। সরাটা সরিয়ে নিয়ে দীননাথ বলে: "বামুন খদ্দের যদি আসে, তাকে কি খেরেস্তানের জল খাওয়াব?"

বামুন খদ্দের যত আসে তা খুবই জানা আছে যশোদার। তবু মাথা নেড়ে সায় দেয় দীননাথের কথায়—নইলে হয়ত প্রাপ্য চা-টা মারা যাবে। হিসেবীর চেয়েও জেদী বেশি দীননাথ।

সার্টের পকেট খুঁটে একটা বিড়ি বার করে যশোদা। দাঁতে বিড়িটা চেপে বলে: "ভালো লাগে না দীন-দা—কাজকম্ম একদম নেই। নুরুল মিয়ার জ্বর হয়েছিল—পুলিশ সায়েবের বাবুর্চ্চির কাজ করেছি সাতদিন—সেই কবে—তারপর একদম সাফ্।"

"কাজকম্ম একটা খুঁজে নে। পুরুষ মানুষ, ঘরে চুপচাপ বসে আছিস্ কেন?"

দড়ির সল্‌তে থেকে বিড়িতে আগুন ধরিয়ে নেয় যশোদা—ভালো টান আসে না—ফেটে গেছে বুঝি বিড়িটা কোথাও। ধরানো দিকটা মুখে ঢুকিয়ে তবু কয়েকটা ফুঁ চালিয়ে বলে যশোদা: "পাওয়া যায় না কাজকম্ম। চেনা নেই তেমন কারু সঙ্গে আমার—বাবাকে চিন্‌ত সবাই।"

মিথ্যে নয়, মতিরাম রবার্টসের সঙ্গে ছিল সবারই পরিচয়। সহর তৈরীর গোড়ার দিকের লোক মতিরাম। জায়গাটার আদি-বাসিন্দে ত ছিল সব তিলি আর মালী। পাহাড়ী একটা নদী আছে বলে কৈবর্ত্তও ছিল দু চার ঘর। কিন্তু সহর যখন তৈরী হচ্ছে পুকুরের পানার মতই ধারে ধারে সরে যাওয়া ছিল তাদের কাজ—আর কিছু নয়। রবার্টসন সাহেব এলেন অষ্ট্রেলিয়া থেকে—একটা কালো ছেলে সঙ্গে নিয়ে—মারবার থেকে এলো একদল মাথায় ফেট বেঁধে, উঁচু পেট দুলিয়ে—বিহার থেকে এলো ধোবী আর মেথর। কলকাতা থেকে এক বেণে এসেছিল সাইকেলের একটা দোকান খুলতে, কাপড়ের দোকান খুলে বস্‌ল ঢাকার দুজন ব্যবসাদার—বিক্রমপুর পাঠিয়ে দিলে সোনার বেণে আর উকীল। পদ্মার পর মেঘনা পার হয়ে ভীড়ের পর ভীড় এসে জড় হল বাংলাদেশের এই পূব সীমান্তে। এরা সবাই পরদেশী, এই জায়গাটুকুকে আশ্রয় করে একে অন্যের আত্মীয় হয়ে উঠল।

আজ অনেক পুরোনো হয়ে গেছে সহর। আদি-বাসিন্দেরাও সহুরে হয়ে উঠেছে—আর যেন ভয় নেই। কৈবর্ত্তরাও যীশুর আশ্রয়েই এসেছে—তাদের কেউ কেউ ক্যাম্বিসের জুতো পরে হাটের দিনে লুক-লিখিত সুসমাচার হাতে করে আবার গলা ছেড়ে গানও গায়! তিলিরা তেজারতির মস্ত আড়ৎদার—মালীরা রাস্তা ঝাঁট দেয়—মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেন সাফ করে কোদাল চালিয়ে। আশপাশের গাঁ থেকে এসেছে মেলাই লোক—উকীল, কেরাণী আর ডাক্তার। জায়গাটা যেন বরদাস্ত করে নিলে সহরটাকে! লোকের ভীড়ে কোথায় আজ রবার্টসনের নাম—কোথায় বা কাফ্রিছেলে মতিরাম, ফেটওয়ালা মারওয়ারীরা বা কোথায়! কে কার খোঁজ নেয়? দিশী খৃষ্টানদের জন্য বরাদ্দ মিশনারীদের জায়গাটা আছে কয়েকটা কুঁজো নুলো ডেরা নিয়ে—কোথায় তার মেহেদী ঘেরা ফুলের বাগান!

মতিরাম বাংলা বল্‌তে শিখেছিল রবার্টসনের কাছে—দাড়ি রাখতে শেখাও তার সাহেবেরই আদর্শে। যশোদা মাকে বড় হয়ে দেখেনি—শুনেছে বাঙালীই না কি ছিল তার মা। সাহেব যে ছিল না তাত ঠিকই—তাহলে কি আর এই নুলো ডেরায় থাকতে হয় তার—আর রং হয় গায়ের এম্নি কালো? মিশনারী স্কুলের মাষ্টার গোষ্ঠের লম্বা, ঢ্যাঙ্গা বোন সৌদামিনীকেও যে সে কোনোদিন বিয়ে করবে তা-ই বা কে জান্‌ত? কি করে যে তবু বিয়েটা হয়ে গেল! যশোদার মত না হলেও সৌদামিনী কালোই। তবে বাংলাদেশের মেয়ে, কালোতে পালিশ আছে।

চালাক মেয়ে সহু—যশোদার মত থিঁতিয়ে যায়নি তত। যশোদা না খাওয়াক—ছেলেপিলে পাঁচটাত তারও। সে ত মা। খাওয়াতে হবে তাকেই। ধাই-এর কাজে লেগে গেছে তাই সহু—পাঁচ ছেলের মা,—সহজ, স্বাভাবিক শিক্ষাত আছেই তার। সহুরে লোকরা জাত মানে না—তাছাড়া আঁতুড় ঘরের জাত আবার কি ?

সাড়ে এগারোটায় বাড়ি ফিরে অনেক দিনই শুনতে হয় যশোদাকে—মা বাড়ি নেই। বড় ছেলে কালু চেঁচিয়ে বলে দেয়। কোলের ছেলেটা বারান্দায় মাটির উপর শুয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করে—তার তত্ত্বাবধানের ভার ছিল যে চারজনের উপর, উঠোনে নেমে তারা একে অপরকে সার্কাস দেখায়। ক্ষিদেও পায়না নাকি শুয়োরের দলের ? উনুনে গিয়ে যশোদা ডাকে : "এই কালু—চালগুলোও ধুয়ে রাখ্‌তে পারোনি হারামজাদা ?"

কালুও ভেংচি দিয়ে ওঠে : "আমি কি জানি—কতটা চাল !"

"জানো না—কিন্তু গিল্‌তে ত পার কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত !" গা থেকে সার্টটা খুলে চাল মাপতে থাকে যশোদা। পোকামাকড়ের মত ছেলেগুলো উঠোনে কিলবিল করে, বারান্দার উপর কাঁচাটা পাখীর ছানার মত কাৎরায়—যশোদার ভ্রূক্ষেপ নেই। উনুন ধরিয়ে চাল ধুয়ে আন্‌তে ইস্কুলের পুকুরে চলে যায়।

ফিরে এসেও যশোদা দেখে কালুদের সার্কাস ভাঙেনি। ঘোড়ার মত উঠোনের চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে নান্‌কু—মাঝখানে দাঁড়িয়ে কালু চাবুকের চট্-চট্ আওয়াজ করে চলেছে। সার্কাস এসেছে টাউনহলের ময়দানে—বিরাট তাঁবু—তার চেয়েও বিরাট ভীড়। পর্দ্দার বেড়া ফাঁক করে উঁকিঝুঁকি মেরে সয়তানগুলো হয়ত কখন দেখে এসেছিল সার্কাসের খেলা—তারই জের এই। যশোদাও তাঁবুর আশেপাশে ঘুরে এসেছে দু-এক দিন।

খেলোয়াড়রা বাঘ-সিংহ নিয়ে নাকি খেলা দেখায়। খাঁচায় পোরা শুট্‌কী মত বাঘ-সিংহগুলোকে ত দেখেছে যশোদা। ওরা আবার জানোয়ার না কি ? মতিরাম বল্‌ত বটে বাঘ-সিংহের কথা। কালো কুচ্‌কুচে মানুষের দল সারা গা চিত্রবিচিত্র করা বল্লম হাতে ছুট্‌ত কেশর ফোলান সিংহের পিছু পিছু—বুনো সিংহ, তার চেয়েও ভীষণ বুনো মানুষের দল ! সিংহ শিকারের একটা অস্পষ্ট ছবি মনে করতে চেষ্টা করে যশোদা—তার শরীরের নিস্তেজ কাফ্রি রক্ত গরম হয়ে উঠতে চায়। উনুনে জল ঢেলে ভাতের হাঁড়িটা ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছা করে তার। বাবুর্চ্চির কাজ জানে বলে বাড়ি বসে উনুন ঠেল্‌তে হবে এমন কি কথা আছে ?

রান্নাঘরের অন্ধকার থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে যশোদা। সাপের মত মাথা তুলে রোদের দিকে তাকায়। দম আট্‌কে আস্‌ছিল তার ঘরের ভেতরে। ফর্সা আলোয় নিশ্বাস নিয়ে বাঁচ্‌তে এল। একটু আগেই এমন করছিল কেন তাঁর শরীর? ধোঁয়ায়—অন্ধকারে? আফ্রিকার অন্ধকারে?

বাচ্চাটাকে ঘিরে বসেছে এবার ছেলেরা। কালুর কথা মনোযোগ দিয়ে শুন্‌তে হচ্ছিল সবার! কথার সঙ্গে ধমক চল্‌ছিল অনর্গল।

"ইয়া সব স্থলপদ্ম গার্ল ইস্কুলের বাগানে—তোরা চোখেও দেখিস্‌নি সেই ফুল। মালী শালা ঘুমোয়না সারারাত—ল্যাম্প জ্বালিয়ে বসে থাকে!—" কালু গ্যাদা ভাইগুলোকে অবাক করে দিতে চায়।

"ফুল চুরি করতে গিয়েছিলি তুই?" নান্‌কু প্রশ্ন করে।

"থাম্। বলিনি চুপ করে শুনে যা! ল্যাম্প জ্বালানো থাকে বলে কি সারারাত ও ঘুমোয় না? ঘুমোয় ঠিকই—ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে রাখে আর কি। ভাবে লোকের চোখে ধুলো দেবে। আমিত শেষ রেতে বেরিয়েই সাবাড় করে দিলুম বাগান।"

"কই, ফুলত তুই একদিনও বাড়ি আনিস্ নি।" নান্‌কু ধৃষ্টতা দেখায়।

"বল্‌লুম না চুপ কর্। বাড়ি আন্‌বার জন্যে ফুল চুরি করেছি আমি? তখন পূজো—দুগ্‌গা-বাড়ির দুয়োরে ঢেলে দিয়ে এলুম সব ফুল। আমার চেয়ে বেশি ফুল আর কোন্ শালা দিতে পারে? দুটি চারটি শিউলি নিয়ে আসে লোক—ওত আমি ছুঁই-ই নে।"

বাচ্চাটা আবার উস্‌খুস্ করতে সুরু করে। হাঁটুর উপর ওর মাথাটা তুলে দোলাতে দোলাতে বলে কালু:

"কী বাজি পুড়িয়েছি এবার কালীবাড়িতে দেয়ালির সময়!"

"পয়সা পেলি কোথায়?" আবারও নান্‌কু দুঃসাহস দেখায়।

"পয়সা!" ভেংচিয়ে ওঠে কালু: "এম্নি বাক্স ভরা বাজি নিয়ে এসেছিল ননী—পোড়াতে পারে না—ভয় পায়। সব পুড়্‌ল আমার হাতে।"

খচ্চরের মত হঠাৎ খিঁচড়ে ওঠে যশোদা: "এই কালু—ভাতটা দেখিস, ডাল নিয়ে আসছি আমি।"

যশোদা বেরিয়ে যায়। নান্‌কুর কোলে বাচ্চাটাকে ঠেসে দিয়ে কালু গিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে। এবার নান্‌কুর পালা। ছোট ভাই দুটোর মুখের কাছে আঙ্গুল নেড়ে বলে: "আমরাও দেখিস্ অনেক ফুল তুলে এবার পরবে মেমসায়েবকে দিয়ে আস্‌ব।"

জিতু বলে : "পরবে বাবাও বাজি আন্‌বে।"

কালু যেন কান পেতেই ছিল, বেরিয়ে এসে সম্‌ঝিয়ে দেয় ওদের : "বড়দিনের পরবে আবার বাজি! ভারি ত পরব। একটা করে কমলা দেয় শুধু বুড়ি মেমটা।"

জিতু বলে : "জামাও দেবে এবার—বাবা বলেছে।"

নান্‌কু খবরটা আরো সত্যি করে তোলে : "জামা কি ও পাবে নাকি—ছোট ছোট ছেলেদের জন্যে জামা!"

ভেংচিতে মুখটা বিঘৎ দুই লম্বা করে বলে কালু : "মেমদের পুরোনো জামা কেটে কেটে তৈরী—ও জামা আমি পরতে গেছি আর কি!"

নান্‌কু আর জিতু চুপ করে যায়। জানে, পুরোনো জামা যদি ওদের পসন্দ হয় তাহলে কালুর মার ভাগ্যে লেখা।

তবু বড়দিন এলে একটু নড়েচড়ে ওঠে যশোদা। লম্বা লম্বা পা ফেলে পাদ্রী সাহেবের কুঠির কাছে যায়, রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে খানিকক্ষণ, নজরে পড়লে যদি সাহেব ডাকে। সাহেব হয়ত বেরিয়েও আসেন—সাদা দাড়ির গায়ে চশমার কালো ফিতেটার দিকে চোখ তুলে চায় যশোদা, সাহেব চোখ তুল্‌লেও কিন্তু যশোদার দিকে চান না। চশমার কাচে রোদ্দুর ঝিক্‌ঝিক্ করে ওঠে—তাই কি সাহেব দেখ্‌তে পেলেন না তাকে? গেট পার হয়ে সাহেব চলে যান—যশোদা তবু নড়ে না—দুএক পা করে এগিয়ে ঘাস-কাটা মালীর কাছে এসে দাঁড়ায়।

"ঘাস কোথায় রে বিশা—কাট্‌ছিস যে!" আলাপে জম্‌তে চায় যশোদা।

"সায়েবের মর্জ্জি—এক ইঞ্চির উপর উঠ্‌তে পারবে না!"

"তাত হবেই—পরব আস্‌ছে কিনা!"

"পরব বলে' কি? ঘাসের বাই বারোমাসই আছে সায়েবের।"

"তবু এটা ত বড়দিনের সময়—বৈঠক মিছিল খানাপিনা হবে হয়ত।"

"কিচ্ছুনা—মেয়েটার জন্যে একটা পিরান চাইলাম মেমসায়েবের কাছে—বলে এবার আর কিছু হচ্ছে না, বলে, যুদ্ধ লেগেছে।"

আরো একবার ত যুদ্ধ লেগেছিল—মনে পড়ে যশোদার। কিন্তু মিছিলের ত কামাই হয়নি। তার তখন বয়েস ছিল অল্প একটা লালনীল নিশান হাতে করে মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সহর সে ঘুরে বেরিয়েছে! আজকের যুদ্ধ এমন কি যুদ্ধ যার জন্যে মিছিলও বাতিল হয়ে যাবে! বিশা মালীর কথা বিশ্বাস করতে চায়না যশোদা—বলে "ধেৎ—তুই জানিস্ নে। পরব কামাই দেবে সাহেব?"

বিশাও ঠাট্টা করে : "মাঠটাত তৈরী করে দিচ্ছি তুই এসে নাচ দেখিয়ে যাস।"

রেগে উঠেও যশোদা কিছু বল্‌তে পারে না। একটা মালীর সঙ্গে কি কথা কাটাকাটি করবে সে? তার কি মুখের ইজ্জৎ নেই?

মুখের ইজ্জত যশোদা বরাবরই রক্ষা করে এসেছে। নইলে একেক দিন এমন হয় যে সৌদামিনীকে গালিগালাজ করে সে দুরস্ত করে দিতে পারে কিন্তু তা সে দেয়না। মতিরাম তাকে শুধু মুখে মুখে এবিসিডি-ই শিখিয়ে যায়নি—বাঁকা চোরা হরফে ইংরাজিতে নামটাও যশোদা সই করতে পারে। সাহেব সুবোর কাছ ঘেঁসেই তার চাকরি। মুখে যাচ্ছেতাই বেরুতে চায়না সহজে।

তিন দিন অনুপস্থিত থাকার পর হয়ত সৌদামিনী পান চিবুতে চিবুতে এসে বাড়ি ঢোকে। ছেলেগুলোকে রেঁধে খাইয়ে আর তার চেয়েও বিষম কাজ ওদের সামাল দিয়ে যশোদার মেজাজ তখন সপ্তমে।

"বাচ্চাটাকে নিয়ে কালুত দিনে দশবার তোমার কাছে ছুটে যায় খাওয়াতে আমি তা হলে সারাদিন বাড়ি বসে থাক্‌লেই পারি!"

শাড়ীর লাল পাড়ে ঠোঁটের ধারগুলো মুছে নিয়ে সৌদামিনী দায়িত্বহীনের মত বলে : "ছেলেদের দেখ্‌বে না ত বাপ হয়েছো কেন?"

এই সাংঘাতিক প্রশ্নের আরো সাংঘাতিক জবাব যশোদার জানা আছে কিন্তু মুখ থেকে তার সে জবাব ফুট্‌তে চায়না। বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে যায় সে বাড়ি থেকে। আসে দীননাথেরই দোকানে।

কাপড়ের খুঁটে কানতক ঢেকে জড়সড় হয়ে দীননাথ মাচার উপর বসে হাঁটু নাড়ে। মামলাবাজ যাত্রীর ভীড় এখন কম। তাছাড়া আড়ৎদার বলে দিয়েছে নূন, চিনি, কারোসিন ত পাওয়াই যাবে না—ডাল আসে কিনা সন্দেহ। দেশেই চলে যাবে কিনা ভাব্‌ছিল দীননাথ। যশোদা এলেও তাই সে চুপ করেই ছিল।

টুলটার উপর বসে খানিকক্ষণ সড়কের দিকে চেয়ে থেকে আপন মনেই যেন বলে ওঠে যশোদা : "সংসারে কেউ আপন হয় না দীনদা।"

দীননাথের বলে তখন ছেলেপুলে নিয়ে একটা প্রকাণ্ড গোষ্ঠীকে খাওয়াবার চিন্তা—সামান্য জমিতে তা কি করে হয় মনে মনে তারই একটা হিসেব কষে দেখছে। যশোদার মত বাউণ্ডেলের কথা তার কানে গেলে ত!

"ছেলেপুলে বল, বউ বল কোনোদিন আপন হয় না! শুধু আমার বলেই বল্‌ছিনে—দেখলুম কত।"

"খেটে খাওয়াবিনে বউ ছেলেদের—আপন কি ওম্নি হয়?" দীননাথ বিরক্ত হয়েই বলে।

একটু উৎসাহ দেখা যায় যশোদার মুখে: "খেটে খাওয়ালেও বা কি? আমি কি খাওয়াইনি ওদের কোনদিন? তবু এম্নি ধরণ চিরটা কাল। এদের সঙ্গে বন্‌লনা আমার।"

"বন্‌বে কি করে? তুই হলি খেরেস্তান।"

"এরাও ত খেরেস্তান—গোষ্ঠরা দুপুরুষের খেরেস্তান।"

"হলইবা—তবু বাঙালী ত!"

"ওই যা বলেছে!" চা পাবার আশায় নয়—যশোদার মনের কথাটা বল্‌তে পেরেছে বলেই দীননাথকে সে তারিফ করে ওঠে। বাঙালীর সঙ্গে কি করে বন্‌বে তার? সে পূরোদস্তুর কাফ্রির ছেলে। অবশ্য ঠিকমত আন্দাজ করতে পারে না, কাফ্রিদের দেশটা কি রকম—কি রকম অদ্ভুত আশ্চর্য্য জায়গা যে মরিসস্। তবে এ রকম কেঁউ কেঁউ বুলিওয়ালা পিন্‌পিনে বাঙালীর মত লোক নিশ্চয়ই সেখানে নেই। হাতপাগুলো ছট্‌ফট্ করতে থাকে যশোদার কাজ করবার জন্যে কিন্তু এ রাজ্যে কাজ কোথায়? জীবনে দুবার মাত্র দুটো কাজ করতে পেরেছিল সে। একবার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে চুক্তি নিয়ে রাস্তার ধারের বিশাল একটা বটগাছ কেটে দিয়েছিল একদিনে. আরেকবার মিউনিসিপ্যালিটি থেকে দশ টাকা পেয়ে দুদিনে পুরোনো একটা মস্ত দীঘির জলো ঘাস উপড়ে দিয়েছিল। এখন এ সব কাজ কন্‌ট্রাক্টর বাবুদের হাতে—মজুর লাগিয়ে কাজ করান তাঁরা—আর মজুরও পাওয়া যায় এখন বিস্তর।

"খুব খারাপ দিন এল্লোরে যশোদা—কাজকারবার তুলে দিতে হবে।" কপালে কেঁচোর মত কতকগুলো দাগ তুলে বলে দীননাথ।

"হুঁ" বলে যশোদা চুপ করে থাকে। এই দীননাথের সঙ্গেও বা কতটুকু খাতির তার? কত বছর ধরে দেখাশুনো আলাপ পরিচয়, চা খাওয়ায় ওম্নি—সে কথাও সত্যি, মাঝে মাঝে দুচার আনা ধারও যে না দিয়েছে এমন নয় কিন্তু তবু দুজনের মধ্যে অনেকখানি ফারাক। শুধু খৃষ্টানই নয়, জন্তু জানোয়ারের মত হয়ত তাকে মনে করে দীননাথ। এতদিনের তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের অর্থ আবিষ্কার হতে থাকে যশোদার মনে।

দুপয়সার মুড়ি নিতে আসে মৌলভি সাহেবের বাচ্চা মেয়ে ফুলজান। ঠোঙ্গাটা বাঁধতে বাঁধতে দীননাথ বলে: "এম্নি দিন এসেছে—কাগজ পাওয়া

যাবে না। রদ্দি কাগজের দর বলে বারো আনা সের। যশোদা—এসেছিসই যখন একটা কাজ করে দিয়ে যা—ক'টা বনসেগুণের পাতা পেড়ে দিয়ে যা লক্ষ্মীটি—ওদিয়েই মোড়ক বাঁধা চল্‌বে আমার এখন থেকে।"

যশোদা শব্দ করে না। অন্যমনস্ক হয়ে সড়কের দিকে চেয়ে থাকে।

"শুনছিস্—ও যশোদা—" দীননাথ আবারও ডাকে।

"গাছে উঠ্‌তে আজ পারবনা দীনদা—পায়ে একটা চোট লেগেছে।" যশোদা উঠে দাঁড়ায়।

"না হয় কোটা দিয়েই পেড়ে দে।"

কথাটা যেন শোনেনি এম্নি ভাব করে যশোদা হাঁট্‌তে সুরু করল। নিজে থেকে চা খেলো না সে আজই প্রথম।

ক'টা দিন সৌদামিনী বাড়িতেই আছে। যশোদা তাই সহরটা টইটই করে বেড়ায়। লোকে বল্‌বে অবিশ্যি বেড়ায়, সৌদামিনীও হয়ত তা-ই বল্‌বে কিন্তু যশোদা জানে কাজের পেছনেই তার এই ঘোরাফেরা।

বাড়ি ফেরবার মুখেই অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে ওঠে যশোদা। নরম দেখালে পাছে সৌদামিনী পেয়ে বসে সে আশঙ্কা থাকে। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়না। সৌদামিনী যে-কে-সে।

"এ মরাগুলোকে দেখ্‌লেও ত হয় বাড়ি বসে—পুকুরে যায় মরতে এক মরা—মাঠে দৌড়িয়ে কাচ ভাঙ্গায় পা কেটে আসে আরেক শকুন আর কেলে অসুরের ত দেখাই নেই!"

যশোদা তেতে ওঠে: "আমি কি বাড়ি বসে থাকবার দাসখৎ দিইছি না কি?"

"বাইরে কি কাজটা আছে শুনি?" পাৎলা ঠোঁটগুলো ফর্‌ফর্ করতে থাকে সৌদামিনীর: "পয়সা রোজগারের নাম করে ত বেরুনো হচ্ছে—পয়সার ত কূল নেই! তবেই বল্‌ব আছে কেউ বাইরে। সেই সোহাগীকে নিয়ে থাকলেই হয়—বাড়িতে আর আসা কেন?"

এখনও ইতরের মত পাল্টা জবাব যশোদা দিতে পারে না। ঘৃণায় সমস্ত শরীরটা শিরশির করে ওঠে তার—থুতনি কাঁপিয়ে শুধু বলে: "মেয়েমানুষকে মার দেওয়াই উচিত—ওদের সঙ্গে কথা বল্‌তে নেই।"

"মারবে? অ্যাঁ মারবে?" পাতলা শরীরটাকে নাচিয়ে তোলে সৌদামিনী: "বড় বাড় বেড়েছ! দাদা আমায় কি জানোয়ারের হাতে দিয়ে গেল—তার

আগে গলা টিপে আমায় মেরে ফেল্‌লে না কেন ?” সৌদামিনী ফোঁপাতে সুরু করলে, রকম-সকম দেখে কোলের কাঁচাটাও ট্যাঁ করে রইল।

কি বিশ্রী লাগ্‌ছিল সৌদামিনীকে ! যশোদা মনে মনে দুঃখিত হয়ে উঠ্‌ল —একদিনের জন্যও যে একে তার ভালো লেগেছে। যশোদার হাতের আর বুকের শক্ত পেশীগুলো সৌদামিনীর নরম মাংসের চাপে যে অদ্ভুত স্বাদ পেয়েছিল তা-ও যেন তার মনে আজ তেতো হয়ে আসে। মনে হচ্ছে তার, যেন একটা মরা মানুষ সৌদামিনী হয়ে তার চোখের সামনে লাফিয়ে চলেছে। এত কুৎসিত সৌদামিনীকে কোনদিন সে দেখেনি। সত্যি বল্‌তে, কি আছে এ মেয়েটার— লম্বা সরু একটা শরীর, চোয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়তে চায়, উঁচু হয়ে আছে কনুইএর হাড়, কালো তাগায় তার উপর কতকগুলো মাদুলি ঝুলিয়েছে ! মাদুলি ! কালীবাড়ির পূজোরীটা মাদুলী বিক্রী করে। সে-মাদুলীই কি না কে বল্‌বে ?

অস্থির হয়ে ওঠে যশোদা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে যেন দম ফিরে পায়।

শালকরের দোকানে গিয়ে বসে সে আজকাল। নদীয়ার মুসলমান শাল-কর—এক আধটা বিড়ি যশোদার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আলোয়ান রিফু করতে করতে গল্প করে।

“এতদিন বাংলাদেশে আছ, তামাক খাওনা সাহেব এ কেমন কথা ?”

“নাঃ, কোনোদিনই তামাক খেলাম না”—যশোদা বিড়িটা দাঁতে চেপে ধরে।

“ছাখোনা এই বাঙ্গাল দেশে এসে আমি ত শুঁট্‌কীও খেতে শিখেছি।”

যশোদা মাথা নাড়তে থাকে। শালকর বল্‌তে থাকে নদীয়ার মাটির কথা—নদীয়ার মাটিই মিষ্টি, যেমন সেখানকার লোকের কথাবার্ত্তা। এটা হল পাহাড়ীদের দেশ —নেহাৎ পেটের দায়ে তাকে আস্‌তে হয়েছে এখানে—তবে জায়গাটার উপর যে মায়া হয়ে যায়নি তা নয়—কিন্তু তা বলে দেশকে সে ভোলেনি বছরে একবার সে দেশে যায়ই।

বেখাপ্পাভাবে হঠাৎ যশোদা বলে ওঠে : “খুব যুদ্ধ হচ্ছে, না মিয়া ?”

“হেঁ, তাত হচ্ছেই। দাম চড়ে গেছে কতো জিনিষ পত্তরের। রং নেই, সাবান পাবে নাকো, ব্যবসা আর চল্‌বে না।”

“কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে ?”

“বিলেতে। হাব্‌সী দেশেও লেগেছে শুন্‌তে পাই।”

“হাব্‌সী দেশ কোথায় ?”

“মিশর বাদশার দেশের কাছাকাছি।”

"মিশরে ? আফ্রিকায় ?"

"হবেও বা ! কিন্তু সে অনেক দূরে। তবু হেথায় আমরা মারা যাচ্ছি ছাখো।"

বিড়িটা শেষ করে উঠে যায় যশোদা। বাড়ি যাবার সময় হয়েছে। কিন্তু বাড়ি যায় না সে। পুলিশ লাইনটা ঘুরে আসে একবার। ম্যাজিষ্ট্রেটের চাপরাশির সঙ্গেও আলাপ চালিয়ে আসে কতক্ষণ।

চাপরাশী তারু মিয়া বলে দিয়েছে সৈন্য হতে কি বাধা আছে ? আঠারো টাকা মাইনে তাছাড়া খাওয়া আর পোষাক-আষাক একদম মোফৎ। তবে কি না এখানে এখনো নাম লিখানো সুরু হয় নি ঠিকানা দিয়ে দেওয়া হয় কলকাতার, সেখানে গিয়ে পৌঁছুতে পারলেই আর কোনো হাঙ্গামা নেই। কত লোক এরই মধ্যে ঠিকানা জেনে নিয়ে চলে গেছে কলকাতা, তাদের অনেকের নামও তারু মিয়ার মুখস্তের মত।

"কিন্তু কলকাতা যাবার টাকা নেই যে আমার !" যশোদা যেন তারু মিয়ারই কৃপাপ্রার্থী।

টাকা নেই ! তা হলে আর কি ? বসে থাক। মাত্র ত ছ'টা টাকা—কোনো রকমে যোগাড়যন্ত্র করে নিয়ে একবার পাড়ি দিলেই ত হল। মাসের শেষে তার তিনগুণ কড়কড়ে টাকা যখন হাতে আস্‌ছে তখন আর ছ'টা টাকা পাওয়া যায় না ?

তারু মিয়া অনেক কথাই বল্‌লে। আসলে আড়কাঠি ও নয়, কথা বল্‌তেই ভালোবাসে লোকটা, আর কিছু জান্‌তে শুন্‌তে যে ওর বাকি নেই তা জাহির কর্‌তে পারলেই ও খুসী। সৈন্য হতে চাইলে কি করতে হবে, বানিয়েই তা বলে দিলে সে যশোদাকে। যশোদাও তাতেই খুসী। যাহোক একটা খবর পাওয়া গেল।

টাকা আছে। সৌদামিনীরই রোজগারের সাতটা টাকা। মরচে ধরা টিনের বাক্সটাতে লুকিয়ে রেখেছে সৌদামিনী।

সারাটা দিন আর বাড়ি ছেড়ে বেরুল না যশোদা। কিন্তু ছেলেগুলোর হৈ চৈ হাঙ্গামায় তার যেন একটুও হুঁশ নেই। একটা কথা পর্য্যন্ত বল্‌তে ইচ্ছা করছিল না তার। যেন এখান থেকে শিকড় তার উপড়ে গেছে, আর এ মাটিতে বস্‌বে না গাছ। সত্যি এখানকার লোক ত সে নয়, কি লাভ তার এখানে থেকে ! তারই বৌ আর ছেলে পিলে এরা কিন্তু তবু তার থেকে অনেক আলাদা।

অবিশ্যি সৌদামিনীর ছ'টা টাকা সে পাঠিয়ে দেবে পোষ্ট অফিসের মারফৎ তাছাড়া আর একটি পয়সাও না। সে চলে গেলে এদের কোনো কষ্ট নেই কারণ সে থেকেও এদের সুখ ছিল না। কাজেই সে ভাবনা যশোদা আর করে না। সৈন্য হবে যশোদা। সৈন্যেরা লড়াই করে। লড়াই করতে গায়ের জোর চাই। সার্কাসের লড়নেওয়ালা পালোয়ানদের দেখেছে সে মস্ত যোয়ান তারা। জোর আছে এখনও ঢের যশোদার গায়ে। সৈন্য হয়ে যেতে পারবে কি সে মিশর? তারপর হাবসীদের দেশে? হাবসীদের দেশই হয়ত তার দেশ। আফ্রিকা মুলুকেই ত মরিসস! হয়ত খুবই অদ্ভুত মনে হবে তার কাছে মরিসস দেশ, তবু ভালো লাগ্‌বে সেখানকার লোক, সেই বনজঙ্গল, সাপ হাতী সিংহ। কাঁটা দিয়ে সমস্ত শরীরটা শিরশির করে ওঠে যশোদার।

সৌদামিনী অনেকবার তার কাছে ঘুরঘুর করে যায়। নান্‌কুকে উপলক্ষ করে তাকেই কয়লা কিনে আনতে বলে। যশোদা তবু মুখ খোলে না।

নিরুপায় হয়ে চাবিটা শেষে বারান্দায় ছুঁড়ে দিয়ে বলে সৌদামিনী: "বিকেলে আর উনুন জ্বল্‌বে না।"

রাত্রি আটটা না বাজতেই পাড়াটা যেন মরে শ্মশান হয়ে আছে। কেরোসিনের যা দাম জেগে থাকা ত শুধু কেরোসিন পুড়বার জন্যে! অন্ধকারে বেরিয়ে এলো যশোদা—হাতকাটা সার্টটার পকেটে ছ'টা টাকা। ময়লা একটা চাদর জড়িয়ে নিয়েছে সে গায়ে। ষ্টেশনে গিয়ে বস্‌তে হবে অনেকক্ষণ—রাত দেড়টায় গাড়ি। সার্টের পকেটটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে এতক্ষণে ভাবছিল সে—টাকা ক'টা কি চুরি করা হ'ল? সৌদামিনী অবশ্য জানে না, তাকে বলেনি সে টাকা নেবার কথা। মনে পড়ে তার 'দশ আজ্ঞা'য় চুরি না করবার কথা ছিল। সেদিনে সে চুরি করতনা। আর আজও কি সে চুরি করেছে! সৌদামিনীরইত টাকা! তাড়াতাড়ি আবার যশোদা মনের কথাটাকে শুধ্‌রে নেয়—না থাক্ সৌদামিনীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ, টাকাটাত সে পাঠিয়েই দেবে।

গাড়ি আসবার পনেরো মিনিট আগে টিকিটের জানালা খুল্‌বে। ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই—চেনা কারু সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে হঠাৎ। দশ পাঁচ কথা জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে কোথায় সে যাচ্ছে। তার চেয়ে অন্ধকার প্লাটফর্ম্মে গিয়ে বসে থাকা ভালো।

প্লাটফরমের এক প্রান্তে শ্লিপারের খুঁটিতে ষ্টেশনের নাম ঝুলানো—তার গা ঘেঁসে লোহার বেড়ায় ঘেরা এক চিল্‌তে বাগান। বাগানের ঝাঁকড়া জবাফুল গাছটার ছায়ায় একটা জায়গা খুব বেশি অন্ধকার। যশোদা ওখানেই গিয়ে পুটলির মত বসে রইল। রেল-লাইনের ওধারে ষ্টেশনের গুদাম। তারপর ধান ক্ষেত, অনেকদূর পর্য্যন্ত—গাঁয়ের গাছের সারিতে মেশা। যশোদার ঠোঁটে একটা বিড়ি পুড়তে থাকে—চেয়ে থাকে সে অন্ধকারের দিকে।

কোথায় কল্‌কাতা? ওখান থেকেই বড়দিনের সময় সাহেবের কুঠিতে খেলনা, জামা, লজেঞ্চুস আর কেক আসে। মস্ত সহর আর অনেকদূর। সৈন্য হ'তে চলেছে যশোদা। এমন ছেঁড়া প্যান্ট নয় আর—আনকোরা হাফপ্যান্ট পরবে সে, নতুন কোর্ত্তা গায়ে দেবে আর কাঁধে নেবে সঙ্গীন-উচানো বন্দুক—পায়ে ভারি ভারি বুট জুতা—তার ওজনে মাটি কেঁপে ওঠে। ভারি জুতোয় ভারি আওয়াজ তুলে, হাত দুলিয়ে চলেছে যশোদা সৈন্যের সারে সারবন্দী হয়ে—কল্‌কাতা ছেড়ে দিল্লী—দিল্লী ছেড়ে বোম্বাই—তারপর সেখান থেকে জাহাজ। ওই গুদামের মত উঁচু আর প্রকাণ্ড সেই জাহাজ, দরিয়া পাড়ি দিয়ে চলে। যশোদা চলেছে সে জাহাজে এ দেশ—এ রাজ্য ছেড়ে, কতদূরে তা সে জানে না। কোথায় গিয়ে যে পৌঁছবে তা-ও ত সে জানে না! সে কেমন দেশ—আফ্রিকা? বন জঙ্গল আর অন্ধকার। সে অন্ধকারে মানুষগুলোর গায়ের রং-ও কালো হয়ে যায়। ধানের ক্ষেতের উপর অন্ধকারের দিকে আবারও তাকায় যশোদা। কেমন ভয় ভয় করতে থাকে তার—কিছু দেখা যায় না, চেনা যায় না কিছু। সেই অন্ধকার থেকে কি যেন একটা দৈত্যের মত উঠে এসে তার শক্ত শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে, দুম্‌ড়িয়ে, নেতিয়ে দিয়ে যায়। ঠোঁট শুকিয়ে আসে যশোদার—মনে হয় মুখ দিয়ে বুঝি আর কোনদিন কথা বেরুবে না।

ঘরে এসে ঢোকে যশোদা। দরজা খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছে সৌদামিনী। কালু, নান্‌কু এরা ঘুমে ঠাণ্ডা হয়ে আছে। লণ্ঠনের টিম্‌টিমে আলোতে দেখা যায় সৌদামিনীর ঘুমন্ত মুখ। মনে পড়ে অনেকদিন ধরে অনেক ভাবে এ মুখ দেখেছে যশোদা—এত চেনা এ-মুখ যে তার প্রত্যেকটি রেখার বাঁক তার মুখস্ত। এত চেনা বলেই এ-মুখ তার ভালো লাগে। ঘুমন্ত সৌদামিনীকে সুন্দরও লাগে যেন এখন।

গা থেকে জামাটা খুলে ফেলে আড় করা বাঁধা বাঁশের উপর ছুঁড়ে দেয় যশোদা—লণ্ঠনটা নিভিয়ে দেয় তারপর—তেলের যা ভীষণ দাম আজকাল!

সমাজতন্ত্রবাদ ও বিপ্লব

লুসিয়ঁ লরা

মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত বিরোধও বাড়তে থাকে এবং তার ফলে অবশেষে শ্রমিক বিপ্লব হয়ে দাঁড়ায় অনিবার্য্য। এই পরিণতির সাধারণ ধারা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁদের যা বক্তব্য তার মধ্যে অস্পষ্টতার আভাষ নাই, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কি ভঙ্গী নেবে, তার ফলে যে নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠা তারই বা রূপ কি হবে—এ সমস্ত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস ও এঙ্গেলস দুই জনেরই বক্তব্যের মধ্যে অনেকখানি অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তার অবকাশ রয়েছে।

ভেবে দেখলে কল্পনাসর্ব্বস্ব সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান পার্থক্যও এইখানে। স্পষ্টতার অভাব সেদিক থেকে দোষের নয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ প্রত্যয় বা চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে দুনিয়ার রূপান্তরের কোন সহজ পথনির্দ্দেশ করে না। বুদ্ধিবিলাসের বদলে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ সামাজিক পরিণতির কেবলমাত্র সাধারণ ধারা নির্দ্দেশ করে। বলে যে সে ধারার বিশেষ গতি ও রূপ, তা কেবলমাত্র ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে ধরা দেয়, এবং সেই বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই সামাজিক বিপ্লবসাধনের জন্য কোন ধারার কি গুরুত্ব তা নির্ণয় করা চলে। ১৮৪৬ সালে মার্কস কল্পনাসর্ব্বস্ব সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে তাঁর নিজের সমাজদর্শনের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলেছেন :

"সমাজের বিবর্ত্তনে শ্রমিকেরা যতদিন নিজেদের শ্রেণীস্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নিজেদের পৃথক সত্তার দাবী করে না, ততদিন শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে যে স্বার্থদ্বন্দ্ব, তারও কোন রাজনৈতিক রূপ নাই। যতদিন সমাজের উৎপাদনী শক্তির বিকাশের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিসাধনের পথ বাস্তব হয়ে না উঠে, ততদিন নতুন সমাজের সম্ভাবনাও সুদূর। এ রকম অপরিণত অবস্থা যতদিন থাকে, ততদিন কেবলমাত্র শোষিত শ্রেণীর দুঃখ দূরের জন্য নয়াসমাজ ব্যবস্থার পরিকল্পনা এবং সর্ব্বসমস্যাহর বিজ্ঞানের কল্পনা যাঁরা করেন, সে সমস্ত চিন্তাবিলাসীদের বৈজ্ঞানিক না বলে বিজ্ঞানবিলাসী বলতে হয়। ইতিহাসের

বিকাশের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামও তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট হয়ে উঠে, এবং তখন সমাজবিজ্ঞানের জন্য আর কেবলমাত্র কল্পনানির্ভর হবার প্রয়োজন নাই। চোখের সামনে সমাজে যে পরিবর্ত্তন ঘটছে, তার বিবরণ এবং সে পরিবর্ত্তনের বাহন নিজেকে করলেই যথেষ্ট।"

ধনতান্ত্রিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীরও বিকাশ, সেই বিকাশের ফলে স্বতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব। শ্রেণীসংঘর্ষ ক্রমে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে পরিণত হয়, এবং রাষ্ট্রশক্তি শ্রমিকশ্রেণীর হাতে এসে পড়ে। ক্ষমতা অধিকারের ফলে ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংঘবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর সম্পদে পরিবর্ত্তিত হয়। মার্কসের এসব সাধারণ সূত্র সর্ব্বজনবিদিত কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কসের অনুগামীদের হাতে তাদের এমন বিকৃতি ঘটেছে যে সর্ব্বজনবিদিত হলেও তাদের পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক কর্ম্মীদের মধ্যে অনেকের মত যে মার্কস রক্তবিপ্লবের অনিবার্য্যতায় বিশ্বাসী, রাষ্ট্রে সর্ব্বব্যাপী একনায়কত্বের সমর্থক। তাঁরা বলেন যে মার্কসের মতে বিনা ক্ষতিপূরণে এবং একযোগে সমস্ত সম্পত্তিকে রাষ্ট্রাধিকারে আনতে হবে। রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্বন্ধে মার্কসের ধারণারও অনেক বিকৃতি তাঁরা করেন। এই সমস্ত কারণে মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রকৃত মতবাদের পুনরালোচনা এবং তার সঙ্গে মার্কসপন্থীদের বিকৃত মার্কসবাদের তুলনা প্রয়োজন।

সাম্যবাদী ইস্তাহারের শেষ অধ্যায়ে আছে: সাম্যবাদীরা তাদের মত ও লক্ষ্য লুকোতে চায় না। তারা খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে যে রাষ্ট্র ক্ষমতার ব্যবহার দ্বারা বর্ত্তমানের সামাজিক ব্যবস্থার বিলোপ সাধনই তাদের লক্ষ্য সাধনের একমাত্র পথ।

আধুনিক ধনতন্ত্রবাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিতে গিয়ে মার্কস তাঁর ক্যাপিটাল বা মূলধন গ্রন্থে লিখেছেন :

পুরোনো সমাজের নবজন্মক্ষণে একমাত্র শক্তিই ধাত্রীর কাজ করতে পারে। সেই শক্তি অর্থনৈতিক ক্ষমতার অন্যতম রূপ।

এই দুটী উদ্ধৃতি দিয়েই সাধারণত প্রমাণ করা হয় যে মার্কস সহিংস উপায়ের সমর্থক, এবং সহিংস শ্রেণীসংঘর্ষে বিশ্বাস না করলে তাকে মার্কসপন্থী বলা চলে না। মঁসিয় বেরাচা মার্কসের সমালোচক, মিষ্টার হুক তাঁর সমর্থক, কিন্তু দুজনের রচনায়ই এ মনোভাবের পরিচয় মেলে।

এ সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে কথাগুলির সঠিক অর্থ নির্ণয় প্রয়োজন। শক্তিপ্রয়োগ বললেই দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের কথা মনে আসে—যুদ্ধবিগ্রহের সহিংস

পরীক্ষাও শক্তিরই রূপান্তর। কথাটীর কিন্তু ব্যাপকতর এবং সাধারণ অন্য অর্থও আছে, সেখানে শক্তির অর্থ ক্ষমতা, যে ক্ষমতা সমস্ত সমাজব্যবস্থা ও আইনের ভিত্তি। সক্রিয় শক্তি এবং নিহিত ক্ষমতার মধ্যে যে পার্থক্য, তাকে স্পষ্ট করে বোঝা প্রয়োজন। বিভিন্নমুখী সামাজিক শক্তির যে নিত্য ও দ্বন্দ্বহীন চাপ, সাময়িক ও দ্বন্দ্বমূলক শক্তির সঙ্গে তার পার্থক্য পরিস্ফুট। প্রথমটী অর্থাৎ নিহিত ক্ষমতা সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পরের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সক্রিয় কিন্তু দ্বিতীয়টীর পরিচয় কেবল তখনি মেলে যখন বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থবিরোধ প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। বলাবাহুল্য যে এরকম দ্বন্দ্ব সাময়িক হতে বাধ্য। আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটী দৃষ্টান্ত নিলে একথা আরো পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়।

বিগত মহাযুদ্ধের পরে ইয়োরোপে যে শান্তি, নিহিত ক্ষমতার পারস্পরিক সম্বন্ধই তার ভিত্তি একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যে সমস্ত রাষ্ট্র অবস্থান্তর আনবার জন্য যুদ্ধাভিলাসী, তাদের তুলনায় সমসাময়িক ব্যবস্থায় তুষ্ট রাষ্ট্রগুলির শক্তি যতদিন বেশী থাকবে, ততদিন সন্ধি টিঁকবে। সমাজের মতন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায়ও নিহিত ক্ষমতাই বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্বন্ধ নির্ণয় করে—বিরুদ্ধ পক্ষের শক্তিপুঞ্জের ক্ষমতাসাম্য যখন উল্‌টে যায়, তখনকার সাময়িক অব্যবস্থাই সক্রিয় শক্তি বা প্রকাশ্য সংঘর্ষের অবকাশ।

১৮৪৮ সালে মার্কস এবং এঙ্গেলস যে এ দুই ধরণের ক্ষমতার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন নি একথা সত্য। ক্ষমতার কথা বলতে গিয়ে যে তাঁরা নিহিত ও প্রকাশ্য দুই ধরণের শক্তির কথাই বলবেন, তাও স্বাভাবিক। সে সময়ে ইয়োরোপে গণতন্ত্রের বিশেষ কোন নিশানা ছিল না। উদীয়মান শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির জন্য রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্ত্তন যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ ভিন্ন হতে পারে, একথা কেউ ভাবতেও পারত না। সে সংঘর্ষ যে কেবলমাত্র প্রকাশ্য তা নয়, বে-আইনীও বটে, কারণ প্রতিষ্ঠিত আইনের বিরুদ্ধেই শ্রমিক-শ্রেণীর বিদ্রোহ। গণতন্ত্রবিরোধী আইন বদলাতে হলে আইন-অমান্য বোধ হয় অনিবার্য্য, কারণ পুরোনো মৃত স্বৈরতান্ত্রিক আইনকে গণতান্ত্রিক আইনে পরিণত করা স্বাভাবিক উপায়ে সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কিন্তু তা সম্ভব, কারণ সমাজের নিহিত শক্তি অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর পারস্পরিক চাপের ফলে প্রকাশ্য শক্তি সংঘাত ভিন্নও সমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আনা যায়।

মার্কস ও এঙ্গেলসও শক্তি প্রয়োগের বিষয়ে পরে তাঁদের মত পরিবর্ত্তন করেছিলেন। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাই তাঁদের মত বদলের কারণ। ১৯ শতকের

শেষভাগে গণতন্ত্রের যে প্রসার, তার প্রভাবে তাঁদের মতও বদলাবে এটা স্বাভাবিক। তাঁরা ক্রমে একথা বুঝলেন যে ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের যে রূপ, তারই ছায়া হিসাবে ১৮৪৮ সালে তারা শ্রমিক বিপ্লবের কল্পনা করেছিলেন। "সংস্কারবাদ" বা রিফর্মিজম আজকাল অপবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু জার্ম্মান সাম্যবাদী দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রানৎস মেহরিং সম্বন্ধে কেউ সংস্কারবাদের অপবাদ দিতে পারে না। মার্কসের বিষয় তিনিও লিখেছেন :

কারখানার আইন ও শ্রমিক সংঘগুলিও যে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনের স্তর বিশেষ, সাম্যবাদী ইস্তাহারে তার কোন স্বীকৃতি নাই। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন বিধির ফলে শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য এবং তার বিরুদ্ধে শ্রমিকের প্রতিক্রিয়াকে ইস্তাহার তাই কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিপ্লবের দৃষ্টিকোণ থেকেই একতরফা ভাবে বিচার করেছে। ব্রিটিশ ও ফরাসী বিপ্লবকে ভিত্তি করেই সাম্যবাদী ইস্তাহারের সমস্ত সিদ্ধান্ত।

সাম্যবাদী ইস্তাহার প্রকাশিত হওয়ার প্রায় ২৫ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৭২ সালে মার্কস কিন্তু অন্যরকম কথা বলেছেন। প্রথম আন্তর্জাতিকের হেগ সম্মিলনের ঠিক আগে তাঁর বিখ্যাত আমষ্টারডাম বক্তৃতায় তিনি বলেন :

শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি যে সর্ব্বত্র একই উপায়ে সাধিত হবে একথা আমরা বলি না। প্রত্যেক দেশের প্রতিষ্ঠান, লোকাচার ও ঐতিহ্য অনুসারে তার উপায় স্থির করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইংলণ্ডের মতন দেশে শ্রমিকের উদ্দেশ্য সাধন যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্ভব সে কথা আমরা অস্বীকার করি না। হল্যাণ্ডের বেলায়ও হয়তো তাই, কিন্তু সকল দেশের পক্ষে একথা খাটে না।

মার্কসের মৃত্যুর পরে এঙ্গেলসও অনেকবার এ ধরণের কথা বলেছেন। ফরাসী দেশের শ্রেণীসংগ্রামের যে ইতিহাস মার্কস লিখেছিলেন, তার ভূমিকায় ১৮৯৫ সালেও এঙ্গেলস একথা বলেন। সে ভূমিকাটী এত পরিচিত যে তার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। সশস্ত্র বিপ্লবের সাফল্য সম্বন্ধে অনেকের যে অহেতুকী আশা, সে সম্বন্ধে এঙ্গেলস বলেছেন, "ধনতন্ত্রবাদ শ্রমিকদের বে-আইনী কার্য্যকলাপের চেয়ে আইনসঙ্গত কার্য্যকলাপকে বেশী ভয় করে। সশস্ত্র বিপ্লবকে যত ভয় করে, তার চেয়ে বেশী ভয় করে নির্ব্বাচনের সাফল্যকে।" সর্ব্বসাধারণের ভোটাধিকার তাঁর মতে প্রয়োজনীয়, এবং অতীতে প্রতারণার যন্ত্রস্বরূপ তার ব্যবহার হয়ে থাকলেও সে ভোটাধিকারকে মুক্তিসাধনের অস্ত্রে পরিণত করা যায়। স্পষ্ট ভাবে তিনি বলেছেন :

মুষ্টিমেয় চক্রান্তকারীর নেতৃত্বে অশিক্ষিত জনসাধারণ যে বিপ্লব আনে, সে রকম সহিংস আন্দোলনের যুগ চলে গিয়েছে। বর্ত্তমানে আমাদের সমস্যা সমস্ত সমাজ-দেহের সম্পূর্ণ রূপান্তর—সে রূপান্তর সাধনের জন্য জনসাধারণের সচেতন প্রচেষ্টার প্রয়োজন। জনসাধারণের জানা দরকার কি উদ্দেশ্যে কি লক্ষ্য সাধনের জন্য তারা লড়ছে। গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস আমাদের একথা শিখিয়েছে। জনসাধারণের কর্ত্তব্য কি তা তাদের বোঝাবার জন্য দীর্ঘ দিনের অবিশ্রান্ত চেষ্টা প্রয়োজন, এবং বর্ত্তমানে সেই কাজে আত্মনিয়োগ করে আমরা যে সাফল্য লাভ করেছি, তাতেই আমাদের বিপক্ষ দল হতাশ হয়ে পড়েছে।

টীকাকারেরা যে বাদবিতণ্ডার অরণ্য সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রকৃত মতবাদ জানতে হলে এঙ্গেলসের এ ভূমিকাটী বর্ত্তমানের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে সমস্ত উদ্ধৃতি এ পর্য্যন্ত করেছি তাতেই কয়েকটি কথা পরিষ্কার বোঝা যায়। মার্কস ও এঙ্গেলসের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে মতও বদলিয়েছিল। তাঁরা সহিংস বিপ্লবের অনিবার্যতায় বিশ্বাসী একথা মনে করা অযৌক্তিক। তাই বলে গান্ধীজীর মতন অহিংসায় বিশ্বাসীও তাদের বলা চলে না। সংগ্রামশীল সমাজতন্ত্রী হিসাবে তাঁরা জীবনের যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছিলেন, তাতে তাঁরা এই সিদ্ধান্তেই আসেন যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অহিংস উপায়ে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিসাধন সম্ভব। ধনতন্ত্র যদি গণতান্ত্রিক আইন ধ্বংস করে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নষ্ট করে, তাহলে অবশ্য একথা খাটেনা।

মঁসিয় বেরাচা এ বিষয়ে যে ভাবে ফতোয়া দিয়েছেন, তাতে বিস্মিত হতে হয়। সাম্যবাদী ইস্তাহারে যে কথাগুলি সহিংস বিপ্লবের সহায়ক, সেই-গুলি উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন :

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাতার সমস্ত মতবাদের ভিত্তি এইখানে। তাঁর বহুল রচনার মধ্যে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের কথাও খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু সে কথার উপরে ঝোঁক দিতে গেলে তাঁর আসল চিন্তাধারা ও মতবাদ কেবল মাত্র কথার বাগাড়ম্বরে চাপা পড়ে যাবে।

মঁসিয় বেরাচার বিশ্লেষণ পদ্ধতি যদি ঠিক হয়, তবে কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের কথাগুলি দিয়ে মার্কসের মতবাদের বিচার করলে অন্যায় হবে কেন? মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনার অংশবিশেষ বাদ দিয়ে মঁসিয় বেরাচা যে অর্থ করেছেন, তাকে ধ্রুবসত্য মনে করবার কি কারণ আছে? হিংসা ও অহিংসার প্রশ্নে মার্কস ও

এঙ্গেলসের আসল মতবাদে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবার অবকাশ রয়েছে তা অস্বীকার করবার উপায় কই ?

ধরা যাক মার্কস যে দুটী পথ নির্দ্দেশ করেছেন, তার একটী অবলম্বন করে শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করল। তখন কি হবে ? সাধারণতঃ যাঁরা মার্কসবাদী বলে পরিচিত, তাঁরা বলবেন যে তখন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে একনায়কত্বের এ ফরমূলার উপর মার্কসবাদীরা বিশেষ কোন জোর দেননি কিন্তু যুদ্ধের পরে তাই হয়ে দাঁড়ালো মার্কসবাদের অন্যতম মূলসূত্র। এবিষয়ে মার্কসপন্থী ও মার্কসবিরোধীদের অদ্ভুত মতৈক্য। একদিকে মঁসিয় বেরাচার মত মার্কসবিরোধী, অন্যদিকে ট্রটস্কিপন্থী বা ষ্টালিনপন্থী মার্কসবাদী—সকলেই একমত যে সহিংস শ্রেণীসংগ্রামে বিন্দুমাত্র শিথিল-বিশ্বাস হলে তার আর মার্কসীয় ফেরদৌসে স্থান মিলবেনা। এ নিয়ে ১৯১৭ সালের পরে যে বিভ্রমের সৃষ্টি হয়েছে তার একটা নমুনা দিলেই চলবে। ১৯৩১ এবং ১৯৩২ সালে পল লুইয়ের দুখানি বই বেরোয়। ১৯৩১ সালের গোড়ায় তিনি লিখেন :

মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত মার্কসের বিভিন্ন ধারণার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব নিয়ে বাদবিতণ্ডা হয়েছে সব চেয়ে কম। তাকে স্বতোসিদ্ধ বলেই ধরা হয়েছে। কিন্তু ১৯৩২ সালের গোড়ায় তিনিই লিখলেন :

১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের কথা কম লোকেই জানত—তা নিয়ে আলোচনাও হয়নি। যেটুকু আলোচনা হয়েছে তাও ভাসাভাসা এবং সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য নয় বল্লেই চলে।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব যে স্বতোসিদ্ধ বলে গৃহীত, পূর্ব্বের এ মন্তব্য পরের মন্তব্যের একেবারে বিরোধী। "মার্কসের আসল উদ্দেশ্য কি" বলে কোল ১৯৩৪ সালে যে বইখানি প্রকাশ করেন, তাতেও বলা হয়েছে যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব মার্কসবাদের ভিত্তি, কিন্তু তাঁর এ বক্তব্যের স্বপক্ষে মার্কসের ১৮৭৫ সালের বিখ্যাত মন্তব্য ভিন্ন আর কোন উদ্ধৃতি কোল দেন নাই।

দেখা যাক যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব কথাটীর আসল তাৎপর্য্য কি। মার্কসের রচনায় কথাটী তিনবার মেলে—এঙ্গেলসের রচনায় দুইবার। কিন্তু মাত্র এই পাঁচবার না হয়ে যদি দশ বা আরো বেশী বারও সূত্রটী তাঁদের রচনায় মিলত, তাহলেও একটী কথা জোর করে বলা চলে। মার্কস বা এঙ্গেলস কেউই কোনদিন কথাটীর অর্থ পরিষ্কার করে বলেননি বটে কিন্তু যেখানেই অনুসঙ্গ থেকে সূত্রটীর তাৎপর্য্য খানিকটা স্পষ্ট, সেখানেই যে তাঁরা গণতন্ত্রের অর্থে সূত্রটীর ব্যবহার

করেছেন একথা নিঃসন্দেহ। এক কথায় মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ও গণতন্ত্র সমার্থ।

মার্কসে প্রথম বার সূত্রটী মেলে ১৮৫০ সালে :

সাম্যবাদ বা বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের দিকেই শ্রমিকশ্রেণী ক্রমে ঝুঁকে পড়ে—মধ্যবিত্ত শ্রেণী তার নাম দিয়েছে ব্লাঁকি। যে সমাজতন্ত্র চিরন্তন বিপ্লবের ও যে বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ঘোষণা—শ্রমিকশ্রেণীর সে একনায়কত্ব সমস্ত শ্রেণীবিভাগের অবসানের সূচনা।

১৮৫২ সালে ৫ই মার্চ তারিখে তাঁর বন্ধু ভেদেমেয়ারকে মার্কস লেখেন :

মতবাদের দিক থেকে নতুন আমি যা করেছি তা হল এই। (১) উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্ত্তনের ইতিহাসের স্তর বিশেষের সঙ্গে যে শ্রেণীবিভাগ জড়িত, আমি তা প্রমাণ করেছি। (২) শ্রেণী সংঘর্ষের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য। (৩) সে একনায়কত্ব সমস্ত শ্রেণীর বিলোপ ও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সূচনা মাত্র।

১৮৭৫ সালের ঘোষণা সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত :

ধনতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজকে বিভক্ত করে রয়েছে বিপ্লবী রূপান্তরের যুগ। তখনই ধনতন্ত্র সাম্যবাদে রূপান্তরিত হয়। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই রকম রূপান্তরের যুগ রয়েছে—তখন শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী একনায়কত্বে রাষ্ট্র চালিত।

এঙ্গেলস সূত্রটীর ব্যবহার করেছেন মাত্র দুইবার—১৮৯১ সালে। প্রথমবার মার্কসের "ফরাসী দেশে অন্তর্যুদ্ধের" ভূমিকায় ১৮ই মার্চ্চে তিনি লিখেছেন :

জার্ম্মান বুজরুকের দল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের কথা শুনেই মূর্চ্ছা যায়। সূত্রটীর অর্থ কি তা জানবার কি তোমাদের ইচ্ছা আছে? প্যারিসের কম্যুনের কথা স্মরণ করলেই তোমরা সূত্রটীর মানে বুঝবে—তাকেই বলে শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব।

জার্ম্মান সোস্যাল ডেমক্রেসীর কার্য্যসূচীর খসড়ার সমালোচনা করতে গিয়ে ১৮৯১ সালের ২৯ মে এঙ্গেলস লেখেন :

এ কথা নিঃসন্দেহ যে একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমাদের দল এবং শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা অধিকার করতে পারে। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে প্রমাণ হয়েছে যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রকৃত রূপও এই।

মার্কস ও এঙ্গেলসের এসব কথা থেকে এই সিদ্ধান্তই হয় যে ১৮৫০ সালে "শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের" সূত্র যখন প্রথম ব্যবহার হয়, তখন ব্লাঁকির নামেই

তা চলেছে। এ সময়ে মার্কস ব্লাঁকি ও জেকবিনদের চিন্তাধারায় অনেকখানি প্রভাবান্বিত ছিলেন। সে সময়েও মার্কস যে একনায়কত্বের কথা ভেবেছেন, তার সঙ্গে কিন্তু গণতন্ত্রের কোন বিরোধ ছিল না। সাম্যবাদী ইস্তাহারে ঘোষিত হয়েছিল :

শ্রমিকশ্রেণীর শাসকশ্রেণীতে রূপান্তর, অর্থাৎ গণতন্ত্রের জয়ই শ্রমিক বিপ্লবের প্রথম স্তর।

গণতন্ত্রের প্রতি এ অনুরাগের প্রমাণ বার বার মেলে। ১৮৯১ সালে এঙ্গেলস যখন বলেন যে প্যারিস কম্যুনই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের আদর্শ, তখন তিনি এ কথাই বলেন যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্য নাম শ্রমিক প্রভুত্ব। কাজেই মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি অধিকার ও চালনার কথাই এ সূত্রে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু একমাত্র গণতন্ত্র ভিন্ন অন্য কি উপায়ে শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করতে পারে? শ্রমিকশ্রেণী ব্যক্তিবিশেষ নয়—বহু ব্যক্তির সমষ্টি। সে সমষ্টির উদ্দেশ্য সফল করতে হলে প্রথম সে উদ্দেশ্যকে রূপ দিতে ও জানতে হবে, এবং সমষ্টির ইচ্ছা ব্যক্তি গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ভিন্ন কি করে জানা যাবে? সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ব্যক্তিসম্পত্তির বদলে সামাজিক সম্পদসৃষ্টি, কিন্তু গণতন্ত্র ভিন্ন তাও হতে পারে না, কারণ সমষ্টি যদি স্বাধীনভাবে সে সম্পদের ব্যবহার করতে না পারে, তবে তা সামাজিক সম্পদ হবে কি করে?

পূর্ব্বের উদ্ধৃতিগুলি এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখেনি। যারা মনে করেন যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব গণতন্ত্রবিরোধী, তাঁদের মার্কসপন্থী বলা চলে না। গণতন্ত্র বাতিল করে একনায়কত্বে বিশ্বাস করতে অবশ্য তাঁরা পারেন, এবং তাতে কেউ কিছু বলতে পারেনা। তাঁদের মত ঠিক না ভুল, সে প্রশ্ন তোলারও প্রয়োজন নাই, কেবল এইটুকু পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন যে মার্কস ও এঙ্গেলসের দোহাই দেবার তাঁদের অধিকার নাই। মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে শ্রমিকশ্রেণীর প্রভুত্ব ও গণতন্ত্র সমার্থ। বরং ভাবতে হবে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বোঝাতে যে দ্ব্যর্থব্যঞ্জক সূত্রটী এককালে ব্যবহার হয়েছিল, বর্ত্তমানে তার কোন সার্থকতা আছে কিনা। মার্কস ও এঙ্গেলসের নিজেদের সঠিক মতবাদ জানা প্রয়োজন। তাহলে তাঁদের ভাষ্যকারদের এবং বিরুদ্ধবাদীদের বিকৃতিগুলি সহজে ধরা পড়ে।

মার্কসপন্থীর মতে রাষ্ট্রের যে রূপ, তার সঙ্গে গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মার্কসীয় রাষ্ট্ররূপ যাকে বলা হয়, বস্তুতপক্ষে

এঙ্গেলস তাকে রূপ দিয়েছিলেন, তবে মার্কস নিজেও তা মেনে নেন। এঙ্গেলস বলেন :

রাষ্ট্র সাধারণত সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অর্থনৈতিক শ্রেণীর করায়ত্ত। অর্থনৈতিক ক্ষমতার বলে সেই শ্রেণী রাজনীতির ক্ষেত্রেও শাসন ক্ষমতা হস্তগত করে। রাষ্ট্রশক্তি হাতে পেয়ে শাসকশ্রেণী শোষিত জনসাধারণকে আরো বেশী দমন ও শোষণ করবার শক্তি অর্জ্জন করে।

এঙ্গেলসের এ বিবরণে 'সাধারণত' কথাটী লক্ষ্যণীয়। তিনি দেখেছিলেন যে "কোন কোন ক্ষেত্রে বিবদমান শ্রেণীগুলি প্রায় সমশক্তি বলে রাষ্ট্রশক্তি তাদের মধ্যে মধ্যস্থ হিসাবে খানিকটা স্বাধীন বা নিরপেক্ষ থাকতে পারে।" এ অবস্থা কিন্তু সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। অন্য ধরণের রাষ্ট্রের তো কথাই নাই, মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও রাষ্ট্রশক্তি ধনতান্ত্রিক শ্রেণী-শোষণের যন্ত্রমাত্র। ঐতিহাসিক বস্তুবাদও আমাদের এই কথাই শেখায়। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর যে রাষ্ট্রিক সংগঠন গড়ে উঠে, ভিত্তির দোষগুণ তার মধ্যে সঞ্চারিত হতে বাধ্য। লেনিন কিন্তু কেবল তা বলে ক্ষান্ত হননি। মার্কস কুগেলমানকে ১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রিল যে চিঠি লিখেছিলেন, তার একটীমাত্র কথার উপর নির্ভর করে লেনিন "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" গ্রন্থখানিতে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র আমূল ধ্বংস করে তবেই শ্রমিক বিপ্লব শ্রমিকরাষ্ট্র স্থাপন করতে পারে। এ মতকে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতের বিকৃতি না বলে উপায় নেই। মার্কস রাষ্ট্রযন্ত্র সমূলে ভাঙতে চাননি—সাম্রাজ্যবাদের আওতায় রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক যে সব বাহ্যাড়ম্বর গড়ে ওঠে, তিনি তাকেই ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন।

লেনিন অনেকক্ষেত্রেই মার্কসীয় ধারণার রূপ ও বিষয়ের মধ্যে তফাৎ করেন নাই, ভেবেছেন যে পুরোনো রূপ বা সংগঠন বদলালে বিষয় বদলাবেই। বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি যতদিন পর্য্যন্ত ধনতান্ত্রিকের বদলে সমাজ-তান্ত্রিক না হবে, ততদিন রাষ্ট্র শ্রমিকশ্রেণীর কল্যাণ সাধনের উপায় হতে পারে না। সাম্যবাদী ইস্তাহারের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। লেনিন অনেক স্থলে মার্কসের মতবাদ গ্রহণ করতে পারেন নি। সেক্ষেত্রে খোলাখুলিভাবে মার্কসের সঙ্গে তাঁর নিজের মতানৈক্য প্রকাশ করলেই ভাল ছিল—তা না করে তিনি মার্কসের মুখে নিজের মতামত বসিয়ে দিয়েছেন।

ব্যক্তিসম্পত্তিকে সামাজিক সম্পদে রূপান্তরের সমস্যা কঠিন। শ্রমিক-শ্রেণীর দ্বারা রাষ্ট্রশক্তির অধিকার কারু লক্ষ্য হতে পারে না—সামাজিক সম্পদের প্রতিষ্ঠার দ্বারা শ্রমিকের মুক্তিসাধনের উপায় হিসাবেই তার প্রয়োজন। সে লক্ষ্য যে কি ভাবে সিদ্ধ হবে সে বিষয়ে মার্কস ও এঙ্গেলসের বক্তব্য অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত আমরা তা দেখেছি। তারও কারণ আছে। কাল্পনিক সমস্যা ও সমাধানে তাঁরা বিশ্বাস করতেন না বলেই এ বিষয়ে কোন ধরাবাঁধা সূত্র দিয়ে যাননি। তা না দিয়ে থাকলেও তাঁদের সাধারণ নির্দ্দেশ থেকে এ কথা পরিষ্কার যে বর্ত্তমানে মার্কসবাদ বলে যা চলে, তার সঙ্গে মার্কস বা এঙ্গেলসের মতামতের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই।

মার্কসপন্থীদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাতাদ্বয়ের মতে সমস্ত সম্পত্তিকেই রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিণত করতে হবে। রাষ্ট্রীকরণের স্বপক্ষে তাঁরা ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত সাম্যবাদী ইস্তাহারের কথা আনেন। ইস্তাহারে বলা হয়েছিল যে উৎপাদনের সমস্ত যন্ত্রপাতি রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। ইস্তাহারের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে "কাপিটাল" বা "মূলধনের" প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। পরেও মার্কস ও এঙ্গেলস এ সম্বন্ধে তাঁদের মত পরিষ্কার করে বলেছেন। সাম্যবাদী ইস্তাহারের সঙ্গে কাপিটাল গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের সপ্তদশ অধ্যায়ের তুলনা করলে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায়। ১৮৭২ সালের ২৪ জুন তারিখে মার্কস ও এঙ্গেলস সাম্যবাদী ইস্তাহারের নতুন এক সংস্করণের জন্য যে ভূমিকা লেখেন, তাতে তাঁরা স্পষ্টই বলেছেন যে ইস্তাহারের বিপ্লবী কার্য্যসূচীকে অভ্রান্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় মনে করবার কারণ নেই।

মার্কসের নাম করে একথাও বলা হয় যে সামাজিক সম্পদের প্রতিষ্ঠা এককালে এবং এখনই অর্থনীতি ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র করতে হবে। এ সমস্ত হবু-মার্কসিষ্ট ভুলে যান যে কেবলমাত্র ধনতান্ত্রিক সম্পত্তির রাষ্ট্রিকরণের কথাই মার্কস্ বলেছেন। যারা নিজেদের হাতিয়ার নিজেরাই ব্যবহার করে, সে সমস্ত শ্রমজীবীদের সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই। এ সমস্ত নীতিবাগীশেরা ভুলে যান যে যৌবনের উদ্দীপনার দিনে ১৮৪৮ সালের প্রাক্কালেও মার্কস্ ও এঙ্গেলস এরকম অসম্ভব ধারণা করেন নাই। এঙ্গেলস ইস্তাহারের যে খসড়া করেছিলেন তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে "এক মুহূর্ত্তে ব্যক্তিসম্পত্তির বিলোপ সম্ভব নয়", "শ্রমিক বিপ্লবে সমসাময়িক সমাজের রূপান্তর ক্রমিক হতে বাধ্য।" সেই খসড়াতেই রয়েছে যে "যে সমস্ত মনিব তখনও থাকবে, রাষ্ট্রের মতন উঁচু হারে

শ্রমমূল্য বা মজুরী দিতে" তাদের বাধ্য করতে হবে। এসব কথা বারবার বোঝাতেই বা হবে কেন? আধুনিক কালের অর্থনৈতিক জীবনের জটিল ব্যবস্থা ও সংগঠন সম্বন্ধে যাঁর বিন্দুমাত্র সাধারণ জ্ঞান আছে, তিনিই জানেন যে ব্যক্তিসম্পত্তিকে রাষ্ট্র-সম্পদে রাতারাতি রূপান্তরের কল্পনা একমাত্র উন্মাদের পক্ষেই সম্ভব। মার্কস ও এঙ্গেলসের বিরুদ্ধে আর যাই বলা যাক না কেন, তাঁদের পরম শত্রুও তাঁদের সেকথা বলতে পারে না।

যাঁরা বলেন যে মার্কসবাদের মতে সম্পত্তির পূর্ব্ব-মালিকদের বিন্দুমাত্র ক্ষতিপূরণ না দিয়ে সম্পত্তি রাষ্ট্র নিয়ে নেবে, তাঁরা মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিধি উভয়কেই লঙ্ঘন করেন। মার্কস ও এঙ্গেলস এ সম্বন্ধে নীরব বল্লেও ভুল করা হয়। তাঁদের মনে যাই থাক না কেন, তাঁদের লেখায় ক্ষতিপূরণের স্বপক্ষে কথা কোথাও কোথাও রয়েছে, কিন্তু ক্ষতিপূরণের বিরুদ্ধে মন্তব্য তাঁদের সমগ্র রচনায় একটীও মেলে না। ইস্তাহারের খসড়ায় ১৮৪৭ সালে এঙ্গেলস ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা বিচার করেছেন এবং পরে ইংরেজ ভূম্যধিকারীদের বিষয় বলতে গিয়ে মার্কস বলেছেন যে অন্তর্যুদ্ধের চেয়ে বরং ক্ষতিপূরণ দেওয়া ভাল—তাতে সামাজিক অপব্যয়ও কম।

এসব বিষয়ে এতখানি আলোচনা নিরর্থক। তবু বাধ্য হয়ে আমাদের তা করতে হয়েছে, কারণ সব জিনিষেরই সহ্যের একটী সীমানা আছে। মার্কসের নামে বর্ত্তমানে এত মিথ্যার বেসাতি হয় যে তার প্রতিবাদ প্রয়োজন। বহু ক্ষেত্রেই মার্কসের রচনার একটী কথাও না পড়ে কেবলমাত্র লোকমুখে বর্ণনা শুনে অথবা স্বপক্ষে বিপক্ষে সমালোচনা পড়ে লোক মার্কসবাদী বা মার্কসবিরোধী। ডারউইনের শিক্ষার যেরকম বিকৃতি ঘটেছে, মার্কসের বেলায়ও হয়েছে তাই। জনসাধারণ ডারউইনের বিষয় জানে যে তাঁর মতে মানুষ বানরের বংশধর। ডারউইনকে ভুল বুঝলে কারু বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু মার্কসকে ভুল বোঝার বিপদ বহু। মার্কসের প্রকৃত মতামত না জেনে তবু লক্ষ লক্ষ লোক যদি তাঁর অন্ধ অনুচর হয়, তবে মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার পক্ষে আশঙ্কার কথা। সেজন্য বর্ত্তমানে মার্কসের মতামতের সত্যাসত্য নির্ণয় প্রত্যেক সামাজিক মানুষের কর্ত্তব্য।

সিগারেটের টুকরো

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

রাজনৈতিক অপরাধে রণধীরের সাত বছরের জেল হয়েছিল। ছয় বছর পূর্ণ হওয়ার কয়েক মাস পরেই সে আন্দামান থেকে ছাড়া পেলে।

সন্ধ্যার মুখে জাহাজ এসে লাগলো জেটিতে।

জাহাজ থেকে নামবার আগে রণধীর একবার চেয়ে দেখলো পশ্চিমের সূর্যাস্ত শোভার দিকে, একবার চেয়ে দেখলো শেষ অপরাহ্ণের আলোঝলমল ক'লকাতা শহরের দিকে। তার বুকের রক্ত দ্রুততালে নেচে উঠলো। সামনের পথ দিয়ে চলেছে অগণিত মোটর-রিক্সা-ঘোড়াগাড়ী, কত কলহাস্যপরায়ণ নর-নারী। এক বিন্দু বৃষ্টির মতো যদি সে ওই জনস্রোতে মিশে যেতে পারতো!

কিন্তু তার উপায় নেই।

দিনের আলো দ্রুত নিবে আসছে। এর পরে আসবে রাত্রি, তার নৈষ্কর্মের ক্লান্তি নিয়ে। সেই দীর্ঘ রাত্রি তাকে কাটাতে হবে ক'লকাতার জেলে। ছাড়া পাবে পরের দিন সকালে।

রণধীরের মনে হচ্ছে, সেই পরের দিনটা আর ইহজীবনে বুঝি আসবে না। এই নিস্তরঙ্গ ক্লান্ত শর্বরী, সমুদ্রের মতো এরও যেন তলও নেই, পারও নেই।

হতাশায় সে চোখ বন্ধ করলে।

কিন্তু পরের দিন সত্যই অবশেষে এল।

দুপুরে দেখা গেল, রণধীর তার সুটকেসটি নিয়ে নিঃশব্দে হাওড়া ষ্টেশনে একটি ট্রেনের কামরায় বসে। দুচোখে তার বিস্ময় আর ব্যস্ততা। তার সদ্যোজাত স্বাধীন সত্তা ছোট শিশুর মতো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যত দেখছে, দেখার তৃষ্ণা যেন আর মিটছে না।

আরও ঘন্টা কয়েক পরে ট্রেনখানি তাদের গ্রামের ষ্টেশনে এসে লাগলো।

প্লাটফর্মে নেমে রণধীর চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো, চেনা লোক কাউকে পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু একটি চেনা মুখও দেখা গেল না। তার আসবার কথা কেউ জানে না! কেউ তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নেই।

রণধীরের মনে পড়লো শর্বরীকে। কে জানে এখন কি করছে সে। কোথায় আছে তাই বা কে জানে? জেলে যাওয়ার বছর তিনেকের মধ্যেই তার মা বাবা দুইই মারা যান। তারপরেও শর্বরী এইখানেই ছিল। মাস চারেক আগে আন্দামানে থাকতে তার থেকে সর্বশেষ চিঠি যা সে পেয়েছে তাতেও এই-খানকারই ঠিকানা ছিল।

শর্বরীর কথা মনে হতেই রণধীর ব্যস্ত হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চললো।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কে জানে গ্রামের লোকেরা তাকে চিনবে কিনা। সে কিন্তু আলাপ করবার জন্যে দাঁড়ালো না। হাল্‌কা সুটকেসটি হাতে করে একেবারে নিজের বাড়ীর উঠানে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ালো।

কিন্তু কোথায় শর্বরী?

পলকের মধ্যে রণধীর ঘেমে উঠলো। বাড়ী অন্ধকার, দরজা বন্ধ। সে শর্বরীর নাম ধ'রে ডাকতে যাবে, এমন সময় পিছনে কার পায়ের শব্দে চমকে উঠলো।

—মা গো!

এ কণ্ঠস্বর রণধীরের ভুল হবার নয়। বুঝলে, উঠনের মাঝখানে হঠাৎ অপরিচিত লোক দেখে শর্বরী ভয় পেয়ে গেছে।

—আমি, আমি, শর্বরী, চিনতে পারছ না?

শর্বরী চিনতে পারলে। কিন্তু কথা কইতে পারলে না। শুধু স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

রণধীর বুঝলে, এতখানি আকস্মিকতার জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। সে ভয় পেয়ে গেল। ওর একেবারে কাছে গিয়ে একটা ঝাঁকি দিলে।

বললে, চিনতে পারছ না শর্বরী? আমি যে। ছাড়া পেয়েছি।

ওর স্পর্শে শর্বরী একবার চমকে উঠলো।

তারপর শান্তভাবে বললে, ঘরে চল।

শর্বরী আগে আগে চললো। বারান্দায় উঠেই বললে, একটু দাঁড়াও। আলোটা জ্বালি।

শিকল খুলে অন্ধকার ঘরের মধ্যে শর্বরী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

রণধীর ফিরেছে। তার কারাজীবন শেষ হয়েছে। এইটুকু ভাবতেই তার অনেকক্ষণ লাগলো। এই দুটি কথাই যেন সে কিছুতে ভাবতেই পারছে না।

বাইরে থেকে রণধীর বললে, কি হ'ল? দেশলাই নেই?

শর্বরী সম্বিৎ ফিরে পেলে।

বললে, আছে বই কি। এই যে জ্বালি।

হঠাৎ তার মনে পড়লো, তার পরণের শাড়ীখানি যেমন ছেঁড়া তেমনি মলিন। এতদিন পরে রণধীর ফিরলো, এই বেশে কি ওর সামনে দাঁড়ানো যায়! কাপড়টা আলো জ্বালবার আগেই বদলাতে হয়।

তাড়াতাড়ি বললে, এক মিনিট দাঁড়াও না। আমি হারিকেনটা খুঁজছি।

শর্বরীর কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতায় রণধীর আশ্বস্ত হ'ল।

বললো, খোঁজো। আমি বাইরেই একটু বসি।

শর্বরী সাড়া দিলে না। সে তখন অন্ধকারেই বাক্স খুলে শাড়ী বাচছে।

কিন্তু কত দেরী করে? রণধীর উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো। আলো জ্বালতে এতক্ষণ লাগছে কেন?

পকেট থেকে দেশলাই বের ক'রে ও ঘরের ভিতর ঢুকেই দেশলাই জ্বাললো, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট শব্দ শুনলে: ও কি! বাইরে যাও, বাইরে যাও!

শর্বরী কাপড় বদলাচ্ছে।

অপ্রস্তুত হয়ে রণধীর বেরিয়ে এল। তার একটু পরেই শর্বরীও আলো জ্বেলে বাইরে এল। তার মুখে তখনও তৃতীয়ার বাঁকা চাঁদের মতো সলজ্জ এক ফালি হাসি লেগে রয়েছে।

ছ'বছর সময় বড় কম নয়।

রণধীর এই দীর্ঘ কালকে ক্ষয় ও ক্ষতির মধ্যে শর্বরীর দেহে যেন প্রত্যক্ষ করলে: সতেরো আঠারো বছরের মেয়ে আজ চব্বিশে পা দিয়েছে। দেহ শীর্ণ, কিন্তু সে হয়তো অন্য কারণে; চোখের কোলে ক্লান্তির কালি, সেও হয় তো অন্য কারণে। কিন্তু প্রথম যৌবনের সে চঞ্চলতা কোথায় গেল? শর্বরী কেমন যেন ভারিক্কি হয়েছে। কথায় কথায় হাসির সে উচ্ছলতা নেই। বাঁকা ভ্রূতে ক্ষণে ক্ষণে কৃত্রিম কলহের মেঘ আর ঘনিয়ে আসে না, বাকা হাসি নোঙর-বাঁধা পান্‌সির

মতো একটু দুলেই থমকে থাকে। সংকীর্ণ ললাট অজ্ঞাতপূর্ব স্নেহ ও প্রসন্নতায় মসৃণ।

শর্বরী হাত মুখ ধোবার জল এনে দিয়ে উনান ধরাতে গেল। রণধীর হাতমুখ ধুয়ে রান্না ঘরের দরজায় উঁকি দিলে।

শর্বরী বললে, এই ধোঁয়ার গরমে বসতে এলে ?

—তা হোক।

শর্বরী একটা পিড়ি পেতে শাড়ীর আঁচলে ঝেড়ে দিলে।

জিজ্ঞাসা করলে, চা খাবে তো ?

—আছে ?

—একটুখানি চা আছে বোধ হয়। সেজদা'র জন্যে আনিয়েছিলাম সেদিন।

—সেজদার জন্যে ? তুমি নিজে খাও না ?

—ছেড়ে দিয়েছি।

রণধীর আর প্রশ্ন করতে সাহস করলে না। শুধু নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। সে জানে, ছ'বছর আগেও চা ছিল শর্বরীর প্রাণ। সেই চা যদি সে ছেড়ে থাকে, অনেক দুঃখেই নিশ্চয় ছেড়েছে। হয় তো অর্থের অভাবেই। সেই অপ্রিয় উত্তরটা শোনবার ভয়ে ও নিয়ে আর সে প্রশ্ন করতে সাহস করলে না।

জিজ্ঞাসা করলে, সুশীল এসেছিল ? কি করছে সে ?

—কি আর করবে ? মাষ্টারী করে বেতুড়ে। ছুটি থাকলে আসে মাঝে-মাঝে। কাছেই তো !

তবু ভালো। সুশীল শর্বরীর চেয়ে মোটে দু'বছরের বড়। দু'জনে পিঠো-পিঠি। তবু ভালো সে সঙ্গীহীনা বোনের মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে যায়। শুনে রণধীর অনেকটা আশ্বস্ত হোল।

বললে, বাড়ী ঢুকে তোমায় না দেখতে পেয়ে, ঘর দোর বন্ধ দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

চা তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

পেয়ালাটা রণধীরের সামনে নামিয়ে দিয়ে শর্বরী বললে, কেন ?

—ভাবলাম, তুমি বুঝি এখানে নেই।

শর্বরী চুপ ক'রে রইল।

পরে বললে, বাবা আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলেন। মধ্যে ক'দিনের জন্যে একবার গিয়েও ছিলাম। কিন্তু,

—কিন্তু ?

শর্বরী জবাব দিলে না। মনে হ'ল, তার ঠোঁটের কোণে একটু যেন হাসি খেলে গেল।

রণধীর চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলে।

বললে, এখানে একা সেই যা ভয়।

—ভয় আর কি ? সবাই আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছেন। ছেলেরা তো সমস্ত দিন এখানেই থাকে। রাত্রে ও বাড়ীর পিসিমা শুতে আসেন। বাইরের ঘরে ছেলেরা কেউ-না-কেউ শোয়।

রণধীর নিঃশব্দে চা খেতে লাগলো।

শর্বরী হঠাৎ বললে, পিসিমা আজও বোধ হয় শুতে আসবেন।

ব'লেই হাসি চাপবার জন্যে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

রণধীরও হাসলো।

হাসি থামলে শর্বরী বললে, সত্যিই যদি আমি না থাকতাম এখানে, কি করতে তুমি ?

—কি জানি।

—কিন্তু তুমি তো চেয়েছিলে আমি বাপের বাড়ীতেই থাকি।

—আমি তোমার একলা যাবার জন্যেই ভয় পেয়েছিলাম। এখন দেখছি,

—কে বৌমা ? কার সঙ্গে কথা কইছ ?

পিসিমার কণ্ঠস্বর !

শর্বরী তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে পিছন ফিরে বসলো।

—আমি পিসিমা। ভালো আছ ?

রণধীর উঠে পিসিমাকে প্রণাম করলে।

—রণু ? ওমা, কি হবে ? তুই কখন এলি ? তোর চেহারা কত বদলে গেছে ! গলার স্বর পর্য্যন্ত ভারি হয়েছে ! আমি ভাবলাম, বৌমার দাদাদের কেউ বুঝি ! বোস, বোস !

বলতে বলতে পিসিমার গলার স্বর ভারি হয়ে উঠলো।

—ভালো আছিস ?

—হাঁ, পিসিমা।

—ক'দিন থেকেই এবাড়ীতে কাক কল্‌কল্ করছিল। বললাম বৌমাকে, দেখো আমার রণু এবার আসবে। দেখলে বৌমা ?

শর্বরী সম্মতি জানাবার জন্যে তার ঘোমটা-ঢাকা মাথাটা নাড়লে।

—লক্ষ্মী জনার্দ্দন ছেলেকে আমার ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে এনেছেন, কাল ভালো ক'রে ঠাকুরের ভোগ দিও বৌমা। বুঝলে?

শর্বরী আমার সম্মতিসূচক মাথা নাড়লে।

পিসিমা একগাল হেসে বললেন, সে আমার মা-লক্ষ্মীকে বলতে হবে না। জানিস রণু, বৌ পেয়েছিলি বটে তপিস্যে কোরে!

—বলো কি পিসিমা!

ঘোমটার আড়ালে শর্বরীর সমস্ত দেহ সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো।

পিসিমা গলা বড় ক'রে বললেন, এক শো বার! তপিস্যে করার মতোই বৌ। তোর বাবা মারা গেলেন। বৌমার দাদা এলো নিতে। বললে, আমার এখন যাওয়া কিছুতেই হ'তে পারে না দাদা। শাশুড়ী শোকে-তাপে শয্যেশায়ী। আমি গেলে তাঁকে দেখবে কে? শেষে তোর মাও গেল। তোর শ্বশুর নিজে নিতে এলেন। বাপের কাছে যাবে না বলতে লজ্জা হ'ল। গেল, কিন্তু মাস শেষ না হ'তেই আবার বাপের সঙ্গে ফিরে এল। বাপের সে কী কান্না! আমাকে ডেকে বললেন, ও তো কিছুতে সেখানে থাকতে চায় না বেয়ান। তাই আপনাদের কাছেই আবার নামিয়ে দিয়ে গেলাম। রণধীর না ফেরা পর্য্যন্ত এ বাড়ী ও কিছুতে ছাড়বে না। আপনারা দেখবেন ওকে।

পিসিমার গলার স্বর আবার ভারি হয়ে উঠলো।

আঁচলে চোখ মুছে বললেন, তা আমাদের কিছুই করতে হয়নি বাবা। ওযে কোথা থেকে কি ক'রেছে, কি ক'রে সংসার চালিয়েছে, কাউকে কোনো দিন বুঝতেই দেয়নি। তাছাড়া বলব বৌমা?

বৌমা সাড়া দিতে পারলে না। কেবল আরও সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

পিসিমা বললেন, তুই বোধ হয় শুনিসনি, এরই মধ্যে ছেলেদের কাছ থেকে পড়া দেখিয়ে নিয়ে ও একটা পাস পর্য্যন্ত দিয়েছে।

বিস্ময়ে রণধীর এক মুহূর্ত্ত কথা কইতে পারলে না।

তারপরে বললে, বলো কি পিসিমা! ম্যাট্রিকুলেশন?

—ওই তো বললাম বাবা। এমন বৌ অনেক তপিস্যেয় মেলে। এই বয়সে অনেক দুঃখ ও পেলে রণু। দেখিস যেন আর দুঃখ না পায়।

পিসিমা চলে গেলেন।

আগের রাত্রে আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে গল্প ক'রে শুতে যেতে রণধীরের অনেক রাত হয়েছিল। সকালে যখন সে উঠলো, তখন বেলা হয়েছে। উঠানে রোদের বান এসেছে।

শর্বরী হেসে জিজ্ঞাসা করলে, ঘুম ভাঙলো ?

রণধীর ঘাড় নেড়ে সাড়া দিলে। কিন্তু চারি দিকে চেয়ে হাসতে পারলে না। বাড়ীর এ কি শ্রী হয়েছে !

রাত্রের অন্ধকারে তার চোখে পড়েনি। এখন দেখলে, ঘরের চাল জরাজীর্ণ। চিররুগ্নের পাঁজরার মতো চালের বাঁকারিগুলো পাৎলা খড়ের উপর দেখা যাচ্ছে।

এখানে-সেখানে পাঁচীলগুলো পড়ে গেছে। বাইরে থেকে বাড়ীর ভিতরটা দেখা যায়। বৃষ্টির ছাটে ঘরের দেওয়ালগুলো ক্ষয়ে গেছে। সম্ভবতঃ অর্থাভাবেই তার সংস্কার হয়নি।

বাড়ী তো নয়, যেন শ্মশান।

শুধু কবে এক দিন রণধীর ফিরবে ব'লে এই শ্মশানে শর্বরী কি ক'রে যে এত দিন একা কাটালে ভাবতে বিস্ময় লাগে।

কিন্তু এইখানেই সমস্যার শেষ নয়। রণধীর ফিরেছে সত্য, তাতে শর্বরীর প্রতীক্ষার শেষ হয়েছে, কিন্তু সমস্যার নয়। এর পরেই বা তাদের দুজনের কি ক'রে চলবে ? সংসার প্রতিপালন তো নিতান্ত সহজ নয়।

পিসিমার একটা কথা রণধীরের মনে দাগ কেটেছে : এই ক'বছরে এই বয়সে অনেক দুঃখ শর্বরী পেয়েছে। আর দুঃখ যেন সে না পায়। পিসিমার আরও একটা কথা তার মনে মাঝে-মাঝে উঁকি দিচ্ছে : শর্বরী ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছে।

শর্বরী আর বোঝা নয়, সে শুধুই তার গৃহের গৃহিণী নয়, শুধুই সহধর্মিণীও নয়,—তার সহকর্মিণীও হতে পারে।

রণধীর শর্বরীর সঙ্গে পরামর্শ করলে। স্থির করলে, তারা দুজনেই ক'লকাতা যাবে, দুজনে মিলে অর্থোপার্জন করবে। তা ছাড়া আর উপায় নেই। এ বাজারে একজনের রোজগারে ভদ্রভাবে সংসার চলা অসম্ভব। শর্বরীর তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগ্রহ অর্থোপার্জনের জন্যে ততটা নয়, যতটা স্বামীর সঙ্গলাভের লোভে। আসল কথা, ছ'বছর তার রণধীরকে ছেড়ে কেটেছে। আর সে ছেড়ে থাকতে রাজি নয়।

স্থির হ'ল, এখানে অনাবশ্যক কালহরণ ক'রে লাভ নেই। যত শীঘ্র সম্ভব ওরা দুজনেই ক'লকাতায় যাবে।

* * * * *

বছর কয়েক পরের কথা।

সন্ধ্যার কিছু পরে রণধীর আফিস থেকে ফিরলো। আপিস নয়, একটা বড় ষ্টেশনারী দোকান। কিন্তু রণধীর এবং শর্বরী তাকে আপিসই বলে। অনেক ঘাটে ঘুরে ঘুরে সে আপাততঃ এইখানে এসে লেগেছে। ঝকমারি কাজ। কিন্তু ঝকমারি আর কোন কাজে নেই?

থাকে তেতলার ছোট একটি ফ্ল্যাটে। দু'খানি মাঝারি ঘর। একখানি শোবার ঘর, একখানি বসবার। এরই ভাড়া লাগে পঁচিশ। এর বেশী তাদের আর দরকারও নেই, সামর্থ্যও নেই।

শর্বরীর রুচি আছে। তাদের অল্প আয়ের মধ্যেই একটু একটু ক'রে ঘর দুখানিকে সাজিয়েছে মন্দ নয়। বাইরে থেকে দেখলে তাদের অবস্থা স্বচ্ছল ব'লেই মনে হয়। হাল ফ্যাশানের খাট, ড্রেসিং টেবল্, সোফা সবই আছে।

রণধীর ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বেলেই চমকে উঠলো।

—কি? শরীরটা ভালো নেই?

শর্বরী তার নার্সের পোষাক পরেই সোফায় শুয়েছিল। অলসভাবে চোখ মেলে একবার চেয়েই আবার চোখ বন্ধ করলে।

রণধীর আবার জিজ্ঞাসা করলে, হাসপাতাল আছে না কি?

হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে শর্বরী বললে, আছে বই কি? সময় হ'ল।

শোনো, আজকে আর রাঁধতে পারলাম না। বাজার থেকে কিছু আনিয়ে-ববং খেয়ে নিও।

বাজারের খাবারের নামে রণধীরের মুখ শুকিয়ে গেল।

বললে, কি দরকার? বরং দুটি ভাতে-ভাত আমিই ফুটিয়ে নোব।

শর্বরী উঠে দাঁড়িয়েছিল। হেসে বসে পড়ল।

বললে, তাহ'লে এ সব ছেড়ে আবার আমাকেই রাঁধতে যেতে হয়। তোমার রান্না একদিন আমি খেয়েছি।

সে কথা রণধীরেরও মনে আছে। রেধেছিল আলু-ভাতেই, কিন্তু না সিদ্ধ হয়েছিল আলু, না ভাত। রণধীরও হাসলে।

শর্বরী বললে, আজকের মতো বাজার থেকে কিছু আনিয়েই খাও। আমি ভাবছি, একটা ঠাকুর, অথবা একটা combined hand না রাখলে চলবে না। শরীর আমার ভালো যাচ্ছে না। ডক্টর বোস উনুনের ধারে যেতে একদম নিষেধ করেছেন।

আঃ! ডাক্তার বোস! এই লোকটিকে রণধীর কিছুতেই পছন্দ করতে পারে না। ভদ্রলোক শর্বরীর সম্বন্ধে বড় বেশী উৎসাহ দেখায়! আজও রণধীর তাকে চোখে দেখেনি। কিন্তু শর্বরীর কাছ থেকে তার নাম এত বেশী শোনে যে, তাকে আর অপরিচিত মনে হয় না।

রণধীর রাগে। কিন্তু পাছে শর্বরী ভাবে 'জেলাসি', সেই ভয়ে মুখে কিছু বলতে পারে না। বলবার মতো কিছু খুঁজেও পায় না। কিন্তু তার কেবলই মনে হয়, এই ডক্টর বোস অনাহুত তার ও শর্বরীর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। কেবলই মনে হয়, যেদিন থেকে সে শর্বরীর মুখে এই লোকটির নাম শুনছে সে দিন থেকেই শর্বরী ক্রমশঃ যেন বদলাচ্ছে। যে-শর্বরীকে সে আন্দামানে যাবার আগে দেখে গেছে, যে-শর্বরীকে সে আন্দামান থেকে ফিরে এসেও দেখেছে, সে-শর্বরীকে এই শর্বরীর মধ্যে সে যেন খুঁজে পাচ্ছে না।

শর্বরী বললে, ডক্টর বোস বলছিলেন,

রণধীর নিজেকে আর সামলাতে পারলে না। বললে, এই ডক্টর বোস কে তুমি আমাকে বলবে?

তার কণ্ঠস্বরের উত্তাপে শর্বরী প্রথমে চমকে উঠলো। শান্ত কণ্ঠে বল্‌লে—ডক্টর বোসকে তুমি চেনো না?

—না। শুধু দিনের পর দিন তাঁর নাম শুনে আসছি। তাতে এই মনে হয়েছে যে, তোমার সম্বন্ধে তিনি বড় বেশী উৎসাহ নেন,—প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত।

শর্বরী এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে রইল। তারপর বললে, তুমি কী বলছ?

রণধীর তেমনি কণ্ঠে বললে, ঠিকই বলছি শর্বরী, তুমি জানো আমি ঠিকই বলছি। তাঁর উৎসাহ কিছু কম হওয়া উচিত। আমি লক্ষ্য করছি, তিনি এবাড়ীতে পর্যন্ত পায়ের ধূলো দিতে আরম্ভ করেছেন।

—তার মানে? এই বাড়ী তিনি পায়ের ধূলো দেবেন? তাঁর সম্বন্ধে তুমি কি ভাবো? এমন কথা তুমি কেমন ক'রে বল?

—বলি ওই আধ-পোড়া সিগারেটের টুকরোটার দিকে চেয়ে। আমি সিগারেট খাই না। ও-টুকরো কি ক'রে এল বলতে পার?

সেদিকে চেয়ে শর্বরীর মুখ কাগজের মতো ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। কিন্তু তখনই নিজেকে সে সামলে নিলে।

ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, এ বাড়ীতে যেখানে যত টুকরো জমবে তার কৈফিয়ৎ আমাকে দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু যদি তিনি এসেই থাকেন, তাতে তোমার বলবার কি আছে?

—কিছুই নেই, এই কি তোমার বিশ্বাস?

হাঁ। তাই আমার বিশ্বাস। এখানে আমাকে আনলে কে? আমি তো আসতে চাই নি। কে আমাকে নার্সগিরি শেখালে? আজ নার্সের বাড়ীতে যদি একজন ডাক্তার আসেই তাতে তোমার কি বলবার থাকতে পারে? তুমি আমাকে সন্দেহ কর?

—করি। আগে করতাম না, এই মুহূর্ত্ত থেকে করি।

—এ তোমার অন্যায় 'জেলাসি'।

শর্বরীর এই স্পর্দ্ধায় রণধীর প্রথমটা হতচকিত হইয়া গেল। তারপর শান্তকণ্ঠে বললে, তুমি বসো, আমি বলছি। তোমাকে এখানে এনেছি আমি। তোমার নার্সগিরি শেখার মূলেও আমি। তোমাকে আমি পল্লীর পুরোনো সমাজ থেকে এনে অবাধ স্বাধীনতার একেবারে মাঝখানে দাঁড় করিয়েছি। ভেবো না, এর মূল্য দিতে আমি প্রস্তুত নই। কিন্তু পিসিমার সেই কথা মনে পড়ে: এই বয়সে অনেক দুঃখ তুমি পেয়েছ, আর যেন দুঃখ না পাও। আমি তোমাকে সেই দুঃখের হাত থেকে বাঁচাতে চাই।

পিসিমার কথায়? শর্বরী অকস্মাৎ হা হা ক'রে হেসে উঠলো,—চল ফিরে যাই পিসিমার কাছে। তুমি সেখানে স্কুলে একটা পণ্ডিতি নেবে, আর আমি রাঁধব বাড়ব, তোমার সেবা করব। যাবে ফিরে?

শর্বরী হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালো। রিষ্টওয়াচের দিকে চেয়ে বললে, তোমার সঙ্গে বসে বসে তর্ক করার সময় আমার নেই। তুমি ধীরভাবে ভেবে দেখো।

তারপরে আঁচল উড়িয়ে বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রণধীর নিঃশব্দে বসে রইল।

এতখানি সে শর্বরীর কাছে প্রত্যাশা করেনি। তার মাথা ঝিম ঝিম করছিল। দেহ যেন ভারি হয়ে গেছে। এমনি ক'রে অনেকক্ষণ ব'সে থেকে ধীরে ধীরে সে উঠলো। কুঁজো থেকে জল ঢেলে ঢক ঢক ক'রে আকণ্ঠ জল খেলো। আঃ! তৃষ্ণায় যেন ছাতি ফেটে যাচ্ছিল।

আলো নিবিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে সে শুয়ে পড়ল।

নাঃ! গ্রামে আর ফিরে যাওয়া যায় না। কিন্তু এই ডাক্তার! এও অসহ্য!

সকালে ঘুম থেকে উঠে সে শর্বরীর প্রতীক্ষায় বসে রইল। যেদিন শর্বরীর রাত্রে ডিউটি থাকে, সেদিন সে ফিরে এলে দুজনে একসঙ্গেই চা খায়। শর্বরী নিজের হাতে চা করে।

একটু পরেই দরজার কে যেন কড়া নাড়লে।

রণধীর উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলে।

শর্বরী নয়, দারোয়ান। তার হাতে একখানা চিঠি।

শর্বরী লিখেছে: এখন থেকে কড়া নিয়ম হয়েছে, নার্সদের হাসপাতালেই দিনরাত্রি থাকতে হবে। খালি ছুটির দিন বাসায় যেতে পাবে। রণধীর যেন শর্বরীর বিছানা ও বাক্স এই দারোয়ানের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেয়।

রণধীর কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চিঠিখানা বার বার পড়লে, যেন তার মানে ঠিক বুঝতে পারছে না। তারপরে শর্বরীর বিছানা আর বাক্স বার ক'রে দিলে।

নিঃশব্দে সে বাইরের ঘরে এসে বসল।

হঠাৎ তার চোখ পড়ল, আধ-পোড়া সিগারেটের টুকরোটার দিকে। মনে হ'ল, সেটা যেন মুখ কালো ক'রে হাসছে।

অজ্ঞাতসারে রণধীরও হাসলে। তারপরে উঠে চা তৈরী করতে গেল।

আধুনিক সাহিত্য

ভারতবর্ষ যে কৃষিজীবী দেশ এ জ্ঞানটা আমাদের মানসিক সম্পদ ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যবহারিক জীবনে মধ্যবিত্তরা নাগরিক সভ্যতারই জীব। যেহেতু বাংলা সাহিত্য মধ্যবিত্ত-শাসিত, তাই সাহিত্যের মারফৎ বহুদিন যাবৎ আমরা দেশের যে ছবি পেয়ে এসেছি তাতে দেশজ মানুষের রং ছিলনা। ছিল পরের সংস্কৃতি অনুকরণ করে যে মন তৈরী হয় তারই ইতিহাস, নয়ত জীবনের প্রতি দায়িত্বহীন আচারব্যবহারের কাহিনী। পদার্থহীন মধ্যবিত্ত জীবনের ছবিকে অপদার্থতর করে তুলেছে বহু সাহিত্যিকেরই পাণ্ডিত্যের বাচালতায়। কেউবা জীবনকে যৌনতার রং-এ রঙীন করতে গিয়ে জীবন আর সাহিত্যকে অসুস্থই করে দিয়েছে—বাস্তবতারও ইজ্জৎ রক্ষা করতে পারেনি। মোটের উপর লরেন্স-হাক্সলি এণ্ড কোং ইংরিজি সাহিত্যে সমাজের অসার ফেনাকে যতটা ফেনায়িত করে তুলেছিল, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আধুনিক যুগের অনেক উপন্যাসকারই বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে ততটাই অনাবশ্যক জঞ্জাল জড় করেছেন। সত্যিকারের দেশ বা সমাজ যে সাহিত্যে একটুও স্থান করে নিতে পারেনি তার জন্য পাঠকদের মনে দুঃখ থাকলেও লেখকরা মনে মনে একটুও লজ্জিত হননি। অথচ আমরা সবাই জানি, আমাদের নাগরিক মধ্যবিত্ততা কারু বা একপুরুষের, বড় জোর কারু দু'তিন পুরুষের। এই নাতিদীর্ঘ সময়ের ব্যবধান উত্তীর্ণ হয়ে জীবনের মূলকে অনুসন্ধান করবার সামান্য পরিশ্রমও কোনো লেখক স্বীকার করতে রাজী হননি, এই ভেবেই তাঁরা সুখী আছেন যে সহর-বাসের সঙ্গে তাঁদের নাড়ীর যোগাযোগ চিরকালের। অবিশ্যি সহর-বাস সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতনতা নিয়েও যদি তাঁরা উপন্যাস রচনা করতেন তবু তার সার্থকতাকে প্রশ্ন করবার অবসর থাকৃতনা। তাঁদের কাছে সহর-বাসের মানে—ড্রয়িং-রুম, সাজানোগুছানো পাঁচ দশটা বুলি, মোটর, লেক আর অবাধ যৌন-মিলন।

বাংলা সাহিত্যের এই শোচনীয় অবস্থায় আশঙ্কার কারণ যথেষ্টই ছিল। কিন্তু সমাজ যখন দুর্বুদ্ধির চাপে হাঁসফাঁস করতে থাকে, তখনই তার গর্ভে সুবুদ্ধির জন্ম হয়। সতর্ক পাঠক বাংলা সাহিত্যের সেই অন্তঃসারহীন আড়ম্বরের দিনেও কয়েকজন লেখকের মনে সুবুদ্ধির শৈশবকে দেখতে পেয়েছিল। সেদিনের অনাদৃত শিশু আজ দৃপ্ত যুবক। মেকীর

গণদেবতা (চণ্ডীমণ্ডপ)—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য ৩৷৷০। কাত্যায়নী বুক ষ্টল্।

মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পাঠকসাধারণও বেশি দিন থাকতে পারেনি—সত্যকে, স্বাস্থ্যকে আজ তারা অভিনন্দন জানাতে সক্ষম।

যে অগণিত ভূখণ্ড নিয়ে বাংলাদেশের সত্যিকারের রূপ—তা তার সহর নয়, গ্রাম। সে-গ্রাম ভারতীয় আদর্শের আত্মসম্পূর্ণ গ্রামের সংজ্ঞাকে সার্থক করতে পারেনা, ধনতান্ত্রিক সহর-সভ্যতার সংঘাতে আজকের দিনে বাংলাদেশের গ্রাম ভগ্নপ্রায়। এ গ্রামের ছবি আমরা বুদ্ধি দিয়ে যতটুকু ধরতে পারি তার চেয়ে তা অনেকাংশে স্বতন্ত্র আর এ গ্রামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় না থাকলে নিজেদেরই যে আমরা চিনিনে সে কথাটাই প্রমাণিত হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম সচেতন বাংলা ঔপন্যাসিক যিনি এমন একখানি গ্রাম তার মূলশিকড় শুদ্ধ তুলে এনে আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত করেছেন। গ্রামের অতিথি হিসেবে গ্রামকে তিনি দেখেন নি, 'গণদেবতা'র তারাশঙ্কর গ্রামবাসী, গ্রামের মাটির সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগাযোগ অচ্ছেদ্য। তাঁর সাহিত্যের সত্যকে, বলিষ্ঠতাকে তাই আজ সজ্ঞান পাঠকমাত্রই অভিনন্দন জানাবে। তারাশঙ্করের প্রতি সশ্রদ্ধতা বাংলা পাঠকশ্রেণীর সুবুদ্ধিরই পরিচায়ক কেননা তারাশঙ্করের সাহিত্য-সম্পদ ধারকরা পুঁজি নয়, তা খাঁটি বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার মানুষ।

'গণদেবতা' (চণ্ডীমণ্ডপ) উপন্যাসখানিতে সমস্ত গ্রামটাই নায়ক—আমাদের ধারণাকে আরেকটু কেন্দ্রগত করে আনলে বলতে পারি গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপটাই নায়ক। যে-চণ্ডীমণ্ডপ ছিল সকলের সম্পত্তি, সকলের শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় যার রূপ ছিল, জীবন্ততা ছিল, সে আজ শ্রীহীন, প্রাণশূন্য। গ্রামের স্বার্থপর যশলোভী শ্রীহরি ঘোষ চণ্ডীমণ্ডপকে নিজের সম্পত্তি করে নিয়ে তার শ্রী ফিরিয়ে আনতে চাইলে কি হবে, তার সঙ্গে গ্রামের লোকের হৃদয়ের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

চণ্ডীমণ্ডপের এই দুর্ঘটনার ছায়াই অবিকল সমস্ত গ্রামটার উপর গিয়ে জুড়ে বসেছে। গ্রাম ছিল চাষীদের সবার—কুচক্রী চাষী শ্রীহরি ঘোষ হয়ে উঠল সহকর্ম্মী ভাইদের জমিদার। কিন্তু তবু আমরা উপন্যাসের চারশ' পৃষ্ঠায় শ্রীহরি ঘোষকে বড় করে দেখতে পাইনে—দেবু পণ্ডিত, অনিরুদ্ধ কামার, দুগ্‌গা মুচিনী, ইংরিজি নবীশ হরেন ঘোষাল, বৃদ্ধ চৌধুরী, পদ্ম কামারণী, ডেটিন্যু যতীন, বিলু—সবার জীবনযাত্রার সমান তালেই চলেছে শ্রীহরির জীবনের ছবি—এমন কি অসংখ্য ছোটখাট চরিত্রের উঁকিঝুঁকিকেও ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি শ্রীহরি। এ বিধান গ্রাম্যজীবনের—গ্রাম্যজীবনের সার্থক শিল্পীর হাতে তা অনায়াসেই ফুটে ওঠে।

আমাদের মনে ভারতীয় এই ধারণাটা এখনও দূর হয়নি যে সমাজ রাষ্ট্রনীতির নিরপেক্ষ। অতীত ভারতে যা-ই হয়ে থাক—বর্ত্তমানে যে রাষ্ট্রনীতি সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এ নিয়ে এক সেকেণ্ডও তর্ক চলেনা। সমাজ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের আদর্শকে উপলব্ধি করবার দৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে কোনো উপন্যাসকারের ছিলনা—এমন কি হাল আমলের বহু কম্যুনিষ্টম্মন্য ঔপন্যাসিকের রচনাতেও তার আভাস দেখা যায় না। এ দৃষ্টি দেখছি আমরা তারাশঙ্করের চোখে। রাষ্ট্রিক-ব্যবস্থা বাংলার পল্লীসমাজে যে ভাঙা-গড়ার ইতিহাস রচনা করছে তার সম্পূর্ণ

ভাষ্য আমরা 'গণদেবতা'র চরিত্রগুলোর মধ্যে দেখতে পাই। তাই প্রত্যেকটি রাষ্ট্রিক আন্দোলনের ঢেউ গণ্ডপল্লীতে যে আশা ও আশঙ্কার স্ফুরণ এনে দেয় তাকে লেখক উপেক্ষা করতে পারেন নি।

অর্থনৈতিক ভিত্তিতে আঘাত খেয়ে পল্লীসমাজের কাঠামোটা আজ যে শীর্ণতার গ্লানি বহন করছে এই খাঁটি সত্যকে আবিষ্কার করেও তারাশঙ্কর মুক্তির কোনো সন্ধান বইটিতে দিতে পারেন নি। পল্লীজীবনের দুঃসহ দুর্গতির গায়ে সাময়িক সান্ত্বনার প্রলেপ দেবার জন্যেই তিনি ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধ ন্যায়রত্নের একটি চরিত্র এনে দাঁড় করিয়েছেন। ন্যায়রত্নদের মতো ধার্ম্মিক কয়েকজন লোক পল্লীতে বাস করেন বলেই যে পল্লীসমাজ একেবারে ধ্বসে যাচ্ছে না—এ ধারণাকে মেনে নিলেও আমাদের কোনো উপকার বা সমস্যার সমাধান ত হয়না। মুষ্টিমেয়ের ধর্ম্মমনোভাব সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনা—ধর্ম্ম যখন সমাজের বেশির ভাগ লোককে ধরে রাখতে পারছে না, তাতেই বোঝা যায় সমাজে ধর্ম্মের শক্তি ফুরিয়ে গেছে। তারাশঙ্করের মত দৃষ্টি-সম্পন্ন লেখকের কাছে আমরা আশা করেছিলাম যে যুগে যুগে ভগবান-প্রেরিত দূতের উপর তাঁর আস্থা থাকবেনা। কিন্তু পল্লীসমস্যার অর্থনৈতিক সমাধানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তারাশঙ্কর ধর্ম্মকেই সমাধানের নিয়ন্তা বলে নির্দ্দেশ করেছেন :

> "তবু ন্যায়রত্ন কোথাও না কোথাও বাঁচিয়া আছেন, চৌধুরী আছে; চৌধুরীর উত্তরাধিকারী দেবু ঘোষ নবরূপে—নবযুগে আবির্ভূত হইয়াছে। মধ্যে একটা পুকুরের পাঁক হইতে একটা পাথরের মূর্ত্তি সে পাইয়াছে। ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন—সূর্য্যমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি শ্রীহরি ঘোষ দাবী করিয়াছিল—কিন্তু সে তাহাকে দেয় নাই। দেবু সেটি লইয়াছে। সে তাহার পূজা করিবে। তাহার মনে হইল—সূর্য্যমূর্ত্তির মুখের সঙ্গে ন্যায়রত্নের মুখের মিল আছে। পল্লীর উপরের পঙ্কাবরণ উন্মোচন করিলেই তাহাকে পাইবে।"

এমন মনে হওয়াতেই পল্লীর দুঃখদারিদ্র্য দূর হয়ে আকাশ নির্ম্মেঘ হয়ে যাবেনা। অর্থ-নীতির মূলসূত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকাতেই তারাশঙ্কর এই আদর্শবাদী মনোভাবকে ভাষা দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পেরেছেন।

হয়ত পল্লীর মানুষ দেবু ঘোষের মত একটা দুর্ব্বল সান্ত্বনা নিয়েই বেঁচে থাকে। কিন্তু সৃষ্টিশীল শিল্পী ফটোগ্রাফার নন। 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্'—কথাটা তাঁদের আদর্শ হতে পারেনা। সমাজ তাঁদের কাছে সৃষ্টি চায়, পথ চায়—তাঁদের হাতে ধরা আয়নায় নিজের মুখ দেখেই খুসী থাকতে চায়না। তারাশঙ্কর অর্দ্ধপথে থেমে গিয়ে আমাদের নিরাশ করেছেন। যে আদর্শ জীবনধারণের পক্ষে সহায়ক নয়—তা ভারতীয় হলেও আমাদের কাছে মূল্যহীন।

এ ছাড়াও আরো অনেক দিক দিয়েই তারাশঙ্কর 'গণদেবতা'য় সার্থক শিল্পীর পর্য্যায়ে উঠতে পারেন নি। সে সূত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্যই তাঁর ভাষা। ভাষার বাঁধুনিতে তাঁর শিল্পী-মনের পরিচয় প্রায় অনুপস্থিত—উপন্যাসের বর্ণনার স্থানগুলো দৈনিক পত্রিকার ভাষায় শুনতে হলে আমাদের মন স্বভাবতই বিরূপ হয়ে ওঠে। ভাষা-শিল্পের সংস্কার থেকে মুক্তি লাভ করা পাঠক বা লেখকের পক্ষে খুব গৌরবজনক নয়। ভাষার দুর্ব্বলতায় 'গণদেবতা'র অধিকাংশ বর্ণনাই পাঠকের কাছে ক্লান্তিকর লাগতে বাধ্য। যে উপন্যাসের আয়তন প্রায় এপিকের কাছাকাছি ভাষার দুর্ব্বলতা তার পক্ষে কতটুকু ক্ষতিকর হয়ত তিনি তা ভেবে দেখবেন।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

রেডিও

বৈজ্ঞানিক সাফল্যে আজকাল সমস্ত পৃথিবীতেই যে একটা পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, তার সবচেয়ে বড় সূত্রই হচ্ছে রেডিয়ো। কাজে কাজেই রেডিয়োর কাছে দাবীটা আমাদের সকলেরই একটু বেশী। সারা পৃথিবীর মুখপত্র এই ছোট্ট বাক্সটি যখন নানা ভাষায়, নানা কণ্ঠে কল্‌কল্ করে ওঠে তখন বাস্তবিকই রোমাঞ্চিত না হয়ে পারি না।

কিন্তু একথা না বললে সত্যের অপলাপ হবে যে কলকাতার বেতারকেন্দ্র এদিক থেকে আমাদের বড়ই হতাশ করে। কলকাতা এমন একটি নগর যেখানে জ্ঞানী গুণীর অভাব নেই কিন্তু রেডিয়োর মারফৎ তাঁদের আমরা পাই-ই না বলতে গেলে। তবু এর মধ্যে গাইয়েদের কিছু কিছু পাওয়া যায় কিন্তু সাহিত্যিক বা চিত্রশিল্পীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ বড়ই উদাসীন। অনুষ্ঠানের তো ত্রুটি নেই। গান, গল্প, পল্লীমঙ্গল, এ, আর, পি, নাটক, নভেল—বেতার কেন্দ্র আমাদের পরিবেশন করেন অনেক কিছুই—সকাল সন্ধ্যা একেবারে মুখরিত। কিন্তু সেই মুখরিত সময়গুলো আমাদের কেমন কাটে সেকথা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন তো কি বলি?

চিত্রীরা যদি মাঝে মাঝে তাঁদের চিত্রকলা সম্বন্ধে কিম্বা সাহিত্যিকরা তাঁদের সাহিত্য সম্বন্ধে রেডিয়োর মারফৎ আমাদের কিছু শোনান তা হ'লে আমরা জনসাধারণরা অনেক উপকৃত হই। প্রত্যেক শিল্পীরই একটা আলাদা চিন্তার জগৎ আছে, তাঁদের চিন্তাধারাটা তাঁদের মুখ থেকে শুনবো এরকম সুযোগ সুবিধা হওয়াটা খুব সহজ নয়—একমাত্র রেডিয়োই আমাদের সে সুযোগটা সহজে দিতে পারে সন্দেহ নেই। তারপরে নাটক। যে সমস্ত নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে খুব প্রসংশা পেয়েছে, রেডিয়োতে অনেক সময়েই শুনি সে সব নাটকই অভিনীত হচ্ছে। বিশেষত শুক্রবার দিন। আর পুরো দু'ঘণ্টাব্যাপী একটা নাটক শোনা—যেখানে শুধু শোনাই—সেখানে সময়টা অত্যন্ত ক্লান্তি-কাতর ও দীর্ঘ হয়ে ওঠে নাকি? চল্লিশ মিনিটই যথেষ্ট সময়।

আমরা সব সময়েই বলি যে থিয়েটার দেখবো, থিয়েটার শুনবো বলি না কখনো—তার কারণ দেখাটাই হচ্ছে আমাদের দশ আনা—বাকী ছ' আনা শোনা। রাজা শব্দটি শুনলেই আমাদের মনে ঝক্‌ঝকে দামী এবং অনন্যসাধারণ একটি মখমলের পোষাক-সজ্জিত মূর্ত্তি চোখে ভেসে ওঠে—কখনো তার স্বর জলদগম্ভীর কি জল-তরঙ্গের মতো অলংকারময় সে কথা ভাবি না। কাজেই পাত্র-পাত্রীকে আড়ালে রেখে কেবল কানকে পরিতৃপ্ত করেই দেখার

আনন্দ ভোগ করানো অত্যন্ত শক্ত হয়ে ওঠে। শুনতে তো প্রায় অসম্ভবই মনে হয়। কাজেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে অভিনয় একেবারে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিল সে অভিনয়ই রেডিয়োতে এসে ঠেকলো একদম লাস্ট বেঞ্চিতে।

আর সত্যি বল্‌তে অভিনেতা অভিনেত্রীরা যে সুরে তাঁদের পাঠ বলেন সে সুরটি বর্জ্জন না করলে আর চলছে না। নাটক করছেন বলে সে যে কী এক নাটুকে টোন্ বার করতে থাকেন এঁরা গলা দিয়ে যে আমরা হতভাগ্য শ্রোতারা একটা নিমেষের জন্যেও ভুলতে পারি না যে আমরা নাটক শুনছি। অভিনয় জিনিষটা অবহেলার যোগ্য নয়। ভাল উপন্যাস বা গল্প পড়তে পড়তে আমরা যেমন নায়ক-নায়িকার দুঃখে দুঃখী হই—সুখে আনন্দ পাই—কতক্ষণের জন্য যেমন ভুলে যাই যে বই পড়ছি—নাটকেও তো আমরা সেই ভুলের মুহূর্ত্তটিই খুঁজি। আনন্দের উপকরণের তো ঐটাই সবচেয়ে বড় সার্থকতা। তখনো সেই মুহূর্ত্তেও যদি নিজের ঘর-সংসার আর নিজের সুখ-দুঃখটাই বড় হয়ে থাকে আমাদের মনে তা হলে কী লাভ হলো বই পড়ে, পয়সা খরচ কোরে সিনেমা দেখে—কিম্বা থিয়েটারের অভিনেত্রীরা যখন ব্যর্থ প্রেমে হা হুতাশ করেন—কিম্বা করুণ সন্তানহারা মায়ের অভিনয়ে কাঁদেন তখন তার সেই সরুমোটা মেশানো অভিনব ক্রন্দিত কণ্ঠস্বর শুনে আমাদের মনের ভাবটি কেমন হয়? চোখ আমাদের অশ্রুসজল হয়ে ওঠে ঠিকই কিন্তু তা কি কেঁদে কেঁদে !!

তাছাড়া যে সব নাটক অভিনীত হয় রেডিয়োতে তা যে প্রায়ই সুশ্রাব্য হয় না সে কথা তো বলাই বাহুল্য। মনে তো পড়েনা,—চমৎকার একটি নাটক শুন্‌লাম—একথা কোন বুদ্ধিমান শ্রোতা কখনো বলেছেন। অবিশ্যি ভাল নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের পরে কে আমি জানিনা কিন্তু একথা খুবই সত্যি যে আজকালকার লেখকদের মধ্যে এমন লেখকের মোটেও দুর্ভিক্ষ হয়নি যাঁরা অন্ততঃ চলন সই গোছের একটা নাটক লিখতে পারেন। একথা রূঢ় শোনালেও বলতেই হয় যে নির্ব্বাচনে খুব সুরুচির পরিচয় বেতার কেন্দ্রের কর্ত্তৃপক্ষেরা খুব কমই আমাদের দিয়েছেন। এদেশের সবই তো ছেলে ভুলোনো ছড়া—সিনেমাওয়ালারা খোঁজেন চার আনার সিটের মনোভাব—থিয়েটারওয়ালারাও তাই—রেডিয়োওয়ালারাই বা কেন বাদ যাবেন। সকলের মনের তলাতেই ঐ এক বণিক বাসা বেঁধে আছে। জনগণ কী চায়? কতখানি হালকা হলে তারা গ্রহণ করতে পারে। এবং আসল লোকই তারা, তারাই তো সংখ্যায় বেশী, তারাই তো কিনবে টিকিট—কিন্তু এসমস্ত প্রতিষ্ঠানের একটা দায়িত্বও তো আছে? ইচ্ছে করলে এঁরাই তো পারেন জনগণের মনকে অনেকখানি উঁচুতে তুলতে।

তবু তো সিনেমা বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ব্যবসায়ী বুদ্ধির পক্ষে একটা বলবার কিছু আছে কিন্তু রেডিয়োর কর্ত্তৃপক্ষও যদি সেভাব মনে পোষণ করেন তা হ'লে তাঁরা কি কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারেন?

প্রতিভা বসু

সিনেমা

কাশীনাথ : নিউ থিয়েটার্স লিঃ

বেশি বয়েসে ছেলেমানুষি করলে যেমন কুৎসিত দেখায়, আজও বাংলা সিনেমাকে শৈশবের গণ্ডীতে ঘুরতে দেখে ঠিক তেম্নি মনে হয়। বয়েস অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বুড়োমি এনে দেয়, বাংলা সিনেমার আঙ্গিকেও তাই প্রবীণতার ছাপ সুস্পষ্ট কিন্তু এ আঙ্গিক নিয়ে তা এমন সব গল্প পরিবেষণ করে যাচ্ছে যা ম্যাডেনী আমলের 'মাতৃস্নেহে'র চেয়ে একটুও উঁচু দরের নয়। হঠাৎ আজ সিনেমার রাজ্যে পতিব্রত্যের একটা প্রবল জোয়ার যে কেন এসে উপস্থিত হল তা বোঝা মুস্কিল। জীবন বা সমাজের দিকে তাকিয়ে আমরা স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে যে দ্বন্দ্ব আবিষ্কার করতে পারি, মনুষ্যত্বহীন পাতিব্রত্য কি তা নিরসন করে সমাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে? 'জীবন-সঙ্গিনী' বা 'সহধর্ম্মিণী' পর্য্যায়ের গল্প আজকের দিনের সমাজে যে শুধু অপ্রয়োজনীয় তা নয়, অসহ্যও। কিন্তু বাংলা সিনেম্যার কর্ত্তৃপক্ষের সে কাণ্ডজ্ঞান নেই—তাঁরা অনবরত ঠাকুমার ঝুলি ঝেড়ে গল্প পরিবেষণ করে যাবেনই। আমাদের ঠাকুমারা যে এখন বঙ্গের বধূ নন, এ জ্ঞানোন্মেষ তাঁদের কবে হবে তা-ই ভাবি।

যদি ভুলক্রমে বাংলা সিনেমা অন্যদিকে মুখ ফেরায় তাহলেও তার দৃষ্টি শরৎচন্দ্রে এসে নিবদ্ধ হতে বাধ্য। শরৎচন্দ্র তাঁর 'দেবদাসে' যে ইচ্ছাপূরক কল্পনার প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন আর তা নিয়ে দেবদাস ছবি যে অঘটন ঘটিয়ে ফেলেছে তারই মোহ থেকে আজ পর্য্যন্ত বাংলা সিনেমার কর্ত্তৃপক্ষ মুক্ত হতে পারলেন না। 'শরৎবাবুর গল্প চাই'—অবিরতই তাঁদের কণ্ঠে এই ঐক্যতান বাজ্‌ছে। শরৎচন্দ্রের গল্পে যে সাতরাজার ধন মাণিক লুকিয়ে আছে এমন একটা উন্মার্গী কল্পনা নিউ থিয়েটার্সের না থাকলে তাঁরা পরিণীতা বা কাশীনাথকে চিত্রার্পিত করবার আগ্রহ দেখাতেন না। শরৎচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী সন্দেহ নেই—বাংলা ছবি সবাক হয়েছে এ কথাও সত্য কিন্তু সিনেমা শুধু কথাতেই বেঁচে ওঠে না, তার প্রাণ চিত্রোপযোগী গল্প। সে-গল্প পরিণীতা বা কাশীনাথে নেই।

কাশীনাথকে সিনেমার গল্পের জন্য গ্রহণ করা আর শরৎচন্দ্রের নাম ভাঙিয়ে খাওয়া সমান কথা। কাশীনাথে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার এক দশমাংশও বেঁচে নেই। শরৎ-সাহিত্যের উজ্জ্বল ভাণ্ডারে যে গল্প সসঙ্কোচে এক কোণায় পড়ে থাকে তাকে ঢাক পিটিয়ে লোকের সামনে এনে উপস্থিত করা অবাঞ্ছিত এবং অন্যায়।

অবিশ্যি একথা অনস্বীকার্য্য যে কাশীনাথের চিত্র-রূপ ওর গল্পের চেয়ে ভালো উৎরেছে। তার জন্যে পরিচালকের কুশলতার প্রতি আমরা সশ্রদ্ধ। ছবির ভাষায় গল্পকে বলবার অসাধারণ ক্ষমতা যে পরিচালকের আছে তা নিয়ে সামান্য প্রশ্নও আর করা যায় না। কলসীর জলের ফোঁটা দিয়ে মৃত্যুর ইঙ্গিত বহন করা যে কোনো শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সূক্ষ্ম শিল্প-চেতনার পরিচায়ক। তবে এ সূক্ষ্ম শিল্পচেতনার পাশাপাশিই তিনি এমন স্থূল ও গর্হিত ঘটনা-সংস্থান করেছেন যা কাশীনাথের অমার্জ্জিত গল্পের কলেবরেও খুঁজে পাওয়া যায় না। স্ত্রী গালাগালি করে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেই যে স্বামী হাউমাউ করে কাঁদতে সুরু করবে এ অদ্ভুত ও হাস্যকর মনস্তত্ত্ব যে পরিচালক কোন্ বুদ্ধি থেকে আমদানী করলেন তা বোঝা দুষ্কর। কাশীনাথের পরিচালক এ অস্বাভাবিকতার আশ্রয় নেবেন ভাবতে সত্যি দুঃখ হয়।

তবু কাশীনাথ থেকে এ একটা আশা নিয়ে আমরা ফিরতে পারি যে পরিচালনার দিকে বাংলা সিনেমা সত্যি এগিয়ে যাচ্ছে। যদিও নীতীন বসুর মত দক্ষ চিত্রশিল্পীর পক্ষে ক্যামেরার মুখ দিয়ে গল্প বলাটা খুব বিচিত্র নয় তবু বলতে হয় পরিচালনা-বিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না থাক্‌লে কাশীনাথ গল্পকে কাশীনাথ ছবিতে পরিণত করা যায় না। পরিচালনার ক্ষেত্রে আরেকটি প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি আমরা 'বন্দী' চিত্রের মারফৎ। সাহিত্যিক শৈলজানন্দ আজ সার্থক চিত্র-পরিচালক; তা থেকে আমরা এ তথ্যটি আবিষ্কার করেই খুসী যে বাংলা ছবির পরিচালনার প্রগতি যাত্রায় সাহিত্যের দান বড় কম নয়।

আ

সমালোচনা

INDIA AND FREEDOM by L. S. Amery (Oxford University Press). Rs. 3/-.
THE STORY OF INDIA by F. R. Moraes. Rs. 5/-.

ভবিষ্যতের বাঙালী—এস ওয়াজেদ আলী। মূল্য ১৷৷০।

বইখানির নাম ভারতবর্ষ এবং স্বাধীনতা, এবং তার রচয়িতা শ্রীযুক্ত এমেরি। এ রকম মণিকাঞ্চন যোগ বড় একটা দেখা যায় না। ইংরেজ জাতির রসবোধের প্রশংসা করতে হয়, কারণ বর্ত্তমান যুদ্ধের দুর্দ্দিনেও যারা এমন একটা রসিকতার সৃষ্টি করতে পারে, তাদের রসবোধ সত্যই অনুকরণীয়। এমেরি সাহেবের ভারতপ্রীতি বর্ত্তমানে বিশ্ববিশ্রুত, যার ফলে বৃটিশবন্ধু আমেরিকান সাংবাদিকের মধ্যেও অনেকেই বলতে বাধ্য হয়েছেন যে ভারতবর্ষের সমস্যা সমাধানের জন্য সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন ভারত সচিবের আসন থেকে শ্রীযুক্ত এমেরির বহিষ্করণ, এবং সেই সঙ্গে ভারত সচিবের পদটীর পর্য্যন্ত বিলুপ্তি। আলোচ্য পুস্তিকাখানিতে এমেরি সাহেব তাঁর ভারতপ্রীতির সেই খ্যাতি অটুট রেখেছেন একথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

এমেরি সাহেবের প্রধান বক্তব্য তিনটী। যারা ইংরেজের একনিষ্ঠ বিশ্বপ্রেম, নিছক সেবাধর্ম্মের তাগিদে সুদূর ভারতবর্ষে আগমন এবং অনিচ্ছায় কেবলমাত্র ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য ভারত অধিকারকে ঠিকভাবে বুঝতে পারেনি, তারাই বলে থাকে যে হিটলারের ইয়োরোপিয় অভিযান এবং ইংরেজের ভারতাধিকার মূলত এক জাতের। এমেরি সাহেব তাঁর বক্তৃতায় এ কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে পৃথিবীর প্রায় একপঞ্চমাংশ অধিবাসীর বাসভূমি ভারতবর্ষকে ইংরেজ স্বাধীনতা এবং শান্তির খাতিরেই শৃঙ্খলিত করে রেখেছে, এবং সেই ন্যায়নিষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জার্ম্মান বা জাপানের লুব্ধ ও বর্ব্বরতাপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদের তুলনা হতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের জার্ম্মান বা জাপানী সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বিতৃষ্ণা ও আক্রোশকে যারা ভণ্ডামী বা কপটতা মনে করে, তাদের প্রকাণ্ড ভুল দেখাবার জন্য এমেরি সাহেব চেষ্টার ত্রুটী করেননি, এবং অন্ততঃ নিজেকে তিনি বুঝ দিয়েছেন যে তাঁর সে চেষ্টা সফল।

এমেরী সাহেবের দ্বিতীয় বক্তব্যটীও প্রথমটীর সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে জড়িত। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ যে কেবলমাত্র ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্ম্মরাজ্যের আধুনিক সংস্করণ তা নয়—ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতারই নামান্তর। তাই যারা বলে থাকে যে বর্ত্তমান যুদ্ধের দুর্দ্দিনে বিপদ যখন আসন্ন মনে হয়েছিল, তখনই হঠাৎ স্যর স্ট্যাফর্ড ক্রীপস ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছিলেন, তারাও

মস্ত ভুল করে। বস্তুতপক্ষে চিরদিনই ইংরেজ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে উদগ্রীব এবং সে সাধনায় আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ইংরেজের বিশ্রাম নেই। এবং পূর্ব্বেও বহু ইংরেজ রাষ্ট্রনেতা এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সঙ্গে সমঝোতা করতে আসতে প্রস্তুত ছিলেন, তবে একদিকে নির্ব্বোধ ভারতবাসীদের আত্মকলহ এবং রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব, এবং অন্য দিকে ইংলণ্ডে নানা কাজে বিলিতি রাষ্ট্রনেতার ব্যস্ততা—এই সমস্ত কারণে পূর্ব্বে এতটা স্পষ্টভাবে ইংরেজের উদ্দেশ্য ঘোষণা বা ভারতে বৃটিশ মন্ত্রিসভার সদস্যের আশা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধের দিনে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ নেই বলেই বোধহয় সময়েরও অভাব ঘটেনি, এবং তাই এবার সমরপরিষদের সভ্যেরও এখানে আসার কোন বাধা ঘটেনি,—যুদ্ধের পরিস্থিতিতে ভারতের অন্তর্কলহও বোধহয় কম, তাই এবার স্যর ষ্ট্যাফর্ড ক্রীপসের সশরীরে আগমন। এমেরী সাহেবের এই প্রাঞ্জল বৃটিশ ন্যায় যারা বুঝবে না, সেই সব মূঢ়মতিদের একমাত্র জেলখানা ভিন্ন আর কোনখানে স্থান হতে পারে?

এমেরী সাহেবের তৃতীয় বক্তব্য যে, যে স্বাধীনতার উপর ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি, যে স্বাধীনতা বহুকষ্টে এবং আয়াসে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীকে শেখাচ্ছে, এবং যে স্বাধীনতার পরিপূর্ণ পরিণতির জন্য আজ শতাব্দী ধরে বৃটিশ রাষ্ট্রনেতাদের সাধনা, সেই স্বাধীনতা কি সহজে বা অকস্মাৎ সম্পূর্ণভাবে লাভ করা যায়? গ্রীক পুরাণে আছে যে মিনার্ভা আজন্ম পূর্ণ যৌবনা। কিন্তু সেই অনৈসর্গিক বিকাশের সম্ভাবনা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চিরন্তন স্বভাবের মধ্যে মিলবে কি ভাবে? ভারতীয়েরা অবুঝ এবং স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম্ম বোঝেনি—তাই তারা চঞ্চল এবং অকস্মাৎ পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করে বসে, কিন্তু এমেরী সাহেবের মতন প্রাজ্ঞ এবং বিজ্ঞ জনেরা জানে যে যুগ যুগ ধরে তিল তিল করে স্বাধীনতার সৌধ গড়তে হবে। আজ এমেরী সাহেব একটু চূণ দেবেন এবং যুগান্তের শেষে এমেরী সাহেবের বংশধর এসে তাতে সুরকী জোগাবেন—তার পরে চলবে ইটপাথর সংগ্রহের চেষ্টা, তা নইলে স্বাধীনতা কি কেবলমাত্র মুখের কথা?

এমেরী সাহেব স্বনামধন্যপুরুষ, এবং একগুঁয়েমী ও নির্ব্বুদ্ধিতায় তিনি ভারবাহী জন্তু-বিশেষের সঙ্গে তুলনীয়। তবু তাঁর রচনা একেবারে নিছক মিথ্যার সাজি নয়—মিথ্যা পরিবেশে মিথ্যার বেসাতিতে সত্যের যে দুয়েকটী কণা মিশিয়েছেন, তাতে মিথ্যা আরো বেশী ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু ভারতবাসীর পক্ষে বইখানি পড়া প্রয়োজন, কারণ সাম্রাজ্যবাদের মোহে তথাকথিত শিক্ষিত ইংরেজের বুদ্ধির যে অপলাপ, তার নিদর্শন হিসাবে বইখানি যুগপৎ শিক্ষাপ্রদ ও কৌতুকবহ। তবে বর্ত্তমানের বাজারে ভারতসম্পর্কে অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ আমেরিকানও এ রকম ধোকায় সহজে ভুলবে কিনা সন্দেহ—সেদিক দিয়ে এমেরী সাহেবের ঘর্ম্মপাত যে পণ্ডশ্রম এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খানিকটা তথ্যজ্ঞান দেওয়া মোরেস সাহেবের বইখানিরও উদ্দেশ্য, এবং আনন্দের সঙ্গে বলতে হয় যে তিনি সে কাজে অনেকখানি সাফল্যলাভ করেছেন। মোরেস সাহেব ভারতবাসী খৃষ্টান এবং ভারতীয় জাতীয়তায় বিশ্বাসী। এমেরী সাহেবের সঙ্গে তাঁর মতের যে কোথাও কোন মিল থাকবে না, এটা স্বাভাবিক। এমেরী সাহেবের সঙ্গে কেবল মতের

নয়, মতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যও সুস্পষ্ট, এবং তারও কারণ সহজে বোঝা যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরেজের যেটুকু দান, তাও যেমন তিনি অস্বীকার করেন নি, তেমনি অন্য দিকে ইংরেজ আগমনের ফলে ভারতীয় জীবনের যে ক্ষতি ও অধঃপতন, তাও তিনি ভোলেন নি। এক কথায় মোরেস সাহেব সত্যবাদী ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন।

ওয়াজেদ আলী সাহেবের "ভবিষ্যতের বাঙালী" ঠিক ইতিহাস নয়, তবে ইতিহাসের মালমসলার ভিত্তিতে বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিকল্পনা। ওয়াজেদ আলী সাহেব চিন্তাশীল ও ভাবুক, এবং বর্ত্তমান পুস্তিকাখানিতে তাঁর সে সুনাম আরো বাড়বে। অল্প পরিসরের মধ্যে তিনি অনেক কথার অবতারণা করেছেন, তবে তাঁর বক্তব্য মোটামুটিভাবে এই যে প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক কারণে ভারতবর্ষ এক রাষ্ট্র হতে বাধ্য, কিন্তু ঐক্যবোধ তত প্রবল নয় বলে সে রাষ্ট্র এক অখণ্ড কেন্দ্রিয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, কয়েকটি খণ্ড রাষ্ট্রের সমষ্টি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রিয় রূপ। তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে সেই খণ্ড রাষ্ট্র গঠনের জন্য জাতীয়তার যে ভিত্তির প্রয়োজন, বাঙলা দেশে তার মালমসলা যত বেশী, অন্য কোথাও তার নমুনা মেলে না। ওয়াজেদ আলী সাহেবের মতে বাঙলা দেশে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সমস্ত উপাদানই রয়েছে, এবং সেদিক থেকে স্বাধীন বাঙলা স্বাধীন ভারতের অগ্রদূত হবার অধিকারী। তার জন্য প্রয়োজন বাঙলার রাষ্ট্রিয় জীবনের স্বাতন্ত্র্য। তার ফলে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যসাধনও সহজ হবে, কারণ বাঙালী স্বভাবত পরমতসহিষ্ণু ও শান্তিপ্রিয়, এবং "স্বার্থান্ধ লোকের প্ররোচনা না থাকলে বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের মিলন খুবই সহজ ছিল এবং এখনও আছে আর ভাবীকালেও থাকবে।" ওয়াজেদ আলী সাহেব সব চেয়ে জোর দিয়েছেন এই কথায় যে ভবিষ্যতের বাঙালীর সে গৌরবের ভিত্তিস্থাপনে সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও চিন্তাশীলের দায়িত্ব সব চেয়ে বেশী।

এ সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে অনেক আলোচনা চলে, কিন্তু ওয়াজেদ আলী সাহেবের প্রধান প্রতিপাদ্য নিয়ে তর্কের অবকাশ নাই। বিশেষ করে বর্ত্তমানে যখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী এবং তাঁদের সচেতন ও অচেতন অনুচরেরা সাম্প্রদায়িক বিষে দেশকে আচ্ছন্ন করতে ব্যস্ত, সে সময়ে তাঁর স্বচ্ছবুদ্ধি এবং মুক্ত বিচার রীতির মূল্য আরো বেশী। এমেরী সাহেবের মিথ্যা প্রচারণার ঠিকমত জবাব মোরেস সাহেব ও ওয়াজেদ আলী সাহেব দুজনেই দিয়েছেন।

হুমায়ুন কবির

কবিতা (১৩৪৩-৪৮)—দিনেশ দাস। পূর্বাশা, পি ১০ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

সাম্প্রতিক বাঙলা কাব্যে দিনেশবাবু নবাগত; কয়েক বছর ধরে সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় তাঁর রচনার দেখা পাওয়া যাচ্ছিল, মাঝে মাঝে দু'একটা কবিতা পড়ে উৎসাহ বোধও করছিলুম; কিন্তু এই বোধ হয় তিনি প্রথম কবিতার বই ছেপে বা'র করলেন, একসঙ্গে তাঁর সমগ্র রূপটা দেখবার সুযোগ হ'লো। দিনেশবাবুর মন যথার্থ কবির মন, আধুনিক মন; এবং আমাদের

চারদিকে যে-জগতের পরিধি সে-জগৎ সম্বন্ধে তিনি সচেতন, একথা অনুভব করে তৃপ্তিলাভ করেছি। এই সচেতনতা হয়ত অনেকেরই আছে, এবং বিচিত্র কুশলী ছন্দে বুদ্ধিগ্রাহ্য বক্তব্যে তার রূপান্তর ; অথবা অসংলগ্ন কথা ও ছবির মালায় বক্তব্যের অস্পষ্ট আভাস নিয়তই আমরা সাম্প্রতিক কবিতায় দেখ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু গভীরতর আবেগ ও অনুভূতির ভিতর সেই সচেতনতার সঞ্চার এবং বুদ্ধি ও অনুভবগ্রাহ্য অর্থবহ বাক্যে তার সার্থক কাব্যময় প্রকাশ খুব কম আধুনিক কবিদের মধ্যেই দেখা যায়। দিনেশবাবুর এই 'কবিতায়' তার অনেকখানি সম্ভাবনা দেখা গেল। ভবিষ্যৎ তাঁর কাব্যসাধনার দুয়ারে গভীরতর সার্থকতা বহন করে আনবে, এই আশা করা খুব অন্যায় নয়। যেভাবে তিনি বলেছেন তাঁর ভেতর মনন-কল্পনার, অভিজ্ঞতার সত্যতা ও সততার অভাব বড় একটা কোথাও নেই ; এবং অভিজ্ঞতার এই সততা ও সত্যতাই তাঁর কবিতার সার্থকতার মূলে।

এই বই'র ৩৪টি কবিতা তিনটি বিভিন্ন স্তবকে ভাগ করা হ'য়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি স্তবক রচনার তারিখও দেওয়া হ'য়েছে। তা'তে কবির মনন-কল্পনার গতি অনুসরণ করা পাঠকের পক্ষে সহজ, বিশেষ করে আমার পক্ষে, কারণ খণ্ড খণ্ড ভাবে এক একটি কবিতা পাঠ করে তৃপ্তি পেলেও, কোনো কবির মনন-কল্পনার গতি-প্রকৃতি বুঝতে হ'লে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় কবিতাগুলো পাঠ করলে কাজটা সহজ হয় শুধু নয়, খণ্ড খণ্ড কবিতাগুলোও যেন অধিকতর উপভোগ্য হয়। প্রথম স্তবক 'মৌমাছি' অংশে 'মৌমাছি', 'হাই' ও 'নখ' কবিতা তিনটি ভাল লাগ্‌লো, এবং তার কারণও অভিজ্ঞতার সততা ও বক্তব্যের স্পষ্টতা। এই খণ্ডেই আরও কয়েকটি কবিতা আছে ; সেগুলিতে রচয়িতার মনন-কল্পনার দৃষ্টি পরনির্ভরতায় আচ্ছন্ন, ব্যক্তিমানসের জীবন-অভিজ্ঞতা তাদের উৎস নয় বলেই আমার মনে হ'য়েছে। 'সহর' খণ্ডে নাগর সভ্যতার বিচিত্র উপকরণ কবিতাগুলির বিষয়বস্তু। বেশ বুঝা যায় কবি আধুনিক জীবনকে মনন-কল্পনার আয়ত্তের মধ্যে আন্‌বার চেষ্টা করছেন, এবং কোথাও কোথাও সে-চেষ্টা সার্থক দীপ্তি লাভ করেছে, কিন্তু মোটের উপর তিনি এখনও নিজের খুঁটি পান্‌নি, বেশীর ভাগ প্রচলিত কাব্যিক বিন্যাস ভঙ্গি এবং কথায় ও ছবিতে সমসাময়িক আধুনিকতার 'ফ্যাসন' মেনে চলেছেন। তবে আধুনিক নাগর জীবনকে ধরবার চেষ্টাটা সর্বত্রই যে খুব আন্তরিক সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। প্রয়াসের এই আন্তরিকতাই দিনেশবাবুকে সাহায্য করেছে শেষ পর্যন্ত নিজেকে খুঁজে পেতে। শেষ স্তবক 'কাস্তে'র কবিতাগুলি যথার্থ কবিতা এবং প্রকৃত অর্থে আধুনিক। এই খণ্ডের সব ক'টি কবিতাই বক্তব্যের স্পষ্টতায়, মনন-কল্পনার স্বচ্ছ সততায়, ব্যক্তিমানসের অভিজ্ঞতার গভীরতায় এবং নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গি ও চিত্রমহিমায় উজ্জ্বল ও অভিনব। বিশেষভাবে সার্থক কবিতা 'কাস্তে', 'ক্লাইভ ষ্ট্রীট' ও 'ব্যাঙ্ক'। আধুনিক জীবন মনন-কল্পনার অভিজ্ঞতাকে কত গভীরভাবে স্পর্শ করতে পারে এবং আবেগানুভূতিকে উদ্রিক্ত করতে পারে, এবং তা' পারলে যথার্থ কাব্যে তা' কি করে রূপান্তরিত করা যায়, তা'র সার্থক প্রকাশ প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বুদ্ধদেব বসু কিছু কিছু দেখিয়েছেন। দিনেশবাবুর কবিতায় এঁদের দুজনেরই কিছু কিছু প্রভাব চোখে পড়ে, কিন্তু তাঁর নিজস্ব দীপ্তিও লক্ষ্যণীয়।

ছন্দ ও বাক্‌ভঙ্গির উপর দিনেশবাবুর অধিকার প্রশংসনীয়, কিন্তু মনে হয়েছে একাধিক কবিতা আরও নিখুঁত, আরও সুডৌল ও সুসংবদ্ধ হ'তে পারতো যদি তিনি লেখার পর তাদের সংস্কার ও মাজাঘসার দিকে আর একটু মন দিতেন। তাছাড়া, কোথাও কোথাও তিনি সস্তা ও প্রচলিত চিত্র, উপমা, বাক্‌ভঙ্গির ফাঁদে পা দিয়েছেন। এ-মোহটা কাটিয়ে ওঠা দরকার।

নীহাররঞ্জন রায়

কালো হাওয়া। বুদ্ধদেব বসু। ডি, এম, লাইব্রেরী। মূল্য তিন টাকা।

বুদ্ধদেব বাবুর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কালো হাওয়া' সহজেই প্রথম স্থান অধিকার করবে। তার কারণ 'কালো হাওয়া'র কয়েকটি চরিত্র লেখকের ব্যক্তিত্ব নিরপেক্ষ। বুদ্ধদেব বাবুর নায়কেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামত এবং চরিত্রের মুখপাত্র। সেজন্য শেষ পর্যন্ত তারা পাঠকের মনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাবী করতে পারেনা। কিন্তু এ অভিযোগ 'কালো হাওয়া'র অরিন্দম, হৈমন্তী এবং মহামায়া সম্বন্ধে খাটেনা। অরিন্দমের জীবনীশক্তি অ-সাধারণ, তিনি খেতে ভালোবাসেন, উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলেন, তার মধ্যে কোনোরকম কুটিল মারপ্যাঁচ নেই। তিনি অনেকটা স্থূল, কিন্তু হৃদয়বৃত্তির স্বাভাবিক বলিষ্ঠতায় আমাদের আকর্ষণ করেন। প্রথম যৌবনের উদ্দাম প্রাণশক্তি প্রৌঢ়বয়সেও তিনি হারাননি। তাঁর স্ত্রী হৈমন্তী একদা সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর সহধর্মিণী ছিলেন, অর্থাৎ স্বামীর প্রাণশক্তির অংশীদার ছিলেন। কিন্তু যৌবন সীমানায় এসে স্ত্রীলোকেরা মানসিক ও দৈহিক জীবনে যে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হন, তার ধাক্কা তিনি সামলাতে পারেন নি। বহুদিন প্রবাসে থেকে অরিন্দম কলকাতায় ফিরে এসে দেখলেন যে তাঁর সংসারে বিপর্যয় শুরু হয়েছে। হৈমন্তী ও বড়ো মেয়ে এক সন্ন্যাসিনীর করতলগত, স্ত্রীর শুচিবাই ও ধার্মিকতা প্রায় মানসিক ব্যাধির রূপ নিয়েছে। বড়ো মেয়ে একবার প্রেমে ধাক্কা খেয়ে অবদমনের বিকৃতিতে বিষাক্ত, ছেলে মদ্যপায়ী ও লম্পট, যে কালো হাওয়া অরিন্দমের সংসারকে আচ্ছন্ন করেছে, তারই বিকৃত শারীরিক প্রকাশ অরুণের কুৎসিত রোগে। বিকারের হাত থেকে একমাত্র রক্ষা পেয়েছে অরিন্দমের ছোট মেয়ে বুলি। অরিন্দম সন্ন্যাসিনী মহামায়ার কবল থেকে সংসারকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত দুর্ঘটনায় স্ত্রীর হাতে তাঁর মৃত্যু হল।

বুদ্ধদেববাবু মহামায়ার চরিত্রাঙ্কনে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মহামায়ার কথোপথন এত স্বাভাবিক হয়েছে যে সেটা বিস্ময়কর। হৈমন্তীর চরিত্রের বিবর্তনও সফলভাবে লেখক দেখিয়েছেন। বুদ্ধদেববাবু আগেকার উপন্যাসগুলিতে অনেক সময় অপ্রয়োজনীয়ভাবে লিরিক্‌ল্ হতেন, কিন্তু 'কালো হাওয়া'তে অরিন্দম যখন তাঁর যৌবন-স্মৃতির রোমন্থন করেন, তখন আমরাও তাঁর অতীতে-যাত্রার সঙ্গী হই। অদৃষ্টের বিরূপ ছায়া কী ভাবে শেষ পর্যন্ত অরিন্দমকে গ্রাস করে তার ইতিবৃত্তেও লেখক গঠন-ক্ষমতার চমকপ্রদ পরিচয় দিয়েছেন। অরিন্দমের হঠাৎ

মৃত্যুতে প্রথমে হয়ত খটকা লাগে, কিন্তু পাঠক মনে করতে পারেন যে বিদেশ থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর হাতে মৃত্যু সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল নয়, আলাসেম্ননের মৃত্যু এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'কালো হাওয়া'র শেষ দৃশ্যটি Point Counter Point-এর বিয়াট্রিস্-বার্লাপের কথা মনে করিয়ে দেয়।

পরিহাসের ব্যাপারে বুদ্ধদেববাবু হাক্স্লি-পন্থী, এবং হাক্স্লির উন্নাসিক রসিকতা ব্যক্তিগতভাবে আমার পছন্দসই নয়। বিধবাদের গোপন আমিষস্পৃহা ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর জিনিষ নয়, আমিষস্পৃহার সঙ্গে শুদ্ধাচারের, নিষ্ঠার বড়াই ফরাসী লেখক হলে হয়'ত নির্বিকারভাবে একই সঙ্গে দেখাতেন, মন্তব্য করতেন না। এসবক্ষেত্রে মন্তব্য করাটা হয়'ত অ-সাহিত্যিক।

সমর সেন

মরা মাটি : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা, পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্যু। মূল্য দুই টাকা।

দুঃস্থ নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণী ও পরার্থশ্রমীদের জীবন নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক গল্প, কবিতা ও উপন্যাস লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে আধুনিকতম সাহিত্যিক পর্য্যন্ত সবাই এ'দের জীবনের দুঃখবেদনা নিয়ে কিছু-না-কিছু লিখেছেন। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিচার করতে গেলে এই সমস্ত লেখকদের মধ্যেই একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। সুর ও রংয়ের পার্থক্য অনেক, তবুও মোটামুটি এঁরা দুঃস্থ লোকের জীবনযাত্রাকে একই দিক থেকে দেখেছেন। উদারনৈতিক মধ্যবিত্তের মনোভাব নিয়ে দরদ ও সহানুভূতির রং দিয়ে দুঃস্থ লোকের জীবনযাত্রাকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এ সমস্ত লেখা ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়। আলোচ্য উপন্যাসটিতে লেখক এই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর পথ থেকে নতুন পথে চলেছেন। একজন দুঃস্থ লোক তার জীবন ও সমাজকে যেভাবে দেখ্ছে লেখক সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে সেই সমাজ ও জীবনকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। আঙ্গিকের দিক থেকে তাই তিনি কাহিনীটিকে স্মৃতিকথার রূপ দিয়েছেন। এতে করে লেখক কৃষকের জীবনের সত্যিকারের ছবির দিকে খানিকটা অগ্রসর হয়েছেন সেকথা অসঙ্কোচে স্বীকার করা যায়।

একজন শক্তিমান লেখক তাঁর নিজের কথা অথবা ব্যক্তিবিশেষের কথা বল্তে গিয়ে সমাজের সমগ্র রূপকেই প্রকাশ করে থাকেন। মানুষকে তিনি দেখে থাকেন তার বিচ্ছিন্নতায় নয়, সামাজিক দ্বন্দ্বের ঘাতপ্রতিঘাতে মানুষের যে রূপ, সমাজের বৃহত্তর পটভূমিকায় দাঁড় করিয়ে মানুষের সেই সমগ্র রূপকেই তিনি প্রকাশ করে থাকেন। ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সমাজের এই সমগ্র রূপটি প্রকাশ করবার চেষ্টা আধুনিক লেখকদের রচনায় সর্ব্বত্র ভালরূপ ফুটে উঠতে পারে নি।

"মরা মাটির" নায়ক ভরত নিজের জীবনকাহিনী বল্তে গিয়ে কেবলমাত্র সমাজের একটি বিশেষ দিককেই দেখে নি, সমগ্র রূপটি প্রকাশ করেছে। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ থেকে

আজকের দিন পর্য্যন্ত বাংলার কৃষকের সমাজ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যে দুর্দ্দশার সীমান্তে এসেছে তার ধারাটি ভরতের জীবনকাহিনীতে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ভরত নিজে যদিও কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেনি তবুও সে কৃষক হয়েছিল, যে অনুর্ব্বর মাটি জীবনে তাকে লাভবান করতে পারে নি তার প্রতি মমতাও ভরতের অসীম। অনিবার্য্য বেদনাদায়ক কারণেই ভরত কৃষক হতে দিনমজুরে পরিণত হল।

আঙ্গিকের দিক থেকে এখানে একটি ত্রুটীর উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। আমাদের মনে হয় অনিবার্য্য কারণেই এ ত্রুটী ঘটেছে। ভরত যখন নিজের সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার স্বরূপ বর্ণনা করেছে তখন মাঝে মাঝে এরূপ আত্মবিশ্লেষণ ও সমাজের বিশ্লেষণ করেছে যা ভরতের শ্রেণী ও সমাজের লোকের পক্ষে হয়ত সম্ভবপর নয়। লেখক সেখানে অজ্ঞাতসারে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভরতের সমাজ ও শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত নন বলেই লেখকের এ ত্রুটী ঘটেছে। ভরত যে চোখে জীবন ও সমাজকে দেখ্‌ছে সে মনোভাব সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা লেখকের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। তবুও পূর্ব্বতন সাহিত্যিকদের পথ হতে লেখক সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে চলেছেন এবং বাংলার কৃষকের জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অধিকতর সত্য ও যথার্থ হয়েছে।

নিপুণ চিত্রকরের পরিচয় পেয়েছি সেখানে যেখানে লেখক দুঃস্থ জীবন ও সমাজের অমসৃণ রুক্ষতাকে রূপ দিয়েছেন। কী যৌন সম্বন্ধে, কী অর্থ, কী মৃত্যু, সবকিছুর প্রতিই যে একটা নির্ম্মম রূঢ়তা সমাজের দুঃস্থ শ্রেণীর বর্ণবিরল দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, সেখানে লেখক সত্যিকারের শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে একথা বলা চলে লেখক এই উপন্যাসটিতে নতুনতর পথ ও দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা সক্ষমভাবে করতে সমর্থ হয়েছেন।

অজিতকুমার গুহ

SARAT CHANDRA CHATTERJEE—By Humayun Kabir. Padma Publications Ltd., Bombay. Price Re. 1/4.

আধুনিক বাংলা কবিতা যেমন আজও রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে নি, আধুনিক বাংলা উপন্যাসেও তেমনই শরৎচন্দ্রের প্রভাব আজও সুস্পষ্ট। শুধু বাংলা দেশ কেন গোটা ভারতবর্ষের সাহিত্যক্ষেত্রে জনপ্রিয়তার দিক থেকে শরৎচন্দ্র অদ্বিতীয়। তাঁর অনেক বই গুজরাটি, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রূপান্তরিত হ'য়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে—এমন কি ইংরেজীতেও তাঁর দু'একখানি বই অনূদিত হ'য়ে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। সাহিত্য-শিল্প-বিচারে জনপ্রিয়তাই অবশ্য শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র প্রমাণ নয়; তবে শরৎচন্দ্রের এই সর্বব্যাপী জনপ্রিয়তার দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হয় যে তিনি বড় সাহিত্য-শিল্পী ছিলেন ব'লেই, তাঁর শিল্প নৈপুণ্যের একটা সার্বজনীন আবেদন আছে।

বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে শরৎ-সাহিত্যের মূল সুরটি ধরা খুবই সহজ—কারণ শরৎচন্দ্র ছিলেন মনে প্রাণে খাঁটি বাঙ্গালী এবং বাংলার উচ্চ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ভিত্তি ক'রেই শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-সাহিত্য গঠিত। তাছাড়া শরৎ-সাহিত্যের মূল-সূত্র-বিশ্লেষণ-মূলক কয়েকখানি সমালোচনার বইও বাংলা ভাষায় আছে। অন্য ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে কিন্তু শরৎ-সাহিত্যের মূল সুরটি বোঝা অত সহজ নয়। শরৎ-সাহিত্যের অবাঙালী পাঠক-পাঠিকার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। প্রধানত তাদের জন্যই অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ইংরেজী ভাষায় তাঁর এই পুস্তকখানি রচনা করেছেন। এ জাতীয় একখানি পুস্তকের অভাব বহুদিন থেকেই অনুভূত হচ্ছিল; অধ্যাপক কবির এ ব্যাপারে অগ্রণী হ'য়ে সকলের ধন্যবাদার্হ হ'য়েছেন।

প্রগতিশীল সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে অধ্যাপক কবিরের সুনাম আছে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাঁর 'বাঙলার কাব্য' নামক সমালোচনা-পুস্তকে আমরা দেখেছি যে সাহিত্য-বিচারে তিনি সামাজিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর সমর্থক। শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর বর্তমান সমালোচনার বইখানি তাঁর পূর্ব গৌরব বহুলাংশে বৃদ্ধি করবে—এই আমার বিশ্বাস। সমাজ এবং যুগ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে কোন সাহিত্য-শিল্পীর প্রতিভাকেই বিচার করা চলে না—বিশেষত শরৎচন্দ্রের মত সাহিত্যিক প্রতিভা যাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসের মধ্যেই সমাজ চেতনার ছাপ জাজ্বল্যমান। গোঁড়া সমালোচকদের মতে প্রচলিত সাহিত্যের মধ্যে প্রধান দুটি বিভাগ থাকে—বিশুদ্ধ রস-সাহিত্য আর উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য। আমাদের মতে কিন্তু বড় সাহিত্যমাত্রই অল্পবিস্তর উদ্দেশ্য-মূলক। সে হিসাবে শরৎ-সাহিত্যও উদ্দেশ্যমূলক। যে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে শরৎচন্দ্রের জন্ম ও পরিপুষ্টি হয়েছিল, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে তার প্রভাব সুপরিস্ফুট। এই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেই অধ্যাপক কবির শরৎ-প্রতিভার বিচার ও বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর বিচার সর্ব্বজনসম্মত না হ'তে পারে, তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব এবং যুক্তির সারবত্তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না ক'রে পারে না। মাত্র সত্তর পৃষ্ঠার মধ্যে চারটি অধ্যায়ে তিনি শরৎ-সাহিত্যের যে সুনিপুণ বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন, তা' সত্যই আমাদের ভাবনার খোরাক জোগায়। এত স্বল্প পরিসরের মধ্যে তাঁর আলোচনা অবশ্য পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারে নি—তবে তিনি মোটামুটি শরৎ-সাহিত্যের প্রধান প্রধান ভাবধারা ও চরিত্রগুলো নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তাতে অবাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের খুবই উপকার হবে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মত তাঁর নিজের জীবনও ছিল রোমাঞ্চকর; স্থানাভাব বশত অধ্যাপক কবির শরৎচন্দ্রের জীবনকে বাদ দিয়ে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। এই সিরিজের সাধারণ সম্পাদক মিঃ ইউসুফ মেহেরালী ভূমিকায় শরৎচন্দ্রের জীবন নিয়ে সুন্দর একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক কবির শরৎ-সাহিত্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রকে কোথাও অনাবশ্যকভাবে যেমন প্রশংসাও করেন নি—তেমনি প্রয়োজন মত তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনা করতেও কুণ্ঠিত হন নি। শরৎচন্দ্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী ছিলেন বটে, তাই বলে তাঁর রচনা সর্বাঙ্গসুন্দর ছিল না। তাঁর বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কিছুটা রক্ষণশীলতার খাদ যে

মেশানো ছিল, সেটাও অধ্যাপক কবিরের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। মোট কথা শরৎ-সাহিত্যের ভক্ত পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে এ বইখানি অপরিহার্য। পুস্তকখানির সম্বন্ধে একটা প্রধান অনুযোগ এই যে এমন সুন্দর বইখানা মুদ্রাকর-প্রমাদে ভরা। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে এ ত্রুটি থাকবে না।

গোপাল ভৌমিক

বনলতা সেন : জীবনানন্দ দাশ
ভানুমতীর মাঠ : অশোকবিজয় রাহা
ওপারেভে কালো রঙ : সুধীরচন্দ্র কর
কয়েকটি নায়ক : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
মনপবন : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
উলুখড় : বিমলচন্দ্র ঘোষ

সবগুলি বই-ই 'কবিতা-ভবন' থেকে প্রকাশিত, প্রত্যেকটি সিকি মূল্যের, এবং 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের অন্তর্গত।

আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশই প্রধান ব্যক্তি যার সম্পর্কে আলোচনা সাহিত্যিক অসাহিত্যিক সব মহলেই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। মফস্বলবাসী এবং স্বভাবতই নিঃসঙ্গ বলেই তাঁর এই বদনসিব কিনা জানিনা, মনে হয় আধুনিক বাঙলা কাব্যের প্রধান গতিপথ থেকে তাঁর অসঙ্কুচিত নিঃশব্দ পলায়নই এ অবহেলার মূলে। অথচ এই শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি থেকে যে নতুন কাব্যধারার প্রবর্তন এবং রবীন্দ্র-ঐতিহ্য থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা জীবনানন্দ তার একজন প্রধান, অক্লান্ত অথচ নির্জন কর্মী। তবু আজকালকার সমালোচকের মুখে তাঁর নাম আরো ঘনঘন শুনিনা তার কারণ জীবনানন্দ দাশের কবিতা একান্তরূপেই একটি বিশিষ্ট মানসিক ভঙ্গির প্রতীক, কোন নতুন ভাবধারা অথবা নবাবিষ্কৃত আঙ্গিকের বিদ্রোহী বাহন নয়। কিন্তু চরম ও পরম বিশ্লেষণে যে কোন সাহিত্যপ্রচেষ্টা, বিশেষরূপে কবিতারচনা, একটি মানসিক ভঙ্গি ও তার সার্থক রূপায়ন ছাড়া আর কী হ'তে পারে? এবং যে কবি একটি সম্পূর্ণ নতুন চেতনিক রাজ্যের ছত্রপতি তাঁর বিবক্ষার ও বক্তব্যের আঙ্গিক যে স্বতন্ত্র হবে সে তো স্বতঃসিদ্ধ।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যবিচার কঠিন, নানাকারণে। রবীন্দ্র-বিদ্রোহী হয়েও তিনি একান্তরূপেই রোমান্তিক, এমন কি তাঁর অনেক রচনাই নজরুলীয় পুনরুক্তিপূর্ণ। একজন সমালোচক একবার লিখেছিলেন যে জীবনানন্দই বাংলার সেরা প্রতীকী কবি এবং প্রতীকীবাদ বলতে মোটামুটি যদি এই বুঝায় যে তা উপমা তুলনা অলঙ্কার অনুসঙ্গের আবর্তে পাঠকের মনে এমন এক রকমের মোহ সৃষ্টির প্রচেষ্টা যার প্রধানতম গুণ কেবল একটি সুর, তাহলে এ কথা অনস্বীকার্য্য। অথচ কে না দেখেছে তাঁর কবিতা আর যা-ই হ'ক প্রতীকীবাদসুলভ বাহুল্যবর্জিত

নয়। বক্তব্যকে ঘনীভূত করবার জন্য তিনি প্রতীক ব্যবহার করেন না, বরং একটি কথায় প্রকাশ করা যায় এমন যে ভাব তাকেও তিনি প্রায়ই কয়েকটি খণ্ড খণ্ড ছবি কী চিন্তার মধ্য দিয়ে জাহির করেন। 'ইয়ার্ণ' শব্দটির সঙ্গে নাকি 'টেল্' কথাটির কী রকম যোগসূত্র আছে; সেই বিচারে অন্নদাশঙ্কর বলছেন, প্রমথ চৌধুরী আমাদের সেরা গল্পবাগীশ। কাব্যের মজলিশে চৌধুরী মহাশয়ের সেরা কাউণ্টারপার্ট জীবনানন্দ দাশ।

স্বভাবতই সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার বিদ্রোহ যে দ্বিতীয় আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে সেই সাম্যবাদী দৃষ্টিও তার নেই। শুধু 'বনলতা সেন'-ই নয়, জীবনানন্দ রাজনৈতিক কবিতা যদি লিখেই থাকেন তাহলেও তাদের সংখ্যা এককের অঙ্ক ছাড়িয়ে যাবে না।

রেখা, রঙ, আর চেতনার কোন এক অচেনা অজানা রাজ্যের একটি উদাস করুণ প্রশান্ত সুর, এই তো জীবনানন্দের কবিতা। স্বভাবতই তাঁর বেশীর ভাগ রচনা প্রকৃতি-বিষয়ে, এমন কি নিছক প্রেমের কবিতার মধ্যেও তাঁর প্রাকৃতিক প্রলেপ আমাদের বিস্মিত প্রশংসা কাড়ে। হ্যাক্সলি সাহেবের প্রতিবাদ সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় প্রকৃতির মধ্যে একটি স্বাভাবিক কোমলতা আছে, মধ্যযুগীয় ফিউডল সমাজ যার সন্ধান রাখতো। জীবনানন্দের বিশিষ্টতা এই প্রকৃতিময় প্রশান্ত ষ্টাইলে; এবং কোন্ কবিই না অনুভব করেছেন যে পয়ারের দীর্ঘ চরণগুলি যুক্তাক্ষরবর্জিত হলে এমন টেনে টেনে চলে যে ভাষায় এক রকমের নরম অবসন্ন চাল আসে। আসলে একই-সুরে-বাঁধা-শব্দসংযোজিত পয়ার একান্তরূপেই কৃষিযুগের ছন্দ। এবং জীবনানন্দ মনেপ্রাণে মফঃস্বলবাসী, কেবল সশরীরে নয়; তাঁর কাব্যে তাই পয়ারের ছড়াছড়ি।

কিন্তু এ কবির কাব্যের প্রাণ হ'ল তার অদ্ভুত মিশ্রণে: অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, পুরোনোর সঙ্গে নতুনের, অসম্ভবে-সম্ভবে, অবিশ্বাস্যে-বিশ্বাস্যে, গ্রামের সঙ্গে নগরের অপূর্ব সংযোজনে। বিদিশা, শ্রাবস্তী আর সিংহল সমুদ্রতীর ছেড়ে যেই এসে দেখি 'নাটোরের বনলতা সেন' তার 'পাখীর নীড়ের মতো চোখ মেলে' বলে 'এতদিন কোথায় ছিলেন,' আকস্মিক বিস্ময়ের বিদ্যুৎস্পর্শে আমরাও শিহরিত হই। এত দূর আর এত কাছে, এই মিলিয়ে জীবনানন্দের টেকনীক।

জীবনানন্দও বিষ্ণু দে'র মতো সুন্দর পঙক্তিপ্রধান কবি। তাঁর এক একটি উপমাই একটি কবিতার স্বাদ আনে এবং সে উপমা বেশীর ভাগ সময়েই বক্তব্য স্বচ্ছ ও অর্থকরী করবার জন্য ব্যবহৃত হয় না, কেবলমাত্র একটি আবহাওয়া সৃষ্টিই তাদের উদ্দেশ্য। স্বভাবতই রচনা মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে, একটি ভাবের সঙ্গে অপর একটি বক্তব্যের সুদূরতম যোগসূত্র আবিষ্কারও দুরূহ ব্যাপার। সাধারণ পাঠক অন্ধকার দেখতে পারেন, জীবনানন্দ এলিওটের উদ্ধৃতি তুলে বলবেন, কবিতার জন্যই কবিতা।

আর কিছু না হক, ঠিক এই কারণে ভালো লাগতে পারে অশোকবিজয় রাহার 'ভানুমতীর মাঠ'। কবিত্ববর্জনই যখন নতুন কবির আদর্শ, সেই মুহূর্তে তাঁর এই অকুণ্ঠিত, উচ্ছ্বসিত, নির্ভুল কবিত্ব করা সত্যই আশাতীত। একটু আলো, একটু অন্ধকার; কিছু ছায়া, কিছু কায়া; সব মিলিয়ে জানা-অজানার ঝিলিমিলিতে দেখা একটি ভারি মজার দেশ, যদিও

সে দেশে ঢুকতে গিয়ে অশোকবিজয় ধরেছেন সত্যেন দত্ত, সুকুমার রায়ের পায়ের ছাপ। কিন্তু অশোকবিজয়ের বিরুদ্ধে আমার নালিশ কবিতাগুলিকে তিনি কেন আরো সংক্ষিপ্ত করেন নি। ফ্যাণ্টাসির সম্মোহ ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ আমরা আকস্মিক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে থাকি; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চমক কাটতে থাকে, তার পরেও যদি ফ্যাণ্টাসি চলে তাহলে তা ফ্যাণ্টাষ্টিক লাগবেই। 'ভানুমতীর মাঠে'ও ভাবাবেগ, কিছুদূর এগুবার পর, ভাবালুতায় ক্লান্তিকর।

'এক পয়সায় একটি' সিরিজ প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল, যতদূর মনে পড়ে, আধুনিক কাব্যকে ছড়িয়ে দেওয়া। 'আধুনিক' শব্দটি গোলমেলে। তবু রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের ছায়া-মুক্তিকেই আমরা মোটামুটিভাবে আধুনিকতার মাপকাঠি ধরেছিলাম। সেই অর্থে এই গ্রন্থমালায় সুধীরচন্দ্র করের 'ওপারেতে কালো রঙ' ছাপানো নিরর্থক, যদিও তাঁর কবিতার সরল অনাড়ম্বর মনোরম ভঙ্গি সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে। মনে হয়, ভাষার এই স্বচ্ছতা, ছন্দের অনায়াস ভঙ্গি, কল্পনার প্রত্যক্ষতা আধুনিক কবিতায় কেনই-বা থাকবে না?

দেবীপ্রসাদ যদিও একেবারে দুর্বোধ্য নন তবু তাঁর রচনাতেও সেই আধুনিকতার আলগা প্রলেপ; কবিতা যেন ভঙ্গিসর্বস্ব, দু'এক পাতা উল্টোতেই বুঝতে পারি কথার আঁকাবাঁকা অপরিচিত প্রয়োগে কবিতা 'ক্লেভার' হলেও কাব্যবস্তুটা হাতছাড়া হয়েছে। অথচ সাধারণ নিরর্থক শব্দচয়ন, খণ্ডিত বাক্য, দুর্বল ভাষায় আঙ্গিকের বাহাদুরীও ব্যর্থ। এই জাতীয় রচনায় সমর সেন যে ওস্তাদি দেখিয়েছেন তার কারণ তার ভাষার ঠাসবুনানি, বক্তব্যের গাঢ়তা। তা ছাড়া দেবীপ্রসাদের মনটাই রোমাণ্টিক, 'কয়েকটি নায়কের' একাধিক কবিতায় মিলবে তার নজির। অথচ কী আশ্চর্য্য, রোমান্তিকতার বিরুদ্ধেই তাঁর বিদ্রোহ! কী ক'রে অস্বীকার করি বর্দ্ধিষ্ণু ধনতন্ত্রের মতোই স্ববিরোধী আমাদের আজকালকার অনেক কবি ও কবিতা।

ভারি ভালো লাগে তাই মঙ্গলাচরণের অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ দৃষ্টি। তার কবিতার চালটা হালকা হলেও অভিজ্ঞতার নির্ভেজাল সত্যতা অনস্বীকার্য্য। মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের অসহ্য গ্লানি আরো অনেক কবির মতোই তার কাব্যে হতাশার সুর এনেছে। সে সুর এতই বিষণ্ণ ক্লান্ত অবসন্ন যে তর্ক করতে ইচ্ছে হয় না। তবু তাকে স্মরণ করিয়ে দেব, নিছক ব্যঙ্গ ক'রে বড় সাহিত্য হয় না। এবং আশা করব মঙ্গলাচরণের কবিতাও আঙ্গিকের অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলবে না, বক্তব্য বস্তুর গভীরতা ও নিবিড়তায় প্রাণবন্ত হবে।

অথচ এতদিন ধরে বাংলা কবিতার আসরে আমরা যে আঙ্গিক আঙ্গিক করে গলা ফাটালাম তাও ব্যর্থ হয় নি। এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই রবীন্দ্রভক্তেরা এবং তৃতীয় দশকে নজরুল-অনুবর্তী কবিতালেখকেরা শিথিল ক্ষয়িত ছন্দে, অক্ষম দুর্বল শব্দচয়নে, হাজারবার-বলা ভাবে ও ভঙ্গিতে যে নপুংসক পঙ্গু কংকালসার কবিতাশিশুর জন্ম দিচ্ছিলেন তার থেকে নিস্তার পেতেই প্রয়োজন ছিল সুধীন দত্তের অভিধানবিহার, বিষ্ণু দে'র পাণ্ডিত্যের ছলাকলা এবং সমর সেনের টেলিগ্রাফিক নিবিড় সংক্ষিপ্তি। তবু এতো ক'রেও কী ভাষাসমস্যা মিটলো? তাই এতদিন পরে আমাদের ভাববার সময় হয়েছে, অগ্রগতি কোন্ পথে। মনে হয়, বাংলা কবিতার মুক্তি বক্তব্যের নূতনত্বে। এবং কথা আসলে ভাষা কী আটকে থাকতে পারে?

বিমলচন্দ্র ঘোষের কোন কোন রচনা পড়ে আশান্বিত হয়েছিলাম এই কারণে। নবীন লেখকদের মধ্যে তিনি সেই দু'চারজনের অন্যতম—আধুনিকতা যাদের মোহ নয়। তাঁর কবিতায় ভঙ্গিটা অপ্রধান, বলবার কথাই বড়; এবং যেহেতু সে কথা তাঁর আন্তরিক অভিজ্ঞতা-সম্ভূত এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যরঞ্জিত স্বভাবতই তাঁর ভাষাও কিছুটা স্বতন্ত্র। কিন্তু এসব কথা 'উলুখড়' সম্পর্কে খাটে না। বিমলচন্দ্র এই কাব্যছড়াগুলি ছড়িয়েছেন সেই সব সবুজ মুহূর্তে যারা দিনযাপনের প্রাণধারণের দুঃসহ মরুভূমিতে এসে মাঝে মাঝে সোনা ছড়িয়ে যায়। আর আমরা বলে উঠি :

ছোট্ট একটি কালের ঘোরে বেঁচে থাকার গভীর মোহ আছে বলেই বেঁচে আছি।

আবুল হোসেন

সঞ্চারী ঃ বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঃ কবিতা-ভবন, ২০২, রাসবেহারী এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

'সঞ্চারী' বিমলাপ্রসাদের দ্বিতীয় কবিতার বই। ভাষার সাবলীলতা ও প্রকাশভঙ্গীর সহজ স্ফূরণের জন্যে এবং বর্ণনাভঙ্গীর দিক থেকে বইখানি পরিণত বলে মনে হলো। কবিতাগুলো অবশ্য মোটামুটি আত্মকেন্দ্রিক; লেখকের নিজের ব্যক্তি-জীবনই প্রধান হয়ে উঠেছে এবং নানা রঙ-বেরঙের টুক্‌রো-টুক্‌রো ছবির মধ্য দিয়ে নিত্যি-তিরিশ দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভাষা পেয়েছে। প্রথম দিকের কয়েকটি কবিতায় কবিমন পুরোনো দিনের স্মৃতি-সন্ধানী, মাঝের কয়েকটি কবিতা অর্থঘনতার জন্যে উপভোগ্য; আর শেষের কবিতাগুলো মৃদু ব্যঙ্গ ও নাটকীয়তায় সিঞ্চিত হ'য়ে খানিকটা কৌতুকরস পরিবেষণ করিতে পেরেছে।

বিমলাবাবুর কবিতায় সমস্যাপীড়িত পৃথিবীর নৈরাশ্য ও তিক্ততা অনুপস্থিত। বড়ো-বড়ো বিষয়ে ছোট কথা না বলে ছোট-ছোট বিষয়ে বড়ো কথা বলবার প্রচেষ্টা এর একটা কারণ হ'তে পারে। মোটের ওপর বক্তব্যকে যে সার্থক ভাবে পাঠকের সামনে উপস্থিত করতে পেরেছেন সেইটেই বিমলাবাবুর কৃতিত্ব।

পৃথ্বী-মেখলা অনাদি সাগর প্রথম সৃষ্টি হ'তে
আজিও যে কথা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দেয় আকাশপ্রান্ত পথে,
বিজন বনের ফাঁকে ঝিলিমিলি হাওয়া
অসম্পূর্ণ কবিতার শেষ-চাওয়া
সবুজ তারার স্তিমিত প্রদীপ স্বপ্নপুরীর দেশে
মায়াবীর সুর পাহাড়ের দূর তোমার ছবিতে মেশে।
—'প্রক্ষিপ্ত'

'সঞ্চারী'র কয়েকটি গদ্য-কবিতা বিশেষ ক'রে 'সেরিনেড', 'প্রতিষ্ঠা', 'শাড়ী' উল্লেখযোগ্য। গদ্যকাব্যের বাঁশী সবাইর হাতে বাজে না। গোড়ার দিকে যাঁরা গদ্যকাব্য ধরেছিলেন তাঁদের অনেকেই আবার গদ্য ছেড়ে মিলের কবিতা লেখা শুরু করেছেন। বিমলাবাবু কিন্তু গদ্যে নিজস্ব

একটা রীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন বলে' মনে হ'লো এবং 'সঞ্চারী'তেই তার প্রমাণ বিশেষভাবে রয়েছে। এই ধরণের গদ্যকাব্যে ভাবনা কি ভাষা কোনোটারই জটিলতা নেই বলে তা' অনায়াসেই সর্ব্বজনগ্রাহ্য হ'তে পেরেছে।

'সঞ্চারী'র কবির শব্দ-যোজনা সুন্দর, চমকপ্রদ মিলের ব্যবহার মুন্সীয়ানার পরিচয় দেয়, এখানে-সেখানে অনেক সুন্দর পংক্তি ছড়িয়ে রয়েছে যা মনকে না নাড়া দিয়ে পারে না।

ভালোবেসেছিনু একদা দিনের রাত্তের সন্ধিক্ষণ।
ঘুরিছে পরাণ তোমার কেন্দ্রে কর্ষণ-ভারাতুর।
জেনেছি এবার কোথা ফোটে মোর গোলাপের অঙ্কুর।
(ট্রায়াড্‌স্)

এবং এই ধরণের চিত্তাকর্ষক লাইন 'সঞ্চারী'তে আরো পাওয়া যাবে। একমাত্র যা নেই তা হলো সমসাময়িক পৃথিবী ও সমাজ-জীবন সম্পর্কে কবির সচেতনতা। আধুনিক কবি আজকালকার পৃথিবীকে কী ভাবে দেখবেন তা জানতে পাঠকমাত্রেই আগ্রহশীল। সংঘাতময় এমন একটা পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আমরা বাস করছি যার প্রভাবকে অস্বীকার করা সহজ নয়। বিমলাপ্রসাদের কাব্যের বিষয়-বস্তু এখন পর্য্যন্ত যথেষ্ট ব্যাপক নয় বলেই হয়তো সমসাময়িক সমাজ-জীবনের অভিব্যক্তির ছায়া তাঁর কাব্য থেকে বাদ পড়েছে। বিমলাবাবুর কবিত্বশক্তিতে আস্থাবান বলেই আশা করছি অদূর ভবিষ্যতে তাঁর কবিতায় নতুন সুর-যোজনা করে তিনি আধুনিক পাঠকের দাবী মিটাতে পারবেন। নিচের কয়েকটি পংক্তিতে ঃ

পাখীরা থাকে মৌন ও মূক পালক-ঝরার বেলায়;
তাহাদের সেই স্থাবর স্থানুতা আমার মুখেতে আঁকা।
পর-নির্ভর শিশুর মতই সব কিছু পাই নিয়মিত,
একটি মহিলা-মালিক আমায় আঁচলে বেঁধেছে আজীবন।

ঘুণে-ধরা মধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তব চিত্র ধরা পড়েছে এবং যে-কবি এই 'স্থবির স্থানুতা'র হাত থেকে আত্মরক্ষার পথ বাৎলে দেবেন তিনিই যে সত্যিকারের কবি সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কোনো-কোনো বাঙ্গালী কবি অবশ্য এই বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই ভাবতে শুরু ক'রেছেন যদিও তাঁদের কাব্যে তা অখণ্ড রূপ নিয়ে আজো সুপরিস্ফুট হতে পারে নি। কিন্তু ইতিমধ্যে 'সঞ্চারী'তে যা পাওয়া গেলো তার মূল্যও বড়ো অল্প নয় এবং সত্যিকারের ভালো কবিতার ওপর যাঁদের ঝোঁক্ আছে 'সঞ্চারী' পড়ে তাঁরা বিরূপ হবেন না বলে' আশা রাখি।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

POETS OF TO-MORROW—The Hogarth Press. 6s.

কবিদের খেদোক্তি এই: একদা কবিরা যে সমাদর লাভে অভ্যস্ত ছিলেন বর্তমানে তা' আর সহজলভ্য নয়; অতীতে তাদের ভাগ্যে রাজসম্মান বা রাষ্ট্রীয় সম্মান ছিল প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা। কিন্তু সম্প্রতি এই অভ্যাসের ব্যতিক্রম ঘটেছে। তাছাড়া সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক

নানা ভাঙাগড়ার বিপর্যয়ের মধ্যে কাব্যের প্রধান রসবেত্তা সেই জনসাধারণের গ্রহণশীলতাও ক্রমশঃ অনুদার হয়ে এসেছে, এতাবৎ কাব্যামোদীর কাছে রসঘন পঙক্তির পরিবর্তে আজ রেসচক্রের অশ্বই বেশি আকর্ষণীয়। আজ তাদের কাছে মননশীলতার সূক্ষ্ম কারুকার্যের দাম নেই, দাম আছে শুধু কোনো পরুষ উত্তেজনার। সুতরাং একদিকে অতীতের সেই সপ্ত রঙীন অস্তাচল, অপর দিকে একদা রসলোভীদের সাম্প্রতিক নিঃসাড় চেতনার পরিচয় পেয়ে যদি তরুণ কবিগণ এতদিন সত্যিই অভিমানের খোলসে নিজেদের স্বধর্ম মুড়ে রেখে থাকেন তো খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় কি! বরঞ্চ আজ অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা মেটাতে কাব্যচর্চা ছেড়ে যদি একান্তই কার্থবার্টসানের ইশতাহার অনুবাদ বা জমিদারী সেরেস্তায় দুইয়ে আর দুইয়ে চার করতে হয় তো তাদের দোষ দেবে এমন স্পর্ধা আছে কার!

আশার কথা এই, ইংলণ্ডের আকাশের ঘোলাটে রঙ এবার একটু ফিকে হয়ে আসছে, চাকাও অন্যদিকে প্রায় ঘুরতে সুরু করেছে। কবিদের সুদীর্ঘ অভিমানের অবসান হোল এবার?

প্রারম্ভে প্রথম চারজন আগন্তুকের কথাই ধরা যাক—যাঁদের প্রকাশক বলেছেন, 'Poets of To-morrow'। যাঁরা সমবয়স্ক, কেউই ত্রিশের কোটা অতিক্রম করেন নি।

সর্বপ্রথমে পিটার হিউএটই উল্লেখযোগ্য। এবং তারও আগে কবিতা সম্পর্কে তাঁর সহজ সত্য মন্তব্য: Modern times require a new synthesis of personal life with political and social ideas মনে রাখলে তাকে উপলব্ধি করাও সহজ হবে। তার প্রত্যেকটী কবিতাতেই তার এই উক্তির অদৃশ্য স্বাক্ষর বর্তমান। হিউএটের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে তার বলিষ্ঠ জীবনবাদ। পৃথিবীজোড়া মহাসমরের বিরাট ভয়ঙ্কর পক্ষপুটের নীচে যখন সবাই করুণ আর্তনাদে ককিয়ে উঠেছে, যখন 'বুলেট-ডেথ' যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের চকিতে স্পর্শ করে যেতে পারে তখন—Let us live, that every wind or smell can have its valid and remembered place এই সুকঠোর ঘোষণা সত্যিই অপূর্ব লাগে। দুনিয়ার সাম্রাজ্যলোভী দাম্ভিক শক্তিগুলোর অবিচার অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে অনেকেই যখন পরাঙ্মুখ হয়েছেন, তখন রক্তাক্ষর সাজিয়ে তিনিই তাদের শুনিয়ে দিয়েছেন:

Blood rushes too with pain.....where gangster batons batter, helpless brains and the nerves scream.

জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যুদ্ধের তাণ্ডব লীলা—কিন্তু এই বিভীষিকার মধ্যে থেকেও পরম সুন্দর প্রেমকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। এক প্রান্তে Blood over China অপর প্রান্তে meanwhile the moon is yours—এ কল্পনা শুধু তিনিই করতে পারেন যিনি ধ্বংসকেই চরম কথা বলে মেনে নেন নি, স্রষ্টার মত সৃষ্টিকেও বসিয়েছেন ধ্বংসেরই পাশাপাশি।

আদর্শের দিক থেকে এইচ ম্যালালিউ হিউএটেরই সহযাত্রী। তবে তাঁর পদক্ষেপ আরও স্পষ্ট, আরও দৃঢ়তাব্যঞ্জক। মৃত্যুর কথা চিন্তা করে কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে হিউএটও বলেছিলেন—

Suspend our flying
Not with a flaming crush but a flutter like a paper plane.

কিন্তু ম্যালালিউ কণামাত্র হতাশার ধার ধারেন না। Tears are no use: we have the will. Now let us show the might—এত উদ্দীপনা তাঁর। মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তিনি নিঃসন্দিহান। আমাদের করণীয় কর্তব্য শুধু—

Reshuffle the alphabets and order words as guns,
To discharge their shells into the doubtful ear.
Ours is not the unquestioning strength of stones,
But the future is near us and our line is clear.

রাথভেন টড্ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয়—তার এক ডজন কবিতার মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতার আভাস নেই। দু'একটী রচনায় মিষ্টিসিজমের পেলব স্পর্শ থাকলেও সেগুলো কোথাও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে নি। "My poems try to be poems, and to be simple—তাঁর এই নিরহঙ্কার উক্তি অত্যুক্তি নয়।

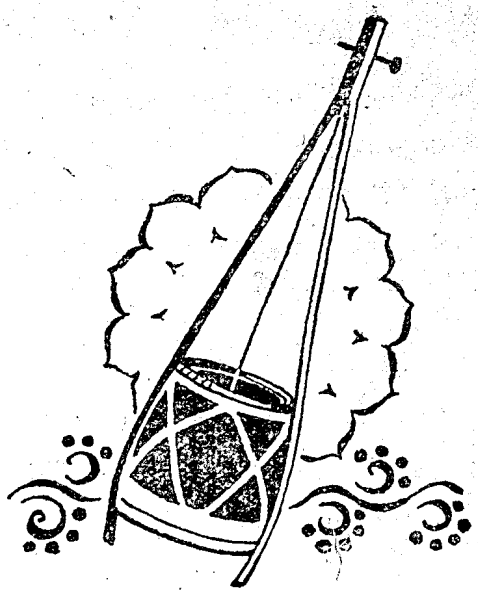
একমাত্র রবার্ট ওয়ালার ভিন্ন পূর্বোক্ত তিনজন কবির রচনাতেই বর্তমান সংঘর্ষ ও সংঘাতের রেখাপাত ঘটেছে। যা অনিবার্য তা' ঘটবেই, নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলে চলবে না। —তিন জনেরই সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই। আজ পৃথিবীর পট পরিবর্তনের সময় আগতপ্রায়। —কারণ the map has grown. আজ— I was quite happy dreaming and had no fear, এই ক্লীব উক্তি আত্মহত্যার সামিল। কারণ, from the map, a gun is aimed at me.

রবার্ট ওয়ালার সম্পর্কে বেশি বাক্যব্যয় নিরর্থক। The idea must be to subordinate oneself to the use of the contemplative imagination which is the chief means of bringing tranquility, whatever disorder there may be in one's life— এই প্রস্তাব বিংশ শতাব্দীতে কেউ সমর্থন করবে না।

পূর্ণেন্দু সেন

Published and Printed by K. C. Banerjee at the Modern Art Press, 1/2, Durga Pituri Lane, Calcutta. Edited by Humayun Kabir. Office: 36, Ahiripukur Road.

কাব্য অনুরাগীদের জন্য



একটি সুচিন্তিত, সুলিখিত বই

হুমায়ুন কবিরের

বাঙলার কাব্য

আলাওল থেকে রবীন্দ্রপরবর্ত্তীযুগ পর্য্যন্ত কাব্য-প্রেরণার পশ্চাৎপটে কবির অন্তর্লোকের সঙ্গে বহির্জগতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব যুগে যুগে কাব্যকে রূপায়িত করেছে। সমাজমননের সঙ্গে কাব্যের এই যোগসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা বাঙ্‌লা ভাষায় এই প্রথম। গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রামাণিক গবেষণা দ্বারা বহু প্রচলিত মতামতের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। নানা তর্কসাপেক্ষ বিষয়ের অবতারণার জন্য বইখানি অতি শীঘ্র সুধীসমাজে গভীর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবে।

যথাযথ শব্দপ্রয়োগে, বাক্যের নির্দ্দিষ্ট মিতব্যয়িতায়, ভাবের ঘনসন্নিবদ্ধতায় বাঙ্‌লায় এরকম সমালোচনী ভাষা এর পূর্ব্বে কেউ ব্যবহার করেন নি।

নিখুঁত ছাপা ও বাঁধাই। দাম দেড় টাকা

গুপ্ত রহমান এ্যাণ্ড গুপ্ত



৫-১, রাময় রোড্, কলিকা

চতুরঙ্গ

[পঞ্চম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা আষাঢ় ১৩৫০]

মুসলীম রাজনীতির হেরফের

হুমায়ুন কবির

মুসলমান ও হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে জীবিকা ও ক্ষমতার ভাগাভাগিই সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূল কারণ, কিন্তু প্রায় সকল দেশেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী জনসাধারণকে চালনা করে বলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্যাগুলিই সমাজের বড় সমস্যা বলে মনে হয়। এ রকম দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের ফলে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনাও বেড়ে যায়, এবং একথা স্বীকার করতেই হবে যে মুসলমান গণমানসের সম্বুদ্ধ চেতনার জন্যই সম্প্রতি লীগের প্রভাব এতখানি বেড়েছে। গত কুড়ি পঁচিশ বৎসরের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে মুসলমান জনসাধারণের যে নবজাগরণ, তার শক্তি ও উদ্যমকে ভারতীয় কংগ্রেস এখনো কোন সংগঠনী খাদে আনতে পারে নি। নবজাগ্রত গণচেতনার পক্ষে নিছক রাজনৈতিকের চেয়ে ধর্ম্মমিশ্রিত আহ্বানের আবেদন ঢের বেশী, তাই কংগ্রেসের ইতিহাসেও এরকম আবেদনের পরিচয় মেলে। সেই ধর্ম্মীয় খোলস ব্যবহার করেই লীগ মুসলমান জনসাধারণকে টানবার চেষ্টা করেছে এবং অনেকটা সফলও হয়েছে। তার ফলে কেবল যে লীগের প্রভাব আশ্চর্য্য রকম ভাবে বেড়ে গিয়েছে, তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মুসলীম লীগের সংগঠন ও প্রকৃতিরও বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পরে কংগ্রেস যে পরিমাণে সক্রিয় আন্দোলন বাদ দিয়ে নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ছিল, ঠিক সেই পরিমাণে লীগ কংগ্রেসের লক্ষ্য ও কর্ম্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর উঁচু করে তুলছিল। তার ফলে লীগের

ক্ষমতা ও খাতির দুই-ই অত্যন্ত বেড়ে গেল। লীগের ক্রিয়া-কর্ম্মে ভব্যতা অবশ্য বাড়ে নি বরং ভীষণভাবে কমেছে, কিন্তু লীগের আভ্যন্তরীণ সংগঠনে যে বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তন, এটাও তারই নিদর্শন। পূর্ব্বে লীগের বৈঠক ছিল অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত আশরাফ মুসলমানের আদবকায়দা দোরস্ত সখের মজলিস, সরকারী ও বিষয়সম্পত্তির গুরুতর কাজকর্ম্ম শেষ করে সেখানে এসে দু চারটী নরম গরম বুলি ছেড়ে দেশ সেবার দাবী মেটানোর আড্ডা—আর এখন তা হয়ে দাঁড়াল রগচটা আতরাফ মুসলমানের রাজনৈতিক আখাড়া, সমস্ত যুক্তি, তর্ক ও বিচার বাদ দিয়ে আশা, আশঙ্কা ও ক্রোধের লীলাক্ষেত্র। এ পরিবর্ত্তন বিস্ময়কর কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়কর জিন্না সাহেবের ভাগ্যবিড়ম্বনা। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে কংগ্রেস যখন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও সক্রিয় আন্দোলনে নামছিল, জনসাধারণের ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্যই তিনি সেখান থেকে পলায়ন করলেন, অথচ তাঁর ললাটের লিখন যে তাঁরই হাত দিয়ে পূর্ব্বেকার নিয়মতান্ত্রিক ও নরমপন্থী লীগে ধীরে ধীরে সংগ্রাম মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে। তাও হল এমন সময় যখন কংগ্রেস সংগ্রাম ছেড়ে ক্রমে নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে ঝুঁকছে। মনে প্রাণে উকিল—জিন্না সাহেবের এই হল ঠিক পরিচয় এবং উকিল হিসাবে নিয়মতান্ত্রিকতা তাঁর একেবারে মজ্জাগত। আইনসভাতে তাই তাঁর জুড়ি মেলা ভার—সেখানে আইনের মারপ্যাঁচের মধ্য থেকে ফাঁক বের করে তার পূর্ণ সুযোগ সুবিধা গ্রহণেই তাঁর আনন্দ। নিয়মতান্ত্রিক ক্ষেত্রের বাইরে কিন্তু তিনি অসহায়। যে সব বিষয়ে আইনের ধারা কোন কথা বলে না, অথবা রাজনৈতিক সমস্যা যেখানে শক্তির উলঙ্গ দ্বন্দ্বে আত্মপ্রকাশ করে, সেখানে আইনজীবি জিন্না আর কূল খুঁজে পান না। যে সব গুণের জন্য পার্লামেণ্টারী দলের নেতা হিসাবে তাঁর সাফল্য, সেই সমস্ত গুণই সংঘর্ষ ও সংকটের দিনে বিপ্লবী জনসাধারণের নেতৃত্বের বেলা দোষ হয়ে দাঁড়ায় বলে তিনি বিপ্লবী নেতা হবার একেবারে অযোগ্য। তাই এবার মহাযুদ্ধ যেদিন বাধল, কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব বর্জ্জন করে আবার সংগ্রামশীলতার দিকে ঝুঁকে পড়ল, প্রত্যক্ষ ও বে-আইনী আন্দোলনের হাওয়া উঠ্‌ল, সে সময় আমরা দেখি যে লীগ তার পূর্ব্বের সমস্ত সংগ্রামশীলতার ভাণ বর্জ্জন করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় ও তার অনুগ্রহের ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র চালাবার জন্য উদগ্রীব।

তা সত্ত্বেও লীগের পরিবর্ত্তন হয়েছে। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের মতন লীগও ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করে। সে সময় লীগও বলেছিল যে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের সমন্বয়ে স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সংগঠিত

করতে হবে, কিন্তু সেদিনও কংগ্রেসের সঙ্গে কার্য্যক্রম নিয়ে লীগের মতভেদ ছিল। কংগ্রেস চেয়েছিল যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো গণপরিষদের দ্বারা নির্দ্ধারিত হবে, কিন্তু লীগ তাতে রাজী হয় নি, বলেছে যে গণপরিষদে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মতামত কোন আমল পাবে না। ভারতবর্ষকে হিন্দু ও মুসলমান অঞ্চলে ভাগ করবার প্রস্তাবও অনেকবার উঠেছে কিন্তু ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত লীগ এরকম কোন ভাগাভাগির প্রস্তাব গ্রাহ্য করে নি। ১৯৪০ সালে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার ইস্তফার কিছুদিন পরে লীগ হঠাৎ ঘোষণা করে বসল যে হিন্দু ও মুসলমান প্রদেশগুলির জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনই ভারতীয় সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। অবশ্য সে দুটী যুক্তরাষ্ট্রেও বিভিন্ন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য ধর্ম্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক অধিকারের জন্য প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতে হবে।

কংগ্রেস, লীগ, মহাসভা, কৃষকপ্রজা সমস্ত দলেরই তাই লক্ষ্য স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্থাপনা। যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা নিয়ে কিন্তু বিবাদ অনেক। কংগ্রেস চায় যে স্বতন্ত্র ও স্বনিয়ন্ত্রণশীল প্রদেশসমূহের সংযোগে যে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে, তার হাতে দেশ রক্ষা, বৈদেশিক সম্বন্ধ, যানবাহন ও চলাচল, শুল্ক ও মুদ্রার ভার থাকবে। বাকী সমস্ত ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক রাষ্ট্রের হাতে। লীগও চায় যে এ সমস্ত বিষয় যুক্তরাষ্ট্রের হাতে থাকবে, কিন্তু লীগের পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্র হবে দুটী; এবং তাদের কার্য্যক্রমকে পরিচালনা করবার জন্য কোন কেন্দ্রিয় শাসনযন্ত্রকে স্বীকার করতে লীগ প্রস্তুত নয়। মহাসভার পরিকল্পনাকে লীগ পরিকল্পনার ঠিক উল্টো বলা চলে। বাহ্যত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করে নিলেও মহাসভার লক্ষ্য কেন্দ্রিয় রাষ্ট্রযন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি, এবং তার ফলে যদি সংগঠনকারী রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হ্রাস হয়ে তারা স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশে রূপান্তরিত হয়, তবে তাতেও মহাসভার কোন আপত্তি নেই। কৃষকপ্রজা আন্দোলনের পরিকল্পনার সঙ্গে কংগ্রেসের পরিকল্পনার পার্থক্য দুইটী। স্বনিয়ন্ত্রণশীল প্রদেশের বদলে কৃষকপ্রজা আন্দোলন স্বাধীন খণ্ডরাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি করতে চায়। তাছাড়া, কৃষকপ্রজা আন্দোলন স্বনিয়ন্ত্রণশীল ও স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের স্বেচ্ছাধীন মিলন ও স্বতন্ত্রীকরণের ভিত্তিতে যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে, সেখানে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে মজুর ও চাষী অর্থাৎ দেশের অগণিত জনসাধারণের স্বার্থেই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে এতদিন পরে হঠাৎ ১৯৪০ সালে ভারতীয় ঐক্য

অস্বীকার করে লীগ দুই যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকল কেন? সংস্কৃতিগত বিলোপের আশঙ্কাই বোধ হয় লীগের এ মত পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ, যদিও প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের আমলে ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া থেকেই তার সূত্রপাত। হিন্দুদের মধ্যে একটী বিপুল অংশের গোঁড়ামীর ফলে লীগ মুসলমান সমাজে এ আশঙ্কা সংক্রামিত করতে পেরেছিল। হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই ভারতের রাষ্ট্রিয় নবজন্ম ও হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের মধ্যে কোন তফাৎ দেখেন নাই। তাঁদের রাষ্ট্রচিন্তায় অখণ্ড ভারতের যে রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে, তারই বিরুদ্ধে লীগের পরিকল্পিত ভারতবিভাগের প্রস্তাব উঠে। কেন্দ্রিয় সার্ব্বভৌমিকতায় স্বৈরাচারের যে সম্ভাবনা, তার প্রতিবাদ হিসাবে লীগের এ দাবী বোঝা যায়। কিন্তু একমাত্র প্রতিবাদ ভিন্ন লীগের পরিকল্পনার নিজস্ব কোন সার্থকতা নাই। পাকিস্তানের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় অভিযোগ এই যে তাতে কোন সমস্যারই কোন সমাধান মেলে না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রশ্ন পাকিস্তানেও থাকবে। বর্ত্তমানে যেমন, তখনও তেমনি কোনোখানে হিন্দুর, কোনোখানে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য থাকবে। এক যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত স্বনিয়ন্ত্রিত খণ্ডরাষ্ট্রে যদি সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়গুলি পরস্পরের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার প্রশ্নের কোন সমাধান করতে না পারে, তবে সেই সম্প্রদায়গুলিই যে দুই যুক্তরাষ্ট্রের আমলে সে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে, তার ভরসা কি? এক যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সমাধানের যেটুকু অবকাশ, দুই যুক্তরাষ্ট্রে তাও নাই। বরং তখন দুটী যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতভেদ ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা সর্ব্বদাই থাকবে, এবং তার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত খণ্ডরাষ্ট্রেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য ও সংঘাতের আশঙ্কা আরো বেড়ে যাবে। ভারতীয় নিরাপত্তাও তাতে ব্যাহত হবে, কারণ যুযুধমান স্বার্থের দ্বন্দ্বে বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তি ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নানা রকমে হস্তক্ষেপ করবার সুযোগ ও অবকাশ পাবে।

অনাবিল ও মুক্তবুদ্ধির বিচারে একথা নিঃসন্দেহ যে স্বাধীন ও স্বনিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক খণ্ডরাষ্ট্রের সংযোগে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রই হবে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রিয় রূপ। এবিষয়ে মতভেদের কোন অবকাশ নাই, কিন্তু যখনই খণ্ডরাষ্ট্রগুলির ভিত্তি ও প্রকৃতি অথবা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা ও স্বরূপ নির্ণয় করতে চেষ্টা হয়, তখনই নানারকম মতভেদ বেরিয়ে পড়ে। দুটী প্রশ্নেই লীগের বক্তব্য অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট। খণ্ডরাষ্ট্রগুলির আয়তন, প্রকৃতি অথবা রাষ্ট্ররূপ কি হবে সে সম্বন্ধে লীগ নির্ব্বাক। যুক্তরাষ্ট্রের বেলায়ও লীগ কেবলমাত্র বলে দুটী যুক্তরাষ্ট্র হবে, তাদের সংগঠন অথবা

খণ্ডরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধের প্রশ্নে লীগ কিন্তু কোন কথা বলতে চায় না। কংগ্রেসের দাবী যে ভারতের জনসাধারণ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারে যে গণপরিষদ নির্ব্বাচিত করবে, সেই গণপরিষদই এ সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করবে। লীগের কিন্তু গণপরিষদে ঘোর আপত্তি। লীগ বলে যে স্বাধীনতা অর্জ্জনের আগে গণ-পরিষদের সংগঠন কোন দিন হয় নি, হতে পারে না; আর যদি কোন রকমে ভারতবর্ষে তা সম্ভব হয়ও, তবে তা হবে মোসলেম স্বার্থের বিরোধী। এ রকম গণপরিষদে মুসলমানেরা হবে সংখ্যালঘু। কাজেই রাষ্ট্রগঠনের ব্যাপারে যেখানে সংখ্যাগুরু হিন্দুর সঙ্গে সংখ্যাল্প মুসলমানের মতভেদ হবে, সেখানেই মুসলমান সম্প্রদায়ের মতামত টিঁকবে না। লীগের আপত্তির মূলে এই ধারণা যে ধর্ম্ম-সম্প্রদায় এক হলে রাজনৈতিক মতামতও এক হতে বাধ্য। জন্মগত কারণে হোক, অথবা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার ফলে হোক, একবার এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হলে সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে একমত না হয়ে আর উপায় নাই।

লীগের এ ধারণা যে কত ভ্রান্ত সেকথা তর্ক করে বোঝাতে হয় না। আমরা প্রতিদিন দেখি যে ধর্ম্মমতে মিল সত্বেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে মতের দারুণ অমিল রয়েছে। ইয়োরোপের প্রায় সকলেই খৃষ্টান, কিন্তু তাই বলে সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব কি অন্য কোন মহাদেশ থেকে কম? তুর্কীরাও মুসলমান, আরবী ইরাকীরাও মুসলমান, অথচ মুসলমান তুর্কীর শাসন ধ্বংস করবার জন্য মুসলমান আরবী ইরাকীরা খৃষ্টান ইংরাজের সাহায্য নিতে এক মুহূর্ত্তও দ্বিধা করেনি। ধর্ম্ম ব্যাপারে মতামত এক জিনিষ, সাংসারিক ক্রিয়াকাজে মতামত অন্য জিনিষ। তা সত্বেও লীগের আশঙ্কা দূর করবার জন্য কংগ্রেসের অবিসম্বাদী নেতা মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেছেন যে মুসলমান সম্প্রদায় চাইলে পরে গণপরিষদে মুসলমান প্রতিনিধি কেবলমাত্র মুসলমানের দ্বারা নির্ব্বাচিত হবেন। তিনি আরো বলেছেন যে এই সমস্ত প্রতিনিধি ভারত বিভাগ দাবী করবেন না বলেই তাঁর বিশ্বাস ও আশা, কিন্তু যদি তাঁরা স্থির করেন যে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে দুইটী যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে হবে, তবে সেই দাবীও তিনি মেনে নিবেন।

গান্ধীজীর এ ঘোষণার পরে গণপরিষদে মুসলীম লীগের আপত্তি বোঝা কঠিন। এ কথা নিঃসন্দেহ যে গণপরিষদ এ ভাবে গঠিত হলে মুসলমান স্বার্থের কোন হানি হতে পারে না, বরং গণপরিষদের নির্ব্বাচনেই মোসলেম জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হবে। হয়তো ঠিক এই জন্যই লীগ এতদিন গণপরিষদে রাজী হয়নি। লীগের সংগঠন ও কার্য্যক্রম দেখলে কোন সন্দেহ থাকে না যে মুসলমান অভিজাত

ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ ও স্বার্থসিদ্ধিই লীগের লক্ষ্য। অধুনা যে লীগের মধ্যে জনসমাবেশ, তাও ঘটেছে অভিজাত শ্রেণীর নেতৃত্বে এবং সেই নেতৃত্ব রক্ষার জন্য। ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে চাষী এবং মজুরের অভাব অভিযোগের থেকে লীগ জনসাধারণের দৃষ্টি এতদিন ফিরিয়ে রেখেছে, কিন্তু একবার প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হলে বঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে যে রাষ্ট্রিক চেতনা আসবে, তার ফলে লীগের ভিত্তি পর্য্যন্ত টলে উঠতে পারে, এ আশঙ্কা ছিল বলেই লীগের গণপরিষদে এত আপত্তি।

এ ছাড়া গণপরিষদে লীগের আপত্তির আরো একটী কারণ ছিল। লীগ দাবী করে ভারতীয় মুসলমানের লীগই একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। লীগের শক্তি এবং প্রভাব যে গত পাঁচ ছয় বৎসরে বহু পরিমাণে বেড়েছে একথা অনস্বীকার্য্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও পূর্ব্বের অন্যান্য মুসলমান প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে এবং নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে। পাঞ্জাবে আহরার পার্টি আজও শক্তিশালী। ধর্ম্মের আহ্বানের সঙ্গে অর্থনৈতিক অভিযোগের মিলনে আহরার পার্টির যে কার্য্যক্রম, তার বিপ্লবী সম্ভাবনার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। এই বিপ্লবী আকর্ষণের ফলে মুসলমান কর্ম্মীদের মধ্যে সংগ্রামশীল ও স্বার্থত্যাগী একটী অংশ চিরদিনই আহরার দলের দিকে ঝুঁকেছে—আজো ঝোঁকে। কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে আহরার দলের কোন দ্বন্দ্ব নাই, তবে আহরারেরা কংগ্রেসের আর্থিক কার্য্যক্রমকে আরো এগিয়ে নিতে চায়। লীগের প্রতি আহরার দলের দারুণ অশ্রদ্ধা ছিল, কারণ আহরারদের মতে লীগ প্রতিক্রিয়াশীল মধ্যবিত্তদের আড্ডা। পাঞ্জাবে যদি ভোটাধিকার আরো প্রসারিত হয়, তবে তার ফলে যে আহরার দলের শক্তি আরো বাড়বে এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

মুসলমান শাস্ত্রবিদ ও মওলবীদের প্রতিষ্ঠান জমিয়তুল ওলামায়ে হিন্দেরও জনসাধারণের উপর গভীর প্রভাব রয়েছে। জমিয়ত কংগ্রেসের রাজনৈতিক-কার্য্য-ক্রমের সমর্থক। ধর্ম্ম হিসাবে ইসলাম মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার সমর্থক এবং সেজন্য জমিয়ত চিরদিনই স্বাধীনতার সংগ্রামে কংগ্রেসের সঙ্গে সমানভাবে যোগ দিয়েছে। জমিয়তের সভ্যেরা সে জন্য কারাবরণ ও অন্যান্য ভাবেও নির্য্যাতন সয়েছেন। বাঙলাদেশে জমিয়তের প্রভাব তত বেশী না হলেও যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী ও পাঞ্জাবে আজো জমিয়তের প্রভাব বিপুল। গণপরিষদের নির্ব্বাচন যদি বয়স্ক জনসাধারণের ভোটে হয়, তবে জমিয়তের প্রতিনিধিরা যে লীগের একতরফা দাবী সত্ত্বেও সেখানে স্থান পাবেন একথা নিঃসন্দেহ।

কংগ্রেসের মধ্যেও মুসলমানের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। কিছুদিন আগে একবার পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দাবী করেছিলেন, যে মুসলীম লীগের চেয়ে কংগ্রেসের মুসলমান সভ্যের সংখ্যা বেশী। এ সম্বন্ধে জোর করে বলা কঠিন, কারণ কংগ্রেসের যেমন চাঁদা দেওয়া সভ্য রয়েছে, লীগের সেরকম সভ্য আছে কিনা সন্দেহ। তবে মুসলমান সমাজে বর্ত্তমানে কংগ্রেসের চেয়ে লীগের প্রভাব যে বেশী এ কথা নিঃসন্দেহ। গত কয়েক বছরে লীগের প্রতিপত্তি আরো বেড়েছে এবং বর্ত্তমানে জওহরলালের কথা টেকে না। তবু কংগ্রেসের মুসলমান সভ্যদের গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না। সংখ্যা এবং প্রতিভায় ভারতীয় মুসলমানের এক উল্লেখ-যোগ্য অংশের প্রতিনিধিত্বের দাবী কংগ্রেস আজো করতে পারে, একমাত্র ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ও গোঁড়া লীগ সমর্থকই এ কথা অস্বীকার করতে পারে। আর একটী কথা মনে রাখা প্রয়োজন। মুসলমান চাষী ও মজুরের মধ্যে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেসের প্রভাব বাড়ছে, যদিও সহরে ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আজো কংগ্রেসের প্রতি বিরাগ তীব্রভাবে দেখা যায়।

সীমান্ত প্রদেশের খোদাই খিদমৎগারের কথা আগেই বলেছি। মুসলমানের এত সংখ্যাধিক্য আর কোন প্রদেশেই নাই, কিন্তু সেখানেই কংগ্রেসের প্রভাবও সব চেয়ে বেশী। অল্পদিন আগে পর্য্যন্ত লীগ সেখানে দন্তস্ফুট করতে পারেনি —যদিও সম্প্রতি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় সেখানেও লীগের শক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সুরু হয়েছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যনীতির এই সাম্প্রতিক বিকাশ কেবলমাত্র সীমান্ত-প্রদেশে সীমাবদ্ধ নয়—পাঞ্জাব, আসাম, বাঙলা, সিন্ধুদেশে তার বহু নমুনা গত চার বছরে মিলেছে।

বাঙলাদেশের কৃষকপ্রজা সমিতির লক্ষ্য ও আদর্শ অসাম্প্রদায়িক, কিন্তু সংগঠন ও নেতৃত্বের দিকে দৃষ্টি রাখলে তাকে মুসলমান রাজনৈতিক দলের মধ্যে ধরতে হয়। রাজনৈতিক আদর্শকে বাস্তব করতে হলে সমাজের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো বদ্‌লাতে হবে—এই বিশ্বাসই প্রজা আন্দোলনের ভিত্তি। তার কার্য্যক্রম তাই জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনার সঞ্চার, কিন্তু অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দলের সঙ্গে তার প্রধান পার্থক্য এইখানে যে পার্লামেণ্টারী ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তা ভূমিবিপ্লব সাধন করতে চায়। চাষীর দৈনন্দিন জীবনের দাবীদাওয়ার মধ্যেই প্রজা আন্দোলনের জন্ম, কিন্তু গণচেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রসার ও প্রকৃতি দুই-ই বদলি-য়েছে। জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা যত বাড়বে, কৃষকপ্রজা

আন্দোলনের শক্তিও ততই বাড়বে। সেদিক দিয়ে দেখলে তার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

লীগবিরোধী মুসলমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিয়া পলিটিকাল কনফারেন্স বা শিয়া রাজনৈতিক সংঘেরও নাম করতে হয়। মুসলমান সমাজে বিভিন্ন সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা, অর্থ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠায় শিয়ারাই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। তারাও রাজনীতির ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কংগ্রেসের সমর্থক। কিন্তু সমস্ত দলগুলির মধ্যে একদিক দিয়ে মোমিন আনসার কনফারেন্স বা মোমিন সংঘের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। মোমিন সংঘের শক্তিবৃদ্ধি অল্পদিনের মধ্যে হয়েছে, এবং লীগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অস্ত্র ও অভিযোগ ব্যবহার করে শক্তিসঞ্চয় করেছে, লীগের বিরুদ্ধে ঠিক সেই সমস্ত অস্ত্র ও অভিযোগ ব্যবহার করেই মোমিন সংঘের শক্তি বৃদ্ধি। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে মোমিনদের সংখ্যা কম নয়—তাঁদের নেতা জহিরুদ্দিন সাহেব দাবী করেছেন যে মোমিনদের সংখ্যা সাড়ে চার কোটিরও উপর, কিন্তু সংখ্যা তাদের যাই হোক না কেন, শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও রাজনৈতিক চেতনায় তারা মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে পিছে পড়ে রয়েছে। লীগ এতদিন মুসলমান সম্প্রদায়ের নাম করে কংগ্রেসের কাছে যে সমস্ত রক্ষা-কবচ দাবী করে এসেছে, বর্ত্তমানে মোমিন সংঘ লীগের কাছে মোমিন আনসারদের জন্য ঠিক সেই সমস্ত রক্ষাকবচই দাবী করছে।

এ সমস্ত বিভিন্ন দলগুলির কার কি শক্তি বা প্রভাব সে সম্বন্ধে সঠিক বলা কঠিন হলেও মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ার খুব ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নাই। অনেক সময়ে একই ব্যক্তি একই কালে এ রকম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্য—সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও কার্য্যক্রম পরস্পরবিরোধী। তবু একথা অস্বীকার করা চলে না যে লীগমনোবৃত্তি ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং মুসলমানদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানদের মধ্যে লীগই বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। তা সত্ত্বেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব এবং শক্তিবৃদ্ধি থেকে বোঝা যায় যে লীগ যে দাবী করে যে লীগই ভারতীয় মুসলমানের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান, সে দাবীর কোন মূল্য নাই। যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যায় কম অথচ অর্থনৈতিক হিসাবে খানিকটা শক্তিশালী, সেই সব প্রদেশেই লীগের প্রভাব বেশী। যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানেরাই সংখ্যাগুরু, সেখানে মুসলমানের বিভিন্ন শ্রেণী বা গোষ্ঠির মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থ-দ্বন্দ্বকে চেপে রাখা চলে না। বাঙলাদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশে

তাই ঘটেছে। বাঙলাদেশে এবং পাঞ্জাবে জমিদার এবং মহাজনদের মধ্যে বেশীর ভাগ অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত কিন্তু কৃষকশ্রেণীর অধিকাংশ মুসলমান, এবং মুসলমানের বিপুল অংশ কৃষিজীবি। কৃষকপ্রজা ও আহরার দলের উদ্ভব এই দুই প্রদেশেই হয়েছে কেন তা চিন্তার বিষয়। ঠিক তেমনি আর একটী লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে মুসলমানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রগতিশালী ও বিত্তবান শিয়া সম্প্রদায় এবং সবচেয়ে বেশী পশ্চাদপদ ও বিত্তহীন মোমিন আনসার উভয়েই কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শ ও কার্য্যক্রমের সমর্থক। লীগবিরোধী অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি যদি একজোট বাঁধে, তবে তাদের সম্মিলিত শক্তির সামনে লীগ দাঁড়াতে পারে কিনা সন্দেহ, এবং ভারতীয় মুসলমানের সত্যিকার প্রতিনিধি বোধ হয় সেই সম্মেলনের মধ্যেই মিলবে। মূলতঃ অভিজাত ও মধ্যবিত্ত মুসলমানের শ্রেণীপ্রতিষ্ঠান বলে ভোটাধিকার যত ব্যাপক হবে, লীগের শক্তিও ততই কমবে এ আশঙ্কাও লীগনেতাদের রয়েছে। এই সমস্ত কারণ আলোচনা করলেই কংগ্রেস মুসলমানকে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন দিয়েও গণপরিষদ চায় কেন, এবং লীগই বা তাতে আপত্তি করে কেন তা বোঝা যায়।

৪

এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা করেছি, তাতে খাকসার আন্দোলনের কথা কিছুই বলা হয়নি। তার প্রধান কারণ এই যে খাকসার আন্দোলন অল্পদিনের মধ্যে গড়ে উঠেছে, এবং তার বিশদ আলোচনার আজো সময় আসেনি। তা ছাড়া বর্ত্তমানে খাকসার আন্দোলন রাজনীতি বর্জ্জন করে চলতে চেষ্টা করছে। তবে খাকসার নেতা আল্লামা মশরেকীর চিন্তাধারা, রচনা ও কার্য্যক্রম বিচার করলে কোন সন্দেহ থাকে না যে বাহ্যত যাই হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে খাকসার আন্দোলন জাতীয় প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের মধ্যে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনেরও সম্ভাবনা দেখে বলেই বর্ত্তমানে সমাজসেবা ও চরিত্র গঠনের প্রতি বেশী ঝোঁক দিয়েছে। আল্লামা মশরেকী সে কথা আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশও অনেকবার করেছেন। একদিকে যেমন মানুষের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত না হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বপ্ন আকাশ-কুসুম, তেমনি অন্যদিকে যে সম্প্রদায়ে মানুষের চরিত্র উন্নত সেখানে রাজনৈতিক পরাধীনতা টিকতে পারেনা একথা তিনি বারবার বলেছেন। খাকসার আন্দোলন প্রধানত মুসলমানকে নিয়ে সুরু হলেও তার সদস্যের মধ্যে অন্য সম্প্রদায়ের লোক মেলে। স্যর ষ্ট্যাফর্ড ক্রীপস যখন এদেশে আসেন, তখন আল্লামা মশরেকী লীগ,

মহাসভা, কংগ্রেস সকলের মধ্যে মিলনের চেষ্টা করেছিলেন। যুদ্ধকালে ভারতবর্ষ কিছুই পাবে না আর যুদ্ধের পরে সবই পাবে—ক্রীপসের এ কথা যে কত বড় ফাঁকী, আল্লামা স্পষ্টভাবে তারও রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন। তবু আন্দোলনের প্রধান ঝোঁক সমাজসেবার দিকে এবং প্রত্যেক খাকসারকে প্রতিদিন সমাজসেবায় যোগ দিতে হয়। বে-আইনী ঘোষিত হবার আগে খাকসার স্বেচ্ছাসেবকেরা সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করেছে। তার প্রধান উদ্দেশ্য ভারতীয় নিষ্ক্রিয় ও জড়বাদী জনসাধারণকে সক্রিয় ও চঞ্চল করে তোলা, এবং সেই সঙ্গে সৈনিক মনোবৃত্তির প্রসারে সংগঠনশক্তি ও নিয়মানুবর্ত্তিতার বিকাশ। আল্লামা মশরেকী একথাও বলেছেন যে ধনীনির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলে যদি একই পোষাকে এবং একই কালে কুচকাওয়াজে নামে, তবে তাতে সাম্যভাব ও গণতন্ত্রের প্রসারতা বাড়বে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সক্রিয়তা, গণতন্ত্র ও নিয়মানুবর্ত্তিতাই বর্ত্তমানে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

খাকসার আন্দোলন সাক্ষাৎ ভাবে লীগবিরোধী নয়, কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও মর্য্যাদা স্বীকার করে প্রকারান্তরে লীগের মুসলমান প্রতিনিধিত্বের একচেটিয়া দাবিকে খাকসাররা অস্বীকার করেছে। আর একদিক থেকেও লীগের রাজনৈতিক মনোবৃত্তির সঙ্গে খাকসারের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার পার্থক্য সুস্পষ্ট। লীগের সদস্যদের মধ্যে মুসলমান ভিন্ন অন্য কারু স্থান নাই, বরং মুসলমানদের মধ্যেও যারা লীগপন্থী নয়, তাদের লীগ প্রত্যক্ষভাবে না পারলে পরোক্ষভাবে মুসলমান সমাজ থেকে বাদ দিতে চেষ্টা করে। অন্যপক্ষে খাকসার আন্দোলন অমুসলমানকেও টানে এবং মুসলমানদের মধ্যেও বিভিন্ন রাজনৈতিক মতামতের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে লীগ মুখ্যত রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাপারে একেবারে বিরূপ বা উদাসীন, অথচ লীগই ধর্ম্মীয় একতার উপরে ঝোঁক দেয় বেশী। খাকসার আন্দোলন মুখ্যত ধর্ম্মীয় আন্দোলন এবং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী খাকসারদের স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি পরিপূর্ণ ভাবে স্বীকার করে নিতে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও খাকসার আন্দোলনে লীগের মতন ধর্ম্মীয় জাতীয়তার উগ্র গন্ধ মেলেনা। এ সমস্ত কারণে লীগ নেতারা খাকসার আন্দোলনকে খুব প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেন না। কয়েকবার খাকসার আন্দোলনকে লীগের অন্তর্ভুক্ত করবার চেষ্টাও হয়েছে। তাতে কিন্তু খাকসার নেতা রাজী হননি, এবং তার ফলে লীগ ও খাকসার নেতারা পরস্পরকে প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে খানিকটা অপ্রীতির

চোখেই দেখেন। এখনও সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে বা শক্তি পরীক্ষায় পরিণত হয়নি, কিন্তু ঘটনার পারম্পর্য্যে মনে হয় যে অদূর ভবিষ্যতে সে দ্বন্দ্ব অনিবার্য্য।

লীগ যে খাকসার আন্দোলনকে অবিশ্বাসের চোখে দেখে তার আরও একটী কারণ আছে। একেবারে সুরুতে লীগ খাকসার আন্দোলনকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করেছে তা আমরা দেখেছি। সে চেষ্টা নিষ্ফল হলেও লীগ প্রথমে খাকসার আন্দোলনকে আক্রমণ করেনি, কিন্তু ১৯৪০ সালে খাকসার নেতৃবৃন্দ যখন সক্রিয় আন্দোলনের ডাক দিলেন এবং শহীদগঞ্জের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে খাকসার কর্ম্মীবৃন্দের শক্তি, সাহস ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে সমস্ত ভারতবর্ষে সাড়া পড়ে গেল, লীগ নেতৃবৃন্দের মনে তখন ভয় হল যে খাকসার আন্দোলনের প্রবল সক্রিয়তার সামনে লীগের নেতিবাদী প্রতিক্রিয়াশীল কর্ম্মপন্থা টিকতে পারবে না। তখন থেকেই লীগ খাকসার আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে দেখতে সুরু করল।

সেই বৎসরই সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী আল্লাবক্সের নেতৃত্বে আজাদ কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠায় সে সন্দেহের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। পূর্ব্বেই বলেছি যে গত কয়েক বৎসরে লীগের শক্তিবৃদ্ধি সত্ত্বেও অন্যান্য মোসলেম রাজনৈতিক দল ও মতগুলির অস্তিত্ব বিলোপ হয়নি। লীগের তুলনায় তারা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকেই দুর্ব্বল কিন্তু লীগবিরোধী সমস্ত দলগুলির সমন্বয়ে অবস্থা যে কি দাঁড়ায়, তা বলা কঠিন ছিল। যতদিন এ সমস্ত দল বিচ্ছিন্ন ছিল, ততদিন লীগ তাদের আক্রমণ করেছে কিন্তু বিশেষ ভয় করেনি। আল্লাবক্সের নেতৃত্বে যেদিন বিচ্ছিন্ন দলগুলি একত্রিত হল, তখন যে লীগ তাকে বিদ্বেষের চোখে দেখবে, তাতে বিচিত্র কি? খাকসার আন্দোলনও বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী লোককে সমাজসেবা ও ব্যক্তিগত চরিত্র উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক সূত্রে গাঁথবার জন্য সচেষ্ট। লীগের মনে তাই স্বভাবতই আশঙ্কা জাগল যে আজাদ কনফারেন্সের মতন খাকসার আন্দোলনও একদিন লীগবিরোধী বিভিন্ন মুসলমান দলগুলির মিলনক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে।

ভারতীয় মুসলমানের রাজনীতির ক্ষেত্রে আল্লাবক্সের আবির্ভাব এক স্মরণীয় ঘটনা। এত অল্প সময়ে এত প্রতিষ্ঠা খুব কম লোকেরই ভাগ্যে জোটে, কিন্তু আল্লাবক্সের বেলা বলা চলে যে তাঁর প্রতিষ্ঠা পরিপূর্ণভাবে স্বোপার্জ্জিত। ১৯৩৭ সালের আগে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর নাম শোনা যায়নি, অথচ ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যেই তিনি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের আসরে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী হিসাবে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, কিন্তু প্রধান মন্ত্রিত্ব তাঁর বেলায় যে প্রতিষ্ঠার কারণ নয়, কেবলমাত্র

উপলক্ষ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্যান্য প্রদেশেও বহু প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ আল্লাবক্সের মত এত সহজে ভারতীয় জনসাধারণের হৃদয় জয় করতে পারেননি। ১৯৪০ সালে আজাদ কনফারেন্সের সভাপতি হিসাবে তিনি যে বিপুল সম্বর্দ্ধনা পেয়েছিলেন তা যে কোনো জননেতার পক্ষে লোভনীয়।

আল্লাবক্সের জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ তাঁর সাহস ও চরিত্রবল। সে সময় লীগের সৌভাগ্যের জোয়ার এসেছে। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনের পরাজয়ের পরে এক বৎসরের মধ্যে লীগের ভাগ্যের বিস্ময়কর পরিবর্ত্তনের বিষয়ে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি। অন্যান্য কারণের মধ্যে কংগ্রেসের বিপুল বিজয়ে ইংরেজের আশঙ্কাও যে লীগের শক্তিবৃদ্ধির অন্যতম কারণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জিন্না সাহেবকে পূর্ব্বে কোন দিন ইংরেজ সহ্য করতে পারেনি—গোল টেবিল বৈঠকে যে ভাবে তাঁকে বিনা দ্বিধায় বাদ দেওয়া হয় পূর্ব্বেই তার উল্লেখ করেছি। এখন কিন্তু কংগ্রেসের প্লাবনকে রোখবার জন্য ইংরেজের কাছে জিন্না সাহেবের দর অনেক বেড়ে গেল। পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যর সিকান্দার হায়াৎ খাঁর সঙ্গে ইংরেজ রাজশক্তির সম্বন্ধ যে নিবিড় ও মধুর এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। ইংরেজের সমর্থন ভিন্ন তিনি যে কোন মৌলিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করেন না, এ কথাও সকলেই জানে। সাধারণ নির্ব্বাচনে বাঙলা দেশে ফজলুল হক যে ভাবে জিন্না সাহেবকে পর্য্যুদস্ত করেছিলেন, পাঞ্জাবে স্যর সিকান্দারের ইউনিয়নিষ্ট দলের হাতে লীগ তার চেয়েও বেশী নাজেহাল হয়েছিল। অথচ ১৯৩৭ সালে লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে স্যর সিকান্দার ও ফজলুল হক দুজনেই জিন্না সাহেবের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন এটা প্রথম দৃষ্টিতেই বিচিত্র ঠেকে। হক সাহেবের লীগে যোগদানের পক্ষে তবু খানিকটা যুক্তি ছিল, কারণ তিনি লীগের প্রথম স্রষ্টাদের অন্যতম, এবং বাঙলা দেশে যে বিরোধী-দলের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছে, লীগের সাহায্য ভিন্ন তাঁদের পরাজিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল কিনা সন্দেহ। স্যর সিকান্দারের কিন্তু সে রকম কোন মুস্কিল ছিল না, এবং অন্যপক্ষে রাজশক্তির সমর্থনের ভিত্তিতেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও কর্ম্মপন্থা গঠিত। তাই স্যর সিকান্দারের লীগে যোগদানে এই কথাই বোঝা গেল যে ইংরেজ রাজশক্তির দৃষ্টিভঙ্গী বদলিয়েছে, পূর্ব্বেকার অস্পৃশ্য জিন্না সাহেব আজ রাজশক্তির চোখে কেবলমাত্র স্পৃশ্য নয়, বরণীয় হয়ে উঠেছেন।

এক দিকে কংগ্রেসের দ্বিধা ও কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীদের ভুল, কংগ্রেসী অনুচরদের উৎকট উৎসাহ ও কোন কোন ক্ষেত্রে অবিমৃষ্যকারিতা, অন্যদিকে

রাজশক্তির সস্নেহ দৃষ্টির সমর্থনে লীগের শক্তি যে কি ভাবে বৃদ্ধি পেল, তার খানিকটা ইঙ্গিত পূর্ব্বে দিয়েছি। এই ভরা জোয়ারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই আল্লাবক্স এত সত্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সিন্ধু দেশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য বিপুল—একমাত্র সীমান্ত প্রদেশ ভিন্ন অন্য কোথাও এ ধরণের মুসলমান সংখ্যাধিক্য নাই। বাঙলা দেশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য ধর্ত্তব্য নয় বল্লেও চলে। মুসলমান সওয়া তিন কোটি হলেও অমুসলমান প্রায় পৌনে তিন কোটি, কিন্তু অর্থ, শিক্ষা ও অবস্থানে মুসলমানের চেয়ে অমুসলমান অনেকখানি উন্নত। পাঞ্জাবেও মুসলমান শতকরা ছাপ্পান্ন আর অমুসলমান শতকরা চুয়াল্লিশ। অথচ যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমান সংখ্যায় অল্প, সেখানে মোসলেম সংখ্যাল্পতা ভয়াবহ। কোথাও মুসলমানের সংখ্যা শতকরা দশজন, কোথাও বা পনেরো বা খুব বেশী হলে কুড়ি বাইশ। আল্লাবক্স তাই বুঝেছিলেন যে লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি যে কেবলমাত্র সমগ্র ভারতবর্ষের স্বার্থের বিরোধী তা নয়, মুসলমান স্বার্থের তা আরো বেশী পরিপন্থী। সংখ্যাল্পতার উপর ঝোঁক যত কম দেওয়া হয়. সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের ততই কল্যাণ। বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের বদলে তা হলে সর্ব্ব জনস্বার্থের বিভিন্ন প্রশ্নই রাজনীতির ক্ষেত্রে বড় হয়ে দেখা দেবে, নইলে সে সমস্ত প্রশ্ন পরে যাবে চাপা এবং একমাত্র সংখ্যাগুরু ও সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের ঝগড়াতেই দেশ ও সমাজের রাজনৈতিক চিন্তা, সময় ও উদ্যম অপব্যয়িত হবে।

আল্লাবক্সের রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় এইখানে যে সিন্ধু দেশে মুসলমানের বিপুল সংখ্যাধিক্য সত্বেও একথা তিনি সহজে বুঝেছিলেন। অথবা হয়তো বলা চলে যে মুসলমান সংখ্যাধিক্য প্রদেশের লোক বলেই একথা তিনি উপলব্ধি করেন। মুসলমান যেখানে সংখ্যাল্প, সেখানে তার মনোবৃত্তি অনেকখানি আত্মরক্ষামূলক হতে বাধ্য। জিন্না সাহেব জানেন যে বর্ত্তমান অবস্থায় বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী হবার আশা তাঁর কোন দিন নাই—চিরদিনই সেখানে তাঁকে আশ্রিত হয়ে থাকতে হবে। আশ্রয়দাতার মনোবৃত্তির বিকাশ তাঁর চরিত্রে তাই অসম্ভব। অনেক সময়ে তাঁর ব্যবহারে ও কথায় বার্ত্তায় যে অসৌজন্য ও নীচতা প্রকাশ পায়, সংখ্যাল্প-মনোবৃত্তির সংকীর্ণতা ও আশঙ্কাই তার প্রকৃত কারণ। একথা তিনি বোঝেন না যে সংখ্যাল্প-মনোবৃত্তির প্রকাশে চরিত্রের যে দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে, তার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্ব লাভের আশা আরো পিছিয়ে যায়। আল্লাবক্স বুঝেছিলেন যে ধর্ম্মীয় পার্থক্য ও সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যকে রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে সরাতে না পারলে কোন দিন আমরা আমাদের মৌলিক সমস্যার

সমাধান করতে পারব না, এবং সেজন্য তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গোড়া থেকেই লীগ রাজনীতিকে তিনি অস্বীকার করেছেন।

আল্লাবক্সের সংগঠন শক্তিতে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভার আর একটি দিক প্রকাশ পেয়েছে। লীগের বিপুল শক্তিবৃদ্ধি তিনি দেখেছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও তিনি লক্ষ্য করেছেন যে লীগবিরোধী যে সমস্ত মুসলমান প্রতিষ্ঠান বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে, বিচ্ছিন্নভাবে দুর্ব্বল হলেও তাদের সম্মিলিত শক্তি কম নয়। সেজন্য তাঁর অন্যতম রাজনৈতিক সাধনা হয়ে দাঁড়াল এই সমস্ত বিভিন্ন দলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের যুক্ত কর্ম্মপন্থার ভিত্তিতে এক নূতন মুসলমান সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা। তিনি একথা বুঝেছিলেন যে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক মতামত ও অস্তিত্ব স্বতন্ত্র, এবং সে স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করা ভুল। বস্তুতপক্ষে লীগের বিরুদ্ধেও প্রধান অভিযোগই এই যে লীগ দাবী করে যে মুসলমান মাত্রেরই মুসলমান হিসাবে রাজনৈতিক মতামত এক হতে বাধ্য। মতবাদের ও অস্তিত্বগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বিভিন্ন দলের মধ্যে সহযোগিতায় কাজ চালাবার উদ্দেশ্যেই ১৯৪০ সালে আজাদ মুসলমান কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠা। বিভিন্ন ও ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত এই কনফারেন্সের কার্য্যক্রম প্রথম থেকেই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজাদ কনফারেন্স আশানুরূপ সাফল্যলাভ করতে পারেনি। তাতে আশ্চর্য্যও নাই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেখানে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে একযোগে কাজ করতে নামে, সেখানে তাদের কাজের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য থাকবেই, এবং বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি দিতে হয় বলে তার কর্ম্মপন্থায় তীব্র একাগ্রতা আসতে পারে না। তা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে আজাদ কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠায় লীগ কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, এবং এতদিন যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী লীগের কথাকেই ভারতীয় মুসলমানের কথা বলে পৃথিবীময় চালু করার সুযোগ পেয়েছিল, তাতে বাধা পাওয়াতে তারাও অপ্রসন্ন। উভয় পরিণতির জন্যই প্রধান কৃতিত্ব আল্লাবক্স সাহেবের প্রাপ্য।

৫

মহাযুদ্ধের গোড়াতে কংগ্রেস এবং লীগের কার্য্যক্রম আবার আমূল বদলে গেল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের সংগ্রামশীল কার্য্যক্রমের সূচনা দেখা দিল, তা বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। লীগও সঙ্গে সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদের

দিকেই ঝুঁকে পড়ল। পুরোণো নিয়মতান্ত্রিকতাকে কিন্তু জিয়ানো গেল না। একেতো জিন্না সাহেব প্রাক্তন কংগ্রেসী এবং বর্ত্তমানে কংগ্রেসের সঙ্গে যতই ঝগড়া হোক না কেন, কংগ্রেসী গন্ধ পুরোপুরি ধুয়ে ফেলা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। যে মদরত মধ্যপন্থার ফলে সরকারী সমর্থন ও সাহায্য মেলে, আজো জিন্না সাহেব তার কায়দা পুরোপুরি দুরস্ত করতে পারেননি। তা ছাড়া কংগ্রেস ও খেলাফৎ-কমিটী-গুলির কুড়ি বৎসর প্রচারণার ফলে জনসাধারণের চেতনা রাজনৈতিক সংগ্রামে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। জিন্না সাহেবের ইচ্ছা থাকলেও তাকে আচ্ছন্ন করবার তাঁর শক্তি নাই। ফলে কংগ্রেসেরই মত লীগের মধ্যেও আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্ম্মপন্থার লোক লীগে আসলেও কায়েমী স্বার্থের সেখানে এত প্রভাব যে আজ পর্য্যন্ত লীগ সক্রিয় সংগ্রামে কোন দিন যোগ দিতে পারেনি। তার রাজনৈতিক কর্ম্মসূচী ও দাবীও তাই আজো কংগ্রেসের তুলনায় অনেক নীচু সুরে বাঁধা।

লীগের সাম্প্রতিক কর্ম্মপন্থায় এটাও লক্ষ্যণীয় যে যদিও প্রতিক্ষেত্রেই লীগ ভিন্ন কারণ দেখিয়েছে, তবু যুদ্ধের সুরু থেকে এ পর্য্যন্ত প্রতিপদেই কংগ্রেস যা করেছে, লীগও দুদিন বাদে তার অনুসরণ করেছে। একদিকে কংগ্রেসের বাস্তব ও কল্পিত ভুলভ্রান্তি ও অন্যায়ের জন্য লীগ কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছে—অন্যদিকে প্রতিবারই কংগ্রেসের যে সিদ্ধান্ত, লীগ ভিন্ন অজুহাতে তাই গ্রহণ করেছে। ভারতীয় জনমতের সমর্থন না নিয়ে ভারতবর্ষকে যুদ্ধরত ঘোষণা করায় কংগ্রেসের মতন লীগও ইংরেজ রাজশক্তির নিন্দা করেছে। ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে ভারতীয় শাসনসঙ্কট সমাধানের জন্য বড়লাটের যে প্রস্তাব, কংগ্রেসের মতন লীগও তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তথাকথিত যে ভারতরক্ষা সমিতি বড়লাট গঠন করেন, কংগ্রেসের মতন লীগও তাতে সদস্য পাঠাতে অস্বীকার করেছে। চার্চ্চিল-মার্কা যে স্বাধীনতার প্রস্তাব ভারতবর্ষের জন্য স্যর ষ্ট্যাফর্ড ক্রীপস নিয়ে এসে-ছিলেন, কংগ্রেসের মতন লীগও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। লীগ অবশ্য প্রত্যেক বারই এ রকম সিদ্ধান্তের স্বতন্ত্র কারণ দেখিয়েছে, কিন্তু কারণ যতই ভিন্ন হোক না কেন, ফল প্রত্যেক বারই হয়েছে এক।

কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সব চেয়ে বড় প্রভেদ দেখা দিয়েছে কর্ম্মপন্থায়। কংগ্রেস ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্য সক্রিয় আন্দোলন ও সংগ্রামে ভয় পায় না—লীগের লক্ষ্য যে সংগ্রামে না নেমে কৌশলে কি ভাবে কার্য্য উদ্ধার করা যায়। লীগ বোধ হয় ভেবেছিল যে কংগ্রেস যদি সংগ্রামে নামে, তবে সেই

শক্তিদ্বন্দ্বের সময় বিনা স্বার্থত্যাগে ও প্রয়াসেই নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে নেবে। লীগের এ কার্য্যক্রমের জন্য তার সংগঠন খানিকটা দায়ী। যে প্রতিষ্ঠানে কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রতিপত্তি, সে প্রতিষ্ঠান যে সংগ্রামে বিমুখ হবে তা স্বাভাবিক। জিন্না সাহেবের ব্যক্তিগত চরিত্র ও পেশাও এ মনোবৃত্তির জন্য অনেকখানি দায়ী। আইনজীবী সক্রিয় আন্দোলন চায় না—যুক্তিতর্ক ও কৌশলের মারপ্যাঁচে কার্য্য উদ্ধারেই উকিলী বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা। জিন্না সাহেবও তার ব্যতিক্রম নন।

লীগের এ রকম রাজনৈতিক পাঁয়তারার ফলে ভারতীয় মুসলমানের কিন্তু গভীর ও স্থায়ী ক্ষতি হয়েছে। সারাক্ষণ কেবলমাত্র সংখ্যাল্পতার বিলাপে অনেকের মনেই এনেছে দুর্ব্বলতা এবং সে দুর্ব্বলতার ফলে অতি সহজেই তারা ইংরেজ রাজশক্তি-নির্ভর হয়ে পড়েছে। ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের স্বার্থের বিরোধকে বড় করে দেখতে গিয়ে তারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহানুভূতি হারিয়েছে এবং সেই সঙ্গে মুসলমানের মনে অন্য সকলের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, তার ফলে মুসলমান সহজ ও সচ্ছন্দ ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে ভুলে যাচ্ছে। সব সময়ে নিজেকে আক্রান্ত ভাবলে যে অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি গড়ে উঠে, তার ফলে চিত্তের পরিপূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। ভারতবর্ষের ইতিহাস যেদিন সংস্কারমুক্ত ও উদার দৃষ্টি দিয়ে লেখা হবে, সেদিন জিন্না সাহেবের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হবে এই যে ভারতবর্ষের নয় কোটি মুসলমানের মনে তিনি যে দুর্ব্বলতা ও পরাজিত-মনোবৃত্তি সঞ্চারের চেষ্টা করেছিলেন, সে চেষ্টা সফল হলে ভারতীয় মুসলমান অন্যান্য সম্প্রদায় ও জাতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিঁকতে পারতো না। ভারতীয় মুসলমানের সৌভাগ্য যে জিন্না সাহেবকে তারা একচ্ছত্র নেতা মানে নি। তাঁর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়েছে, তারা স্বতন্ত্র ও বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর চেয়ে দুর্ব্বল হতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে এই সমস্ত দলই যে মুসলমান মানসের প্রকৃত ও সার্থক অভিব্যক্তি, তাতে সন্দেহ করা চলে না।

এ কথাতে আশ্চর্য্য হবারও কারণ নেই। চিরদিনই মুসলমানের ইতিহাস সম্প্রসারণ ও অভিযানের ইতিহাস—সে সম্প্রসারণ কেবলমাত্র ভৌগলিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, মানস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও মুসলমান চিরদিন অভিযাত্রী। মরহম-ডাক্তার ইকবালের একটী কবিতায় মুসলিম ইতিহাসের একটী স্মরণীয় ঘটনা কীর্ত্তিত হয়েছে। স্পেনবিজয়ী তারেক মাত্র সাত শত সৈন্য নিয়ে ইয়োরোপে নেমে সমস্ত জাহাজ পুড়িয়ে দেবার আদেশ দেন। সাংসারিক বুদ্ধিমান উপদেষ্টারা

আপত্তি করেন যে তাহলে আর ফেরবার উপায় থাকবে না। তাঁরা বলেন যে বিদেশে এত কম সৈন্য নিয়ে থাকবার চেয়ে সকলে মিলে ফিরে যাওয়া শ্রেয়। উত্তরে তারেক বলেন—বিদেশ? বিদেশ কাকে বলে? যদি সমস্ত দুনিয়া আল্লার দুনিয়া হয়, তবে আল্লার বান্দা মুসলমানের পক্ষে কোন বিদেশ নাই। এ মনোবৃত্তির সঙ্গে জিন্না সাহেবের পাকিস্থানী মনোবৃত্তির পার্থক্য কি কাউকে বোঝাতে হবে?

বর্ত্তমানে পাকিস্থানকে মুসলীম লীগ লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে। পাকিস্থান কি তা কেউ জানে না, স্পষ্ট করে বলতে পারে না। চারিদিকে গণ্ডী টেনে নিজেকে সংরক্ষণ যদি পাকিস্থানের অর্থ হয়, তবে মুসলীম ইতিহাসের শিক্ষা পাকিস্থানের বিরোধী। সকল দেশ ও জাতির ইতিহাসই শিক্ষা দেয় যে আত্মরক্ষায় রক্ষা নাই। ব্যক্তির মতন জাতিও কেবল তখনই বাঁচে যখন নিজেকে চারিদিকে সম্প্রসারিত করে দেয়। সংস্কৃতিকে রক্ষা করা চলেনা—সংস্কৃতিকে নিত্য নব নব বিজয়ে নব জন্ম লাভ করতে হয়। যেখানেই চেষ্টা হয়েছে যে বাইরের সংস্রব বাঁচিয়ে নিজের সীমানা বা গণ্ডীর মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে থাকব, সেখানেই তার ফলে এসেছে জড়তা ও মৃত্যু। নদীর প্রবাহ আছে বলে তার জল কখনো খারাপ হয় না—পুকুরের সীমানা সঙ্কীর্ণ বলেই পুকুর এত সহজে মজে। ভারতীয় মুসলমানকেও বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের মধ্য দিয়েই বাঁচতে হবে।

পাকিস্থানের আদর্শ অবলম্বন করাতে লীগের উদ্দেশ্য ও কার্য্যসূচীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন এসেছে। এক অর্থে পাকিস্থানে বিশ্বাস লীগের ভিত্তিমূল ধ্বংস করে দেয়। এতদিন লীগ বলে এসেছে যে ভারতবর্ষের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা ভৌগলিক যত পার্থক্যই থাকনা কেন, মুসলমান হিসাবে তাদের স্বার্থ এক এবং অদ্বিতীয়, এবং সেই স্বার্থপূরণ হলে অন্যান্য স্বার্থ আপনিই পূর্ণ হবে। পাকিস্থানে এই পূর্ব্ব-বিশ্বাস ব্যাহত হয়েছে, কারণ সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানের সঙ্গে সংখ্যাগুরু প্রদেশের মুসলমানের স্বার্থবৈষম্যের উপরই পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা। সংখ্যাগুরু প্রদেশে মুসলমানের হাতেই আসবে রাজশক্তি—তারা হবে রক্ষক এবং অমুসলমান হবে রক্ষিত। সংখ্যালঘু প্রদেশে অবস্থা দাঁড়াবে উল্টো—সেখানে মুসলমানই হবে রক্ষিত এবং অমুসলমানের কাছে রক্ষাকবচ দাবীই তাদের প্রধান করণীয়। এক কথায় যে অবিভাজ্য মুসলিম স্বার্থের ভিত্তিতে লীগের প্রাসাদ গড়ে উঠেছিল, সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু মুসলমানের স্বার্থের পার্থক্যে তার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়েছে। একবার যদি লীগ স্বীকার করে যে মুসলমান হয়েও স্বার্থ বিভিন্ন হতে পারে,

তবে সে পার্থক্য কেবলমাত্র প্রদেশের বেলায় সীমাবদ্ধ থাকবে না, মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের পার্থক্যও স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে।

আমরা পূর্ব্বে লক্ষ্য করেছি যে সংখ্যালঘু প্রদেশগুলিতে মুসলীম লীগের যে আবেদন, সংখ্যাগুরু প্রদেশে তা কোনদিন সম্ভব হয় নি। সীমান্ত প্রদেশ জিন্না সাহেবের নেতৃত্ব কোন দিনই মানে নাই, এবং পঞ্জাবেও তাঁর প্রভাব গভীর নয়। সিন্ধু ও বাঙলা দেশ সম্বন্ধেও একথা খাটে, এবং মন্ত্রিত্বের কল্যাণে লীগের যে শক্তিবৃদ্ধি, সিন্ধু ও বাঙলা থেকে তাও বর্ত্তমানে অন্তর্হিত হয়েছে। সংখ্যাগুরু প্রদেশে লীগের প্রতিপত্তি যে কম তারও কারণ স্পষ্ট। এটাও লক্ষ্যণীয় যে পাকিস্থান প্রস্তাব গ্রহণের পরেই প্রদেশগুলি বিচ্ছিন্ন হতে সুরু করে। সংখ্যাগুরু প্রদেশের মুসলমানের স্বার্থ ও কর্ত্তব্য যখন ভিন্ন, তখন তারা যে ভিন্নভাবে নিজেদের সংগঠন ও নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবে এটা স্বাভাবিক। সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানের চিরদিনই রক্ষাকবচের প্রয়োজন হবে, কাজেই কোন সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমান ভবিষ্যতে সংখ্যাগুরু প্রদেশের নেতৃত্ব দাবী করতে পারবেন না। আমাদের চিরদিন বিশ্বাস যে যতদিন সংখ্যাগুরু কোনো প্রদেশের নেতা সর্ব্ব-ভারতীয় মুসলমানের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে না পারেন, ততদিন মুসলীম রাজনীতি নেতিবাচক থেকে যাবে। মহৎ নেতৃত্বের জন্য যে সাহস, উদারতা ও রাজনৈতিক বাস্তববোধের প্রয়োজন, সংখ্যালঘু প্রদেশের আত্মরক্ষামূলক আবহাওয়ায় কোন দিন তার বিকাশ হতে পারে না।

পাকিস্থানের আদর্শ তাই পরোক্ষে লীগের ভিত্তি শিথিল করে দিয়েছে। বাইরে লীগের শক্তি ও ঐক্যের নিদর্শন যতই বেশী মনে হোক না কেন, আজ সন্দেহ নাই যে পাকিস্থানের দাবীতে বিভিন্ন প্রদেশ লীগ সংগঠন থেকে ক্রমে বিযুক্ত হয়ে পড়তে বাধ্য। তবু পাকিস্থানের দাবী ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একটী উপকার করেছে। এই দাবীর ফলে কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় নিয়ে নতুন করে ভাবছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের রূপ, প্রকৃতি ও পরিমাণ নিয়েও আজ আলোচনা উঠেছে। বিভিন্ন ভূখণ্ডের ও তথাকার জনসাধারণের স্বনিয়ন্ত্রণের জন্য যে দাবী পাকিস্থানের মধ্যে নিহিত, ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তার মূল্য অনেকখানি, এবং কম লোকেই তাকে অস্বীকার করবে। বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব বাধে তখন, যখন স্বনিয়ন্ত্রণের চেয়ে ভারত-বিভাগের দিকে ঝোঁক পড়ে বেশী, অথচ আমরা দেখেছি যে কেবলমাত্র বিভাগের মধ্যে কোন রাজনৈতিক সমস্যারই সমাধান মেলে না। সে সঙ্গে এটাও লক্ষ্যণীয়

যে লীগও নিজের পূর্ব্বের জিদ খানিকটা নরম করে এনেছে। গণসংসদ লীগ পূর্ব্বে কোন দিনই মানতে চায়নি, কিন্তু এখন লীগও স্বীকার করছে যে সমস্ত মুসলমানের মতামত নিয়ে পাকিস্থানের প্রশ্নের মীমাংসা হবে। অবশ্য এখনো লীগের দাবী যে কেবলমাত্র মুসলমানের ভোটেই এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করতে হবে, কিন্তু ১৯৪০ সালে লীগ তাতেও রাজী হয়নি। তখন লীগ বলেছে যে লীগ চায় বলেই ইংরেজ রাজশক্তিকে পাকিস্থান মঞ্জুর করে নিতে হবে। কংগ্রেসেরও খানিকটা মত পরিবর্ত্তন দেখা যায়। বোম্বাইতে সম্প্রতি যে প্রস্তাব কংগ্রেস কমিটী গ্রহণ করেছে, তাতে প্রাদেশিক সরকারের হাতে সমস্ত উদ্বৃত্ত শক্তি থাকবে একথা স্বীকার করে প্রকারান্তরে প্রাদেশিক স্বনিয়ন্ত্রণ স্বীকার করা হয়েছে। পূর্ব্বে কোন দিন কংগ্রেস প্রদেশের হাতে এতটা শক্তি দিতে স্বীকার করেনি। আজাদ কনফারেন্সে সম্মিলিত বিভিন্ন দল ভারতীয় রাষ্ট্ররূপের যে পরিকল্পনা করেছিল, কংগ্রেসের বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে তাকে প্রায় সম্পূর্ণ স্বীকার করা হয়েছে। হিন্দু মহাসভার মনোভাবেরও যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তাতে বিভিন্ন ভারতীয় রাজনৈতিক দলের মধ্যে বোঝাপড়া আজ পূর্ব্বেকার চেয়ে সহজ মনে হয়। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে যে সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি সক্রিয়, তার ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন দলের মতানৈক্য শিথিল হয়ে আসতে বাধ্য—যদি না আসে তবে ভারতবর্ষের পক্ষে তার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে ?

ভাদ্র, ১৩৪৯

পরিশিষ্ট

এ প্রবন্ধটী গত বৎসর রচিত। কংগ্রেস শ্রাবণ মাসে বোম্বাই প্রস্তাব গ্রহণ করায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, ভারতের জনসমুদ্রে যে উদ্বেলতা আসে, আজো তার স্বরূপ বা শক্তি নির্ণয়ের দিন আসে নাই। লীগ ভাদ্র মাসে কংগ্রেসের প্রস্তাবের জবাব দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার মধ্যেও জিন্না সাহেবের নেতৃত্বের দুর্ব্বলতা শোচনীয় ভাবে ধরা দেয়। কংগ্রেসকে কটূক্তি করেই তিনি কর্ত্তব্য উদযাপন করেন কিন্তু ভারতীয় শাসনসঙ্কট সমাধানে লীগেরও যে দায়িত্ব আছে এরকম কোন ইঙ্গিত সে সময় দেখা দেয় নাই। গান্ধীজীর উপবাসে আর একবার সমগ্র দেশে চাঞ্চল্য আসে—একমাত্র লীগ ভিন্ন বাকী সমস্ত দল সমবেত ভাবে গান্ধীজীর মুক্তি ও ভারতীয় অচল অবস্থার অবসানের চেষ্টা করে।

অবশ্য বীর সাভারকরের সঙ্গে এ সময়েও জিন্না সাহেবের অদ্ভুত মতৈক্য দেখা যায়। স্যর সিকান্দারের আকস্মিক মৃত্যুতে ও আততায়ীর হস্তে আল্লাবক্স নিহত হওয়ায় আবার নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। লীগের কার্য্যক্রমেরও নিগূঢ় পরিবর্ত্তন হয়েছে মনে হয়, কারণ ইংরেজ রাজশক্তির সাহায্যে মুসলমান সংখ্যাগুরু প্রদেশে লীগমন্ত্রিত্ব কায়েম করার যে চেষ্টা নির্লজ্জভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে, কোন গোপন সমঝোতা ভিন্ন তার অন্য কারণ বোঝা যায় না। জিন্না সাহেবের রূপান্তরও জনসাধারণকে বিস্মিত করেছে, কারণ বর্ত্তমানে ইংরেজ রাজশক্তির কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির পুনরাবৃত্তি ভিন্ন তাঁর আর অন্য কোন বক্তব্য নাই। আসামে, সিন্ধু দেশে, বাঙলায় ও সীমান্ত প্রদেশে প্রাদেশিক লাটেরা লীগমন্ত্রিত্ব গঠন ও কায়েমী করবার জন্য যে ভাবে নিয়মতান্ত্রিক সমস্ত রীতি ও রুচিকে লঙ্ঘন করেছেন, জিন্না সাহেবের নব বিকশিত বৃটিশ সাম্রাজ্যপ্রীতির পুরস্কার ভিন্ন তার আর কোন অর্থ হয় না। দিল্লীতে জিন্নাজী সদম্ভে বলেছিলেন যে গান্ধীজী যদি তাঁকে পত্র লেখেন, তবে সে পত্র আটকাবার সাহস ভারত-সরকারের হবে না। গান্ধীজী জিন্নাজীকে চিঠি লিখলেন, ভারতসরকার সে চিঠি বন্ধও করলে কিন্তু এখন আস্ফালনের বদলে জিন্নাজীর কণ্ঠে করুণ আর্ত্তনাদের সুরই বেজে উঠল! এ সমস্ত ঘটনাই এত সাম্প্রতিক যে প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাদের বিচার কঠিন। বিশেষভাবে পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের পশ্চাদপটে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ যে বিক্ষোভ, তার গতি ও লক্ষ্য কোথায় কোন বন্দরে নিয়ে আমাদের ভাঙা তরীকে তুলবে, কে বলতে পারে?

আষাঢ়, ১৩৫০

একটি নিবেদন

অরুণ মিত্র

সুবর্ণ হাসির তীর বেঁধাও দেওয়ালে
ঝাঁকে ঝাঁকে, তারা সব ভোঁতা হয়ে ঝরে।
তূণ কেন শূন্য করো ? পোষাবে না পরে
এতখানি মেহনৎ। এবার কপালে
চমৎকার ভাগ্যলিপি লিখেছে সরকার :
অন্নবস্ত্র নিরুদ্দিষ্ট, হয়তো গ্রেপ্তার।
সেই নগ্ন দিনের খাতিরে
কিছু বাণ থাক্ না তূণীরে !

এবার

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

মেরুর বরফ-দিন ঝাঁক ঝাঁক বকের মতন
মুছে দিয়ে যায় মাঠ, সবুজ মাঠের দেশ, তারপর ধোঁয়াটে সহর :
মুছে দিয়ে যায় ধূধূ সাদায় আকাশ
বরফের বোবা আলো, বরফের মেঘ।
আবার কি ফিরে এলো বরফের দিন ?
পৃথিবী কফিনে ঢাকা, বরফের পাথুরে কফিন।

ধোঁয়ার মতন নড়ে হাওয়ায় এ কাদের আওয়াজ ?—
ফাঁকা, ফিকে, ফিস্‌ফিস্ কথা ?—
কা'রা কথা কয়—উঁচু কথা ?—
তবু ফাঁপা কাদের আওয়াজ ?

আলো জ্বলে। মেরুর আলেয়া ?
মশাল ? মশাল কেন ?—
জীবন জাগাতে এলো নূতন এথেন্স ?
জ্বলে কি মোমের শিখা ? কফিন মোমের সারে ঘেরা।
কথা কয়, পথ খোঁজে কফিনের সাদা মানুষেরা।
কথা কয় কানাকানি করে :
"বুদ্‌বুদ পৃথিবী ফেটে মিশে যাবে বরফের ঝড়ে।"

সূর্য্য আছে : ফাটেনা পৃথিবী,
আবার দেহের তটে নূতন পিপাসা—
নূতন অরণ্য দিন পৃথিবীর ভ্রূণে তারপর—
সূর্য্যের সবুজ আলো নিয়ে আসে ঘাসের শরীর।
সূর্য্য আছে, আছে মাটি, ফিরে আসে আকাশ ও চাঁদ—
তারপর আর কিছু শোনা যায় ? মানুষের নূতন নিনাদ ?

সূর্য্য থাকে কালো কালো ত্বকের আড়ালে,
নাইল আর তাইগ্রিস্, গঙ্গা, ইয়াংসির তীরে তীরে,
মানুষের অপরূপ ছায়া
পিরামিডে, ক্যারাভানে, লাঙ্গলের ভেজা মেটে পথে।
এবার এদের দিন, দিন ভরা এদের শপথে।

তাজমহলের চূড়া, পিরামিড উঁচু হয়ে ওঠে
কালো মানুষের মন এনে দিল পাথরের পাখা—
সূর্য্য আর পৃথিবী এদের
এদের পেশীতে কাঁপে পৃথিবীর স্বপ্নরেখাগুলো।
বেঁচে আসে পাহাড়ের রূপকথা—চীনের ড্র্যাগন
চোখ মেলে চায় ফের নিনেভ-ওফির ব্যাবিলন॥

শক্তি

সুধীরকুমার চৌধুরী

ধর্ম্মনীতি হতে
শক্তি বহু গুণ বড়, সারথি রহিলে তার রথে
ভালবাসা। শক্তি যদি প্রেমের প্রভাবে
নিজেরে নিজের মাঝে খুঁজে পায়, তাহার স্বভাবে
চাঞ্চল্যের যত বেগ, অলক্ষ্য সে আবর্ত্তের টানে
আপনার মাঝে এসে শান্ত হয়, তবে সেইখানে
জাগে যে সংহতি, তার স্থিরজলে ফোটে চুপেচুপে
কল্যাণের শতদল তৃপ্তি মুক্তি আনন্দের রূপে।

শক্তিহীন দেবতারে কে চাহে রে, ক্লীব দেবতারে,
বর দিতে কিছু নাই, দণ্ডও যে দিতে নাহি পারে ?
দেবতার মত হয়ে এ-জীবনে পাব দেবতাকে,
বর দিতে পারি যেন, দণ্ড দিতে সাধ্য যেন থাকে।

দুর্ভাগ্যের দিনে,
দেবতারে কি জানাস্ ? কিছু কভু পায় শক্তিহীনে ?
দেবতার বর তারও ভার আছে, শুধু হাত জোড়
ক'রে তারে পেতে চাস্, নেবার মতন কই জোর
হাতে তোর, সেই তোর শক্তি-পরিমাপ ?
পাষাণে খুঁড়িস্ মাথা, আর্ত্তকণ্ঠে জুড়িস্ বিলাপ,
এমন করিয়া পেয়ে সুখ আছে, বল্ ?
নতি-বিনতিতে কিছু নাই ফল
হেন মর্ম্মান্তিক কথা বলিব না, তবু দেবতার
কাছে যেতে পথে চাই শক্তিরূপে রূপান্তর তার।

আজ এই কথা আরো ব'লে যাই সবাকারে ডেকে,
দেখেছি পুত্রের মৃত্যু আমি তার শয্যাপার্শ্বে থেকে
শিথিল দেহে ও মনে। আত্মায় সে কি যে শিথিলতা
করেছিনু অনুভব সেইদিন, আজ তার কথা
মনে হয়ে ভাবি ব'সে, এর মাঝে কোথায় কল্যাণ ?
দেবতার সাথে মোর সেদিনের সেই ব্যবধান
কি চরম ! সেই দিন শক্তিহীনে, সর্ব্বশক্তিধরে
হ'ল যেই ছাড়াছাড়ি, ঘোচেনি তা এত বর্ষ পরে !
হতাম দেবতা আমি, ব্যবহার দেবতার মত,
সেদিনের সেই মৃত্যু রুধিবারে সাধ্য যদি হ'ত।

তোদেরে শুধাই, যদি মানুষ সে শক্তি পেত হাতে,
তবে কোনোদিন তার মন আর যেত কি হত্যাতে ?
"হত্যা করিও না," সব শাস্ত্রে বলে, এ কি রে বিস্ময়,
"মৃতেরে জীবন দিতে শেখো" কেন কভু নাহি কয় !
মৃতেরে জীবন দিতে মানুষ শিখিবে যেই দিন
"হত্যা করিও না" এই ধর্ম্মনীতি হবে অর্থহীন।
প্রেম হলে দ্বিধাহীন, শক্তি হলে অবাধ প্রসর,
ধর্ম্মনীতি ধরা হতে আপনি মাগিবে অবসর।

হাওয়াখানা

দিনেশ দাস

হাওয়াখানা চুপচাপ !

দূরে ওই দেখছ না
আকাশের লাঞ্ছনা ?
ওড়ে ওই ছেঁড়া কালো উড়্ণী,
এলোমেলো
ঝড় এল ঝড় এল
ঘুরপাক্ খায় লাখ্ ঘূর্ণী।

তট ভাঙে ঝুপঝাপ।
হাওয়াখানা চুপ্চাপ !

ঢেউয়ের মতই ঝড় মোচ্ড়ায়
দুলে ওঠে ফুলে ওঠে আছ্ড়ায় আছ্ড়ায়,
পাল ভাঙে হাল ভাঙে
ছেঁড়ে কাছি ছেঁড়ে মাঝি অস্থির ;
পড়ে তীর ওড়ে নীড় চৌচির।

দেয়ালের আড়ালেতে জমে ঘুম
হাওয়াখানা চুপ্চাপ নিঝ্ঝুম।

কান্না !
পালকের মত বুক
ধুকপুক্ ধুকপুক্
অসহায় কাৎরায় হাত্ড়ায়।

পিষে যায় মিশে যায়
ছোট ছোট কচিমুখ
ছোট ছোট চুণী আর পান্না
প্রাণ বলে, আর না। আর না।

তট ভাঙে পট ভাঙে হুপ্‌দাপ
হাওয়াখানা তবু চুপ, চুপ্‌চাপ!

একে একে তারা ফোটে রাত্রে
ভ'রে ওঠে আকাশের পাত্র,
তারার মতই কত
চক্‌চকে লাখো ক্ষত
আঁকা হ'ল এ-মাটির গাত্রে,
জান্‌লনা কেউ কণামাত্র।

রাতের শিশির কাঁদে টুপটাপ,
হাওয়াখানা চুপ্‌চাপ
হাওয়াখানা চুপ্‌চাপ।

অভিজ্ঞানবসন্ত

আবুল হোসেন

আবার বসন্তের হাওয়া দিল শহরে :
ঝিরঝিরে সোনালি সকাল আর তুলোওড়া বৈকাল
গরুর চোখের মতো রাতে এসে মেশে,
প্রাসাদের পাহাড়ে পাহাড়ে প্রশান্ত আকাশ ঘেষে
নীল নীল নরম জ্যোৎস্না পাখা ঝাড়ে—
একদল নীল কাক বিকেলের স্রোতহীন নদীতে।

দূরে কোন্ দোতালার ঘরে বারে বারে সুর ভাজে
এমন একটি কানায় কানায় ভরা কুমারীর মতো
সবুজ সোফায় কাল ফেটে পড়ে শেষেরকবিতালাস্যে।
এমন চাঁদিনী রাতে আমাদের মরা ভালো ভাই !

ছোট্ এ ভুবনে আজি ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই,
আমাদেরই সোনার শ্রমে ভরেছে শহর ;
জীর্ণ এ গলিতে তাই বর্ষা শীত গ্রীষ্মে জমে জমে
বেঁধেছি ডেরা।

আর ক্ষণে ক্ষণে শুধু মনে মনে ভাবি :
আজি হতে শত বর্ষ পরে নিবীড় নিঃশব্দ কৌতূহলে
নিভৃত বিরলে—হয়ত মনে গভীর মমতা—পৃথিবীর কোথায়
কোন্ কোণে তোমরা পড়ছ এ কবিতাটি রঙচটা পোকাকাট্া
একটি পাতায় : উপমা অলংকার আর
আঙ্গিকের সরু মোটা টান—একটি কবিতা শুধু।

কী বুঝবে তোমরা এই আহুতির অসহ্য ব্যথা ?

সাহিত্যে যৌনপ্রসঙ্গ ও বর্তমান সমাজ

আবু সয়ীদ আইয়ুব

নালিশ শোনা যায় যে মাণিক বাঁড়ুয্যের সাম্প্রতিক লেখায় সেক্স্ এবং সেক্স্-ঘটিত মনোবিকারের বড় বাড়াবাড়ি। কথাটা যদি বাজারে চল্‌তি বা চল্‌তি হবার উমেদার কোনো লিখিয়ে সম্বন্ধে উঠত তা হলে ভাববার কিছু ছিল না। উপন্যাস যত পানসেই হোক তাকে চালু করবার সহজ অথচ অমোঘ উপায় হচ্ছে সেক্সের ঝাল-মসলাটা বেশ ক'রে মাখিয়ে দেওয়া ; তাতে সাহিত্য-রসিকের মুখে যদি নাও রোচে, বেরসিক হাজারও পাঠকের জিবে জল আসবে। অথবা ধ'রে নিতে পারতাম যে খোদ্ লেখকের মনটাই বিকারগ্রস্ত। কিন্তু "পদ্মা নদীর মাঝী", "পুতুল নাচের ইতিকথা" কিম্বা "সহরতলী"র রচয়িতাকে তো এত সহজে বরখাস্ত ক'রে দেওয়া যায় না। ঐ তিনটে উপন্যাসে এবং কয়েকটি ছোট গল্পে দেখেছি তাঁর মনের সুস্থ মাত্রাজ্ঞান ও তীব্র সংবেদনশীলতা, তাঁর টেক্‌নিকের মজবুৎ গাঁথুনি, তাঁর ভাষার নিপুণ গৃহিণীপনা। এও দেখেছি যে তাঁর সব চেয়ে খুঁৎখুঁতে সমালোচক তিনি নিজেই। এমন একজন লেখক নিছক খেয়ালের বশে কিম্বা বাজারের ফর্‌মায়েশে একটা কিছু নিয়ে মাতামাতি করবেন এটা কোনো কাজের কথা নয়। অথচ নালিশটা যে একেবারে ভুয়ো তাও বলতে পারিনে।

যাঁদের আমরা বলি ভদ্রলোক, সংখ্যায় নগণ্য হলেও তাঁরা নানা কৌশলে সমস্ত সমাজটাকে এমন ক'রে হাতের মুঠোর মধ্যে ধ'রে রেখেছেন যে তাঁদের বেশ খানিকটা গণ্য না ক'রে উপায় নেই। এই ভদ্রসন্তানরা যত দিন সমাজ-শাসন ও পরিচালনার ভার নিজের হাতে রাখবেন, আইন গড়বেন, আদালত করবেন, দর্শন-বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় প্রশাখায় নিজের একচোখা মনের ছাপটি এঁকে চলবেন, ততদিন সাহিত্য থেকে এঁদের বিতাড়িত করবার চেষ্টা নিরর্থক। চোখ বুজে সাহিত্যের আসরে এঁদের অস্তিত্ব লোপ ক'রে সান্ত্বনাটা কী যখন চোখ খুললেই দেখতে পাই এঁরা অক্‌টোপসের মত আট পায়ে সমাজটাকে আঁকড়ে ব'সে রয়েছেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাঁরা শ্রমিক সাহিত্য দাবী করছেন তাঁরা

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—চতুষ্কোণ

সাহিত্যকে এগিয়ে দিচ্ছেন না, গুলিয়ে দিচ্ছেন মাত্র। শ্রমিকতন্ত্র স্থাপনের পূর্বে শ্রমিক সাহিত্য নিয়ে দাপাদাপি এক ধরনের উবুড়-করা আইভরি টাওয়ারবিলাস। তবে বুর্জোয়া সমাজের বাইরের ব্যবস্থায় যেমন ভাঙন ধরেছে, তার মনের ভিতরেও তেমনি বিকার ঢুকেছে। সে-বিকারের প্রভাব সমগ্র সমাজ-দেহের উপর অনিবার্য এবং অপরিমেয়। যে-কারণে হোক বুর্জোয়া গোষ্ঠীর অনুভূতি ও ভাবনা আজ যদি শারীরিক বৃত্তিবিশেষের সঙ্গে খুব ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে চলে, তা হলে তো আজকের সাহিত্যিক তার ধোপদোরস্ত কোঁচাটিকে আল্‌গোছে তুলে পাশে স'রে দাঁড়াতে পারে না ; তাকে যে এই কাদা-ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে—যদি একে কাদা ঘাঁটাঘাঁটি বলতে চান—নেবে আসতেই হবে। সেই কারণটা কী বরঞ্চ তার খোঁজ নেওয়া দরকার।

আজকের দিনে যেমন সেক্স্, তেমনি 'বিশুদ্ধ প্রেম' নামক দূর-আকাশবর্তী এক বাষ্পনীহারিকার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করত উনিশ শতকের সাহিত্য। রোম্যান্টিকদের এই প্রেম আমাদের মানসিক পরিবেষ্টনে এতখানি জায়গা জুড়েছে যে আমরা সহজেই ভাবি এ এক চিরন্তন প্রবর্তনা, সাহিত্যের সঙ্গে এর যোগ স্বতঃসিদ্ধ ও শাশ্বত। হক্সলি বা কড্‌ওয়েল্ মনে করিয়ে দিলে ভাবতে অবাক লাগে যে এরও ইতিহাস আছে, আদি অন্ত আছে। অথচ মাত্র কয়েক শতাব্দী পার হয়ে রেনেসাঁস্ যুগটা ছাড়িয়ে গেলে আমরা আর রোম্যান্টিক প্রেমের পাত্তা পাই না, না সমাজে না সাহিত্যে। তার মানে এ নয় যে এমন এক সময় ছিল যখন নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল না। সে-আকর্ষণের উৎপত্তি খুঁজতে হলে মানবেতিহাসের বহু কোটি বৎসর পূর্বে প্রাণীলোকের নিম্নতম স্তরে গিয়ে হাজির হতে হয়, যেখানে বংশবৃদ্ধির উপায় স্ত্রী ও পুং প্রাণীর সঙ্গম নয়, লিঙ্গবিহীন জীবাণুর বিভাজন। নারী-পুরুষের শারীরিক ও মানসিক আকর্ষণকেই যদি প্রেম বলেন তা হলে বলতে হয় যে প্রেম সম্বন্ধে প্রাচীনদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অন্য রকম, আজকের প্রায় বিপরীত। রোম্যান্টিকদের কাছে প্রেম হলো এক স্বর্গীয় বা ঐশী প্রেরণা, মানবজীবনের যা শ্রেয়তম ও সুন্দরতম তারি নির্যাস। প্রাচীন যুগে প্রেমের সাক্ষাৎ যদি বা পাই (বিশুদ্ধ সেক্সের কথা বলছি না) যেমন হেলেনের প্রতি প্যারিসের প্রেম, তার সম্বন্ধে গদ্‌গদ ভাবোচ্ছ্বাস দেখা যায় না। বরঞ্চ তাকে ভাবা হয় যেন মানুষের ভূতে-পাওয়া দশা, অথবা এক ভয়াবহ ব্যাধি যার কবলে পড়লে আর রক্ষা নেই, কিন্তু কবলে না পড়ার জন্য যথাবিহিত চেষ্টা করাই সুস্থ লোকের কর্তব্য।

মানুষ এক দিকে হল দলচর জীব, সামাজিক বোধ ও প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ,

বহুলোকের সহযোগিতায় পরিপালিত, তাদের দাবী মেনে চলতে এবং তাদের উপর দাবী খাটাতে অভ্যস্ত। সে চাষ করে একজোট হয়ে, শীকার করতে যায় দল বেঁধে, লড়াইয়ের ময়দানে সে সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক। তার উৎসব-অনুষ্ঠান পালাপার্বন নৃত্যগীত সমস্তই সম্মিলিত। অন্যদিকে তার সেক্স তাকে করেছে যূথভ্রষ্ট, মিথুনচারী। সমাজের প্রতি সে বিমুখ, জনতার মধ্যে মাত্র একজন তার সকল আগ্রহ কেড়ে রেখেছে। তার সেই একেলার সঙ্গিনীকে নিয়ে সে নীড় বাঁধবে, বেড়া তুলবে, পর্দা টানবে। ফিউডাল যুগের কবি ওমর খৈয়াম বনজঙ্গলের মাঝখানে তাঁর প্রিয়ার সঙ্গে ব'সে এক টুকরো রুটি আর এক পেয়ালা মদ নিয়ে স্বর্গরচনা করবেন। বনজঙ্গলের মাঝখানে কিন্তু ঐ দুটি বস্তু কোথা থেকে জুটবে এবং ফুরিয়ে গেলে দিনের পর দিন জুটতে থাকবে—এই গদ্য চিন্তাটা কবির মনে না আসারই কথা। তবে স্বর্গরচনার ব্যাপারে প্রিয়ার সঙ্গে পাঁউরুটির মূল্য-সমীকরণে যে-অকবিজনোচিত কাণ্ডজ্ঞান ও স্পষ্টবাদিতা প্রকাশ পেয়েছে তা খৈয়ামী চতুষ্পদীর দুর্লভ বৈশিষ্ট্য। রুটির অত্যাবশ্যকতা অবশ্য সবাই একবাক্যে মেনে নেবে; কিন্তু মদের পাত্র না হলে কি ভূস্বর্গের খস্‌ড়াটা অসমাপ্ত থাকত? থাকত বোধ হয়, কারণ কবিও যে সামাজিক জীব, সমাজের হাজারো লোকের সঙ্গে দায়িত্বের হাজারো সূত্রে বদ্ধ, সেটা তো সহজে ভোলা যায় না, তার জন্য ইরাণী সুরার ঘন ঘন প্রয়োজন। শ্রেণীবিভাগের পাকা ব্যবস্থায় লালিত কবি রবীন্দ্রনাথ সমাজ থেকে আরও দূরে সরে এসেছেন; নিজের সামাজিক অস্তিত্বটাকে ভুলবার জন্য ইরাণী সুরা তাঁর দরকার নেই। বর্ষার দিনে প্রিয়ার চোখে চোখ রেখে তিনি সরাসরি বলতে পারেন :

সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,
আঁধারে মিশে গেছে আর সব।

সেই "আঁধারে" সামাজিক মানুষের সত্তাও লোপ পেয়েছে।

মানুষের এ দুটি দিকই যখন মৌলিক ও চিরন্তন, তখন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সাহিত্যে ও শিল্পসৃষ্টিতে দুটি ধারাই যুগে যুগে প্রবহমান থাকবে। কিন্তু সাহিত্য একটা থেকে আর একটাতে দোলা খেয়ে এসেছে, কোনো এক সময়ে দুটোকে সমানে কোল দিতে পারে নি। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে sex এবং

herd instinct যতদিন instinct মাত্র ছিল ততদিন তারা সাহিত্যের উপাদান হতে পারে নি, ততদিন সত্যিকার সাহিত্য বা যে-কোনো প্রকার শিল্পকলা জন্মাতেই পারে নি। যখন সেগুলি নিছক উপজ্ঞা থেকে হৃদয়াবেগের স্তরে উপনীত হলো, মানুষ তখনই হলো শিল্পী, চাষবাসের, যুদ্ধবিগ্রহের বাইরে সে এমন একটা কিছুর সন্ধান পেল যা জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক না হলেও জীবন-সম্ভোগের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান, যা সে অন্যকে দিতে এবং অন্যের কাছ থেকে পেতে উৎসুক। প্রাচীন যুগের সাহিত্যে, হোমর হিসিয়ডের মহাকাব্যে দেখা যায় যে প্রেম তখনও তেমন পরিস্ফুট বা পরিব্যক্ত নয়, তাতে মুখ্যত প্রকাশ পেয়েছে সামাজিক অনুভূতির বিস্তার ও গভীরতাই। প্রাচীন যুগে এটাই স্বাভাবিক, কেন না সেক্স্ অনেক কাল কেবল শারীরিক প্রবর্তনা-রূপে থেকে গেলেও জীবন-যাত্রা অচল হয় না, কিন্তু ছোট ছোট উদ্বাস্তু শিকারী মানুষের দল যখন কৃষি-প্রধান জনবহুল শক্তিও সমৃদ্ধিশালী সমাজে পরিণত হয় তখন herd instinct-এ আর কুলোয় না, আত্মচেতন সামাজিক বোধের বিকাশ একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে। এই নবপরিস্ফুট সামাজিক চৈতন্য থেকেই মহাকাব্যের জন্ম, এবং একে পরিপুষ্ট করাতেই তার সার্থকতা।

সেক্সের মানসিক বিকাশ প্রেম এল অনেক বিলম্বে, সভ্যতার অনেকখানি অভিব্যক্তির পর। ফিউডল যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগে আসতে সব চেয়ে বড় পরিবর্তন যা চোখে পড়ে তা হচ্ছে সমাজে মানবিক সম্বন্ধের ক্রমঃহ্রাস এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। সাম্যতন্ত্রের ভগ্নাবশেষ কিছু এখনো জমিদারী প্রথার মধ্যে টিকে রয়েছে। প্রতাপশালী জমিদার যদি বা প্রজাকে অন্যায় উৎপীড়ন ও শোষণ করে তবু প্রজাদের জীবন থেকে সম্পর্কচ্ছিন্ন নয় তার জীবন, তাদের সুখদুঃখের খবর ও ভার কতক পরিমাণে না নিয়ে সে থাকতে পারে না। কোম্পানির মালিকের সঙ্গে কারখানার মজুরের যে-সম্পর্ক তার সঙ্গে এর তুলনা করলে দেখা যাবে যে দুটোর প্রভেদ শুধু মাত্রাগত নয়, জাতিগত। একটাতে হৃদয়বৃত্তির বিকাশের রাস্তা খোলা আছে, আরেকটাতে নেই। মার্কস্-এর ভাষায় "বুর্জোয়ারা মানুষের সঙ্গে মানুষের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে ফেলে বাকি রেখেছে কেবল নগ্ন স্বার্থের, নির্মম দর-কষাকষির যোগসূত্র।" অনুভূতির সামাজিক স্রোতধারা অবরুদ্ধ হয়ে অন্য দিকে বাঁক ফেরাল, যুগল প্রেমের খাদে বইতে লাগল। সেই সঙ্গে মধ্যযুগীয় ধর্মের কড়া অনুশাসন সেক্সের শারীরিক বিকাশকে অহৈতুক বিধি-নিষেধের বেড়াজালে ঘিরে মনের দিকে তার প্রসার অস্বাভাবিক রকম ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুল্‌ল। এ দুটি মূল কারণ থেকেই রেনেসাঁস্ যুগের রোম্যান্টিক্ প্রেম উদ্‌ভূত। উনিশ

শতক পর্যন্ত সাহিত্যে সর্বত্র তার বোল বোলাও, কবি মানেই প্রেমিক, উপন্যাস মানেই প্রেমের কাহিনী।

বিশ শতকে আবার হাওয়া গেল পাল্‌টে। প্রেমের কবিতা লেখা এক রকম বন্ধ হয়ে এল, উপন্যাসে বিশুদ্ধ প্রেমের জায়গা নিল নির্জলা সেক্স্‌। এর জন্য প্রথমতঃ দায়ী ভিয়েনীজ্‌ স্কুলের মনোবিকলন-তত্ত্ব। বিস্তর তথ্যাদি ঘেঁটে তাঁরা সাব্যস্ত করলেন যে অত্যন্ত খাঁটি শেলী-মার্কা সেই-যে the worship that the heart lifts above, and the heavens reject not—তার পেছনেও রয়েছে চাপা লিবিডোর প্রবল তাড়না। এর ফলে সেক্স্‌ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা যেমন বাড়ল, স্নায়বিক চাঞ্চল্যজনিত যে-কৌতূহল এতদিন ধামাচাপা ছিল তাও তেমনি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। লেখাপড়ায় কথাবার্ত্তায় চিন্তা-ভাবনায় সর্বত্রই প্রসঙ্গটির ছড়াছড়ি এবং বাড়াবাড়ি। সাহিত্য তার আক্রমণ ঠেকাতে পারবে কেন। দ্বিতীয়তঃ, গত মহাযুদ্ধের সর্বনাশা আবর্তনে মানুষের সমস্ত চরম মূল্য গেল তলিয়ে, এক বিশ্বব্যাপী অনাস্থা ও অবিশ্বাস সারা য়ুরোপের—ফলে সারা পৃথিবীর—চিত্ত ভাসিয়ে দিলো। প্রেম ছিল অন্যতম প্রধান মূল্য, তার বেলায়ও ব্যতিক্রম ঘটল না। মানুষের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ সইতে না পেরে পঞ্চশর তাঁর তূণটি বগলদাবা ক'রে কেটে পড়লেন। বুর্জোয়া মূল্যের বিনাশকে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার ভাঙনের পূর্বাভাস মনে করা অসঙ্গত নয়। আর্থিক জগতে যার নাম দেওয়া হয় capitalist crisis, মূল্য-বোধের উপপ্লবকে তারি আধ্যাত্মিক প্রতিফলন বল্‌তে পারেন। এক সভ্যতার পতন এবং আর এক সভ্যতার উত্থানের মাঝখানকার সময়টা স্বভাবতই অরাজকতার সময়। এই সময়ে আদিম মানুষের প্রবৃত্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বিজ্ঞানে বলে প্রকৃতি না কি vacuum বর্‌দাস্ত করতে পারে না। সভ্যতার ফাঁক ভরবার জন্য তাই ছুটে আসে মানুষের অবদমিত বর্বরতা। তাই ফ্যাশিস্ট্‌ দেশের মাথায় রক্ত চাপে, সংস্কৃতির নাম উঠলে হাত যায় পিস্তলের দিকে। তাই ক্যাপিটলিস্ট্‌ দেশে প্রচণ্ড বেগে সেক্সের চর্চা চলে, জন্মায় যৌন-বিকার, মানসিক ব্যাধি এবং ব্যাধির প্রতি আসক্তি।

এই সামাজিক পটভূমিকার উপরই "চতুষ্কোণ" উপন্যাসের চরিত্রগুলি আঁকা হয়েছে। বইয়ের চতুষ্কোণ নামটিতে বোঝায় সেই শেল্‌ফে আল্‌মারিতে টেবিলে চেয়ারে এবং রাজকুমারের ভাবনায় দুর্ভাবনায় স্বপ্নের বিকারে দিবাস্বপ্নের জঞ্জালে

ঠাসা ছোট ঘরটিকে। কিন্তু "চতুষ্কোণ" বলতে আরও কিছু বোঝায়। নাম-করণে ইঙ্গিত রয়েছে সমাজের সেই সংকীর্ণ কক্ষটির দিকে যা উত্তেজনার উপকরণ-বাহুল্যে ঠাসা, যেখানে বিরাট পৃথিবী ও বৃহৎ সমাজের আলো-বাতাস পৌঁছয় না, যার বাসিন্দাদের প্রচুর অবসর শুধু নিরানন্দ আমোদের পেছনে ধাবমান এবং বিক্ষুব্ধ। উপন্যাসের নায়ক রাজকুমার যখন এক চতুষ্কোণে ব'সে ব'সে বই প'ড়ে, আর শুয়ে শুয়ে হাজারো এলো-মেলো ভাবনা ভেবে হাঁপিয়ে ওঠে, তখন সে বেরিয়ে যায় অন্য চতুষ্কোণটিতে। সেখানে যাদের সঙ্গে তার সংস্পর্শ তারা তাকে আঘাত করে কিন্তু জাগিয়ে তুলতে পারে না, উত্তেজিত করে উৎ-প্রাণিত করতে পারে না; তাদের ঘোরানো-প্যাঁচানো বাঁকানো-চোরাণো জীবন তার জীবনকে জটিলতর ক'রে দেয়, সিদ্ধি বা শান্তির কোনো রাস্তাই বাৎলে দিতে পারে না। বিভ্রান্ত রাজকুমার ফিরে আসে তার পূর্ব চতুষ্কোণটিতে। আবার ভাবে, বই পড়ে আর স্বপ্ন দেখে—এমন সব স্বপ্ন যা ফ্রইড্, আদ্‌লার, জোন্‌সের বইয়ের সেরা দৃষ্টান্ত হতে পারত। এমন মানুষের মনে বিকার না এসে পারে না। নারী সম্বন্ধে রাজকুমারের চৈতন্য অস্বাভাবিক প্রখরতা লাভ করে। নারীকে কিন্তু সে ভালবাসে না, তার আসঙ্গও সে চায় না, সে কেবল তার সুপরিচিতা কোনো মেয়ের নগ্নদেহ একবার চোখ ভ'রে দেখবে। এই বাসনার এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খাড়া ক'রে নিজের মনকে সে চোখ ঠারে। কিন্তু তাতে শান্তি কৈ। তার জীবন এগিয়ে চলে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে, বিকারের দিকে।

কোনো কোনো পাঠক অনুযোগ করেছেন যে বইটা যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তব নয়। নায়কের মনের গড়ন যেমন সৃষ্টিছাড়া, তার জীবনের ঘটনাগুলিও তেমনি অভূতপূর্ব, আশপাশের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।—সাহিত্যের বিচার কি আশপাশের সঙ্গে মিল খুঁজেই করতে হবে? সাহিত্যিক কি দৈনিক কাগজের রিপোর্টার যে বাইরে যা যেমনটি ঘটছে সেটাকে ঠিক তেমনই টুকে এনে সকালবেলা আমাদের চায়ের টেবিলে হাজির করবে? মাণিক বাবুর লেখায় বিশেষতঃ "চতুষ্কোণে" কল্পনার ভাগটা প্রবল স্বীকার করছি, কিন্তু সে কল্পনা স্বৈরাচারী নয় কাজেই মিথ্যা নয়, তা শিল্পধর্মী অর্থাৎ সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসম্বদ্ধ। তাছাড়া রাজ-কুমারের চরিত্র কি সত্যিই খুব উদ্ভট বা অস্বাভাবিক? একটু তলিয়ে দেখলেই কি ধরা পড়ে না যে তার মনের গড়নের এমন কি তার বিকারেরও অস্বাভাবিকতা যতটা মাত্রাগত ততটা জাতিগত নয়। তাকে যদি আমরা আকারে ছোট ক'রে

দেখি, তার চড়া সুরটাকে একটু খাদে নাবিয়ে নিয়ে আসি, তাহলে দেখব যে রাজকুমারের মনের বৈশিষ্ট্য এবং বিকার তার স্বশ্রেণীর, তারই মত আধুনিক কালের প্রসাদলালিত অবসরভোগী মধ্যবিত্ত অনেক যুবকের মনের আনাচে কানাচে বর্তমান। ততটা দৃষ্টিগোচর নয় অবশ্য, কারণ এক দিকে তার মাত্রা অল্প, এবং অন্য দিকে সাধারণ পর্যবেক্ষকদের বিশ্লেষণী শক্তি অপটু। রাজকুমারের মন সর্বতোভাবে না হলেও মূলতঃ আর পাঁচ জনেরই মত, শুধু লেখক তাকে তাঁর মাইক্রস্কোপের সামনে ধরে বিরাট ক'রে দেখিয়েছেন। মাইক্রস্কোপে দেখা জিনিষ এক হিসাবে খুবই অস্বাভাবিক, সেই অস্বাভাবিকতা রাজকুমারের চরিত্রাঙ্কণেও পরিলক্ষ্য। তবে কি না লেখকের উদ্দেশ্য তাই ছিল, সেকথা ভূমিকাতেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রথম পাতার প্রথম লাইনেই দেখা যায় রাজকুমারের মাথা ধরেছে। সে নিজে স্বীকার না করলেও তার ডাক্তার বন্ধু অজিত জানে যে স্বাস্থ্য তার খারাপ। মানসিক ব্যাধিরও একটু ইঙ্গিত করল বন্ধু, সেটা কিন্তু ঠাট্টাচ্ছলে। তখনও সে বিকারগ্রস্ত নয়, তবে মন তার অনিবার্যরূপে এগুচ্ছে বিকারের দিকে। আমাদের চোখের সামনে বিকারের চিহ্নগুলি একে একে স্পষ্ট হয়ে ওঠে; উপন্যাসের আকার ক্ষুদ্র এবং লয় দ্রুত বলে ৭০।৮০ পৃষ্ঠার মধ্যেই আমরা একটি পুরোপুরি নিউরোটিক চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। এই নিউরোসিসের উদ্ভব ও ক্রমপরিণতি প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের সঙ্গে দেখানো হয়েছে। জানি না আধুনিক মনোবিকলন তত্ত্ব সম্বন্ধে মাণিক বাবু কতদূর অভিজ্ঞ। যদি তিনি অভিজ্ঞ না হন তাহলে তাঁর সহজাত গভীর অন্তর্দৃষ্টি আমাদের অবাক করে। যদি হন তবে তাঁর লেখায় পাণ্ডিত্যের সংযম ও নিরাড়ম্বর পশ্চাদপসরণ প্রকৃত শিল্পীরই যোগ্য। বহু দেশী ও বিদেশী ঔপন্যাসিক এ স্থলে libido, repression, regression, sublimation, voyeurism, censorship প্রভৃতি তত্ত্বকথা ও পারিভাষিক শব্দের পসরা বের ক'রে পাঠকের মনে চমক লাগাতে গিয়ে উপন্যাসটাই মাটি করতেন। আর এক দিক থেকে উপন্যাসের আরও ঘোরতর সর্বনাশ ঘটতে পারত কাঁচা লেখকের হাতে। বইয়ের যেটাকে ক্লাইম্যাক্স বলা যেতে পারে, যেখানে রাজকুমারের বিকৃত মনকে আসন্ন উন্মাদ-রোগের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সরসী তার জন্মজন্মান্তরের সংস্কার পদদলিত করে নিরাবরণ দেহে রাজকুমারের সামনে এসে তার নিউরোটিক খেয়ালের তৃপ্তিসাধন করল—সেই দৃশ্যটি এত ক্ষণভঙ্গুর, লেখকের বিন্দুমাত্র অক্ষমতা বা অসাবধানতার ফলে vulgarityর দিকে

ঝুঁকে পড়তে পারতো এত সহজেই, যে সমস্ত অধ্যায়টি আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়েছি, প্রতি প্যারাগ্রাফে প্রতি ছত্রে মনে আশঙ্কা জেগেছে এই বুঝি গেল সব। কিন্তু শিল্পীর পাকা হাত মুহূর্তের জন্যেও কাঁপে নি, কোনো রেখা বেঁকে যায় নি, কোনো রঙ একটু বেশি বা কম পড়ে নি।

লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

ষষ্ঠ কন্যা

সন্তোষকুমার ঘোষ

পুরণো হলেও একটা মাজাঘষা ভাব আছে, পরিচ্ছন্ন একটা শ্রী। ঝকঝকে তকতকে উঠোন, সেখানে কখনো বাসন কেন, ময়লাটুকুও পড়ে থাকতে দেখিনি। সিঁড়িটা সেকেলে বটে, উঠতে নামতে বাসুকির মতো মাঝে মাঝে থর থর করে কাঁপেও, কিন্তু ঝাড়া-পোছা সর্ব্বদাই। পুরণো শাড়ির টুকরোতেই হোক আর তালিদেওয়া ছেঁড়া শেমিজেই হোক, দরজা জানালাগুলোয় সবসময়েই পর্দ্দার লজ্জাবতী আব্রু।

আসবাবপত্রগুলোরও বৈশিষ্ট্য ছিলো বৈকি। সেকেলে দামী কাঠে তৈরি আসবাব, কালে কালে তার রঙের জেল্লা ধুয়ে গেছে, সেই সাথে গেছে দাম। কিন্তু মান যায় নি। তাদের মসৃনতা আজো অটুট। অতোগুলো ঘর, কিন্তু কোনটাতে এক ফোঁটা ঝুলও ঝুলছে না কড়িকাঠে গলায় দড়ি দিয়ে।

নৃত্যগোপাল বাবুকে দেখা যায় হয় কোন ইংরেজী উপন্যাস পড়ছেন, নয়ত সেদিনকার খবরের কাগজের পাতা উলটোচ্ছেন।

আমাকে দেখে বল্‌লেন,—এসো হে মাষ্টার। বোসো। ঘোড়ার খবরটা দেখছিলুম। আচ্ছা ঘোড়ার মারটা কি নসিবের মারের চেয়েও মারাত্মক মনে হয় তোমার?

সসঙ্কোচে বললাম, ও দুটো তো একই।

বললেন, তাই নাকি। ওই দেখ সেকেলে লোক, আধুনিক ভাষার প্যাঁচ কষতে গিয়েছিলুম, পড়ে গেলুম ধরা। তুমি এক টানেই আমার কব্জি ভেঙে দিলে। বলে হো-হো করে হেসে উঠলেন শিশুর মতো। তারপর অকস্মাৎ বললেন, আচ্ছা এবার আসল কথা বলি শোন, দেখতো এর মধ্যে কোনটার চান্স বেশি বলে মনে হয় তোমার? বলে চট্ করে সেদিনকার কাগজ থেকে কতগুলো রেসের ঘোড়ার নাম চোখের সুমুখে খুলে ধরলেন।

লজ্জিত কণ্ঠে বললাম,—ওসব আমি ঠিক বুঝি না।

সারা ঘরে দমকা হাওয়া ঢুকে যেন কাচের বাসন খান খান করে ভেঙ্গে দিলো নৃত্যগোপাল বাবু এমনি ভয়ানক গলায় হেসে উঠলেন। অপ্রস্তুত হতে হ'ল।

বললেন,—কেমন ইয়ং ম্যান তুমি মাষ্টার, অশ্বতত্ত্বে রস পাওনা। ভুরু কুঁচকে আমার সারা দেহটা একবার যাচাই করলেন, বাজিয়ে নিলেন যেন টাকার মতো করে। ফের বললেন,—ছোট ছোট করে চুল ছেঁটেছ, দাড়ি গোঁফ রেখেছ জংলীদের মতো, হাফসার্ট, খাটো বহরের ধুতি, আর ক্যাম্বিসের জুতো। মাষ্টার, তোমার চেয়ে যে আমিও আধুনিক। তারপর চাপা গলায় গোপন কথা জিজ্ঞাসা করার ভঙ্গিতে বললেন,—কী ব্যাপার বলো তো? বোমার দলে ছিলে নাকি কখনো?

একটু হেসে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই নৃত্যগোপাল বাবু ফের তন্ময় হয়ে গেলেন। বোধ করি ঘোড়াগুলোর কুষ্ঠি কুলুজী মুখস্ত করছেন। আরাম কেদারার দু'পাশে রেসের সাময়িকপত্রগুলো স্তূপীকৃত। সপ্তাহের দৈনিকগুলোয় রেসের খবর দাগানো।

রেসের নেশা অনেকের দেখেছি, কিন্তু মাঝবয়সী কোন পেন্সনারকে ঘোড়া নিয়ে মাতামাতি করতে সেই প্রথম দেখলাম।

অথচ শুনেছিলাম নৃত্যগোপাল বাবু নিজে কখনো রেস খেলেন না। সকলকে টিপ্ সরবরাহ করেন।

অদ্ভুত!

পর্দ্দা ঠেলে ভেতরে এলাম। নৃত্যগোপাল বাবুর সেজ ছেলে হকিষ্টিক ঘোরাতে ঘোরাতে বেরুচ্ছিল। আমাকে দেখে হেসে অভ্যর্থনা করলে, এই যে বিদ্যেসাগর মশাই, প্রাতঃপ্রণাম।

হেসে জবাব দিলাম,—'আফটারনুন মিঃ ধ্যানচাঁদ।

সুরজিত খুসি হোলো। বললে, এই স্যুট্টাতে কেমন মানিয়েছে বলুন তো অতুল বাবু? গ্র্যাণ্ড না? ভারি চমৎকার ম্যাচ করেছে। অথচ ভারি সস্তায় বানিয়েছি। কত খরচ পড়েছে জানেন, চল্লিশ টাকা বারো আনা। এ বাজারে শস্তাই বলতে হয়, কী বলুন।

শিষ দিতে দিতে সুরজিত চলে গেল আপন মনে। একটু হাসলাম নিজেই। ছেলে মানুষ। মনে এখনো মরচের দাগ লাগেনি। খেলা আর বায়োস্কোপ, ব্রিজ আর পিকনিক এই নিয়েই আছে।

একদিন আমাকে ওর ঘরে চুপি চুপি ডেকে নিয়েছিল। বলেছিল, আপনাকে একটা গোপন কথা বলব; কাউকেও বলবেন না বলুন।

হেসে বললাম, বলোই না।

দিব্যি করিয়ে নিয়ে আমাকে একটা মেয়ের ছবি দেখতে দিলে সুরজিত। ফোটোতে রঙ বোঝবার উপায় নেই। ক্ষীণাঙ্গী একটি মেয়ের ছবি। মুখ চোখের শ্রী আছে, চোখে চশমা। স্পষ্টতঃই কলেজে পড়ে। একটু বেশি রোগা বলে দৃষ্টিতে একটু ক্লান্ত শীর্ণতা।

সুরজিত চাপা গলায় বললে, মেয়েটি আমায় ভালোবাসে অতুলবাবু।

বললাম, সে তো তুমি না বলতেই বুঝেছি। তারপর ?

তারপর সুরজিত যে গল্পটা বল্‌লে তাতে বৈশিষ্ট্য কিছু ছিল না। মামুলি ব্যাপার। জাতে মিলছে না। অভিভাবকেরা বিরূপ।

সুরজিত আমার কাছে ঠিক কী চায় বোঝা গেল না। হয়ত খালি চায় একটু সহানুভূতি। মেয়েটির নামটা জেনে নিয়েছিলাম,— অতসী।

ভারী অদ্ভুত মেয়ে এই মহাশ্বেতা। ঠিকুজির হিসাবে যুবতী ঠিকই, কিন্তু দেহের কোথাও ইঙ্গিতেও তার উচ্চারণ নেই। ভারী রোগা আর ভারী ভীরু। অনুচ্ছ্বসিত একটি মনের সান্নিধ্যে এসে যৌবনের সমস্ত উচ্ছ্বাসও যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী লিখছিল, সাড়া দিয়ে ঘরে ঢুকতেই চমকে ফিরে চাইলো।

ম্লান হেসে চেয়ারটা এগিয়ে দিলে। বললাম, কী লিখছিলে।

যদিও জানি, তবু প্রশ্নটা। পৌরাণিক নামের আড়ালে আছে ওর পৌরাণিক মন. আর আছে অপরিণত দেহ। ও কখনো লুকিয়ে চুরিয়ে কারুর কাছে চিঠি লিখবে না তা ঠিক। খাতাটা টেনে নিলে দেখতে পেতাম ও বাংলা থেকে ইংরিজি তর্জ্জমা করছে কিম্বা নীরস জ্যামিতির দুরূহ অঙ্কনের গোলকধাঁধাঁয় ঘুরছে। অকারণে খাতাটায় কখনো হিজিবিজি কাটেনা বা পোষা বেড়ালটার ছবি পর্য্যন্ত আঁকেনা, ও এমন ভীরু। নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টামাফিক পড়াই। এ্যালজেব্রার প্রবলেম, ইংরেজীর ব্যাখ্যা, আর সংক্ষিপ্ত সার। কবিতাগুলো অনায়াসে গড় গড় করে মুখস্ত বলে যায়, অঙ্ক কষে অনায়াসে, ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটির অদ্ভুত মেধা।

বলি, তুমি ছেলে হয়ে জন্মালে ভালো হ'তো শ্বেতা।

সহজাত লজ্জায় মাথাটা টেবিলের ওপর আরো নুয়ে পড়ে, বোকা চোখে চেয়ে বলে,—মাও তাই বলে।

—কী বলে ?

—বলে যে তুই যদি ছেলে হতিস মহাশ্বেতা। তাহলে ভালোরকম পাশ করতিস, আর আমাদের রোজগার করে খাওয়াতিস।

পরিহাসের সুরে মাথা দুলিয়ে বলি বটে তাই নাকি,—কিন্তু অনাগত যৌবনা এই মেয়েটির ব্যর্থতার কথা ভাবতেই মনটা আর্দ্র বিষণ্ণতায় ছেয়ে আসে।

মহাশ্বেতার মাকে আমি কখনো দেখিনি। শুনেছি দিনরাত পূজোর ঘরেই থাকেন, পূজার্চ্চনায় ব্যস্ত। একদিন আভাসে খালি দেখেছিলাম গরদের শাড়ি, গাঢ় সিন্দুরচর্চ্চিত গৌর ললাট। আমাকে দেখে একগলা ঘোমটা টেনে উধাও হয়েছিলেন।

মাঝে মাঝে মহাশ্বেতার লজ্জাটাকে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। অস্তিত্বহীন বস্তুকে প্রাণপণে ঢাকবার প্রয়াসটা শোচনীয় হাস্যকর ঠেকে। আগেই বলেছি, ওর যৌবন আসেনি, কিন্তু তার আগেই এসেছে জ্যোতিহীন চোখ, পাণ্ডুর কপোল আর বিনীত বক্ষোদেশ। মাথায় চুলও দু'চারটে পেকেছে দেখেছি, অকালে। একদিন বাহুমূলে অসতর্ক চোখ পড়েছিল, চৌরঙ্গীর রাস্তায় ফিরিঙ্গী মেয়ের উন্মুক্ত জানু আর ম্যাডোনা বৌদিদের স্তন্যদাত্রী মূর্ত্তি দেখেই আমাদের আইবুড়ো মনে যৌন চেতনার প্রথম রঙ লাগে, তাই চমকে উঠলুম বৈকি ; দেখলাম,—খানিকটা জায়গায় চাকার মতো গোল শাদা দাগ। শ্বেতী ! মহাশ্বেতা চমকে উঠে ব্লাউসের হাতা টেনে দিয়েছিল ত্রস্তে।

তাই ওর এত লজ্জা বুঝি, এত ভীরু সঙ্কোচ।

অঙ্ক কষতে কষতে মহাশ্বেতা হঠাৎ মুখ তুলে চাইলো। বললে,—আপনার কাছে কোন বই নেই মাষ্টার মশাই ?

কী বই চাও !

এই গল্পের বই,—উপন্যাস।

কৌতুক বোধ করলাম,—উপন্যাস পড়বে তুমি ?

কুণ্ঠিতকণ্ঠে মহাশ্বেতা বললে,—আমি নয়, মেজো বৌদি। মেজো বৌদি চাইছিল। বলছিল, তোর মাষ্টার মশায়ের কাছে কোন বই নেই রে ভাই ঠাকুরঝি। পেলে পড়তাম। দাদা তো রাতে বাড়ি থাকেন না কিনা,—খবরের কাগজে নাইট ডিউটি দেয়। বৌদি বেচারা থাকে একলাটি ; সময় ওর কাটেনা।

দরজার পর্দ্দাটা কেঁপে উঠলো একবার। ফিরে চাইতেই দেখলাম দ্রুত পায়ে কে সরে গেল তাড়াতাড়ি পা দু'খানাকে চিনলাম। শৈবলিনী। মহাশ্বেতার মেজো বৌদি।

শৈবলিনীকে দেখেছিলাম এর আগেও আরেকদিন। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বুভুক্ষু দুই চোখের ভৃঙ্গার রাস্তার চলমান জনসমুদ্র পান ক'রছে। শিথিল বেশ, অপটু প্রসাধনে দৃষ্টিকটু মাত্রাধিক্য। ফিকে সবুজ রঙের স্বচ্ছ পোষাক আয়নার মতো। দেহের প্রতিটি রেখা বিজ্ঞাপিত। গালে মেখেছে রঙ, সযত্নে ভুরু এঁকেছে, চাউনিকে কৃষ্ণতর করেছে সুর্ম্মার অবলেপনে।

চাউনিটা ভালো লাগেনি। ভঙ্গিটাও না। দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে এসেছি।

অরিজিতের কাজ খবরের কাগজে। সারা বছর নাইট ডিউটি। নিরীহ গোবেচারী মানুষটা। বাড়িতে সারাক্ষণ অগণিত পুঁথির অক্ষরসমুদ্রে স্নান করছে। পঞ্চশর খান খান হয়ে ফিরে যাচ্ছে শুকনো পেস্ট বোর্ডের কঠিন মলাটে।

বঞ্চিত শৈবলিনী কি অরিজিতের বিকল্প খুঁজছে সমস্ত পথের মানুষের মধ্যে? কী জানি।

প্রতি মাসে প্রথম সপ্তাহে একবার এ বাড়িতে নেমন্তন্ন পাই। সে দিন দিল্লী থেকে টাকা আসে। মহাশ্বেতার বড়দা দিল্লীতে কাজ করেন। শুনেছি বড়ো কাজই করেন। কী কাজ জানি না। তবে জাঁকালো রকমের কিছু নিঃসন্দেহই। এখানকার খরচ চলে তাঁর পাঠানো কাঞ্চনে। সেখানে সস্ত্রীক থাকেন; দেশে আসেন কদাচিৎ।

*
* *

ধীরে ধীরে দেখ্‌ছি ধুলো জমে উঠেছে বাড়িটার আনাচে কানাচে। তক্‌তকে উঠোনটায় সাঁৎলা পড়েছে। ছাইয়ের গাদা আর বাসনের পাঁজা। মেজেতে পানের পিক আর কড়িকাঠে ঝুল।

কোথায় যেন গোলমাল ঘটেছে। সেটা অনায়াসবোধ্য।

দু'মাসের মাইনে বাকি পড়েছে। ভাবি, ছেড়ে দেবো। কিন্তু পাওনা আদায়ের প্রয়োজনে তৃতীয় মাসেও আসতে হয়। তৃতীয় মাসের প্রাপ্যের মোহ টেনে আনে চতুর্থ মাসেও। দূষিত বৃত্ত।

সুরজিত এখনো হকি টেনিস খেলছে বটে, কিন্তু স্যুটটার ফেঁসেছে খানিক। সেটা সন্তর্পণে ঢেকে রাখে। শার্টের ছেঁড়া আস্তিনটা ঢাকছে কোটের হাতায়।

এক দিন বললে, দুটো টাকা দেবেন অতুল দা, বড্ড ঠেকেছি।

দুটো টাকা ছিল না, যা ছিল তাও দাতব্য করবার মতো নয়, তবু যা হয় কিছু দিলাম। কেন ওর টাকা চাই, তাও জিজ্ঞাসা করিনি। হয়ত অতসীকে সিনেমা দেখাবে। টাকা গেছে, কিন্তু প্রেয়সীর কাছে ঠাট বজায় রাখার গলদ্‌ঘর্ম্ম প্রয়াস আছে অটুট।

শুনলাম রেসে একটা বড়ো রকমের মার খেয়েছেন নৃত্যগোপাল বাবু। কচের মত যে বিদ্যার খালি ভারবাহী হয়েই ছিলেন এতকাল, তাকে প্রয়োগ করতে গিয়ে বিষম ঠোক্কর খেয়েছেন।

মহাশ্বেতা এখনো আসে। একপাঁজা বই কাঁখে নিয়ে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে ঘরে ঢোকে। যেন মস্তবড় একটা অপরাধ করছে। শরীর ওর ক'দিনে আরো রোগা হয়েছে, আরো ক'টা পেকেছে চুল। বাহুমূলের শ্বেতকলঙ্ক যে বিস্তৃততর হয়েছে, সেটা আর লুকিয়ে দেখার আবশ্যক করে না। ব্লাউসহীন বাহুমূলে শাড়ীটাকে সংযত করতে বারম্বার ব্যর্থ প্রয়াস করে, বারম্বার মুখরা কলঙ্কটা নির্লজ্জ ভাবে করে আত্মঘোষণা।

নখ খুঁটতে খুঁটতে নত মুখে বলে,—আপনি আর আসবেন না, মাষ্টার মশাই?

টাকার কথাটা মনে এলেও মুখে আসে না। পিঠ চাপড়ানো সুরে বলি,—আসবো বৈকি, বারে!

নৃত্যগোপাল বাবুর কাছে গেলাম। দেখি ভদ্রলোক এক পাটি জুতো নিয়ে মেজেয় ঘষছেন আর বলছেন,—হাঁটো এবার নিজে নিজে। ঘরময় পায়চারী করোগে। হেঁ হেঁ বাবা, থেমে গেলে যে। দেখলে তো, আমার পা দু'খানা নইলে তুমি অচল। জুতো কখনো পা হয়? জুতো জুতোই।

হঠাৎ আমাকে দেখে ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। জুতোর পাটি তুলে নিয়ে গোড়ালিটা মনোযোগ দিয়ে পরখ করতে করতে বললেন,—এসো মাষ্টার। আজ কালকার জুতো দেখেছ। দু'দিনেই ক্ষয়ে গেছে। একদম রদ্দি মাল বাজারে ছাড়ছে!

বলে হাসলেন। হাসি যে কখনো এত করুণ হয়, জীবনে এ অভিজ্ঞতা সেই আমার প্রথম।

টাকার তাড়া দিতে এসেছিলাম। কিন্তু ফিরে এলাম নির্ব্বাক হয়ে। মৃতের সঙ্গে মানুষের কলহ নেই।

অরিজিতের কাছেও সে কথা বলার কোন মানে হয় না। চাকরি খুইয়ে

ঘরে এসে বসেছে। পুঁথি গেছে, দিনরাত আছে ক্রস পাজলের অক্ষরবৃত্ত ধাঁধায়। পেন্সিলের উল্টো দিকে চিন্তাকুল দাঁত বসিয়ে বঙ্কুর করে তুলেছে।

—বলুন তো মাষ্টার মশায় এটা fun হবে না gun হবে? pawn না fawn, cat না rat?

শৈবলিনীকে দেখলাম অদূরে টেবিলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আর্শিতে মুখ দেখছে। ভ্রুভঙ্গি বিলসনে মুগ্ধ করছে আপন প্রতিবিম্বকেই। দশনপংক্তিতে নিষ্ঠুর ভাবে পীড়ন করছে অধরোষ্ঠ, আর মাঝে মাঝে মদালস নেত্র ফিরিয়ে লক্ষ্য করছে অরিজিতের দৃষ্টি কোথায়।

আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টেনে দিলে। কিন্তু অপ্রতিভ ওকে এতটুকুও দেখা গেল না, ওর আত্মোপাসনা দেখে ফেলেছি বলে।

অরিজিৎ ফের তাড়া দিলে,—বলুন না মশাই একটা Tar হবে, না Bar? Door না Poor? Doom ও তো হতে পারে? এঁ, সব কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছে।

দুহাতে অরিজিৎ লম্বা লম্বা চুল টানতে লাগলো নিজের মাথার।

সুরজিত সেদিন এলো কাঁদো কাঁদো মুখে। চার পাশে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বললো,—জানেন মাষ্টার মশাই, বাবা আমার বিয়ে দিচ্ছে?

বললাম, সুখবর। খাওয়াটা কি আগাম হবে না চার চোখ এক হবার—

সুরজিত প্রায় কেঁদে ফেলে বললে আপনি'ও ওই কথা বলছেন অতুলদা। জানেন, বাবার একটা মস্ত বড় ডিসাসটার হয়ে গেছে। আর্থিক ক্ষতির উসুল করতে চান আমার বিয়ে দিয়ে। কোন বড় একটা রাজপরিবারের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে রাজকন্যে আর অর্দ্ধেক রাজত্ব গেঁথে তুলছেন। সে মেয়েটার ছবি আমি দেখেছি। ড্যাবডেবে চোখ, খ্যাঁদা নাক, আর বিষম মোটা। টাকার লোভে বাবা আমায় দাঁড়ি পাল্লায় বসিয়ে ওজন দরে বিক্রী করছেন। এ বিয়ে আমি করতে পারবো না অতুলদা। তাছাড়া অতসী রয়েছে—তার প্রতি একটা কর্ত্তব্য,—

সুরজিত আবেগের বশে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরলো। ওর যুক্তিতে হাসি পেলো। বিয়েয় আপত্তি অতসীর জন্যে নয়, পাত্রীর রূপের ঘাটতির জন্যে। অর্থাৎ প্রস্তাবিতা পাত্রীর যদি চেহারার জৌলুষ থাকতো, তবে সুরজিত আদর্শ পুত্র হিসেবে চিত্রিত বিয়ের পিড়েয় বসে সুড়ুৎ করে গাঁটছড়া বেঁধে বসতো।

হাতখানা ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিলাম। বললাম, দেখি তোমার বাবাকে বলে। সম্মত হ'লাম সুরজিতের খাতিরে নয়, অতসীর কথা স্মরণ করে।

নৃত্যগোপাল বাবুর ঘরে গিয়ে দেখি, তিনি দাবার ছক খুলে বসেছেন। মুখোমুখি দু'সারে বল সন্নিবেশ করেছেন। বড়ে, দাবা, পীল। সারা মেজেয়, টি-পয়ে, টেবিলে অসংখ্য রেসের কাগজ, আর পোড়া সিগারেটের টুকরো।

আমার পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে বললেন,—এসো মাষ্টার। আজ ভারি মজার খেলা খেলেছি। ছকে ঘোড়া নেই দেখেছ? নাই বা থাকলো ঘোড়া। পীল লেকে লড়েঙ্গে। বলে উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলেন। সে হাসিতে বাঁধানো দাঁত আলগা হয়ে পড়লো। বীভৎস সে হাসি!

পড়াতে পড়াতে হঠাৎ কঠোর কণ্ঠে বললাম, মহাশ্বেতা!

মহাশ্বেতা চোখ তুলে তাকালে। আশঙ্কায় আঁখিপল্লব থরো থরো।

বললাম, আজো তুমি এসেন্স মেখেছ মহাশ্বেতা, আর পাউডার ঘষেছ? কত বার বারণ করেছি না, আমার সামনে কখনো এই অভদ্র প্রসাধনে আসবে না?

মহাশ্বেতা তখনো কাঁপছে ভয়ে, শীর্ণ কপোল পাণ্ডুরতরো। ছলো ছলো চোখে চেয়ে বললো,—কী করব, মেজো বৌদি রোজ সাজিয়ে পাঠিয়ে দেবে। পাতা কেটে চুল বেঁধে দেবে, ঠোঁটে নখে দেবে রং লাগিয়ে, আসবার সময় গায়ে ছিটিয়ে দেবে আতর। আমি মাখতে চাই না, তবুও। বলে,—এ সব না করলে আপনি নাকি—আসবেন না। শেষেরটুকু বলে সঙ্কুচিত মৃদু কণ্ঠে।

অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় বোবা হয়ে গেলাম। টেবিলের সুমুখে আরক্ত লজ্জায় আনতাননা মহাশ্বেতা। কৃশ হাতের ঢিলে চুড়িগুলোকে মনের চাঞ্চল্যে একবার ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে কনুই অবধি, আবার টেনে নিয়ে আসছে কব্জিতে। বাহুমূলের প্রহরী আঁচলটা পড়েছে খসে। সে খেয়াল নেই। নতমুখে ফের বললে,—বৌদি বলে, মাষ্টার মশায়ের আমাদের কাছে কত পাওনা, তবু রোজ আসে, কেন জানিস?

গম্ভীর কণ্ঠে বললাম, বৌদি তোমায় ভুল বুঝিয়েছেন মহাশ্বেতা। তুমি যদি ফের কখনো ইতরের মতো আমার কাছে আসবে, তবে আমিই আসা বন্ধ করে দেবো।

শৈবলিনীর চেহারাটা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার সুমুখে। মহাশ্বেতার আনাড়ি প্রসাধন-প্রয়াসের মধ্যে আর একটি কামাতুর মনের উন্মুখ আত্মনিবেদন স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। মহাশ্বেতা নয়, শৈবলিনী। শৈবলিনী ওর বুভুক্ষু চিত্ত তুলে ধরেছে আমার সুমুখে,—মহাশ্বেতার বকলমে।

টেবিলের ওপর মাথা গুঁজে আছে মহাশ্বেতা। সারা কক্ষে আসন্ন সন্ধ্যার কালো ডানা। কেমন মায়া হ'ল। ওর কাঁধে হাত রেখে ডাকলাম,—মহাশ্বেতা!

কী! মহাশ্বেতার কণ্ঠ আর্দ্র। অপ্রত্যাশিত করস্পর্শে চমকে উঠেছে। ওর কণ্ঠস্বরে এমন একটা জিনিষ ছিল, যাতে আমিও চমকে উঠলুম। হয়ত বিচারে ভুল করেছি। খেলনার মোটরে দম দিতে দিতে শৈবলিনী কখন খেলনাতে সত্যি সত্যিই প্রাণ-সঞ্চার করেছে, তা' সে নিজেই জানে না!

কিন্তু সুরজিত যে ঝোঁকের মাথায় এতটা করবে, তা কখনও ভাবিনি। বিয়ের আয়োজন সব ঠিক করে এনেছিলেন নৃত্যগোপাল বাবু। নগদ বিশ হাজার এক টাকায় কন্যা পক্ষের সঙ্গে রফা হয়েছিল। সীসের মতো ভারী সর্ব্বনাশের বোঝা গলায় ঝুলিয়ে তলিয়ে যাচ্ছিলেন, হয়ত এতে ভেসে থাকবার খানিকটা অবকাশ মিলত।

কিন্তু বিয়ের তিনদিন আগে সুরজিতকে পাওয়া গেল না। আর পাওয়া গেল না শৈবলিনীকে। সুরজিত চেয়েছে নিস্কৃতি,—আর শৈবলিনী পেয়েছে ওর দয়াহীন দস্যুতার আর একটি উপকরণ।

নৃত্যগোপাল বাবুকে সেদিন দেখলাম কোচে শুয়েছেন! শিয়রের কাছে বসে একটা মেয়ে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। চিনলাম, অতসী।

আমাকে দেখে বললেন,—পীল ভি গিয়া মাষ্টার। তবভি নেহি ছোড়েঙ্গে। দেখেঙ্গে আউর এক দফে। ফ্রেঞ্চকাট চিবুকে হাত বুলোচ্ছেন আর বার বার বলছেন, পীল ভি গিয়া। সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরাচরিত উচ্চহাসি। বুঝতে বাকি থাকে না,—এ হাসি কান্নারই ক্যামোফ্লেজ।

ফিরে আসবার সময় অতসীকে ভালো করে দেখে এলাম। আশ্চর্য্য মুখভঙ্গি। এত বড় আঘাতটাতেও ভেঙ্গে পড়েনি একটুও। ও ভুলেও কখনো সায়েনাইডের শরণ নেবে না,—বড়ো জোর আরো বেশি করে পরীক্ষার পড়া করবে; রঙিন আকাশকে মুড়ে দেবে শুকনো ছাপানো-বইয়ের পাতায়।

দিল্লী থেকে টাকা আসছিল না। সে রহস্যের কিনারা হ'ল এতদিনে। বড় বৌদি দিল্লী থেকে ফিরে এলেন একা। বড়দার মৃত্যু হয়েছে। নেটিভ ষ্টেটের কোন প্রিন্সের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন শিকারে। দু'মাস কোন খোঁজ ছিল না। তারপর একটা চিঠিতে জানা গেল, শিকারে এক দুর্ঘটনায় তিনি মারা

গেছেন। রাজা সাহেব আফশোষ পাঠিয়েছেন আর সেই সঙ্গে ক্ষতিপূরণ বাবদ একটা চেক।

বড় বৌদি কলকাতায় চলে এলেন। সঙ্গে চারটি ছেলে মেয়ে। ছেলে মেয়েগুলোকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। শুকনো প্যাকাটির মতো চেহারা সব, রুগ্ন অসম্পূর্ণ অবয়ব! লিক্‌লিকে হাত-পা। আর সব চেয়ে যেটা মারাত্মক, —সব কটির চোখ কানা। জন্মাবার সময় নাকি ভালোই ছিলো ওরা। কিন্তু তিন চার মাস বয়স থেকে কি একটা অসুখ হয়, যন্ত্রণায় কাৎরাতে থাকে সারারাত, তার পরদিন ভোর বেলা দেখা যায়, চোখ দু'টি বিনষ্ট হয়েছে। প্রত্যেকের ব্যাপারে এমনি। মেজো ছেলেটা একটু খুঁড়িয়েও চলে।

নৃত্যগোপাল বাবুর বাড়ি আজো যাই। তবে আর পড়াতে নয়। মহাশ্বেতাকে পড়াবার সাহস আর নেই। তারও নেই বোধ করি।

নৃত্যগোপাল বাবুর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। আজকাল কারু সঙ্গে দেখা করেন না। সারাদিন ঘরে দরজা দিয়ে কাটিয়ে দেন। আপন মনে ছক সাজিয়ে খেলেন শতরঞ্চ। এবার দেখা হলে কী বলবেন তিনি? বলবেন কি যে, দাবাটাও গেছে মাষ্টার, কিন্তু ছাড়বো না তবুও; আর এক দফা দেখবো? আর সঙ্গে সঙ্গে সেই তীব্র হাসি?

বড় বৌদির সঙ্গেও একদিন পরিচয় ঘটবার সৌভাগ্য হয়েছিল বৈকি।

নিচের ঘরে বসেছিলাম। মহাশ্বেতা ঘরে এলো নিঃশব্দ চরণে। হাতে একটা চিরকুট দিলে আমার, বললে, বড় বৌদি একবার ডাকছেন আপনাকে।

বললাম, আমাকে? সেকি।

তা জানি না—বলে মহাশ্বেতা চলে গেল। আজকাল আরো স্বল্পভাষী হয়েছেও, শামুকের মতো আরো গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে।

বড় বৌদির ঘর চিনতাম; কিন্তু পর্দ্দা ঠেলেই আবার তিন পা পিছিয়ে আসতে হোলো। একটা আগুল্‌ফ আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বড় বৌদি প্রসাধন করছেন। স্ত্রীলোকের অনাবৃত দেহ যে কখনো এত কুৎসিত হতে পারে, দেখবার আগে একথা আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না কখনো।

বড় বৌদি আমার ছায়া দেখেছিলেন বুঝি। তাড়াতাড়ি কোনক্রমে একটা পোষাকে শরীর ঢেকে বেরিয়ে এলেন—এসো ভাই, এসো। লজ্জা করছে?

সমস্ত শরীর কাঁপছিল বিস্বাদ একটা উত্তেজনায়। মুখটা তিঁতো

লাগছে। ঘরে গিয়ে বসলাম কোনক্রমে একটা টুলে। টেবিলের টানা খুলে বড় বৌদি একটা কাগজ বার করলেন, আমার হাতে দিয়ে বললেন, এই অষুধটা আমায় এনে দিতে হবে ভাই। বাড়িতে আর একটা পুরুষমানুষ নেই যাকে এ ভার দিতে পারি।

অষুধের নামটা পড়ে চমকে উঠলাম। বললাম, সেকি বৌদি,—এর চেয়ে পাপ যে নেই।

বড় বৌদি হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরে বললেন,—কিন্তু উপায়ও যে নেই ভাই। দেখছ না চোখের সুমুখে একটা হাবা, একটা খোঁড়া, আর কানা সব ক'টাই? আর একটাও যদি এমনি ধারা হয়, তবে বাঁচবো না আর; বিষ খেয়েই মরতে হবে।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই বৌদি অসঙ্কোচে বলে গেলেন,—যা বুঝেচো তাই ঠিক। লজ্জাকর রোগে সর্ব্বাঙ্গ জরজর হয়ে আছি। অহোরহো কী যে জ্বালা সে তুমি বুঝবে না। শুধু দেহের নয় মনেরও।

বলতে বলতে বৌদি করলেন কি, পাগলের মতো গায়ের জামাটাকে খসালেন এক টানে। শুভ্র থানধুতিটা গড়িয়ে পড়লো মৌন অপমানে। একে একে দেখালেন বৌদি ওঁর দেহের স্থানে স্থানে কামনার কী কুৎসিত ক্ষত। গায়ে, পিঠে, পায়ে, হাতে—বাদ নেই কোথাও।

চোখ বন্ধ করতে হ'ল। রুদ্ধশ্বাসে বললাম, ওপর থেকে কিন্তু একটুও বোঝবার উপায় নেই বৌদি, আপনার শরীরে যে এই কদর্য্য রোগ।

তীব্র কণ্ঠে হেসে উঠলেন বড় বৌদি। বললেন,—ওপর থেকে তো কত কিছুই বোঝা যায় না ভাই। ওপর থেকে তো শুনেছিলে শ্বশুর আমার শাঁসালো সরকারী পেন্সনার, স্বামী আমার দিল্লীতে মস্তো বড়ো চাকুরে। কিন্তু একথা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিলে কি যে, ওটা একটা মস্ত বড়ো ধাপ্পাবাজী, ভূয়ো একটা চালাকি? আমার স্বামীর কখনোই চাকরি ছিল না। এখানে থেকে পেট চলে না, চাকরি খোঁজবার ছুতো করে আমায় শুদ্ধু টেনে নিয়ে গেলেন দিল্লীতে। সেখানে আমাকেই করেছিলেন বেসাতির পুঁজি। বিনিময়ে আমি পেয়েছি এই পোকায় কাটা শরীর আর পঙ্গু একপাল সন্তান। শ্বশুরকুলের ইজ্জৎ রেখেছি, রুটি জুগিয়েছি, পঞ্চকন্যার সঙ্গে আমার নামও প্রাতঃস্মরণীয়াদের ফিরিস্তিতে উঠবে তো ঠাকুর পো?

বলতে বলতে বৌদি ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন।

ধীরে ধীরে উঠে এলাম অলক্ষিতে। নৃত্যগোপাল বাবুর ঘরের দরজাটা খোলা পেলাম অনেক দিন বাদে।

উঁকি দিয়ে দেখি নৃত্যগোপাল বাবু তেমনি দাবার ছক মিলিয়ে বসেছেন। তাঁকে ঘিরে বসেছে বড়ো বৌদির অপোগণ্ড ক'টি।

আমাকে দেখে সোৎসাহে বলে উঠলেন,—ফের খেলতে বসেছি মাষ্টার। ঘোড়া, পীল, দাবা গেছে,—দেখছ না এবার খালি বড়ে সাজিয়েছি? এবারে বড়ের খেলা।

আঙুলের ইসারায় বড়ো বৌদির বাচ্ছা ক'টাকে দেখিয়ে দিলেন। কানা, খোঁড়া আর হাবা তিন জন। বিকলাঙ্গ জীবনের প্রতিভূ।

গণতন্ত্রের অপমৃত্যু

লুই ফিশার

জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রযন্ত্র কি ভাবে হিটলার দখল করলেন? দেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্রই নিজের কর্ম্মসূচি আগে থেকেই প্রকাশ করা হিটলারের রীতি। প্রচারণা মাত্রকেই যারা প্রতারণা মনে করে, সেই সমস্ত অতিবিজ্ঞ সমালোচকেরা অবশ্য তাঁর কথা বিশ্বাস করেনি। নাৎসিরা পরিষ্কার ভাবে বলেছে যে জার্ম্মাণী শাসন করবে—হিটলারও তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি গোপন রাখেন নি। অনেক মাথা ধূলোয় লুটবে—একথা তিনি সদম্ভে ঘোষণা করেছেন। গণতন্ত্র ধ্বংস করবেন এ ইচ্ছাও লুকোন নি। তবু গণতন্ত্র তাঁকে মেনে নিয়েছে এবং গণশাসন ধ্বংসের জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে। জার্ম্মাণ গণতন্ত্রের এ আত্মহত্যা ইতিহাসের একটা বিচিত্র ও বিস্ময়কর অধ্যায়, এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন এইজন্য যে এ রকম আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জার্ম্মাণ গণতন্ত্রের একচেটিয়া মনে করবার কারণ নাই। জার্ম্মাণ গণতন্ত্র সজ্ঞানে নিজের হাতে নিজের কবর খুঁড়েছে। কিন্তু তখনও তার মুখে বুলি: "হুঁশিয়ার, হিটলারের ধোঁকায় ভুলো না।"

একদলীয় শাসন ব্যবস্থা অটুট রাখবার মূল্য হিসাবে সোভিয়েৎ রুশিয়াকে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। গণতান্ত্রিক জার্ম্মাণীতে দলের সংখ্যা অত্যধিক বলে জার্ম্মাণীকেও ভুগতে হয়েছে। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের অপব্যবহারে জার্ম্মাণীতে ছোট ছোট ভোটার দলের সৃষ্টি হয়—তারা ক্ষুদ্র ভৌগলিক বা অর্থ-নৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে রাইশটাগে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাতো। জার্ম্মাণ মন্ত্রীসভার অস্তিত্ব দু'চারটী ভোট এদিক ওদিক হলেই অনেক সময় টলে উঠ্‌ত, কাজেই এ সমস্ত ছোট ছোট দলের একক বা সম্মিলিত ভাবে মন্ত্রীসভার পতন ঘটাবার শক্তি ছিল। মন্ত্রীসভাকে হুমকী দিয়েও তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেছে, কিন্তু তার ফল হয়েছে ভয়াবহ। সংখ্যাল্প দল যদি সংখ্যাধিক দলকে পরাজিত বা বিড়ম্বিত করতে পারে, তাহলে সংখ্যাগুরুত্বের শাসনশক্তিতে আনে অবিশ্বাস। অধিকাংশের মনে অনাস্থার সৃষ্টি হলে ডিকটেটরশিপ বা একনায়কত্বের রাস্তাও তখন খোলাসা হয়ে যায়।

জার্ম্মাণীতে একটা মুস্কিল ছিল বহু দলের অস্তিত্ব। কিন্তু জার্ম্মাণ গণতন্ত্রের পতনের আরো গুরুতর কারণ ছিল। গণতন্ত্র চিরদিনই প্রশান্ত ও মধ্যপন্থী। চরমপন্থী রাজনীতি গণতন্ত্রের শত্রু। অসুস্থ সামাজিক পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক অবিচারের পরিমাপক হিসাবে জার্ম্মাণীতে কিন্তু চরমপন্থী রাজনীতিরই প্রাদুর্ভাব। জার্ম্মাণীতে চরমপন্থার দুই প্রান্তে দেখা দিল সাম্যবাদী বা কম্যুনিষ্ট দল ও হিটলারের জাতীয় সমাজতন্ত্রী বা নাৎসি দল। দুটী দলই কিন্তু গণতন্ত্রবিরোধী ও এক-নায়কত্বের সমর্থক।

ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দা ও আভ্যন্তরীণ অশান্তির সঙ্গে সঙ্গে নাৎসি ও কম্যুনিষ্ট দলের ভোটসংখ্যারও বাড়তি দেখা যায়। ১৯২৪ সালের মে মাসে নাৎসিরা রাইশ-টাগে বত্রিশটী আসন অধিকার করে। মহাযুদ্ধের ক্ষতিপূরণে ডয-ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে জার্ম্মাণীতে যে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা দেখা দেয়, তার ফলে সে বৎসরই ডিসেম্বর মাসের নির্ব্বাচনে নাৎসি প্রতিনিধির সংখ্যা চৌদ্দতে নেমে আসে। ১৯২৮ সালের মে মাসের নির্ব্বাচনে নাৎসীরা মাত্র বারোটী আসন দখল করে। ১৯২৪ সালের মে মাসে কম্যুনিষ্টদের ছিল তেষট্টি জন প্রতিনিধি, সে বৎসর ডিসেম্বর মাসে দাঁড়ায় ছেচল্লিশ জন এবং ১৯২৮ সালের মে মাসে চুয়ান্ন জন। তারপরে আস্‌ল ১৯২৯ সালের পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট। ১৯৩০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের নির্ব্বাচনে নাৎসি প্রতিনিধির সংখ্যা হয় ১০৭, কম্যুনিষ্ট প্রতিনিধির সংখ্যা ৭৬। জ্বরে রোগীর দেহতাপ বাড়ে, নাৎসি ও কম্যুনিষ্টদের এ সংখ্যাবৃদ্ধিও পীড়িত গণতন্ত্রের দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি।

নিরাপত্তা খুঁজতে গিয়েই শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ গণতন্ত্রের পতন হল। নিরাপত্তা চেয়েও পায়নি বলেই সেদিন জার্ম্মাণ জাতির পক্ষে নিরাপত্তার আহ্বান এত দুর্ব্বার হয়ে উঠল। অন্যান্য জাতির তুলনায় জার্ম্মাণদের শৃঙ্খলাপ্রীতি প্রবল। যা মাপাজোঁকা যায়, তার প্রতি চিরদিনই তাদের টান। একদিন বার্লিনে এক নাপিতের দোকানে গেছি, শুনলাম চৌকো মাথা এক প্রুশিয়ান মক্কেলকে নাপিত জিজ্ঞাসা করল যে কি ভাবে তাঁর চুল কাটবে? প্রুশিয়ান ভদ্রলোক উত্তর দিলেন —পিছনে দুই এবং সামনে চার মিলিমিটার হিসাবে ছাঁটো। নিয়মানুবর্ত্তিতা জার্ম্মাণীর জাতীয় স্বভাব। চল্লিশ বৎসর ধরে প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গকে প্রত্যেকদিন একই নাপিত কামিয়েছে। প্রত্যেকদিন সকালে সে একই সময়ে এসেছে, ঘড়ি ধরে সমান সময় থেকেছে এবং ঘড়ির কাঁটা মাফিক কাজ শেষ করে একই মিনিটে ফিরে গেছে। জার্ম্মাণী দেশটাও সরল রেখার দেশ। অনেক বার উড়োজাহাজে

জার্ম্মাণী পার হয়েছি—দেখেছি যে নীচে জ্যামিতি কশা নক্সা। প্রকৃতির কল্যাণে ক্বচিৎ কোথাও বাঁকের চিহ্ন মেলে। প্রত্যেকটী ক্ষেত সযত্নে চষা, প্রত্যেকটী বেড়ার গাছ সমান করে ছাঁটা। বিলেতে মাঠ জঙ্গল যেমন অগোছাল পড়ে রয়েছে, কোথাও তার নমুনা মেলে না। জার্ম্মাণীতে বন জঙ্গল গুলিও সযত্ন রক্ষিত বাগান মনে হয়। বেড়াগুলি পর্য্যন্ত মাপাজোঁকা। এক কথায় জার্ম্মাণরা প্রকৃতির সব কিছুকেই স্ববশে এনেছে—পোষ-না-মানা যদি কিছু থাকে তবে সে হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি।

কোনো জাতি যে স্বভাবতই শ্রেষ্ঠ আর কোনো জাতি স্বভাবতই নিকৃষ্ট, আমি তা বিশ্বাস করি না। আবহাওয়া, জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কিন্তু জাতীয় চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয়। উক্রেনের মুযহিক ও মিসরের ফেলাহীনের মনোবৃত্তি ভিন্ন হতে বাধ্য। কর্ণওয়ালের জেলে ও কালিফোর্ণিয়ার কমলা-চাষীর মধ্যেও পার্থক্য অনেক। এশিয়ার কৃষকের চরিত্রে যেসব দোষগুণ, প্রভাঁসের রোদে পোড়া মদ্যপ্রিয় কৃষকের মধ্যে তার লক্ষণ মেলেনা। রাজনৈতিক ঘটনার ফলে জাতির শরীর সংগঠন পর্য্যন্ত বদলে যায়। রুশিয়ায় গত পঁচিশ বৎসরের দুঃখকষ্টের ফলে শরীরের দৈর্ঘ্য কমে গেছে। পূর্ব্বের দীর্ঘাকৃতি, তন্বী, ডিম্বাননা, স্বচ্ছত্বকা রুশ রমনী বর্ত্তমানে বড় একটা নজরে পড়ে না—তার বদলে দেখা দিয়েছে বেঁটে খাটো মজবুৎ-গঠন, স্থূলদেহ নারীকর্ম্মীর দল। প্রত্যহ-স্নান, স্বাধীনতা, সুখাদ্য, খেলাধূলা, যত্ন, অবসর ও সুচিকিৎসার ফলে আমেরিকান রমনী আজ পৃথিবীর মধ্যে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

যে ভূখণ্ডে বাস, তার প্রভাবে জাতীয় চরিত্রের পরিবর্ত্তন ঘটে। ঘটনার সংস্থানও চরিত্র গঠনে সমান সক্রিয়। বিগত ও বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী অবকাশে জার্ম্মানদের জীবন উদ্বেগে, দুশ্চিন্তায় ও শ্রান্তিতে কেটেছে। শক্তিশালী নেতৃত্বের জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষাও তাই সহজে বোঝা যায়। ১৯২৫ থেকে ১৯৩০ পর্য্যন্ত পাঁচ ছয় বৎসর অপেক্ষাকৃত শান্তিতে কেটেছে। চ্যাপ্টামাথা, বৃষস্কন্ধ, প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গের বিরাট বপু সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছে, তাঁর সেই নিরেট অচঞ্চল মুর্ত্তিকে নিরাপত্তা, মন্থর পরিবর্ত্তন ও আইনানুবর্ত্তিতার প্রতীক ভেবে লোকে ভরসা পেয়েছে। চারিদিকে মন্ত্রীসভার দ্রুত আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধানের মধ্যে রাষ্ট্রশক্তির উৎসও জার্ম্মান জাতির রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তিমূলের মতন তিনি অচঞ্চল দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর পিছনে ছিল সৈন্যবাহিনী ও অভিজাত জমিদারের দল—শিল্পপতিরাও পা মিলিয়ে চলেছে।

১৯৩০ সালে সব উল্টে গেল। রাষ্ট্রসৌধের ভিত্তি কেঁপে উঠ্‌ল। ঝড়ের রাতে দিশেহারা নাবিকের মতন জাতি পথনির্দ্দেশক আলোক স্তম্ভের খোঁজে উদগ্রীব হয়ে উঠ্‌ল। সে দুর্দ্দিনে হিণ্ডেনবুর্গের স্থৈর্য্য ও শক্তি জাতিকে ভরসা দিতে পারেনি। মহাযুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জের তখনো চলছিল এবং ডয-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে ওয়েন-ইয়ং পরিকল্পনা গ্রহণেও জার্ম্মানেরা তুষ্ট হয়নি, অথচ হিণ্ডেনবুর্গ ওয়েন-ইয়ং পরিকল্পনার সমর্থক এবং তাকে কার্য্যকরী করবার জন্য গণতন্ত্রের সাহায্যে সমগ্র জার্ম্মান জাতিকে আহ্বান করেছিলেন। নাৎসিদের দৃষ্টিতে ক্ষতিপূরণে স্বীকৃতি ও গণতন্ত্র দুটীই মহাপাপ—নাৎসি হারমান গোয়রিং তাই হিণ্ডেনবুর্গকে তীব্র আক্রমণ করলেন। যে সমস্ত চরমপন্থী দল বলে যে একমাত্র তারাই সঙ্কটের সমাধান করতে পারে—নতুন দল, নতুন নেতৃত্ব ও নতুন কর্ম্মপদ্ধতি ভিন্ন বাঁচবার উপায় নাই, দুর্দ্দিনে জনসাধারণ স্বভাবতই তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পুরোণো দল ও নেতার ভুলের জন্য যাদের দুর্দ্দশা, তাদের কাছে যে নতুনের আকর্ষণ প্রবল হবে তাতে বিচিত্র কি? জার্ম্মান জাতির ঘনায়মান বিপদের দিনে তাই কম্যুনিষ্ট ও নাৎসি চরমপন্থীদের দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত শুভলগ্ন ঘনিয়ে এল।

কম্যুনিষ্টদের তুলনায় নাৎসিদের একটা বড় সুবিধা ছিল। শাসক সম্প্রদায় ও শক্তিশালী শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নাগরিক জনসাধারণ তাদের সঙ্গে লড়াই করে নিজেদের মুক্তিসাধন করবে—এই ছিল কম্যুনিষ্টদের আহ্বান। তারা বলত যে মুক্তির পথে প্রথমে হয়তো রক্তাক্ত অন্তর্যুদ্ধ, আত্মত্যাগ, বিশৃঙ্খলা, দারিদ্র্য ও মৃত্যু সবই সহ্য করতে হবে। হিটলার ঘোষণা করলেন যে জনসাধারণের যুদ্ধ বা বিদ্রোহের কোন প্রয়োজন নাই—যা করবার তাদের হয়ে তিনিই করবেন। জনসাধারণ কেবল হিটলারকে বিশ্বাস করলেই মুক্তি পাবে। বিনা কষ্টে কেবল বিশ্বাসের দ্বারাই তিনি সিদ্ধি এনে দেবেন। বুদ্ধিমানের মত এ ঘোষণাও তিনি করলেন যে আইনসঙ্গত উপায়ে রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করাই তাঁর উদ্দেশ্য। বাস্তবিক পক্ষেও নাৎসিরা বিপ্লব অথবা অন্তর্যুদ্ধ ভিন্নই রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করেছিল। গণতন্ত্রের শেষ অন্ধ রাজনৈতিকেরা স্বেচ্ছায় বিনা দ্বন্দ্বে তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে নিজেদের নির্ব্বাসন দণ্ড নিজেরাই ঘোষণা করলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরেরও অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং পরে নাৎসি সেডিষ্ট বা উৎপীড়ন-বিলাসীদের তুষ্টি এবং অ-নাৎসিদের মনে ভীতি উৎপাদনের জন্য যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ড অবশ্য হয়েছিল। অ-জার্ম্মানের মধ্যে যেমন, জার্ম্মানদের মধ্যেও তেমনি অনেকেরই রক্তপাতের মোহ, নিষ্ঠুরতার প্রতি আকর্ষণ, অতীত

অপমানের প্রতিহিংসা ও স্বদলীয় ভিন্ন অঙ্গের উপর অত্যাচারের স্পৃহা আছে। জার্ম্মান জাতির শৃঙ্খলা প্রীতির কথা মনে রেখে হিটলার এ সব প্রবৃত্তিকে যতটা পূরণ করা চলে, তার ব্যবস্থা করেছিলেন।

কম্যুনিষ্টদের তুলনায় হিটলারের আবেদন অনেক বেশী ব্যাপক ছিল। একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেই কম্যুনিষ্টরা সদস্য ও সমর্থক খুঁজেছে। যদিও সোশাল ডেমোক্রাটদের মধ্যে সামান্য অংশ কম্যুনিষ্ট দলে যোগ দিল, তবু জার্ম্মান শ্রমিক শ্রেণীর প্রায় ষোলআনাই নাৎসি অভ্যুদয়ের আগে সমাজতন্ত্রবাদী দলে রয়ে গেল। প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবিদের মধ্যেও কম্যুনিষ্টরা খানিকটা সমর্থক পেয়েছে, এবং দেউলিয়া কৃষক ও দৈন্যগ্রস্ত নিম্নমধ্যবিত্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে দুচার জনও তাদের দলে যোগ দিয়েছে।

হিটলার কিন্তু সমস্ত জার্ম্মানকেই স্বদলে আহ্বান করলেন। প্রত্যেককেই সে যা চায়, তারই প্রতিশ্রুতি দিলেন। বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি পরস্পর বিরোধী হলো বলে কোন দ্বিধা তাঁর মনে আসেনি। তিনি তো খোলাখুলিই বলে থাকেন যে মিথ্যা যত বড় হবে, তত সহজে লোকে তা বিশ্বাস করবে। যুদ্ধবাদীদের তিনি বললেন যে জার্ম্মানীর প্রয়োজন বিপুল সৈন্যবাহিনী ও নব নব দেশ জয়। জাতীয়তা-বাদীদের তিনি বললেন যে বৃহত্তর জার্ম্মানীর প্রতিষ্ঠা ও জার্ম্মান জাতির নবজন্ম সাধনই তাঁর লক্ষ্য। স্বামীলোভী অবিবাহিতাদের তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাদের স্বামী মিলবে। পুঁজিবাদীদের তিনি বল্লেন যে শ্রমিকসংঘের অত্যাচার থেকে তিনি শিল্পকে রক্ষা করবেন, অথচ শ্রমিকদের প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তারা যা চায়, তাই তিনি তাদের দেবেন।

কৃষকশ্রেণীকে হিটলার বল্লেন—কৃষকই জাতির মেরুদণ্ড। নগর ধ্বংস হয়ে গেলেও জার্ম্মানজাতি থাকবে, কিন্তু কৃষক না বাঁচলে জার্ম্মানীর মৃত্যু অনিবার্য্য। শ্রমিকদের উদ্দেশ্য করে গোয়েবলস বল্লেন—তোমরাই পৃথিবীর প্রকৃত অভিজাত। যে সমস্ত মধ্যবিত্ত পরিবার মার্কের অধোগতির সময় সর্ব্বস্ব হারিয়েছিল, তাদের হিটলার বল্লেন যে সমস্ত দুর্গতির মূল কারণ কোটীপতি ব্যাঙ্কার বা মহাজনদের ষড়যন্ত্র। মহাজনদের হিটলার বল্লেন যে ইহুদিদের অন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাই তাদের দুঃখের কারণ, সে কারণ তিনি দূর করে দেবেন। ছোট দোকানওয়ালাকে তিনি কথা দিলেন যে কারখানা ও বড় ব্যবসায়ীর হাত থেকে রাষ্ট্রই তাকে রক্ষা করবে, আবার বড় ব্যবসায়ীদের তিনি বল্লেন যে তাদের সাফল্যই তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ, এবং সেই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে জার্ম্মান জাতির নেতৃত্ব তাদেরই প্রাপ্য। হিটলার

নিজে ক্যাথলিক এবং জার্ম্মানীতে ক্যাথলিকদের সঙ্গে তিনি সর্ব্বদাই সদ্ভাব রাখতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁরই এক অনুচর স্যুইটজারল্যাণ্ড গিয়ে প্রটেষ্টাণ্টদের মধ্যে প্রচার করল যে ক্যাথলিক প্রভুত্বের হাত থেকে জার্ম্মানীকে বাঁচানোই হিটলারের লক্ষ্য। দুটী বিষয়ে কিন্তু তিনি সকলকেই প্রতিশ্রুতি দিলেন—সাম্যবাদ ও ভার্সাইয়ের নিষ্ঠুর সন্ধির বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ। এ দুটী 'অত্যাচারের' হাত থেকে তিনি সকলকে রক্ষা করবেন। ফলে হল যে সমস্ত শ্রেণীর জার্ম্মান, এমন কি ইহুদিরা পর্য্যন্ত নাৎসি দলের তহবিলে অর্থ দিয়ে হিটলারকে সাহায্য করেছে।

চরমপন্থী দুটী দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে নাৎসিরা কম্যুনিষ্টদের পর্য্যুদস্ত করবে এটা অনিবার্য্য হয়ে দাঁড়াল। গোড়াতে কিন্তু কম্যুনিষ্টদেরই জয়ের সম্ভাবনা ছিল বেশী এবং সোভিয়েৎ বিপ্লবের সাফল্যে তাদের প্রচুর সমর্থক জুটেছিল। ১৯২৯ সালের অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরে কিন্তু নাৎসিরা এগিয়ে গেল। কম্যুনিষ্টরা বলল যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, নাৎসিরা বলল যে একনায়কত্ব হবে জার্ম্মানজাতির। কম্যুনিষ্টরা মার্কসের পতাকাবাহী, হিটলারের পতাকাবাহী হিটলার স্বয়ং। কম্যুনিষ্টরা নাস্তিক, হিটলার ঘোষণা করলেন যে ঈশ্বরের ইঙ্গিতে তাঁর রাষ্ট্রসাধনা। কম্যুনিষ্টরা আন্তর্জাতিক মতবাদ প্রচার করে, নাৎসিরা প্রচার করল জার্ম্মান জাতীয়তাবাদ। নাৎসিরা বিদেশী-বিরোধী, ইহুদি-বিরোধী ও ভার্সাইয়ের সন্ধি-বিরোধী; কম্যুনিষ্টরা কেবলমাত্র পুঁজিপতি-বিরোধী। জার্ম্মানদের মধ্যে অধিকাংশই কিন্তু হয় ছোট নয় বড় পুঁজিপতি, অথবা বড় ছোট পুঁজিপতি হবার সাধক। বিত্তসংগ্রহ যাদের সাধনা নয়, তারা হয় রাজকর্ম্মচারী অথবা উকিল ডাক্তারের দল, তাদের স্বাভাবিক টান মধ্যবিত্তের দিকে—শ্রমিকের দিকে নয়।

জার্ম্মানীর সঙ্গে রুষদেশের তফাৎ আকাশ পাতাল। জার্ম্মানীতে যে সোশাল ডেমোক্রাট দল কম্যুনিষ্টদের রাষ্ট্রশক্তি দখলে বাধা দিয়েছে, রুশিয়ার মদরত সমাজতন্ত্রীদের তুলনায় তারা বিপুল শক্তিশালী। রুষদেশের বিত্তবান শ্রেণীর তুলনায় জার্ম্মান বিত্তবানেরা অনেক ক্ষমতাবান। রুষদেশে বলশেভিকেরা বৃহৎ শিল্পপতিদের বিধ্বস্ত করেছে, কিন্তু জার্ম্মান "বিপ্লব" তাদের বিধ্বস্তের চেষ্টা পর্য্যন্ত করেনি, এবং চেষ্টা এই জন্যই করেনি যে অপরিণত রুষদেশের তুলনায় শিল্পবাণিজ্যে অগ্রণী জার্ম্মানীতে বৃহৎ শিল্পপতিরা অনেকগুণ বেশী শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া বলশেভিক বিপ্লবে কৃষকশ্রেণী অগ্রণী হয়ে এসেছিল, তাদের আশা ছিল যে বিপ্লবের ফলে ভূমিতে মালিকানা মিলবে, কিন্তু জার্ম্মানীতে

তার সম্ভাবনা ছিল না। কৃষকশ্রেণীর সেখানে বরং আশঙ্কা যে বিপ্লবের ফলে জমিতে তার মালিকানা স্বত্ব নষ্ট হতে পারে। সমাজের অর্থসম্পদ বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যত বেশী ছড়ানো, কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহ বা বিপ্লবের সম্ভাবনাও তত কম।

জার্ম্মানী শিল্পবাণিজ্যে উন্নত এবং সেখানে লক্ষ লক্ষ পরিবারের নিজস্ব ভূমিসম্পদ রয়েছে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ অথবা কোন প্রাকৃতিক দুর্ভোগে রাষ্ট্রযন্ত্র একেবারে ধ্বংস, পরিবারগুলির সমস্ত সম্পত্তি নাশ এবং লুপ্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের আশা পর্য্যন্ত নিঃশেষ যত দিন না হয়, ততদিন এরকম দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব প্রায় অসম্ভব। ১৯২৯ সালের পরে জার্ম্মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী এ কথা বুঝেছিল। এ কথাও তারা বুঝেছিল যে জার্ম্মানীতে কম্যুনিষ্টদের পক্ষে অন্য দলের সাহায্য ভিন্ন একা রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার করা অসম্ভব। অন্য পক্ষে যদি অন্য কোন দলের মিত্রতায় তারা শক্তি-কেন্দ্র দখল করে, তাহলেও তাদের পক্ষে বিপ্লব সৃষ্টি অসম্ভব, কারণ যে সমস্ত দল তাদের সাহায্য করতে পারে, তারা হয় শ্রমিকই নয়, অথবা শ্রমিক হলেও বিপ্লব-বিরোধী।

একথা আজ স্পষ্ট যে কম্যুনিষ্টদের হাত থেকে জার্ম্মানীকে রক্ষার জন্য নাৎসি দলের কোন প্রয়োজনই ছিল না। কম্যুনিষ্টদের দ্বারা শাসনযন্ত্র অধিকারের সেখানে কোন সম্ভাবনাই ছিল না। জার্ম্মানীতে কম্যুনিষ্টদল যে কত দুর্ব্বল ছিল, তার একটা অকাট্য প্রমাণ এই যে নাৎসিরা যখন ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে শাসনযন্ত্র অধিকার করল, অথবা শাসনতন্ত্র অধিকারের পরে নিজেদের অধিকারকে সুদৃঢ় করতে সুরু করল, তখন তাতে বাধা দিতে কম্যুনিষ্টরা একটুও চেষ্টা করে নি অথবা পারে নি।

কম্যুনিষ্টদের নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। সৈন্য বাহিনী ও পুলিশের হাতে অস্ত্র ছিল, কিন্তু তাদের সঙ্গেও কম্যুনিষ্টদের অসদ্ভাব। কম্যুনিষ্টদের হাতে একমাত্র অস্ত্র ছিল জাতীয় ধর্ম্মঘট, কিন্তু ধর্ম্মঘট সর্ব্বব্যাপী না হলে তাতেও আশা থাকে না। জার্ম্মানীতে তারও সম্ভাবনা ছিল না। একেতো লক্ষ লক্ষ লোক বেকার, তার উপর সোশাল ডেমোক্রাট দলের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এ রকম ধর্ম্মঘট ও তার বিপ্লবাত্মক পরিণতির বিরোধী। ফ্যাসিষ্টদের নোটহিলফে অথবা "প্রয়োজন মত সাহায্য" দেবার শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শিক্ষিত শ্রমিকরাও এ রকম ধর্ম্মঘটকে বাধা দিতে যেখানে বদ্ধপরিকর, সেখানে যে কম্যুনিষ্টদের আহ্বানে জাতীয় ধর্ম্মঘট হওয়া অসম্ভব ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। ধর্ম্মঘট দ্বারা

জাতীয় জীবনকে অচল করে বিপ্লব আনবে, সে শক্তি জার্ম্মানীর কম্যুনিষ্টদের ছিল না।

জার্ম্মান কম্যুনিষ্ট দলের অন্য গলদও ছিল; প্রথম দিকে আমি তাদের মধ্যে বড় একটা কাউকে চিনতাম না। সোভিয়েৎ রুশিয়ার জন্য আমার সহানুভূতি ছিল, কিন্তু তাই বলে বিদেশী বিপ্লব মাত্রই আমাকে আকর্ষণ করে নি। এ রকম বিপ্লবের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল বলেই হয়তো আমি সে বিষয়ে উদাসীন ছিলাম। আমার মনে হয় যে বলশেভিকরা সক্রিয় ও সৃজনী-প্রতিভাশালী বটে কিন্তু অন্য দেশের কম্যুনিষ্টরা প্রাণহীন কাঠের পুতুল, বলশেভিকদের ইসারায় ছায়ামূর্ত্তির মত চলে। জার্ম্মান কম্যুনিষ্টদের রচনা ও কাজ দিয়েই আমি তাদের বিচার করেছি, এবং দুই-ই আমার কাছে ঘৃণ্য মনে হয়েছে। কম্যুনিষ্টদের মুখপত্র বার্লিনের দৈনিক রোটে ফানে বা রক্তপতাকা মতসর্ব্বস্ব সস্তা উত্তেজনায় ভরা থাকত এবং অন্যান্য দেশের কম্যুনিষ্ট দৈনিকগুলিরও সেই একই দশা। উঁচু দরের কম্যুনিষ্ট সাময়িক পত্রও অবশ্য ছিল এবং লণ্ডনের কম্যুনিষ্ট মাসিকপত্র লেবর মন্থলীতে আর পাম দত্তের তীব্র সম্পাদকীয়গুলি পড়ে সর্ব্বদাই আনন্দ পেয়েছি। তা সত্ত্বেও কোন দেশেই কিন্তু কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ফলে মৌলিক চিন্তানায়ক অথবা শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব হয় নি। লেনিন, ট্রটস্কি অথবা ষ্টালিন বা বুখারিনের সঙ্গে তুলনীয় একটি লোকেরও নিদর্শন মেলে না। আমার বিশ্বাস যে মস্কোর উপর অন্ধ নির্ভরই এ অবস্থার জন্য দায়ী। আমি কেবল মস্কোর দেওয়া টাকা পয়সা অথবা সেখানকার হুকুমের কথা বলছি না—সেখানকার ভাব জগতের যে আবহাওয়া, তার প্রভাবের কথাই বলছি। মস্কোতে যদি দক্ষিণপন্থীদের বাদ দেওয়া হয়, অমনি দুনিয়ার সর্ব্বত্র কম্যুনিষ্ট দলগুলি দক্ষিণপন্থীদের ছাঁটতে সুরু করে, এবং এ রকম ছাঁট যে যুক্তিযুক্ত তা প্রমাণ করবার জন্য পূর্ব্বের মতামত নিয়ে ডিগবাজি খেতে সুরু করে। আবার সোভিয়েৎ বামপন্থীদল যদি কোন কারণে ষ্টালিনের কৃপাবঞ্চিত হয়, অমনি সুদূর চীলি এবং চীনদেশে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট অভিযান সুরু হয়ে যায়। ক্রেমলীন যেদিন রুশীয় সাহিত্যে ও শিল্পকলায় রূপ-সর্ব্বস্বতাকে আক্রমণ করল, তখনই ফরাসী ও গ্রীক কম্যুনিষ্টরা সে সব দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য রূপ হওয়া সত্ত্বেও সেখানেও সেই আক্রমণের সুর তুলল। তোতাপাখীর মত যারা অন্যের শেখানো বুলি আওড়ায়, তারা কি কোন দিন নেতা হতে পারে?

মস্কোতে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কেন্দ্র—তার হুকুমে জার্ম্মাণ কমুনিষ্ট দলে

কয়েকবার ছাঁটাই হয়। একবার জার্ম্মাণ কম্যুনিষ্টরা এর্ণষ্ট থেলমানকে বদলিয়ে অন্য নেতা নির্ব্বাচন করতে চেষ্টা করে, কিন্তু মস্কোর হুকুমে থেলমানকে বহাল রাখতে হল। শক্তিমত্তার চেয়ে হুকুমবরদারীর মূল্য হল বেশী। মস্কোর সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ ও সহযোগিতার মূল্য আছে। বিদেশী কম্যুনিষ্ট দলগুলি রুশদেশের বিজয়ী ও সক্রিয় বিপ্লব থেকে শক্তি এবং প্রভাব দুইই আহরণ করে, বর্ত্তমান অবস্থাতেও পৃথিবীর একটা দেশে সাম্যবাদের সাফল্য দেখে তারা অনুপ্রেরণা পায়। স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মপদ্ধতির পথে কিন্তু এ নির্ভরতায় বাধাই এসেছে, কারণ রুশীয় কম্যুনিষ্টদলের নির্দ্দেশ না আসা পর্য্যন্ত বিদেশী কম্যুনিষ্টদল নিজের কর্ম্মপন্থা স্থির করতে পারে না, এমন কি কী যে কর্‌তে হবে তাও জানে না। যদি কখনো কোন মতভেদ হয়েছে, তবে রুশীয় মতবাদই টিকেছে। বিদেশী কম্যুনিষ্টদের মধ্যে যে পেরেছে, সে রুশীয় দলের আদেশ মেনে নিয়েছে, তা নইলে দল থেকে বিতাড়িত হয়েছে। প্রতিভাশালী জার্ম্মাণ তরুণদের মধ্যে অনেকেই এককালে কম্যুনিষ্ট দলের সদস্য ছিল। তারা দলে এসেছে, কিন্তু থাকতে পারেনি। তারা এসেছে অনেক আশা নিয়ে, কিন্তু হতাশ হয়ে তিক্তচিত্তে দল ছেড়ে চলে গেছে।

জার্ম্মাণ গণতন্ত্রের জীবন যখন সঙ্কটাপন্ন, জার্ম্মাণীর ভবিষ্যত নিয়ে সমস্ত জার্ম্মাণ যেদিন চিন্তিত ও বিব্রত, তেমন সময়েও কম্যুনিষ্টদল জার্ম্মাণীর সমস্যা অবহেলা করে সোভিয়েট ও চীন দেশরক্ষার প্রশ্নে তাদের সময় ও শক্তি নিয়োগ করেছে। হয়তো জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন নিয়ে সকলেই উদগ্রীব, এমন দিনেও বৃটীশ যুদ্ধ জাহাজ কনষ্টানৎসা বন্দরে যাওয়ায় রুশের যে ভবিষ্যৎ (হয়তো কল্পিত) বিপদের আশঙ্কা, তার কাহিনীতেই রোটে ফানের সমস্ত প্রথম পৃষ্ঠা ভর্ত্তি। এরকম ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে জার্ম্মান শ্রমিকেরা বিরক্ত হয়ে উঠল। রুশিয়ার প্রতি তাদের ছিল সহানুভূতি, কিন্তু জার্ম্মাণী হল তাদের জীবন।

কম্যুনিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতির প্রতি বিরাগের আর একটী কারণ নাৎসিদের সঙ্গে তাদের সহযোগিতা। বহুক্ষেত্রেই রাইশটাগে, বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভায়, এমন কি নির্ব্বাচনের সময়েও কম্যুনিষ্ট ও নাৎসিরা একই সাথে কাজ করেছে। কম্যুনিষ্টদের এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল গভর্ণমেণ্টের পরাজয় সাধন, অথবা অন্তত:পক্ষে গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত করে গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা। গভর্ণমেণ্ট অপারগ হলে তার ফলে যে লাভ হবে নাৎসিদলের, সে হিসাব কম্যুনিষ্টরা করেনি। জার্ম্মাণ কম্যুনিষ্টদের মধ্যে অনেকে ভাবত যে একবার নাৎসি শক্তি প্রতিষ্ঠা হলে তার প্রতিক্রিয়ায় কম্যুনিষ্টবিপ্লব সম্ভব হয়ে আসবে। বস্তুতপক্ষে কিন্তু তার ফলে বন্দীশালার দ্বারই খুলে গেল। কম্যুনিষ্টরা

নিজেদের দলের কাছে বাহবা পাওয়ার জন্যও অনেক সময় ভুল করেছে। তারা দেখাতে চেয়েছে যে তারা সর্ব্বদাই সরকার-বিরোধী, ক্যাথলিক ব্রুনিং অথবা সোশাল ডেমোক্রাট হারমান মুলারের শাসন তারা সমর্থন করবে না। ফলে কিন্তু তাদের ভাগ্যে জুটল হিটলার—তাদের সমর্থনের কোন তোয়াক্কাই তিনি রাখলেন না। কম্যুনিষ্ট কর্ম্মপন্থার ফলাফল যখন ধরা পড়তে সুরু করল, তখন কম্যুনিষ্টদের মধ্যে অনেকেই দল ছেড়ে দিল।

বৃহৎ শিল্পপতি বা অন্য কেউ কম্যুনিষ্ট বিপ্লব বন্ধ করবার জন্য হিটলারকে সাহায্য করেনি। সেটা ছিল মাত্র একটা অজুহাত এবং তার ফলে জন সমর্থন মিলেছে। বস্তুতপক্ষে তারা চেয়েছে শক্তিশালী জার্ম্মাণ শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি হ্রাস। মজুরীর হার কমাতে তারা চেয়েছে, কাজের ঘণ্টা বাড়াতে চেয়েছে এবং শ্রমিকদের সঙ্গে যে সমষ্টিগত ভাবে বোঝাপড়া করার দায়, তার থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছে। সামাজিক অবস্থা উন্নতি ও বেকার বীমার টাকা কমিয়ে অস্ত্র শস্ত্রের জন্য অর্থ বাড়াতে চেয়েছে। এ সমস্ত ব্যাপারেই নাৎসিরা সাহায্য করতে পারত। পুঁজিপতিরা দেখল যে নাৎসিরা প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতিবাদে বৃহৎ এবং ক্রম-বর্দ্ধমান জন আন্দোলন গড়ে তুলছে। তারা ভাবল যে এ আন্দোলনকে তারা পোষ মানাবে বা অন্ততপক্ষে নিজেদের কাজে লাগাবে।

জার্ম্মাণ গণতন্ত্রের আমলে রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পরকে ব্যর্থ করেছে এবং ফলে গভর্ণমেণ্ট যা হয়েছে, সবগুলিই হয়েছে অক্ষম ও শক্তিহীন। শান্তিবাদী বলে সেনানায়কের দল, সমাজতান্ত্রিক বলে শিল্পপতিরা, উদারপন্থী বলে জমিদারের দল এবং গণতান্ত্রিক বলে স্থায়ী রাজকর্ম্মচারীরা জার্ম্মাণ গণতন্ত্রকে ঘৃণার চোখে দেখেছে, অথচ দলাদলির ফলে গভর্ণমেণ্টের শক্তিহীনতার দরুণ রাজশক্তি তাদেরই হাতে এসেছে। তাদের কিন্তু নিজস্ব ভোট ছিল না এবং ভোট যাদের হাতে, তারা তাদের জব্দ করতে পারে। এমন সময়ে লক্ষ লক্ষ ভোট কুড়িয়ে হিটলারের আবির্ভাব, কাজেই তারা ভাবল যে হিটলারের সমর্থন পেলে তারা ভোটের সাহায্যে নিজেদের ক্ষমতার বনিয়াদ দৃঢ় করতে পারবে।

জার্ম্মাণীতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পরেও বৃহৎ শিল্পপতি, প্রাচীন ভূম্যধিকারী, সৈন্যবাহিনী বা আমলাতন্ত্রের শক্তিহ্রাসের কোন চেষ্টা হয় নি। শিল্পপতিদের অর্থ ও শক্তি বরং আরো বেড়ে গেল। ভূমিও জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন হয়নি। সৈন্য বাহিনীর প্রভাব আরো গভীর হয়ে এল এবং ঘন ঘন পরিবর্ত্তনের মধ্যে মন্ত্রীদের অভিজ্ঞতা ও শাসনজ্ঞানের অভাবে আমলাতন্ত্রের শক্তি ও সুযোগ সুবিধা বাড়তে

লাগল। এগুলি হয়ে দাঁড়াল রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীন রাষ্ট্র। একত্রিতভাবে তারা হয়ে দাঁড়াল রাষ্ট্রের চেয়েও শক্তিশালী মহারাষ্ট্র। ১৯৩০—৩৩ সালে জার্ম্মাণীতে যে শক্তিসংঘর্ষ, তা বস্তুতপক্ষে হিটলারের সঙ্গে গণতন্ত্রের যুদ্ধ নয়। বাইরে থেকে অবশ্য তাই মনে হয় কিন্তু বস্তুতপক্ষে দ্বন্দ্ব চলছিল এই নিয়ে যে পূর্ব্বোক্ত চারটী শক্তির মধ্যে কোনটী হিটলারকে কাজে লাগাতে পারবে, কোনটী তার বিরোধিতা করবে এবং কোনটী তাঁর কাছে হার মেনে নব্য জার্ম্মাণীতে স্থান পাবার চেষ্টা করবে? হিটলারের তরফ থেকে প্রশ্নটী আরো সহজ ভাবে দেখা দিল ঃ—এগুলির মধ্যে কোনটির সাহায্যে রাষ্ট্রশক্তি অধিকারে তিনি সক্ষম হবেন?

*
* *

১৯৩০ সালের ৬ই মার্চ্চ তারিখে বেকারদের দাঙ্গায় বার্লিনে রক্তস্রোত বইল। পরদিন সমরমন্ত্রী গ্রোণার হুকুম দিলেন যে সৈন্যবাহিনীতে নাৎসিদল থাকতে পারবে না। ১৯ মার্চ্চ তারিখে আইন পাশ হল যে গণতন্ত্র, গণতন্ত্রের পতাকা অথবা গভর্ণমেণ্টকে যদি কেউ অপমান বা উপহাস করে, তবে তার শাস্তি হবে। ২৭ মার্চ্চ তারিখে বাজেট পাশ করবার মত সমর্থন না পেয়ে হারমান মুলারের মন্ত্রীপরিষদ ইস্তফা দিল। তিন দিন পরে হাইনরিশ ব্রুনিং মূলারের বদলে চ্যান্সেলর পদে অভিষিক্ত হলেন। সে সময় ব্রুনিয়েংর বয়স ৪৫ বৎসর। ধর্ম্মে তিনি ক্যাথলিক, রাজনীতিতে রক্ষণশীল। সে সময় অর্থনৈতিক সঙ্কটে জার্ম্মাণী বিপন্ন এবং সেই প্রশ্নের সমাধানেই ব্রুনিং সর্ব্ব শক্তি নিয়োগ করলেন। জার্ম্মাণ জীবনে সেদিন যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন হচ্ছিল, সেদিকে দৃষ্টি দেবার সময় তিনি পান নি। ব্রুনিং বাস্তববাদী, সৎ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন, এবং শাসনের জন্য এ সব গুণের দরকার, কিন্তু তখন যে ঝড় জার্ম্মাণীতে আসন্ন, কেবলমাত্র মামুলি শাসকোচিত গুণে সে ঝড় কাটিয়ে উঠা অসম্ভব ছিল।

ব্রুনিংয়ের গভর্মেণ্ট বেশীদিন টেকে নি। সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ নির্ব্বাচন হ'ল। ১৯৩০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরের এ নির্ব্বাচনে পনেরোটী দল যোগ দিয়েছিল। তার মধ্যে দশটী দল মিলে মাত্র ত্রিশটী আসন দখল করে। বাকী পাঁচটী দলের মধ্যে সোশাল ডেমোক্রেট দল ১৫৩ থেকে কমে ১৪৩-এ দাঁড়াল। ন্যাশনালিষ্ট বা জাতীয়তাবাদী দল পূর্ব্বে ছিল ৭৩, এবার হল ৪১। কেন্দ্রিয় ক্যাথলিক দলের শক্তি বেড়ে ৬২ থেকে ৬৮-তে উঠল, কম্যুনিষ্টরা হল ৫৪ থেকে

৭৬, কিন্তু সব চেয়ে শক্তি বৃদ্ধি হ'ল নাৎসি দলের। তারা ১২ থেকে এক লাফে ১০৭-এ উঠে এল।

বার্লিনে শেয়ার বাজার বন্ধ হয়ে গেল। দুনিয়ার সর্ব্বত্র খবরের কাগজ স্তম্ভিত। সোশাল ডেমোক্রেটরা দেখল যে একমাত্র ব্রুনিং হয়তো জার্ম্মাণ গণ-তন্ত্রকে বাঁচাতে পারেন—তাদের সমর্থনে আবার ব্রুনিং চ্যান্সেলর হলেন। আমিও ভাবলাম যে এবার নাৎসিদের সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। কুরফুরষ্টেনডামে গিয়ে এক ঝুড়ি নাৎসি প্রচার পুস্তিকা কিনলাম—মায় হিটলারের মাইন কামফ বা আমার সংগ্রাম। হিটলারের মহাগ্রন্থ আমার কাছে মনে হল প্রলাপোক্তি,—যুক্তিহীন, অসংলগ্ন এবং কাঁচা হাতের জার্ম্মাণ রচনা। রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবেও তার মূল্য নগণ্য—তার একমাত্র মূল্য এই যে জার্ম্মাণ রাইশটাগে ১০৭টী ভোটের মালিক জেলে বসে বন্দী অবস্থায় বইখানি লিখেছিলেন।

*
* *

১৯৩১ সালের শেষে বেকারের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে প্রায় ষাট লক্ষে দাঁড়াল। বড় বড় ব্যাঙ্ক ফেল পড়বার উপক্রম হল এবং গভর্মেণ্ট হয় তাদের পরিচালনের ভার নিজে হাতে নিতে অথবা তাদের টাকা দাদন দিতে বাধ্য হল। মুদ্রাবিভ্রাটের সঙ্কট আবার দেখা দিল এবং ১৯২১-২৩ সালের দুর্গতির স্মৃতি মনে পড়ে জার্ম্মাণ জাতির অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। শেয়ার বাজার বহুদিন বন্ধ রইল—শিল্প সামগ্রীর উৎপাদনও আবার ১৯২২-২০ সালের মত কমে এলো।

দোকানদার, চাষী, অল্প আয়শালী পরিবার এবং উকিল ডাক্তার প্রভৃতি ব্যবহারজীবি লোকে দেখল যে তাদের উপার্জ্জন ও সম্পত্তি বিধ্বস্ত বা ধ্বংসোন্মুখ। তাদের মধ্যে অনেকেই নাৎসি বা কম্যুনিষ্ট দলে যোগ দিল। কেউ বা প্রথমে নাৎসি দলে যোগ দিয়ে পরে কম্যুনিষ্ট বনে গেল। কেউ বা কম্যুনিষ্ট মতে তৃপ্তি না পেয়ে নৎসি কর্ম্মপদ্ধতিতে পুনর্দীক্ষা নিল। ঘন ঘন দল পরিবর্ত্তন এ সময় প্রায় রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াল। দুঃখ দৈন্যের তাড়নায় তারা বাঁচবার পথ খুঁজেছে, এবং অকপট ভাবে খুঁজেছে বলেই এক দল ছেড়ে অন্য দলে গেছে—যদি কোথাও মুক্তির কোন দিশা মেলে।

ফরাসী বাহিনী রাইনল্যাণ্ড পরিত্যাগ করেছিল বলেই হিটলারের অভ্যুত্থান সম্ভব হল। ব্রুনিংয়ের এখন চেষ্টা হল ক্ষতিপূরণ থেকে জার্ম্মাণীকে রেহাই

দেওয়া যায় কি না। সে চেষ্টা না করে তাঁর উপায় ছিল না—তা নইলে জার্ম্মাণ অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। কিন্তু তাঁর চেষ্টা যদি সফল হয় তবে তাতে হিটলারের জয় আরো এগিয়ে আসবে। ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন সমাধানে ফরাসী-জার্ম্মাণ সহযোগিতা প্রয়োজন, কিন্তু একবার প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেলে সহযোগিতার অবসানও অনিবার্য্য। হিটলার যে ফরাসীদের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করবেন এ ভরসা জার্ম্মাণদের ছিল না, কিন্তু মিত্রতা রক্ষার প্রয়োজন যেদিন ফুরোবে, সেদিন হিটলারের হাতে শক্তি সমর্পণেও বাধা থাকবে না।

বস্তুতপক্ষে জান্তে অজান্তে সবাই যেন হিটলারের হয়ে কাজ করছিল। ১৯৩১ সালের ৩১ মার্চ্চ জার্ম্মাণ বিদেশ-সচিব কার্টিয়াস জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে শুল্ক-সংঘের প্রস্তাবনা করেন। খবরটী বোমার মতন ফেটে পড়ল। ফরাসী দেশ রুমানিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া যুগোশ্লাভিয়া কাউকে পূর্ব্বে এ বিষয়ে জানান হয় নি। ফরাসী মন্ত্রী ব্রিয়ঁ বল্লেন—এ রকম শুল্কসংঘ আমি হতে দেব না। শুল্ক সংঘ হ'ল না, কিন্তু তাতেও লাভ হল নাৎসি দলের। ভার্সাই সন্ধি সম্বন্ধে নাৎসিরা এতদিন যা বলে এসেছে, তা হাতে নাতে প্রমাণ হয়ে গেল। জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে শুল্কসংঘ বা অন্য কোন ধরণের ঐক্যবন্ধন স্থাপিত হোক, ফরাসী বা ইটালির কেউ তা চায়নি—তাদের আশঙ্কা যে এ রকম মিলনের ফলে জার্ম্মাণীর শক্তি বাড়বে। একথা তারা ভাবেনি যে এভাবে জার্ম্মাণীর শক্তি বাড়লে তাতে সন্ধি-সমর্থক গণতান্ত্রিক জার্ম্মাণীর শক্তিই বাড়বে, আর অষ্ট্রিয়া জার্ম্মাণীর মিলন যদি না হয়, তবে তাতে শক্তি বাড়বে ভার্সাই-বিরোধী যুদ্ধাভিলাষী হিটলারের। দুদিক দিয়েই তাই হিটলারের সুবিধা। ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে জার্ম্মাণীর যেটুকু লাভ, তার ফলে রাষ্ট্রশক্তি অধিকার তাঁর পক্ষে সহজ হোল। আবার অষ্ট্রিয়ার ব্যাপারে জার্ম্মাণীর যে অপমান, তাতে জার্ম্মাণদের নতুন নতুন দল তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিল।

১৯৩২ সাল জার্ম্মাণীর পক্ষে সন্ধি-বর্ষ—এ বৎসরই তার সমস্ত আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছল। এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর নতুন প্রেসিডেণ্টের নির্ব্বাচন করতে হবে। অনেকেই ভাবল যে এ দুঃসময়ে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব এড়ানো বাঞ্ছনীয় —বিশেষ করে তখনো ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন নিয়ে বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে গোপন ও জটিল আলোচনা চলছে। তা ছাড়া নির্ব্বাচনে কি হয় সে সম্বন্ধে কেউ ভরসা পাচ্ছিল না। ৭ই জানুয়ারী সমর সচিব গ্রোণার, চ্যান্সেলর ব্রুনিং এবং হিটলারের মধ্যে এক বছর বা দু বছরের জন্য নির্ব্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার বিষয় গোপন কথাবার্ত্তা হয়। হিটলার ইতস্ততঃ করতে লাগলেন কিন্তু নাৎসি দলে কোলাহল

বেধে গেল। গোয়েবলস এবং গোয়রিং জিদ ধরলেন যে হিণ্ডেনবুর্গের বিরুদ্ধে হিটলারকে দাঁড়াতে হবেই। গোপন কোন সমঝোতার আর অবকাশ রইল না। ১৫ই ফেব্রুয়ারী হিণ্ডেনবুর্গ ঘোষণা করলেন যে জাতির প্রতি কর্ত্তব্য হিসাবে তিনি আবার প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য নির্ব্বাচনপ্রার্থী। সোশাল ডেমোক্রাটরা কাউকে দাঁড় করাল না, হিণ্ডেনবুর্গকে যে তারা খুব পছন্দ করত, তা নয়, তবে হিটলার বা থেলমানের প্রতি তাদের বিরাগ আরো বেশী, এবং তারা হিণ্ডেনবুর্গকে সমর্থন না করলে হিটলারের জয় অনিবার্য্য।

১৩ই মার্চ্চ যে ভোট হয় তাতে হিণ্ডেনবুর্গ পেলেন ১৮,৬৫৪,০০০ ভোট, হিটলার—১১,৩৪১,০০০ আর থেলমান—৪,৯৮২,০০০, এবং ডুষ্টেরবের্গ—২,৫৫৮,০০০। অন্যান্য প্রার্থীদের ভোটের যোগফল হিণ্ডেনবুর্গের চেয়ে বেশী হওয়ায় ১০ই এপ্রিল তারিখে আবার ভোট হল। এবার হিণ্ডেনবুর্গ পেলেন ১৯,৩৬১,০০০ ভোট, হিটলার—১৩,৪১৯,০০০ আর থেলমান—৩,৭০৬,০০০। হিণ্ডেনবুর্গ নির্ব্বাচিত হলেন। প্রায় দশ লক্ষের উপর কম্যুনিষ্ট ভোট না দিয়ে প্রমাণ করল যে কম্যুনিষ্ট নেতাদের চেয়ে তাদের বুদ্ধি বেশী। নির্ব্বাচনের ফলে কিন্তু অবস্থা অনিশ্চিত হয়ে রইল। কেউ কেউ বলল—হিণ্ডেনবুর্গের সুনিশ্চিত জয়ে প্রমাণ হয় যে হিটলার ও নাৎসি পার্টির দমন করে জার্ম্মাণীর অর্থসঙ্কট দূর করবার জন্য হিটলার-বিরোধী-সাহসিক কর্ম্মপন্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশই দেশ দিয়েছে। অন্য পক্ষে একথাও শোনা গেল যে নাৎসি দল ১৩,০০০,০০০ উপর ভোট পেয়েছে এবং দিন দিন তাদের শক্তি বেড়েই চলেছে। এ রকম দলকে কেউ দমন করতে পারে না—তার সঙ্গে বোঝাপড়া করাই শ্রেয়।

হিটলারকে দমন করবার ঝোঁকই মন্ত্রীসভার দেখা গেল। প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের তিনদিন পরে সমরসচিব গ্রোণার নাৎসি ঝটিকা-বাহিনীকে বে-আইনী ঘোষণা করলেন। ব্রুনিং গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য ভূমিব্যবস্থা সংস্কারে হাত দিলেন। জার্ম্মানীর পশ্চিম অঞ্চলে জমির টানাটানি, অথচ পূর্ব্বপ্রুশিয়ার জমিদারদের হাতে জমি পতিত পড়ে থাকত। ১৯৩২-সালে সরকারী সাহায্যের ৬৯,০০০,০০০ মার্ক ১২০০০ কৃষিজীবিকে দেওয়া হয়, অথচ মাত্র ৭২২ জন জমিদারকে দেওয়া হয় ৬০,০০০,০০০ মার্ক। তা দিয়েও তারা জমি বা জমিদারীর উন্নতি করতে পারেনি—সে অর্থের অপব্যয় করেছে। ব্রুনিং স্থির করলেন যে জমিদারীগুলির নতুন বিলিবন্দোবস্ত করতে হবে। তিনি ভেবেছিলেন যে হিণ্ডেনবুর্গ গণতন্ত্র রক্ষার প্রধান স্তম্ভ, এবং সেজন্য তাঁর পুনর্নির্ব্বাচনের জন্য তিনি

আপ্রাণ পরিশ্রম করেছিলেন। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে হিণ্ডেনবুর্গ পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার পয়লা নম্বর জমিদার এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াশীল। তাছাড়া, তাঁর বন্ধুবান্ধবেরাও প্রায় সকলেই জমিদার এবং তাদের কথাই তিনি সবচেয়ে বেশী শোনেন। ব্রুনিংয়ের ভূমি সংস্কারের প্রস্তাবের কানাঘুষা হতেই জমিদারের দল স্থির করল যে ব্রুনিংকে তাড়াতে হবে, তার জন্য যদি হিটলারকে আনতে হয় সেও ভাল। হিটলারের ভূমি সংস্কারে বিশ্বাস ছিল না। তিনি নাৎসি কর্ম্মসূচি থেকে জমিদারী বাজেয়াপ্তের প্রস্তাব বাদ দিয়ে মাইন কামফে লিখলেন যে চাষীর ভূমি সমস্যা মেটাবার জন্য উক্রেন জয় করতে হবে, পূর্ব্ব-প্রুশিয়ায় সামান্য জমি দিয়ে সে সমস্যা মিটবে না। হাতের পাখী তিনি জমিদারদের দিলেন—চাষীদের বল্লেন যে গাছে যে দুটো পাখী রয়েছে, দুটোই তারা পাবে।

ব্রুনিং যখন তাঁর ভূমি সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে হিণ্ডেনবুর্গের কাছে এলেন, তখন তিনি এরকম "বলশেভিক" আইন গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ব্রুনিংকে মন্ত্রীসভা পরিত্যাগ করতে বল্লেন। ৩০শে মে তারিখে ব্রুনিং ইস্তফা দেওয়ার পর ব্যারণ ফন প্যাপেন ২রা জুন তারিখে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। জমিদার ও অভিজাত নিয়েই তাঁর মন্ত্রীসভা গঠিত হ'ল। পূর্ব্বপ্রুশিয়ার ভূম্যধিকারীদের হাতে ব্রুনিং ও গণতন্ত্রীদের পরাজয় হল, শ্লাইখারের হাতে গ্রোণার হারলেন।

প্রকৃতপক্ষে শ্লাইখারই ব্রুনিং ও গ্রোণারের পতনের জন্য দায়ী। শ্লাই-খার গোপনে হিটলার, ঝটিকা-বাহিনীর নেতা রোয়েম এবং গোয়েবলসের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালিয়েছিলেন। সে সময় তিনি সমরমন্ত্রী গ্রোণারের সহকারী। গ্রোণার যেদিন ঝটিকাবাহিনীকে বে-আইনী ঘোষণা করলেন, শ্লাইখার গিয়ে তাঁকে বল্লেন যে সেনাবাহিনী এ কাজ সমর্থন করবে না। গ্রোণার শ্লাইখারকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করলেন। সৈন্যবাহিনীতে গণতন্ত্রে নিষ্ঠাবান মতবাদের মুখপাত্র ছিলেন গ্রোণার, কিন্তু বহুলোকের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ অনিবার্য্য। হিটলারের মন্ত্রে দীক্ষিত, রণোন্মুখ ও বলশেভিকবিরোধী অনেক তরুণ দলপতিও সৈন্যবাহিনীতে ছিল। ব্রুনিংয়ের চেষ্টার ফলে অন্যান্য রাষ্ট্রের সমান সমরসজ্জার অধিকারও জার্ম্মাণীর ফিরে আসছিল। সৈন্যবাহিনী তখন নব নব বিজয়ের আশায় উদ্‌গ্রীব। শ্লাইখার ছিলেন এই দলের মুখপাত্র এবং দেখা গেল যে সৈন্যবাহিনীতে গ্রোণারের চেয়ে তাঁর দলই শক্তিশালী। শ্লাইখার নাৎসিদল, জমি-দারের দল ও শিল্পপতিদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালিয়ে আপোষে ফন প্যাপেনকে চ্যান্সেলর করতে চেষ্টা করলেন। পরিণামে প্যাপেনই হিটলারের পথ মুক্ত করলেন।

অভিজাত জমিদারের দলের প্রতি জার্ম্মাণ গণতন্ত্র ১৯১৮ সালে যে উদার ব্যবহার দেখিয়েছিল, সমরপন্থীদের যে উদারতার সঙ্গে তাদের পূর্ব্ব পদে বহাল করেছিল, তার প্রতিদানে গণতন্ত্রকে বিনাশ করবার সুযোগ কবে আসবে তারই প্রতীক্ষায় তারা চোদ্দ বৎসর ধৈর্য্য ধরে বসেছিল। নিধনের কাজ তাদের পক্ষে কঠিন হয়নি, কারণ প্রেসিডেন্ট থেকে সুরু করে সেনাপতি, বিচারক ও পুলিশ সমস্ত পদই তারা দখল করে বসেছিল। গণতন্ত্রের বিনাশ আরো সহজ হয়েছে এইজন্য যে শ্রমিক শ্রেণী ছিল দ্বিধা-বিভক্ত। সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী শ্রমিক গণতন্ত্র রক্ষার জন্যও মিলতে পারল না, মধ্যবিত্ত শ্রেণীও অর্থনৈতিক স্বার্থের খাতিরে রাজনৈতিক অধিকার বিসর্জ্জন দিল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে সাম্যবাদের যে ভীতি, হিটলারও তারই উপর দিলেন ঝোঁক। যে সব কারণে জার্ম্মান গণতন্ত্র ধ্বংস হল, তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বোধ হয় সাম্যবাদ-বিরোধী আবেদন। জার্ম্মানীর কম্যুনিষ্ট দল ১৯১৮ সালে যে সমস্ত শক্তি ও প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করতে পারেনি, ১৯৩২ সালে ধ্বংস করবার কথা ভাবতেও পারেনি, সেই সমস্ত শক্তি ও প্রতিষ্ঠানই ১৯৩৩ সালে সাম্যবাদের জুজু সামনে দাঁড় করিয়ে জার্ম্মান গণতন্ত্রকে ধ্বংস করল। মুখে তারা সাম্যবাদের কথা বলেছে, প্রকৃতপক্ষে তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল শ্রমিকসংঘ ও উদারপন্থী রাজনীতি। জার্ম্মান গণতন্ত্র শান্তিকামী ও উদারপন্থী বলেই জার্ম্মানীর শিল্পপতি, জমিদার ও সেনানায়কেরা জার্ম্মান গণতন্ত্রকে ধ্বংস করল। হিটলার যেদিন এসে গণতন্ত্রের দুর্গ আক্রমণ করলেন, ভিতর থেকে অন্তর্শত্রুরা দুর্গদ্বার খুলে দিল।

৩০শে জুলাই আবার নির্ব্বাচন হয়। রাইশটাগে এবার নাৎসিরা পেল ২৩০ জন, সোশাল ডেমোক্রাট ১৩৩, কম্যুনিষ্ট—৮৯, কেন্দ্রিয় ক্যাথলিক—৭৫ ও জাতীয়তাবাদী—৩৭। মধ্যপন্থী দলগুলির আর কোন অস্তিত্বই রইল না। রাইশটাগের অধিবেশন হল ৩০ আগষ্ট। গোয়েরিংকে সভাপতি নির্ব্বাচন করে ৫১২—৪২ ভোটে প্যাপেনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করায় আবার নতুন নির্ব্বাচনের আদেশ হ'ল। এবার কিন্তু ২৩০ জনের বদলে ১৯৭ জন নাৎসি প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হল। প্যাপেন তখনো চ্যান্সেলর এবং হিটলারের সঙ্গে তাঁর কথাবার্ত্তা চলছে, এর মধ্যে ২রা ডিসেম্বর হঠাৎ শ্লাইখার চ্যান্সেলর নিযুক্ত হলেন।

১৯৩২ সালের শেষার্দ্ধে জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থার খানিকটা উন্নতি হয়। শ্লাইখারও এ সময় আলাদা ভাবে নিজের হাত খেলতে সুরু করেন। ক্ষমতার প্রলোভন দারুণ এবং শাসনযন্ত্রের চূড়ায় পৌঁছে কেউ সহজে অন্যকে

স্থান ছাড়তে চায় না। শ্লাইখারের মতলব ছিল যে নাৎসি সংগঠনকে দ্বিধাবিভক্ত করে শ্রমিক-সংঘ ও হিটলার-বিরোধী নাৎসিদের সাহায্যে তিনি গভর্মেণ্ট চালনা করবেন। হিটলার যে শিল্পপতিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, অন্যতম নাৎসি নেতা গ্রেগর ষ্ট্রাসার তা পছন্দ করেননি। নাৎসিরা জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদী। হিটলার কিন্তু জাতীয়তাবাদী ও সমাজতন্ত্রবিরোধী। ষ্ট্রাসারের সমাজতন্ত্রের দিকে ঝোঁক ছিল। ফলে শ্লাইখার ও ষ্ট্রাসার মিলে হিটলার ও প্যাপেনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। শিল্পপতিরা ভয় পেয়ে গেল। তারা ভেবেছিল যে হিটলারের হাতে টাকা দিলেই নাৎসিদের আয়ত্তে রাখা যাবে, এখন দেখা গেল যে হিটলারের নাৎসিদের উপর পুরোপুরি দখল নাই। (এর জন্য ষ্ট্রাসার ও শ্লাইখার দুজনকেই দাম দিতে হয়েছিল—১৯৩৪ সালে দুজনকেই গুলি করে মারা হয়।)

নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব চালাতে ও ঝটিকা বাহিনীর মতন বিপুল দলকে আয়ত্তে রাখতে টাকার দরকার। নাৎসি অর্থভাণ্ডার তখন নিঃশেষ, হিটলারের হাতে টাকা নাই, শিল্পপতিরাও আর অর্থসাহায্য করতে অনিচ্ছুক। ৩রা ডিসেম্বর তারিখে থুরিঙ্গিয়ায় যে নির্ব্বাচন, তাতে নাৎসিদের ভোট প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে এল। সারা ডিসেম্বর শ্লাইখার দলে দলে সোশাল ডেমোক্রাট ও শান্তিবাদীদের কারামুক্ত করতে লাগলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও খানিকটা ফিরে এল। ২২শে ডিসেম্বর গোয়েবলস লিখলেন—পার্টির মধ্যে অনেক বিবাদ ও অসন্তোষ। আর্থিক দুর্গতি আগের মতই চলছে।

আমি ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে বার্লিনে এলাম। আমেরিকান দূতাবাস, সোভিয়েট দূতাবাস, আমেরিকান সাংবাদিক, জার্ম্মাণ সাংবাদিক, সকলের মুখে এক কথা—হিটলারের আর আশা নাই, নাৎসিরা খতম হয়ে গেছে। ৩০শে জানুয়ারী কিন্তু হিটলার হলেন জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলর।

লোকচক্ষুর অন্তরালে অনেক কিছু ঘটছিল। ৪ঠা জানুয়ারী রাইনল্যাণ্ডে প্যাপেনের সঙ্গে হিটলারের গোপন সাক্ষাৎ হয়। সেখান থেকে প্যাপেন তাঁকে ডুসেলডর্ফে শিল্পপতিদের এক বৈঠকে নিয়ে যান। সেখানে উপস্থিত একজনের কাছে শুনেছি যে সেদিন হিটলার তাঁর বাদামী কোর্ত্তা পরে যাননি—তিনি গিয়েছিলেন সাদা টাই বেঁধে পুরোপুরি সান্ধ্য পোষাকে। শিল্পপতিদের তিনি বল্লেন যে শ্লাইখারকে বিশ্বাস করা যায় না—জার্ম্মাণ শিল্প বাণিজ্যের প্রকৃত বন্ধু আমি। বক্তৃতা করতে করতে তিনি বুক চাপড়াতে সুরু করলেন। শিল্পপতিদের ব্যবসায় বুদ্ধি পাকা, কিন্তু রাজনীতি ভিন্ন জিনিষ। তারা হিটলারের আস্ফালন দেখে

ভাবল যে এ নির্ব্বোধকে চালিয়ে নিতে কোন কষ্ট হবে না। শিল্পপতিদের হিটলার প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাঁদের ব্যবসা বাণিজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তিনি হাত দেবেন না। হিটলার শ্লাইখারের নাম দিলেন—রক্ত সেনাপতি। ষ্ট্রাসারের কোন সমর্থক নাই সে কথা বল্লেন। আরো বল্লেন যে জমিদারী বাজেয়াপ্তই ব্রুনিংয়ের মতন শ্লাইখারেরও উদ্দেশ্য। শিল্পপতিদের সতর্ক করলেন যে সময় বেশী নাই, যদি জার্ম্মাণীকে বাঁচাতে হয়, হিটলারই বাঁচাতে পারেন, এবং শিল্পপতিদের ও জার্ম্মাণীকে বাঁচাবার জন্যই হিটলারের শক্তিসাধনা। শিল্পপতিরা হিটলারের জয়গান গেয়ে অর্থ সাহায্য নিয়ে এলেন।

এবার হিণ্ডেনবুর্গকে বোঝাবার পালা। তাঁকে বোঝানো হল যে শ্লাইখার স্বেচ্ছাচারী ও দুরাশাপন্ন। অন্য পক্ষে হিটলার ন্যায়তান্ত্রিক, দেশভক্ত ও সমঝ-ওয়ালা। জনরব রটল যে শ্লাইখার সৈন্যবাহিনী তৈরী করে রেখেছেন এবং প্রয়োজন হলে ব্যবহার করতে ইতস্ততঃ করবেন না। প্যাপেন হিণ্ডেনবুর্গের সঙ্গে এক সাথে থাকতেন এবং দেখা হলেই হিণ্ডেনবুর্গকে বলতে লাগলেন—একমাত্র হিটলারই আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারেন। হিটলারের আগের মত ভোটশক্তিও আর নাই, কাজেই এবার আমাদের কথা মত চলতে হবে। ৩০শে জানুয়ারী হিণ্ডেনবুর্গ হিটলারকে ডেকে পাঠালেন, ও জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলরপদে নিয়োগ করলেন।

এমনি করে জার্ম্মাণ গণতন্ত্রের স্বেচ্ছামৃত্যু হ'ল।

রাহু

রজত সেন

বিজনদাকে প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম।

কেনই বা মনে থাকবে? মনে থাকা মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ, স্মৃতির ধূসর ছায়ায় কত মুখ মিলিয়ে গেছে, জীবন-ইতিহাসের কত উজ্জ্বল পৃষ্ঠা সময়ের ধূলোর স্পর্শে ম্লান, বিবর্ণ হয়ে গেল কে রেখেছে তার হিসেব?

চাল-ডাল-নুনের ত্রিভুজ-পরিবেষ্টিত জীবনের বোঝা নিয়ে নিস্তরঙ্গ নদীতে স্বচ্ছন্দ-গতিতে ভেসে যাচ্ছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে বিন্ধ্যাচলের কোন এক অখ্যাত ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে বিজনদার একখানা চিঠি এল। ছোট্ট কয়েক লাইনের একখানা পোস্ট কার্ড,—তবু মনে হল হেমন্তের বাতাসে ঘর-ছাড়া বাঁশীর ডাক শুনলাম, বুঝলাম রাধিকার মনের ব্যথা!

বিজনদা মিতভাষী, তাই চিঠিতেও অতিশয়োক্তি নেই; কয়েকটি মাত্র পঙ্‌তি মনে হয় কোন আশ্চর্য মন্ত্রের এক একটি সূত্র! লিখেছেন—"আবার তোদের কাছে ফিরে আসছি রে! নিরিবিলি একখানি ঘর দেখে রাখিস—যেখানে লোকের ভিড় কম। শুভানুধ্যায়ী—বিজনদা!"

অফিস থেকে এক দিনের ছুটি নিয়ে কলকাতা ঢুঁড়ে বেড়ালাম। অবশেষে সহরের দক্ষিণ প্রান্তে একেবারে লেকের ধারে দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে একখানা ঘর ভাড়া করে ফেললাম, নিরালা, নির্জন। বিজনদার পছন্দ না হয়ে পারেনা।

স্টেশানে গেলাম বিজনদাকে আনতে। তাক লাগিয়ে দেয়া যাবে। যতদূর জানি বিজনদা আত্মীয়বিহীন, নির্বান্ধব; সংসারে আপনার জন যে কেউ আছে এটা কোনদিন শুনিনি তাঁর মুখ থেকে।

প্ল্যাটফরমে পায়চারি করছি, পাঁচ লাখ টাকার লটারি-জেতার সংবাদের জন্যেও মানুষ বোধ হয় এতটা উত্তেজিত হয়না।

দূর থেকে অদৃশ্য ট্রেনের শব্দটা আমার বুকের মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছিল।

* * *

গাড়ির কোন জানলায় একখানা পরিচিত মুখ দেখা গেলনা, গৈরিক বসন পরিহিত কোন লোক পর্যন্ত নয়।

পাঁচ বছর আগে একটি দিনের কথা মনে পড়ল, জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ধুতি-পাঞ্জাবী ত্যাগ করে রঙিন কাপড় পরবে শেষ কালে?'

বিজনদা শান্ত, মধুর হেসে বলেছিলেন, 'আপত্তি কি? মন যদি বদলাতে পারে তার আবার রঙ্, সামান্য পোষাকে কি এসে যায় রে?'

'মনের রঙ্ তোমার বদ্‌লেছে নাকি?'

'প্রত্যেক দিন বদলায়!'

আশ্চর্য লোক এই বিজনদা। তাঁর উজ্জ্বল, শান্ত এবং গভীর দৃষ্টি দ্বারা তিনি যেন আমার অন্তরের গহনতম রহস্যও দেখতে পান, কিছু গোপন রাখবার উপায় ছিলনা তাঁর কাছে।

পা চালালাম, শরীরে আনলাম বিদ্যুৎ-গতি; জনারণ্যে বিজনদাকে হারিয়ে যেতে দেয়া হবেনা।

পিঠের উপর বাঁশের লাঠি, আগায় একটি সাধারণ পুঁটলী, পরণে গৈরিক আলখাল্লা, পায়ে খড়ম, সাড়ে ছ'ফুট বিজনদা কখনও দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যেতে পারেন না।

চলায় তাঁর এতটুকু চাঞ্চল্য নেই, ধীর, মন্থর গতিতে তিনি গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

'এই-বিজনদা!' ছেলেমানুষের মত অত জোরে চীৎকার করে ফেলব আশা করিনি। পেছন ফিরলেন বিজনদা, তাঁর সেই শান্ত হাসি। লাঠি নামিয়ে তিনি আমায় আলিঙ্গন করলেন, বললেন, 'ভুলিসনি দেখছি!'

'তোমায় আবার ভুলতে পারে কেউ? কি হল, আবার রঙ্ বদলাল নাকি?'

বিজনদা হাসলেন।

বাসে দু'একটি কথা হল মাত্র। ট্রামের ঘড়ঘড়, মানুষের অসহ্য কোলাহলের মধ্যে বিজনদার গলার ক্ষীণতম শব্দও হারিয়ে যেতে পারে—এই আশংকায় কথা কইলাম কম। আর—ওঁর স্বভাব আমার ভালো করেই জানা আছে, নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত তিনি মুখ খুলবেন না। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর ছাড়া বিশেষ কিছু আশা করলে হতাশ হতে হবে।

লাঠিটা তিনি হাতছাড়া করলেন না, কমণ্ডলু আর হরিণ-ছাল বইবার সৌভাগ্যটুকু কোন রকমে অর্জন করলাম।

বাস থেকে নেমে নির্জন পথ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

'অনেক বাড়ি হয়ে গেছে এধারে, না?'

চমকে উঠলাম বিজনদার গলার শব্দে। 'হ্যাঁ, অনেক! তুমি গেছ—কম দিন ত হয়নি ?'

আবার নিস্তব্ধতা।

তবু অনুভব করলাম বিজনদার একান্ত সান্নিধ্য!

লেকের পাশ দিয়ে যে-রাস্তাটা একেবারে টালিগঞ্জের পুলের ধারে চলে গেছে, সে-রাস্তার উপর প্রকাণ্ড এক বাগান পরিবেষ্টিত বাড়ি।

দারোয়ান সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

বিজনদা কিছু মন্তব্য করবার আগেই বললাম, 'বাড়িটা খালি, আমারই এক জমিদার বন্ধুর। তার সঙ্গে ব্যবস্থা করে দুটো ঘর বাগিয়েছি। তোমার কোনই অসুবিধে হবেনা। দারোয়ানকে কয়েকটি টাকা বেশি দিলে সেই তোমার সব কাজ করে দেবে, এমন কি রুটি পাকানো পর্যন্ত!'

'এ ত ঐশ্বর্যের সমারোহ!' বললেন বিজনদা।

'হলই বা! তোমার কাজ কর্মের বিঘ্ন না হলেই ত হল!'

'বাধা-বিঘ্নের কথা নয় কমল! প্রথম কথা প্রাসাদে থাকবার অধিকার আমার নেই ; দ্বিতীয় এত ভাড়া কোথা থেকে জুটবে ?'

'তোমার প্রথম মন্তব্যের উত্তরে বলতে চাই—এখানে আশ্রয়ের প্রশ্নই প্রধান, প্রাসাদ বা কুটিরের তুলনা যুক্তিহীন—যখন কোনটাই তোমার ক্ষতিবৃদ্ধি করছে না। তোমার বইগুলোর চাহিদা আছে লোকের কাছে। প্রকাশকের কাছে সন্ধান নিলে জানতে পারবে—বেশ মোটা কিছু তোমার পাওনা হয়েছে ; অতএব তোমার দ্বিতীয় সমস্যারও সমাধান হয়ে গেল। এখন চল ভেতরে।'

প্রশস্ত ঘর। মেঝেয় পুরু কার্পেট বিছানো, দরজায় মিহি পর্দা। দক্ষিণ দিকে পালংক। বাইরে থেকে হেনা গাছের ডাল প্রায় জানালা ছুঁয়েছে। এক পাশে ছোট একখানি লেখবার টেবিল, চেয়ার। টেবিলের ওপর শ্বেতপাথরের একটি ধ্যানী বুদ্ধ প্রায় এক ফুট উঁচু।

বিজনদা কয়েক মিনিট ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালেন। তাকালেন চারপাশে। দৃষ্টি তাঁর পরিক্রমণ-শেষে বুদ্ধ-মূর্তির ওপর নিবিষ্ট হল ; লাঠিটা নামিয়ে রেখে টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন, একান্ত দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন মূর্তির দিকে ; তাঁর মুখে দেখা দিল অদ্ভুত এক হাসি।

'অবরুদ্ধ করে মুক্তির ইসারা!' তিনি বললেন অবশেষে।

কয়েক মিনিটের নিস্তব্ধতা।

'হ্যাঁরে কমল, লোকে আমার বই পড়ে?' জানলার কাছে এগিয়ে তিনি বললেন। 'পড়ে!' উত্তর দিলাম, 'কেন জানো?' তোমার লেখা দুর্বোধ্য বলেই পাঠকের কৌতূহল এত বেশি! যে-বিষয় বোঝা কষ্টসাধ্য তার ওপর আকর্ষণ আমাদের প্রবল—এ তুমি জানো। সবাই এত আলোচনা করছে, দেখাই যাক না কি বলছে লোকটা। এ-ই হচ্ছে বই-কাট্‌তির রহস্য! তা ছাড়া সমালোচনা যারা করেছেন তাঁরা ধোঁয়া দিয়ে কুয়াশা দূর করবার চেষ্টা করেছেন মাত্র। ফলে তোমার কেতাবের মূল্য গেছে বেড়ে।'

'যদি না-ই বোঝে লোকে কিনবে কেন আমার বই?' বিজনদা হাসি মুখে প্রশ্ন করলেন।

'বোঝবার বাহাদুরি অর্জন করবে বলে!' যদি দৈবাৎ অর্থটা পরিষ্কার হয় বন্ধু-মহলে বুদ্ধি আর মেধার প্রশংসাও কম কথা নয়।'

কয়েক মিনিট পরে বললাম, 'গেটে যে লোকটাকে দেখলে—তাকেই বলেছি তোমার খাবার তৈরি করে দেবে।'

'দরকার নেই, একটা রাঁধবার জায়গা পেলে নিজেই ব্যবস্থা করে নেবো, রাত্রে ত ওসব হাঙ্গামা নেই!'

'উপোস নাকি?' বিস্মিত হলাম।

'না, সামান্য কিছু পানীয় বা—সে হয়ে যাবে, তার জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না তোকে। তোর এখন ছুটি।'

এ-মন্তব্যের অর্থ প্রাঞ্জল। আপাতত আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। দু'দণ্ড প্রাণ খুলে গল্প করব এ-সুযোগ বিজনদা দিলেন না; আহত হলাম।

'প্রয়োজন ব্যতীত তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ নেই—এই তুমি বলতে চাও নাকি?'

বিজনদা চট করে উত্তর দিলেন না। কি ভাবছিলেন, এ-ই তাঁর স্বভাব, কথার মাঝখানে অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়া। এ সত্ত্বেও কোন কথা তাঁর কান এড়িয়ে যায় না। কিন্তু আলোচনাটা অঙ্ক নয়, ভাষা দ্বারা তোমার মনকে বুঝতে দাও।

হঠাৎ আমার দিকে এগিয়ে এসে কাঁধের ওপর হাত রেখে বললেন, 'অভিমান করেছিস তুই! আফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরিস, অনেক গল্প করব তোর সঙ্গে। অনেক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাবো!'

আনন্দে হৃৎপিণ্ড দুলে উঠল। অভিমানের জন্যে লজ্জিত হলাম।

'তুমি থাকবে ত? না অন্য কোথাও—'

'কোথাও যাব না! অপেক্ষা করব তোর জন্যে।'

আমারই জন্যে অপেক্ষা করবেন বিজনদা! প্রিয়-সম্ভাষণের উত্তেজনায় আমার সমস্ত স্নায়ু শিথিল হয়ে এল।

* * *

ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারে বাগান অতিক্রম করে নিঃশব্দে দরজা ঠেলে বিজনদার ঘরে ঢুকলাম; টেবিলের নীল সেডের আলোয় যাঁকে দেখলাম—তিনি বিজনদা নন। মিহি-কাপড়ের পাঞ্জাবী পরণে, হাল ফ্যাসানের ছাঁটা-চুল। নিবিষ্ট মনে মাথা নিচু করে লিখছেন।

'দেখুন! বিজনদা ছিলেন না এ-ঘরে?' সংকুচিত গলায় প্রশ্ন করলাম।

'বোস্!' বহুদূর থেকে বিজনদার গলার শব্দ যেন হাওয়ায় ভেসে এল।

মৃদু পায়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলাম, ভুল হয় নাই; বিজনদাকে কেউ কোন দিন ভুল করতে পারে না। গৈরিক বসন ত্যাগ করেছেন তিনি, পরণে খদ্দর। অথচ সকালে তাঁর চুল পড়েছিল ঘাড়ের ওপর। মুখে উজ্জ্বল গৌরবর্ণের আশ্চর্য দীপ্তি যেন বেড়ে গেছে!

খাটের ওপর বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিন্তু লিখেই চললেন তিনি, খুব সম্ভব আমি হারিয়ে গেছি বিস্মৃতির তিমির অন্ধকারে।

অপেক্ষা করতে লাগলাম। বিজনদার দৃষ্টি বাইরে অন্ধকার আকাশের দিকে নিবদ্ধ হয়ে রইল, কিন্তু রাত্রির গাঢ় অন্ধকারের কোন স্পর্শ নেই তাঁর চোখে, অতলস্পর্শী দৃষ্টি অন্ধকার অতিক্রম করে চলে গেছে নূতন বিচিত্রতর এক জগতে—যেখানে বিচরণের সাধ্য ছিল না আমার।

হঠাৎ কলমটা টেবিলের এক দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তিনি তাকালেন আমার দিকে, মনে হল শূন্য দৃষ্টিতে। ক্রমশ তাঁর চোখে ফিরে এল প্রাণ, অনুভব করলাম উত্তাপ।

'অনেকক্ষণ এসেছিস—না?'

'তা এসেছি, তোমার ধ্যান ভাঙ্‌ল?'

বিজনদা হাসলেন। পরিচ্ছদ পরিবর্তনের জন্যে তিনি কোন কৈফিয়ৎ দেয়া প্রয়োজন বোধ করলেন না। আমার পাশে এসে বসলেন। 'তোর কথা বল, মনোযোগ দিয়ে শুনছি। মা ভাল আছেন? সুচরিতার সঙ্গে দেখা হয়? বিয়ে হয়েছে নিশ্চয়!'

'তোমার কথা শুনতেই ত এলাম!' বললাম আমি; 'মা ভালো আছেন, সুচরিতা বিয়ে করবে না ঠিক করেছে!'

'ও, তাই নাকি?' শান্ত গলায় তিনি শুধু বললেন।

'এ ছাড়া সুচরিতা সম্বন্ধে তোমার আর কিছুই বলবার নেই?'

বিজনদার মুখ দেখে মনে হল তিনি বিস্মিত হয়েছেন, 'সুচরিতা সম্বন্ধে? কৈ, না, কি বলবার আছে?'

ইচ্ছে হল বিজনদার সঙ্গ ত্যাগ করি; কিন্তু উঠতে পারলাম না। কিসের অদৃশ্য আকর্ষণ আমাকে চলৎশক্তি রহিত করে ফেলেছে। অসহ্য লাগছিল, কিন্তু খাট থেকে পা নামাবার পর্যন্ত উৎসাহ বোধ করলাম না।

'জান বিজনদা, সে তোমার জন্য আজীবন চিরকুমারী থাকবে স্থির করেছে?' বলে ফেললাম। লাভ ছিল না কিছুই।

'আমার জন্যে? কি বলছিস?'

'ঠিকই বলছি। তুমি কি এক দিন ওকে বুঝতে দাও নি—তাকে তুমি বিয়ে করবে?'

বিজনদা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন না, তাঁর মুখে কোন জটিল প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠল। কপালে দেখা দিল কয়েকটি তীর্যক রেখা। নিঃশব্দে পায়চারি করলেন কয়েকবার কার্পেটের ওপর।

'অথচ কাপুরুষের মত তুমি পালিয়ে গেলে বিন্ধ্যাচলে!' রক্তে অনুভব করলাম আঘাত করবার নেশা, 'বিয়ে করবার তোমার সাহস হল না, গা ঢাকা দিলে। দুনিয়ার লোকের বিশ্বাস জন্মেছিল—তোমাদের বিয়ে হবে!'

'সে কি আমার অপরাধ রে? লোকের ভাবনার কি অন্ত আছে পৃথিবীতে?'

'কিন্তু তাদের ঐ ধারণার জন্যে তুমিই ত দায়ী!' গলায় আর সে জোর পেলাম না।

'তোর যুক্তিতে ভুল আছে, বুঝিয়ে দিচ্ছি। লোকের মতামতের ওপর কান দিয়ে কি আমরা চলতে পারি? না চলা উচিত? আলোচনা, নিন্দা করা এটা আমাদের স্বভাব—ভুলে যাসনি! সুচরিতার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল মাত্র, বিয়ের প্রশ্ন এখানে আসছে কি করে? বিয়ে করবার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছি—এ-ধারণা যে ভ্রান্তিপূর্ণ এটা আশা করি একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবি। বাস্তবিক যদি ওর মনে এ-রকম কিছু ভাবান্তর ঘটে—আমি দুঃখিত। এর চাইতে বেশি আমি কি বলতে পারি?'

লজ্জিত হলাম, অনুতাপ বোধ করলাম, কটু কথার জন্যে। 'আমায় ক্ষমা কোরো বিজনদা, অপরাধ করেছি!'

বিজনদা আমার একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন।

বিজনদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম তখন রাত্রি গভীর। অন্ধকার পথ। আকাশে আষাঢ়ের পুঞ্জীভূত মেঘ, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোয় অন্ধকার আরও নিবিড় হয়ে দেখা দিচ্ছে চোখে। জোরে পা চালালাম।

মিনিট কয়েক পরে আকাশ ভেঙে জল নামল। আমার বাড়ি খুব দূরে নয়, দৌড়বার জন্যে প্রস্তুত হলাম, কিন্তু তাতে পা পিছলে যাবার সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্তে। দিশাহারা বোধ করলাম কয়েক মুহূর্ত!

যখন বিজনদার ঘরে এসে পৌঁছলাম—তখন সম্পূর্ণ ভিজে গিয়েছি। লিখছিলেন তিনি একান্ততায় স্তব্ধ হয়ে, মুখ না ফিরিয়েই বললেন, 'আলনায় ধুতি আর জামা আছে; ভিজে কাপড় বদলে নে, শুয়ে পড় বিছানায়!' আবার কলম চলল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কোথায় শোবে?'

'কেন? চেয়ারে। শুয়ে পড়, রাত কটা রে?'

'অনেক।'

বাইরে বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ঝম ঝম শব্দ, গাছের শাখায় দুরন্ত বাতাসের গর্জন। ঘুম পাচ্ছিল। বিজনদার সঙ্গে বাদানুবাদ বৃথা।

শুয়ে পড়লাম চাদরটা টেনে।

পাশ থেকে বিজনদার মুখ দেখা যাচ্ছে; চোখের নিমিলিত পাতায় একাগ্রতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিস্মিত হলাম, বিজনদা কোন দিন স্নায়ুতে শ্রান্তি বোধ করেন না।

দেয়ালের দিকে মুখ ফেরালাম, বৃষ্টি-ঝরার গান ছাড়া আর কোন শব্দকে আমল দিলাম না। বিজনদার মুখখানা স্পষ্ট হয়ে উঠল। অন্ধকারের প্রান্ত থেকে তাঁর আশ্চর্য দুটি চোখ তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কিছুতেই সে-দৃষ্টি তাড়াতে পারলাম না মন থেকে।

ঘুম নেই।

বিজনদা বিন্ধ্যাচলে। আমায় অফিসের বড় সাহেব শাসাচ্ছেন; মা মারা গেলেন এই মাত্র! তাঁর দীর্ঘ বৈধব্য-জীবনের ওপর পড়ল শেষ যবনিকা।

মা'কে হারাবার দুঃখ খুব কঠিন হয়ে বাজল না আমার বুকে। বীথিকে একদিন বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, বীথি রাজি হয়নি—কেননা ওর মতে সংসার ঘাড়ে নেবার দায়িত্ব আমার নাকি জন্মায়নি। স্ত্রীকে পালন করবার মত সামর্থ আমার কোথায়? বেকারত্বের অপরাধ বীথির কাছে অমার্জনীয় হয়ে দেখা দিল; আমার যে একখানা দোতলা বাড়ি আছে, মায়ের পর সে-বাড়ির সম্পূর্ণ মালিকানা যে আমার, এ-সত্য বীথির মনকে টলাতে পারল না। চাকরি—যে কোন চাকরির জন্যে কোলকাতা সহর চষে ফেললাম। ইতিমধ্যে আসামের এক জমিদার সোনার বড়শিতে বীথিকে গেঁথে ফেলল। জল ঘোলা করলাম, ঢিল ছুঁড়লাম, হাত-ছিপ নিয়ে তীরে দাঁড়িয়ে জানালাম অনেক কাকুতি। সোনা-রূপো-গয়নায় মাখানো চাড় ফেলে ঘোড়েল মাছ নড়ল না, আসামের পাকা খেলোয়াড় ছিপ গুটিয়ে মাছ তুলে ফেললেন। (চোখ খুলতেই বিজনদার মুখ দেখলাম)।

বীথির কাল-রাত্রি কাটল, বীথি হারালো তার কৌমার্য! (যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলাম) বিজনদা তাকালেন আমার দিকে, চোখ বুঁজে পড়ে রইলাম। চেয়ারে বসে বসে তিনি যেন আমার অন্তঃস্থলের গোপন কাহিনী উদ্ঘাটন করছেন। ঘুম নেই। বিজনদার শারীরিকতার উন্মাদক স্পর্শ যেন অনুভব করলাম আমার রক্তে। পাশ ফিরলাম। তুমি যাও, বিজনদা! তোমার উপস্থিতি নিয়ে তুমি চলে যাও লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে—পৃথিবী ছাড়িয়ে,—যেখান থেকে তোমার স্মৃতি আমাকে স্পর্শ করবে না। আমাকে মুক্তি দাও। মুক্তি দাও। চোখ খুলতে সাহস হল না। সাদা দেওয়ালে বিজনদার উজ্জ্বল মুখখানা যেন জ্বলছে! আশ্চর্য! বীথিও আমায় ভোলাতে পারছে না!

বীথিকে নিবিড় আলিঙ্গনে অনুভব করলাম দেহের প্রত্যেকটি স্নায়ুতে! ওর ভ্রমর-কৃষ্ণ চুলে ডুবিয়ে দিলাম মুখ! চুম্বন করলাম বীথিকে ওর কানের পাশে, গালে, পাতলা ঠোঁটে, গলায়, বুকে, বাহুতে;—কিন্তু বীথি নেই, বিজনদা হাসছেন!

আবার বীথি। বিজনদা বীথির হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন আশ্চর্য এক পথ দিয়ে সূর্যের উদ্দেশে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম বীথির দেহ মিলিয়ে গেল সূর্যের রক্তাক্ত গহ্বরে।

চিৎ হয়ে শুলাম, হাত পা মেলে, শরীরটাকে ভাসিয়ে দিলাম শূন্যে হাল্কা হাওয়ায়।

বৃষ্টি পড়ছে ঝম্ ঝম্, ঘুম, ঘুম্, ঘুম। আয় ঘুম, ঘুম আয়।

শায়িত কমলের দেহ থেকে ধীরে ধীরে মুক্তি নিল কমল! নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াল বিজনদার পেছনে, হাতে তার উদ্যত শাণিত অস্ত্র।

বিজনদা কলম রেখে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। কমলের ছায়া মিলিয়ে গেল হাওয়ায়।

বিজনদা ফিরে এলেন টেবিলের ধারে।

* * *

বাইরে অন্ধকার ফিকে হয়ে এল।

বিজনদা বাতি নিবিয়ে স্নান করতে গেলেন।

পাখি ডাকলো। বর্ষণ ক্ষান্ত আকাশে ঘন মেঘের ঘটা।

রাত্রি-জাগরণের পর সারা দেহে ক্লান্তি নিয়ে শয্যা-ত্যাগ করলাম।

আধ-ভিজে কাপড় আর জামা পরে—বিজনদার পরিচ্ছদ আলনায় টাঙ্গিয়ে রেখে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলাম।

বিজনদা এসে পড়লেন। তেমনি ক্লান্তিহীন, প্রফুল্ল চেহারা; চেয়ারে বসে লোকটা যে সারা রাত কলম চালিয়েছে এ-কথা ওঁর মুখ দেখে কেউই বলতে পারবে না।

'তোর ত চা খাওয়া অভ্যেস আছে, অপেক্ষা কর, ব্যবস্থা করে ফেলছি!' তিনি বললেন।

আপত্তি করলাম—যদিও গরম চায়ের প্রস্তাব আমার কাছে বড় প্রলোভন। বললাম, 'রাত্রে বাড়ি ফিরিনি, মা ভাবছেন। এখন যাচ্ছি। অফিস ফেরত আসবো।'

রাস্তায় লোক চলাচল তখনও ভালো করে আরম্ভ হয়নি। বাতাসে বৃষ্টির গুঁড়ো।

* * *

অফিসে কাজের ভিড়েও বিজনদার ভূত তাড়াতে পারলাম না ঘাড় থেকে। চিঠির খসড়া তৈরি করছি, হঠাৎ মনে হল সাদা কাগজের ওপর একখানা ঝাপসা মুখ ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে! কলম চালাচ্ছি সে মুখের ওপর! ফাইলটা সরিয়ে রাখলাম।

হরিপদকে ঘিরে কখন একটা কলরব ঘনিয়ে উঠেছে লক্ষ্য করিনি। ব্যাপার কি? টেবিল ছেড়ে এগিয়ে গেলাম। হেড অফিস থেকে এইমাত্র

চিঠি এল, বড় সাহেবের সুপারিশ মঞ্জুর হয়েছে। রাঁচীর ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের পদ হরিপদই পূর্ণ করবে—আগামী মাস থেকে।

আপত্তি ওজর কেউই শুনল না। পাঁচটার পর চারজন সহকর্মী হরিপদকে নিয়ে রেস্তরাঁয় ঢুকে পড়ল। রাত্রি আটটা পর্যন্ত রাজ্যের রাবিস গেলা হল। মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল, বিজনদার সঙ্গে আজ আর দেখা হলনা বুঝি!

'গুরু-ভোজনের আনুসঙ্গিক কৈ?' বিমল চোখ টিপল।

হরিপদর ক্ষীণ কণ্ঠ কারুরই কানে পৌঁছাল না, তার পকেট হাতড়ান হল, দুর্ভাগ্যক্রমে তখনও খান তিনেক দশটাকার নোট তার ব্যাগে পাওয়া গেল।

নোট ক'খানা হস্তগত করে বিমল বলল, 'Follow me—I shall lead you to—'

রমাপতি যোগ করল, 'Hell! না ভাই—ওতে আমি নেই, মুখ থেকে গন্ধ বেরুলে গিন্নি ধরে ফেলবে! সেবার সারাটা রাত কি কেলেঙ্কারী! আমি চললাম।'

বিমল তার সার্টের হাতা চেপে ধরল, 'রাখ তোর গিন্নি! জানিস্ আমারও ঘরে সীতা আছে, জানলার ধারে বসে রামচন্দ্রের জন্যে রাত জাগবে। বলবি কবরেজী ওষুধের গন্ধ!'

'কবরেজী ওষুধ হঠাৎ খেতে গেলাম কেন? না ভাই, তাকে তুমি চেননা, ঠিক ধরে ফেলবে! সাংঘাতিক মেয়ে!'

'রাত্তিরে বাড়ি যাবিনা—ওখানে পড়ে থাকবি! বলিস একটা বানিয়ে যা হয় কিছু!'

'কোথায় পড়ে থাকবো?' সন্দেহে রমাপতি ভুরু কুঁচ্‌কাল!

'চল না! দেখচি!'

বিমল ছাড়ল না কাউকে।

ভিড়ের মধ্যে কেটে পড়বার চেষ্টা করলাম, বিমলের কড়া হাতের চাটি মাথায় ঝন ঝন করে উঠল। নিরস্ত হলাম।

ঝাপসা অন্ধকারে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে বিমল একটা পুরণো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি বাবা? সব ন্যাকা বনে গেলে দেখছি যে! এসো!'

বিমল ঢুকে পড়ল কয়েকটি মেয়ের গা ঘেঁসে, পেছনে আমরা। বিজনদার দৃষ্টি আমায় অনুসরণ করল, নিজেকে ধমক দিলাম। বিজনদাকে মন থেকে ছেঁটে ফেলবার এ একটা অপূর্ব সুযোগ!

কিন্তু—কাল ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াবো কোন ভরসায়? যদি জিজ্ঞেস করেন কোন প্রশ্ন? যদি বুঝতে পারেন? লজ্জায় মরে গেলাম। মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে গেল সমস্ত চিন্তাসূত্র। মিনতি করে বললাম, 'শরীরটা ভয়ানক খারাপ লাগছে ভাই! মাথাটা কেমন যেন ঘুরছে! আমায় ছেড়ে দাও!'

'ছেলেমানুষী কোরোনা, কমল! ভেগে পড়বার মতলব ছাড়! বিয়ে ত করনি—অত ভাবনা কিসের?'

তর্ক করা বৃথা! হয়ত হাত ধরে টানাটানি আরম্ভ করবে! মনে মনে বললাম, বিজনদা ক্ষমা কোরো! তোমার সুহৃদ হবার উপযুক্ততা আমি যেন বিনাশ না করি!

দরজায় পর্দা ঝুলছিল। বিমল ডাকল, 'সাবিত্রী! বাইরে এসো একবার!'

মেয়েটি বাইরে এল, পর্দাটা বাঁ হাতে ধরেছে—যেন ঘরের উজ্জ্বল আলোর রেখা তার আকৃতিটা স্পষ্ট করে তোলে।

মন্দ লাগল না মেয়েটিকে! স্মার্ট মনে হল, যদিও পরিচ্ছদে শালীনতার অভাব নিতান্তই পীড়াদায়ক। যুবতী।

'আসুন!' পর্দাটা তুলে ধরল সাবিত্রী। সবাইকে আহ্বান করল, 'আসুন!'

পরিচ্ছন্ন ঘর। এক পাশে খাট আর সৌখিন একখানি ড্রেসিং টেবিল। আলনায় কয়েকখানি পরিষ্কার সাড়ি ও ব্লাউজ আর তোয়ালে। ঘরের তাকে কাচের গ্লাস, পেয়ালা, কয়েকটি ডিকেণ্টার। নীচে ফরাস পাতা।

বসলাম সবাই তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে।

সাবিত্রীকে টাকা দেয়া হল, চারটি বোতল, সোডা আর দু'টিন সিগারেট এসে পড়ল অল্পক্ষণের মধ্যে।

পর্দার পাশ থেকে দুটি জলন্ত চোখ আমায় পুড়িয়ে ফেলেছে! মুখ ফেরালাম। তাকালাম সাবিত্রীর দিকে। দেহ ছাড়া কি আর আছে ওর? সমস্ত অবয়বে, ভঙ্গিতে একটা কদর্য বিজ্ঞাপন।

বিমল হাত বাড়িয়ে বলল, 'কাছেই একটু এসনা বাপু!'

সাবিত্রী ঘন হয়ে বসল বিমলের কোলের কাছে।

খানিকটা পান করলে হয়ত সাবিত্রীকে ভালো লাগতে পারে, অস্পষ্ট আলোর অন্ধকারে।

একটা গ্লাস বিমল আমার দিকে এগিয়ে দিল।

হাত বাড়াতে গিয়ে আঙুল কাঁপছে বুঝতে পারলাম। দরজার বাইরে যেন

অস্পষ্ট কার ছায়ামূর্তি দেখতে পেলাম। খানিকটা পানীয় ছলকে পড়ল চাদরে! লক্ষ্য করলনা কেউ। বললাম, 'দরজাটা বন্ধ করে দাও না! কে না কে এসে পড়বে ঘরে!'

সাবিত্রী দরজা বন্ধ করে এল।

মুখের কাছে গ্লাসটা তুলে নামিয়ে নিলাম, 'কেউ দরজায় টোকা মারছে না?' ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম।

'কেউ না! জানলাটা নড়ছে হাওয়ায়', সাবিত্রী হাসিমুখে বলল 'কৈ আপনি এখনও খাননি?'

'এই যে খাচ্ছি! তাড়া কিসের?' বললাম।

দ্বিতীয় গ্লাস চলছে!

বিমলের একান্ত অনুরোধে সাবিত্রী সাড়ির বদলে একটা রেশমী ঘাগরা পরে নিল, বিমল তার পায়ে নূপুর পরিয়ে দিচ্ছে। নাচ সুরু হবে। উজ্জ্বল আলোয় তাকে স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল, জমকালো আভরণ, রঙ্, পাউডার, খোঁপায় জড়ানো বেলফুলের মালার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছিল; অনুজ্জ্বল ম্লান আলোয় তার দেহটাই চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে! হাসি আর চাউনি মনের মধ্যে অসহ্য ঘৃণা জমিয়ে তুলছে!

নাচ আরম্ভ হল। বোতল ক'টা খালি হয়ে গেছে। একটা গ্লাস ভাঙ্‌ল। রাস্তায় বেলফুল আর ঘুগ্নি হাঁকছে।

আমার গ্লাসটা অন্যের অলক্ষ্যে সরিয়ে রাখলাম খাটের নিচে।

বিজনদা ডাকছে বাইরে থেকে, স্পষ্ট শুনলাম গলার শব্দ!

দরজাটা খুলে বাইরে এলাম। কৈ কোথায় বিজনদা?

রাস্তায় এসে পড়েছি। ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে। আকাশে বৃষ্টির ভয়। চৌরঙ্গী পর্যন্ত পায়দল, সেখান থেকে রিকসা করব।

বিজনদা বোধ হয় ল্যাম্পের ধারে বসে লিখছেন। সন্ধ্যের সময় আমার জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন কি?

বিজনদা থাক, অন্ততঃ আজ রাত্রিটা নিজের কথা ভাবা যাক।

সাবিত্রী নাচছে এখনও, রেশমী ঘাগরা তার উড়ছে বাতাসে। থমকে দাঁড়ালাম, চলেই বা এলাম কেন? এখন—এই নির্জন, অন্ধকার রাস্তায় সাবিত্রীকে ভালই লাগল। দেহে তার এখনও মাদকতা আছে, বিলোল কটাক্ষে আছে কামনার ইসারা। ওকে ত ইচ্ছে করলেই আকর্ষণ করতে পারতাম। কিন্তু

বিজনদাই আমায় বঞ্চিত করেছে এ আনন্দ থেকে, মুখের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে পানপাত্র। বিজনদার হাত থেকে কেমন করে মুক্তি পাবো? কে উদ্ধার করবে আমায়?

জোরে পা চালালাম, বৃষ্টি বুঝি এসে পড়ল।

* * *

নিদ্রাহীন রাত্রির অবসান হল।

প্রতিটি মুহূর্ত বিজনদা ও সাবিত্রীর যুদ্ধে ক্লেশকর হয়ে উঠেছিল। আয়নায় মুখ দেখে চঞ্চল হয়ে গেলাম। চোখের চার পাশে কালো দাগ। সরে এলাম। ছাতে পায়চারি করলাম, সমস্ত স্নায়ুতে ক্লান্তি, পেশীগুলো অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

স্থির করলাম আজ আর বিজনদার কাছে নয়। একখানা বই নিয়ে শুয়ে পড়লাম হাত পা ছড়িয়ে।

বৃথা।

বিজনদার ওখানে যখন পৌঁছলাম তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে।

'তোকে ভালো দেখাচ্ছেনা ত! অসুস্থ?' জিজ্ঞাসা করলেন বিজনদা।

'না, ভালোই ত আছি!'

কয়েক মিনিটের নিস্তব্ধতা।

'হ্যাঁ রে! সুচরিতাদের ওখানে যাতায়াত আছে?'

প্রশ্নটার অর্থ কি? শংকিত হলাম।

'না, কালে ভদ্রে!'

কথাটা মিথ্যে। তুচ্ছতম কারণের সুযোগ নিয়েও ওঁদের ওখানে আমি যাই। না গিয়ে আমার উপায় ছিলনা। সুচরিতাদির নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্যে একদিন যাতায়াত আরম্ভ করেছিলাম। নিজের অজ্ঞাতসারে সাহচর্য একদিন ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছে। সুচরিতাদি এমন একজন মেয়ে—যাঁকে ভালো না লেগে উপায় নেই, যাঁর মধুর স্বভাব শান্ত প্রকৃতি আর অন্তরঙ্গ ব্যবহার চিরকাল তোমার মনে অক্ষুণ্ণ ভক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

কথাটা বলতে পারিনি, কোনদিন পারবোনা।

বিজনদা মাঝখানে সৃষ্টি করেছেন মহাসাগরের ব্যবধান।

* * *

বললাম, 'বিজনদা ! জীবন বড় একঘেয়ে ঠেকছে, বিয়ে করি, কি বল ?'

বাস্তবিক উৎসাহে তিনি উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন, 'তুই এতদিন যে বিয়ে কেন করিসনি,' তিনি বললেন, 'তাই আমি এখন ভাবছি। এ-কথা আমার একবারও মনে হয়নি, (বুদ্ধের মূর্তির দিকে তাকিয়ে) ভারি সুন্দর !'

বিস্মিত হলাম ! 'কি ?'

'এই বিয়েটা ! মানুষকে এমন একটা পরিপূর্ণতা দেয়—কি বলব ! আমি কামনা করি—তোর জীবন সুন্দর আর মহত্তর হয়ে উঠুক !'

দিন কয়েকের মধ্যে সব স্থির হয়ে গেল।

বিজনদা এত পরিশ্রম করতে পারেন—এটা কোন দিন জানা ছিলনা। তাঁর অবস্থিতি আরও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। মন্ত্রগুলো বার বার ভুল হচ্ছিল ! শুভদৃষ্টির সময় চন্দন-চর্চিত সুন্দর, সুকুমার মুখের পানে ছায়ার মত আর একখানি পরিচিত মুখ ভেসে উঠল। কিন্তু ভয় পেলাম না, নেশাটা জমছে।

বিজনদা অনেক রাত্রে পালাচ্ছিলেন, বাসর-ঘরে বন্দী করা হল তাঁকে আর শংকা নেই, ওঁকে নিয়ে মাথা না ঘামালেও আমার চলবে ! সুতীব্র, উন্মাদক নেশায় নিজেকে একেবারে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রাখব, ক্লিয়ার আউট্ বিজনদা !

আলাপ করিয়ে দিলাম, "বিজনদা ! আমার জীবনের ধূমকেতুও বলতে পারো। সবিতা !' হাসলাম !

'পরে আলাপ হবে কমল, আজ আমায় যেতে দে অনেক কাজ আমার !'

বিজনদার আপত্তি টিঁকলনা, সবিতার সঙ্গে বাধ্য করলাম আলাপ করতে। বসলেন বিজনদা জাঁকিয়ে, কৌতুক-মেশানো মধুর সরলতায় কথা বলে চললেন, এমন আশ্চর্য গলায় একান্ত আন্তরিকতায় কারুর সঙ্গে এর পূর্বে আলাপ করতে তাঁকে দেখিনি। কিন্তু মনকে প্রবোধ দিলাম, আশংকা করবার কারণ নেই কিছু ! সবিতা আমার, একান্ত আমারই ! লক্ষ্য করলাম সবিতা নিঃসংকোচ দৃষ্টিতে বিজনদার দিকে তাকিয়ে আছে সে-দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে, বিস্ময়, বিমুগ্ধ প্রশংসা এবং শ্রদ্ধা।

বিজনদা এক সময়ে বিদায় নিয়ে গেলেন, রেখে গেলেন তাঁর শারীরিক অনুভূতি, তাঁর অনুচ্চ অথচ স্পষ্ট মোহময় কথার ধ্বনি ঊর্মির মত আমার অন্তরে আঘাত করে বেড়াচ্ছে। সবিতার রাত্রি বিজনদা হরণ করে নিয়ে গেছেন।

সবিতাকে অমানুষিক ভালবাসতে আরম্ভ করলাম, রাক্ষসের মত গ্রাস করলাম তার সমস্ত সত্বা। আমার জীবন, আমার কাজ, আমার নিদ্রা এবং

জাগরণের প্রতিটি মুহূর্ত বেষ্টন করে রাখলাম সবিতাকে দিয়ে। ওর স্বাতন্ত্র্যকে হত্যা করলাম, ওর যৌবন আমার আত্মার, আমার সমগ্র ইন্দ্রিয়ের প্রতিধ্বনি মাত্র। বিশাল, আয়ত চোখে ও আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, বুঝি ভয় পায়। ভীরু পাখির মত সে আমার ক্ষুধার কাছে আত্মসমর্পণ করে, অনুযোগ করবার সাহস পায়না, আপত্তির অবকাশ পায়না।

'তোমার বিজনদাকে একদিন চা খেতে বলনা কেন!' সংকুচিত গলায় সবিতা একদিন প্রস্তাব করল।

'বিজনদাকে?' আমার গলার স্বরটা আর্তনাদের মত শোনাল; 'আচ্ছা বলব। বেশ লোক, না?'

কিন্তু গেলাম না। বিজনদার আকর্ষণ সবিতার নিবিড় স্পর্শের দ্বারা প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করলাম।

সেদিন রবিবার। সবিতাকে তার মার কাছে রেখে আসতে হল, অনেকদিন ঠেকিয়ে রেখেছি তাকে।

দুপুরে কিছু করবার নেই। ঘুমোবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। সিনেমার উদ্দেশে রওনা হলাম, টিকিট পেলাম না।

বিজনদার বাড়ির সামনে এসে হঠাৎ ট্রাম থেকে নেমে পড়লাম, থমকে দাঁড়ালাম; যাওয়া-না-যাওয়ার দ্বন্দ্বে দুলতে লাগলাম।

টেবিলের উপর মাথা রেখে বিজনদা ঘুমিয়ে পড়েছেন; সামনে পাথরের বুদ্ধ-মূর্তি। হয়ত এই মাত্র ঘুমিয়েছেন; হাতের কাছে যে-কোন-একখানা বই নিয়ে সোফাটায় গা এলিয়ে দিলাম, পা দিলাম ছড়িয়ে। মাথাটা কাত হয়ে পড়ল একদিকে, বইটা মাটিতে।

* * * নীল আকাশে সাদা মেঘের কিনারে কিনারে আশ্চর্য সুন্দর এক পাখি সোনালী পাখায় ভর করে স্বচ্ছন্দ, নিরুদ্বেগ গতিতে উড়ে যাচ্ছে।

এক খণ্ড সাদা মেঘ দেখতে দেখতে কালো হয়ে গেল, হঠাৎ সেই জমাট মেঘ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ল চারদিকে, আর তার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল হিংস্র, ভয়ংকর এক বাজ!

দিগন্ত, শূন্য আকাশে শংকাকুল, ভয়ার্ত পাখিটি উড়ে চলল বিদ্যুৎ-গতিতে, পশ্চাতে তার উদ্যত থাবা মেলে সেই বাজ। জীবন আর মৃত্যুর প্রতিযোগিতা চলল।

অগ্রগামী পাখির মুখটা বদলে গেল ধীরে ধীরে, পাখার পরিবর্তে দু'খানি

অনাবৃত, নিটোল বাহু! রূপালী সাড়ির আঁচল আর কালো চুল উড়িয়ে সবিতা উড়ে যাচ্ছে আকাশে, চোখে তার দুরন্ত ইসারা!

পশ্চাতে সেই বাজ, বিজনদার মুখ, পাখির শরীর মানুষের অবয়বে রূপান্তরিত হল।

ব্যবধান হ্রস্ব হয়ে এল। বিজনদা স্পর্শ করলেন সবিতার হাত।

শ্বেত-শুভ্র শয্যা।

সবিতার আলস্য-মধুর দেহে বংকিম ভঙ্গি!

বিজনদা কঠিন হস্তে নিরাবরণ সবিতাকে আলিঙ্গনে নিষ্পেষিত করে ফেলছেন, তিনি ওকে চুম্বন করলেন—বুকের কাছে সেই কালো তিলের ওপর—যেখান থেকে গত রাত্রির চুম্বন-চিহ্ন এখনও মিলিয়ে যায় নি।

ঘুম ভেঙ্গে গেল। সোজা হয়ে বসলাম।

বিজনদা তখনও ঘুমোচ্ছেন। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে, টেবিলের নিচে পা দুটো ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি, হাত ঝুলছে দু'পাশে। চেয়ারের গায়ে মাথাটা আলগোছে ঠেস দেয়া।

দাঁড়িয়ে পড়লাম, জুতো পড়ে রইল খালি পায়ে নিঃশব্দে ঢুকে পড়লাম পাশের ছোট ঘরটায়—যেখানে নানা রকম টুকিটাকি জিনিষ পত্র এলোমেলো ছড়ান। এক গাছি মজবুত দড়ি যোগাড় করতে বেশি সময় লাগল না।

ঘুমন্ত বিজনদার পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্র হাতে একটি ফাঁস তৈরি করলাম, সাবধানে গলিয়ে দিলাম মাথার ভিতর! শরীরের সমস্ত স্নায়ু এবং পেশী একাগ্র করে অমানুষিক শক্তিতে দড়ির দু'প্রান্তে টান দিলাম। বিজনদা একবার বিদ্যুৎ-চালিতের মত চমকে উঠলেন, পেছনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম তিনি চোখ মেলেছেন। আরও জোরে টানতে লাগলাম, বাহুতে অনুভব করলাম প্রচণ্ড শক্তি! আরও জোরে—ঘাড় ফেরাবার চেষ্টা করলেন তিনি, পারলেন না। অনুভব করলাম তার দৃষ্টিশক্তি ম্লান, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে!

দড়ি ছেড়ে দিলাম। বিজনদার মাথাটা এক দিকে কাৎ হয়ে পড়ল। ফাঁস খুলে নিয়ে দড়িটা পকেটে পুরলাম।

যখন রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম—তখনও বিকেল।

আধুনিক সাহিত্য

'আধুনিক সাহিত্যিক' কথাটার উপর বাঙ্গালী পাঠকের একটা সহজাত আশঙ্কা আছে। বাংলাদেশে রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যেরই দুর্নাম আধুনিক সাহিত্য। কারণে অকারণে ও নামের সঙ্গে বিভীষিকা দেখা পাঠকদের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। চোখ মেলে নিজের চতুষ্পার্শ্বকে দেখবার সাহস যাদের নেই সাহিত্যে উৎসুক হওয়া তাদের পক্ষে বিড়ম্বনা। আধুনিকদের যৌনচিত্র আঁকবার প্রবাদটাই বাঙ্গালী পাঠকদের কানে সোজাসুজি প্রবেশ লাভ করেছিল—তাই তারা আর অন্য কোন দিকে কর্ণপাত করেনি। সে যুগেও এমন দুজন গল্প লেখক ছিলেন—যাঁরা 'আধুনিক' ধ্বনির আওতায় লিখতে সুরু করেছিলেন বলেই আধুনিকতার দুর্নামের অংশীদার হয়েছেন অথচ প্রতিভাবান হয়েও প্রতিভার যথোচিত সম্মান পাননি। বাংলাদেশে আধুনিক সমাজ বলে যে উনিশ শতাব্দী থেকে স্বতন্ত্র একটা সমাজ গড়ে উঠেছে সে-সমাজের খানিকটা সম্পূর্ণ ভাবে গল্পের ভিতর দিয়ে সার্থক রূপ দিতে পেরেছিলেন শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। আধুনিক সাহিত্যিকের ভীড়ের মধ্যে এ দুজনকেই বলা যায় সত্যিকারের আধুনিক। বাঙ্গালী পাঠক এদের গল্পগুলোর সঙ্গে ভালো করে পরিচিত হতে পারলে হয়ত আধুনিকতার নামে আজ এতটা কলঙ্ক জড় হয়ে উঠতনা।

ইদানীং প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মহানগর' বলে যে গল্পের বইটি প্রকাশিত হয়েছে তার গল্পগুলো পড়ে আজকের দিনের যে কোনো সমালোচকই বল্‌বেন, একটা যুগের সাহিত্যের প্রতি বাঙালী পাঠক বা সমালোচক কোনো সুবিচারই দেখাতে পারেন নি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বহু গল্পই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর তালিকায় ভুক্ত হবার দাবী জানাতে পারে—হয়ত পাঠকরা সে দাবী অগ্রাহ্য করেছে এবং সমালোচকরাও পাঠকদের ভ্রম সংশোধন করতে এগিয়ে আসেন নি।

তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প আবেগের উগ্রতা বা বর্ণের অসহ্য উজ্জ্বলতা নিয়ে আবির্ভূত হয়নি। জোর করে অসাধারণ হবার চেষ্টা লেখকের ছিলনা—তাই তাঁর অসাধারণত্ব অনেক সময় পাঠকের সাধারণ উপলব্ধির বাইরেই থেকে গেছে। তাঁর গল্পের যা উপকরণ—মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর জীবন—সত্যি বল্‌তে, তাতে এমন কি বর্ণাঢ্যতা আছে যা দিয়ে রোমাঞ্চকর কাহিনী বা আবেগ-মত্ত চরিত্র তৈরী করা যায়? তাছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্র বৈজ্ঞানিক বিচার-বুদ্ধিকে নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে কাহিনী তৈরী করতে অনেক সময়ই রাজী হননি। কাজেই অনেক ক্ষেত্রে হৃদয়াবেগ বা ঐতিহ্যগত সংস্কারের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র পাঠকের

চোখে যতটা সফল হয়ে দাঁড়িয়েছেন—ততটুকু সফলতাও প্রেমেন্দ্র মিত্র লাভ করতে পারেন নি। তার একমাত্র কারণ পাঠকের বিজ্ঞান-বিরোধী মন। যে প্রাকৃতিক নিয়মে আমাদের জীবন পরিচালিত হচ্ছে আমরা তাকে সহজে বুঝ্‌তে চেষ্টা করিনে, কেউ বোঝাতে চেষ্টা করলে তার উপর রুষ্ট হয়ে উঠি। যে দৃষ্টি নিয়ে প্রকৃতি বা সমাজ মানুষের জীবনকে তৈরী করে চলেছে প্রেমেন্দ্র মিত্র সে-দৃষ্টিতেই মানুষকে দেখ্‌তে চেয়েছেন—পাঠকের রোষ থেকে নিষ্কৃতি না পাবার কারণই তাঁর তা-ই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প যে কারণে গভীর সে কারণেই পাঠকের কাছে তা আগ্রহ-বর্জ্জিত।

এ থেকে কেউ যেন না মনে করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র বৈজ্ঞানিক বিচার-বুদ্ধির নীরস কাঠিন্য দিয়ে তাঁর গল্প-সাহিত্যকে কঙ্করময় করে তুলেছেন। গল্পের চরিত্রগুলোকে তিনি এনে দাঁড় করিয়েছেন গভীর ভাবে আপন করে নিয়েই; কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের নির্দ্দয় ভাবে ছেড়ে যাবার ঔদাসীন্যও তাঁর আছে। গল্পের চরিত্রগুলো মানুষ হয়ে উঠেছে, ভাব-গদ্‌গদ্ ননীর পুতুল হয়ে ওঠেনি। এক সময় প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছিলেন: "গল্প মাত্রেই বোধ হয় নদীর চোখে তীরের গল্প।" গল্পের এর চেয়ে সার্থক সংজ্ঞা খুব সহজে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। কারণ যে সব গল্পের অনেকদিন পর্য্যন্ত মহৎ সাহিত্য হিসেবে টিকে থাকবার অধিকার জন্মায়, সেগুলো প্রত্যেকটিই 'নদীর চোখে তীরের গল্প'। লেখক তাদের আপন করে একবার জড়িয়ে ধরেন পরের মুহূর্ত্তেই নির্দ্দয় ভাবে ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। গল্পের চরিত্রগুলোর সঙ্গে লেখকের আত্মীয়তার সুরু বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতায় শেষ হলেই গল্পের গল্পত্ব এবং মহত্ব জমে ওঠে।

'মহানগরের' প্রথম গল্প মহানগরের কথাই ধরা যাক। সভ্যতার পীঠস্থান মানুষের মন নিয়ে যে নিষ্ঠুর খেলা খেল্‌ছে রতনের শিশুহৃদয় তার কি খোঁজ রাখে? লেখক এখানে মহানগরের বিস্মৃতিময় নিষ্ঠুরতার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছেন—তাই রতন তার হারানো দিদিকে খুঁজে পেয়েও দিদির হৃদয়ের বাইরেই পড়ে থাকে অথচ রতন মনের সহজ সরল বিশ্বাস-টুকুকে নিয়ে বাঁচতে থাকে—লেখক ফিরে এসে সে বিশ্বাসের গায়ে আঘাত দেন না—তার বিশ্বাস নিয়ে তাকে বাঁচতে দিতে মহানগরেরও আপত্তি নেই। ছোট ভাই-এর ভালোবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দিদি যে আজ মহানগরের হৃদয়হীন গণিকা—এ ঘটনাটা শুধু মাত্র নিয়তির একটা দুর্বোধ্য নিষ্ঠুরতা নয়—তার পেছনে আছে সমাজ এবং সভ্যতার সক্রিয় নিয়ম। হৃদয়াবেগের তাড়নায় সে ইঙ্গিত লেখক কোথাও উহ্য রাখেন নি।

দ্বিতীয় গল্প 'অরণ্যপথে'ও যখন পাগল মেয়েটার বাবা বলে উঠ্‌লেন: "ও যে আমারি অপরাধের প্রত্যক্ষ শাস্তি তা জানি।" তখন তার চরিত্রের সমস্ত রহস্য—যা অরণ্যের রহস্য-বিভীষিকার মতই মনে হয়েছে—এক মুহূর্ত্তে পরিচ্ছন্ন হয়ে পাঠকের কাছে ধরা দেয়।

মানুষের মনের এমন অনেক রহস্যকেই প্রেমেন্দ্র মিত্র এ শতাব্দীর জ্ঞানের আলোতে উন্মোচিত করে দেখিয়েছেন। তৃতীয় গল্প 'দুর্লঙ্ঘ্য'-এ শুন্‌তে পাই: "অপরূপ, রহস্যময় এই মানব-আত্মা, শূন্য আকাশ যে দেবতায় ভরিয়ে তোলে, প্রেমকে মৃত্যুর ওপারেও জয়ী করবার যে স্পর্দ্ধা করে, শেষ পর্য্যন্ত সেও একটা শুক্‌নো, কুৎসিত ডাক্তারী শাস্ত্রের অধীন। ডাক্তারী শাস্ত্রের অমোঘ

বিধান তার সমস্ত আদর্শ সমস্ত স্বপ্নকে নির্ম্মমভাবে গুঁড়িয়ে থেৎলে নিজের নির্দ্দিষ্ট পথে চলে যায়।" বিচারশীল পাঠকের মনকে মানুষের এই ট্র্যাজিডি যতটুকু রস পরিবেশন করে সাধারণ পাঠকের সংস্কারবদ্ধ মনকে ঠিক ততটুকুই বিরস করে তোলে এই নতুন কথার আঘাত।

কিন্তু মানুষের মনের সমস্ত রহস্যকেই যে প্রেমেন্দ্র মিত্র ব্যাখ্যায় প্রাঞ্জল করে দিতে চেয়েছেন তা নয়। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম-তন্তু যেখানে রহস্যের ম্লান কুয়াশা বলে মনে হয়—সেখানকার ছবি তুলে আনবার অসাধারণত্বও তাঁর বিস্ময়কর। 'মুহূর্ত্ত' গল্পের স্বামী-স্ত্রীর ট্র্যাজিডিতে সে-ছবি আমরা দেখ্‌তে পাই।

'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী'তে করুণার মনের কারুকার্য্য শেষটায় পাঠককে যে অভাবনীয়তায় এনে উপস্থিত করে তাতে লেখকের সমৃদ্ধ মন ও অপূর্ব্ব গল্প-বোধ একই সঙ্গে উদ্ঘাটিত হয়েছে। মধ্যবিত্ত রক্তের অভিশাপ সুবোধ ঘোষের 'গোত্রান্তর' গল্পের পূর্ব্বে আর এমন সার্থক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে কিনা তা আমাদের জানা নেই।

মধ্যবিত্ত জীবনের সমাজ-বোধ অথচ নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে শেষ গল্প 'নতুন বাসা' তৈরী। থিয়োরি হিসেবে পলায়নবাদটা যে কত সূক্ষ্ম ধারায় প্রবাহিত হলে গল্প দেহ পেতে পারে—আজকের দিনের সমাজ-সচেতন সাহিত্যিকের দল এ গল্প থেকে তার আদর্শ গ্রহণ করতে পারেন। তাদের ক্লান্তিকর রচনা একদিন সত্যিকারের সাহিত্য হয়ে উঠ্‌বে, অবিশ্যি তার আগে একটু পেছন ফিরে যদি তারা প্রেমেন্দ্র মিত্রের দিকে তাকাতে পারেন।*

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

মহানগর—প্রেমেন্দ্র মিত্র (দেড় টাকা)

চতুরঙ্গ

[ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা আশ্বিন ১৩৫০]

বন্দীর চিঠি

ভারতী সারাভাই

এর্নষ্ট টলের টেসাকে যেসব চিঠি লিখেছেন, তার মধ্যে একটা চিরন্তন সমস্যার আভাষ মেলে : টলেরের মত অসামান্য পুরুষের কাছে নরনারীর সম্বন্ধের স্বরূপ কি? এ চিঠিগুলি থেকেই টেসার ছবি আমাদের মনে ধরা দেয়—তা ছাড়া টেসাকে জানবার আর কোন উপায়ও তো নাই। তাই তার কথা ভাবতে হলে জনৈকা রমণী হিসাবেই আমাদের ভাবতে হবে, কিংবা হয় তো বলা চলে যে টেসা চিরন্তনী নারী। টলেরকে কিন্তু কেবলমাত্র একজন পুরুষ ভাবা চলে না—টলের টলেরই, তাঁর চরিত্র বোধগম্য। ভবিষ্যতের অনেক সম্ভাবনা নিহিত থাকলেও তাঁর শারীরিক ও মানসিক অবয়ব সুনির্দ্দিষ্ট ও স্বনির্ভর। টলের অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ তো বটেই, হয়তো লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী। চিঠিতে তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবনের পরিচয়ই মেলে—তখন গণবিপ্লবের সাধনাতেই তিনি মগ্ন এবং সে জন্য কারাবরণও তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। পরবর্ত্তী যুগের কথা আমাদের এখানে না ধরলেও চলে। সে প্রতিবিপ্লবের যুগে টলের যে স্বপ্ন দেখেছেন, যে আদর্শের জন্য খেটেছেন, দুঃখ সয়েছেন, তার অনেকগুলিই ব্যর্থ হয়ে গেল। টেসাকে যখন তিনি চিঠি লিখছেন, তখনো হয়তো তাদের দূরাগত ছায়া তাঁর মনে পড়েছে, কিন্তু এ সমস্ত ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত। পরে একদিন জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে হতাশায় তিনি বিদেশে আত্মহত্যা করেছিলেন। যে ঐশী শক্তির বলে লেখনীর ভাষায় নিজের নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বের সীমানা অতিক্রম করে দেশ

দেশান্তরের মানুষের সঙ্গে তিনি আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন, নীরবে বিনা প্রতিবাদে জীবন শেষ করে তারও অবসান ঘটিয়েছেন। আভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁর জীবনের যে যুগ প্রসিদ্ধ, তার চেয়ে কিন্তু কারাগারের বন্দীজীবনের যুগের আকর্ষণই বেশী। মাত্র তিনখানি বইয়ে আমরা এ জীবনের পরিচয় পাই, কিন্তু তাতেই টলেরের ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠে। আত্মজীবনীর ভগ্নাংশ, বন্দীর পত্র ও নাটকগুলিকে পরস্পরের ভাষ্য, পরিপূরক ও অঙ্গ মনে করা চলে। তিনখানিরই ভিত্তি তাঁর জীবন, কাজেই তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্য। সে যুগে টলের জার্ম্মান ছিলেন। জার্ম্মান মানসিকতা অতিক্রম করে পরে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সে যুগের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়েও তাঁর ব্যক্তিত্বের ছবি ফুটে উঠে। টলের বন্দী জার্ম্মান এবং সাহিত্যিকও বটে। তাঁর শারীরিক পরিক্রমণ নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ কিন্তু বন্দীজীবনের শূন্যতাকে ভরে তুলেছে তাঁর অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন। জীবনের যেটুকু আভাষ বন্দীশালার জানালা দিয়ে আসে, সেই সাহিত্যিক প্রতিভার বলেই তার পরিপূর্ণ মূল্যবোধ ও স্বীকৃতি। নাট্যগ্রন্থেও সেই একই লোকের পরিচয় মেলে—তাঁর অন্তরে ও বাহিরে যত দ্বন্দ্ব, সামাজিক জীব হিসাবে তাদের রূপায়িত করেই তাঁর নাটক রচনা।

পুরুষ সম্বন্ধে তো তবু এটুকু জানি। কিন্তু রমণীটীর পরিচয় কি? বন্দীর পত্রের রহস্যময়ীর বিষয় আমরা কি জানি? আমাদের মালমসলার মধ্যে টলেরের পত্রাবলীই টেসার চরিত্র অঙ্কনের শ্রেষ্ঠ উপাদান। হয়তো যে ছবি আমরা আঁকব তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক—কেবলমাত্র মনস্তত্বের ব্যঞ্জনা। কিন্তু তবু সে ছবির কি মূল্য থাকবেনা?

টেসার কোন চিঠি আমরা পাইনি। প্রকৃতির বিবরণে কেবলমাত্র মানুষের একতরফা অভিজ্ঞতার পরিচয়—টেসার সঙ্গে টলেরের সম্বন্ধেরও একতরফা বিবরণ টলেরের চিঠি। তা ভিন্ন টেসার বিষয় কিছুই আমরা জানিনা এবং এ চিঠিগুলি লিখবার সময়েও টলেরের সর্ব্বদাই সতর্ক থাকতে হত। সেন্সরের শ্যেনদৃষ্টি এড়াবার জন্য ব্যক্তিগত অনেক কথাই প্রকাশের সময় বাদ পড়ে গেছে—সাধে কি টলের লিখেছেন: "চিঠি লেখাও হয়ে দাঁড়ায় এক দুঃসহ বোঝা, মনে হয় যাদুকর যেভাবে দড়ির উপর কসরৎ দেখায়, সারাক্ষণ যেন কথার রশ্মিতে তেমনি ভাবে কসরৎ দেখাচ্ছি।"

টেসার বয়স কত, কোন দেশের কোন পরিবারের তিনি লোক—সে সব আমরা কিছুই জানিনা। পথে যদি তাঁর সাথে দেখাও হত, তাঁকে চেনবার উপায়

ছিল না। বিবাহিতা অথবা কুমারী, বন্ধ্যা অথবা সন্তানবতী, কাজের মেয়ে না আলসে—কোন কথাই জানবার উপায় নাই। আমাদের কাছে তাঁর একমাত্র পরিচয়—তিনি টেসা, রবিদীপ্ত দক্ষিণ দেশে তাঁর সঞ্চরণ। ইটালি, স্পেন, গ্রীস প্রভৃতি দেশের যাদুময় সহর থেকে টলেরকে বারবার আমন্ত্রণ টলেরের পত্রে পরিস্ফুট। টেসার বিরহে টলেরের যে বেদনা, তাঁর পত্রে সেকথা বলা তিনি দরকার মনে করেননি। একথা নিঃসন্দেহ ভাবে পত্রাবলীতে ফুটে উঠেছে যে, যেখানে টেসা, সেখানেই টলেরের স্বপ্নময় দেশ। হ্রদ ও ক্যাথেড্রালের দেশে সূর্য্যালোকের প্লাবনে বিপুল প্রান্তর উদ্ভাসিত। জীবনে হয়তো সেখানে কোনদিন যাওয়া হবেনা কিন্তু তবু সে দেশের কথা ভাবলেও বর্ত্তমানের দুঃসহ ক্লান্তি ও অবসাদে সান্ত্বনা মেলে। চিঠিতে সেকথা প্রকাশ পেয়েছে: "তুমি যে আমার আকাঙ্ক্ষার দেশে যেতে পারো, তাতেই আমার আনন্দ। প্রাণময় দেশ, সেখানে রঙের খেলা, আকাশে নীল, সূর্য্যের দীপ্তি ও আলো। চারিদিকে প্রাচুর্য্য, নারীদের কণ্ঠে সেখানে গান।"

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে, তখন টলেরের মনে স্বপ্ন নামে: "স্বপ্নের মত লঘুচরণে আমাদের মিলনের ক্ষণ ঘনিয়ে আসে। আজ রাত্রিতে পাবিয়ার কার্ত্তজায় তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।···হঠাৎ স্বপ্ন বদলে গেল—দেখলাম আমরা তিনজনে গণ্ডোলায় বসে আছি, রাত্রির ছায়ায় ভেনিসের খালে আমাদের গণ্ডোলা ভেসে চলেছে। তোমার চিঠি পেয়ে যে সারাদিন আমার ঐশ্বর্য্যে কেটেছে, সে কথাও কি বলতে হবে? তোমার চিঠি পেয়ে গান শুনেছি। যে এসে কথা বলেছে, তারই কণ্ঠে বেজেছে সুর। তুমি আমার পাশে, আমি তোমার পাশে —এর চেয়ে বেশী ঐশ্বর্য্য আমার কল্পনায় আসে না। অল্প একটু ক্ষণের জন্য তোমার পাশে থাকতে চাই। ক্লান্তি চাদরের মত সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, সে ক্লান্তি তাহলে অঙ্গ থেকে খসে পড়বে। সত্যি, আমি ক্লান্ত—বড় ক্লান্ত।"

স্বাস্থ্য আবার ফিরে আসবে একথা জানলেই স্বাস্থ্য ফিরে আসে। টলেরের কল্পনাতেই অন্য ভুবনে বসতি—কিন্তু তবু তাঁর মনে বোধ জাগে যে তাঁর নিয়তির লিখন নিষ্ঠুর। তবু এটুকু সান্ত্বনা যে মেলে, তারই মূল্য কি কম? তার নিদর্শন চিঠিতে রয়েছে: "তুমি যে তোমার সন্তান নিয়ে এসেছিলে, সেজন্য আমার কৃতজ্ঞতা কি করে জানাব? তবু ভিন্ন পৃথিবীতে আমার বাস—অনেক স্বপ্ন সেখানে ধূলোয় মিলিয়ে যায়। সত্যে তোমার নিষ্ঠা—তুমি শ্রেয়ের পূজারী। আমি যে বন্দী সে কথা আমি জানি। নিয়তিই আমার পথ নির্দ্দেশ করে দিয়েছে। কিন্তু সে কথা জানি

বলেই আমি মুক্ত—সমস্ত বন্ধন সত্ত্বেও বন্ধনজয়ী। পরস্পরের যারা অন্তরঙ্গ, সেরকম দুজনের মধ্যে কথা, কাজ বা প্রমাণের কি প্রয়োজন? অন্তরঙ্গতার পরীক্ষাও এইখানে যে একজন অন্য জনকে বোঝে এবং যখন সে তার স্বভাবের নিগূঢ়তম পথে চলে, তখনো তাকে শ্রদ্ধা করে। একমাত্র সত্য মানুষের নিঃসঙ্গতা। মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন যোগসূত্র নাই।"

টলের সর্ব্বদাই টেসাকে চিঠি লিখতেন। নিজের হৃদয় ও মন এবং বেদনাহত আত্মার প্রকাশ করতেন। তাঁর আত্মজীবনীতে অন্য নারীরও উল্লেখ আছে কিন্তু পত্রাবলীতে সমস্ত দৃশ্যপট অধিকার করেছেন একাকিনী টেসা। আমাদের কোন ক্ষোভের কারণ নেই তাতে। প্রতিভা ও আদর্শপরায়ণতা সাধারণ মানুষ থেকে টলেরকে বিচ্ছিন্ন করেছিল—সেই নিঃসঙ্গ টলের বন্দীশালা থেকে কি ভাবে বারে বারে টেসার দিকে হৃদয় প্রসারিত করেছেন, তা দেখে আমাদের শিক্ষা হয়। কোন আদর্শ বা জাতিকে আত্মবিস্মৃতভাবে ভালবাসার অর্থই ভগবানকে ভালবাসা। সাধারণ মানুষ তা পারে না। হাতের পুতুল অথবা মনের সংস্কার, গৃহদেবতা অথবা মন্দিরাধিপতিকে পূজা করেই তারা তৃপ্ত, কিন্তু অশরীরী আদর্শ বা লোকোত্তর লক্ষ্যকে জীবনের কেন্দ্রে স্থাপিত করতে পারে কয় জন? মন্দির অথবা গৃহের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতীককে যারা চিরাচরিত রীতিতে পূজা করে না, অজ্ঞাত আদর্শের সে সব দুঃসাহসী অভিযাত্রীকে যে সাধারণ মানুষ বর্জ্জন করতে চাইবে তাতে বিচিত্র কি?

বন্দীর পত্রের অধিকাংশ চিঠিই টেসাকে উদ্দেশ্য করে লেখা। সামাজিক মানুষ, পারিবারিক মানুষ, রূপস্রষ্টা মানুষের জীবনে যে সব সমস্যা, সে সমস্ত সমস্যার নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ এ সব চিঠিতে মেলে। এ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কার কি ভাবে তাঁর নাটক রচনায় ও জীবনের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে বিকাশ লাভ করেছে, সে কথা টলের টেসাকে লিখেছেন। তাঁর নিজের জীবনের পরিণতি সম্বন্ধে টেসার যে সব পরামর্শ, তারও আলোচনা চিঠিতে পাই। তার সঙ্গে রয়েছে প্রতিদিনের নানা কথা। উঁচু দেওয়ালের মাথায় বন্দীশালার জানালার গরাদের মধ্যে সোয়ালো পরিবারের আবির্ভাবে আলৌকিকের আভাষ। বন্দীশালার গরাদের মধ্য দিয়ে গলির টুকরো দৃশ্য—লীলায়িত ভঙ্গীতে সেখানে চলেছে তরুণীর দল। আকাশের রঙ ও চেহারা বদলায়, ঋতুর নৃত্যচক্রের অবিরাম গতি এবং তার মধ্যে স্মৃতির দুর্নিবার মিছিল। অতীতের অবিচ্ছিন্ন কথা ও আধভোলা আশা রূপ খোঁজে, জানালা দিয়ে ভেসে আসে জীবনের টুকরো টুকরো খণ্ড ছবি। পশ্চাদপটে সব সময়ে জেগে থাকে বর্ত্তমানের

গম্ভীর ও ধূসর বাস্তবতা। রাত্রির অন্ধকারে কর্ম্মসঙ্গীকে একলা ফেলে আসতে হয়েছে মৃত্যুশয্যায়, জেলখানার কয়েদী ও পাহারাওয়ালাদের বিস্মৃতিহীন উপস্থিতি। শাস্তি, রোগ, শোক, মৃত্যু এবং তারই মধ্যে দুয়েকখানি বাইরের চিঠি। বন্ধ কারাগারের এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও টলেরের নিরাসক্ত চিত্তে সঙ্গীতের আভাষ মেলে, কিন্তু কখনো কখনো বিরল মুহূর্ত্তে সামান্য দুয়েকটী কথায় সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙে প্রকাশ পায় তার অন্তরের আকুতি ও গৃহহীন বেদনা। গভীর ও অচ্ছেদ্য আশঙ্কার অন্ধকারে পৃথিবী ও হৃদয় ছেয়ে যায়। দুঃখ সুখে অভিজ্ঞতার যে সূক্ষ্ম অনুভূতি টলেরের জীবনকে ঐশ্বর্য্যান্বিত করেছিল, সামান্য কয়েকখানি চিঠিতেই তার ব্যঞ্জনা।

টেসার কথা ভেবে শ্রদ্ধা জাগে মনে। টলেরের সঙ্গে সমান তালে যে চলেছে, তাঁরও চাই দুর্জ্জয় সাহস, আত্মপ্রত্যয় ও পরিণত বুদ্ধি। টলেরের জীবনের নিঃসঙ্গ নাটক যিনি দেখেছেন, তাঁর অভিজ্ঞতাও কম সমৃদ্ধ হতে পারে না। প্রথমেই যে প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে, যে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, সে প্রশ্ন আমরা ভুলে যাই। সাধারণ নারীর মতন টেসা কি কেবলমাত্র রমণী? প্রতিদিনের কাজে ও অভ্যস্ত সিদ্ধান্তের পিছনে কি দূরপ্রসারিত আত্মীয়তার আবেগ? কোন গোপন অনুভূতির কেন্দ্রে তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠান? হয়তো টেসার পরিচয় তাই, কিন্তু এ বিবরণেও তাঁর পরিচয় নিঃশেষ হবে না। বিলাসিনীদের কথা মনে পড়ে হঠাৎ দুঃখ লাগে মনে—তরুণী তন্বী যারা সাজসজ্জায় মগ্ন, কথায় কথায় টোল খেয়ে যায় গালে, রূপচর্চ্চা ও বিলাসে দিন কেটে যায়। অভিজ্ঞ নরনারীর সংসারের দুরূহ সমস্যা নিয়ে যে ভাবনা, সে ভাবনা তাদের স্পর্শ করে না, কিন্তু তবু তাদের কত তুচ্ছ মনে হয়। নারী মন ভোলায়, রক্তে দেয় দোলা। নারী মায়াবিনী, টলেরের প্রাণেও জাগিয়েছিল উদ্দাম চঞ্চলতা। পুরুষ ও নারীর পরস্পরের আকর্ষণের ভিত্তিই তার স্বরূপ, কিন্তু তবু যে নারী কেবলমাত্র রমণী, তার জন্যও অনুকম্পা লাগে। এদের জীবনের প্রবাহ বিচ্ছিন্ন, কিন্তু যে নারী গৃহলক্ষ্মী, যে নারী সন্তানের জননী—তাকেও হঠাৎ দীর্ঘদিনের অবসানে অবান্তর ও নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। সে বিস্মৃতিকে সহজে মেনে নেবে এমন নারী কোথায়? যে পুরুষ চিরদিন তার সঙ্গী, তার মাথায় যখন হঠাৎ নতুন ধ্যান ও ধারণা খেলতে থাকে, অনাগত পৃথিবীর আবির্ভাবের স্বপ্নে তার জীবনের ভিত্তি পর্য্যন্ত বদলে যায়, তখন বিস্মৃত, নিষ্প্রয়োজন নারীর মনোভাব কি কল্পনা করা যায় না? মানুষের আত্মা যখন অদম্য উৎসাহে পুরাতনকে বর্জ্জন করে, ক্ষুদ্র সুখের আশা বিসর্জ্জন দিয়ে মহাজীবনের স্বপ্ন দেখে, তখন কি রমণীর মনে তার প্রতিক্রিয়া জাগেনা? পুরুষের জীবনের বিচিত্র প্রকাশে কোন ভাগ

থাকবে না, কেবলমাত্র তার লীলা-সঙ্গিনী ও বিলাস-সহচরী হয়ে কি কোনদিন নারী তৃপ্ত হতে পারে ? যদি কোন নারী তাই নিয়েই সন্তুষ্ট হতে চায়, তবে একদিন হঠাৎ সে দেখবে যে পুরুষ তার প্রতি বিরূপ নয়, তার কথা একেবারে বিস্মৃত হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে নারী একথাও বিস্মৃত বেদনায় বোঝে যে জীবনের আনন্দ, জীবনের মাধুরী, এমন কি সবচেয়ে সুন্দর ও রমণীয় বস্তুও যে মুহূর্ত্তে অবান্তর হয়, সেই মুহূর্ত্তে তা পরিত্যজ্য হয়ে পড়তে বাধ্য। হয় জীবনের বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে তার প্রয়োজন আছে, নয়তো জীবনে তার কোন স্থান নাই। সমস্ত ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ও আবেগের চেয়ে জীবনের প্রয়োজন গভীরতর ও মহত্তর।

এ উপলব্ধিতে মনে যে আঘাত লাগে, সে আঘাতে চেতনার নতুন দিক খুলে যায়। সৌন্দর্য্যকে আর জীবনের একমাত্র অথবা চরম লক্ষ্য মনে করা চলে না। মনে হয় নিজের তৈরী কারাগারে সুন্দর বন্দী, নিজের সৃষ্ট সীমানার মধ্যে তা সীমাবদ্ধ। হঠাৎ অন্তর্দৃষ্টির উদ্ভাসিত আলোকে কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য-পূজার ত্রুটী ও অপূর্ণতা আমাদের কাছে ধরা দেয়—একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে সৌন্দর্য্যের চরম প্রকাশের জন্যই সুন্দরকে অতিক্রম করে যেতে হবে।

গিরিরাজ কুমারী পার্ব্বতী একথা নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন। বসন্তের সৌন্দর্য্যসম্ভার, কামদেবের ফুলধনু সব ব্যর্থ হয়ে গেল। ঈপ্সিতকে পার্ব্বতী পেলেন না। ভারত কবি কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই এই অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করেছেন। কালিদাসের পার্ব্বতী সর্ব্বান্তকরণে নিজের রূপকে অভিশাপ দিলেন। অপরূপ মাধুরীকে ব্যর্থতা থেকে বাঁচাবার সাধনাই তাঁর সাধনা। প্রিয়তমের প্রেয়সী হওয়াই রূপ-মাধুরীর একমাত্র সার্থকতা। তাই সুরু হ'ল তাঁর কুমারীর তপস্যা—সেই তপস্যা ভিন্ন শিবের প্রেম, মহাদেবের মতন স্বামী মিলবে কি ভাবে ? শঙ্কর তো কেবল মানুষ নন—নৃপতিও নন। তিনি তপস্যারত দেবতা—ধ্যানমগ্ন যোগীরাজ।

কালিদাসের বহুশতাব্দী পরে রবীন্দ্রনাথও এ সত্যকে নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। তাঁর চিত্রাঙ্গদার ব্যক্তিত্ব অনেক বেশী পরিণত ও ঐশ্বর্য্যময়। চিত্রাঙ্গদা বর্ত্তমানের নরনারীর প্রতীক। জনশাসনে তিনি অভ্যস্ত—যুদ্ধ ও রাষ্ট্রনীতির জগতে তাঁর অবাধ সঞ্চার। রহস্যময়ী নারী এবং বিশ্বসংসারের নাগরিকের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান, সে ব্যবধান সম্বন্ধে কিন্তু চিত্রাঙ্গদাও সচেতন। অর্জ্জুনের চিত্তজয়ে তাঁর সাধনা এবং চিত্রাঙ্গদার সন্ধানে অর্জ্জুনের আকুলতার মধ্যে এ সমস্যা জাগ্রত। চিত্রাঙ্গদা কোনদিন নিজেকে প্রতারণা করেননি। কামনার মোহ যখন প্রবলতম,

তখনও তাঁর দৃষ্টির স্বচ্ছতা মলিন হয় নি। সৌন্দর্য্যের দুর্জ্জয় আকর্ষণ লাভ করেও তিনি ভোলেন নি যে সে সৌন্দর্য্য পরিচ্ছদের মতন বহিরাবরণ—ধার করা সাজমাত্র। এ কথাও তিনি জানতেন যে এ মোহন প্রতারণা টিকবেনা—তাই তিনি সজ্ঞানে সেই সৌন্দর্য্যকে ব্যবহার করেছেন নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরে সেই মায়ার আবরণ বর্জ্জনের যে মুহূর্ত্ত, তার জন্য তিনি নিজেকে তৈরী করে রেখেছিলেন ; শুধু তৈরী নয়, যে নিষ্ঠুর মায়ার জালে তিনি বন্দী, তার বন্ধন থেকে মহৎ মুক্তির লগ্ন বলে সে মুহূর্ত্তকে বরণ করবার জন্য তাঁর চিত্ত প্রস্তুত ছিল। মায়ার সঙ্গে তিনি সন্ধি করেছিলেন, সে মায়ার মধ্যে নিজেকে ভোলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তবু সর্ব্বক্ষণই সে মায়ার সঙ্গে তাঁর যে বিরোধ, প্রেমের সমস্ত মাধুরীর মধ্যে সে কথা কখনো ভুলতে চাননি। অবশেষে মায়ার মোহ বর্জ্জন করে আপন সত্তার গৌরবে তিনি দাঁড়ালেন—অর্জ্জুনকে আহ্বান করলেন যে আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলনকে যেন বাহিরের কোন খাদ স্পর্শ না করে।

পুরুষকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। কেবলমাত্র বহির্সজ্জা দেখে যে আকৃষ্ট হয়, তাকে একদিন ক্লান্তি ও হতাশায় জানতে হবে যে আত্মার অন্তরঙ্গ পরিচয় তার শক্তিতে নাই। বারম্বার অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করেন—কে তুমি, তুমি কে আমাকে বল? যখন তোমাকে পরিপূর্ণ-ভাবে পাই ভাবি, তখনো আমাকে এড়িয়ে তুমি চল। কোনদিনই কি তোমার সত্য পরিচয় মিলবেনা? টলেরও জিজ্ঞাসা করেছিলেন : খুঁজে কাকে আবিষ্কার করব? কার পুনরাবিষ্কারের ইঙ্গিত মিলবে? তুমি কে, আমিই বা কে? তোমার জীবনের সার্থকতা কই? আমার জীবনেরই বা উদ্দেশ্য কি?

চিত্রাঙ্গদা জানেন যে অর্জ্জুন তাঁ'কে চেনেন না। চিনবেনই বা কি ভাবে? মানুষ যেমন করে বর্ম্ম পরে নেয়, তেমনি ভাবে তিনি চেয়েছেন সৌন্দর্য্যের আচ্ছাদন। প্রাচীন কালে বীরের যে বর্ম্ম, তার মধ্যে সর্ব্বদাই কোথাও না কোথাও থাকত দুর্ব্বলতা এবং সেই দুর্ব্বলতার মধ্যেই নিহিত থাকত মৃত্যুর বীজ। চিত্রাঙ্গদার যে বহিরাবয়ব, তার মধ্যেও ছিল পরাজয়ের ইঙ্গিত। আকাঙ্ক্ষার চরম মুহূর্ত্তেও তিনি জানতেন না যে অর্জ্জুনের কামনা চিত্রাঙ্গদাকে নয়—চিত্রাঙ্গদার যে রূপসজ্জা তারই প্রতি অর্জ্জুনের মোহ। পূর্ব্বের কুরূপ এবং বর্ত্তমানের সুরূপ—দুটী আচ্ছাদনকেই অতিক্রম করে তাঁর যে প্রকৃত সত্তা, তাই রইল যখন অর্জ্জুনের অগোচর, তাই রূপবদলে দোষই বা কি? যে বর তিনি কেবলমাত্র একটী দিন ও রাত্রির জন্য চেয়েছিলেন, দেবতার কৃপায় যে বর বর্ষব্যাপী হয়ে তাঁকে রূপ ও সুষমা

জুগিয়েছিল—হয়তো কোন নর বা নারীর ভাগ্যে তা সারাজীবনের জন্য জোটে। সৌন্দর্য্যের মুখোস পরেই কারু জন্ম, কিন্তু নিয়তির এমনই লীলা যে সে সৌন্দর্য্য কেবলমাত্র মুখোসই থেকে যায়। যদি সে উপহাস অসহ্য মনে হয়, তবে মুখোস খসে পড়ে, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে সৌন্দর্য্যের মোহও ভেঙ্গে যায়। রবীন্দ্রনাথ আভাষে ইঙ্গিতে এই কথাই প্রকাশ করেছেন যে নরনারীর শারীরিক বা মানসিক যে রূপ, ব্যক্তিত্বের তারা কেবলমাত্র বহিরাবরণ। আত্মার রহস্য যে দুর্জ্ঞেয় এ স্বীকৃতিতে সান্ত্বনা আছে,—ব্যক্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিচ্ছবি এঁকে তা পাওয়া যায় না। আরেক জনকে জেনে আমরা তৃপ্ত হতে পারি না—আমরা চাই যে সেও আমাদের পরিপূর্ণভাবে জানুক। চিত্রাঙ্গদা তাই চেয়েছিল যে অর্জ্জুন তাঁকে স্বরূপে জানুন।

চিত্রাঙ্গদা জানতেন যে অর্জ্জুন তাকে চিনেন নাই। মুহূর্ত্তের কামনায় ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ভঙ্গ করে রূপসী চিত্রাঙ্গদার চরণে আত্মনিবেদন করেছিল যে অর্জ্জুন, সেও তাঁর ধ্যানের অর্জ্জুন নয়। সেখানে যে মিলন, সে মিলন দুটী বিভ্রান্ত প্রেমিকের। আবেগের উত্তেজনায় স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট অর্জ্জুন ও মায়ারূপাচ্ছন্ন চিত্রাঙ্গদার যে মিলন, সে মিলনে অনুভূতির তীব্রতা যতই হোক না কেন, তার মধ্যে দুজনের কারুই সত্য পরিচয় নাই, তাঁদের স্বাভাবিক মহত্ত্বের সেখানে বিচ্যুতি।

যাও যাও ফিরে যাও, ফিরে যাও বীর।
মিথ্যারে ক'রোনা উপাসনা।

কিন্তু বল্লে কি হবে? যে তীব্র অনুভূতি তিনি জাগিয়েছেন, তাকে তৃপ্ত করবার শক্তি তাঁর নাই। শান্ত বিবেচনার পরে চিত্রাঙ্গদা পথ বেছে নিলেন। তিনি জানতেন যে অর্জ্জুনকে সহজে টানার এই পথ। তাই তাঁর খেদ:

সময় থাকিত যদি একাকিনী আমি
তিলে তিলে হৃদয় তাঁহার করিতাম
অধিকার, নাহি চাহিতাম দেবতার
সহায়তা। সঙ্গিরূপে থাকিতাম সাথে,
রণক্ষেত্রে হতেম সারথী, মৃগয়াতে
রহিতাম অনুচর, শিবিরের দ্বারে
জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভক্তরূপে
পূজিতাম, ভৃত্যরূপে করিতাম সেবা,
ক্ষত্রিয়ের মহাব্রত আর্ত্ত পরিত্রাণে
সখা রূপে হইতাম সহায় তাঁহার।

* * * * * কিন্তু হায়
আপনার পরিচয় দেওয়া, বহু ধৈর্য্যে
বহুদিনে ঘটে, চিরজীবনের কাজ,
জন্মজন্মান্তের ব্রত। তাই আসিয়াছি
দ্বারে তোমাদের, করেছি কঠিন তপ।
হে ভুবনজয়ী দেব, হে মহাসুন্দর
ঋতুরাজ, শুধু এক দিবসের তরে
ঘুচাইয়া দাও জন্মদাতা বিধাতার
বিনা দোষে অভিশাপ, নারীর কুরূপ।

চিত্রাঙ্গদা স্থির বুদ্ধি ও আত্মসচেতন। পুরুষ অর্জ্জুনই বরং অচেতন, প্রবৃত্তি-চালিত ও এ লীলামৃগয়ায় অনভিজ্ঞ। মানুষের কর্ম্মমুখর পৃথিবীতে দিবসের তীব্র রৌদ্রদাহ—খানিকক্ষণের জন্য হলেও ইন্দ্রিয়ের অন্ধকার অতলে সান্ত্বনা খোঁজা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। আত্মবিস্মরণে তাই তাঁর আনন্দ, কিন্তু চিত্রাঙ্গদার পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে চিত্রাঙ্গদা কখনোই সম্বিৎ হারাননি, এবং সেই জন্যই মিলনের মুহূর্ত্তেও অর্জ্জুন অতৃপ্ত। রবীন্দ্র নাট্যের চিত্রাঙ্গদা অভিজ্ঞতার সাক্ষীর মতন সচেতন সমালোচক—নাট্যের বিষয় ও বিষয়ী। উপনিষদে আত্মার বর্ণনায় পাই যে আত্মা পক্ষীমিথুন—একটী পাখী যখন যুগপৎ অভিজ্ঞতার বিষ ও মধুময় ফল খায়, অন্য পাখাটী বৃক্ষ শাখায় বসে দেখে।

কামনার উদ্দামতার শেষে অর্জ্জুনের মনে আসে অতৃপ্তি। তার প্রকৃতি ও কারণ তিনি জানেন না, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা জানেন, এবং জানেন বলেই এই পরিণতি স্মরণে রেখে তাঁদের যুগ্ম অভিজ্ঞতাকে চালনা করে এসেছেন।

তবু অর্জ্জুনকে দোষ দেবে কে!

শিশুকে কে না ভালবাসে? কিন্তু তবু শিশু শিশু। যারা বয়স্ক ও অভিজ্ঞ, তাদের জীবনের সঙ্গে শিশুর জীবনের কোনই যোগ নাই। ক্বচিৎ অসামান্য জননী বা শিক্ষকের মধ্যে হয়তো এর ব্যতিক্রম মেলে।

যখন হৃদয়ে সাড়া জাগে, মনে হয় তা কি সহজ। ফুলবতী লতা, বর্ষণান্তে গাছের পাতায় জলবিন্দু, সাদা মেঘের পশ্চাদপটে সবুজের খেলা—দেখেই মন ভরে উঠে। চিরদিনের চেনা মুখ, চলার বিশেষ ভঙ্গী, বিরতির ইঙ্গিত—হঠাৎ কি বিপুল অর্থপূর্ণ মনে হয়। আমরা দার্শনিক সাজি, বলি যে বাইরের রূপ নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শ্রী বদলায়, অবিনশ্বর সত্যের মধ্যে তার স্থান নাই, কিন্তু তবু এই

নশ্বর মুহূর্ত্ত ও নশ্বর রূপ নিয়েই আমাদের কারবার। চকিৎ চোখের চাউনি, হঠাৎ না-ভেবে আদরের ভঙ্গি, অপ্রত্যাশিত হাসির আলো—এই সমস্ত টুকরো অভিজ্ঞতাই জীবনে এনে দেয় ঐশ্বর্য্য, তারই মধ্যে মেলে নব জন্মের আভাষ, মৃত্যুকে অতিক্রম করবার ভরসা ও উপায়।

মুহূর্ত্তের এ সমস্ত অভিজ্ঞতা সুন্দর ও সৃষ্টিশালী, ভালবাসার লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য, কিন্তু সে অভিজ্ঞতাকে বাঁচিয়ে রাখা, তাকে স্থায়ী রূপ দেওয়া কি সহজ? জীবনের ঝড় ঝঞ্ঝা, বিপদ ও মৃত্যুর মধ্যে তাদের মৃত্যুঞ্জয়ী রূপকে বন্দী করে রাখবার সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ করে—তারই নাম প্রতিভা।

টেসার কি সে প্রতিভা ছিল? আমরা জানিনা, জানবার উপায় নেই। কেবল এইটুকু জানি যে তিনি নারী। বিস্ময় লাগে যে আলৌকিক ঘটনা যখন ঘটে, কি সহজে তা ঘটে। প্রতিভাদীপ্ত পুরুষও চায় যে নারীর নারীত্ব পূর্ণ হোক। সেও চায় যে নারী হোক কেবলমাত্র নারী, সরলা সহৃদয়া নারী, সমস্ত জাতিধর্ম্ম, শিক্ষা, শ্রেণী ও ব্যক্তিত্বের পার্থক্য সত্ত্বেও মমতাময়ী নারী। দীর্ঘ যুগাবসানের ও সভ্যতার বিপ্লবের মধ্যে যে নারী স্বধর্ম্ম ভোলে না—সমস্ত দেশের সমস্ত মানুষের কাছে যে নারী আপনার নারীত্বের পরিচয়ে গৌরবদীপ্ত। নারীর প্রকৃত পরিচয়ও এই যে নারী কেবলমাত্র বিধাতার সৃষ্টি নয়—পুরুষের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাই তাকে দিয়েছে তার পরিপূর্ণ রূপ।

প্রতিভাদীপ্ত পুরুষ মোহিনী নারীকে চায় কিন্তু তাকে নিয়ে তৃপ্তি পায় না। মোহিনীর মধ্যে নারীপুরুষের অতীত যে ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিকে সে আহ্বান করে। নারীর মধ্যে রমণী ভিন্নও সে চায় সাথী, কর্ম্মের সঙ্গী, চিন্তার অংশীদার। যে পথিকৃত আত্মা পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমান সজাগ, যে অনুসন্ধিৎসা বর্ত্তমানকে অতিক্রম করে অনাগত ভবিষ্যতের যাত্রী, সেই উৎসুক আত্মাকে খুঁজে বেড়ায়। টেসার পত্রে টলের লিখেছেন: "একমাত্র তুমিই আমার দৃষ্টিভঙ্গী মেনে নিয়েছ, আমার চিন্তা ও কর্ম্মের বিশৃঙ্খলার মধ্যে এনেছে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা, আমার ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক জীবনকে কল্যাণের পথে চালিত করেছ।" নারীর চরিত্রের এ দিক নতুন নয়। চিরদিনই নারী উপদেষ্টার কাজ করেছে, কিন্তু নতুন ভাবে তার স্বীকৃতি হয়েছে অল্পদিন। নবযুগের নারীর মধ্যে সঙ্গী ও সহকর্ম্মীর এই প্রকৃতি দিন দিন এত ব্যাপক হয়ে উঠবে যে সে সম্বন্ধে নারী আর সচেতন থাকবে না। পুরুষকেও যেন সেকথা নারী কখনো স্মরণ করিয়ে না দেয়। যেখানে সন্দেহ, সেখানেই আমরা সচেতন। যা স্বভাবের মজ্জাগত, তা এত সহজ যে সে সম্বন্ধে আমরা সজাগই নই।

রবীন্দ্রনাথ তাই চিত্রাঙ্গদা ও অর্জ্জুনের পুরাতন কাহিনীর নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পুরাতন কাব্যকল্পনায় নায়িকা কি প্রেমাস্পদের দ্বারা প্রত্যাখ্যানের মুহূর্ত্তে কোনদিন বলতে পারত ?

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সে-ও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

পূর্ব্বেকার কোন রাজকন্যা কি প্রেম প্রত্যাখ্যানের পরমুহূর্ত্তে বল্‌তে পারতেন ?

যে নারী নির্ব্বাক ধৈর্য্যে চির মর্ম্মব্যথা
নিশীথ নয়ন জলে করয়ে পালন
দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসি তলে,
আজন্ম বিধবা আমি সে রমণী নহি।

ব্যক্তির এই যে স্বাধীন ও অজেয় আত্মা, নারীর মাধুর্য্য ও রমণী-স্বভাবের সঙ্গে তার সমন্বয় করতে হবে। এমনি করে আবির্ভাব হবে পরিপূর্ণ নারী : যে নারী স্বপ্রতিষ্ঠ, যে নারীর মধ্যে পুরুষোচিত কার্য্যের সঙ্গে মিলবে রমণীর তিতিক্ষা।

টেসা কি টলেরের প্রতিভার দ্বারা প্রভাবান্বিত হননি ? নিজের অজ্ঞাতে কি টলের তাঁকে মনের মত করে গড়ে তোলেন নি ? পাঁচ বৎসর তাঁদের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটেনি, কিন্তু অসাক্ষাতেও মানুষের মনের সৃষ্টি বন্ধ থাকে না।

আমরা কি দেখিনা যে কত সময়ে নিজে না জেনেও মহামানুষ প্রতিবেশকে বদলে দেন, যারা তাঁর সংস্পর্শে আসে, তারা নবজন্ম লাভ করে ? শুনতে হয় তো আশ্চর্য্য লাগে কিন্তু মহৎ আদর্শ, ব্যক্তিতাতীত স্বপ্নও কার্য্যকরী ও সফল হয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে। কেবলমাত্র নিজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের দ্বারাই এক এক জন

মানুষ আমাদের অস্পষ্ট অনুভূতিকে মূর্ত্তি দেয়। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি শ্রদ্ধা বা প্রীতির ফলে সে গুরুত্ব অর্জ্জন করে—পিতা, মাতা, বন্ধু, শিক্ষক এমনকি সন্তানও এ ভাবে গুরুর আসন পেতে পারে। ম্যাক্সিম গোর্কির উপন্যাসে পুত্রই জননীকে সৃষ্টি করেছে। প্রিয়জনের জন্য নিঃসঙ্গ বিপদ ও স্বার্থত্যাগের আহ্বানেই এনে দেয় কর্ম্মপ্রেরণা। তাতে কোন লজ্জার কথা নাই। আধুনিক নারীও এ ভাবে মুক্তি পেতে পারে। নিজের মধ্যে শ্রদ্ধার এ উৎস খুঁজে পেলে প্রতিদিনকার পোষাকী স্বভাব অতিক্রম করে অন্তরের যে গোপন সত্যরূপ, তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এই স্বতোউৎসারিত প্রেরণার শক্তি বিপুল—এত বিপুল যে আধুনিক নারী অনেক ক্ষেত্রেই সে সম্বন্ধে সচেতন নয়। আধুনিক নারীকে শ্রদ্ধার পথে চলতে হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার সাধনা যে কেবলমাত্র ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে যেন সে শ্রদ্ধা আবদ্ধ না থাকে। ব্যক্তি বিশেষের সংস্পর্শে যে শক্তির জন্ম, সে শক্তি সমস্ত পরিবর্ত্তনকে অতিক্রম করে স্থায়ী নৈর্ব্যক্তিক রূপ খুঁজে পাক। প্রেমাস্পদকে হারাবার আশঙ্কাও যেন এ সাধনা থেকে তাকে পথভ্রষ্ট না করে।

টেসা কি টলেরের কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন? মাত্র একটীবার টলেরের লেখায় তার আভাষ মেলে। টেসা টলেরের অনুচরদের সহযোগে কাজ করতে চেয়েছেন বলে টলের আনন্দিত। টেসা যে তাঁর কর্ম্মপথে সহযাত্রিনী—এই একটীবার মাত্র তার ইঙ্গিত মেলে।

এক এক সময়ে মনে প্রশ্ন উঠে—টেসা কি স্বভাব রমণী? সভ্যতার ব্যাধিদুষ্ট সমাজে স্বাভাবিক সংস্কারমুক্ত নরনারী মেলেই না—সেই সমস্ত অপরিণত ব্যক্তির মধ্যে টেসা কি ব্যতিক্রম?

টেসা কি সেই নবযুগের নারী? তাও আমরা জানি না। টলের তাঁকে যে ভাবে দেখেছিলেন, তার আভাষ শুধু পাই:

"চিচিনোতে বসন্ত, চিচিনোর আকাশ রৌদ্রে উদ্ভাসিত—তার জন্য আমার মন উদগ্রীব। যদি সেখানে আজ যেতে পারি, তবে তোমার যে ভাবে দিন কাটছে, আমারো দিন তেমনি ভাবে কাটত। বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকত না, রৌদ্রে স্তিমিত চোখে পড়ে থাকতাম। সমস্ত দেহে মনে অনুভূতি যে পায়ের নীচে পৃথিবীর মাটী, মাথার উপরে আকাশের আলো। তোমার চিঠি এলো। তার প্রথম কথায় বেজে উঠল সুর। গির্জ্জার বাগানের দেয়ালে বসে আছি, চারিদিকে রৌদ্রের প্লাবন। সমুদ্রের ধারে, ভেনিসে তোমার জীবনে যে সৌন্দর্য্য, যে অবন্ধনের আনন্দ, যে গতিশীল চাঞ্চল্য—তার ছোঁওয়া লাগল মনে। তোমার যে আত্মবিস্মরণের শক্তি,

সে শক্তি কি আমার আছে ? বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার যে বোঝা আমাকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে, সে বোঝা থেকে কি আর মুক্তি পাব ?"

টেসা কি সমাজের অভিজাতদের অন্যতমা ? তাঁর অভিজ্ঞতাও কি কেবলমাত্র পরোক্ষ ? পৃথিবীর যে চেহারা বদলাবার জন্য টলেরের আপ্রাণ সাধনা, তার সঙ্গে টেসার কতটুকু পরিচয় ছিল ? বর্ত্তমান অবস্থা সংস্থানে তাঁরা দুজনেই সমাজের দৈনন্দিন রীতি থেকে মুক্ত, কিন্তু শ্রেণীবোধ ও সামাজিক সুযোগ সুবিধার পার্থক্য যে কি গভীর ভাবে সমাজ বিদ্রোহীদের মনেও ক্রীড়া করে, সে কথা কি একেবারে ভুলতে পেরেছেন তাঁরা ?

টেসা কি আত্মসম্মোহিত ? সংসারানভিজ্ঞ অভিজাত তরুণের স্বপ্ন তো নারশিসাসের স্বপ্নও হতে পারে ! আত্মসমাহিত অজ্ঞতায় তার আনন্দ, সৌন্দর্য্যের সেখানে যে বিকাশ, বাইরের দুঃখদৈন্য তাকে জীর্ণ করতে পারে না, নববসন্তের বিস্ময় কোনদিন তার ভাঙবে না। তার সূক্ষ্ম অনুভূতি, করুণা অনিয়ন্ত্রিত, কিন্তু সে অনুভূতি ও করুণার মধ্যে কি অহঙ্কার ও আত্মসমাদরের আভাষ মেলে না ?

এ রকম নারী—এ রকম তরুণী কি নাই ?

প্রতিভাদীপ্ত পুরুষ হয় তো বলবেন—কেন থাকবে না ? যৌবনের স্বপ্নময় পৃথিবীকে অস্বীকার করা চলে না। যেখানে যৌবনকে দেখি, স্বতোই কেন তাকে স্বাগত জানাই ? চিন্তাহীন যে শৈশব একদিন আমারো ছিল, তারই স্মৃতি আমাকে বলে দেয়, কোথায় যৌবন। হয়তো আমার তরুণী জননীর কথা মনে পড়ে। সেদিন আজ আর নাই, কিন্তু মার কথা ভুলব কি ভাবে ? চিন্তাশূন্য পুরাতন পৃথিবীর কাননে আমার বাস—তারই মধ্যে দেখেছে নির্ভাবনা যৌবনের নানা রূপ। আমিও তো একদিন তরুণ ছিলাম—সে পৃথিবী আজ লুপ্ত, ইতিহাসের কুক্ষিগত, কিন্তু তবু সোনার মুহূর্ত্তে তা ক্ষণেকের জন্য জীবন্ত হয়ে উঠে।

তরুণ ও তরুণী সেকথা জানে। মরুভূমি ইসারায় তাদের কথা বলে, নদীর ধারা তাদের ঘুমন্ত স্বভাব-মানুষকে জাগিয়ে দেয়। তারা গোপন রহস্যের সন্ধান পায়, জানে যে এখানে—বর্ত্তমান স্থানে ও কালে—আমাদের সুখ, আমাদের শান্তি।

অনেক বেদনার উপশম হবে—অনেক দ্বন্দ্ব ঘুচবে। কৈশোরের আনন্দে পুরুষের মুখে ফুটবে হাসি। রমণী দেখবে পাহাড়ের ঢালু ধারে ঘাসের বুকে শিহরণ। পুরুষ এগিয়ে চলবে, হাওয়ার বেগে দুর্ব্বা পায়ে দলে সে যাবে এগিয়ে। ঘাসের উপর রৌদ্র যখন খেলে যায়, তেমনি হাসি মুখে রমণী আবার জেগে উঠবে। তার

মনে পড়বে প্রাচীন দ্রষ্টাদের কথা, কবিদের গান : বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নৃত্যশীল এবং তারই সঙ্গে নৃত্যশীল পৃথিবী। পর্ব্বত তারকা সূর্য্য চন্দ্র সকলেই নৃত্যমুখর।

শুভ মুহূর্ত্তে যে তরুণ ও তরুণীর নিদ্রা ভাঙে, তারা ধন্য। প্রেমাস্পদের আঘাতেও যদি সে মোহ ভাঙে, তবু তারা ধন্য। হয়তো বিদায় সম্ভাষণের মধ্যেই সে জাগরণ আসবে, হয়তো কঠিন আঘাতে যৌবনের সুখস্বপ্ন ভেঙে যাবে। যে এসে তাদের জাগাবে, তার মনে যাই থাক না কেন, তবু সে যেন তাদের জাগায়। যৌবনকে সে যদি সমালোচনা বা অবহেলা করতে চায় তবে করুক, কিন্তু তবু এসে যেন সে যৌবনকে ডাক দেয়।

চারণ যেন বলে—এরা তো তরুণ, এবং তরুণ বলে নির্ব্বিকার। যৌবনের ধর্ম্মে তারা বাড়ছে, বদলাচ্ছে। আমায় শুধু দেখতে হবে যে তারা যেন কোন ছাঁচে, কোন মতবাদের কারাগারে বন্দী না হয়ে পড়ে। ছাঁচ ভাঙে তো ভাঙুক, কিন্তু যৌবনের সম্প্রসারণ যেন রুদ্ধ না হয়। তরুণ বলেই তাদের কল্পনাকে দিতে হবে অবাধ মুক্তি। ভবিষ্যতের যে রথ, সেই রথে হোক আমাদের যাত্রা। এ সমস্ত তরুণ উজ্জ্বল আনন চারিদিকে ছড়িয়ে থাক—তাদেরও স্মরণে থাকবে দীক্ষার এ মুহূর্ত্ত। বিশ্বের ভাগ্যনিয়ন্তা সকলে হবে না কিন্তু তবু তরুণ তরুণ বলেই প্রিয় ও বরণীয়।

তরুণকে আহ্বান যেন না থামে। আহ্বান যদি মৃদুই হয়, যদি বার বার আহ্বানেও সাড়া না আসে, আকাঙ্খা ও সুখানুভূতির ব্যবধানে স্বপ্নের মত মনে হয় আহ্বান—তবু যেন আহ্বান না থামে। বৃষ্টিবিন্দু অনিবার অশ্রান্তভাবে ঝরে পড়ে, কঠিন পাথর ভেজে না। কিন্তু তবু বৃষ্টি ঝরার বিরাম নাই। তারপরে কোন শুভমুহূর্ত্তে বৃষ্টিধারায় সমস্ত কঠিনতা ধুয়ে মুছে যায়। তেমনি চলুক তরুণকে আহ্বান যতক্ষণ চরম মুহূর্ত্ত না আসে।

তরুণ তরুণী হয়তো বিদ্রোহ করবে—হয়তো আহ্বানে মন টললেও বাইরে ধরা দিতে চাইবে না। তারা চলুক নিজেদের পথে, নিজেদের হৃদয়ের অন্তঃপুরে গোপনে সে রূপান্তর উপলব্ধি করুক। দীক্ষার মুহূর্ত্ত অন্ধকারেই কাটে—সেই অন্ধকারেই তাদের জীবনের নববিকাশ মূর্ত্ত হয়ে উঠুক।

সেই নববিকাশের ফলে তাদের জীবনে মিলন ও বিরহ নতুন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

কবিতা

প্রেতায়িত

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেতের মতন এক ধূসর বিষাদ
এইখানে থাকে ;
এই নদীতীর থেকে ওপারের ধু-ধু-করা দিক্-ছোঁয়া মাঠে
হারাণো গ্রামের কোনো ভেঙে-পড়া মন্দিরের ত্রিশূল-চূড়ায়
আপনাকে মেলে দিয়ে কখন কখন,
ধোঁয়াটে কুয়াসা গায়ে মাখে।

সমস্ত দুপুর ধরে
একা একা ঘাটের কিনারে
ঝাঁকড়া অশথ গাছে একটি কি দুটি পাতা নাড়ে,—
দু-একটা উদাস ভাবনা
হঠাৎ ভাসিয়ে দেয়
ঘুরে ঘুরে খসে পড়া শুক্‌নো পাতায় ;
কখনো বা স্তব্ধ হয়ে শোনে
ঘুঘু নয়, কে গোঙায়
ধরণীর মনে।

যদি কোনদিন ভু'লে বস এসে ঘাটের ওপর
কোনো সন্ধ্যা বেলা
তোমার হৃদয় নিয়ে ফিরে যেতে দেবেনা একেলা।

তোমার জীবন ঘিরে যদি কারো নাম
দিগন্তের মত জাগে নিরুদ্দেশ তবু অবিরাম
তার কোন দিনকার চেপে-রাখা একটি নিশ্বাস
হয়ত লুকিয়ে এনে ছেড়ে দেবে অকস্মাৎ
ঝিরিঝিরি অশথের পাতা-কাঁপা কোমল আঁধারে।

অথবা ওপার থেকে
একটি করুণ তারা তুলে
গড়ে' দেবে যেন তার মুখ ;
—এই তার দুর্বোধ কৌতুক !

একবার ছোঁয়া যদি লাগে সে ভৌতিক,
তারপর হৃদয়ের কোথা কাল কোথা দেশ দিক্ !

পর পৃষ্ঠা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অভ্যাস-আড়ষ্ট পৃষ্ঠা ধীরে-ধীরে চলেছি উলটি'
অর্গল-আবদ্ধ কক্ষে ; অস্পষ্ট জীবনবোধ, পথ
পঙ্গু, পরাঙ্মুখ ; ভাগ্যের হয়েও কিনা প্রতিরথ
দৈবেরি দাসত্ব করি ; ঘোরঘটা দেখিলেই হটি
আপনার অটল কোটরে ; ক্ষীণ ক্ষণ-খণ্ড ক'টি
খুঁটি শুধু কদর্য কার্পণ্যে ; ক্ষুদ্র ক'রে স্বত্ব-সীমা
নিষ্ক্রিয় রক্তের স্বাদে অনুভবি বুদ্ধির জড়িমা ,
গৃহস্থ শিবেরে চিনি, ভয় করি দ্বারস্থ ধূর্জটি।

তার পর এক দিন তৃণ-প্রাণে নেমে আসে ঝড়
অনশ্বর। পথেরে বিমুক্ত করে অভিন্ন প্রান্তরে ;
পুড়ে যায় জতুগৃহ, উড়ে যায় শৃঙ্খল-শৃঙ্খলা,
দিনানুদৈনিক দৈন্য ; জীবনের শিকড়-শিখর
ন'ড়ে যায়, প'ড়ে যায় ভেঙে, অকস্মাৎ নভান্তরে
সবলে উত্তীর্ণ হই, দিগ্বালিকা উদয়-উজ্জ্বলা ॥

প্রেম অপ্রেমের কবিতা

জীবনানন্দ দাশ

নিরাশার খাতে ততোধিক লোক উৎসাহ বাঁচায়ে রেখেছে ;
অগ্নিপরীক্ষার মত কেবলি সময় এসে দ'হে ফেলে দিতেছে সে সব।
তোমার মৃত্যুর পরে আগুনের এক তিল বেশী অধিকার
সিংহ মেষ কন্যা মীন ক'রেছে প্রত্যক্ষ অনুভব।
পৃথিবী ক্রমশ তার আগেকার ছবি
বদলায়ে ফেলে দিয়ে তবুও পৃথিবী হয়ে আছে ;
অপরিচিতের মত সমাজ সংসার শত্রু সবি
পরিচিত বুনোনির মত তবু হৃদয়ের কাছে
ক্রমশই মনে হয় নিজ সজীবতা নিয়ে চমৎকার ;
আবর্ত্তিত হয়ে যায় দানবের মায়াবলে তবুও সে সব।
তোমার মৃত্যুর পরে মনিবের এক তিল বেশী অধিকার
দীর্ঘ কালকেতু তুলে বাধা দিতে চেয়েছে রাসভ।

* * *

তোমার প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে ফেলে তুমি চ'লে গেলে কবে।
সেই থেকে অন্য প্রকৃতির অনুভবে
মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত হয়ে জেগে উঠেছে হৃদয়।
না হ'লে নিরুৎসাহিত হতে হয়।
জীবনের, মরণের, হেমন্তের এ রকম আশ্চর্য্য নিয়ম ;
ছায়া হয়ে গেছ ব'লে তোমাকে এমন অসম্ভ্রম।

* * *

শত্রুর অভাব নেই, বন্ধুও বিরল নয়—যদি কেউ চায় ;
সেই নারী ঢেরদিন আগে এই জীবনের থেকে চ'লে গেছে।

ঢেরদিন প্রকৃতি ও বইয়ের নিকট থেকে সদুত্তর চেয়ে
হৃদয় ছায়ার সাথে চালাকি ক'রেছে।
তারপর অনুভব ক'রে গেছে রমণীর ছায়া বা শরীর,
অথবা হৃদয়,—
বেরালের বিকশিত হাসির মতন রাঙা গোধূলির মেঘে ;
প্রকৃতির, প্রমাণের, জীবনের দ্বারস্থ দুঃখীর মত নয়।

* * *

তোমার সঙ্কল্প থেকে খ'সে গিয়ে ঢের দূরে চ'লে গেলে তুমি ;
হ'লেও বা হয়ে যেত এ জীবন : দিনরাত্রির মত মরুভূমি ;—
তবুও হেমন্তকাল এসে পড়ে পৃথিবীতে, এমন স্তব্ধতা ;
জীবনেও নেইক' অন্যথা,
হেমন্তের সহোদর র'য়ে গেছে, সব উত্তেজের প্রতি উদাসীন ;
সকলের কাছ থেকে সুস্থির মনের ভাবে নিয়ে আসে ঋণ,
কাউকে দেয় না কিছু, এমনই কঠিন ;
সরল সে নয়, তবু ভয়াবহভাবে শাদা, সাধারণ কথা
জনমানুষীর কাছে ব'লে যায়—এমনই নিয়ত সফলতা।

সন্তপ্তবালুকাং ভূমিমসিকণ্টকিতাম্

অমিয় চক্রবর্ত্তী

গরম বালির পথে গেলে
খালি পায়ে।
নিবিড় উত্তাল জল তারি নীল তীরে,
নিঃস্ব রৌদ্রের বেলা।

বসুন্ধরা শেষ হয়ে চলে
তোমার ক্রান্তির তটে।
ঠাণ্ডা হাওয়া হুহু শব্দে বয়;
বুনো ঝাউ চিত্রশীর্ষ।
কোনো স্পষ্ট লক্ষ্য নেই।

শব্দের ইশারা নিয়ে নদী
ঝিরিঝিরি নেমেচে যেখানে
কিন্তু চলা আর নেই—
সেই স্যন্দমান অস্তগতি,
—পাহাড়ের রেখা দেখা যায়—
তার দৃষ্টি চাই।

বালি আর জল আর হাওয়া।
দগ্ধ তৃণ, নীল বাঁকা পথ—
বেলা প'ড়ে আসে॥

ডিজাইনের সৌষ্ঠব



অলঙ্কার নির্ম্মানে — ডিজাইনের সৌষ্ঠব, মনোরম কাজ এবং স্বর্ণের বিশুদ্ধতাই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমাদের দোকানে নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ হাল ফ্যাসনের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার দিলেও অল্প সময়ে পছন্দ মত ডিজিন ভেয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। মফঃস্বলের অর্ডার ভি. পি. ডাকে পাঠান হয়। পুরাতন স্বর্ণের পরিবর্ত্তে নূতন অলঙ্কার পাওয়া যায়। কাজের তুলনায় মজুরী সুলভ এবং প্রত্যেকটি অলঙ্কারের জন্য গ্যারান্টি থাকে।

এম বি সরকার এণ্ড সন্স

জুয়েলার্স এণ্ড গোল্ড স্মিথস অর্ডার সাপ্লায়ার্স

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা

২৪, ১২৪-১ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

শারদোৎসব

কল্পে হবে



রক্কো

সুরভিত ক্যাষ্টর অয়েল

ফ্রাঙ্ক রস্ এণ্ড কোং লিঃ * কলিকাতা

বিষ

প্রবোধকুমার সান্যাল

দশ বছরের মেয়েটা গ্রামের মধ্যে ছিল অতিশয় কুখ্যাত। তা'র কীর্ত্তিকলাপ দেখে সন্দেহ হোতো, দৈবাৎ সে মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। মেয়েটার ভাব ছিল ছেলেদের সঙ্গেই বেশী। পাড়ায় পাড়ায় চোর-চোর খেলে বেড়ানো, মাছ ধরা, সাঁতার কাটা, হাডু-ডু খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো, লুকিয়ে মাঠের আ'ল ভেঙে জল বের করে' দেওয়া, খালের ওপরকার বাঁশের সেতু ভাঙা—এই সব অকাজ আর কু-কাজে তা'র মস্তিষ্কও ছিল যেমন প্রখর, তা'র জুড়িও ছিল তেমনি কম। তা' ছাড়া পরের বাগানে অনধিকার প্রবেশ ছিল তা'র অবারিত ; চুরি বিদ্যায় তা'র হাত ছিল অতি পাকা। অন্ধকারে বাগানে ঢুকে গাছ থেকে জামরুল পাড়তে গিয়ে ডাল ভেঙে সে পড়েছে, হাত ভেঙেছে, গা ছড়েছে—কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপও করেনি। নদীর খাঁড়িতে ঢুকে জেলেদের মাছের জাল কাটতে গিয়ে সে বেদম প্রহার খেয়ে এসেছে, এমন ঘটনাও দুর্লভ নয়। শরীরটা ছিল তা'র বেতের মতন শক্ত, হাত পাগুলো মজবুত। মার খেয়ে তা'কে কাঁদতে দেখেনি কেউ, আছাড় খেয়ে পড়ে' কখনো সে কাৎরায়নি। সমস্ত গ্রামে তা'র নিন্দাটা ছিল প্রবল। সবাই বলতো, মেয়েটা এ গাঁয়ের ধূমকেতু।

তা'র প্রকৃতিগত নিষ্ঠুরতার জন্য ছেলেদের মধ্যেও কেউ তা'র অন্তরঙ্গ হ'তে ভরসা পেতো না—মেয়েছেলে ত' দূরের কথা। যে তা'র অতি নিকটে থাকতো, তা'র ওপরেই সে অত্যাচার চালাতো বেশী। হঠাৎ ঠেলে খালের জলে ফেলে দেওয়া, পুকুরের ডুব-জলে কতক্ষণ চুবিয়ে রেখে পেট ভরে' জল খাওয়ানো, গায়ে বিছুটি-পাতা ঘষে দেওয়া, কৌশলে ধুতরোর বিচি গেলানো—ইত্যাদি নানাবিধ আজগুবী এবং অভাবনীয় অনাচারে ছেলেদের কাছেও সে আতঙ্কের পাত্রী ছিল। অনেক সময় গা ঢাকা দিয়ে গ্রামের বারোয়ারি চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে সে মাটির ঠাকুরের হাত-পা ভেঙে রেখে আসতো—একাজে কোনোদিন সে ধরা পড়েনি। তা'র পা দুটো ছিল সরু আর লম্বা—ছুটতে পারতো অসম্ভব।

চোখ দুটো ছিল তা'র নীল—একটু যেন বন্য। চুল ছিল মাথায় একরাশ —কিন্তু সেই চুলের রাশির ভিতরে কাঠি-কুটি, পোকা, ধূলো,—এমন ভাবে জ মে

থাকতো যে সেই চুলের কোনো সংস্কার সম্ভব হোতো না। মা-বাপের অবহেলার পাত্রী ছিল সে, এবং বাড়ীতে কোনো সময়েই তা'কে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ছিল। সকাল সন্ধ্যায় দুটি খাওয়া, এবং রাত্রের দিকে যেখানে সেখানে প'ড়ে ঘুমিয়ে থাকা —এ ছাড়া বাড়ীর সঙ্গে তার সম্পর্ক একেবারেই কম। তা'র দুরন্তপনা এবং নির্দ্দয় আচার-আচরণ দেখে শুনে তার মৃত্যু কামনা করা ভিন্ন মা-বাপের আর কোনো উপায় ছিল না। কোনো একটা ভয়ানক অশুভ লগ্নে তা'র জন্ম—গ্রামের ভিতরে সকলেরই এই বিশ্বাসটা প্রবল ছিল। অনেক সময়ে অনেকে দেখেছে, আটাকাটি দিয়ে গাছের আগডালে উঠে কোনো একটা পাখী ধরে' সে তা'র ডানা দুটো টেনে ছিঁড়ে পাখীটাকে মাটিতে ফেলে দিল। বিড়ালের গলায় দড়ি বেঁধে মাঝপুকুরে চুবিয়ে সে জন্তুটাকে মারতো। ঘুমন্ত কুকুরের গায়ে পাথর মেরে তা'র পাঁজর দিত ভেঙে। চৈত্র মাসে গিয়ে চাষীদের গোলায় সে দেশালাইর কাঠি ধরিয়ে দিয়ে আসতো।

মেয়েটার নাম ছিল টুনি। দৈবাৎ মানুষের ঘরে তা'র জন্ম।

বছর চারেকের মধ্যে টুনি একবারে বদলে গেল। তা'র সেই কঠিন তীক্ষ্ণ দেহটা কোন্ মন্ত্রবলে দেখতে দেখতে নধর হয়ে উঠলো, এবং হাত পাগুলোয় এসে পৌঁছলো অস্বাভাবিক লাবণ্য। ময়লাধরা রুক্ষ গায়ের চামড়ার নীচে কোথায় ঘুমিয়েছিল তা'র রূপ, সেইরূপ বাইরে বেরিয়ে এলো জ্যোতির্ম্ময় হয়ে। তা'র স্বভাবের নির্ম্মমতা যেন কুয়াশার মত এক সময়ে মিলিয়ে গেল, এবং তা'র দুরন্তপনা যাদুর মতো যেন শান্ত হয়ে এলো। তারুণ্যের জোয়ার দেখা দিল তা'র অঙ্গে অঙ্গে।

টুনি ভদ্র সমাজের যোগ্য হবে, মানুষ হবে, বিয়ে হবে তা'র—এই অবিশ্বাস্য কথাটা গ্রামবাসীদের কল্পনার অগোচরে ছিল। কিন্তু সত্য সত্যই তা'র বিয়ে একদিন হোলো। অপ্রত্যাশিতভাবে তা'র পাত্র জুটে গেল।

সেই অঞ্চলে নদীর বাঁধ ভেঙে এসেছিল প্রবল বন্যা। রাতারাতি কত গ্রাম, কত মানুষ আর পশু ভেসে চলে' গেল তা'র সীমা রইলো না। টুনিদের বাড়ী আর তা'দের ঘর-খামারও রক্ষা পেলো না। জেলা সদর থেকে এসেছিল রিলিফ পার্টি। সেই দলের একটি যুবকের চেষ্টায় টুনিদের পরিবার সে যাত্রা বাঁচতে পারলো, এবং সেই ছোকরা টুনিকে দেখে ও তা'র সঙ্গে আচার-ব্যবহার করে' তা'কে পছন্দ করলো। ঘটনাটা সকলের কাছেই বিস্ময়জনক বৈ কি। টুনি প্রণয়াসক্ত হোলো।

ছেলেটির নাম অনন্ত। তা'র বাড়ী কলকাতায়, কিন্তু সে চাকরী করে বাঙ্গলার বাইরে কোন্ কয়লার খনি অঞ্চলে। ছুটি ছাটায় অনন্ত কলকাতায় যাতায়াত করে। বুড়ো মা বাপ আছে বটে, কিন্তু তাঁরা উভয়েই রুগ্ন। মায়ের অম্লশূল, এবং বাপ বাত-ব্যাধিগ্রস্ত। তাঁদের সেবার জন্য বিয়ে না করলেই নয়। সুতরাং প্রস্তাবটা উঠতেই মা-বাপ রাজী হলেন।

গ্রামে গিয়ে অনন্ত টুনিকে বিয়ে করে' নিয়ে এলো। ইতিমধ্যে বিবাহিত জীবনের কল্পনা টুনির মনে দানা বেঁধে উঠেছিল রূপকথার মতো। অনন্ত ছেলেটি ভালো, এবং এ বিয়ে অনেকটা যে গান্ধর্ব্ব মতে এতে আর সন্দেহ কি? এই বিয়ের পটভূমিকায় ছিল গ্রামের বিস্তৃত আকাশ, অন্ধকার নদীকূল, দিগন্ত জোড়া বন্যার প্রবাহ—এবং মৃত্যুর নৃত্যকলরোল। সুখের ও আতঙ্কের চেতনা ছিল অতি নিবিড়; সমগ্র স্নেহবঞ্চিত বাল্যকালের অপরিমেয় প্রাণের ক্ষুধাটা ছিল তীব্র ও সচেতন! সুতরাং টুনির মনে সুখের ও আনন্দের স্বপ্ন ফেনিয়ে উঠেছিল রসতরঙ্গের মতো। সুন্দর ঘরকন্না, মধুর আনন্দের আয়োজন, পুরুষের নিবিড় উত্তাপ, আকাশের অফুরন্ত কল্পনা! কিন্তু তাদের সেই গ্রামের অসীম উদার বিস্তার অতি ক্ষুদ্র হয়ে এসে ঢুকলো কলকাতার একটি অতি সঙ্কীর্ণ গলির পুরাতন একখানা তেতালা বাড়ীর নীচের তলায়। কালো জল ছলছলে নীচের তলায় টুনির বাসা বাঁধা হোলো।

এদিকটা শহরের পূর্ব্বাঞ্চল, পাড়াটা তেমন ভালো নয়। চারিদিকে বস্তি, আশপাশে পড়ো মাঠ, গলির দুধারে নর্দ্দামা। মাঝখানে এই ছোট গৃহস্থপল্লীর ভিতরে এই তেতলা বাড়ীটির নীচের তলাটা একটু অন্ধকার ও অস্বাস্থ্যকর। অনন্তর ইচ্ছা, কিছুদিনের মধ্যে তা'র মাইনেটা বাড়লে সে একটু ভালো জায়গায় গিয়ে দুখানা ঘর ভাড়া করবে, এবং তা'র সুন্দরী স্ত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শিয়ালদার পুরণো বাজার থেকে কিছু কিছু আসবাবপত্রও কিনে আনবে। অনন্ত এমন বউ পেয়ে খুব খুসী। বিশেষ করে' অমন শান্ত, সরল ও হাস্যমুখী স্ত্রী তা'র ভাগ্যে যে কী অদ্ভুত নিয়মে জুটে গেল, এটা খুবই বিস্ময়ের কথা। সে গিয়েছিল কয়লা-কুঠির কুলী সংগ্রহের কাজে, ভাসলো বন্যায়—ঘরে এসে পৌঁছল সুন্দরী বউ। একেই বলে ভাগ্যচক্র। ফুলশয্যার রাত্রে অনন্ত নিঃসাড়ে শুয়ে পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়ের কথা ভাবতে লাগলো, আর টুনি তা'র পাশে আলতাপরা পা দুখানি একত্রে জড়িয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে স্মিতমধুর মুখে রইলো ঘুমিয়ে। মাঝরাতে অনন্তর একখানা হাত তা'র ডান হাতখানায় এসে ছুঁয়েছিল, সেজন্য ঘুমের মধ্যেও নিবিড় রোমাঞ্চ কম্পনে তা'র সমগ্র প্রাণসত্তা অধীর ও অসংযত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু টুনি নাকি অত্যন্ত লাজুক, তাই জেগে উঠতে গিয়েও লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে সে আবার চোখ বুজে রইলো। সে-রাতে দুটি স্বপ্ন জেগে রইলো পাশাপাশি।

দিন দুই পরে চাকরী-স্থানে চলে' যাবার আগে অনন্ত আদর করে' তা'র স্ত্রীর নাম রেখে গেল, মিঠু। বলে' গেল, আবার শিগগিরই ফিরবো, হয়ত কলকাতার আফিসে বদলী হয়ে আসবো। তখন নতুন বাসা ভাড়া করে' তোমাকে নিয়ে থাকবো। ততদিন তুমি মা-বাবাকে দেখো, মিঠু, লক্ষ্মীটি।

টুনি আড়ালে দাঁড়িয়ে তা'র স্বামীর পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। তা'র চোখ দুটো যেন বন্য হরিণীর মতো ছুটতে লাগলো অনন্তর পিছু পিছু।

অনন্ত চলে' যাবার পর প্রতি সপ্তাহে তা'র দুখানা করে' চিঠি আসতে লাগলো। তারপর একখানা—তারপর এক মাসে একখানা। চিঠিতে ভালোবাসার কথা থাকে, কিন্তু আসবার কথা থাকে না। সাহেব ছুটি দিতে নারাজ, আফিসে লোক কম, এখন যুদ্ধের সময় ইত্যাদি। তবে ছুটি পেলেই যাবো, তুমি ভেবোনা মিঠু—তোমাকে নিয়ে কত বেড়াবো, কত গল্প করবো। চিঠির মধ্যে একটি তরুণের ভাবী জীবনের সকল সুখস্বপ্ন সোনার অক্ষরে ফুটে থাকে।

এর পরে ভালোবাসার ভাষাটা এলো দুর্ব্বল হয়ে। পুনরাবৃত্তির দোষে সেটার রং এলো ফিকে হয়ে। সান্ত্বনা দেওয়াটা হয়ে উঠলো হাস্যকর। তখন মাসে একখানা চিঠিও আসে কিনা সন্দেহ। টুনির হাতে কেবল রইলো ঘর আর বারান্দা, বারান্দা আর ঘর।

টুনি পল্লীগ্রামের মেয়ে, শিক্ষার পালিশটা তা'র কম। যে-সুসংস্কৃত মনোবৃত্তি উদার ধৈর্য্যের সঙ্গে আত্মসম্বরণ করে' প্রেমের শান্তরূপের তপস্যা নিয়ে বসে' থাকে, সেটি তা'র নেই—থাকার কথা নয়, এবং নেই বলে' সে দুঃখিতও নয়। সেই কারণে প্রথম দিকে চিঠির জন্য সে যেমন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতো, পরের দিকে নিজের প্রতীক্ষার নির্লজ্জ দৈন্য লক্ষ্য করে' নিজের ওপর সে ভয়ানক বিরক্তও হয়ে উঠতো। আর যাই হোক, চিঠির পর চিঠি পাবার জন্য তা'র বিয়ে হয়নি, মাসের পর মাস পুরুষের আগমন প্রতীক্ষার জন্যও এই অন্ধ প্রেতপুরীতে সে এসে বাসা বাঁধেনি। মনে হোলো, তা'র বিরুদ্ধে এ যেন একটা ভয়ানক চক্রান্ত। এটা নাকি কলকাতা শহর—সে শুনে এসেছে এখানকার লোক অত্যন্ত ধড়িবাজ, অতিশয় কুটীল। টুনি ভাবতে লাগলো, আর কিছু নয়, এ সমস্তই তা'কে ফাঁদে ফেলার জন্য আগের থেকে ব্যবস্থা করা। এই অন্ধকার নীচের তলাকার অস্পষ্ট ঘর, ওই বাতব্যাধিগ্রস্ত

শ্বশুর, ওই রুগ্না স্বার্থপর শাশুড়ী—জীবন যাত্রার এই চারিদিক ঘেরা দারিদ্র্য—এই সব যা কিছু, সবই তা'কে তিলে তিলে দগ্ধ করার ফন্দী। টুনি অধীর হয়ে উঠলো।

একদিন শাশুড়ী বললেন, বৌমা, দরজার ধারে গিয়ে দাঁড়ালে নিন্দে হয়, জানো? এ সব ভালো নয়!

টুনি বললে, কেন?

কেন! এত অজ্ঞান মেয়ে তুমি নও, বাছা। এটা তোমাদের পাড়াগাঁ নয় যে, লোকে তোমাকে সরল ভাববে। আর ওদিকে যেয়ো না। লোকের মুখে হাত চাপা দিতে পারবো না।

শাশুড়ীর শাসনটা ইদানীং যেন তা'র ভিতরে কেমন একটা কঠিন অন্তর্জ্বালার সৃষ্টি করে। কিন্তু টুনি কিছু বলে না, মুখ ফিরিয়ে চলে' যায়। অসন্তোষে ভরে' ওঠে তা'র পীড়িত মন।

আর একদিন শাশুড়ী বললেন, বৌমা, এমন দস্যি মেয়ে তুমি? নতুন কাপড়খানা ছিঁড়লে কেমন করে' শুনি?

টুনি বললে, দরজার কোণে আঁচল আট্‌কানো ছিল, টানতে গিয়ে ছিঁড়ে গেছে!

শাশুড়ী বললেন, আজকাল একখানা কাপড়ের দাম কত জানো? কই, আগে ত' এমন ছিলে না তুমি? শ্বশুরের কাণে উঠলে দেখো তিনি কি বলেন! একেই ত খিটখিটে মানুষ!

টুনি গ্রাহ্য করলো না, অন্য দিকে চলে' গেল। শাশুড়ী তীব্র দৃষ্টিতে তা'র দিকে চেয়ে রইলেন।

নিজেকে টুনির অদ্ভুত লাগছে। সে এমন ছিল না কোনো কালে। কেউ তা'কে শাসন করেছে, লাঞ্ছনা করেছে, বশ্যতা স্বীকার করিয়েছে—আর সে মুখ বুজে সমস্তটা মেনে নিয়েছে, এ তা'র জীবনে অভিনব। সে ছিল সমস্ত গ্রামের আতঙ্কের পাত্রী, সে যা'কে বিরূপ মনে করতো, সে অক্ষত থাকতো না। সে অনাদৃত, উপেক্ষিত ছিল,—সে আত্মীয়-পরিজনের মাঝখানে স্নেহবঞ্চিত বাল্যকাল যাপন করে' এসেছে, একথা সত্য, কিন্তু নিজেকে সে সহজে ছড়িয়ে দিতে পারতো গ্রামের উদার বিস্তারের মধ্যে। তা'র আকাশ ছিল অসীম, তা'র ধানক্ষেত ছিল আনন্দের লীলাক্ষেত্র, তা'র গ্রামের পথঘাট, নদীতীর, জেলেদের পাড়া, বাউরীদের তালপুকুর, গয়লাদের ঘর—এ সমস্তই ছিল তা'র প্রাণ-কল্লোলে মুখরিত। এখনো সেই গ্রামের সর্ব্বত্র তা'রই সহস্র সহস্র পায়ের চিহ্ন বুকে নিয়ে যেন তা'রই বিচ্ছেদ

বেদনায় কাতর। তা'দের সেই কুটীর প্রাঙ্গণে দোয়েল পাখী হয়ত আজো ডেকে যায়, আজো নদীর খাঁড়িতে উজ্জ্বল মাছগুলি ভেসে আসে, বাগানের কচি ফলগুলি নব চেতনায় শিউরে ওঠে, কাজলপরা চোখগুলি নিয়ে গ্রামের গরুগুলি তা'দের ঘরের দিকে চেয়ে-চেয়ে আজো হয়ত মাঠে চলে' যায়—কিন্তু টুনি তা'দের মধ্যে আজ কোথাও নেই! তা'র কচি বুকখানি সমগ্র গ্রামখানিকে আঁকড়ে ধরে' এই চিরান্ধকার প্রেতপুরীর নিঃসঙ্গ মলিন শয্যায় শুয়ে যেন ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে। সেই অনাদৃত বালিকার জীবন অনেক ভালো ছিল, কিন্তু এই অপমানিত বন্দিনীর জীবন মুক্তির পিপাসায় দিন দিন যেন আত্মদ্রোহিতায় মেতে উঠলো।

অনন্ত যাবার সময় তা'কে একটা লালমোহন পাখী কিনে দিয়ে গিয়েছিল। টুনি স্থির করলো, পাখীটাকে উড়িয়ে দিতে হবে। বারান্দার ধারে গিয়ে সে দাঁড়াতেই পাখীটা তা'কে দেখে আনন্দে উৎসাহে পাখা ঝটপট করে' উঠলো। টুনি কাছে গিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে লোহার খাঁচার দরজাটা দিল খুলে। পাখীটা তৎক্ষণাৎ খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলো। কিন্তু চারিদিকে দেওয়াল দেখে প্রথমটা সে হকচকিয়ে গেল। নীচের তলা থেকে ঝটপটিয়ে উড়ে বসলো দোতালায়, সেখান থেকে তেতালার বারান্দায়। তারপর তা'র চোখে পড়লো উপরতলাকার আলো, আলোর পথ ধরে' সে খুঁজে পেলো আকাশের একটা টুকরো। পাখীটা সেই দিক লক্ষ্য করে' ডানা বিস্তার করে' উড়ে গেল। টুনি উপরদিকে চেয়ে দেখলো এক ফালি আকাশ তা'র অতৃপ্ত অশান্ত প্রাণের ক্ষুধা জাগিয়ে যেন দূরের থেকে তা'কে পরিহাস করছে!

বৌমা—অ বৌমা—

শাশুড়ীর অধীর ও উগ্র চীৎকারে টুনির চমক ভাঙলো। সহসা ছুটে গিয়ে সে বললে, কি বলছেন—?

ওই-ওই দেখো বেড়ালের কাণ্ড। জ্যান্ত কৈ মাছটা নিয়ে ওই পালালো,—কোনোদিকেই কি তোমার চোখ নেই গা? বুড়ো শ্বশুরকে আজ কী দিয়ে ভাত দেবো বল দেখি?—শাশুড়ী দুম দুম করে' চলে' গেলেন।

পলকের জন্য টুনি একবার দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকালো। দেখতে দেখতে তা'র সেই পুরাতন হিংস্র রক্তটা প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় টগবগিয়ে উঠলো। সহসা রান্নার খুন্তিখানা নিয়ে সে গেল এগিয়ে, এবং সজোরে সেই মেনি বেড়ালটার পিঠের উপর দিল বসিয়ে। শাশুড়ী ফিরে আসছিলেন, হঠাৎ এই দৃশ্যটা দেখে হাউমাউ করে' উঠলেন—কী করলে, কী সর্ব্বনাশ করলে, বৌমা? ও যে ষষ্ঠির বাহন! মেরে

খুন করলে,—ওমা, কেটে যে দুখানা হয়ে গেল! একেবারে রক্ত গঙ্গা!—ওগো, কোথা গেলে তুমি? ওগো, শুনছো—?

শ্বশুর মশায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। বিড়ালটা তখন মৃত্যুর আগে রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করছে।

টুনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে হাসছিল।

শ্বশুর মশায় কাঁপতে কাঁপতে এক জায়গায় বসে' পড়লেন। তাঁর গলা শুকিয়ে উঠলো। শাশুড়ী চীৎকার করে' বললেন, এমন খুনে মেয়েকে কোত্থেকে অনন্ত ঘরে আনলো গো? এ কি সর্ব্বনেশে কাণ্ড?

টুনি বললে, একটা বেড়াল মেরেছি তা কি? অমন করছেন কেন আপনারা? মরেছে বেশ হয়েছে!

কে ওকে এখন তুলবে শুনি?

কেন? আমিই তুলে ফেলে দিয়ে আসছি। রক্তটা মুছে নিলেই ত' হবে। আপনাদের সব বাড়াবাড়ি।

শাশুড়ী বললেন, আর খুন্তিখানা? ওই খুন্তি কি আর নেবো ঘরে?

ভারি একখানা খুন্তি!—বলে' টুনি চলে' গেল।

বুড়ো শ্বশুর এদিক ওদিক তাকিয়ে ডাকলেন, বলি, শুনছ?

শাশুড়ী জবাব দিলেন, কি গা?

অনন্তর পাখীটা উড়ে পালালো কখন্?

শাশুড়ী বেরিয়ে এসে বললেন, ওমা তাইত, খাঁচাটা যে খোলা?—বলি, হ্যাঁ বৌমা—বৌমা, শুনছ?

টুনির আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

বন্য নীলাভাস আবার ফিরে এলো টুনির চোখে। ভিজা আবাঁধা চুলের রাশির মধ্যে আবার পোকায় বাসা বাঁধলো। মুখের রেখাগুলি হয়ে এলো কঠিন, চেহারাটা হোলো রুক্ষ।

অনন্তর চিঠি আসে অনিয়মিত, কিন্তু তা'র জবাব দেবার সময় টুনির আর হয়ে উঠেনা। শ্বশুর শাশুড়ী তিরস্কার করলে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেয়ালে নখ খুঁটতে থাকে—যতক্ষণ না নখের ডগা থেকে রক্ত বেরোয়। রাঁধতে বললে তরকারীতে নুন দিয়ে বসে এক খাব্‌লা—সেই তরকারী খেয়ে অম্লরোগী শাশুড়ীর গলা জ্বলে যায়। উনুন থেকে দুধ উতলে ঝিঁকের ওপর গড়িয়ে পড়ে—দেখে তা'র

আমোদ লাগে। শাশুড়ী তাই দেখে আজকাল খোলাখুলি ভাষায় গালমন্দ করতে বসেন।

অনন্ত গতমাসে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল, এমাসের পনরো তারিখের মধ্যে ছুটি নিয়ে সে আসবে। কিন্তু সেই পনেরো তারিখ কবে পেরিয়ে গেছে, তার দেখা নেই। বাপের বাড়ী থেকে মাস তিনেক আগে একখানা চিঠি এসেছিল—টুনি কেমন আছে—কিন্তু সে চিঠির জবাবও দেওয়া হয়নি, তারপরে আর চিঠিও আসেনি। আলো বায়ুহীন নীচের তলাটার জলে-জলে সারাদিন ঘুরে টুনির দুই পায়ে হাজায় ভরে' গেছে! চারিদিকের দেয়াল বাঁধা এই অন্ধ গুহার ভিতরে থেকে তা'র সুন্দর ও নধর মুখে চোখে কেমন যেন ধূসর বিবর্ণতা দেখা দিয়েছে।

তা'র খেয়াল গেল, শাশুড়ীকে সে সর্ব্বপ্রকারে জব্দ করবে। শাশুড়ীর খাবার দুধে সে হলুদ বাটা ফেলে দিল, পানের কৌটা লুকিয়ে রাখলো, গোপনে তাঁর খাদ্যে বালির চাপড়া মিশিয়ে দিল, কেরোসিন ঢেলে দিল তাঁর বিছানায়। শাশুড়ী চেঁচিয়ে কেঁদে গাল দিয়ে হাট বাধাতে লাগলেন। টুনি খুশী হয়ে কলতলায় গিয়ে বসে' মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে লাগলো। তা'র একমাত্র চেষ্টা হোলো, এই ক্ষুদ্র গৃহস্থটির জীবনযাত্রাকে সর্ব্বপ্রকারে দুরূহ করে' তোলা। একাজে সে বিশেষ মজবুত।

শ্বশুর বলে' দিয়েছেন, আমার ঘরে তুমি ঢুকোনা, বৌমা।

কেন?

আমার খুটিনাটি জিনিসপত্র চারিদিকে ছড়ানো থাকে তাই বলছি। আমার খাবার ওষুধের সঙ্গে বাতের মালিশ মিশিয়ে দিলে আর আমাকে বাঁচতে হবে না। আমার আফিঙের কৌটো সেদিন তুমিই লুকিয়ে রেখে ছিলে, আমি বেশ জানি—কচি খোকা নই।

টুনি হেসে বললে, আপনি আফিং খান্ কেন?

তা'তে তোমার মাথা ব্যথার কী দরকার বৌমা? আফিং খাই—ঘুম হয়, নেশা হয়—শরীর মন ভালো থাকে! তাই খাই।

কিন্তু ও ত বিষ!

শ্বশুর বললেন, মাত্রা বুঝে খেতে হয়।

টুনি চুপ করে' গেল। শ্বশুর বললেন, তুমি যাও, বৌমা। আজ আর আমার বাতের মালিশের দরকার নেই। তুমি ভাল মানুষের মেয়ের মতন একটু শান্ত হয়ে শাশুড়ীর কাজ করো গে। কাল থেকে ওঁর শূল বেদনা বেড়েছে, তুমি

যেন এখন আর দৌরাত্ম্যি করো না। অনন্ত ফিরলে তা'র হাতে তোমাকে তুলে দিয়ে আমাদের ছুটি। ধন্যি মেয়ে বাবা তুমি!

টুনি চলে' গেল নিঃশব্দে! বিরক্ত চক্ষে তা'র দিকে একবার তাকিয়ে শ্বশুর মশায় হিসাবের খাতাটা টেনে নিলেন।

ইদানীং অনন্তর কোনো চিঠিপত্র আসেনি। স্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়ে ঠিকমতো জবাব পায়না, হয়ত সেই কারণে তারও চিঠিপত্র লেখার উৎসাহ কমে গেছে। সে স্থির করেছিল, একেবারে কাছে গিয়ে সে স্ত্রীর অভিমান ভাঙাবে। বহুদিন ধরে' সে আশ্বাস দিয়ে স্ত্রীকে ভুলিয়ে রেখেছে, নিজেও সে ইন্দ্রজাল বুনেছে প্রবাসে থেকে—এবার গিয়ে সকল অন্যায়ের প্রতিকার করবে সে। তা'র মাইনে বেড়েছে, এই চমকপ্রদ খবরটা সে চেপে রেখেছে—এবার গিয়ে সোল্লাসে সেটা সে ঘোষণা করবে। সুতরাং অনেক তদ্বির তদারক এবং অনেক উমেদারি করে' সে আগামী সপ্তাহ থেকে একমাসের ছুটি সাহেবকে দিয়ে মঞ্জুর করিয়ে নিল। সাহেব তা'র কাজে খুশী হয়ে বললেন, তোমাকে কলকাতার আফিসে আসছে মাসে বদলী করব কিনা, ভেবে দেখবো। ইতিমধ্যে গিয়ে নবপরিণীতা স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হও।

অনন্ত আনন্দে আত্মহারা হয়ে কলকাতা রওনা হোলো তার পরের সপ্তাহে। দিনান্তের সারসপক্ষী যেমন সুদীর্ঘ আকাশ পেরিয়ে অন্ধের মতো বাসার দিকে ছোটে, অনন্ত তেমনি ছুটলো রেলপথে। গাড়ী চলবার পর তা'র মনে হোলো, সুবিধা থাকলে ট্রেনের চেয়েও অধিকতর দ্রুতগতিতে সে ছুটে যেতে পারতো।

বাসায় এসে অনন্ত যখন পৌঁছলো তখনও সন্ধ্যা হয়নি। আসবার আগে সে চিঠি দেয়নি। সুতরাং মনে করেছিল বাড়ীতে হঠাৎ দেখা দিয়ে আনন্দের একটা ঝড় বইয়ে দেবে সে। সেইজন্য বাসায় ঢুকলো সে পা টিপে টিপে। ষ্টেশন থেকে ফিরবার সময় বাজার থেকে সে কিনে এনেছে একরাশ ফুল। ভেবে রেখেছিল আজ নতুন করে' আবার একটা ফুলশয্যায় টুনিকে ফুলের অলঙ্কারে সে মনের মতন করে' সাজিয়ে দেবে! একখানা নতুন শাড়ীও ছিল তা'র ঝোলায়। সদর দরজা পেরিয়ে সে ভিতরে ঢুকলো। কলতলা পেরিয়ে গেল সে ঘরের দিকে। কিন্তু মাঝপথে সে থমকে দাঁড়ালো। শোবার ঘরের সামনে বারান্দায় দুটি ভদ্রলোক চিন্তিত মুখে বসে' রয়েছেন। অনন্ত বললে, কে আপনারা?

আপনিই কি অনন্তবাবু?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

লোক দুটি বললে, আমরা ডাক্তার বাবুর এসিষ্ট্যাণ্ট। ডাক্তার বাবু ঘরে আছেন, আপনি ভেতরে যান্।

অনন্ত বিদ্যুতের মতন ঘরে ঢুকলো। মা ছিলেন বসে'—হাউমাউ করে' চেঁচিয়ে উঠলেন, বাবা আর্ত্তনাদ করলেন। ওপাশে ডাক্তার বসে' রয়েছেন টুনির বাঁ হাতখানা হাতে নিয়ে। টুনি বিছানার মধ্যে অচেতন ও অসাড়।

অনন্ত বললে, ব্যাপার কি?

ডাক্তার বললেন, এখনও ঠিক কিছু বোঝা যাচ্ছে না। শুনছি নাকি বেলা চারটের থেকে হঠাৎ মেয়েটির এই অবস্থা হয়েছে, জ্ঞান ফিরছেনা।

তা'র মানে?

ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বললেন, শরীরে কোনো অসুখের লক্ষণ নেই, সর্দ্দি, কাশি, জ্বর—কিছুই নেই। কিন্তু রোগী সিঙ্ক্ করছে মনে হচ্ছে, ঘণ্টাখানেক পরে আর বোধ হয় রোগী বাঁচবেনা।

বাঁচবেনা!—অনন্ত যেন আর্ত্তনাদ করে' উঠলো বুকফাটা কান্নায়।

বাইরের থেকে এসিষ্ট্যাণ্ট্ দুজন ঘরে এসে দাঁড়ালো। বললে, স্যর, কেমন দেখছেন এখন?

ডাক্তার বললেন, অত্যন্ত রহস্যজনক মনে হচ্ছে! এপোপ্লেক্সি নয়, হার্টের ব্রেক ডাউন নয়—অথচ সতেজ রোগী আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে চলেছে। এত তাড়াতাড়ি চলেছে যে, জানিনে আর কতক্ষণ রাখতে পারবো।

মা ও বাবা মুখে কাপড় চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অনন্ত বলে' উঠলো, তবে কি কোনো উপায় নেই ডাক্তার বাবু?

আমি অত্যন্ত দুঃখিত, অনন্তবাবু। ডাক্তারবাবু রোগীর নাড়ি ছেড়ে দিয়ে নতমুখে বসলেন।

হারিকেনটা টিপ টিপ করে' জ্বলছে। সেই আলোয় অবরুদ্ধ বাতাসের মধ্যে অনন্ত গিয়ে বসলো টুনির পাশে। রোগীর স্বাস্থ্যে কোথাও শীর্ণতা নেই, রুগ্নতা নেই। ঘুমে সে অসাড়, চোখের কোল দুটো কালো, হাতের তালু দুটি বিবর্ণ, নাকের নিশ্বাসটি স্তিমিত। অনেকক্ষণ অনন্ত স্তব্ধভাবে বসে' রইলো। তারপর এক সময়ে বললে, ডাক্তার বাবু—?

কি বলুন?

ক্ষমা করবেন, একটা কথা বলবো। মেয়েটি বড় দুরন্ত, কিছু খায়নি ত? মানে—বিষ-টিস কিছু?

ডাক্তার বাবু তার প্রস্তাবে সহসা সচকিত ও সজাগ হয়ে বসলেন। বললেন, চেষ্টা করে' দেখতে পারি।

—ওহে সন্তোষ—

একজন সহকারী এসে দাঁড়ালো। ডাক্তার বললেন, আমার চেম্বার থেকে শিগগির একবার ষ্টম্যাক পাম্পটা আনো ত? দৌড়ে যাও—অবিশ্যি বিষ-টিস কিছু খাবার কথা আমার আগে মনে হয়নি।

সন্তোষ চলে গেল, এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই ঔষধপত্র সমেত সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এলো। ডাক্তার বললেন, তোমরা বাইরে থাকো। আমি অনন্ত-বাবুকে নিয়েই কাজ করতে পারবো।

যন্ত্রের সাহায্যে অচেতন রোগীর মুখগহ্বরকে বড় করে' তুলে ভিতরে নল চালিয়ে দেওয়া হোলো। অনন্ত টুনিকে ধরে' বসে' রইলো।

পাম্প করতে করতে নানা পদার্থ উঠলো। কিন্তু ডাক্তার এক সময়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি আগে কিছু জানতেন্?

অনন্ত বললে, কি বলুন ত।

আপনার স্ত্রীর ওপর কি উৎপীড়ন করা হোতো?

আজ্ঞে সে কি কথা? আমার মা আর বুড়ো বাবা ছাড়া এবাড়ীতে আর কেউ নেই। তাছাড়া আমার স্ত্রী ওঁদের খুবই প্রিয়!

ডাক্তার ইংরেজিতে আরো দুচারটি কথা জিজ্ঞাসা করলেন। অনন্ত জবাব দিল, ওসব কিছুই নয়, এই আমার ধারণা, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার পাম্প করতে করতে বললেন, আপনি নিশ্চয় অবাক হবেন শুনে, আপনার স্ত্রী আফিং খেয়েছেন! কিন্তু বিপদের কথা হোলো এই, সেই আফিং আর উঠবেনা—অনেকখানি রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে।

অধীর উদ্বেগে অনন্ত পুনরায় আর্তনাদ করে' উঠলো, তা' হলে এখন কি উপায় ডাক্তারবাবু?

উপায় কিছু নেই। সত্যি বলতে কি, রোগীর নাড়ির অবস্থা মোটেই ভালো নয়। অবিশ্যি তখনি তখনি জানলে এতটা বিপদের আশঙ্কা থাকতো না। আফিং উনি কোথায় পেলেন?

বাবা আফিং খান্!—অনন্ত নতমুখে বললে!

এমন সময় ব্যস্ত ভাবে বাবা এসে বললেন, আমি আগে কিছুই জানতে

পারিনি, ডাক্তারবাবু। এই এখন···এই যে কৌটো খুলে দেখছি আমার কৌটো খালি। আধ ভরি আফিং ছিল এতে!

আধ ভরি?

আজ্ঞে হ্যা, ডাক্তারবাবু!

আচ্ছা আপনি যান—কী হয় দেখা যাক্। এই বলে' রোগীর অবস্থার দিকে তাকিয়ে ডাক্তার নাড়ি ধরে' বসে' রইলেন। এক সময় বললেন, নাড়ি এখন আর সিঙ্ক্ করছে না তাড়াতাড়ি। তবে 'কোমা' অবস্থা!

অনন্ত বললে, তবে কি আশা আছে কিছু?

বলা কঠিন।—এই বলে' তিনি রোগীর গায়ে একটা ঝাকানি দিয়ে বললেন, ওমা—মাগো, শুনছ মা?

রোগী নিমীলিত দৃষ্টিতে একবার তাকালো অর্থহীন ভাবে। তারপর আবার গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লো। ডাক্তার বললেন, এই ঘুমটাই বিপজ্জনক, কারণ এ-ঘুম আর নাও ভাঙতে পারে। একে যে-কোনো উপায়ে জাগিয়ে রাখতে পারলে হয়ত কিছু আশা দেখা যেতো। দেখছি বিষটা রক্তে অনেকখানি মিশে গেছে!

অনন্ত বললে, জাগিয়ে রাখার কি কোনো ওষুধ নেই?

কোনো ওষুধই এখন খাটবেনা, অনন্তবাবু। তবে যদি খুব একটা শারীরিক যন্ত্রণা দিয়ে জাগিয়ে রাখা যায়, সে এক কথা। কিন্তু···এই দেখুন না—গায়ের চামড়ায় কোন চেতনা নেই।—এই বলে' ডাক্তারবাবু টুনির নরম নধর হাতের উপর একটা প্রবল চিমটি কাটলেন। আঙ্গুলের দাগ বসে' সে-জায়গাটা নীল হয়ে উঠলো, কিন্তু টুনি কোনো সাড়া দিল না। আঘাতের চিহ্নটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে অনন্তর চোখ দুটো সজল হয়ে এলো। ডাক্তারবাবু বললেন, এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, অনন্তবাবু। আপনি কি পারবেন একাজ? অবিশ্যি কাজটা খুবই ডেলিকেট্—মানে স্বামী হয়ে...

এই বলে' ডাক্তারবাবু তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে উঠলেন। বললেন, এর আর কোনো প্রতিকার নেই! দেখুন, যদি কিছু করা যায়! অবিশ্যি এ খবরটা বাইরে জানাজানি হ'লে আপনাদের অসুবিধে হ'তে পারে। সে যাই হোক—আমি চললুম এখন···যদি মনে করেন রোগীর অবস্থা ভালো তবে আমাকে শেষ রাত্রের দিকে একটা খবর দিতে পারেন। নৈলে···ভগবানই ভরসা! আচ্ছা, নমস্কার!

ডাক্তার তাঁর সহকারীদের নিয়ে বিদায় নিলেন।

উপরতলাকার কোন্ ঘড়িতে ঢং ঢং করে' যেন রাত ন'টা বাজলো।

অনন্তর দুই চোখ ভরে' জল এসেছিল। সে উঠে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এলো। মা-বাবা রইলেন বাইরে। আলোটা টিপটিপে করে' সে রেখে এলো ঘরের কোনে। পূব দিকের জানলাটা দিয়ে পরিপূর্ণ শুক্লপক্ষের এক ফালি ভীরু জ্যোৎস্নার ঝলক এসে পড়ে' ছিল জানলায়। টুনির মাথার কাছে অনন্ত এসে দাঁড়ালো। মৃত্যুর ছায়ায় রোগীর সর্ব্বাঙ্গ অসাড় ও অচেতন। কিন্তু জ্যোৎস্নার আভায় টুনির বিলোল মাদকবিহ্বল দেহখানি আগেকার মতোই ঢলঢল করছে! কোন্ নিবিড় অন্ধ অতলের তলায় সে আজ ডুব দিয়েছে কে জানে, কিন্তু তা'র সমগ্র সুকুমার দেহলতায় লেখা রয়েছে যেন অনন্তর কত দিনের কত সোনার স্বপনের কাহিনী। মৃণালের বৃন্তে যেমন ফুটে থাকে রক্তকমল দল, তেমনি মৃত্যুর বোঁটায় যেন টুনি বিকশিত হয়ে রয়েছে নিঃসাড় হয়ে—হয়ত আজ রাতেই সে খসে' যাবে। বন্যার স্রোতে অনন্তর জীবনে ভেসে এসেছিল এই ফুল, কিন্তু মৃত্যুর প্রবাহ তা'কে স্থির থাকতে দিল না।

অনন্তর দুই চোখে জলধারা বইল অনেকক্ষণ।

এক সময়ে সজাগ হয়ে সে টুনিকে একটা নাড়া দিল, কিন্তু টুনির কোনো সাড়া পাওয়া গেলনা! ভীত হয়ে সে আবার একটা ঝাকুনি দিল, টুনি সামান্য নড়ে' উঠে পুনরায় তখনই স্থির হয়ে গেল! আশা ও নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বের মধ্যে অনন্ত তা'র হাত ও মাথাটা ধরে' একবার উপরদিকে তোলবার চেষ্টা করলো, কিন্তু প্রবল মাদক প্রভাবে রোগী একেবারে বেহুঁস। অতঃপর ডাক্তারের অনুকরণ করে' সে রোগীর দেহের একটা নরম জায়গায় প্রবল ভাবে চিমটি কাটলো—তবু সাড়া নেই। মাত্র একটু নড়ে ওঠে, সামান্য গলার আওয়াজ করে, তারপর আবার নিদ্রায় অচেতন হয়ে যায়।

টুনি? মিঠু?

টুনি কোন্ এক রহস্যলোকে মগ্ন। হয়ত তা'র প্রাণসত্তা আপন দেহখানিকে অতিক্রম করে' গিয়ে বিচরণ করছে সেই বাল্যকালের গ্রামের পথে পথে সেই অবারিত প্রান্তরে, সেই নদীতীরের বিজন আম্রবনে—যেখানে উদার মুক্তি, যেখানে অবাধ সূর্য্যালোক, যেখানে অপরিসীম আনন্দের লীলা নিকেতন। আতঙ্ক ও উদ্বেগে অনন্ত অধীর হয়ে উঠলো।

ডাক্তারের প্রস্তাবটা তা'র সহসা মনে পড়ে' গেল। শারীরিক যন্ত্রণা দিলে হয়ত রোগীর বাঁচার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। অনন্তর মনে হোল, নিজের হাতে বরং এই সোনারবরণ রাজকন্যাকে চিতাগ্নিশিখার উপর তুলে ধরা যায়,

কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণা দেবে সে কোন্ হাতে, কোন্ প্রাণে? অথচ সময় নেই—ঘড়ির কাঁটা অবিরাম ঘুরে ঘুরে মৃত্যুর পদধ্বনির সঙ্কেত জানাচ্ছে—স্নেহের চিত্ত-আলোড়ন এখন ত' আর সম্ভব নয়! অনন্তর ভিতর থেকে যেন নিষ্ঠুর পুরুষ বেরিয়ে এসে বলতে লাগলো, উৎপীড়ন করো, যন্ত্রণা দাও, বাঁচাও!

অনন্ত তা'র শক্ত বাহু বাড়িয়ে টুনির চুলের মুঠি ধরলো, এবং অন্য হাতে একখানা হাত মোচড়াতে লাগলো। টুনি একটা কাতরোক্তি করে' উঠলো! কিন্তু প্রবল নিদ্রার জটিল জাল ছিঁড়ে সে বেরিয়ে আসতে পারলো না। অনন্ত ভাবলো, পুরুষের অতি লঘু করাঙ্গুলি স্পর্শে কি নারীর চেতনাকে অতি নিবিড় যন্ত্রণায় অধীর করে' তোলেনা? চিন্তামাত্র অনন্ত টুনির দেহের আচ্ছাদন সরিয়ে নিল। তারপর অতি মৃদু, অতি সূক্ষ্ম অঙ্গুলি স্পর্শের দ্বারা টুনির সেই ললিত লাবণ্যলতার উপরে মধুরতম নিবিড়তম যন্ত্রণার সৃষ্টি করতে লাগলো। কিন্তু কোনো সুফলই ফললো না—দেহের উপরকার ত্বক যেন প্রাণহীন!

বাইরের দরজায় মায়ের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। অনন্ত উঠে গিয়ে বললে, তোমরা ওঘরে থাকোগে মা, দেখা যাক্ কী হয়।

বৌমা বাঁচবে ত?

দেখতেই পাবে মা!—ব'লে অনন্ত এবার দরজাটা বন্ধ করে' দিল। কিন্তু দরজা বন্ধ ক'রেই তা'র মনে হোলো, এখনো সে যথেষ্ট কঠিন হ'তে পারেনি। এখনো তা'র মনে আছে দয়া, স্নেহ, প্রেম, বিবেচনা—এখনো সে স্ত্রীর প্রতি অন্ধ! কোথায় তা'র সেই নির্মম পৌরুষ, কোথায় সেই দয়াহীন দস্যুমনোবৃত্তি—যে-নিষ্ঠুরতা মৃত্যুর গ্রাস থেকে অমৃতকে ছিনিয়ে আনতে পারে? কোথায় তা'র সেই প্রেম—যে-প্রেম অকল্যাণকে বিনাশ করে সংহার মূর্ত্তি ধরে', যে প্রেমের ভীষণতম রূপ মৃত্যুকেও আতঙ্কিত করে' বিদূরিত করে? অনন্ত শান্ত হস্তে ঘরের কোণ থেকে একটি বেতের ছড়ি সংগ্রহ করে' আনলো। তারপর, দেবলোকদুর্লভ যে-তনুলতাটিকে অলঙ্কৃত করে' সে আজ রাত্রে পুষ্পশয্যা রচনা করার কল্পনা করেছিল, সেই দেহখানির উপর সপাৎ করে' আঘাত হানলো। রোগী চঞ্চল হয়ে নড়ে' উঠলো। কী উল্লাস অনন্তর চোখে মুখে? কী আগ্রহ তা'র দুই বাহুতে। আবার সে সপাৎ করে' টুনির গায়ে বেত মারলো প্রবল শক্তিতে। টুনি কাৎরে উঠলো, অনন্ত আবার মারলো। যন্ত্রণায় টুনির শরীর কুঁকড়ে উঠলো, কিন্তু অনন্ত থামলো না—অন্ধের মতো সপাসপ মারতে লাগলো তা'র সর্ব্বশরীরে। টুনি বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো বিছানার উপর ওলোটপালট খেতে লাগলো।

শিকারের ওপর হিংস্র দাঁত বসিয়ে বন্যজন্তু যেমন পরম উৎসাহে তা'র যন্ত্রণাটা উপভোগ করতে থাকে, অনন্ত ঠিক তেমনি জ্বলজ্বলে চোখে টুনির দিকে তাকিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠলো।

টুনি বিছানার উপর উল্টে পাল্টে গোঁ গোঁ করছে। বেতখানা রেখে দিয়ে অনন্ত তা'র কাছে সরে' গেল। দেখলো টুনির বন্ধ দুই চোখে যন্ত্রণার উত্তপ্ত অশ্রুধারা। মনে হোলো সর্ব্বাঙ্গে তা'র ঘাম ফুটেছে। কিন্তু তা'র গায়ে হাত বুলিয়ে অস্পষ্ট আলোয় অনন্ত বুঝতে পারলো, ঘাম নয়,—কোমল দেহলতাটি বেতের আঘাত সইতে না পেরে রক্তাক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু চিত্তবিকার ঘটলে অনন্তর চলবেনা। আত্মসম্বরণ করে' সহসা অনন্ত তা'র সেই রক্তমাখা হাতে টুনির কচিগালের উপর ঠাস ঠাস করে' কয়েকটা চড় বসিয়ে দিল। টুনি এবার উৎপীড়নের ফলে জেগে উঠে বসলো, বসে' কেঁদে ফেললো।

অনন্ত সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না। সে টুনির দুখানা হাত ধরে' বিছানা থেকে নামিয়ে হিঁচড়ে টানতে লাগলো। কিন্তু রোগীর পায়ে শক্তি নেই যে, উঠে দাঁড়ায়। অনন্ত তা'র মাথাটা দুই হাতে ধরে' দেয়ালের গায়ে ধাঁই করে' ঠুকে দিল। টুনি দাঁড়ালো সোজা হয়ে। অনন্ত তা'কে হিঁচড়ে হিঁচড়ে ঘরময় হাঁটাতে লাগলো, কিন্তু আবার ঘুমে টুনি এলিয়ে পড়তে লাগলো অনন্তর দুই বাহুর মধ্যে। অনন্ত তা'র চুলের মুঠি ধরে' হেঁচকা দিয়ে একমুঠো চুল সজোরে ছিঁড়ে নিল। টুনি আর্ত্তনাদ করে' উঠে এবার জড়িত কণ্ঠে বললে, কেন মারছো আমাকে এমন করে' ?

চোখের জল চেপে অনন্ত ধরা গলায় বললে, তোমার চেয়েও আমি বেশী মার খাচ্ছি, মিঠু ?

টুনি বোধ হয় অনন্তর কথা শুনতে পেলো না। অনন্ত তা'কে আবার হিঁচড়ে হিঁচড়ে ঘরময় হাঁটাতে লাগলো। যতবার সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়, ততবারই অনন্ত নতুন নতুন পীড়নের কৌশল খুঁজে বা'র করে। কখনো টুনির আঙুলের ডগাগুলি পিষে দেয়, কখনো পা দিয়ে টুনির পায়ের আঙুল মাড়িয়ে দলিত করে। এমনি করে' অনন্ত সমস্ত রাত্রি এই ক্ষতবিক্ষত যন্ত্রণাজর্জ্জর রক্তাক্ত ও নিরাবরণা তরুণীটিকে প্রবল অনাচারের দাপটে জাগিয়ে রেখে সমস্ত ঘরটার এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত টানাহেঁচড়া করতে লাগলো।

এক সময় ভোরের আলো এসে পড়লো ঘরের মধ্যে। সেই আলোয় অনন্ত লক্ষ্য করে' দেখলো, টুনির সর্ব্বাঙ্গে তা'রই বর্ব্বরতার অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন।

সর্ব্বশরীরে কালশিরা, শুক্‌নো রক্ত মাখা, মুখখানা বীভৎস নীলাঙ্গ, চোখ দুটি অসহ্য যন্ত্রণা ও বেদনায় কোটরগত। অনন্ত স্ত্রীর আপাদমস্তক লক্ষ্য করে' শিউরে উঠলো।

টুনি সজাগ ও সচেতন হয়ে মহানিদ্রার সমাধির নীচের থেকে যেন হেসে বললে, তুমি ?

অনন্ত বললে, হ্যাঁ আমি !—এই বলে' অনন্ত শাড়ীখানা টেনে নিয়ে স্ত্রীর কোমরে ও গায়ে জড়িয়ে দিল।

টুনি মুখ বিকৃত করলো আড়ষ্ট যন্ত্রণায়। তারপর অনন্তর হাত ধরে' ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, আমার কী হয়েছিল বলো ত ? তুমি ফিরে এসেছো ?

স্ত্রীর মাথাটি বুকের মধ্যে নিয়ে ধরা গলায় অনন্ত বললে, যদি না এসে থাকি, তুমি আমাকে ফিরিয়ে আনো, মিঠু।

টুনি চুপ করে' রইলো।

ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর জল্পনা

বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শুধু বাইরে নয়, খণ্ডযুদ্ধ ভারতবর্ষের মধ্যেও চলেছে : কর্ত্তৃপক্ষ ও কংগ্রেসে, কংগ্রেস ও মুসলীম লীগে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই পক্ষ প্রতিপক্ষের সমর্থক ও সহযোগীদের মধ্যে। সংবাদপত্র খুলুন—আইনসভার আলোচনা, সম্পাদকীয় স্তম্ভ, আদালতের বিতর্ক, আন্দোলনের বিবরণ, বিভিন্ন দলের বিবৃতি, 'মহতী' জনসভার রিপোর্ট—এমনকি খেলার ক্লাবের নির্ব্বাচন—সর্ব্বত্র 'চ্যালেঞ্জ' ও সতর্ক-বাণীর ছড়াছড়ি। কিন্তু এদের বাইরেও যে দেশ আছে, বিভিন্ন সমস্যা আছে এবং তাদের সমাধানের ইসারা-ইঙ্গিত দেখা দিচ্ছে, নূতনতর দৃষ্টিতে অনেক পণ্ডিত ও গবেষক আলোচনা করছেন এবং বক্তব্য প্রকাশ করছেন (যা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এ্যাগ্রিকাল্চারল্ রিসার্চ্চের গবেষণার মত দামী পুঁথিতে অপঠিত অবস্থায় থাকে এবং দেশের রাম-রহিমের কাজে লাগে না)—তাদের খোঁজ কে নেয়? এই পর্য্যায়ের কয়েকটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রস্তাব আলোচনা এই প্রবন্ধের-উদ্দেশ্য।

১

গণতন্ত্র, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব-আতঙ্ক ও সর্ব্বদলীয় সম্মতি এই তিনটি রাজনৈতিক অচল আধুলি বাজারে চালাবার জন্য আমাদের 'জাতীয়তাবাদী' নেতৃবৃন্দ, লীগ ও অ-ব্রাহ্মণ-দল এবং ব্রিটিশ সরকার ব্যস্ত। ৩০শে মার্চ্চ পার্লামেণ্টে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা আরও এক বৎসরের জন্য বলবৎ রাখবার প্রস্তাব সম্পর্কে যে আলোচনা হয় সেই সময়ে ভারত-সচিব মহোদয় এবং সাইমন-কমিশনের সভ্য ও লেবার দলের নেতা এ্যাট্‌লী সাহেব যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। এমেরী সাহেবের মতে ব্রিটিশ প্রথার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, বিশেষতঃ বিলাতি মন্ত্রিসভার ধরণ, ভারতবর্ষে অচল একথা স্বীকার ক'রে অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপ—দৃষ্টান্তস্বরূপ সুইট্‌জারল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভার—অনুকরণীয় এটা স্বীকার না করলে ভারতীয় বিবদমান দলপতিদের মধ্যে মীমাংসায় পৌঁছান সম্ভব হবে না। মেজর এ্যাটলী-ও এরই প্রতিধ্বনি ক'রে বলেন যে

ভারতবর্ষের মত একটা বিভিন্ন ভাষাভাষী মহাদেশে ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থা চাপাবার প্রয়াসটা, সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হ'লেও, ভুল হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় নেতাদের যাঁদের সঙ্গেই আলোচনা হয়েছে তাঁরাই এ যুক্তি নেন্ নি। তাঁর মতে আমেরিকান্ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ব্যবস্থাই ভারতীয় মানসগ্রাহ্য ব্যবস্থা।

অপচিকিৎসার খবর দিয়ে এঁরা যে দুটি প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনের ব্যবস্থা ক'রেছেন তার গুণাগুণ আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে কয়েকটি কথা বলা দরকার। এদেশে ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক শাসন চলে না—এ অপবাদ নূতন নয়: অপবাদ ব'লেই বা মানব কেন? ভারতবর্ষ ও গ্রেটব্রিটেনে তফাৎ অনেক এবং একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের লোকের স্বল্প-পরিসর মনের থেকে এবং ভুঁইফোড় বড়মানুষির সমস্যার সমাধানে যে শাসনতন্ত্র গ'ড়ে উঠেছে তা ভারতবর্ষে চালাবার চেষ্টা করায় ধৃষ্টতা ও ফাঁকি দুয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কখন এদেশে ব্রিটিশ গণতন্ত্রের অনুকরণের চেষ্টা হয়েছে? 'স্থানীয়' স্বায়ত্ত-শাসন ব'লতে যা বোঝা যায়—সেখানে কর্ত্তৃপক্ষ শাসন-যন্ত্রের সহজ গতির জন্য আবর্জ্জনা ফেলার কাজে খুব চতুরভাবে যে স্ব-শাসন দিয়েছেন তাতে 'শাসনে'র ক্ষমতা ও পরিধি সীমাবদ্ধ ব'ল্‌লেও অত্যুক্তি করা হয়: গ্রামে গ্রামে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, এবং বিত্তশালী ও চতুর মহাজন-দালাল-আইনজীবিদের মধ্যে নিরর্থক কলহ এবং শাসন-কর্ত্তাদের অনুগ্রহ-যাচ্ঞার আগ্রহ মাত্র বেড়েছে। লর্ড রিপন নাকি ঐ পথে আমাদের ধাপে ধাপে ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত ক'রে নিতে চেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে আমাদের দেশের প্রচলিত সমাজ-শাসন ও গোষ্ঠী-পরিচালনের ব্যবস্থা মৃতকল্প হ'ল—আমাদের দেশের অনেক অংশেই স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা ছিল—যা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এদেশে ও বিদেশে 'থিসিস্' লিখবার জন্য মাত্র এখন অনুধাবন ক'রে থাকেন। তার অবশ্য প্রভূত অদলবদল দরকার হ'ত: কিন্তু অজ্ঞ শাসক সম্প্রদায় শিক্ষা, শিল্প, আইন, শাসন ও সমাজে বিশৃঙ্খলা এনে এর প্রত্যেকটিরই সামাজিক ভিত্তি নষ্ট ক'রে দিয়েছে—আজ আবার ভারতীয় মানসগ্রাহ্য 'মডেলের' খোঁজ সুরু হয়েছে !!

কিন্তু গলদ তো গোড়া থেকেই। ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ভিত্তি জনমতের গঠন ও প্রকাশে—এদেশে কখনও ভোট-প্রথা এ উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত হয় নি;—স্বাধীন দেশ সম্পর্কে ভোট-প্রথার সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে অর্থনৈতিক বৈষম্যের দরুণ যতটা বলা হয়, পরাধীন দেশের ভোট-প্রথায় তা হওয়া তার চেয়েও

বেশী শক্ত। শুধু আইন সভা থাকলেই হয় না—সে সভার আলোচনা ও ক্ষমতা এতটা মেকীর উপর প্রতিষ্ঠিত যে পদে পদে পার্লামেণ্টের রচা আইন, লাট-বড়লাটের মর্জ্জি, কার্য্যনির্ব্বাহক মণ্ডলীর উপর নির্দ্দেশ দেবার অপারগতা স্মরণ ক'রে ঐ সব দেশী পার্লামেণ্টের সৃষ্টিতে আত্মতৃপ্তি চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি পান নি। বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে ব্রিটিশ গণতন্ত্রের পর্য্যায়ক্রমে প্রগতি ও প্রসার দেখে আমাদের তো চক্ষুস্থির! এমন মেকী দিয়ে, এবং যে ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করবার জন্য শিক্ষা বা দায়িত্ব কিছুই দেবার ইচ্ছা নেই তার পেছনে আমাদের নেতাদের দৌড় করান সম্ভব কেন হয়েছিল? তার কারণ বোধ হয় দুটি। প্রথমতঃ এই সুযোগের যদি কোন সদ্ব্যবহার করা যায় তাই অনেকের লক্ষ্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ যাঁরা এ সব নিয়ে সময় কাটিয়েছেন তাঁরা ইংরেজের রচিত আবহাওয়ায় মানুষ, তাদেরই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সৃষ্ট, এবং তাঁরা প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের ও গণতন্ত্রের বাস্তবরূপের সঙ্গে পরিচিত নন্। এখন যে মোড় ফেরাবার কথা অনেকে বলছেন তার কারণ এই যে ব্রিটিশ গণতন্ত্র যখন এদেশে অচল (সচল কেই বা ক'রতে চেয়েছে?), তখন অন্যপথে নেতাদের দৃষ্টি পরিচালিত হোক্। কিন্তু দেশ যে অচিরেই এবং এই যুদ্ধের মধ্য দিয়েই অনেক দূরে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত হবে—অশিক্ষা, অনভিজ্ঞতা ও অব্যবস্থা সত্ত্বেও—এ সম্ভাবনাও এঁদের কাছে প্রত্যক্ষ নয়। কায়েমী স্বার্থ, চল্‌তি বুলি ও নেতৃত্ব এবং তারই আওতায় ইঙ্গ-আমেরিকান অর্থনৈতিক প্রভুত্বের জেরটানা—এই বাঁধাপথেই বয়োবৃদ্ধ নেতাদের অনেকেই এদেশে-ওদেশে কথা কইছেন।—এটা আমার মূল আপত্তি, অন্য যা পরে বল্‌ছি তা 'বাহ্য' বলা যেতে পারে।

২

সুইস্ শাসন-ব্যবস্থার কাঠামো আলোচনা করলে ভারতবর্ষের পক্ষে তার উপযোগিতা মনে আসা স্বাভাবিক। একাধিক চিন্তাশীল ব্যক্তি এর সমর্থনে কিছুদিন যাবৎ বল্‌ছেন; মাদ্রাজের কয়েকজন অধ্যাপক এবং কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি স্বর্গীয় শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও স্যর্ সি, আর. রেড্ডী এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে জনসংখ্যার সত্তর ভাগের উপর জার্ম্মান ভাষাভাষী এবং কুড়ি ভাগের উপর ফরাসী ভাষাভাষী, ইতালিয়ানও চল্‌তি; আর্ধেকের বেশী লোক প্রোটেষ্টাণ্ট-মতাবলম্বী এবং দুই-পঞ্চমাংশ ক্যাথলিক। এদের শাসনের

ভার যুক্তরাষ্ট্রীয় এক মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত। মন্ত্রিসভার সাতজন সভ্য : যুক্ত-রাষ্ট্রের দুই আইনসভা যুগ্ম-অধিবেশনে এঁদের নির্ব্বাচন করেন। যদিও কোন শাসনতান্ত্রিক নিয়ম নেই, কার্য্যত এঁরা আইনসভার সভ্যদের মধ্য থেকেই নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু, এক 'ক্যান্টন' বা প্রদেশ থেকে দুজন মন্ত্রিসভার সভ্য হ'তে পারেন না এবং রীতি দাঁড়িয়েছে যে এঁরা বিভিন্ন দলের হবেন এবং পাঁচজনের বেশী মন্ত্রী জার্ম্মান-ভাষাভাষীদের মধ্য থেকে হ'তে পারবেন না। প্রধান মন্ত্রী ব'লে কেউ নেই : সাতজনের একজনকে সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের দুই আইন-সভা যুগ্ম-অধিবেশনে সভাপতি ও আর একজনকে সহ-সভাপতি নির্ব্বাচন করে এক বৎসরের জন্য : এবারের সহ-সভাপতি আগামীতে সভাপতি হন এবং তাই পালা ক'রে প্রত্যেক সভ্যই এক এক বৎসর অন্ততঃ সুইস গভর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট হন। মন্ত্রিসভার সভ্যরা নির্ব্বাচনের পর আর আইনসভার সভ্য থাকেন না : চার বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হ'লেও নূতন আইনসভা এঁদের পুনর্নির্ব্বাচন করেন এবং অনেকে বিশ পঁচিশ বৎসর একাদিক্রমেও মন্ত্রিত্ব করেছেন। ব্রিটেনের সঙ্গে তুলনা করলে মন্ত্রিসভার চেহারা ও দায়িত্ব খুবই তফাৎ : মন্ত্রিসভার কোন আইন বা প্রস্তাব আইনসভায় গ্রাহ্য না হ'লে কোন পদত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না, মন্ত্রিসভা হয় সে প্রস্তাব তুলে নেন, নয় আইনসভার বেশীর ভাগ সদস্যদের ইচ্ছামত অদলবদল করেন। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ধাপে নানা সলা-পরামর্শ ও আপোষের মধ্য দিয়ে ইয়োরোপের এই ছোট গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র সংখ্যাল্পের সমস্যা, এবং আইনসভা ও মন্ত্রিসভার সম্বন্ধ সম্পর্কে নূতন দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। যদিও অধুনা বামপন্থী দু-একদলকে কোণঠেসা করা হয়েছে, সাধারণভাবে সুইস্ মন্ত্রি-সভাকে সর্ব্বদলীয় ব'লে বলা চলে।

সুইস্ মন্ত্রিসভাকে কিন্তু 'কোয়ালিশন' মন্ত্রিত্বের পর্য্যায়ে ফেলা ঠিক হবে না। এই মন্ত্রিসভা ভিন্ন ভিন্ন দলের কার্যক্রমের গোঁজামিল মিলনের ফল নয়; ভিন্ন দলের লোক একসঙ্গে কাজ করলেও এঁরা সমবেতভাবে আইনসভার নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করেন : প্রত্যেকে একটি দপ্তরের কর্ত্তা : সুইস্ মন্ত্রিসভাকে সেজন্য কম্পোজিট (composite) বা একীভূত কার্য্যনির্ব্বাহক মণ্ডলীর দৃষ্টান্ত হিসাবে পরিগণিত করা হয়। সেখানে রাজনৈতিক দলাদলি ও মতবাদের ঝগড়ার চেয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়াই মন্ত্রিসভার প্রধান দায়িত্ব! এর অনেক দিক ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধানে লাগতে পারে অনেকের বিশ্বাস। যখন এই প্রস্তাব হয় তখন কেন ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের সমাধানে সুইস্ দৃষ্টান্ত কার্য্যকরী হ'তে পারে

না তা অন্যত্র বলেছি। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ইতিহাস, সেখানকার গণতান্ত্রিক পরিণতি, অর্থনৈতিক সমস্যার সরলতা, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে পররাষ্ট্রীয় সমস্যার জটিলতার অভাব প্রভৃতি কারণে সুইস্ মন্ত্রিসভার রূপ সুইট্‌জারল্যাণ্ডেই সম্ভব হয়েছে, যেমন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টিয় প্রথা সে দেশেই সম্ভব হয়েছে। তবুও পালা ক'রে সভাপতিত্ব, এক জেলা, বিভাগ বা প্রদেশ থেকেই বেশী কর্ম্মকর্ত্তা না নেওয়া, বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্ম্মাবলম্বীদের একত্রে কাজ করবার ব্যবস্থা করা, বহুব্যাপারে জনসাধারণের নিকট referendum মারফৎ মতামত গ্রহণ করা—এ সব আমরা অনুকরণ করতে পারি।

দশ বৎসর আগে গোল-টেবিল বৈঠকের সময় অপেক্ষাকৃত অপরিবর্ত্তনীয় কার্য্যনির্ব্বাহক মণ্ডলী বা মন্ত্রিসভার প্রস্তাব আলোচনা হয় এবং তখনও সুইট্‌জারল্যাণ্ডের দিকে অনেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মধ্যে অনেকে অবশ্য ঐ রকম মন্ত্রিসভা চেয়েছিলেন কংগ্রেসী বা বামপন্থী অন্য দলের সমালোচনা থেকে মন্ত্রিসভাকে বাঁচাবার জন্য। বিভিন্ন দলের মন্ত্রিসভা ও অ-দলীয় মন্ত্রিসভা ভিন্ন জিনিষ—সুইট্‌জারল্যাণ্ডে দল থাকা সত্ত্বেও কার্য্যত "অ-দলীয়" স্থায়ী মন্ত্রিসভার বিবর্ত্তন সুষ্ঠু কাজের পক্ষে সুবিধাজনক : বিলেতে স্থায়ী কর্ম্মচারীবৃন্দ শাসন-কার্য্যে মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও শাসন-কার্য্যের ও নীতির জের টেনে রাখেন : আমাদের দেশে সেক্রেটারী-অব্-ষ্টেটের অনুচর সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারীরা তা ক'রতে গিয়ে মন্ত্রিসভাকে কি রকমে চেপে ফেলতে পারেন তা অধুনা বাংলায় আমরা বেশ টের পেয়েছি। কাজেই ব্রিটিশ পদ্ধতির আংশিক অনুকরণ অপ্রস্তুত ক্ষেত্রে বিপদের কারণ হয়েছে।

৩

আর এক দিক থেকে রাষ্ট্রনৈতিক পুনর্গঠনের প্রস্তাব হয়েছে। দেশবন্ধু তাঁর গয়া কংগ্রেসের অভিভাষণে গ্রাম-পঞ্চায়েতের পুনর্গঠনের একটা ছবি এঁকেছিলেন তার ভিত্তিতে অখিল ভারত রাষ্ট্রব্যবস্থা গ'ড়ে উঠবে। এ ছবি আপাতদৃষ্টিতে গান্ধীবাদীরও ভাল লাগবে এবং সোভিয়েটের ব্যবস্থার অনুরূপ ব'লে বোঝাবার চেষ্টা করলে বামপন্থীদেরও ভাল লাগতে পারে। গোলটেবিল বৈঠকেও কথা হয়েছিল গ্রামগুলিকে নির্ব্বাচনের কেন্দ্র ক'রে একজন "মূখী" বা "মূখ্য" গ্রামপতি নির্ব্বাচন ক'রে ক্রমে বিভিন্ন আইনসভা তৈরী হবে : সমস্ত জটিল সমস্যা প্রণিধান করতে না পারলেও সে সব বুঝে গ্রামের হ'য়ে ভোট দিতে

পারে এ রকম একজন ব্যক্তির নির্ব্বাচন শক্ত ব্যাপার নয়। অশিক্ষা, অভিজ্ঞতার অভাব, বহু ভোটার নিয়ে নির্ব্বাচনের হাঙ্গামা—এসব আপত্তি এই ব্যবস্থায় খণ্ডন করা যায়। কিছুদিন আগে দিল্লীতে ইতিহাসের এক ইংরেজ অধ্যাপক (ইনি বর্ত্তমানে ভারত সরকারে কাজ নিয়েছেন) ডাঃ স্পীয়ার এই মূলনীতির ভিত্তিতে, গোষ্ঠী (বা ইউরোপীয় guild) প্রথার মধ্য দিয়ে যার যার পেশা এবং নিতান্ত প্রয়োজন হ'লে কোনও কোনও ব্যাপারে যার যার ধর্ম্মমত অনুসারে শাসনের ছোট ছোট কেন্দ্র সৃষ্টির এক প্রস্তাবনা ক'রেছেন। এঁর কয়েকটি প্রস্তাবের উল্লেখ ক'রব : নতুনত্বের জন্য এবং এ ধারার ভাবুক দেশে অনেকে হ'তে পারেন এই ভেবে। ভারতবর্ষের মধ্যে বৈচিত্র্যের উল্লেখ ক'রে স্পীয়ার সাহেব বলেন যে এদেশে বিভিন্ন গোষ্ঠী আছে যাদের মধ্যে তফাৎ শুধু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বা ধর্ম্মগত নয়—কৃষ্টিগত। মন্ত্রিসভার আসন বণ্টনের চল্‌তি সমাধান হচ্ছে চাকুরি-বিভাগের আপাত সমাধান মাত্র ; মূলতঃ এই বৈচিত্র্যের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে নূতন রীতির শাসন-পরিকল্পনা এ দেশে চাই। কতক বিষয় আছে যাতে সবাই আইনসভার নির্দ্দেশ মেনে কাজ করবে—আর কতক বিষয় আছে যাতে নিজ নিজ গোষ্ঠীর নির্দ্দেশই মাত্র সেই গোষ্ঠীর লোকেরা মান্‌বে। শেষোক্ত ধরণের ব্যাপারে যেমন হিন্দু মুসলমানের জন্য ভিন্ন আইনের ব্যবস্থা, তেমনি ভিন্ন কার্য্যনির্ব্বাহক ও আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে—যেমন শিখেদের গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি যদি তাদের ধর্ম্মগত ও ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেবার ক্ষমতা পায়। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে ক্ষমতার বি-কেন্দ্রীকরণ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি চল্‌তি প্রস্তাব। এই ধরণের শাসন-গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা, ধর্ম্ম, কৃষ্টি সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য রাজস্বের একটা নির্ধারিত বাঁটোয়ারাও থাকবে জনসংখ্যার অনুপাতে—যেমন মধ্য ইউরোপে কোথাও কোথাও ব্যবস্থা ছিল—প্রাক্-হিট্‌লারী যুগে। এইসব শাসন-গোষ্ঠীর সমান সংখ্যক প্রতিনিধির সমবায়ে একটি আইনসভার ঊর্দ্ধ-পরিষদ গঠিত হবে। যে মন্ত্রিসভা হবে তাতে দলীয় নেতাদের থাকার চেয়েও বেশী দরকার হবে নিয়মিতভাবে সরকারের দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালনার। মন্ত্রী-নির্ব্বাচন হবে প্রতি দু-বছরে আইনসভার উভয় পরিষদ কর্ত্তৃক এবং সুইট্‌জারল্যাণ্ডের মত তাঁদের একজন হবেন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি বার্ষিক নির্ব্বাচনের ফলে। ব্রিটিশপ্রথায় আইনসভার কাছে দায়িত্ব-শীলতার পরিমাপ হবে না ; এঁরা পাকাপোক্তভাবে "অ-দলীয়" কার্য্যক্রম চালিয়ে যাবেন—যেমন কোম্পানীর ডিরেক্টর-সভা ক'রে থাকেন।

ডাঃ স্পীয়ারের আলোচনায় সংখ্যালঘিষ্ঠের সমস্যার অনেক বিস্তৃত গঠন-মূলক আলোচনা আছে; কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর কল্পনায় নেতারা এবং সাধারণ নাগরিক সরল ও সহজ জিনিষই পছন্দ করেন—জটিলতার ভীতি তাঁদের অত্যন্ত বেশী। তাই এই ক'বৎসরে স্পীয়ার-প্রস্তাবগুলি দু-চারজন ছাড়া কেউ অনুধাবনই করেন নি।

৪

উপরোক্ত প্রস্তাব দুইটিই ব্রিটিশ দলীয় ভিত্তির বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে এদেশে মাত্র কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ দলের 'ডিসিপ্লিন' বা কঠোর শাসন রাখবার প্রয়াস পান; কিন্তু একের ভিত্তি রাজনৈতিক মতবাদ, অন্যের সাম্প্রদায়িক। দলাদলি থাকলেও 'party' বা রাজনৈতিক দল এখনও গ'ড়ে উঠছে না। গণতন্ত্রের সার্থকতার জন্য অবশ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা বৈষম্যেরও দূরীকরণ চাই। নির্ব্বাচন-প্রথার বর্ত্তমান ভিত্তির রদবদলও দরকার; শুধু সম্প্রদায়গত ব'লে নয়, সম্পত্তিগত ব'লেও: নির্ব্বাচক গোষ্ঠী দেশের লোকের সামান্য অংশ। এ সম্পর্কে পেশার ভিত্তিতে নির্ব্বাচক মণ্ডলী গঠনের প্রস্তাব কেউ কেউ অধুনা করেছেন: কিন্তু এর বিরুদ্ধেই মত নেতাদের অনেকের। যদিও এতে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনপ্রথার একটা উচ্ছেদের পথ-খুঁজে পাওয়া যায়, তবুও এই প্রথার মারফৎ অনেক 'প্যাঁচ'-চালনার চেষ্টাও অসম্ভব নয়। হায়দ্রাবাদে এর যে ভাবে প্রবর্ত্তন হয়েছে তাতে ধারণা এই যে সংখ্যাগরিষ্ঠকে খুবই ম্রিয়মান করবার এবং বিত্তশালী সম্প্রদায়কে বেশী ক্ষমতা দেবার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার ক'রে গণতন্ত্রের বদলে কোন ফ্যাসীবাদী দলের প্রাধান্যলাভ এতে হ'তে পারে। জিন্না সাহেব বা ডাঃ আম্বেদকার কংগ্রেসের হাতে যে একদলীয় 'অত্যাচারের' ভয় পান এতে তা না কমতেও পারে,—যদিও এই প্রস্তাব কংগ্রেসী প্রভাব খর্ব্বের অন্যতম অস্ত্র হিসাবে প্রস্তাবিত হ'য়েছিল ভারত-সরকারের শাসন-সংস্কার দপ্তরে এই চল্‌তি ধারণা।

৫

এই প্রসঙ্গে শাসনতন্ত্র-রচনার দায়িত্ব এবং শাসনতন্ত্রকে জনগণের পক্ষ থেকে গ্রহণ করবার অধিকার কার হওয়া উচিত তার উল্লেখ করব। মানবেন্দ্রনাথ রায় ১৯৩০ সালে "কন্‌ষ্টিট্যুয়েণ্ট এ্যাসেম্ব্‌লী" বা গণ-পরিষদের যে প্রস্তাব করেন

এই উদ্দেশ্যে, তা কংগ্রেস অনেক পরে গ্রহণ করেন ; কিন্তু ইতিমধ্যে রায়ের প্রস্তাবের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা অনেকটাই "জোলো" ক'রে ফেলা হয়। নানা আপত্তি ওঠে এবং অনেকের কাছেই গণ-পরিষদ মাত্র একটা নেতৃ-সম্মিলন বলেই রূপ পরিগ্রহ করে। প্রকৃত পক্ষে, পণ্ডিত জওয়াহরলাল এই গণ-পরিষদ প্রস্তাবকে বুঝেছিলেন ; কিন্তু তিনিও অধুনা-চল্‌তি ঐ সম্বন্ধে দুটি বইয়ে এমন সব আপত্তি খণ্ডনের সমাধান করেছেন যা মুল-প্রস্তাবের বিরোধী, যথা :—সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্ব্বাচন, সংখ্যালঘিষ্ঠ-সমস্যার সমাধানে বাইরের কারও সালিসী প্রভৃতি। যাঁরা এ বিষয়ের খোঁজ রাখেন তাঁরা স্বীকার ক'রবেন যে রাজ্যক্ষমতা হস্তান্তরের পরিপ্রেক্ষিতেই গণ-পরিষদের প্রয়োজন ও সার্থকতা। তাছাড়া, এর বিরুদ্ধে ভারতীয় ফেডারেল কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি স্যার্ মরিস্ গায়ার থেকে অনেকেই ভারতের বিশেষ অবস্থাগুলির ও প্রশ্নগুলির দিক থেকে নানা যুক্তি দেখাতে চেয়েছেন। তাঁরা একটা ছোট কমিটির হাতে দায়িত্ব দিতে চান শাসনতন্ত্র-রচনার এবং পরে তা জন-প্রতিনিধিদের দ্বারা (যেমন প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের প্রতিনিধিদের দ্বারা) অদলবদল ক'রে পাশ করান হবে।

আসলে গণ-পরিষদের দাবী নানা হেরফেরের পর যে রূপ নিয়েছে তাতে সেই পরিষদ বা ঐ জাতীয় সম্মেলন গণতন্ত্র ও গণশাসন প্রতিষ্ঠায় কোন খসড়া দিতে পারেন ব'লে আর আমাদের ভরসা নেই। প্রাচীন দল ও প্রাচীন দলপতিদের এই সভায় কায়েমী বিভিন্ন স্বার্থের দাবীর চালাচালি মাত্র হবে : আগামী পৃথিবীর সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁরা সজাগ হ'য়ে ভয় পাবেন এবং আমাদের কর্ত্তাদের মতই জনসাধারণের ক্ষমতা সঙ্কোচনের নানা অছিলার অজুহাতে বর্ত্তমানের মধ্যবিত্ত ও শিল্পপতি স্থাপিত 'গণতন্ত্রে'র একটা নকল কাঠামো চাপাবেন দেশের উপর।

শতভিষা

সুবোধ ঘোষ

পুঁটি মাসীমার গল্প তখন দূর পূর্ব্ব বাংলার রাজপাটপুর নামে একটী গাঁয়ে, এক জমিদার বাড়ীর আঙিনায়, এক কালিপূজোর রাতে, একশো গ্যাসবাতি জ্বালিয়ে যাত্রাগানের আসর পেতে বসেছে। বেহালার সুরের কাঁদুনির সঙ্গে অজবিলাপ মাত্র করুণ হয়ে জমে উঠেছে, হঠাৎ একটা বোমা ফাটার আওয়াজ! সাজঘরের পাশে কদমতলায় কতগুলি ধোঁয়ার কুণ্ডলী দুলছে। দু'হাজার লোক যে-যেখানে বসেছিল, সে সেইখানেই বসে রইল চুপ করে। মুখোস পরে স্বদেশী ডাকাতেরা এসেছে, হাতে বন্দুক কোমরে ভোজালি—দশ বারটী জোয়ান ছেলে। একজন বললে—দেশমায়ের নামে...।

—শুভা! ও শুভা!

বাগানের কৎবেল গাছের ভীড় ভেদ করে পাঁচিলের ওপার থেকে নশুবাবুর বাড়ীর একটী জানালা থেকে আপ্লুত আহ্বানের স্বর শোনা গেল। শুভার মা ডাকছেন।

শুভা মিনতি করে বললো—এইখানে থেমে থাকুন মাসীমা। এর মধ্যে সবটা বলে ফেলবেন না। আমি এখুনি আসছি। সত্যি বলছি, একটুও দেরী করবো না।

শুভা ব্যস্ত হয়ে আঁচলটা নিমেষের মধ্যে কোমরে একপাক জড়িয়ে নিয়ে প্রায় দৌড় দিয়ে চলে গেল। বাগানের শেষে এসে একটা লাফ দিয়ে বেঁটে পাঁচিলটার ওপর উঠলো! তারপর ধড়াস্ করে ওপারে নেমে পড়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকলো।

গল্পের আসরে শুধু বসে রইল মঞ্জু আর মীনু। পুঁটি মাসীমা শুভারই উদ্দেশে বললেন।—গল্পটা না হয় শুনেই যেতিস। দৌড়ে গেলে আর কী হবে? তোর পরীক্ষার ফল জানাই আছে।

জানা আছে সবারই। এক মেয়েদেখার দল নিশ্চয় শুভাদের বাড়ীতে এসেছে। তাই এই আহ্বান। আজ চার বছর ধরে টিয়ার ঝাঁকের মত প্রতি সপ্তাহে একটী দুটীবার দেখা দেয়—যেন বাগানের একটা আধপাকা ফল ঠুক্‌রে

চলে যায়। তারপরেই তাদের আপত্তির কারণ চিঠির মারফৎ শোনা যায়—মেয়ে পছন্দসই নয়।

শুভার চেয়ে শুভার মা বেশী স্তম্ভিত হয়ে গেছেন উদ্বাহতত্ত্বের এই বাজারী স্বরূপ দেখে। প্রথম প্রথম বিমুখ পাত্রপক্ষের নামে কটূক্তি করতেন—যারা নিজেরাই রূপগুণের ধোপে টিঁকতে পারে না, তাদের মনে এত বাছবিচারের বাতিক কেন? টাঙ্গাইলের পাটের আফিসে মুহুরীগিরি করে, সেই ট্যারা চোখ পাত্রের বাপও যখন রাজী হয়েও আর হলো না, তখন একদিন হঠাৎ সন্দেহ জাগলো—দোষ কার? কেন প্রজাপতি এত বাম? শিবের মাথায় এত ঢালা-জল কেন শুকিয়ে গেল?

না হয় দেখতে কালোই হয়েছিলি—সেটা তোর বাপের গায়ের রং। কিন্তু বেঁটে হলি কেন? শুভার চেয়ে বয়সে পাচ বছরের ছোট ভুলু—এরই মধ্যে পেঁপে গাছের মত ফন্‌ফন্ করে পাঁচিল ছাড়িয়ে উঠেছে। চৌকাটে মাথা ঠেকে! এইটুকু ছেলের এতটা শালপ্রাংশুতা না হ'লেও চলতো। শুভার এই বেঁটেত্বই ওর বিয়ের পথে সব চেয়ে উঁচু বাধা—যেটা ডিঙ্গিয়ে কেউ আর কাছে আসতে পারছে না! শুভার মা বুঝলেন—দোষটা শুভার।

মেয়ে দেখার পালা শেষ হলে শুভা ঘরের ভেতর যখন চলে আসে, শুভার মা দরজার আড়ালে কান পেতে সব আলোচনা শোনেন। ফাঁক দিয়ে পাত্রপক্ষের, কখনোবা স্বয়ং পাত্রের, মুখের চেহারা থেকে পছন্দের আভাষ বুঝবার চেষ্টা করেন। নিঃসংশয় হন, সম্মতির লক্ষণ নেই। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে—রান্নাঘরের দিকে চলে যান, উঠোন পার হয়ে। উঠোনে তখন মেয়েদেখা অভিযাত্রী-দের মিষ্টিমুখের এঁটো করা যত কাপ রেকাবি আর গেলাসের স্তূপ। আড়চোখে একবার মাঝের বড় ঘরটার দিকে তাকান। শুভা নিঃশব্দে আঁচলের পিন খুলছে।

—যা, শিকেয় ঝুঁটী বেঁধে ঝুলে ঝুলে দোল খেগে যা।

শুভার মা রাগ করে কথাগুলি বলেই আবার হেঁসেলের কাজে হাত দেন। তার পরেই হয়তো দেখেন কালজিরে নেই। ঝিকে ডাক দিয়ে বলেন,—একবার বাজারে যা, কালজিরে নিয়ে আয় চার পয়সার। তার পরেই সব ভুলে যান। শুভার ওপর সব রাগও নিঃশেষে উপে যায়।

ভুলু সন্ধ্যা বেলা ঘরে ফিরে এক একদিন শোনে।—মেয়েদেখার দল এসেছিল। খুব ভাল সম্বন্ধ। ছেলে আইন পড়ছে—বাপের পয়সা আছে।

দেখতেও খুব ভাল। কিন্তু তাদের আনা মাত্র সার হয়েছে। মুখের ওপর ভদ্র-ভাবে জানিয়ে দিয়ে গেছে—মেয়ে পছন্দ হলো না, মাপ করবেন।

ভুলু চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে।—দিদিভাই শুনে যা, আমার পলিসি শোন, শুভা কাছে আসতেই বলে—আমার ঠ্যাং দুটো কেটে তুই লাগিয়ে নে, তোর ঠ্যাং দুটো আমায় দে।

শুভা হেসে ফেলে। শুভার মা হাসতে হাসতে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে শুভাকে বলেন,—আজ বৃষ্টি নেই; যা সিনেমা দেখে আয়। গুম হয়ে বসে থাকিস্ না। পিসীমা জন্মদিনে যে-সাড়ীটা দিয়ে ছিল, সেইটে পর; যা, আমি বলছি। তাড়াতাড়ি কর।

শুভার মার গলার স্বর অনুনয়ের সুরে কোমল হয়ে আসে। বোঝা যায়, যেন নিজের মনের অভিমানের জ্বালা তিনি ঢাকছেন।

মায়ের অনুরোধে আপত্তি জানিয়েও শুভা সাড়ীটা তবু পরলো। কিন্তু স্নো-পাউডার আজকাল একেবারেই ছুঁতে চায় না। শুভার মা ধমক দিয়ে বলেন,—তোর এই বেয়াড়াপনার জন্যেই আমি তোকে দেখতে পারি না।

যাই হোক্, মায়ের কথা শেষাশেষি মানতেই হয়, সাজগোছ করে ভুলুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে যায়। যাবার সময় মায়ের সঙ্গে চকিতে চোখাচোখি হয়। শুভার মা যেভাবে তাকিয়ে দেখেন তাতে শুভার মুখ লজ্জায় করুণ হয়ে ওঠে। মা নিশ্চয় ভাবছিলেন,—মানুষের রাজ্যে কী এমন বেমানান দেখাচ্ছে এই মেয়েকে? হেঁট মুখের এত শান্ত হাসি।

পুঁটি মাসীমার গল্প সত্যিই থেমেছিল; যতক্ষণ শুভা ফিরে না আসে। মঞ্জু বললো—আমার কিন্তু শুভাকে বড় ভাল লাগে। তাছাড়া সত্যি সত্যি আমি বুঝতে পারি না, ওকে কুৎসিত বলে কেন?

মীনু—নশুবাবু যদি টাকার থলে হাতে নিয়ে পাত্র খুঁজতে বের হতেন, তা হলে ওসব কোন কথাই উঠতো না।

কথার মাঝখানে শুভা এসে পৌঁছে গেল। বড় জোর পনের মিনিট সময় লেগেছে। তখনো গলার কাছে এক-আধটু পাউডারের ছিটে লেগে আছে। খয়েরের টিপটা একেবারে মুছে ফেলেছে। আটপৌরে সাজের মধ্যে এখন শুধু শুধু ঘসামাজা মুখখানা আরও বেশী জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছে।—বলুন মাসীমা। শুভা গল্প শোনার জন্য বসলো।

পুঁটি মাসীমা আরম্ভ করলেন—এদিকে জমিদার মশাইয়ের বড় পুত্তুর, চুপিচুপি আসর থেকে কখন উঠে গেছে কেউ টের পায়নি। উঠে গিয়ে সোজা বাড়ীর ভেতর থেকে একটা বন্দুক নিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিক থেকে একটা গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ—রাবুদের বড়খোকা বুকে হাত দিয়ে চীৎকার করে পড়ে গেল। স্বদেশীওয়ালারা মেরে দিয়েছে। তারপর·····।

শুভা—এ কী রকমের স্বদেশী রে বাবা! স্বদেশী লোককেই গুলি করে মারলে, স্বদেশীদের গয়নাপত্তর লুঠ করে নিলে·····।

মীনু—থাম শুভা। আগে গল্পটা শুনে নে।

পুঁটি মাসী—জমিদার বাবু তখনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। একজন স্বদেশী ডাকাত তাঁকে রুমাল দিয়ে বাতাস করতে লাগলো। আর সবাই সকলের কাছ থেকে টাকা পয়সা অলঙ্কার নিয়ে থলি ভরতে লাগল। এমন সময়·····;

মঞ্জু—আপনিও তো যাত্রা শুনছিলেন। আপনি কি দিলেন?

পুঁটি মাসী—সত্যি কথা বলবো?

শুভা—তাই বলুন, এতক্ষণ মিছিমিছি বানিয়ে বলছিলেন। এরকম নিষ্ঠুর ভাবে খুন করে দিলে, অথচ বলছে দেশের নামে·····।

মীনু—থামলি শুভা। বলে যান মাসীমা।

পুঁটি মাসী—আমার গলায় একটা মটরমালা ছিল। তোর মেসোমশায়ের প্রথম চাকরীর উপহার। ব্যাপার দেখে আমি আগেভাগেই টপ্ করে সেমিজের গলার ফাঁকে সেটাকে ফেলে দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। একটা স্বদেশী আমার সামনে এসে থলি ধরলে—দেশের কাজে কিছু দান চাই। আমি বললাম,—কী দেব! আমার কিছু নেই। হাতে এই কাচের চুড়ি, এ নিয়ে কি হবে, কতই বা দাম? স্বদেশীটা বললে—কিছু নেই? তা কখনই হতে পারে না।

শুভা—মাগো! গায়ে হাত দিল শেষে।

পুঁটি মাসী—স্বদেশী লোকটা বললে—আশীর্ব্বাদ দিন, তা হলেই যথেষ্ট। বলেই অন্য দিকে এগিয়ে গেল। এমন সময় ভয়ানক হল্লা আরম্ভ হলো, লোকজন দৌড়ে পালাচ্ছে। বন্দুকের ঘন ঘন শব্দ হতে লাগলো। একটা পুলিশের দল সময় মত পৌঁছে গেল, ওদের গোয়েন্দারা আগেই খবর দিয়েছিল—সে রাত্রে স্বদেশী দল এই রকম একটা কাণ্ড করবে। সেই থলেধরা স্বদেশী ছেলেটা কিছুক্ষণ থম্‌কে সেই হল্লার দিকে তাকিয়ে রইল, কোমর হাতড়ে একটা

পিস্তল বার করলো। আমি সেই ফাঁকে মটর মালাটা সেমিজের ভেতর থেকে বার করে আলগোছে থলির ভেতর ফেলে দিলাম।

শুভা পুঁটি মাসীর গা ঘেঁসে বসলো। বললো—সত্যি, না দিলে বড় খারাপ হতো মাসীমা।

মঞ্জু ও মীনু একসঙ্গে হেসে উঠলো। শুভা মেয়েটীর রকমসকম এই। ওর মনে কোন চাবি নেই, ভাবের আয়না মাত্র। শোনামাত্র শিউরে ওঠে, যেই বুঝলো অমনি বলে ফেললো। বিচার করে দেখবে, চিত্তের ওর খোলা মাঠে এমন কোন বেড়া বাঁধা নেই।

পুঁটি মাসীমা।—ভাল হতো কি না হতো, তা জানি না, মোটকথা দিয়েই দিলাম। কিন্তু...।

শুভা।—এই ছেলেটার গায়ে গুলিটুলি লাগেনি তো মাসীমা?

পুঁটি মাসীমা।—এরই গায়ে লাগলো। স্বদেশীদের দলের নেতা হুইসিল বাজালো—অর্থাৎ এবার সরে পড়তে হবে। এই ছেলেটীও থলে কাঁধে নিয়ে দৌড়ে সবার সঙ্গে গিয়ে দাঁড়ালো, পুলিসের দল তখন প্রায় ঘিরে ফেলেছে। ডাকাত ছোঁড়ারা মাঠের অন্ধকারের দিকে ছুটে পালালো। কিন্তু পুলিসের দল ক্রম ক্রাম গুলি চালিয়েই যাচ্ছে। আমরা তখনো চিকের আড়ালে চুপটী হয়ে বসে আছি। খালের দিক থেকে একটা চীৎকার শুনলাম—বন্দেমাতরম্। অনেক লোক সেদিকে দৌড়ে গেল। ডাকাতদের একজন ঘায়েল হয়ে পড়ে গেছে—সেই থলেওয়ালা স্বদেশী ছেলেটী।

শুভা।—সবই পালিয়ে বাঁচলো, শুধু এই বেচারীকে গুলি মেরে···ধেৎ··· এ বড় অন্যায়।

পুঁটি মাসী।—তারপর মোকদ্দমা হলো। ছেলেটীকে কত লোভ দেখিয়েছে, মেরে গায়ের মাংস পচিয়ে দিয়েছে, তবু সঙ্গীদের নাম ফাঁক করেনি। শেষে এরই নামে নরহত্যা আর ডাকাতির অভিযোগ এল, বিচার হলো। সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার···।

মীনু।—শুভা শুনে যা চুপ করে, ফোড়ন দিস্ না।

পুঁটি মাসী।—বিচারের সময় বড় খোকা বাবুর বউ থান কাপড় পরে নিজেই আদালতে সাক্ষী দিতে এসেছিল। আদালতভরা জজ উকীল জুরি আর লোকের ভীড়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলে গেল—উনি ঘরের ভেতর থেকে বন্দুক নিয়ে এসে আত্মহত্যা করেছেন, আমি নিজে দেখেছি। তাঁকে স্বদেশীদের কেউ গুলি করে মারেনি।

পুঁটি মাসীমার রূপকথা যেন শুভাকে হাত ধরে পথে পথে ইন্দ্রজালের বিস্ময় দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। কী দুর্দ্ধর প্রেরণায়, কত জীবনের নিশ্বাস বায়ুর উৎসর্গে একদিন সারা জাতির কামনা রুষ্ট ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল। সেই ঝড় আজও কত মহীরুহে শান্ত প্রতিজ্ঞায়, নির্ব্বাক প্রতীক্ষায়, বাসা বেঁধে আছে। কারা যেন সেই মহীরুহের কয়েকটি ডালপালা। শুভা তার কিছুই জানে না, বোঝে না। শুভা শুধু গল্প শুনে চলেছে। কিন্তু এ গল্প বড় অদ্ভুত। শুনেই শেষ হয়ে যায় না। মনের ভেতর গিয়ে গল্পটা আবার বেঁচে ওঠে। মনের স্বস্তি নষ্ট করে।

শুভা।—ছেলেটী রেহাই পেল তো মাসীমা ?

পুঁটি মাসীমা।—চার বছরের জন্য জেল হলো ডাকাতির দায়ে। তারপর ···সেই বিধবা বৌটীকে শ্বশুরবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে। সবাই বললো, বৌটী নাকি স্বদেশীদেরই দলের লোক ছিল। কিন্তু বৌটী কোথায় যে গেল তার আর কোন খবর পাওয়া গেল না।

শুভা।—শেষটা বড় খারাপ হলো। ছেলেটীরও জেল হলো—বৌটীও কোথায় চলে গেল। কিছুই হলো না।

পুঁটি মাসীমা।—দুঃখ করছিস্ কেন ? কেউ তো আর মরে গেল না ; যেখানেই হোক্ রয়ে গেল—বেঁচে গেল। আজও তারা বেঁচেই আছে।

শুভা।—ছেলেটী কোথায় আছে মাসীমা ?

পুঁটি মাসীমা।—মীনু, মঞ্জু—তোরা এবার শুভাকে থামাতে পারিস্ তো দেখ। ছেলেটীর খবর পেলে একটা কিছু কাণ্ড করার মতলবে আছে শুভা।

শুভা অপ্রস্তুত হয়ে খানিকটা রাগ করে আপত্তি করলো। আপত্তির রীতিও তেমনই অদ্ভুত। যার বিরুদ্ধে শুভার অভিযোগ থাকে, তারই গায়ের ওপর ঢলে পড়ে একটা গা-ভরা আবদারের ভার যেন ছেড়ে দেয়। মীনুর দিকে একটু হেলে পড়তেই, মীনু দুহাত দিয়ে ঠেলে ধরলো।—না ভাই, মাপ্ করো, এখানে জায়গা নেই। একবার কাত হতে পারলে তুমি আর উঠতে চাইবে না। ঐ যে বড়দি রয়েছে, সাক্ষাৎ সহ্যাদ্রি—ওর গায়ে একেবারে কাবেরী হয়ে গড়িয়ে পড়।

মঞ্জু ডাকলো।—আয়রে শুভা।

পুঁটি মাসীমা বললেন,—শুভা ভাবছে, ঐ ছেলেটীর কি বিয়ে হয়ে গেছে। এত ভালবাসতে পারে, প্রাণ দিতে পারে, প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে—এমন নির্ভীক

ও সুন্দর ছেলে যদি আজ থাকতো, তাহলে···তাহলে কি ব্যাপার হতো, তুই বলে ফেল শুভা।

শুভা এবার সত্যিই রাগ করলো—কী আর হতো! যা শুনতে চাইছেন, তাই বলছি; আর একটা মেয়েদেখার দল আসতো; আর একবার সং সেজে সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম; তারপর একদিন চিঠি আসতো—পছন্দ হলো না।

পুঁটি মাসীমা।—ওরে রাগ করিস্ না। সে তোর সঙ্গে ওরকম ব্যাভার করতো না। কিন্তু উপায় নেই, বেচারা বুড়ো হয়ে গেছে, চুল দাড়ি পেকে গেছে, বিয়ে তো হয়ে গেছে কবেই। তার ওপর নিজেরই দুম্বো দুম্বো মেয়ে রয়েছে—তাদের বিয়ের ভাবনা করবারও সময় হয় না, ভদ্রলোকের—এত কাজ। যেমন ধর, তোর রজনী জেঠাবাবু এখন যেমনটী হয়ে গেছেন।

শুভা।—জেঠাবাবু! শুভার বিস্ময়ধ্বনির মধ্যে জেঠাবাবু যেন নতুন করে আবিষ্কৃত হলেন। বুদ্ধির দিক দিয়ে শুভা যতই বোকা হোক্, অন্তরের চোখ দুটো ওর অন্ধ নয়।

মীনুদি মঞ্জুদির বাবা রজনীবাবুকে শুভা জেঠাবাবু বলেই এতদিন জানতো, রজনীবাবু যে ওদের প্রতিবেশী এ তত্ত্ব কোনদিনও মনে থাকে না শুভার।

জেঠাবাবুর গায়ের সেই রিপুকরা চিরকেলে তসরের চাদরটী নিয়ে কত ঠাট্টা করে শুভা। একবার মেতে উঠলে কথার কোন লাগাম থাকে না। বলে ফেলে—তুমি নিশ্চয় কোন পাপ করেছিলে জেঠাবাবু; নইলে এত বই পড়েছ—তবু একটা ভাল চাকরী পেলে না।

মীনু মঞ্জু দুজনে চম্‌কে ওঠে; বিরক্তও হয়। মেয়েটার কথা বলার রকম নেই। কিন্তু রজনীবাবুই আস্কারা দিতেন বেশী। শুভার সঙ্গে সমানে আবোল তাবোল বকেন। হে শুভা, শুভাঢ্যা, পতিতপাবনী—এই বুড্‌ঢা বাঙালীকে একঠো নোকরী মিলা দে মাঈ!

শুভা হলো ভোরের পাখীর মত; ও কী জানে যে দেবদারুর পায়ের কাছে শুধু প্রণাম করতে হয়। ও জানে একেবারে ডালপালা ছড়ানো ছায়াভরা কোলের ওপর গিয়ে উড়ে পড়তে।

শুভার আশ্চর্য্য লাগতো, ওর বাবা নশুবাবু কেন জেঠাবাবুকে এত ভয় করেন অথচ মান্য করে চলেন। নশুবাবু বার বার বলতেন—মস্ত লোক। কিন্তু শুভার কাছে এটা রহস্য ছিল। জেঠাবাবুকে সে একটু ভয় করতো না।

এক একদিন সন্ধ্যা বেলা বেড়াতে এসে দেখে যায় শুভা—জেঠাবাবু বাড়ীতে নেই। থানা থেকে ডেকে পাঠিয়েছিল—সেইখানেই গেছেন। কখন ফিরবেন বলা যায় না। বুড়ো মানুষ প্রায়ই সন্ধ্যার সময় একটু দুধ রুটি খেয়ে শুয়ে পড়েন। কিন্তু সেদিন কখন্ ছাড়া পাবেন কে জানে!

মঞ্জুদি ও মীনুদির সঙ্গে সেদিন কোন গল্প আলাপ ভাল করে জমে না। গুমোট মন নিয়ে বাড়ীতে ফিরে আসে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। উৎকর্ণ হয়ে শোনে, বারান্দা থেকে শুধু নশুবাবুর হুঁকোর আওয়াজ কানে আসে। ধড়ফড় করে উঠে বসে শুভা। বলে—একবার খোঁজ নাও না বাবা, জেঠাবাবু ফিরলেন কিনা।

একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে জেগে ঘুমিয়ে শুভার রাত কেটে যায়। জানালাটা খুলে বিছানার উপর বসে থাকে। বসে বসে ভাবে—জেঠাবাবু ফিরলেন কি না।

জেঠাবাবুদের বাড়ীটা অদ্ভুত। একটা জীর্ণ কেল্লার মত। চারদিকের পাঁচিলের গায়ে শেওলা বার মাসে ছাড়ে না। মাঝে মাঝে একেবারে ধসে গেছে, পাঁচিলের পাশে এখনো যে কটা লিচু গাছ দেখা যায়, তাদের ধড়টা শুধু বাগানের ভেতর; ভাঙা পাঁচিলের ফাঁকে পথচারীদের লোলুপ হাত গাছগুলিকে ঝুঁটি ধরে রাস্তার ধারে নামিয়ে দিয়েছে। লোনাধরা বাড়ীটা শুধু দেখতেই প্রকাণ্ড। জানালা কপাটের রঙ চটে গিয়েছে। বারমেসে ফলের গাছগুলি একে একে মরে গেছে। বাগানটা শুধু ঘাসের বনে ঢাকা—মাঝে মাঝে রোগা লম্বা এক একটা তাল আর কৎবেল। এই বন্য অবহেলার মধ্যে এখনো এখানে-ওখানে দুচারটে দোপাটী ফোটে, ঝুমকো দোলে—হঠাৎ কোন সন্ধ্যায় হাস্নুনা-হানার কড়া গন্ধে বাগানের বাতাস ভারি হয়ে ওঠে।

রাত্রি ফর্সা হয়ে গেছে। জেঠাবাবু ফিরেছেন কি না? উত্তরের মাঠের ঢালুর শেষে ইঁটের পাঁজাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উশ্রীর বালিতে জনস্রোত দেখা যায় না—একটা সাদাটে বাষ্পের ঘেরাটোপে নদীর খাত ঢাকা পড়ে আছে। লোহার তারের ঝোলানো ব্রিজটার মরচেপড়া কঙ্কালের উপর ফোঁটা ফোঁটা শিশির চিক্‌চিক্ করছে।

মীনুদি এখন ওঠেনি বুঝতে পারা যাচ্ছে। নইলে বারান্দায় বই নিয়ে পড়তে বসতো নিশ্চয়। শুধু বুঝতে পারা যায় মঞ্জুদি জেগেছে। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে আলো দেখা যায়—চায়ের কাপ ডিস কেট্‌লির শব্দ। মঞ্জুদি চা তৈরী করছে। কিন্তু কার জন্য? জেঠাবাবু কি ফিরেছেন?

এতক্ষণে দেখা গেল—বারান্দার ওপর একটা বেঞ্চ টেনে নিয়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে বসে আছেন জেঠাবাবু। মঞ্জুদি চা এনে দিচ্ছে।

শুভা শুনতে পায় : রজনীবাবু বললেন।—তোর মা উঠেছে মঞ্জু ?

প্রমীলাবালা অনেকক্ষণ আগেই উঠেছেন। মঞ্জুরী বললো—হাঁ।

—কি করছে ?

—পূজোর ঘরে আছেন।

—ও, আজ তো তার বোবামির ব্রত, আজ মঙ্গলবার।

প্রতি মঙ্গলবারে প্রমীলাবালা একবেলা উপোষ থাকেন। সারাদিন মৌন থাকেন। প্রমীলাবালা এইভাবে নিজেকে সংসারধর্ম্মের তাড়না থেকে অনেকটা মুক্ত করে ফেলেছেন। একবার পূজোর ঘরে ঢুকলে বের হতে চান না—জপ সারাই হয় না। কোন কোন দিন যদি কাজ নিয়ে বসলেন তো সেটাও জপ করার মত ব্যাপার দাঁড়িয়ে যায়। কুঁয়োতলায় সকালবেলা একরাশ কাপড় কাচতে বসলেন—কেচেই চললেন। উঠলেন বিকেল চারটেয়। সব কাজের মধ্যে হৃদয়ের আগ্রহ ক্রমেই মুছে আসছে।

তাই মঞ্জুকে এগিয়ে এসে এই দায় তুলে নিতে হয়েছে। আশ্রমপালিকার মত এই সংসারতরুর আলবালে মঞ্জু যেন ক্ষান্তিহীন মমতায় জলসেচন করে চলেছে—আজ দশ বছর ধরে, যেদিন থেকে প্রমীলাবালা পূজোর ঘরে ঢুকেছেন।

রজনীবাবু বললেন,—মঞ্জু।

—কি বাবা ?

—অমিয় কোথায় গেল বুঝতে পারছি না। কোন খোঁজ পেলাম না।

পূজোর ঘরে বসেই প্রমীলাবালার কানে কথাগুলি গেল। ধ্যান ছুটে গেল। কোশাকুশী, গীতা-চণ্ডী, মালা তুলসী, চন্দনের বাটী আর ঘিয়ের প্রদীপ সব পড়ে রইল! সশব্দে দরজা খুলে ঘর থেকে যেন ছিট্‌কে বেরিয়ে এলেন, পাথরের মত চোখ দুটো স্তব্ধ হয়ে রইল।

মীনু পড়া বন্ধ করে একটা পাখা হাতে এগিয়ে এসে প্রমীলাবালার হাত ধরলো,—তুমি চুপ করে বসো মা।

প্রমীলাবালা।—না, আমি সইবো না। সইতে পারবো না। কী ভেবেছে সব ? একে একে সরে পড়বে ? বড় সেয়ানা হয়ে উঠেছে ? ঠেঙিয়ে পা খোঁড়া করে দেব।

প্রমীলাবালার কথাগুলি ছেঁড়াছেঁড়া, খাপছাড়া। মনের ভেতর কিসের যেন একটা বেদনা ফুটছে—তারই আলোড়নে এক একটী বিলাপের বুদ্বুদ ফুটে উঠেছে।

—তার চেয়ে চোখের সামনে মরুক্। সাজিয়ে শ্মশানে পাঠিয়ে দেব—কিছু বলবো না।

মীনু প্রমীলাবালার মুখ চেপে ধরলো।—এসব কী বলছো মা। তুমি দিন দিন কী হচ্ছো?

—যতী! যতী! যতী!

প্রমীলাবালা এর বেশী আর বলতে পারলেন না। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে মেজের ওপরেই শুয়ে পড়লেন। মীনু একটা বালিশ এনে মাথার নীচে গুঁজে দিল। হাতপাখা দিয়ে একটানা বাতাস করে চললো।

তেমনি একটানা কেঁদে চললেন প্রমীলাবালা। চেঁচিয়ে কাঁদতে পারেন না। একটা অসহায় আর্ত্তস্বর ভাঙা দেউলের নির্জ্জনতায় ফুঁপিয়ে যেন গান করতে থাকে।

শুভা যেন এতক্ষণ একটা নাটক দেখছিল। এ-রহস্য তার কাছে দুর্বোধ্য। জেঠাবাবুর বাড়ীর সব ব্যাপার যেন কিরকম! জেঠাবাবুকে কেনই বা থানায় ডেকে নিয়ে যায়! অমিদা কোথায় গেল? যতীদার জন্য জেঠীমা কাঁদেন কেন? কেন যতীদা বাড়ী আসে না? মঞ্জুদি এত সুন্দর দেখতে, বয়স হয়েছে—তবু তার বিয়ে হয় না। মীনুদির চোখ খারাপ হতে চলেছে—চসমা দিয়েও ভাল দেখতে পায় না। তবু দিন রাত পড়ে। কেন?

তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে, মাথায় একবার চিরুণী বুলিয়ে, বাগানের পথে জেঠাবাবুর বাড়ীর দিকে চললো শুভা। আজ ভোর থেকেই জেঠাবাবুর বাড়ীর বহুদিনের একটা ঘুমন্ত রহস্য হঠাৎ জেগে মুখর হয়ে উঠেছে। কী ব্যাপার, জানতেই হবে।

ক্রমশঃ

ভারতবর্ষ ও সমাজতন্ত্রবাদ

হুমায়ুন কবির

সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমস্ত পৃথিবী সংগঠিত না হলে যে মানুষের কল্যাণের কোন সম্ভাবনা নাই, এ বিষয়ে বর্ত্তমানে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বোধ হয় সকলেই এক মত। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে যে রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক নৈরাজ্য, তার ফলে মানুষের জীবন পদে পদে ব্যাহত ও বঞ্চিত। সাম্রাজ্যবাদীর নির্লজ্জ লোভ মানুষকে পণ্যে রূপান্তরিত করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞানকে ভিত্তি না করে বরং মানুষকে শোষণের ভিত্তিতেই ইয়োরামেরিকার তথাকথিত সভ্যতা গড়ে উঠেছে। তার ফলে দেশের সঙ্গে দেশের সংঘর্ষ, জাতির প্রতি জাতির বিদ্বেষ এবং রাষ্ট্রের মধ্যেও শ্রেণী-শাসন ও শোষণের বীভৎস প্রকাশ। যতদিন মানুষ মানুষকে শোষণ করবে, ততদিন আন্তর্জাতিক ও অন্তর্জাতিক শোষণের শেষ নাই। যতদিন মানুষ মানুষকে দাস করে রাখবে, ততদিন মানুষের দুঃখ ও দৈন্যের অবসান হতে পারে না। বর্ত্তমানে জ্ঞানবিজ্ঞানের যে শ্রীবৃদ্ধি, তার ফলে এ সংঘর্ষ আরো ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর চল্লিশ বৎসর না পেরোতেই যে দুটী মহাযুদ্ধে পৃথিবী আন্দোলিত হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি ঘটলে সভ্যতার ধ্বংস যে অনিবার্য্য সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। অথচ বর্ত্তমান সামাজিক পরিস্থিতি না বদলালে যুদ্ধ বন্ধ করাও অসম্ভব। গত মহাযুদ্ধের পরে জার্ম্মাণীকে নিরস্ত্র করা হয়েছিল, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। নেপোলিয়নের যুগেও একবার জার্ম্মাণীকে নির্ব্বল করবার চেষ্টা হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও নেপোলিয়নের পরাজয় সাধন জার্ম্মাণ সাহায্যেই সম্ভব হয়েছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধের পরেও জার্ম্মাণীকে নিরস্ত্র করবার চেষ্টা যে পূর্ব্বের চেয়ে বেশী সার্থক হবে, তা মনে করবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

বস্তুতপক্ষে কোন দেশবিশেষকে এ রকম ভাবে নিরস্ত্র বা নির্ব্বল করবার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। পৃথিবীর কোন দেশ যে স্বভাবত শ্রেষ্ঠ অথবা কোন দেশ স্বভাবত অপকৃষ্ট, তা মনে করবার কোন কারণ নাই। ইতিহাসও আমাদের শেখায় যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশ পৃথিবীর নেতৃত্ব করেছে, এবং যে যুগে যে দেশে নেতৃত্ব এসেছে, তখন সর্ব্ব বিষয়েই সে দেশ শ্রেষ্ঠতার দাবী করেছে।

অনেকেই ভাবেন যে ইয়োরোপের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এশিয়া বুঝি স্থান পায় না—তাঁরা ভুলে যান যে ইয়োরোপের নেতৃত্ব অত্যন্ত সাম্প্রতিক। গত দু-তিন শো বছর হয়তো সমরনীতি, বাণিজ্য, শিল্প ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ইয়োরোপিয়েরা এশিয়াবাসীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলা চলে কিন্তু ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেও এই সমস্ত ক্ষেত্রেই ইয়োরোপবাসী বিনা প্রশ্নে আরব বা মুরদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছে। হয়তো কেউ সন্দেহ করতে পারেন যে আফ্রিকার নিগ্রো ইয়োরোপ বা এশিয়াবাসীর তুলনায় স্বভাবতই নিকৃষ্ট—আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সভ্যতায় তাদের তেমন উল্লেখযোগ্য দান নাই। এক হাজার বছর আগে বর্ত্তমানের সভ্যতাভিমানী ইংরেজ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা চলত—সে সময় পর্য্যন্ত পৃথিবীর সভ্যতাভাণ্ডারে তাদের উল্লেখযোগ্য দান কিছুই ছিল না বল্লে বোধ হয় বিশেষ অত্যুক্তি হয় না।

কোন বিশেষ জাতিকে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট মনে করবার কোন কারণ নাই, এবং কোন বিশেষ জাতির দোষে অথবা অপরাধের জন্যই যে যুদ্ধ বাধে একথা মনে করা সমানই ভুল। যুদ্ধ কোন একটা কারণে বাধে না—সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে সমস্ত ত্রুটী ও গ্লানি সঞ্চিত রয়েছে, সেগুলি যখন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠে, তখন যুদ্ধ বা বিপ্লব ভিন্ন তাদের নিরশনের অন্য কোন উপায় থাকে না। ব্যক্তি বা জাতি যুদ্ধ অথবা বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে না—বড় জোর বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। তাই বর্ত্তমান যুদ্ধান্তে জার্ম্মাণী ও জাপানকে নিরস্ত্র করতে পারলেই যে পৃথিবীর সমস্যার সমাধান হবে একথা মনে করার মতন ভুল আর দ্বিতীয় নাই।

প্রতি দেশেই আমরা দেখি যে একদিকে বিলাসের প্রাচুর্য্য ও প্লাবন এবং অন্যদিকে অভাব যন্ত্রণার নিদারুণ নিপীড়ন। সমাজের এ অসুস্থ অবস্থায় সমাজে শান্তি থাকতে পারে না, এবং সমাজের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত অশান্তি, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সংঘর্ষে তাই আত্মপ্রকাশ করে। এ অস্বাভাবিক অব্যবস্থার ফলে সমাজে কল্যাণের আদর্শ নিষ্ক্রিয় ও অর্থহীন, মুনাফার লোভ সবল ও সক্রিয়। গত ১৯৩০—৩২ সালে যখন পৃথিবীময় অর্থসঙ্কট এসেছিল, তখন দেখা গিয়েছে যে সে দুর্দ্দিনেও ব্যসনের ব্যবসায়ে মুনাফার মাত্রা কমেনি। বিলেতে কাপড়ের কল বন্ধ হয়েছে কিন্তু মদের ভাঁটী এবং ফোটোগ্রাফীর কারখানা পূরোদমে চলেছে। বর্ত্তমানে আমরা দেখি যে ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে অত্যাচারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, অথচ অষ্ট্রেলিয়ায় খাদ্যশস্য রাখবার জায়গা নেই বলে গম

পুড়িয়ে অথবা সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কেবলমাত্র জাহাজের অভাবে যে এ অবস্থা ঘটেছে, তাও বলবার উপায় নেই। জাহাজ অথবা যানবাহনের প্রশ্নই যদি একমাত্র প্রশ্ন হ'ত, তবে বিলেতে খাদ্যশস্যের অবস্থা ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক বেশী সঙ্গীন হতে বাধ্য। বিলেতের খোরাকের চার আনাও দেশে উৎপন্ন হয় না, এবং বাকী বারো আনা যে পথ দিয়ে আনা হয়, ডুবোজাহাজ ও উড়োজাহাজের উৎপাতে সে রকম বিপদসঙ্কুল বাণিজ্য-পথ পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই। ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করে বাঙলা তার খোরাকের প্রায় চৌদ্দ আনা নিজে উৎপন্ন করে, এবং বাইরে থেকে খোরাক আনতে হলে যে পথে আনতে হবে, সে পথে শত্রুর দৌরাত্ম্য সে তুলনায় তুচ্ছ, একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। অথচ বিলেতে খোরাকীর খরচ টাকায় চার আনাও বাড়েনি, আর বাঙলাদেশে ধানচালের দাম বেড়েছে সাত আট গুণ।

দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় তাই আমরা দেখি যে সমাজের কল্যাণ বা প্রয়োজন দিয়ে সমাজ ব্যবস্থার সংগঠন হয়নি, বরং ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের হিসাবেই সমাজ চালিত হচ্ছে। তার ফলে যে কেবল রাষ্ট্র বা সমাজের অভ্যন্তরে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ জমে উঠে তা নয়, এই অব্যবস্থা আন্তর্জাতিক বা আন্তর্রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাকেও বিষাক্ত করে তুলেছে। যে সমস্ত ব্যক্তি বা শ্রেণী নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য স্বজাতি বা স্বদেশবাসীকে বিসর্জ্জন দিতে ইতঃস্তত করে না, তারা যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিদেশী বা ভিন্ন জাতিকে শোষণ করবে, তাতে বিচিত্র কি? ব্যক্তিগত লাভের লোভ সমাজের অভ্যন্তরে যে লালসার সৃষ্টি করে, সাম্রাজ্যবাদ বা পরদেশ লুণ্ঠন যে তারই স্বাভাবিক অভিব্যক্তি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতপক্ষে শোষণের ইচ্ছাই বিদেশ জয় ও শাসনের ভিত্তি, এমন কি দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায়ও এ শোষণ-মনোবৃত্তির আভাষ মেলে।

বিভিন্ন সাম্রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করলেও একথা স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। কখনো জাতির লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায়, কখনো বা সামরিক মর্য্যাদার লোভে, কখনো বা ধর্ম্মপ্রেরণার প্রাবল্যে নতুন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছে মনে হতে পারে, কিন্তু এ সমস্ত দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রেও যদি আমরা নব নব সাম্রাজ্য সৃষ্টির প্রকৃত কারণ খুঁজতে চেষ্টা করি, তবে দেখব যে সর্ব্বত্রই অর্থনৈতিক প্রয়োজন প্রকাশ্য বা পরোক্ষ-ভাবে জনগণকে উত্তেজিত ও উদ্বেলিত করেছে। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি অর্থ-নৈতিক, একথা তাই অত্যুক্তি নয়, এবং সমাজের আর্থিক সংগঠন, প্রকৃতি ও রূপ না বদলালে যে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটতে পারে না একথাও নিঃসন্দেহ।

সাম্রাজ্যবাদের অবসান না হলে যে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন হতে পারে না, সে কথাও কি আজ বোঝাবার প্রয়োজন আছে? এটা স্বাভাবিক মানবধর্ম্ম যে যদি অত্যাচারের ফলে অত্যাচারীর শ্রীবৃদ্ধি দেখা যায়, তবে অত্যাচারী-মনোবৃত্তি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। সাম্রাজ্যবাদের সুবিধা যারা পূরোপূরি ভোগ করেছে, সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিতে নিজেদের জাতির জীবনের উৎকর্ষ সাধন করেছে, তারা যদি অন্যকে সাম্রাজ্যবাদ বর্জ্জন করতে বলে তাহলে তা উপহাসের মত শোনায়। কাজেই যতদিন পৃথিবীতে একটী দেশও পরাধীন থাকবে, ততদিন সাম্রাজ্যবাদের স্বাভাবিক অনুসঙ্গ হিসাবে যুদ্ধবিগ্রহের অবসান হওয়াও অসম্ভব। সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা, সাম্রাজ্যবাদী পৃথিবীতে গণতন্ত্রেরও স্থান নাই।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টান্ত দেখলেই একথা স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। ইংরেজের লোক সংখ্যা গত দুইশো বছরে যে ভাবে বেড়েছে পৃথিবীর কোথাও তার তুলনা মেলে কিনা সন্দেহ। ১৭০০ সালে ইংলণ্ডের লোক সংখ্যা ছিল ষাট লক্ষের সামান্য কম এবং ১৯০০ সালে সেই লোকসংখ্যা প্রায় চারকোটি পার হয়ে গেছে। দুইশো বছরে কেবল লোকসংখ্যা যে ছসাতগুণ বেড়েছে, তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের সামাজিক সম্পদ ও ব্যক্তিগত আয়ও অসম্ভব ভাবে বেড়ে গেছে। বিলেতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের আলোচনা করলে দেখা যায় যে উনিশ শতকের গোড়াতেও গ্রামে শতকরা দুয়েক জনের বেশী লোকের ভাগ্যে সপ্তাহে একদিন মাংস জুটত কিনা সন্দেহ, আথচ একশো বৎসরের মধ্যে অবস্থার এমন পরিবর্ত্তন হয়ে গেল যে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বেকারের ভাগ্যেও সপ্তাহে প্রায় চোদ্দ টাকা অর্থাৎ মাসিক ৬০ টাকা সরকারী ভাতা জুটেছে। এটাও লক্ষ্যণীয় যে পলাশীর যুদ্ধের কিছুদিন আগে থেকেই সৌভাগ্যোদয়ের সূচনা দেখা দিলেও পলাশীর যুদ্ধের পরেই ইংরেজের সৌভাগ্যের জোয়ার প্রবল হয়ে উঠল। যে বস্ত্রশিল্পের দৌলতে ইংরেজের সাম্প্রতিক প্রতিষ্ঠার সূচনা, তারও ভিত্তিতে রয়েছে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিয় অবনতি। যে ভাবে আইন করে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের প্রসার কেবলমাত্র ইংলণ্ডে নয়, সমস্ত ইয়োরোপে কমানো হয়েছিল—তার ইতিহাস স্মরণ করলে ইংরেজ অর্থনৈতিকের তথাকথিত স্বাধীন শিল্পবাণিজ্য বা ফ্রী-ট্রেডের কথা উপহাস মনে হয়। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে দক্ষিণ আমেরিকার স্বর্ণ ভাণ্ডার ইংরেজের অর্থনৈতিক সংগঠনে সহায়তা করে থাকলেও অষ্টাদশ শতকের শেষার্দ্ধে ইংরেজের যে অকস্মাৎ এবং অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি, তার মূলে ভারতীয় সম্পদের ব্যবহার ও শোষণ। ১৭৫৭ সালে পলাসীর যুদ্ধ, এবং ১৭৬৭ সাল থেকেই ইংরেজের বস্ত্রশিল্পের অগ্রগতির সুরু,

যন্ত্রশিল্পে নিত্য নব আবিষ্কারের আরম্ভ। এ যোগাযোগকে আকস্মিক মনে করার কোন কারণ নাই, এবং ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের কার্য্যকলাপের যে তদন্ত ও বিচার সে সময় হয়েছিল, তাতে একথা নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে যে ভারতীয় অর্থ সম্পদই ইংরেজ রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন জুগিয়েছে। আমেরিকার সোনার খনির চেয়েও ভারতবর্ষ ইংরেজের পক্ষে অধিক লাভজনক সোণার খনি হয়ে দাঁড়াল।

সে অবস্থার আজো পুরোপুরি পরিবর্ত্তন হয়নি। এখনো ইংরেজের জাতীয় সম্পদের চারি আনা ভারতবর্ষ থেকে সংগৃহিত—এখনো ভারতীয় কাঁচা মাল ইংরেজের জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির ভিত্তি এবং সেই সোনার খনি রক্ষার উদ্দেশ্যে সমস্ত যোগাযোগের পথে নিরাপদ করবার জন্যই মিসরে ইংরেজের আধিপত্য, প্যালষ্টাইনে ইহুদি আরবে বিবাদ সৃষ্টি এবং এডেন অধিকার—এক কথায় সমগ্র প্রাচ্যের উপর ইংরাজের প্রভুত্ব ও আধিপত্যের প্রয়োজন। শুধু তাই নয়। ইংরেজ ভারত-সাম্রাজ্যের বলে পৃথিবীতে যে রাষ্ট্রক্ষমতা ও নিজের দেশে যে আর্থিক সম্পদের অধিকারী, তার দৃষ্টান্তে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও সাম্রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি, কলহ। একথা বল্লে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না যে সাম্রাজ্য, উপনিবেশ এবং তার ফলে যে প্রতিপত্তি, তারই আশঙ্কা অথবা ঈর্ষা গত দেড়শো দুইশো বছরের সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ ও সংগ্রামের মূল। সাম্রাজ্যের অধিকার নিয়েই বিপ্লবী ফরাসীর সঙ্গে ইংরেজের সংঘর্ষ। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যই ইংরাজের সঙ্গে গত শতকে রুষদেশের এবং বর্ত্তমানে শতকে জার্ম্মানির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাত। সেই সাম্রাজ্যের লোভেই আফ্রিকা ভাগাভাগি নিয়ে ইয়োরোপিয় শক্তিদের নির্ল্লজ্জ ও উলঙ্গ কলহ। ব্যক্তিগত সম্পত্তির লোভে দেশ ও রাষ্ট্রের মধ্যে শ্রেণীর দ্বারা শ্রেণীর অত্যাচার এবং তারই বৃহত্তর অভিব্যক্তি হিসাবে জাতি ও দেশের দ্বারা ভিন্ন জাতি ও দেশের স্বাধীনতা হরণ ও শোষণ। কালে সাম্রাজ্যবাদী দেশের শোষিত শ্রেণীও নিজের দুরবস্থার কথা ভুলে যায়, কারণ শাসক শ্রেণী দেখে যে সাম্রাজ্য থেকে আহরিত ধনসম্পদের খানিকটা অংশ দেশের শোষিত শ্রেণীর মধ্যে না ছড়ালে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিপ্লবের ফলে কেবল যে সাম্রাজ্য ধ্বংস হবে, তা নয়, দেশের অভ্যন্তরেও সামাজিক সংস্থিতি রূপান্তরিত হয়ে ব্যক্তি সম্পত্তি বিলুপ্ত হবে।

ব্যক্তি সম্পত্তি ও মুনাফার লোভ তাই বর্ত্তমান পৃথিবীর দুর্গতির প্রধান কারণ অথচ বর্ত্তমান পৃথিবীতে এ দুর্গতির কোন সার্থকতা বা প্রয়োজন নাই। মানুষ যখন প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করতে পারেনি, সেদিন ব্যক্তি সম্পত্তি বা মুনাফার

হয়তো প্রয়োজন ছিল, কারণ তা নইলে তখন মানুষের সমাজে উন্নতি বা অগ্রগতির সম্ভাবনা থাকতনা। বর্ত্তমানে প্রাকৃতিক শক্তির শৃঙ্খলনে সমস্ত মানুষের জন্যই প্রাচুর্য্যের সম্ভাবনা রয়েছে। আধুনিক যুগে ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য বা মুক্তির জন্য অন্যকে পদানত রাখবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রাচীন যুগে মানুষের যে অর্থনৈতিক দাসত্ব, তার সমর্থন না করলেও তা বোঝা যায়, কিন্তু বর্ত্তমান জগতে দাসত্বের অস্তিত্ব কেবল নিরর্থক নয়, তা মানুষের বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রাকৃতিক শক্তিকে শৃঙ্খলিত করার ফলে আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমস্ত মানুষের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা চলে। একমাত্র ব্যক্তি সম্পত্তি ও তারই অর্থনৈতিক প্রকাশ ধনতন্ত্র ও রাজনৈতিক অভিব্যক্তি সাম্রাজ্যবাদ সেই পরিণতির পরিপন্থী। পৃথিবীর যুদ্ধ বিগ্রহ ও অশান্তির মূলও এইখানে।

পৃথিবীতে যাঁরা শান্তি স্বাধীনতা ও উন্নতির যুগ আনতে চান, তাঁদের প্রথম কর্ত্তব্য ব্যক্তিসম্পত্তি ও সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস। ব্যক্তি সম্পত্তি ধ্বংসের জন্য প্রয়োজন দেশে দেশে বিপ্লব কিন্তু সেই বিপ্লবী মনোবৃত্তি গড়তে হলে তার পূর্ব্বে প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা অপরিহার্য্য। তাই বর্ত্তমান পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের যাঁরা সমর্থক, সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটান তাঁদের প্রথম কর্ত্তব্য। পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ লোকের ভারতবর্ষে বাস, চীনদেশের লোকসংখ্যা বোধ হয় আরো বেশী, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক লোকের বাসভূমি বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যবাদের কবলে। কেবল লোক সংখ্যার দিক দিয়ে নয়, প্রাকৃতিক সম্পদেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম অংশগুলি বর্ত্তমানে পরপদানত বলে স্বভাবতই বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যে তারা দ্বন্দ্ব ও কলহের লক্ষ্য। পৃথিবীর অর্দ্ধেক মানুষ যতদিন পরাধীন হয়ে থাকবে, ততদিন সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র আকাশ কুসুম থাকতে বাধ্য।

২

এ কথা যাঁরা স্বীকার করেন, তাঁরাও অনেকে বলে থাকেন যে বর্ত্তমানে পৃথিবীতে যে মহাযুদ্ধ চলছে, তার ফলে যে সমস্ত শক্তি কার্য্যকরী, তাদের প্রভাবে বিশ্বমানুষের মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের জয় অনিবার্য্য। তাঁরা এ কথাও বলে থাকেন যে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রকৃতি পূর্ব্বেকার সমস্ত যুদ্ধ থেকে স্বতন্ত্র—তাঁদের মতে বর্ত্তমানের যুদ্ধ জনযুদ্ধ, এবং জনযুদ্ধের অবসানে জনগণের জয় অনিবার্য্য। জনযুদ্ধ বলতে যদি বোঝায় যে জনসাধারণের সে যুদ্ধে যোগ রয়েছে, তবে পৃথিবীতে যত যুদ্ধ হয়েছে, সেগুলি সবই জনযুদ্ধ—জনগণ যোগ

না দিলে কোনদিন কোন যুদ্ধ চলতে পারে না। জনযুদ্ধের অর্থ যদি হয় যে জনগণ নতুন অধিকার লাভের জন্য যুদ্ধে ব্রতী, তবে কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ জনযুদ্ধ নয়। জনগণের কোন নতুন স্বার্থ বা অধিকার লাভের জন্য ইংরেজ এ যুদ্ধ ঘোষণা করেনি, —নিজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের খাতিরেই তার যুদ্ধে যোগদান। যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধেও একথা অনেক পরিমাণে সত্য—যুক্তরাষ্ট্র আক্রান্ত হওয়াতেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, এবং সেখানেও পৃথিবীর জনগণের মুক্তি অথবা নতুন কোন অধিকার অর্জ্জনের আদর্শ নাই। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার অনেক কথা অবশ্য ইংরেজ ও আমেরিকান রাষ্ট্রনেতারা বলেছেন, কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের দৃষ্টিতেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিচার হয়েছে। ইয়োরোপিয় ভূখণ্ডে একক কোন শক্তির প্রভুত্ব ইংরেজ ও মার্কিণ উভয় রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক —তাই ইয়োরোপিয় ভূখণ্ডে বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতার কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। চীন দেশে জাপান সাম্রাজ্যবাদের সংঘাতের যে আশঙ্কা, তারই প্রত্যুত্তর হিসাবে চীনের স্বাধীনতাও মিত্রপক্ষের সমরলক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু যে সমস্ত দেশ মিত্রপক্ষের পদানত, তাদের স্বাধীনতার ঘোষণা মিত্রপক্ষের সমরলক্ষ্যের মধ্যে স্থান পায় নাই। চার্চ্চিল সাহেব তো স্পষ্টই বলেছেন যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের উদ্দেশ্যে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদগ্রহণ করেন নাই।

এমন কি রুষ দেশের ক্ষেত্রেও বর্ত্তমান যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলা চলে কিনা সন্দেহ। ষ্টালিন নিজে বহুবার বলেছেন যে বর্ত্তমান যুদ্ধ সোভিয়েট রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার যুদ্ধ—বারম্বার তিনি শ্লাভজাতিদের সংহত করে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতে সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন। হিটলারের সঙ্গে তিনি যে অনাক্রমণ-চুক্তি সম্পন্ন করেছিলেন, হিটলার সে চুক্তি লঙ্ঘন করাতেই রুষ ও জার্ম্মানীর মধ্যে যুদ্ধ। যদি হিটলার সে চুক্তি রক্ষা করে চলতেন, তবে ষ্টালিনের মতে রুষ দেশের দিক থেকে জার্ম্মানীকে আক্রমণের কোন প্রশ্ন উঠ্‌ত না। অর্থাৎ ষ্টালিন প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন যে নাৎসি জার্ম্মানীর স্বরূপ যাই হোকনা কেন, নাৎসি জার্ম্মানীর আক্রমণে অন্যত্র মানুষের অধিকার যতই ক্ষুণ্ণ হোক না কেন, তা সত্ত্বেও রুষ দেশকে আক্রমণ না করলে নাৎসি জার্ম্মানীর প্রতি সোভিয়েট রাষ্ট্রের কোন আক্রোশ অথবা প্রতিকূল ভাব থাকত না। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কেউ কেউ বলে থাকেন যে সাম্রাজ্যবাদ যতই অবাঞ্ছনীয় হোকনা কেন, নাৎসি-বাদ তার চেয়েও মারাত্মক, কাজেই সাম্রাজ্যবাদ ও নাৎসিবাদের সংঘর্ষে সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করা প্রত্যেক সমাজতন্ত্রীর কর্ত্তব্য। ষ্টালিন কিন্তু সে কথা

বলেন নাই জাপানকেও আক্রমণ করেন নাই—বরং তাঁর কথায় ও কাজে এই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সাম্রাজ্যবাদ ও নাৎসিবাদের সংঘর্ষে সোভিয়েট রাষ্ট্র নিরপেক্ষ, সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে এক পা অগ্রসর হতেও সোভিয়েট রাষ্ট্র অনিচ্ছুক। জার্ম্মানী আক্রমণ না করলে সোভিয়েট তাই যুদ্ধে নিরপেক্ষই থাকত। কাজেই সোভিয়েট রাশিয়ার যুদ্ধকেও বিশ্বমানবের মুক্তির যুদ্ধ অথবা জনগণের অধিকার সম্প্রসারণের যুদ্ধ বলা চলে না—সে যুদ্ধও একান্তভাবে সোভিয়েটের রাষ্ট্রিয় স্বাধীনতা ও আত্মরক্ষার যুদ্ধ।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের বর্ত্তমান যুদ্ধ যে জনযুদ্ধ নয়, তার আরো কতগুলি লক্ষণ মেলে। সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়ক ষ্টালিন অনেকবার ঘোষণা করেছেন যে স্বদেশ রক্ষা করাই প্রত্যেক সোভিয়েট নাগরিকের কর্ত্তব্য, এবং সে ব্রত উদ্‌যাপন হলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বাহিরে পৃথিবীময়, কিংবা অন্ততপক্ষে ইয়োরোপময় বিপ্লব সাধনও সোভিয়েটের সমর লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। সোভিয়েটের সমস্ত কর্ম্মরীতিরই যাঁরা সমর্থক, যাঁরা মনে করেন যে ষ্টালিন ভুল করতে পারেন না, সে রকম গুরুবাদী না হয়েও সোভিয়েটের পক্ষ থেকে হয়তো বলা চলে যে ষ্টালিনের এ সমস্ত ঘোষণাই কূটনৈতিক চাল। এমনিতেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইংরেজ সাম্রাজ্য সোভিয়েট সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ এবং সোভিয়েট প্রভাবের প্রসারের আশঙ্কায় আতঙ্কিত, কাজেই সেক্ষেত্রে যদি ষ্টালিন ঘোষণা না করেন যে সোভিয়েট বহির্ভূত কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সোভিয়েট হাত দেবে না, তবে রুজভেল্ট বা চার্চ্চিল তাকে সাহায্য করবেন কোন ভরসায়? এবং বর্ত্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্রের যে সঙ্কট, সে বিপদের দিনে রুজভেল্ট চার্চ্চিলের সাহায্য ভিন্ন সোভিয়েটের অস্তিত্ব রক্ষাও সম্ভব নয়।

এ কথার মূলে হয়তো যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু একটা প্রশ্নের তবু মীমাংসা হয় না। ষ্টালিনের মনে যাই থাকনা কেন, যে প্রকাশ্য উদ্দেশ্যের জন্য বর্ত্তমানে সোভিয়েটের যুদ্ধ, সে উদ্দেশ্যের মধ্যে পৃথিবীর নিপীড়িত জনগণের স্থান্ নাই। কেবল তাই নয়, ষ্টালিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিশ বৎসরের জন্য যে সন্ধি করেছেন, তার অন্যতম প্রধান সর্ত্ত যে সন্ধিকামী শক্তি দুইটীর মধ্যে কেউ অন্যের কোন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। ভারতের এবং অন্যান্য উপ-নিবেশের রাষ্ট্রিক মুক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের মধ্যে অন্যতম প্রশ্ন। কাজেই সোভিয়েট রাষ্ট্র নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই অন্ততঃ কুড়ি বৎসরের জন্য পৃথিবীর নিপীড়িত জনগণের প্রায় এক চতুর্থাংশের অধিকার বা স্বাধীনতার জন্য

কোন উদ্যোগ করতে পারবে না। সে সঙ্গে একথা বলাও প্রয়োজন যে ষ্টালিন সোভিয়েট বহির্ভূত জার্ম্মাণ অধ্যুষিত যে সমস্ত দেশ বা জাতির সহায়তা বর্ত্তমানে কামনা করেন, তাদের মধ্যে অনেকের কাছেই তাঁর আবেদনের ভিত্তি শ্লাভ জাতীয়তা বোধ। অর্থাৎ শ্রমিকবিপ্লবের আহ্বান, অথবা নিপীড়িত জনগণের মুক্তি সংগ্রামের পরিবর্ত্তে বিভিন্ন শ্লাভ জাতির মধ্যে আত্মীয়তা ও রক্তের যোগকেই তিনি আত্মরক্ষার প্রবলতর অস্ত্র মনে করেছেন। বাস্তব দৃষ্টিতে এ সমস্তেরই সমর্থন থাকতে পারে—বর্ত্তমানে হয়তো দুনিয়ার মজদুরের ঐক্যবোধের চেয়ে জাতীয়তার আহ্বানই অধিক কার্য্যকরী, কিন্তু এ স্বীকৃতির প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে বর্ত্তমানের যুদ্ধে সোভিয়েট রুষেরও কোন বিপ্লবী বা জনস্বার্থ সম্প্রসারণের ভূমিকা নাই। সম্প্রতি তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অবসানে সেই কথাই আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে, এবং এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না যে যুক্তরাষ্ট্রের এবং বিলাতের পুঁজিপতিদের বাস্তব অথবা কল্পিত আশঙ্কা দূর করবার জন্যই তৃতীয় আন্তর্জাতিকের এ ইচ্ছামৃত্যু।

কেউ কেউ বলেন যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের অগ্রগতির সঙ্গে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক মনোবৃত্তি ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য, এবং তার ফলে যুদ্ধান্তে সমস্ত দেশেই সাম্যবাদী বা অন্ততঃপক্ষে প্রগতিশীল রাষ্ট্রের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। তাঁরা আরো বলেন যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিজয়ের সম্ভাবনা স্পষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মানী এবং অধিকৃত ইয়োরোপে সাম্যবাদী বিপ্লবের সম্ভাবনাও দেখা দিবে। যদি জার্ম্মানীতে সোভিয়েট রাষ্ট্র স্থাপিত হয়, তার ফলে ইয়োরোপের সর্ব্বত্র সাম্যবাদের জয় অবশ্যম্ভাবী, এবং বিলেত ও আমেরিকাতেও সাম্যবাদী বিপ্লব সম্ভব হয়ে উঠবে। সে সময়ে যদি এ দুটী দেশের ধনতান্ত্রিক নেতৃত্ব এরকম রূপান্তরে বাধা দিতে চেষ্টা করে, তবে সে চেষ্টাও ব্যর্থ হতে বাধ্য—জাগ্রত জনমতের সামনে প্রতিক্রিয়াশীল পুরাতন নেতৃত্ব বন্যাস্রোতে তৃণখণ্ডের মতন ভেসে যাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁরা বলেন যে বিলেতেও ধনতান্ত্রিকদের মনোনীত চেম্বারলেনকে সরে দাঁড়াতে হল—তাঁর স্থলে যুদ্ধকালীন নেতা হিসাবে চার্চ্চিলের আবির্ভাব বিপ্লবী জনমতের সার্থকতার সাক্ষী।

এ ধরণের যুক্তি আপাতদৃষ্টিতে ত্রুটীহীন মনে হয়, কিন্তু ধীর ভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে যুক্তিগুলির প্রত্যেকটীই ভ্রান্ত এবং অগ্রহণীয়। একথা সত্য যে যুদ্ধে সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রকৃত জয় হলে ইয়োরোপে সাম্যবাদের বিজয় প্রায় অনিবার্য্য হয়ে দাঁড়াত, কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে সোভিয়েটই প্রকৃত বিজয়ী হতে পারে কিনা, সে সম্বন্ধে অনেক আশঙ্কা ও সন্দেহ রয়েছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মান

রণযন্ত্রের প্রধান আঘাত সোভিয়েট বাহিনীকেই সহ্য করতে হয়েছে, এবং এখনো সোভিয়েট শক্তিক্ষয়ের ভিত্তিতেই জার্ম্মানীর পরাজয়-পরিকল্পনা। এ ব্যবস্থায় সোভিয়েটও যে দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে, সে সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ করা চলে? সে তুলনায় আমেরিকা, বা ইংলণ্ডের কি পরিমাণ শক্তি ব্যয় হয়েছে? আমেরিকার তো কথাই নাই, সমস্ত রকম বাইরের আক্রমণমুক্ত ও বাধাবিহীন অবস্থায় আমেরিকা নিজের শক্তি বাড়িয়ে চলেছে, এবং দিন দিন আমেরিকার শক্তি বাড়ছে বই কমছে না। ইংলণ্ডও ১৯৪০-৪১ সাল পর্য্যন্ত যে আঘাত সহ্য করেছে, গত দু তিন বছরে ধীরে ধীরে তা কাটিয়ে উঠে নতুন ভাবে নিজের শক্তি গঠনে মন দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে এটাও বিবেচনার বিষয় যে ডানকার্কের পরে ইংরাজের প্রায় ৪০ লক্ষ নতুন সৈন্য শিক্ষিত ও সুসজ্জিত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও খাস বিলেত রক্ষার জন্য মার্কিন সৈন্যের আমদানী কেন? বিভিন্ন রণক্ষেত্রে ভারতীয় এবং ঔপনিবেশিক সৈন্যের ব্যবহারই বেশী হয়েছে—এই ৪০।৫০ লক্ষ সৈন্য আজ পর্য্যন্ত কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে বলে শোনা যায়নি। পশ্চিম থেকে ইয়োরোপ আক্রমণ এবং যুদ্ধান্ত ব্যবস্থার কথা স্মরণ রেখেই যে ইংরেজ নিজের শক্তি সংরক্ষণ করে চলেছে, এ বিষয়ে কি সন্দেহ করা চলে? সোভিয়েটের জনবল, ধনবল, শিল্পশক্তি, কৃষিসম্পদ সমস্তই যে ভাবে ধ্বংস হচ্ছে, তাতে সামরিক শক্তিতে যুদ্ধান্তে সোভিয়েট রাষ্ট্র মার্কিণ বা ইংরেজের চেয়ে দুর্ব্বল হয়ে পড়বে, একথা প্রায় নিঃসন্দেহ এবং সে ক্ষেত্রে সোভিয়েটের ইচ্ছা বা পরিকল্পনা কতখানি সার্থক হবে, তা-ও সন্দেহের বিষয়। সে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে সোভিয়েট রাষ্ট্র ঘোষণা করেছে যে অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সোভিয়েটের কোন বক্তব্য থাকবে না এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অবসান সোভিয়েটের সেই ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছুক সিদ্ধান্তেরই বহিপ্রর্কাশ।

এ সমস্ত কথা স্বীকার করে নিয়েও অনেকে বলেন—বর্ত্তমান সংগ্রাম যদি জনযুদ্ধ না-ও হয়, সোভিয়েট রাষ্ট্র যদি পৃথিবীর নির্য্যাতিত জনগণের মুক্তির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা না-ও করে থাকে, তবু বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে সোভিয়েটের জয়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রগতিশালী শক্তির বিজয় অনিবার্য্য। যুদ্ধান্তে শান্তি সম্মেলনে বিজয়ী সোভিয়েট রাষ্ট্র ভবিষ্যত পৃথিবীর রূপ নির্ণয় করবে, এবং কাজেই সোভিয়েট বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মুক্তিও অনিবার্য্য।

এ যুক্তিও বিচারে টেকে না। কারণ রাষ্ট্রশক্তিতে দুর্ব্বল দেশ সবলতর দেশকে প্রভাবান্বিত করবে, এ স্বপ্ন সফল হওয়া দুরূহ। মিত্রশক্তির বিজয়ে

যুদ্ধান্তে চার্চ্চিল যে মর্য্যাদা ও সম্ভ্রমলাভ করবেন, কোনদিন কোন ইংরেজ রাজনৈতিকের ভাগ্যে বোধ হয় তা জোটেনি। কাজেই ইংরেজ রাষ্ট্রশক্তির নির্দ্দেশ যে যুদ্ধের শেষেও তাঁর হাতেই থাকবে, এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। বিগত মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে লয়েড জর্জ্জ নেতৃত্ব হারান, কিন্তু তার পূর্ব্বেই সন্ধি এবং বর্ত্তমান যুদ্ধের বীজ রোপণ করা হয়ে গিয়েছিল। তেমনি এবারও হয়তো সন্ধির কয়েক বৎসর পরে চার্চ্চিল আসনচ্যুত হতে পারেন, কিন্তু তার পূর্ব্বে সাম্রাজ্যবাদী সন্ধি ও ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ভিত্তি তিনি যে স্থাপন করে যাবেন, তাও সমান নিঃসন্দেহ। দেশে অন্তর্বিপ্লবের ফলে তাঁর নেতৃত্ব কেউ কেড়ে নেবে, এটা স্বপ্নবিলাসীর কথা, কারণ বিজয়ী দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে না, এবং ঘটবার যদি কোন সম্ভাবনা আসেও, সে সম্ভাবনাকে কার্য্যে পরিণত করবার মতন নেতৃত্ব আমেরিকা বা ইংলণ্ডে কোথায়? জনমতের পরিবর্ত্তনে বিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত নেতৃত্ব সে পরিস্থিতির সুযোগ না নিলে কোন ফল হয় না। কেবলমাত্র নিজের শক্তিতে নেতৃত্ব যেমন সিদ্ধিলাভ করতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে নেতৃত্বের অভাবে সুবর্ণ সুযোগও অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে পরিস্থিতির সুবিধা গ্রহণের শক্তি নেতৃত্বের অর্থ। যিনি অপেক্ষাকৃত অসুবিধার মধ্যেও নিজের লক্ষ্য সাধন করতে পারেন, তিনিই নেতৃত্বের অধিকারী। যিনি তা পারেন না, তাঁকেই আমরা অযোগ্য নেতা বলি। বিলাত বা আমেরিকার বেলায় কিন্তু এ সব যোগ্যতা ও অযোগ্যতার প্রশ্ন উঠেই না, চার্চ্চিল অথবা রুজভেল্ট বিরোধী বিপ্লবী নেতৃত্বের কোন নিদর্শনই সে দেশে মেলে না। মহাযুদ্ধের বর্ত্তমানে যে পরিস্থিতি, তাতে মিত্রপক্ষের পরাজয় অসম্ভব মনে হয়—অক্ষশক্তিও বোধ হয় অসমাপ্তি বা ষ্টেলমেটের বেশী কিছু আশা করতে পারে না—কিন্তু তাতেও মোটের উপর মিত্রপক্ষেরই সুবিধা থাকবে বেশী। এ অবস্থায় বিলাত বা আমেরিকায় যাঁরা যুদ্ধান্তে বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখেন, তাঁদের আশাবাদে বিস্মিত হওয়া চলে কিন্তু তাঁদের বুদ্ধি বা বিচারের প্রশংসা করা যায় না।

এ সঙ্গে আরো একটী কথা মনে রাখতে হবে। একেই তো সোভিয়েটের ধনবল জনবল অস্ত্রবলের প্রতিদানই সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রত্যেকটী বিজয়ের মূল্য—তার উপর একথাও নিঃসন্দেহ যে বিলেত এবং আমেরিকা কোন অবস্থাতেই স্বেচ্ছায় ইয়োরোপে সর্ব্বত্র এবং বিশেষ করে জার্ম্মাণীতে সোভিয়েটের প্রসার হতে দেবে না। সেজন্য প্রথমেই সোভিয়েটের কাছে থেকে চুক্তি আদায় হয়েছে যে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সোভিয়েটের হাত

থাকবে না—এমন কি পূর্ব্ব ইয়োরোপের যে সমস্ত দেশ সোভিয়েটের প্রতিবেশী, সে সমস্ত সোভিয়েট সীমান্তদেশের বেলায়ও মিত্রপক্ষ নিজের পরিকল্পনা তৈরী করেছে, এবং সে পরিকল্পনা যে সোভিয়েট-বিরোধী, সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিবাদেই তা প্রকাশ পেয়েছে। একথাও বোধ হয় নিঃসন্দেহ যে সোভিয়েটের সে রকম বিজয়ের সম্ভাবনা দেখলে ইয়োরোপে ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য আমেরিকা যা প্রয়োজন তা সবই করবে। মিত্রশক্তির বিরোধিতা সত্ত্বেও যে সে ক্ষেত্রে ইয়োরোপে সর্ব্বত্র সোভিয়েট রাষ্ট্র গড়ে উঠবে, সে আশাও দুরাশা, কারণ অনুকূল পরিস্থিতি ভিন্ন জনমতের প্রকাশও অসম্ভব। চেম্বারলেনের পরিবর্ত্তে চার্চ্চিলের অভ্যুদয়ে যাঁরা জনমতের বিজয় দেখেন, তাঁরা ভুলে যান যে সে সময়ে বিলাতের ধনিক বণিকও জনগণের সঙ্গে এক সাথেই চেম্বারলেনকে সরাতে চেয়েছে বলেই চার্চ্চিলের বিজয়। তা নইলে যতদিন বিলাতের ধনিক সম্প্রদায় চেম্বারলেনকে সমর্থন করেছে, ততদিন জনমতের বিক্ষোভ সত্ত্বেও তাঁর শক্তি হ্রাস হয়নি। মিউনিক চুক্তি, চেকোশ্লোভাকিয়ার অবসান, আবিসিনিয়ার যুদ্ধ—প্রভৃতি ঘটনায় বারবার জনমতের শোচনীয় অপারগতা দেখা গিয়েছে। একথা হয়তো নৈরাশ্যজনক এবং দুঃখের কথা, কিন্তু তাই বলে এ বাস্তব পরিস্থিতিকে অস্বীকার করলে রাজনৈতিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

একথা সত্য যে বিগত মহাযুদ্ধের পরে বিভিন্ন দেশের রণক্লান্তি ও শ্রমিক-বিরোধিতার ফলেই মিত্রশক্তি সোভিয়েট রাষ্ট্র ধ্বংস করতে পারেনি, কিন্তু তার প্রধান কারণ যে সোভিয়েট রাষ্ট্র যেদিন স্থাপিত হল, সেদিনও জার্ম্মাণীর রণশক্তি অটুট। কেবল অটুট নয়, তখনো জার্ম্মানী বিজয়-স্বপ্ন দেখেছে। সে সময়ে প্রতিপক্ষ যে কোন একটী শক্তির সত্বর বিজয় হলে সোভিয়েট রাষ্ট্র সংগঠন ও শক্তিসঞ্চয়ের অবকাশ পেত না। বর্ত্তমানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কারণ এ মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের মধ্যে সোভিয়েটের শক্তি ক্ষয় হয়েছে বেশী। তার চেয়েও বেশী ক্ষতি হয়েছে এই যে দেশরক্ষার প্রয়োজনে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সোভিয়েট যে সূত্রে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছে, তার ফলে পৃথিবীর সকল দেশেই সংগ্রামশীল শ্রমিক-শক্তি বিশ্বসমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শচ্যুত হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতা অধিকারের ও সম্প্রসারণের আহ্বান আজ প্রবল নয়—যে অধিকার রয়েছে তার সংরক্ষণের দাবীই আজ জনমানসকে আচ্ছন্ন করেছে। বাস্তব ঘটনার বিচারে এ ব্যবস্থার হয়তো প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার ফলে বিশ্বময় শ্রমিক-কৃষকরাজের সম্ভাবনা যে পিছিয়ে গিয়েছে, সে কথাও অস্বীকার করা চলে না।

এ আলোচনার ফলে এই কথাই পরিষ্কার হয়ে ধরা দেয় যে বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলাফলেই পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধকালের মধ্যেই যদি পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হয়, বিজিত ও পশ্চাদপদ জাতিগুলি স্বরাষ্ট্র স্থাপন করে পৃথিবীর ধনসম্পদ বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি না দেয়, তবে যুদ্ধান্ত পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাব অনিবার্য্য। হয়তো সাম্রাজ্যবাদের আকৃতি বদলাবে, কিন্তু তার প্রকৃতি বদলাবে না, বরং সেই পরিস্থিতিতে আরো আশঙ্কার কারণ জমে উঠবে। একেতো যুদ্ধের ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের দুর্ব্বলতা অবশ্যম্ভাবী, এবং গত কুড়ি বৎসরের সমাজতান্ত্রিক সাধনায় কৃষিশিল্প যন্ত্রবিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারে ও মানবিক উৎকর্ষে যে উন্নতি লাভ করেছিল, তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় আবার নতুন করে সব কিছু গড়ে তুলতে হবে। অন্য দিকে সাম্রাজ্যবাদ পুরাতন ভুল ভ্রান্তি শুধরে আবার নবজন্ম লাভ করবে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রয়োজন ভারতবর্ষ ও অন্যান্য পরাধীন দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি।

স্বাধীন ভারতবর্ষ তাই কেবলমাত্র ভারতবাসীর জন্য নয়, বরং সমস্ত পৃথিবীর কৃষকশ্রমিকের মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয়। প্রাকৃতিক শক্তির উপর বর্ত্তমানে মানুষের যে দখল, তাতে পৃথিবীর সকল মানুষ সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারে। সেই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পথে একমাত্র বাধা ব্যক্তিগত ও জাতিগত লোভ ও শোষণমনোবৃত্তি, অর্থাৎ ব্যক্তিসম্পত্তি ও সাম্রাজ্যবাদ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং তার ফলে মানুষ সর্ব্বত্র আপনার মুক্তি ও সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের সম্ভাবনা খুঁজে পাবে। সেই স্বাধীনতা অর্জ্জন তাই আজ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রত্যেক মানুষের প্রথম কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্থিতি, ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সংগঠন—এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে বর্ত্তমান পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপ নির্ণয় করতে হবে, কারণ সমাজতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতবর্ষই হবে ভবিষ্যৎ বিশ্বসমাজতন্ত্রের ভিত্তি।

দাম্পত্য আলাপ

বুদ্ধদেব বসু

—অনিমেষ নয়নে যে ভদ্রমহিলার ছবিটি দেখছো, তিনি কে জানতে পারি ?

—ইনি সুষমা দত্ত, মাত্র আটাশ বছর বয়সে একটি স্বামী ও তিনটি শিশু সন্তানকে শোকসাগরে ভাসিয়ে পরলোকে প্রয়াণ করেছে।

—ও, মারা গেছে। তাই বুঝি ছবি ?

—হ্যাঁ, অন্য-কোনো কারণে নয়। যদিও খবর-কাগজে ছবি বেরিয়েছে, তবু ওঁর অবস্থাটা কেউ ঈর্ষা করবে না।

—বুঝেছি। আমরা শুধুই ঈর্ষা করি, এই তো বলতে চাও ?

—না, ঈর্ষা করবে কেন। তবে আমরা যদি কখনো কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহ'লে তোমাদের বুকের ভিতরে সঙ্গে-সঙ্গেই জ্বলুনি-পুড়ুনি শুরু হয়ে যায়, এই আর কি।

—তা যাই বলো, ভদ্রলোকের পক্ষে ভদ্রমহিলার দিকে তাকানো কি ভালো ?

—সে তো নয়ই, কারণ, ভদ্রলোকেরা তাকান খোলাখুলি সোজাসুজি দৃষ্টিতে, সেটা সকলেরই চোখে পড়ে। আর ভদ্রমহিলারা যখন ভদ্রলোকের দিকে তাকান তাঁরা করেন কটাক্ষপাত, সেটা সকলে হয়তো লক্ষ্য করে না কিন্তু 'বুকে যার বেঁধে সেই বোঝে'।

—সেই জন্যই বুঝি অকপট সরল দৃষ্টিতে আধ ঘণ্টা ধ'রে ঐ ছবিটি দেখছিলে ?

—দেখতে-দেখতে অনেক কথা মনে পড়ছিলো।

—তুমি ওঁকে তাহ'লে চিনতে ?

—অমন আঁৎকে উঠলে কেন ? চিরকাল তো আমি তোমার স্বামী ছিলুম না, আমার জীবনেও এমন দিন ছিলো যখন মেয়েদের সঙ্গে কিছু-কিছু মেলামেশা করবার সুযোগ পেয়েছি।

—নিজেকে খামকা ফাঁপিয়ে তুলো না। তুমি এমন-কিছু নও যে মেয়েরা তোমাকে দেখা মাত্র তোমার প্রেমে পড়বে।

—প্রেমে পড়ার কথা তো বলিনি। মেলামেশার কথা বলেছিলুম।

—তা এই সুষমা দত্তর সঙ্গে তোমার মেলামেশার রকমটা শুনি ?

—তখন দত্ত ছিলেন না, তখন ছিলেন মজুমদার।

—কথাটায় ঈষৎ করুণ সুর বাজলো। মনে হচ্ছে তুমি চেয়েছিলে উনি তোমার স্বগোত্র হন, সেটা না-হ'য়ে তিনি যে দত্ত হলেন সে-জন্য তুমি আজ পর্যন্ত তাঁকে ক্ষমা করতে পারোনি—অর্থাৎ ভুলতে পারোনি।

—ভুল হ'লো। ওর গোত্রান্তর আমারই সাহায্যে ঘটেছিলো।

—ও, এক সময়ে তুমি তাহ'লে ঘটকালিও করতে ?

—এই একটাই করেছিলুম, এবং তার ফল ভালোই হয়েছিলো। কিন্তু শেষ রক্ষা হ'লো না, দেখছি। বেচারা সুকুমার ভারি একটা আঘাত পেলো। একটা চিঠি লিখতে হবে—কী লেখা যায় তাই ভাবছি। এ-সব চিঠি লেখবার কোনো মানে হয় না, অথচ না-লিখলেও নয়। হাসছো যে ?

—ভাবছিলুম, ওঁকে যদি তুমি বিয়ে করতে তাহ'লে তোমার এখন কী মজাটাই হ'তো! ড্যাং-ড্যাং ক'রে আবার আর-একটা বিয়ে করতে পারতে।

—জীবিত ও মৃত সব স্ত্রীলোককেই যদি সতিন কল্পনা করতে থাকো তাহ'লে তো তুমি জীবনে মুহূর্তেরও শান্তি পাবে না।

—আপাততঃ শান্তি পাই; যদি সুষমা দেবীর কাহিনীটা আমাকে শোনাও। জানো তো মেয়েদের স্বভাব, কৌতূহলে ম'রে যাচ্ছি।

—হতাশ হবে। তোমাদের অতি প্রিয় আধুনিক লেখকের গল্পের মতো লোমহর্ষক মনস্তত্ত্ব এতে কিছুই নেই।

—তাহ'লে গল্প কিছু আছে। প্রথম থেকে বলো, কিছু বাদ দিয়ো না। আগে বলো কোথায় তাঁর সঙ্গে তোমার প্রথম দেখা।

—প্রথম দেখা মামার বাড়িতে।

—তোমার মামা ?

—হ্যাঁ, আমারই মামা। যাঁর বাড়িতে আমরা সেবার দিল্লিতে গিয়ে উঠেছিলুম। সুষমা তাঁরই শালি।

—তোমার মামার কোনো শালি আছে, এ-কথা আগে তো আমাকে কখনো বলোনি।

—অমন অনেক কথাই তোমাকে বলা হয়নি। যদি ম'রে না যাই, কিংবা তুমি যদি আমাকে ত্যাগ ক'রে অন্য কারো পাণিগ্রহণ না করো, তাহ'লে ক্রমশ প্রকাশ পাবে।

—কী যে সব ফাজলেমি করো, ভালো লাগে না।

—তার মানে, খুবই ভালো লাগে। লাগবেই বা না কেন? কোন মেয়ের দু'বার বিয়ে হয়? যার মধ্যে আকর্ষণীশক্তি প্রবল, তারই তো?

—পুরুষদের মতো অসভ্য বাঁদর নয় মেয়েরা, এটা ঠিক জেনো। চারদিকে যা সব শুনছি! বহুবিবাহের যুগ যেন ফিরে এলো!

—তোমাদের অতি প্রিয় লেখক তো প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন যে পুরুষের বহুবিবাহই প্রকৃতির রীতি, এবং মানুষ তা লঙ্ঘন করেছে ব'লেই পৃথিবী ভ'রে এই যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, অশান্তি। যাই বলো, তাঁর এ-কথাটা আমার বেশ যুক্তিসংগত ব'লেই বোধ হয়।

—তা হবে না! তোমরা পুরুষরা যে কেমন তা জানতে তো আর বাকি নেই! তোমার জীবনের অতীত ইতিহাসে আরো কত সুষমা লুকিয়ে আছে কে জানে!

—আবার ভুল করলে!

—মামার শালি—সম্পর্কটিও বেশ। অর্থাৎ, কোনো সম্পর্কই নেই।

—শুনে সুখী হবে, সুষমার সঙ্গে কোনোদিন আমি ভালো ক'রে কথা বলিনি।

—অন্য-কেউ এ-কথা বললে বিশ্বাস করতুম না।

—তুমি জানো যে তোমার স্বামী এতই অপদার্থ যে দরকারমতো একটা কথা বানিয়ে বলবার ক্ষমতা পর্যন্ত তার নেই। আহা, কত ভাগ্যে এমন স্বামী জোটে!

—বড্ড বাজে বকা তোমার স্বভাব। এই জন্যেই তোমার হাতে গল্প জমে না।

—অভিজ্ঞতা ব'লে আমার কিছু নেই কিনা, তাই বাধ্য হ'য়েই বাজে কথা ফেনিয়ে-ফেনিয়ে পাতা ভরাই। তোমাদের সেই আধুনিক লেখকের কথা শুনেছি, তাঁর বয়স এখন পঁয়তিরিশ, এরই মধ্যে তিনি চব্বিশটা প্রেম করেছেন, তার মধ্যে আঠারোটাই আবার পরস্ত্রীর সঙ্গে। ধন্য পুরুষ! এ না-হ'লে কি আর অমন দারুণ গল্প বেরোয়! আর আমি কিনা গতানুগতিকভাবে বিয়ে ক'রে গতানুগতিক ভদ্রভাবে জীবন কাটাচ্ছি! হায় হায়, কী উপায় হবে আমার?

—কিন্তু এই সুষমাকে তোমার একটা অভিজ্ঞতা ব'লেই বোধ হচ্ছে।

—একে যদি অভিজ্ঞতা বলো, আধুনিকের দল হো-হো ক'রে হেসে উঠবে। একদিন বিকেলবেলা কোনো-এক ঘরের মধ্যে ঢুকে একটি মেয়েকে এক কোণে ব'সে থাকতে দেখলুম—এটা কি কোনো অভিজ্ঞতা?

—বাঃ, বেশ জমবে ব'লে মনে হচ্ছে। শুনি, শুনি।

—আমি তখন এম. এ. পাশ ক'রে বেকার ব'সে আছি। মামা তখনো দিল্লির চাকরি পাননি, হাইকোর্টে পশার জমাবার চেষ্টা করছেন। আমি থাকি ভবানীপুরের ওয়াই. এম. সি. এ.-তে, মাঝে-মাঝে বালিগঞ্জে মামার বাড়ি এসে আড্ডা দিয়ে যাই।

—আড্ডাটা দিতে কার সঙ্গে? তোমার মামির মেয়েরা তখনো বড়ো হয়নি নিশ্চয়ই?

—কথাটা খুব অন্যায় হ'লো, কিন্তু এর প্রতিবাদ করতে গেলে আবার বলবে বাজে বকছি। আড্ডা দিতুম মামির সঙ্গেই, তিনি আমাকে বিশেষ একটু স্নেহের চোখেই দেখতেন। অযোগ্যকে ভালোবাসাতেই মেয়েদের মহিমা।

—যোগ্যকে ভালোবাসতে একেবারেই পারে না বুঝি তারা?

—অযোগ্য হ'লেই ভালোবাসা সহজ হয়। মেয়েদের ভালোবাসায় স্নেহের অংশটাই বেশি, আর জানো তো, স্নেহ নিম্নগামী।

—ঢের হয়েছে! এবার নায়িকাটিকে চট্‌পট্ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করো।

—শোনো তাহ'লে। একদিন মামার বসবার ঘরে ঢুকেই চমকে থেমে গেলাম। এক কোণে চেয়ারে ব'সে একটি মেয়ে বই পড়ছে। তার চুল পিঠের উপর খোলা, আর ভেজানো জানলার ফাঁক দিয়ে বিকেলের আলো সোনালি সুতোর মতো সেই চুলে পড়েছে।

মেয়েটিকে আগে কখনো দেখিনি। আমি দরজার ধারে একটু বোধ হয় ইতস্তত করেছিলাম, সে বই থেকে চোখ তুলে আমাকে দেখতে পেয়েই অত্যন্ত যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লো। উঠে চ'লে যাবে, না কি কিছু বলবে, এই রকম একটা দ্বিধার মাঝখানে প'ড়ে আঙুলের ফাঁকে বইটা চেপে ধ'রে চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

আমি অন্য দিকের দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে পালিয়ে গেলাম। মামিমাকে পাওয়া গেলো রান্নাঘরে।

'ঠিক দিনেই এসেছো, সুমন। তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

'কেন, মাছের চপ হচ্ছে বুঝি?'

মামিমা আঁচলে মুখ মুছে বললেন, 'তুমি একটু বোসো গিয়ে। আমার এক্ষুনি হ'য়ে যাবে।'

আমি বললুম, 'বসবার ঘরে কে একজন মহিলা ব'সে আছেন দেখলুম।'

'মহিলা ! মহিলা আবার কে ? ও, সুষি বুঝি ?' মামিমা হেসে উঠলেন। 'তা সুষিও অ্যাজকাল মহিলা হ'য়ে উঠেছে বইকি।'

'আমি এখানেই বসি, মামিমা। তোমার ঐ ছোটো মোড়াটা দাও।'

'এই গরমে বসবে ?'

'তুমি যদি এই গরমে ব'সে-ব'সে চপ ভাজতে পারো তাহ'লে আমরা যারা দয়া ক'রে ওগুলো খাবো আমরাও না-হয় একটু কষ্ট করলুম।'

মামিমা যতক্ষণ খাবার তৈরি করলেন আমি রান্নাঘরেই ব'সে রইলুম। কথা-প্রসঙ্গে এই সুষি ব্যক্তিটির পরিচয় পাওয়া গেলো। জানা গেলো, মামিমার মা-ও এসেছেন, এবং কিছুদিন তাঁরা এখানেই থাকবেন। মামিমার রাজত্বের সুমন-যুগ শেষ হ'য়ে এবার কি তবে সুষমা-যুগ আরম্ভ হবে ? মনটা যে খুব প্রসন্ন হ'লো তা বলতে পারিনে।

খানিক পরে মেয়েটি রান্নাঘরের দরজার ধারে এসে দাঁড়ালো। বুঝতে পারলুম, এখানেও আমাকে দেখতে পেয়ে সে অবাক হয়েছে, কিন্তু আমাকে যেন দেখতেই পায়নি, এই রকম ভাব ক'রে বললে, 'দিদি, টেলিফোনে কে যেন ডাকছে।'

মামি বললেন, 'আমি এখন উঠতে পারবো না। যাও তো সুমন, ছাখো তো কে। সুষি, এই আমাদের সুমন। এর সম্পূর্ণ পরিচয় আস্তে-আস্তে পাবি।'

ক্ষণমাত্র দেরি না-করে আমি চ'লে গেলুম টেলিফোন ধরতে।

সুষমাকে মাতুলালয়ের একটি অপরিহার্য অঙ্গ রূপে মেনে নিতেই হ'লো। মামিমার বিয়ের কিছুদিন পরেই তাঁর বাবা মারা গিয়েছিলেন, তাছাড়া তাঁর কোনে ভাইও ছিলো না। এ-অবস্থায় ছোটো বোনের দায়িত্ব অনেকটা মামিমারই, তাতে সন্দেহ কী। সুষমা রংপুরের কলেজ থেকেই আই. এ, পাশ করেছিলো, কলকাতায় এলে পড়াশুনোটা ভালোরকম চলতে পারবে, এবং সেই সঙ্গে মেয়েদের জীবনের যেটা শেষ লক্ষ্য, সেখানে পৌঁছবার রাস্তাও খুলে যেতে পারে, এই দ্বিবিধ আশাই মামিমার, এবং তাঁর মা-র, মনের তলায় লুকিয়ে ছিলো, সেটা অনুমান করা আমার পক্ষে কঠিন হয়নি।

—বাঃ, এ যে একেবারে সাজানো গল্প ! সুষমার হাত ফসকে আমার হাতে তুমি কেমন ক'রে পড়লে সেইটে ভেবেই আমার অবাক লাগছে। তারপর, তোমাদের ভাব কেমন জ'মে উঠলো সে-কথা বলো। মামাবাড়িটা হঠাৎ অত্যন্ত তীব্ররকম মধুর হ'য়ে উঠলো, তাই না ?

—তোমাকে তো বলেছি, তখন কলকাতার শহরে মামাবাড়িটাই আমার

একমাত্র আড্ডার জায়গা ছিলো। আমার বয়সের অন্যান্য ছেলেদের মতো আমি হো-হো ক'রে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতুম না ; বেশির ভাগ সময় নিজের ঘরে চুপচাপ ব'সে বই-টই পড়তুম, আর যখনই ক্লান্ত বোধ করতুম মামিমার অঞ্চল-ছায়ার স্নিগ্ধতাই আমাকে টানতো। মামিমা আমাকে প্রায়ই ঠাট্টা ক'রে বলতেন—'সুমন, তুমি বিয়ে করলে এমন আঁচল-ধরা হবে যে বৌ বেচারার প্রাণ থাকে কি যায়।' তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে মামিমার অন্তর্দৃষ্টি গভীর ছিলো ?

—থাক থাক, আর বড়াই করতে হবে না। বৌয়ের আঁচল-ধরা পুরুষমানুষ বড়ো ভালো নয়।

—পুরুষোচিত গুণ আমার মধ্যে কিছুই নেই সে তো তুমি ভালোই জানো। আমি রাগ করতে পারিনে, হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে জানিনে, চাকররা আমাকে ভয় করে না। এমন কি, একটি মনোহারিণী তরুণীকে একেবারে হাতের কাছে পেয়েও আমি তার সঙ্গে প্রেম করতে পারিনি, যদিও তখন আমারও যুবাবয়স। আমার পুরুষ-জন্ম একেবারেই বৃথা।

—তরুণীটি খুবই মনোহারিণী বুঝি ? এই ছবিতে তো তা মনে হচ্ছে না।

—এ-ছবিটা সেজে-গুজে তৈরি হ'য়ে তোলা, এতে ওর মুখটা মুখোশ হ'য়ে গেছে। ওর মুখে প্রাণের একটি শ্যামল আভা ছিলো, সেটি আমার ভারি ভালো লাগতো।

—আহা, থামলে কেন ? আরো একটু কবিত্ব করো।

—যেটাকে কবিত্ব ব'লে ঠাট্টা করলে সেটাই সত্যিকার বর্ণনা।

—বাবাঃ, একটু ঠাট্টাও সয় না ? ব্যাপার তো তাহ'লে সুবিধের নয় তারপর ?

—তারপর ? আর-কিছু না। শুধু ঐটুকুই। একটা অস্পষ্ট ছবি মাঝে-মাঝে আমার মনকে দোলা দিয়ে যেতো—যদি মনে করো সে-ছবি সুষমার তাহ'লে অত্যন্ত ভুল করবে। সে-ছবি কার তা কেউ বলতে পারে না। আধো-ঘুমের মধ্যে কেঁপে উঠছে কালো চুলের অরণ্য, দুলছে নীল শাড়ি নীল সমুদ্রের মতো, একটি ছোটো কথা দক্ষিণে হাওয়ার কলরোলে রাতকে আকুল ক'রে দিচ্ছে। কোনো ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে প্রেমে পড়ার অবস্থা এটা নয়, এটাকে বলতে পারো প্রেমের সঙ্গেই প্রেমে পড়া। জানি না তোমাদের মেয়েদের কখনো এ-অবস্থা হয় কিনা।

—হয় কি না হয় সেটা তখন সুষমাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পেতে।

—ভুলে যাচ্ছো, ওর সঙ্গে মুখোমুখি কখনোই আমার কথা হ'তো না, যদিও

যেদিনই মামাবাড়ি যেতুম সেদিনই দেখা হ'তো। আমাদের ঘরোয়া সভা বসতো দক্ষিণের খোলা ছাতে পাটি বিছিয়ে, সুষমা বসতো একটু দূরে, একটু মুখ আড়াল ক'রে, অন্ধকারে ভালো ক'রে তাকে দেখা যেতো না। কোনো-কোনো রাত্তিরে যখন চাঁদ উঠতো, মামিমা বলতেন, 'সুষি, গান কর্।' প্রথম-প্রথম সে কিছুতেই গাইতে চাইতো না, অনেক পিড়াপিড়ি ক'রে, প্রায় জবরদস্তি ক'রে মামি তাকে গাওয়াতেন। ক্রমে তার গান-গাওয়াটা অনেকটা সহজ হ'য়ে এলো। এক-এক রাত্রে দশটা-বারোটা গান পর-পর গেয়ে যেতো; থামতো যখন, অনেকক্ষণ আমরা কথা বলতে ভুলে যেতুম।

সে কেমন গাইতো তা আমি বলতে পারবো না। লোকে বলতো ভালোই, পরে সে রেকর্ডে গান দিয়ে বেশ নাম করেছিলো। কিন্তু তখন আমার শুধু এ-কথাটাই মনে হ'তো যে তার গলার সুরে যেন সে-কথাই শুনতে পাচ্ছি, যা আমারই মনের কথা, অথচ যা বলবার ভাষা আমার জানা নেই।

—গানগুলি সে তোমারই উদ্দেশে গাইতো তা কি বুঝতে পারতে না?

—অমন অসম্ভব কথা আমার কখনোই মনে হ'তো না। কোনো মেয়ে যদি চোখ তুলে তাকায়, আর আমি যদি ভেবে বসি সে আমাকেই বিশেষভাবে দেখছে, সে-মূঢ়তার কি তুলনা আছে! যদি কারো উদ্দেশে গাইতেই হয়, তাহ'লে তার জীবন-নেপথ্যে যার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিলো, সে কি ছিলো না?

—জীবন-নেপথ্যে পদধ্বনি? সে আবার কী?

—ওর মা ওর বিয়ের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন নানা দিকে, কিন্তু মনের মতো পাত্রের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিলো না। মামিমাকে বলতে শুনতুম—'আহা! এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন—মেয়েটা বি. এ. পড়ছে পড়ুক না—ঠিক সময়ে ওর বিয়ে হ'য়ে যাবে, দেখো।' কিন্তু তাঁর মা বলতেন, 'লোকে একটু আগে থেকেই চেষ্টা করে —মেয়ের বিয়ে কি আর সোজা কথা!'

একদিন ওর মা আমাকে বললেন, 'তোমার তো কত ছেলের সঙ্গে জানা-শোনা, মেয়েটার একটা হিল্লে ক'রে দিতে তুমিই তো পারো।'

মামি হেসে বললেন, 'হ্যাঃ, ভালো লোককেই বলেছো! দোকানে গিয়ে একটা জিনিস চাইতে হ'লে যে সাত বার ঘেমে ওঠে, সে দেবে তোমার মেয়ের বিয়ে! তবে ওর সন্ধানে একজন খুব সুপাত্র আছে বটে,' ব'লে মামিমা আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে একটু হাসলেন।

ওর মা সাগ্রহে বললেন, 'কে? কোথায় থাকে সে? করে কী?'

আমি আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালুম না। তরতর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে রাস্তায়। আমার সমস্ত মুখে তখনো পিন ফুটছিলো। ছি ছি, মামিমা আমাকে এই মনে করেন!

আমার মনের মধ্যে যে কী লজ্জা ঢুকলো তা আর বলবার নয়। কেমন ক'রে আমি প্রমাণ করতে পারি যে সুষমার আকর্ষণেই আমি ওখানে যাই না? কেমন ক'রে বোঝাতে পারি যে আমি এত অভদ্র নই যে মামিমার অকৃপণ স্নেহের অন্যায় অপব্যবহার করবো? আগেও ঘন-ঘন যেতুম ওখানে, এখনো যাচ্ছি। আমার ব্যবহারে কি কোনো পরিবর্তন ঘটেছে? আমি কি ওঁদের এ-রকম ভাববার কোনো কারণ দিয়েছি? নিজের মনকে নির্মমভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখলুম—মনে হ'লো হয়তো কোনো ভুল করেছি, হয়তো কোনোদিন কোনো কথায়, কোনো ভঙ্গিতে নিজের অজান্তেই এমন-কিছু প্রকাশ ক'রে ফেলেছি, মামিমার মেয়ে-মনের সূক্ষ্ম পরদায় যা চট করে ধরা পড়েছে। সেটা কবে হ'লো, কেমন ক'রে হ'লো তা কিছুতেই মনে করতে না পেরে আমার মনের যন্ত্রণা আরো বেড়েই গেলো।

আমার মন বললে, এ-অপবাদ থেকে তোমাকে মুক্ত হ'তেই হবে, যেমন ক'রে হোক।

ও-বাড়ি যেতে আমার পা আর সরছিলো না, কিন্তু ভেবে দেখলুম হঠাৎ যাওয়া বন্ধ করলে সেটাও চোখে পড়বার মতো হবে। আসা-যাওয়ার পালাটা একরকমই রেখে মনে-মনে ভাবতে লাগলুম, কী করা যায়। হঠাৎ মনে হ'লো আমি যদি সত্যি-সত্যি সুষির একটি পাত্র জুটিয়ে দিই, তার চেয়ে ভালো কিছু আর হ'তে পারে না। তাই তো, এই অত্যন্ত সহজ কথাটা আমার এতদিন মনে হয়নি কেন?

ভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়েই সুকুমারের সঙ্গে আমার দেখা। এম. এ.-তে আমার সঙ্গে পড়তো, সম্প্রতি বি. সি. এস.-এর বেড়া ডিঙিয়ে খুলনায় ডেপুটিরূপে অধিষ্ঠিত। দু'দিনের ছুটিতে বেড়াতে এসেছিলো কলকাতায়, চায়ের দোকানে আমার সঙ্গে দেখা। কথায়-কথায় যেই জানলুম যে সে এখনো বিয়ে করেনি, মনটা আমার লাফিয়ে উঠলো।

'আমার জানাশোনা খুব একটি ভালো মেয়ে আছে। যদি বিয়ে করো এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করা যেতে পারে।'

কলেজ পড়বার সময় আমার সম্বন্ধে অহেতুক একটা শ্রদ্ধা ছিলো সুকুমারের। আমাকে বললে, 'বেশ তো।'

তার সঙ্গে কথাটা তখনই অনেকটা এগিয়ে রাখলাম। আমি বললুম, 'সামনের মাসে তো মহরমের ছুটি পড়েছে তখন এসে মেয়েটিকে একবার দেখে যেতে পারো।'

'না, না, আমি আর কী দেখবো। তুমি ভালো বলছো, সেইটেই যথেষ্ট। আর ঐ মেয়ে দেখা ব্যাপারটা আমার কাছে বর্বরোচিত বোধ হয়। তবে আমার মা বোধ হয় একবার—'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তোমার মা একবার দেখবেন বইকি।'

সুকুমার বললে, 'এখন থেকে তো মফস্বলে-মফস্বলে ঘুরতে হবে; বিয়ে না-করলে দিন কাটতে চায় না।'

সুকুমারের সঙ্গে আলাপ ক'রে খুব খুশি হলুম। যদিও ডেপুটি হয়েছে, মনুষ্যোচিত ভদ্রতাবোধ বিসর্জন দেয়নি। সুষিকে সুখী করতে পারবে।

পরের দিন নিভৃতে মামিকে বললুম কথাটা। মামি একটু যেন অবাক হ'য়ে বললেন, 'তুমি ঠিক বলছো, সুমন?'

'ঠিক মানে? সুকুমার এমন ছেলে নয় যে খামকা কোনো কথা বলবে। তোমাদের যদি অমত না হয় সামনের এই আষাঢ় মাসেই বিয়ে হ'য়ে যেতে পারে।'

মামিমা আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বেশ তো।' তাঁর দিক থেকে যতটা উৎসাহ আশা করেছিলুম ততটা যেন দেখা গেলো না।

কিন্তু উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন সুষির মা। আমাকে হাতে ধ'রে বললেন, 'এটা তোমাকে ঠিক ক'রে দিতেই হবে ভাই, এমন পাত্র ফসকালে আর পাওয়া যাবে না।'

দেখতে-দেখতে সুষির বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেলো। বাংলা দেশে এত সহজে কোনো মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়, এ যেন কল্পনাও করা যায় না। মনে হ'লো, উভয় পক্ষ পরস্পরের জন্য প্রস্তুত হ'য়েই ছিলো, শুধু মাঝখানে কেউ এসে পরিচয়ের সূত্রটি ধরিয়ে দেবার অপেক্ষা। আমি সেই মধ্যবর্তীর কাজ করলুম, আত্মীয়মহলে আমার ধন্য-ধন্য প'ড়ে গেলো। আমার মতো অপদার্থকে দিয়ে এত বড়ো একটা কাজ সম্পন্ন হ'তে পারে এ-কথা কে ভাবতে পারতো!

কিন্তু হঠাৎ গোল বাধালো সুষমা নিজে। শোনা গেলো সে বেঁকে বসেছে, বিয়ে করবে না।

মামিমা আমাকে বললেন, 'এখন যাও, বোঝাও গিয়ে সুষিকে।'

আমি আকাশ থেকে পড়লুম।—'সে কী! আমি কী বোঝাবো!'

'তুমি বললেই কাজ হবে। তোমাকে ও মনে-মনে খুব ভক্তি করে তা তো জানো!'

আমি লাল হ'য়ে উঠে বললুম, 'কী বাজে বকছো!'

কিন্তু মনে-মনে আমি চিন্তিত বোধ করলুম। বিয়েটা এতদূর এগিয়ে এখন যদি ভেস্তে যায়, আমারই পক্ষে সবচেয়ে লজ্জার ব্যাপার হবে। সুষি কী ভাবছে কে জানে, কিন্তু সুকুমারের মতো সব দিক দিয়ে বাঞ্ছনীয় পাত্রকে সে খামকা প্রত্যাখ্যান ক'রে বসবে সে কি এতই বোকা?

সুষির বিয়ে ঠিক হবার পর ওর সম্বন্ধে আমার সংকোচ খানিকটা কেটে গিয়েছিলো। মাঝে-মাঝে দু'একটা কথা বলতুম, এমনকি একদিন পরোক্ষে একটুখানি ঠাট্টাও করেছিলুম। ঠাট্টাটা খুবই নিরীহ, কিন্তু সুষি এমন অসামান্যরকম লাল হ'য়ে উঠেছিলো যে তার পরে আর কোনোরকম পরিহাসের অবতারণা করতে ভরসা পাইনি।

সুষিকে পাওয়া গেলো দোতলার কোণের ঘরে, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে। আমি কুণ্ঠিতভাবে বললুম, 'সুকুমার তোমার প্রতীক্ষা করছে, এখন তুমি যদি স'রে দাঁড়াও তাহ'লে ওর মনে অন্যায়রকম আঘাত দেয়া হয়।'

তার কালো চোখ মুহূর্তের জন্য আমার মুখের উপর এসে পড়লো। তারপর চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বললে, 'আর আমার মন?'

'কেন, তোমার মনে কি কোনো দ্বিধা আছে?'

ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে উঠলো তার কুমারী কপোল। মাথা নিচু ক'রে শাড়ির আঁচলটা একবার আঙুলে জড়ালো, একবার খুললো।

আমি বললুম, 'তুমি আর কোনো গোলমাল করবে না, এই কথা আমাকে দাও।'

সে চোখ তুলে বললে, 'আপনি বলছেন?'

'হ্যাঁ, আমি বলছি।'

সুষমার দীর্ঘশ্বাস পড়লো। ভাবলুম, বিয়ের আগে মেয়েদের মন খারাপ হবেই। যেখানে জন্মালো, যেখানে বড়ো হ'লো সেই সমস্ত পরিবেষ হঠাৎ একদিনে ছেড়ে যাওয়া কি সোজা কথা!

আষাঢ় মাসের সতেরো তারিখে ওদের বিয়ে হ'য়ে গেলো। সেদিন বাড়ি ভরা লোকজন, হৈ-চৈ। আমি খুব ব্যস্তভাবে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বিয়ের লগ্ন আসন্ন, বর এসেছে, এমন সময় কী একটা কাজে মামিকে খুঁজতে-খুঁজতে দিশেহারা

হ'য়ে দোতলার সেই কোণের ঘরে গিয়ে হাজির হলুম। মহিলার দল সুষিকে ঘিরে বসে আছেন। তার পরনে ফিকে গোলাপি রঙের বেনারসি, কপালে চন্দন, পায়ে টুকটুকে আলতা। বসেছে উঁচু-করা হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে, চোখের দৃষ্টি আনত। ভারি সুন্দর লাগলো, অন্যমনস্কভাবে একটু বেশিক্ষণই বোধ হয় ওর দিকে তাকিয়ে ছিলুম।

ওর মা আমাকে দেখে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন।—'এসো ভাই, এসো। তোমার জন্যেই তো সব হ'লো, তোমার কথা চিরকাল মনে থাকবে। সুষি, সুমনকে প্রণাম কর্।'

এই আকস্মিক সম্মানলাভে আমি এমন অপ্রস্তুত হ'য়ে গেলুম যে বোকার মতো চুপ ক'রে দাঁড়িয়েই রইলুম। সুষি আমাকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো। লক্ষ্য করলুম তার চোখে আরক্তিম আভা—একটু আগে বোধ হয় কাঁদছিলো।

আমার চোখের উপর চোখ রেখে অস্ফুটস্বরে বললে, 'আপনার মনে এই ছিলো!'

আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না। আস্তে-আস্তে নিচে নেমে এলুম।

—তারপর?

—আর কিছু নেই। এই শেষ।

—সুষমার সঙ্গে পরে আর তোমার দেখা হয়নি?

—বিয়ের দশ দিন পরে সুকুমার বৌকে নিয়ে চ'লে গেলো খুলনা। তার পর এই আট বছর ও কখনো বাগেরহাটে কখনো মেহেরপুরে কখনো নোয়াখালিতে ঘুরে বেড়িয়েছে। এদিকে মামাও হঠাৎ চাকরি নিয়ে দিল্লি চ'লে গেলেন, আমাকেও কাজে-কর্মে বাঁধা পড়তে হ'লো।

—একবারও আর দেখা হয়নি?

—একবারও না। প্রথম-প্রথম সুকুমার আমাকে বার-বার ক'রে লিখতো ওদের ওখানে একবার যেতে, আমিও প্রায়ই ভাবতুম যাবো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হ'য়ে ওঠেনি। একবার স্বামীর খামের মধ্যে সুষি আমাকে একটা লম্বা চিঠি লিখেছিলো। আত্মহারা আনন্দের অমন নির্জলা উচ্ছ্বাস আমি কখনো কোনো সাহিত্যের বইয়ে পড়িনি। সত্যি ওরা খুব সুখী হয়েছিলো।

—আমি যদি সুষমাকে একবার দেখতুম তাহ'লে বেশ হ'তো। তুমিও তো ওদের একবার আমাদের এখানে আসতে বলতে পারতে।

—কী যেন, মনে হয়নি তো কখনো। ওর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম, আজ হঠাৎ কাগজে ওর মৃত্যুসংবাদ দেখে এত কথা মনে পড়লো।

—কিছু মনে কোরো না, কিন্তু সত্যি তুমি বড্ড বোকা ছিলে।

—এখনো তা-ই আছি। মাঝে শুধু একটা কাজে কিছু বুদ্ধির পরিচয় দিতে পেরেছিলুম।

—কী সেটা?

—তোমাকে বিয়ে করা।

আধুনিক সাহিত্য

পনের শতকের য়ুরোপের পর্ত্তুগীজ দূত একদিন সম্পদ শিকারে বের হয়ে যে দেশের উপকূলে তার উত্তমাশার ভবিতব্য প্রথম আবিষ্কার করে পুলকিত হয়ে উঠেছিল, সেই দেশ হলো দক্ষিণ আফ্রিকা। তারপর পর্য্যায়ক্রমে এসেছে—ওলন্দাজ, জার্ম্মাণ ও ইংরেজ। সর্ব্বত্রই ইংরেজ আসতে একটু দেরী করে, কিন্তু একবার আসবার পর সরে যাবার মত স্পৃহা তার দেখা যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকার খাঁটি 'দেশের মাটীর' মানুষ বলতে যাদের বোঝাতো, তারা হলো হোটেনটট—একটী হৃষ্টপুষ্ট পশুপালক জাতি। বুশম্যান—একটি প্রাচীন খর্ব্বকায় দরিদ্র শিল্প-প্রেমিক জাতি। চিত্রঙ্কণ বিদ্যায় পারদর্শী এদের সমতুল্য জাতি দ্বিতীয় একটী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। প্রথম য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিক বর্ব্বরেরা এদের খরগোস শিকার করার মত তাড়া করে মেরেছে। আর আছে বান্তূ জাতি—একটী কৃষ্টিবান সদাচারী নিপুণ কৃষক ও পশুপালক জাতি।

এহেন একটী দেশের হীরা ও সোনা খুঁড়তে এবং বড় বড় খামার পত্তন করতে য়ুরোপীয় প্রতিভার উদ্যোগে কারখানাশিল্প ও কৃষিকাজ আরম্ভ হলো। এরই কারণ সূত্রে আমদানি হলো দেশান্তর হতে কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস, ভারতীয় ও চীনা মজুর। বুয়র নামে পরিচিত ওলন্দাজ কৃষকেরা এসে বসতি করলো। কিছু শ্বেতাঙ্গ মজুরও এল। হোটেনটট, কালো ক্রীতদাস ও য়ুরোপীয় চাষার বর্ণসাঙ্কর্য্যে একটী মিশ্র জাতির উদ্ভবও হলো। ওলন্দাজ ভাষার আওতায় একটী নূতন ভাষার সৃষ্টি হলো, যাকে 'অ্যাফ্রিক্যান' ভাষা বলা হয়। যারা এই ভাষা বলে তাদেরই নাম অ্যাফ্রিক্যানার। এই বিচিত্র জনতার নানা সঙ্ঘস্বার্থ ও সংঘর্ষের পরিণামে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছায়াশ্রিত দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন নামে যে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হলো, তার প্রথম উজীর ছিলেন জেনারেল বোথা। এই পরিণতির পেছনে তিনটী পূর্ব্ব ঘটনার দান রয়েছে—শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক বনাম খাঁটি দেশীয় জাতিদের সংঘর্ষ (কাফ্রী যুদ্ধ) ও বুয়র যুদ্ধ (বৃটিশ বনাম ঔপনিবেশিক ওলন্দাজ) তারপর থেকে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে গোলমাল লেগেই আছে। নানা বিরোধী স্বার্থের প্রতিনিধি রূপে এক-একটী নেতা দেখা দিয়েছেন; তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে স্মার্টস্ ও হার্টজগের নাম সকলেই শুনেছেন। বর্ত্তমান ভারতের নেতা বিশ্ববিখ্যাত গান্ধীজীও দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতিক ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যেই তাঁর সংগ্রামী কর্ম্ম-জীবনের সূচনা করেছিলেন। বর্ত্তমান দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হলেন ডাক্তার মালান। এঁকে জাতীয়তাবাদী বলা হয়। এই জাতীয়তা কিন্তু খাঁটি দেশীয়

দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয়তা নয়। বলা যায়—অ্যাফ্রিকানার জাতীয়তা বিদ্বেষটা ইংরাজী-ভাষীদের বিরুদ্ধে।

সংখ্যায় বান্তুরাই সবচেয়ে বেশী—পঁয়ষট্টি লক্ষ। বান্তুদের মধ্যে জাতীয়তার সূচনা খুব ভালভাবেই হয়েছে। ঠিক আমাদের দেশের মত একটী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে এদের মধ্যে। ইউনিয়নের শ্বেতাঙ্গ-স্বার্থ সেখানে যেমন ভারতীয় শ্রমিকের জীবিকা ও মর্য্যাদাকে দাবিয়ে রাখার জন্য সর্ব্বদা তৎপর, বান্তু-জাতীয়তাকেও সেইরকম নানা চক্রান্ত ও দমনে কাবু করে রেখেছে।

এখানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন খুব উদ্যোগে আরম্ভ হয়েছিল এবং শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধও হয়েছিল। কিন্তু এই শ্রমিক আন্দোলন একটী যথার্থ শক্তিতে পরিণত হতে পারেনি। শ্রমিকেরা শ্রেণী-সচেতন নয়। তারা বর্ণ-সচেতন মাত্র। কাজেই শ্রমিকেরা সাধারণতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তা ইত্যাদি এক-একটী স্লোগ্যানসর্ব্বস্ব দলের পাল্লায় পড়ে নাজেহাল হচ্ছে মাত্র। এই সব দলীয়-রথের সারথি এক-একটী বণিকগোষ্ঠী। সব দেশের মত দক্ষিণ আফ্রিকাতেও কম্যুনিজ্‌মের বাণী প্রবেশ করেছে; কিন্তু প্রচণ্ড বর্ণগত বিচ্ছেদ-বুদ্ধির কণ্টকারণ্যে কম্যুনিজ্‌ম্ পথ করে নিতে পারছে না।

সামাজিক রুচি, ধর্ম্ম, ভাষা, শিল্প, পরিচ্ছদ—এইসব কৃষ্টিগত গুণ ও লক্ষণ ধরে বিচার করলে য়ুরোপীয় জাতিগুলিকে পৃথিবীর বহু স্থান থেকেই মাথা নীচু করে সরে আসতে হয়। তাদের অভিভাবকত্বের দাবী সেখানে টিঁকতে পারে না। কিন্তু নিছক গায়ের রং দিয়ে যদি কোন একটা থিওরী তৈরী করে নিতে পারা যায়, তবে এসিয়া ও আফ্রিকার সর্ব্বত্রই তাদের একটা শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ কায়েম করা যায়। এই জন্যই বোধ হয় লীগ অব্ নেশন্‌স্ আজও এই বর্ণতত্ত্বের অনুরাগ একটী কভেনাণ্টে বেঁধে রেখেছে। গায়ের রঙের ছুঁতো ধরে সাদা সাম্রাজ্য-বাদ কিভাবে নিষ্পন্ন হয়, তার রূপ দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে প্রকট হয়ে উঠেছে। এই ছায়াবৃতার কালো ঘোম্‌টার নীচে যে একটী মানবরূপ ছিল, কবির সেই ক্ষোভ মিটে যাবার মত কোন লক্ষণ আজও দেখা যাচ্ছে না। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকাংশ রাজনীতিক দলগুলিই নিরপেক্ষ থাকবার চেষ্টা করেছে। বিবদমান দুই পক্ষের বড় বড় আদর্শের হেঁয়া শুনে তারা ঠিক স্পষ্ট কোন বিশ্বাসে উৎসাহিত হতে পারছে না।

কালো মানুষের ঘাড়ে এই সাদা সাম্রাজ্যবাদের বোঝা কয়েক শতাব্দী ধরে চেপে রয়েছে। তার ফলে সভ্যতা তথা মানবতা কতখানি ব্যাহত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার কাহিনী তারই একটী দুঃখদায়ক বিবরণ।

মিন্‌হাজ

The Black Man's Burden—By John Burger—Victor Gollancz 6s.



বাংলা গানে কাজী নজ্‌রুল্‌ ইস্‌লাম

সম্প্রতি একটা কথা শুনে ভারি আশ্চর্য লাগলো। নজ্‌রুল্‌ ইস্‌লামের সংগীতসংখ্যা নাকি রবীন্দ্রনাথের অজস্রতাকেও হার মানিয়েছে। খবরটা বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। জানিনা কথাটা কতদূর সত্য। কেননা নজ্‌রুল্‌ ইস্‌লামের এমন কোনো একত্রিত (সংগীতের) প্রামাণ্য গ্রন্থ নেই যা থেকে এ-কথার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। এ পর্যন্ত বাজারে তা'র যে কটি গানের বই বেরিয়েছে তা থেকে এত অধিক সংখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়।

অবিশ্যি অজস্রতাটাই যে রচয়িতার পক্ষে একটা মস্ত গৌরব তা তো নয়? প্রতি মাসের প্রতি সপ্তাহে, প্রতিদিনে রেডিয়ো, গ্রামোফোন, আর সিনেমা কোম্পানী আমাদের যত রকমের যত সুরের আর যত ভাবের যত গান শুনিয়ে কানকে আপ্যায়িত করেছেন তাতে মনে হয় বাংলা গানে কিছু মড়ক লাগলে নিতান্ত মন্দ হত না।

কিন্তু নজ্‌রুল্‌ ইস্‌লাম সম্বন্ধে একথা খাটে না। তিনি যদি সত্যিই অতগুলো গান লিখে থাকেন তা হ'লে তার অনেকগুলো যদি বর্জ্জনীয় হয়ও তবু যে কটি গান সাহিত্যিক মূল্যেই মূল্যবান তার সংখ্যাও নিতান্ত কম হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

একটা সময়ে নজ্‌রুল্‌ ইস্‌লামের গানে দেশ মুখরিত হয়ে উঠেছিল। তা যে কেবলমাত্রই একটা হুজুগ একথা বল্লে অন্যায় হবে। বাংলা গানের মধ্য দিয়ে উর্দ্দু গজলের যে মধুর প্রাণরস তিনি বইয়ে দিয়েছিলেন তা এসে আমাদের মর্ম্মস্থানে আঘাত দিয়েছিল। যদিও তিনি প্রাচীন পারস্য কবিদের রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন, তবুও কথা আর সুরের সংমিশ্রণে তাঁর গানে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠলো যে তাঁকে বাংলা দেশের গুণীরা একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা না দিয়েই পারেননি। আজকাল বাংলা গানে রাগ-প্রধান নাম দিয়ে যে সব গান গাওয়া হয় (যেমন ভীষ্মদেবের বা জ্ঞান গোস্বামীর কিছু কিছু রেকর্ড) তা একেবারে হিন্দুস্থানী সংগীতেরই প্রতিরূপ। কেবলমাত্র হাম্‌ তুম্‌ বদলে তুমি আমি বসানো হয়েছে এইমাত্র যা তফাৎ। যদিও এ ধরনের কিছু গান নজরুলকেও বাধ্য হয়েই লিখতে হয়েছে তবু মোটের উপর তাঁর গান এ জাতীয় নয়। তিনি তাঁর গানে উর্দ্দু গজল বা ঠুংরির মাধুর্যটা সম্পূর্ণ শুষে নিয়ে একটা আলাদা জাতেরই সৃষ্টি করেছিলেন।

সত্যি বল্‌তে কণ্ঠমাধুর্যে যাঁরা ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী অর্থাৎ যাঁদের গলায় স্বভাবতই

নানারকম সূক্ষ্ম কারুকার্য্য আসে তাঁরা যদি মার্গ সংগীত ছেড়ে কখনো বাংলা গান করেন তাহ'লে নজ্‌রুল্‌ ইস্‌লামের গানই বোধ হয় তাঁদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কেননা কণ্ঠের অবাধ মুক্তির একটা মস্ত অবকাশ রয়েছে তাঁর গানে। বারো চোদ্দ বছর আগে যাঁরা দিলীপ রায়ের কণ্ঠে নজ্‌রুল্‌ ইস্‌লামের গান শুনেছেন তাঁরা বোধ হয় আমার এ-কথায় তিলমাত্রও সংশয় প্রকাশ করবেন না।

স্বদেশী গানেও নজ্‌রুল্‌ ইস্‌লামের দান বরণীয়। মনে পড়ে নজরুল ইস্‌লামের কণ্ঠে 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' গানটি যখন প্রথম শুনেছিলাম, কী এক অভিনব আনন্দে মন আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর 'শিকল পরা ছল', 'জাতের নামে বজ্জাতি', 'আমরা ছাত্রদল', 'টলমল টলমল পদভরে', 'চল্‌ চল্‌ চল্‌' ইত্যাদি প্রাণউন্মাদক গান সে সময়ে কে না গেয়েছে? গাইতে-গাইতে কার রক্ত না সমাজসংস্কার আর পরাধীনতার বিরুদ্ধে গরম হ'য়ে উঠেছে? সুরের বৈচিত্র্যে এবং শব্দসমন্বয়ের সঙ্গতিতে তাঁর অনেক গানেই এমন একটা প্রাণস্পন্দন আছে যে আমাদের হৃদয়ের গভীর স্তরেও এ গান গিয়ে আঘাত করেছে।

তবে কিনা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই এটা দেখা যায় যে যে জিনিষকেই আমাদের মন একবার আপন বলে গ্রহণ করে তারই এমন একটা অন্ধ অনুকরণে দেশ ভরে যায় যে শেষ পর্য্যন্ত তার আসল রূপ যায় চাপা পড়ে—মানুষের চেয়ে মানুষের ছায়াটাই হয়ে ওঠে বড়। তার ফলে এর একটা সাময়িক মৃত্যু ঘটে। তবে তা সাময়িকই মাত্র।

এখানে লেখবার পৃষ্ঠা আমার নির্দ্দিষ্ট কাজেই বিস্তৃত কোরে কিছু লেখা সম্ভব নয়। তবে সংগীতপিপাসু বা সাহিত্যরসিকদের কাছে আমাদের একটি বিনীত অনুরোধ রইল যে তাঁরা যেন এ সম্বন্ধে একটু অবহিত হয়ে ওঁর একটি 'সংগীতসংগ্রহ' প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন।

প্রতিভা বসু

সিনেমা

দাবী : নিউ টকিজ।

'বাংলা ছবিতে নূতন নূতন পরিচালকের আবির্ভাব দেখে আমাদের খুসী হয়ে উঠবার কথা'—একথা একাধিক বার আমরা সিনেমা-প্রসঙ্গে বলেছি। এবং এখনো বলি। আমরা আশা করি যে নূতন পরিচালকদের মধ্যে থেকে দু-এক জন অন্ততঃ সৃজনীপ্রতিভার পরিচয় দেবে, যাতে বাংলা ছবি বর্তমান লজ্জাকর নিষ্প্রাণতা থেকে মুক্তি পাবে।

অর্থকরী শিল্প হিসেবে সিনেমা আমেরিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। এর পেছনে শুধু আমেরিকান শিল্পবোধ নয়, শক্তিশালী জাগ্রত চিন্তাও নিত্য নূতন অগ্রসারী পরিকল্পনার রূপ দিচ্ছে। আর্ট হিসেবে এর মূল্য না থাকলে, সিনেমা মানুষের এতটা হৃদয় জুড়ে থাকতে পারতো না—আর্ট মানুষের দৈনন্দিন পদক্ষেপে নূতন গতিপথের সন্ধান দেয়।

বাংলাদেশে সিনেমা-শিল্পের প্রসার ও জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে তিন-চার জন পরিচালকের সুষ্ঠু চিন্তা। তাঁরা জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে পেরেছেন—জনসাধারণকে ধোঁকায় রাখতে চান নি। তাঁদের পরিচালনার যথেষ্ট শক্তি ছিল বলেই একটা শিশু-শিল্প বাড়তে পেরেছে। আজ তাঁদের কাছ থেকে আর কিছু আশা করা যায় না। এঁদের প্রসিদ্ধির মূলে যে ইতিহাস আছে এটা নূতন পরিচালকদের প্রণিধান করা কর্তব্য। এঁদেরকে অনুকরণ করে ছবির জাবর কেটে সিনেমা শিল্পকে বদ্ধজলার মত রোগসঙ্কুল করে কোন লাভ নেই, চর্বিত-চর্বণ আর্টের ধর্ম নয়। এ-কথা সাহিত্যেও সত্য, সিনেমাতেও সত্য। এবং আর্টের মধ্যে যে অর্থকরী প্রয়াস আছে, তা একঘেয়েমির মধ্যে কোনো দিনও স্ফীতি লাভ করে না। কাজেই প্রযোজকের চেষ্টা হবে, পরিচালকের মধ্যে সৃজনী-প্রতিভার সন্ধান করা।

সিনেমা, আনন্দের মধ্য দিয়ে লোকশিক্ষার প্রয়াস : জটিল সমাজ-ব্যবস্থার জটলা থেকে সুস্পষ্ট পথনির্দেশের অভিপ্রায়। এ-কথা যে পরিচালকই ভুলে যাবেন তাঁর পক্ষেই টিঁকে থাকা মুস্কিল। সাহিত্যে হয়তো 'আর্ট ফর আর্টস সেক'-এর বুলি আওড়ানো চলে, কিন্তু সিনেমার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ এবং প্রখর। জনসাধারণের অনুমোদনের উপর এর অস্তিত্ব। কাজেই জনসাধারণের মানসিক পরিবেশটি সম্বন্ধে পরিচালকের ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। ভুঁই-ফোড় উদ্ভট কোনো পরিকল্পনা বা সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক মারপ্যাঁচ কোনো ছবিতে থাকলে এর অকালবিদায় সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার অবকাশ থাকে না।

আজকাল বাংলা ছবি পরিচালনায় আমাদের বক্তব্যের দোষত্রুটিগুলো উঁকিঝুঁকি মারছে। এ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। একদা সিনেমা-শিল্পে বাংলা সমগ্র ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানে ছিল। বাঙ্গালীর বুদ্ধির সহায়তায় ভারতের সর্বত্র সিনেমা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কিন্তু আজকালকার হিন্দী ছবির সংগে বাংলা ছবির কোনো তুলনাই চলে না। গত তিন মাসে বাংলায় কোনো উল্লেখযোগ্য ছবি প্রদর্শিত হয় নি। অথচ হিন্দীতে 'নাজমা', 'কিসমৎ'এর মতো প্রথম শ্রেণীর ছবি পর পর বেরিয়ে গেছে। মেহবুব, শান্তারাম প্রভৃতি পরিচালকগণ সমাজ-সচেতন বলেই লোকের দৃষ্টিতে 'হিরো' হয়ে উঠেছেন। এমন কি বাঙ্গালী দর্শকরাও এঁদের কাছ থেকে কিছু আশা করেন। এঁরা দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন। তাই হিন্দী ছবিঘরে বাঙ্গালী দর্শকের ভীড় বেশী। হিন্দী ছবির লাভের অর্দ্ধেকই বোধহয় বাংলাদেশ জুগিয়ে থাকে। বাংলার আত্মঘাতী ব্যবসাবুদ্ধি, দুর্বল পরিচালনা, গল্পকারের ত্রিশঙ্কুবৃত্তি সিনেমার ক্ষেত্রে বাংলাকে পেছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বাংলা সিনেমার এই দুর্দশার অন্যতম কারণ গুণীলোকের অভাব। এখনো সত্যিকারের ব্যবসাবুদ্ধি নিয়ে সিনেমা শিল্প কেউ গড়ে তুলেন নাই। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে হয়নি এর সংগঠন। এখনো গুণীর কদর হয়নি। সিনেমার উপর নির্ভর করে অনেকেই ভবিষ্যৎকে আশাপ্রদ ভাবতে পারে না। পরিচালকদের মধ্যে অধিকাংশই প্রযোজকের অন্ধ-বিশ্বাসের উপর ভরসা করে ঝুলে আছে। সিনেমার ক্ষেত্রে টিঁকে থাকবার পুরস্কারস্বরূপ বোধ হয় অনেকে পরিচালনার ভার পেয়েছেন—গুণের মাপকাঠিতে এঁদের নির্বাচন হয়নি।

নইলে বাংলার এমন অধঃপতন হবে কেন? বাংলার সিনেমা-শিল্প অকালে জরাগ্রস্ত। মুষ্টিমেয় অভিনেতা-অভিনেত্রী—এদের দ্বিগুণ ক্ষুদে প্রযোজক এবং তিনগুণ পরিচালক। সুদক্ষ টেকনিশিয়ানের অত্যন্ত অভাব। পরিচালকগণ সবজান্তা—সাহিত্য, সঙ্গীত ও আর্টে এঁদের অনন্যসাধারণ পটুতা: অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় ক্ষমতা এক ছাঁচে ঢালাই, কোনো প্রকার বৈরুব্যের ধার তারা ধারে না। সঙ্গীত পরিচালনা নিতান্ত সাধারণ। প্রযোজকদের সমস্ত ব্যবসার পথই রোমের দিকে—লাভ হলেই হলো। বাংলার ধৈর্যশীল দর্শক নীরবে এদের খামখেয়ালির মাশুল দিয়ে যাচ্ছে। আশা, যদি উন্নততরো ছবির সন্ধান মিলে।

আমাদেরও আশা, যদি সৃজনী প্রতিভার সন্ধান মিলে। বাংলাসাহিত্য বিশ্বের দরবারে আসন পেয়েছে! বাংলার রূপালি পর্দায় হয়তো নূতন শক্তির অভিনন্দন হবে। যদিও গত তিন মাসের হিসেব খতিয়ে একটা নিওরটিক বোধ মনে কাজ করে।

'দাবী'র কাহিনী ও সংলাপ লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সংলাপে শক্তিশালী সাহিত্যিকের হাতের স্পর্শ আছে। কিন্তু পরিচালনা পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্রের নয়, তাহলে আমরা 'সমাধানের' মত একটা সুন্দর ছবির সাক্ষাৎ পেতাম। 'দাবী'র পরিচালক ডি. জি. গল্পটিকে হত্যা করেছেন, দানা বাঁধবার অবকাশ নেই। পরিচালনার ক্ষেত্রে এ ধরণের ছেলেমানুষির প্রশ্রয় দেওয়া বোধ হয় আর উচিত হবে না। বিশেষত বাংলার দুর্নাম যখন ছড়িয়ে পড়ছে।

দিব্যেন্দু দত্ত

রেডিও

সিনেমা এবং রেডিও, আধুনিক কালের এই দুটি বিস্ময়কর শিল্প আবিষ্কারকে লেখকেরা মনে মনে সত্যিসত্যি হিংসা করেন কিনা তারাই বলতে পারেন, করলে এমন কিছু অহেতুক হয় না; কারণ একদল কলমবাজেরা উন্নাসিকতার হাওয়াই গম্বুজ থেকে যতই না কেন নাক সিঁটকান, শতকরা নিরানব্বই জন লেখকই জনপ্রিয়তা কামনা করেন, ভক্ত চান, এবং সহানুভূতিশীল পাঠক ও সমর্থকের অভাবে ভেঙে পড়েন। কিন্তু লোকপ্রতি আয় ছ'পয়সা এমনি দরিদ্র যে দেশ সেখানেও সিনেমা হাউস লোকে লোকারণ্য। রেডিও অবশ্য এখনো এতোখানি সমাদর পায়নি এদেশে; ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে, পার্কে পার্কে কী মোটরে মোটরে রেডিও-সেট চোখে পড়ে না আজো, তবু যতগুলি লোক প্রতিদিন এই বকবককরা যন্ত্রটা খুলে কান পেতে থাকে তাদের একটা হিসেব নেওয়া যদি কোনরকমে সম্ভব হতো তা হলে আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পেতাম যে-কোন একজন নামকরা সাহিত্যিকের জনপ্রিয়তা এর কাছে কতটুকু! এবং যে দ্রুততার সঙ্গে এই দুটি শিল্প ছড়িয়ে পড়ছে তাতে, বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, কল্পনা করা একেবারে পাগলামি নয় যে একদা শিল্পরস পরিবেশনে এরাই প্রধানাংশ নেবে। অবশ্য, বলাই বাহুল্য, সাহিত্যের স্থান পুরোপুরি দখল করা কখনোই সম্ভব নয়, যদিনা এমন কোন স্বর্গদিন কখনো আসে যখন প্রত্যেকটি লোক একটি করে সিনেমা কী রেডিওর মালিক হতে পারবে এবং ইচ্ছেমত যখন-খুশী যা-মন-চায় শুনতে পাবে। মধ্যযুগীয় নাচগান যাত্রা থিয়েটারও আশ্চর্য্য জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সাহিত্যকে ঠেলে ফেলতে পারেনি, এবং আধুনিক কালে, এই ব্যক্তিগত সাইকোলজিকাল কারণের জন্যেই, সিনেমা এবং রেডিওর বিপ্লবাত্মক প্রসার হলেও ইয়র-আমেরিকায় সাহিত্যের ব্যাপারে উৎসাহ ও আগ্রহে ভাটা পড়েনি। তবু এক শ্রেণীর লোক, এবং এরাই সংখ্যাগুরু, যে ক্রমে ক্রমেই আনন্দ উপভোগের এবং অবসরবিনোদনের উপায় হিসেবে এই দুটি যন্ত্রের দিকে ঝুকছেন, চোখ কান বন্ধ করে না থাকলে তা কখনোই আমাদের চোখ এড়াতে পারে না।

রেডিও অবশ্য আরো একটা মস্ত বড় কাজ করছে। সমস্ত পৃথিবীব্যাপী মানুষে মানুষে যে নিবিড় যোগাযোগ আজ বিজ্ঞানের দৌলতে সম্ভব হয়েছে তার প্রধান ঘটক এই বিচিত্র যন্ত্রটি। সকালে চায়ের টেবিলে বসে শুনলুম জাভা কী হনলুলুর গানবাজনা, রাত্রে খাওয়ার পর কানে ভেসে এল জার্মেনীর পিয়ানোর টুঙটাঙ, সমস্ত দিনের মধ্যে কতবার এলো

গেলো ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান। সীমানা নিয়ে যে খুনখারাবী ব্যাপার চলেছে পৃথিবীতে রেডিও এলো তার প্রধান শত্রু হয়ে।

জনচিত্তকে নাড়া দেবার এতখানি সুযোগ এবং সুবিধা যার, তার কাছে স্বভাবতই আমরা অনেক কিছু আশা করব। উদ্দেশ্যহীন কিচিরমিচির অথবা আবেদনশূন্য বুক্‌নিতেই যদি সারাদিন কাটে তা হলে ও-যন্ত্রটা না থাকলেই ভালো হতো, অনেকখানি নির্ভেজাল উপদ্রব থেকে রেহাই পেতো কান, এবং যান্‌যন্ত্রমুখরিত এই ছুটন্ত যুগে সে যে একটা কত বড় লাভ তা না বললেও চলে। অথচ এসব কথা আমি যন্ত্রটির বিরুদ্ধে বলছি না, যন্ত্র তো চিরদিনই নিরপেক্ষ, জলের মতোই বর্ণহীন। তাকে কাজে লাগাই তো আমরা, ভালো কাজে লাগাবো কী খারাপ কাজে লাগাবো সেও নির্ভর করে আমাদের উপর। এবং এরোপ্লেন অথবা ডিনামাইট প্রভৃতি যুগান্তকারী আবিষ্কারকেও যে আজকের দিনে আমরা সহজ মনে নিতে পারি না তার কারণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কল্যাণমুখীতার অভাব নয়, মানুষেরই দুর্বুদ্ধি। বিশেষ করে অহিংসাপন্থী শান্তিবাদীদের যন্ত্রবিরোধিতা তো একান্তরূপেই ক্যাপিটালিজিমের বিরুদ্ধে জেহাদ এবং বলাই বাহুল্য সে অভিযোগের মূলে যন্ত্র নয়, ধনবণ্টন ব্যবস্থা।

এরোপ্লেন অথবা ডিনামাইটের মতো রেডিও এখনো অতখানি অধঃপতিত হয় নি। আমরা অবশ্য চেষ্টার কসুর করিনি, তবুও যে এখনো এ-যন্ত্রটির নাম করে খোকা-শোয়ানো হয় না তার কারণ অতখানি মারাত্মক হওয়া বোধ হয় এর ধাতে নেই। তবু যতটা খারাপ হওয়া সম্ভব ইতিমধ্যেই তার সবখানি এর শেখা হয়ে গেছে। এ-ব্যাপারটা অবশ্য শুরু হলো এই মহাযুদ্ধের খুনখারাবি ঈর্ষাবিদ্বেষ থেকে এবং যার জন্য রেডিওর কানে মোচড় পড়তেই আমরাও আজ কানে তুলো দেই তার নাম প্রোপাগাণ্ডা।

যুদ্ধের নামে অবশ্য সাত খুন মাপ এবং যুদ্ধ যখন সর্ব্বভূক তখন এর নামে যা খুশী চালালেই হলো। প্রোপাগাণ্ডা বিশারদ বলে যাদের দুনিয়া জোড়া নাম সেই গোয়েবল্‌স্ সাহেবেরা কী করছেন আমি ঠিক খোঁজ রাখিনা, কিন্তু ক'লকাতা বলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে দ্বিতীয় শহর তার বেতার কেন্দ্র থেকে দিনের পর দিন যুদ্ধ নিয়ে যে কেলেঙ্কারি কাণ্ড হচ্ছে তাতে বুঝি আর কান থাকে না। চোখ বন্ধ করে আছি বহুকাল, কানে তুলো দিয়ে থাকার ব্যাপারটা অবশ্য একচেটিয়া ছিলো প্রভুপক্ষেরই। কিন্তু সে যে কতবড় আরাম এযুদ্ধ সুরু না হলে তা কী আমরা কোনদিন জানতে পেতাম্?

প্রতিদিনকার যুদ্ধের খবর এবং সেই খবরের বিচিত্র আলোচনা, যুদ্ধের বিষয়ে এর-ওর-তার একই ধরণের একঘেয়ে বক্তৃতা তো আছেই, সংস্কৃতি এবং শিল্পের অজুহাতে প্রায়ই একে ওকে ধরে এনে যে সমর-কীর্ত্তন হয় তাতে মর্য্যালের মৃত্যু অনিবার্য। রাগ-সঙ্গীত, কাব্য-সঙ্গীত, আধুনিক-সঙ্গীত প্রভৃতি বিচিত্র নামে ক'লকাতার বেতার কেন্দ্র থেকে সঙ্গীত পরিবেশিত হয়, ইতিমধ্যেই সমর-সঙ্গীত নামে নতুন একটি পদ সংযোজিত হয়েছে কিনা খবর পাইনি, কিন্তু 'পল্লীমঙ্গল আসর' নাম দিয়ে মাঝে মাঝে মঙ্গলবার বিকেলে রেডিও যে মজলিশ জমান তার মারফত এক ধরণের বিচিত্র সমর-নাটক শোনবার সৌভাগ্য আমার কয়েকবার

হয়েছে। আধো-আধো দুর্বল ভাষায়, বাধো-বাধো কথাবার্তায় বাতাস ভেদ করে এই অপূর্ব কথোপকথনগুলি আমরা যখন শুনি তখন যুদ্ধ সম্পর্কে ঘেন্না ধরে যায়। এসব ছাড়াও আছে বোঝার উপর শাকের আঁটি : এ. আর. পি। আমরা বাঙালীরা ভীরু অপবাদে বহুকাল ভূষিত, বোমার ভয়ে স্বভাবতই আতঙ্কিত, কিন্তু গত দু'বছর ধরে প্রতি সন্ধ্যায় রেডিও যে এ, আর, পির অভিযান চালিয়েছে তা শুনে শুনে আজ বারবার মনে হয় বিমান আক্রমণ এর চেয়ে বুঝি মারাত্মক না হতেও পারে!

যুদ্ধের সময় প্রোপাগাণ্ডা কিছুটা হবেই, এবং যেহেতু শিক্ষা এবং সভ্যতার বিপ্লবী বিকাশ সত্ত্বেও মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিবাদিতায় আস্থা স্থাপন এখনো সম্ভব নয়, প্রচারকার্য্যের প্রয়োজনও অনেকখানি অনস্বীকার্য্য। কিন্তু কোথায়, কী ভাবে এবং কতটা করলে তা সার্থক হতে পারে তা জানা দরকার। বিশেষ করে লক্ষ্যণীয় শ্রোতৃবর্গ এবং তাদের বিশিষ্ট রুচি ও মতভঙ্গি। বলাই বাহুল্য, প্রোপাগাণ্ডাও এক রকমের শিল্পকর্ম এবং যথার্থ শিল্পীর হাতে পড়লেই কেবল তা সার্থক হতে পারে। এবং এ-কথা দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হয় অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওতে এই ধরণের লোক সত্যই দুর্লভ। বাকী যারা রইলেন তাদের হাতে প'ড়ে বক্তার কী দুর্দশা তার একটু-খানি নজির কিছুদিন পূর্বে খবরকাগজ পাঠকেরা পেয়েছিলেন স্যর মরিস গয়ারের লেখা কেটে দেওয়ার ব্যাপারে। সেন্সরসিপ বলে যে দুধারি তলোয়ারটি এদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তা দিয়ে এরা যেমন করে সম্মুখে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে সব রকমের ভালো-মন্দ লেখা কচুকাটা করে চলেছেন তার পরেও কি কেউ আশা করতে পারেন, কোন ভালো লেখক কী শিল্পীর নির্ভেজাল অকৃত্রিম কথা আমরা কোনদিন রেডিওর মারফত জানতে পারবো? অথচ বক্তা নির্বাচনের বেলাও বক্তৃতার সঙ্গে কথকের সম্পর্ক প্রায়ই বিচার করা হয় না। হয়ত বিশিষ্ট কবিকে দেওয়া হল উত্তর আফ্রিকায় সামরিক জয়ের গুরুত্ব আলোচনা করতে অথবা খবর-কাগজের সম্পাদকের উপর ভার পড়ল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনার এবং সাপ্তাহিক খবর পরিবেশন করিতে ডাক এল বিশিষ্ট সাহিত্যিকের। এই জাতীয় মূর্খতার পরিচয় তো হামেশাই পাচ্ছি এবং কানে-তুলো ও পিঠে-কুলো বেধে-থাকা জাত বলেই হয়ত এতদিন সহ্য করে চলেছি। কিন্তু এখন বোধ হয় এমন একটা সময় এসে গেছে যখন এ, আই, আর কর্তৃপক্ষকে একটি সহজ সরল প্রশ্ন না করলেই নয়: কেন তারা এতগুলি টাকা এমনি ভাবে উড়োচ্ছেন?

আবুল হোসেন

নাটক

দেবদাস ঃ নাট্যভারতী

বর্তমান বাংলা রঙ্গমঞ্চের ঝোঁকটা ভাবপ্রবণতার দিকে। তাই পুরানো নাটকের পুনরুত্থানই চলেছে অধিকাংশ পাদপ্রদীপের সামনে। তাতে মনে হয়, এর পেছনে রয়েছে দর্শকগণের নেতিবাচক অভিব্যক্তি। বর্তমান বাংলাসমাজের দুর্যোগঘন পরিস্থিতি থেকে কোনো সমস্যাই পাদপ্রদীপের সামনে রূপ পেলে না—পুরানো জৌলুস-চমকিত জুবিলীতৃপ্ত কয়েকটি ছেঁড়াছাঁটা নাটকের অভিনয়ের প্রচেষ্টাতে রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ অর্থকরী বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। এবং এতে দর্শকদের পলায়নী মনোভাবও প্রতিভাত হয়েছে। রঙ্গমঞ্চ সমাজেরই প্রতিফলন। 'রিজিয়া', 'বিল্বমঙ্গল' বা 'বঙ্গেবর্গী' যখন পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে পরিতৃপ্তির সাথে অভিনীত হয়, তখন সমাজের কাঠামোটার ভগ্ন ঘূণেধরা রূপটি বারে বারে মনে পড়ে। মনে হয় সবকিছু বানচাল হয়ে গেছে।

তবু নাট্যভারতীর কর্তৃপক্ষ কিছুটা অগ্রসারী মনোবৃত্তির পরিচয় দিচ্ছেন। আর যাই হোক, 'দেবদাস' ঐতিহাসিক ভাববিলাস নয়। 'দেবদাসে' কিছুটা সামাজিক অভিব্যক্তি আছে। তবে এ সমাজ আজকের নয়, গতকালের, যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাবটা প্রকট হয়ে ওঠেনি। মাঠভরা ছিল ধান, পুকুর ভরা ছিল মাছ। রোম্যান্টিসিজ্‌ম-এর অন্ধ আওতায় যখন কলেজী যুবচিত্ত রাফখাতার পাতায় পাতায় সাহিত্যচর্চার ভেতর দিয়ে একটা দেওয়ানা বেদরদী দিল-এর বেদনা অনুভব করতো। কিন্তু বর্তমানে রুক্ষ রূঢ়তার মাঝে 'দেবদাসের' স্থান সন্দেহজনক।

আনন্দের কথা, নাট্যভারতী প্রেক্ষাগৃহে ভীড়ের অভাব নেই। দুঃখের কথাও বটে আনন্দের কথা এই যে, নাট্যভারতীর নাটক নির্বাচনে সমাজের স্পর্শ আছে, জাতীয়তার গন্ধ আছে। দুঃখের কথা, বাংলাদেশ এখনো শরৎচন্দ্রের প্রভাব-বিমুক্ত হতে পারলে না অনশন প্রপীড়িত বাংলার অন্ধ মূঢ়তার জয়ধ্বনির মধ্যেও। আজকের পথ হৃদয়দৌর্বল্যের পথ নয়।

দেবদাসের প্রতি উন্মাদনার শেষ নেই। শুধু শরৎচন্দ্রের উপন্যাসখানিই জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি। চলচ্চিত্রের 'দেবদাস' এখনো তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে আদর পায়। কুমার প্রমথেশ বড়ুয়ার জনপ্রিয়তার মূলে 'দেবদাস'। বড়ুয়া এবং দেবদাস মিলে মিশে এক হয়ে গেছে তরুণদের চোখে। নাটকীকৃত 'দেবদাসে'র প্রাচীরপত্র পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকদের একটা

তুলনামূলক আগ্রহ বেড়েছে—রঙ্গমঞ্চের 'দেবদাস'কে দেখবার জন্যে। তাই নাট্যভারতীর প্রেক্ষাগৃহের ভীড়ের অনেকটা কারণ, দর্শক মনের ঔৎসুক্য।

শরৎচন্দ্রের 'দেবদাসে'র নাট্যকার শ্রীশচীন সেনগুপ্ত। শচীনবাবু ইতিমধ্যে নাট্যকার হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি নিজে অনেকগুলি নাটক রচয়িতা। তাছাড়া 'পথেরদাবী'র নাট্যরূপ দিতে তিনি যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। কাজেই আশা করা গিয়েছিল, 'দেবদাসে'র বেলায়ও তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে। কিন্তু তিনি আমাদের হতাশ করেছেন। সবই পেলেম, কিন্তু শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস'কে পেলেম না। নাটক ঠিক জমে ওঠেনি, অনেক কিছু জোড়াতালি দিয়ে কর্তব্য সমাধান হয়েছে।

নাটক 'দেবদাসে' শরৎচন্দ্রের গাঁথুনির নিবিড় পরিবেশের অভাব। উপন্যাস যাদের পড়া নেই, তাদের পক্ষে 'দেবদাস' চরিত্র সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত। শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' গড়ে উঠেছে ভাবপ্রবণতার উপর—'দেবদাস' তরুণচিত্তের আবেগঘন স্বপ্নকামনা। এই ভাবপ্রবণতা যতটুকু তীব্র হয়ে উঠবে, ততটা ঘন হবে নাটকের পরিবেশ। নাটকে পার্বতীকে কিছুটা পাওয়া যায়, কিন্তু 'দেবদাস' অসমাপ্ত। আমরা বুঝতে পেরেছি 'দেবদাস'কে পার্বতী ভয়ানক ভালোবাসে, কিন্তু 'দেবদাসের' ভালোবাসাটা অত্যন্ত মামুলী। চন্দ্রমুখীকে ঠিক বোঝা গেল না, কারণ 'বসন্ত' নামক একটি নতুন চরিত্রের উৎপাতে কোনো চরিত্রই ফুটে উঠবার অবকাশ পেল না।

দেবদাসকে সাহায্য করবার জন্যেই নাকি শচীনবাবু এই চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। কারণ চুনীলালকে শরৎচন্দ্র গল্পের মাঝপথে কাশী ভাগিয়ে দিয়েছেন, সেজন্যে শচীনবাবুর বসন্তের দরকার পড়েছে। আমাদের কথা হলো চুনীলালকে কি শচীনবাবু আরো পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারতেন না—পারতেন না কি তিনি ধর্মদাসকে আরো বড়ো করে ধরতে? 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদের মতো, 'তরুবালা'র বেহারী খুড়োর মতো একটি মাতাল-দার্শনিককে আমদানী না করলেও চলতো। এতে নাটক অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে। শচীনবাবুর শীলমোহর-মারা শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' দর্শকরা দেখতে ইচ্ছে করে নি।

নাট্যভারতীর অভিনেতৃসংঘ শক্তিশালী। কিন্তু 'পার্বতী' চরিত্রের রূপায়নে শ্রীমতী সরযূবালা যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তাতে অন্য অভিনেতৃবর্গের অভিনয় ম্লান হয়ে গেছে। এই দক্ষ অভিনেত্রী একা একটি রঙ্গমঞ্চকে পরিপূর্ণ করে রাখতে পারেন। যে টুকু খুঁৎ আছে, সেটা নাট্যকারের দরুন।

শচীনবাবুর 'দেবদাস' দর্শকজনকে মর্মাহত করেছে। নাটক রচয়িতা হিসেবে তাঁর সুনামই বোধহয় এ জন্যে দায়ী। তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সরলভাবে ব্যবহার করতে পারেন নি।

অমল দত্ত

সমালোচনা

রবীন্দ্র রচনাবলী—১১শ, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ খণ্ড। বিশ্বভারতী। প্রতিখণ্ড ৪৷৷০।

আজো কেবলমাত্র বিদেশে নয়, বাঙলা দেশেও অনেকেরই কাছে রবীন্দ্রনাথ একান্ত ভাবে "গীতাঞ্জলী"র কবি। গীতাঞ্জলীতে রবীন্দ্র প্রতিভার যে চরম সরলতা ও উৎকর্ষ, সেকথা স্মরণ রাখলে এ নামকরণের কারণও বোঝা যায়, কিন্তু তবু বলতে হয় যে এ নামকরণে তাঁর প্রতিভার বিপুল পরিসর ও তীব্র সম্মুখাভিযানের গতি পূরোপূরি প্রকাশ পায় না। কল্পনা, ক্ষণিকার যুগেই জীবনের পরিপূর্ণ উপলব্ধির মধ্যেও অভিজ্ঞতার অতীত রহস্যের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথের চিত্তের ব্যাকুলতার আভাষ মেলে। খেয়াতে সে চাঞ্চল্য ও ব্যাকুলতা বাহিরের পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে নিজের অন্তরের মধ্যে ফিরে এসে সান্ত্বনা ও শান্তি খুঁজছে। কিন্তু চিত্তের সেই বিচিত্র ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার মধ্যেও জীবনের দৈন্য ও অপূর্ণতাবোধ গীতাঞ্জলীর গানে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথের বিপুল সাহিত্য সৃষ্টির আর কোথাও বোধ হয় তার তুলনা মেলে না। ইংরাজি গীতাঞ্জলীকে অনেকে বাঙলা গীতাঞ্জলীর অনুবাদ মনে করেন—যদিও এ ভুল অন্তত বাঙালীর পক্ষে অমার্জ্জনীয়—কিন্তু ইংরাজি গীতাঞ্জলীতে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন মনোবৃত্তির কবিতার সমন্বয়ে মেলে ঐশ্বর্য্য, বাঙলা গীতাঞ্জলীর একাগ্র ও গভীর আত্মানুভূতিতে পাই কবি-মনের বেদনাবোধের পরিচয়। নিবিড় ভক্তি ও আত্মনিবেদনের সুর এমন গভীর ভাবে তাঁর রচনায় পূর্ব্বে কোনদিন ধরা দেয় নি এবং সেই আত্মসমর্পিত চিত্তে রূপস্রষ্টার আত্মস্থ সচেতন কারুকার্য্যের স্থান নাই বলে এবার তাঁর ভাষায়ও এসেছে অপূর্ব্ব সরলতা। গীতাঞ্জলীতে তাই কবি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিজেকে ভুলতে চেয়েছেন, মানুষের প্রতিদিনের কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন কিন্তু সমস্ত ক্ষণ সমস্ত কাজ ও সমস্ত চেতনার মধ্যে তার মনে তীব্র বেদনা। প্রাণের দেবতা যেখানে চিত্তের গহনতম অতলে একেলা জাগেন, সেই নিভৃত দেবতার সঙ্গে মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাই গীতাঞ্জলীর সমস্ত গানে মুখর হয়ে উঠেছে। গীতিমাল্য, গীতালিতেও ভক্তির সেই সুর, কিন্তু যে বিরহ গীতাঞ্জলীর গানে বেদনায় মুখর, গীতিমাল্যে তার তীব্রতা পূর্ণতার সম্ভাবনায় স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে, বেদনার মধ্যেও মেলে অপরূপ শান্তির ইঙ্গিত। রবীন্দ্রনাথের মরমী কাব্য সম্বন্ধে কেউ কেউ বলে থাকেন যে রবীন্দ্রনাথ আকাঙ্ক্ষার কবি, তিনি পথসন্ধানী ও পথিকৃত, কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি, সে সাধনায় সিদ্ধির পরিচয় তাঁর কাব্যে মেলে না। কথাটার মধ্যে

আংশিক সত্য রয়েছে অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু গীতিমাল্য ও গীতালির অনেক গানে পরিষ্কার আভাষ মেলে যে মরমী সাধনার সিদ্ধি রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা দিয়েছে, সন্ধানের অবসানের ইঙ্গিত তিনি পেয়েছেন, কিন্তু লক্ষ্য স্থানে পৌঁছবার মুহূর্ত্তেই তাঁর মনে জেগেছে নতুন আদর্শের আহ্বান। গীতালির অনেক গানেই মেলে সার্থকতা ও শান্তির গভীর সুর। গীতিমাল্যে যে বেদনা মন্থর হয়ে এসেছিল, গীতালিতে তার মধ্যে পরিপূর্ণতার আভাষ, কিন্তু অভিজ্ঞতার চরম মুহূর্ত্তেও রবীন্দ্রনাথ ভোলেননি যে জীবনকে কেউ বেঁধে রাখতে পারে না—সামলে চলাই তার ধর্ম্ম, এবং তাই ভক্তির অন্তিম উপলব্ধির মধ্যেও তাঁর আকাঙ্ক্ষিত জীবন-দেবতা পান্থরূপেই তাঁর কাছে ধরা দিয়েছেন।

সম্মুখে চলার এই তীব্র গতি ও প্রচণ্ড আবেগ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে বলাকায়। ভাবতে বিস্ময় লাগে যে, যে কবির অন্তরের গভীর বিরহ বোধ, অভিজ্ঞতার সমস্ত অভিব্যক্তির মধ্যে প্রিয়তমের আকুতি, স্পর্শ ও অনুভূতি গীতাঞ্জলী, গীতিমাল্য ও গীতালি অবিনশ্বর গানে মূর্ত্ত করে তুলেছিল, সেই কবির কণ্ঠেই বেজে উঠেছে বলাকার রুদ্র জীবনবেদ, সমস্ত শান্তি ও প্রাপ্তি, সমস্ত সিদ্ধি ও অবসানকে নতুনের অগ্নিশিখায় দগ্ধ করে অনাগতের আমন্ত্রণ ও স্বীকৃতি। আরো বিস্ময় লাগে এই ভেবে যে, যে দেশে জীবনের গতি চিরদিন শ্লথ, পরাধীনতা ও ভিতর এবং বাহিরের সহস্র বন্ধনে যে দেশে যৌবন বন্দী, সে দেশের কবির কণ্ঠে যৌবনের অভিযানের এ তীব্র সুর কি করে সম্ভব হ'ল? বলাকার সমস্ত কবিতাই গতিচঞ্চল, কোথাও মুহূর্ত্ত বিরামের সম্ভাবনাই নাই, সমস্ত আকাশ বাতাস পৃথিবীর সঙ্গে কবির হৃদয়ও গতির তীব্রতায় দীপ্যমান। সংঘাতে ও সংঘর্ষে সেদিন ইয়োরোপে যে নতুন পৃথিবীর জন্মমুহূর্ত্ত আসন্ন, নব-যুগের যে আবির্ভাবের সম্ভাবনায় আজো সমস্ত মানুষের মন মৃত্যুরজনীর অন্ধকারের মধ্যেও নতুন ঊষার আশায় উদ্‌গ্রীব, তারি অনাগত আহ্বানে বলাকা প্রাণবন্ত।

গতির সে তীব্রতা, প্রাণবেগের সে চঞ্চলতায় যদি যতি না আসে, তবে বোধ হয় সৃষ্টি টিঁকতে পারে না। কেবলমাত্র স্থাবর ও স্থবির পৃথিবী নয়, গতিচঞ্চল কবিহৃদয়ও বেশী দিন সে একাগ্র অগ্রগতি সহ্য করতে পারে না। তাই বলাকার সেই দুর্ম্মদ মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণলীলার পরে আবার মেলে সহজের সুর—পলাতকা ও শিশু ভোলানাথে বিরাট বিশ্বের নাম-রূপহীন স্পন্দনের পরে আবার মেলে পরিচিত পৃথিবীর পরিমিত আধারের রূপরসগন্ধের স্পর্শ। পূরবীও রূপরস-ঘন, কিন্তু পলাতকা ও শিশু ভোলানাথে বলাকার যে তীব্র আবেগ ও চাঞ্চল্য আত্মবিস্মরণ খুঁজেছিল, পূরবীতে সে আত্মবিস্মরণের কোন ইসারা নাই। তাই পূরবীর কল্পনা-বৈচিত্র্য ও ভাষার ঐশ্বর্য্য আমাদের বিস্মিত করে। রবীন্দ্রকাব্যে বোধ হয় অন্য কোথাও এ রকম ভাষা ও ভাবের সমৃদ্ধি মেলে না। বলাকায় যে আবেগ নীহারিকার মতন আপনার বেগে উৎক্ষিপ্ত ও অগ্রগামী, সেই আবেগ পূরবীর স্বকেন্দ্রিক ক্ষেত্রে আত্মস্থ হয়েছে বলেই পূরবী ভাষা ও ভাবে ভাস্বর। এটাও লক্ষ্যণীয় যে পূরবীতেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় নতুন মানুষী সুর ফুটে উঠে। পূর্ব্বেও তিনি অজস্র প্রেমের কবিতা ও গান লিখেছেন, কিন্তু সে সমস্ত গান কখনো হাসিতে উজ্জ্বল, কখনো কৌতুকে উচ্ছল এবং সর্ব্বত্রই যৌবনের চিন্তাভাবনাহীন

কল্পনায় স্বপ্নময়। পূরবীতে যে প্রেমের কবিতা, তার মধ্যেও উচ্ছল উজ্জ্বলতা রয়েছে, কিন্তু সমস্ত হাসি ও কৌতুককে আর্দ্র ও গম্ভীর করে রেখেছে এক প্রচ্ছন্ন বেদনাবোধ—মানুষের সঙ্গে মানুষের যে চিরন্তন দূরত্ব, দেহ ও মনের সমস্ত সাধনার মধ্যে সেই দুর্লঙ্ঘ্য নিঃসঙ্গতার অনুভূতি। ফলে পূরবীর প্রেমকবিতায় দেহ মনের উপলব্ধিও প্রগাঢ়, পূর্ব্বের স্বপ্নালু পৃথিবী অতিক্রম করে নরনারীর সুখদুঃখময় অভিজ্ঞতার অপরূপ অভিব্যক্তি। পূরবীতে এই যে নতুন মানবিক সুর, মহুয়া ও পরিশেষে সে সুর যেন আরো প্রবল, এবং তার ফলে এ যুগে রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যে প্রেমের নতুন একটী দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় পুরাতন লোকনাট্যের কাঠামোর সঙ্গে ইয়োরোপের প্রতীক-নাট্যের ভঙ্গির সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব যে নাট্যরূপ সৃষ্টি করেছিলেন, শারদোৎসব, প্রায়শ্চিত্ত ও রাজাতে আমরা তার প্রথম বিকাশ দেখেছি। রচনাবলীর আলোচ্য খণ্ডগুলিতে সেই ধারা স্পষ্টতর ও সুদৃঢ় হয়ে ধরা দেয়। এ নতুন নাট্য রীতিতে প্রকাশের চেয়ে ব্যঞ্জনার দিকে দৃষ্টি বেশী, চরিত্রসৃষ্টির চেয়ে মানুষের চিরন্তন হৃদয়াবেগকে মূর্ত্ত করবার সাধনা প্রবলতর, তাই তাদের মধ্যে ব্যক্তিস্বরূপ, ঘটনাপ্রবাহ বা চরিত্রের দ্বন্দ্ব মূলকথা নয়—তাদের মূলকথা মানুষের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও পারিপার্শ্বিকের পরস্পরের প্রতিক্রিয়া। অচলায়তন, ডাকঘর, ফাল্গুনী, গুরু, অরূপরতন ও ঋণ শোধ—এ ছয়খানি নাটককে একসঙ্গে বিচার করা চলে। বস্তুতপক্ষে তাদের প্রতিপাদ্যও মূলত এক। সমাজের আচারে ব্যবস্থায় জড়তা ও প্রাণহীনতার বিরুদ্ধে যৌবনের বিদ্রোহ ঘোষণাই তাদের মর্ম্মকথা। জীবনের ট্র্যাজেডির মূল এইখানে যে এককালে যা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা হিসাবে সুরু হয়, উত্তরকালে তাই হয়ে দাঁড়ায় ভবিষ্যৎ অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। জন্মের মধ্যেই মৃত্যুর বীজ লুকিয়ে আছে—একথা কেবলমাত্র জীবজগতে নয়, মানুষের সমাজ-সংগঠন ও সমাজ মানসের বেলায়ও সেকথা সমান খাটে। এককালে যা ছিল কল্যাণময় ও প্রাণবন্ত, পরবর্ত্তীকালে তাই অকল্যাণের ভিত্তি ও প্রাণঘাতী। পুরাতন দূরের কথা, বর্ত্তমানকে আঁকড়ে ধরে থাকাও চলে না, বাঁচতে হলে মানুষকে অবিরত অনিবার্য্যভাবে সম্মুখে অভিযান করতে হবে—এই সত্যই এ নাটকগুলিতে বারে বারে বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে। ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ডে এ্যালিস সবিস্ময়ে দেখেছিল যে সারাদিন ছুটবার পরও সে যেখানে সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তার প্রশ্নের উত্তরে রাণী তাকে বলেছিল যে সে দেশের রীতি যে প্রাণপণে সামনে এগুলে তবু কোনমতে স্বস্থানে টিঁকে থাকা যায়, তা নইলে দুর্ব্বার কালপ্রবাহ মুহূর্ত্তের মধ্যে তাকে অতীত জঞ্জালের মধ্যে ফেলে দেবে। রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য নাটকগুলিও সেই সত্যকে রূপক ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে মূর্ত্ত করে তুলেছে, এবং সেই সঙ্গে আবিষ্কার করেছে যে জীবনের এ সত্য সহজ ও সরল হৃদয়ের কাছেই ধরা পড়ে, জটিলতা ও আড়ম্বরের প্রাচুর্য্যে আমরা একথা ভুলে যাই। ঐতিহ্য ও ইতিহাসের বোঝায় যারা আচ্ছন্ন, তাদের তুলনায় বরং স্বভাবসরল মাটীর মানুষ সজীব ও স্বাধীন, কিন্তু সে স্বাধীনতা আত্ম-অচেতন বলে যে কোন মুহূর্ত্তে তা ভেঙে যেতে পারে। বস্তুতপক্ষে ঘটেও তাই। মাটীর মানুষ নিজের সহজ প্রাকৃতিক জীবন যাপন করতে পারে ঠিক ততক্ষণ, যতক্ষণ সভ্যতাভিমানী বিজ্ঞ নাগরিক এসে তার জীবনের

ভিত্তিমূলে নাড়া না দেয়। যখন তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, তখন প্রকৃতির শিশুরা বহুক্ষেত্রেই পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়—তাদের সেই আদিম সরলতা তাদের বাঁচাতে পারে না। কিন্তু সভ্যতাভিমানীরও মুক্তি নাই। সেখানে আড়ম্বরের যে সূচনা, বংশপরম্পরায় তা পুঞ্জীভূত হয়ে ঐতিহ্যের জঞ্জালে একদিন প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করতে চায়। অপ্রশ্ন স্বীকৃতি ও সন্দেহাকুল জিজ্ঞাসা—এ দুই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন সেই গুরু যিনি ইতিহাসে অভিজ্ঞ, ঐতিহ্য যাঁর মজ্জাগত, কিন্তু সমস্ত ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সহজভাবে গ্রহণ করে যিনি জীবনের সরলতা ও উদ্‌গ্রীব অগ্রগতিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন।

মুক্তধারা ও রক্তকরবীর মধ্যেও জীবনের অগ্রগতি ও কীর্ত্তির স্থবিরতার দ্বন্দ্ব সমান পরিস্ফুট। তবু পূর্ব্বের নাটকগুলির সঙ্গে এ দুখানি নাটকের একটা তফাৎ স্পষ্ট। পূর্ব্বের নাটকগুলিতে জীবনের অগ্রগতির পথে বাধা উত্তরাধিকার সূত্রে জমে উঠেছে—নাটকের নায়ক নায়িকা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবের পূর্ব্বেই তাদের জীবনের ধারা নির্দ্দিষ্ট, যৌবনের অভিযান সেখানে ঐতিহ্য ও ইতিহাসের বিরুদ্ধে। রক্তকরবী ও মুক্তধারায় যে বিদ্রোহ ও দ্বন্দ্ব, স্বকৃত বন্ধনের বিরুদ্ধেই তা তীব্র এবং সেজন্য অন্য নাটকগুলির তুলনায় এ দুখানি নাট্যগ্রন্থে সংঘাত ও সংঘর্ষ অনেক বেশী বাস্তব। রবীন্দ্রনাথ নিজে রক্তকরবী সম্বন্ধে বলেছেন যে কৃষিজীবনের স্বর্ণসীতাকে যেদিন নাগরিক সভ্যতাদানব রাবণ এসে লুণ্ঠন করে নিল, সেদিন মানুষের অন্তরে ও বাহিরে, সমাজে ও ব্যক্তিচরিত্রে যে দ্বিধাবিভাগ, তাদের দ্বন্দ্ব আজো মেটেনি। মুক্তধারা ও রক্তকরবী সেই দ্বন্দ্বেরই নাট্যরূপ। যন্ত্র যে মানুষ তৈরী করে, সেই মানুষকেই যন্ত্র আঘাত হানে, এবং তখন স্বেচ্ছাচারী যন্ত্রকে বশীভূত করবার সাধনায় যন্ত্রীকেও আত্মদান করতে হয়। স্বকৃত বন্ধনের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ, অভ্যস্ত আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেয়ে তা বেশী তীব্র হতে বাধ্য, এবং শুধু তাই নয়, আচার বহুদিন সঞ্চিত বলে সেখানে তবু সমন্বয়ের খানিকটা সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সকৃত কর্ম্মকাণ্ডের যে বন্ধন, তাকে ভাঙতে গেলে দুঃখ বেদনা ও-মৃত্যু অনিবার্য্য। বিয়োগের এ অমোঘ বিধান মুক্তধারা ও রক্তকরবীর সুরকে গভীর ও তীব্র করে তুলেছে, তাই অন্য নাটকগুলিতে যেমন পরিসমাপ্তিতে তৃপ্তির আভাষ পাই, এখানে তার বদলে মেলে জীবনের উত্তুঙ্গ শিখরে ঝটিকার আবেগ ও উচ্ছ্বাস, মৃত্যুর গর্জ্জনের মধ্যেও মহিমান্বিত নবজীবনের বিদ্যুদ্দীপ্ত আশ্বাস। এ সমস্ত বিবেচনায় মুক্তধারাকে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাট্য রচনা বলা চলে, কারণ যে বাস্তবতা ও শক্তির পরিচয় রক্তকরবীতেও মেলে, মুক্তধারায় তারা আরো উজ্জ্বল ও প্রবল। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক ইতিহাসের মধ্যেই বোধ হয় মুক্তধারার যাথার্থ্যের সন্ধান। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই জাগ্রত বুদ্ধি ও সচেতন রূপশিল্পী, তাই জাতীয় জীবনের সমস্ত আন্দোলন-হিল্লোলেই তাঁর মন সাড়া দিয়েছে। বঙ্গভঙ্গের যুগে তাঁর কণ্ঠেই বেজে উঠেছিল দেশ ও জাতির মুক্তির সাধনা, স্বাধীনতার তীব্র আকুতি। যুদ্ধান্ত ভারতবর্ষে ১৯২০ সালে আবার জাতীয় জীবনে যে ভাবপ্লাবন, অসহযোগ আন্দোলনেই তার অভিব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনে সেভাবে যোগ দেননি, আন্দোলনের নেতিবাচক রীতি ও কর্ম্মপদ্ধতি তাঁকে পীড়িত করেছে, কিন্তু তবু তার মধ্যে যে বিপুল জাগৃতি, জাতীয় সত্তার যে বিস্ময়কর

বিকাশ, তাঁর কবিচিত্ত তাতে সাড়া না দিয়ে পারেনি। মুক্তধারা তাই অসহযোগ আন্দোলনের ভাবরূপ, এবং জাতীয় সংগ্রামের ভিত্তিতে গ্রথিত বলে মুক্তধারা জীবন্ত ও প্রাণময়। এত শক্তি ও দৃঢ়তা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের আর কোন নাট্য রচনায় মেলে না।

দুই বোন এবং মালঞ্চের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য দুই-ই স্পষ্ট। মনে হয় যে ঔপন্যাসিক পরিস্থিতি রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় এসেছিল, দুই বোনে তার অভিব্যক্তি তাঁকে তুষ্ট করতে পারেনি বলে অল্পদিনের সময়ান্তরে সেই নাট্যবস্তু নিয়েই মালঞ্চে তিনি তাকে ভিন্ন রূপ দিয়েছেন। মালঞ্চের মতন নিষ্ঠুর লেখা রবীন্দ্রনাথের হাতে বেশী বেরোয়নি, কিন্তু সে নিষ্ঠুরতার ভিত্তি সাহিত্যিক ন্যায়। পূর্ব্বের বহু রচনায় সমাজ, সংস্কার বা স্বভাবের আকর্ষণে চরিত্রের বিকাশে বিচ্যুতি ঘটেছে—এ প্রসঙ্গে সহজেই নৌকাডুবি, চোখের বালির কথা মনে পড়ে—কিন্তু মালঞ্চে কবি যেন প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলেন যে ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্যে আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, বিনাদ্বিধায় সেখানে এগিয়ে চলব। মালঞ্চে গীতিকবিতার তীব্রতা তাই ধরা পড়ে কিন্তু ফলে যুক্তি ও গতির যে বৃদ্ধি, সাহিত্যিক উৎকর্ষ সে পরিমাণে বাড়েনি। জীবন নানা পথে এঁকে বেঁকে চলে এবং আবেগের বাষ্পে তার আকাশকে কেবল আচ্ছন্ন করে না, রঙীন করেও তোলে। নিরাবেগ বুদ্ধির গতি মালঞ্চকে খানিকটা একদেশদর্শী করেছে একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। শেষের কবিতাতেই রবীন্দ্র উপন্যাসের মধ্যে নাট্যভঙ্গীর প্রথম পরিচয় মেলে—দুই বোনে ও মালঞ্চে নাট্যরস আরো জমাট হয়ে এসেছে, চার অধ্যায়ে সে নাট্যভঙ্গী এত প্রবল যে তাকে উপন্যাস না বলে হয়তো নাট্য-উপন্যাস বলাই সঙ্গত। এলিজাবেথীয় যুগের নাটকের সঙ্গে চার অধ্যায়ের ঘটনাসংস্থান ও চরিত্র বিকাশের দিক দিয়ে সাদৃশ্য রয়েছে, কিন্তু এলিজাবেথীয় ট্র্যাজেডিতে ঘটনার যে স্বল্পতা ও তীব্রতা চরিত্রকে বিকশিত করে তোলে, তার মূলে রয়েছে প্রকাশের সাক্ষাৎ ভঙ্গী। চার অধ্যায়ে সে প্রকরণ অসাক্ষাৎ, এবং ফলে প্রকাশ ভঙ্গী উপন্যাসের উপযোগী হলেও গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট করে তুলতে পারেনি। উপন্যাস রচনায় প্রকাশ ভঙ্গী অসাক্ষাৎ হলে ক্ষতি নেই, কারণ উপন্যাসের গতি মন্থর, ঘটনার বৈচিত্র্যের অবকাশ সেখানে অনেক বেশী। চার অধ্যায়ে সঙ্কীর্ণ পটভূমির উপর সরল রেখায় ঘটনার অগ্রগতিতে উপন্যাসের প্রসার ও পরিসর মেলেনি, অন্তপক্ষে ঘটনাকে চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত করে প্রকাশ করায় নাটকীয় রচনারীতিও সম্পূর্ণ হতে পারেনি। প্রকাশভঙ্গী ও বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের পরিচয় চার অধ্যায়ের সর্ব্বত্র মেলে—ফলে চার অধ্যায়ের বর্ণনায় যে জগতের ছবি ফুটে উঠে, সে জগত সুস্থ স্বাভাবিক পৃথিবী নয়, জটিল ও চিন্তাপীড়িত, অস্বাভাবিক ও অবাস্তব জগতের প্রতিচ্ছবি সেখানে পাই। সন্ত্রাসবাদের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য এ অবাস্তব অস্বাভাবিকতাতে সার্থকতা থাকতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও চার অধ্যায় যে আমাদের তৃপ্ত করে না একথা নিঃসন্দেহ।

সেই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির পরে গল্পগুচ্ছের আকস্মিক আবির্ভাব আমাদের বিস্মিত করে, কিন্তু হঠাৎ এতদিন পরে এখানে গল্পগুচ্ছের স্থাননির্দ্দেশের স্বপক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। গদ্য রচনার সমাবেশ নিয়ে আমাদের আপত্তি পূর্ব্বেও বহুবার জানিয়েছি। কিন্তু গল্পগুচ্ছের স্থাননির্দ্দেশ মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কালক্রম অনুসারে সাজালে গল্পগুচ্ছের স্থান

বহু পূর্ব্বে হওয়া উচিত ছিল, কি উদ্দেশ্যে যে বিশ্বভারতী এ রকম খামখেয়ালী ভাবে গল্পগুচ্ছের স্থান এখানে নির্দ্দেশ করেছেন, তা বোঝা কঠিন।

প্রবন্ধগুলির বিশদ আলোচনা আজ এখানে সম্ভবপর নয়। আলোচ্য খণ্ডগুলিতে স্বদেশ, সমাজ, শিক্ষা, শব্দতত্ত্ব, ধর্ম্ম ও শান্তিনিকেতন—এই সংগ্রহগুলি স্থান পেয়েছে বল্লেই পাঠকেরা রবীন্দ্র প্রতিভার ঐশ্বর্য্য, চিন্তার ও সুস্থ মুক্তবুদ্ধির পরিচয় পাবেন।

ছাপা, বাঁধাই সমস্তই ভাল—আমাদের একমাত্র অভিযোগ রচনা সমাবেশ নিয়ে। তার ফলে রবীন্দ্র প্রতিভার পরিণতি ও প্রসার বুঝতে অনেক ক্ষেত্রেই বাধা দেয়।

হুমায়ুন কবির

ভারতবর্ষ ও মার্ক্সবাদ—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সমবায় পাবলিশার্স। দাম ২৲

'ভারতবর্ষ ও মার্ক্সবাদ' যদি কোনো বই-এর নাম হয় তাহলে স্বভাবতই পাঠকরা ভেবে নেন যে ভারতবর্ষের সঙ্গে মার্ক্সবাদের যোগাযোগ বিশ্লেষণ করে দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য থাকবে। এই স্বাভাবিক ধারণা নিয়ে বইটি পড়তে গেলে পাঠকরা হতাশ হবেন, গোড়ায়ই এ কথাটা বলে রাখা দরকার। ১৬৮ পৃষ্ঠার বই-এ ২৭ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধে ভিন্ন ('ভারতের শ্রমিক আন্দোলন') ভারতবর্ষের সঙ্গে মার্ক্সীয় কর্ম্মপ্রণালীর যোগাযোগের কথা বইটিতে প্রায় অনুপস্থিত। 'ভারতবর্ষ ও কার্ল মার্কস্' প্রবন্ধে কার্ল মার্ক্স তদানীন্তন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করতেন মার্ক্সের রচনা থেকে তা-ই অনুবাদ করে দেখানো হয়েছে। তাছাড়া আর যে প্রবন্ধগুলো আছে তার কিছু ভারতবর্ষের জাতীয়তা, দুর্গতি ও দারিদ্র্য নিয়ে আর বাকিগুলো সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি, যুদ্ধ, রুষ বিপ্লব ও সোভিয়েট রাশ্যার গুণগান নিয়ে। কাজেই বইটি শেষ করে আমাদের মনে প্রশ্ন আসে—মার্ক্সের দর্শন ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের আলোতে ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসকে দেখাবার উদ্দেশ্য নিয়েই কি লেখক এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন—না কি সোভিয়েট রাশ্যার প্রতি পাঠকদের অনুরাগী করে তোলাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল! এ প্রশ্নের উত্তরে সাধারণ ভাবে এ কথাই বলা যায় যে উদ্দেশ্য যা-ই থাকুক, বইটির নামকরণে লেখক পাঠকের ধারণার পরোয়া করেন নি। আর কঠোর ভাবে বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয় যে কতগুলো ভাববিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের উপর মার্ক্স নামের গঙ্গাজল ছিটিয়ে লেখক মার্ক্সের প্রতি আগ্রহশীল পাঠকদের কাছে বইটিকে আকর্ষণযোগ্য করে তুল্‌তে চেয়েছেন।

নামমাহাত্ম্য ছেড়ে দিলে বইটিতে যা পাওয়া যায় তা-ও আজকের দিনে খুব বেশি মহৎ নয়। বাংলায় কিছু পরিবেশন করতে গেলে যদি প্রতিপদেই ইংরেজি পুঁথির দিকে চোখ ফেরাতে হয়, লেখকের এ অবস্থাটাকে এখন আর বাঙালী পাঠক গুণমুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেন না। বক্তব্যকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সত্যসিদ্ধ এবং বিশ্লেষণকে নিরপেক্ষ করে তুল্‌তে পারলেই কোনো প্রবন্ধকারকে বাহবা দেওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশত লেখকের সেই শক্তি নেই। এমন কি মার্ক্সকে তিনি যথার্থ বুঝ্‌তে পেরেছেন কিনা সে-সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে, যদিও মার্ক্সের

দাহাই দেবার সুযোগ কোনো সময়ই তিনি অবহেলায় নষ্ট করেন নি। প্রায় একশ বছর আগে ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের কথা বল্‌তে গিয়ে মার্ক্স বলেছিলেন :

"……একটা বিরাট দেশে রেলপথের শাখাপ্রশাখা বজায় রাখতে গেলে রোজকে রোজ । দরকার তা সরবরাহের জন্য কারখানা চাই। এর ফলে যে সব শিল্পের সঙ্গে রেলপথের কোনো সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই, তাদের চাহিদা মেটাবার জন্য কলকব্জার প্রচলন বাড়বে। তাই রেলপথের ব্যবস্থা সত্যই ভারতবর্ষে আধুনিক কল-কারখানার অগ্রদূত হবে।"

কৃষিজীবী ভারতবর্ষে ধনতান্ত্রিক ইংরেজ-রাজত্ব যে শ্রমশিল্পের বীজ নিয়ে সুরু হয়েছে এ কথাটাই মার্ক্স এখানে বল্‌তে চেয়েছেন। রেলপথের বিস্তারের দরুণ শিল্পদ্রব্যের কারখানা গড়ে তোলা অবশ্য প্রয়োজনীয় হবে বলেই তখন যুক্তিসিদ্ধ মনে হয়েছিল। কিন্তু কার্য্যত তা খুব বেশি হয়ে ওঠেনি। Industrial Revolution বল্‌তে যা বোঝায়—এবং মার্ক্সও যা বল্‌তে চেয়েছিলেন, আজ একশ বছর পরেও ভারতবর্ষের সে সুদিন আসে নি। হয়ত একদিন তা আসবে কিন্তু আজও ভারতবর্ষ মুখ্যত কৃষিজীবীর দেশই রয়ে গেছে। ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে এ সত্য অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়—ভারতবর্ষে যৎসামান্য শিল্পপ্রচেষ্টায় উৎসাহিত হয়ে হীরেনবাবুর মতো বলা যায় না : "এখানে বৈজ্ঞানিক শিল্পব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে সাম্রাজ্যতন্ত্রের বহু বাধা সত্ত্বেও, মার্ক্সের এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় সফল হয়েছে।"

তারপর হীরেনবাবু 'ভারতে জাতীয়তার জন্ম' সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে তিন তুড়িতে শিবপূজো সেরে দেবার মতো অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করছেন। তাঁর প্রবন্ধে অসহযোগ আন্দোলনটা মাত্র একটি বাক্যের দৈর্ঘ্য লাভ করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছে। তিনি বল্‌ছেন : "মহাযুদ্ধের সময় যে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় ঘটেছিল, তারই ফলে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনে জনসাধারণের যোগদান সম্ভব হয়েছিল।" অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা একবাক্যে বল্‌বেন যে অসহযোগ আন্দোলনের এ রকম বিশ্লেষণে সত্যের যথেষ্ট ঘাটতি থাকে। অসহযোগ আন্দোলনের কর্ম্মতালিকায় ছিল, স্কুল, বিদেশী কাপড়, কাউন্সিল ও সরকারী চাকরি বয়কট। কার্য্যত দেখা গেছে দলে দলে ছেলেরা স্কুল ছেড়ে এসেছে, উকীল-মোক্তার কাছারীতে যান নি, দেশের নেতৃস্থানীয়রা কাউন্সিল বর্জ্জন করেছেন, স্বরাজ্য ফণ্ডের জন্য চাঁদা তোলা হয়েছে অগ্ন্যুৎসব করা হয়েছে মিলের কাপড় দিয়ে, দোকানীরা হরতাল করেছে, বয়কট করা হয়েছে, ডিউক অব্ কনটকে ও যুবরাজকে। বহুদিন হতে হিন্দু মধ্যবিত্তের মনে যে জাতীয়তা-বোধ জেগে উঠছিল গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংসার পথে তারই প্রথম অভিব্যক্তি হয়েছিল একটি ব্যাপক আন্দোলনে—খিলাফতের সমস্যার সূত্রে মুসলমান মধ্যবিত্তও গান্ধীজীর আন্দোলনে যোগদান করেন। মহাযুদ্ধের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে এ আন্দোলনের যোগাযোগ খুব অল্পই ছিল। মহাযুদ্ধের অবসানে মধ্যবিত্তদের মনে ছিল শুধু ভারতবর্ষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মোহ-মুক্তি। শাসক-জাতির সঙ্গে সহযোগিতা করেও যখন তাঁরা ভারতবর্ষের জন্য ডোমিনিয়নের মত সমান অধিকার অর্জ্জন করতে পারলেন না, তখন তাঁদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করবার একমাত্র পথ ছিল অসহযোগ আন্দোলনে। আন্দোলনের নেতা গান্ধীজীর কাছে স্বরাজের দাবী তখন একটা পবিত্র

কর্ত্তব্য বলেই মনে হ'ত। কাজেই যাঁরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা বস্তুটি তাঁদের মনে একটি বিমূর্ত্ত ভাব ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। যেটুকু ছিল, তা হচ্ছে সমান অধিকার বোধ, আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের গোড়ার কথাই অনেকটা তাই। রাষ্ট্রক্ষমতা পাবার জন্য লড়াই করার নামই রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন, অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ে বিপন্ন হয়ে দাঙ্গা করাকে কোনো মার্ক্সবাদী হয়ত রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন বলেন না। তাছাড়া মার্ক্সবাদীরা নিশ্চয়ই কোনো আন্দোলনের সঙ্গে ব্যক্তি-বিশেষের নাম জড়িত করে আন্দোলনের নামকরণও করেন না। গান্ধীজীর 'সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন'—কথাটি ব্যবহার করে কি হীরেনবাবু বল্‌তে চান যে আন্দোলনের বীজ সমাজে ওতোপ্রোত ছিল না বা এ আন্দোলনের পেছনে সমাজের আকাঙ্ক্ষা ব্যগ্র হয়ে ওঠেনি? ইংরেজি-সংস্কৃতি যে মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজেদের প্রসার ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে দিনের পর দিন সচেতন করে তুল্‌ছিল, প্রধানতঃ সে সমাজই ছিল সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতা ও ভলান্টিয়ার। 'জনসাধারণ' বল্‌তে দেশের যে অগণিত শ্রমিক-চাষী বোঝায়, তারা এ আন্দোলনে জড়িত ছিল বল্‌লে তাতে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না।

সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা লেখক আরো অনেক ক্ষেত্রেই করতে পারেন নি। 'রুষ'-বিপ্লব সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়েও ষ্ট্যালিনকে অহেতুক মর্য্যাদা দিতে চেষ্টা করেছেন। আজকের মর্য্যাদাবান ষ্ট্যালিনের মোহে একথা বলা চলে না যে বিপ্লবের সময়েও ষ্ট্যালিন লেনিনের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। ইতিহাসের দিকে যাঁর পরিচ্ছন্ন চোখে তাকাবার শক্তি আছে, তিনিই বল্‌বেন যে রুষ-বিপ্লবে লেনিনের পর যাঁর নাম উচ্চারণ করা যায় তিনি ষ্ট্যালিন নন। অথচ হীরেন বাবু অবিচলিত ভাবে বলে যাচ্ছেন: "লেনিনের বিরাট ব্যক্তিত্ব তাঁর শিষ্যদের (!) মধ্যে, বিশেষ করে ষ্ট্যালিনের একাগ্র কর্ম্মক্ষমতার ভিতর দিয়ে, তখন বিপ্লবের আয়োজনে প্রযুক্ত না থাক্‌লে হয়তো ১৯১৭ সালের প্রচণ্ড বৈপ্লবিক সুযোগও নষ্ট হয়ে যেত।" শুধু তাই নয়, বিপ্লবোত্তর অন্তর্যুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনায় ('সোভিয়েট ইতিহাসের একটী অধ্যায়') লেখক অত্যন্ত সাবধানে প্রতিপদে ট্রট্স্কির নামটা উহ্য রেখে গেছেন। অথচ কে না জানে যে রাশ্যার অন্তর্যুদ্ধের অধ্যায়ে সোভিয়েটের পক্ষে একমাত্র নায়ক ছিলেন ট্রট্স্কি? এ-নামটির প্রতি অহেতুক বিদ্বেষ ও নামটি বর্জ্জন করবার জন্য হাস্যকর সতর্কতা যদি কোনো লেখকের থাকে, তবে তাঁর পক্ষে সেই বিপ্লবের ইতিহাস লিখ্‌তে যাওয়াই ভুল। বাঙ্গালী পাঠক ষ্ট্যালিন-ট্রট্স্কি বিরোধে নিজেদের কোনো বিশেষ দলভুক্ত মনে করতে চাননা—বিদেশের ইতিহাসের সত্য রূপটাই জানতে এবং বুঝ্‌তে চান আর তাই পাঠকদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় হীরেনবাবু নিজেকে হয়ত বাঙালী বা ভারতীয় বলে মনে করেন না—মনে করেন তিনি রুষীয় এবং ষ্ট্যালিনের পক্ষাবলম্বী। তাঁর এই রুষ-পরায়ণতার দরুণ অনেক সময়ই পাঠকের কাছে তিনি বিরক্তিকর হয়ে উঠেছেন আর তাই পাঠকদের ইচ্ছা হয়—লেনিনের যে কথাগুলো তিনি পাঠককে শোনাবার জন্যে উদ্ধৃত করেছেন সেগুলো তাঁকেই শুনিয়ে দিতে:

"আমরা মনে করি যে বিশেষ করে রুষদেশে সাম্যবাদীরা মার্ক্সবাদকে স্থানীয়

অবস্থানুযায়ী প্রয়োগ করবেন, কারণ মার্ক্সবাদ শুধু মোটামুটি সমাজব্যবস্থা ও তার রূপান্তর সম্বন্ধে কয়েকটি বিধির কথা বলেছে, যার প্রয়োগ ইংলণ্ড বা ফ্রান্স বা জার্ম্মানীতে বিভিন্ন রূপেই ঘটবে।"

এ কথাগুলো প্রণিধান করে লেখক বুঝ্‌তে চেষ্টা করুন যে রাশ্যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখলেও মার্ক্সবাদের সম্মান হানি হয় না।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

TAGORE—A Study: Dhurjati Prasad Mukerji. Padma Publications Ltd., Bombay. Rs. 3/4.

বৃহৎ ব্যক্তিদের জীবন ঐতিহাসিক পরিণতি ও প্রশ্নে জড়িত। বহু শতাব্দীর সঞ্চিত সাধনার তাঁরা এক একটি ফসল। ভৌগলিক সীমাকে অতিক্রম করে তাঁরা কল্যাণ বহন করে আনে। তাঁদের জীবনে সংস্কৃতির রূপান্তর, তাঁদের উৎপত্তি সংস্কৃতির সংঘর্ষে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনেও বাংলার তিনশত বৎসরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ। শুধু তাই নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সীমানায় তিনি হিমালয়ের মতো বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে বসে ভারতীয় সংস্কৃতির মানবতা-ধর্মের আদর্শ-পরিবেশটি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এতো বৃহৎ, এতো মহৎ ব্যক্তি পৃথিবীর বুকে অল্পই জন্মেছে। প্রাণিতত্ত্বের পরিণত চিন্তার একটি সুষ্ঠু ফল রবীন্দ্রনাথ। তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের চোখে এত বড়ো বিস্ময়, যাঁর অসাধারণ ব্যক্তি ও পিতৃপরায়ণতা বাংলার ভগ্ন, জীর্ণ-শীর্ণ ভাষাকে শক্তিশালী চিন্তার বাহক করে তুলেছে, রিকেটি সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন ভারতের সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারাকে বহন করে চলেছে। তাঁর উৎস বেদ-উপনিষদে। চিন্তা বিশ্বমুখীন। নদী যেমন পার্বত্য স্রোত থেকে ক্রমে লোকালয়ে এসে বিরাট জলধারাকে বহন করে সাগরে আত্মসমর্পণ করে, রবীন্দ্রনাথও তেমনি বাংলার ভৌগলিক সীমাকে অতিক্রম করে সমগ্র ভারতের চিন্তাকে উর্বর করে বিশ্বের কল্যাণ কামনা করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল বন্ধন মুক্তি—ব্যক্তিগত, জাতিগত, সার্বজনীন। যেখানে ব্যক্তিকে বেঁধেছে অহঙ্কারে, জাতিকে অপমানে, বিশ্বকে বিভেদে—রবীন্দ্রনাথের লেখনী ও কর্মানুষ্ঠান তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। ভারতের ধর্ম—মানবতার ধর্ম। বহুজাতি ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে ভারতীয় আদর্শ গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের রচনা-সম্ভারে সে আদর্শ সমগ্র বিশ্বে মুক্তি পেয়েছে। সৌন্দর্যপিপাসার মধ্যে মঙ্গলময়ের আসন সমগ্র মানব সমাজের অখণ্ডতার ভেতর দিয়ে সেই বিরাট পুরুষের সুষ্ঠু রূপটি ফুটে ওঠে। শিক্ষার ও আত্ম-অহঙ্কার স্খলনের মধ্য দিয়ে অন্যায় ও মূঢ়তার থেকে মুক্তি এবং সৌন্দর্য্য বোধ। মানুষের কল্যাণ প্রচেষ্টায় মঙ্গলময়ের সাধনা। রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, গল্পে, গানে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, কর্মসংগঠনে, প্রচারে কোথাও এ আদর্শের বিচ্যুতি ঘটেনি। তিনি ভারতবর্ষের প্রতীক।

কাজেই রবীন্দ্রনাথকে পর্যালোচনা করতে গেলে ভারতের সংস্কৃতির রূপটি উপলব্ধি করা প্রয়োজন। যে ঐতিহ্য সহস্র বৎসরের উত্তাপে শিখায়িত হয়ে উঠেছে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে হয় তো এর কোনো মূল্য নেই। কারণ এর ভিত্তি আধ্যাত্মিকতায়। কিন্তু দীর্ঘ সহস্র বৎসরের মানবধর্মকে বর্তমান যুগের বহুচিন্তাকীর্ণ সংঘর্ষজটিল জীবন-যাত্রাপথে আপন অপৌরুষেয়তার অজুহাতে আমাদের অবহেলা করা অন্যায় হবে। রবীন্দ্রনাথের দৈহিক বলিষ্ঠতা, মানসিক উৎকর্ষতা তাঁকে সত্যিকারের ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী করে তুলেছে।

তবে এটুকু বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথ যতটুকু এগিয়ে দিয়ে গেছেন, তারপর থেকে হোক আমাদের যাত্রা সুরু। এই অতীতের ট্র্যাডিশনের পরিসমাপ্তি রবীন্দ্রনাথে—ভবিষতের ট্র্যাডিশন গড়ে তোলার দায়িত্ব ববীন্দ্রনাথের বর্তমান উত্তরাধিকারীদের। রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী তারাই যারা ভারতের আদর্শকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রূপ দিতে পারে। বিশ্বপ্রেমিকতায় সহানুভূতির সুর আছে, তাতে শ্রেণীগত বৈষম্যও ধরা পড়ে, মানুষের কল্যাণের চিন্তায় দুঃস্থতার কালিমা বহন করে আনে। কাজেই আধ্যাত্মিক কল্পনায় সাম্য-মৈত্রী শিকড়হীন পরগাছা মাত্র। ভারতের সহস্র বৎসরের সাধনা, রবীন্দ্রনাথের মননের ফসল সে জন্যে জড়বাদীর দৃষ্টিতে অকর্মক হয়ে গেছে।

তাই জড়বাদের মাপকাটিতে যারা রবীন্দ্রনাথকে আলোচনা করবেন, তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে ন্যায়বিচার করা দুঃসাধ্য। রবীন্দ্রনাথের বিরাটত্ব, রচনার প্রাচুর্য, বিষয়ের প্রসাদগুণ একান্তই ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য। ধূর্জটিপ্রসাদ সে জন্যেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে একটু বিপদে পড়েছেন। এতবড়ো বিরাট প্রতিভাকে পাশ্চাত্য সমালোচনার ভঙ্গীতেও বিচার করা সহজসাধ্য নয়, এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথকে উপলব্ধি করা ধূর্জটিপ্রসাদের মতো পাশ্চাত্য আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে দুঃসাধ্য। কাজেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা স্বচ্ছন্দপ্রবাহী হয় নি। মাঝে মাঝে তাল কেটেছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ধূর্জটিবাবুর ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং এ জন্যে এটুকু আশা করা মোটেই অন্যায় হতো না যে, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের জীবনের ক্রমপরিণতির পথে তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের যে ইঙ্গিত জড়িয়ে আছে—এর একটা সুষ্ঠু ইতিহাস ধূর্জটিবাবু লিখবেন। এই study নিছক বিদেশী সাহিত্যের অনুসরণে।

অমল দত্ত

কালপুরুষের সাত পাঁচ—সুবোধ ঘোষ। ডি, এম্, লাইব্রেরী। দাম দুই টাকা।

বাংলা-গল্পসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তক হিসাবে সুবোধ ঘোষ ইতিমধ্যেই প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। ব্যাপক অভিজ্ঞতার বিচিত্র পটভূমিকায় সমাজ-সচেতন বলিষ্ঠ মন নিয়ে তিনি যে কয়টি গল্প লিখেছেন, তার সংখ্যা বেশি না হ'লেও, তার মধ্যে আমরা বাংলা সাহিত্যের

একটা শুভ ভবিষ্যতের সূচনা দেখ্‌তে পেয়েছি। সুবোধ বাবুর সৃষ্টির ক্ষেত্র যে শুধু বাংলা গল্পের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, 'কালপুরুষের সাত পাঁচ' তার অন্যতম প্রমাণ।

আলোচ্য বইখানিকে প্রবন্ধ-সংকলন বলা চলে। অথচ প্রবন্ধ বল্‌তেই যে গুরুগম্ভীর বিষয়-বস্তু এবং ততোধিক গুরুগম্ভীর রচনা-পদ্ধতির কথা মনে পড়ে, বর্তমান পুস্তকের অন্তর্গত একটি লেখাও সে পর্যায়ের নয়। এই বইয়ের অধিকাংশ লেখারই বিষয়-বস্তু গুরুগম্ভীর বটে, তবে রচনা-পদ্ধতি অত্যন্ত হাল্‌কা চালের। অনেকগুলো লেখাই বর্তমান পুস্তকে সংকলিত হয়েছে—অথচ এর কোনটিকেই পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ বলা চলে না। আকারে কিংবা প্রকারে লেখাগুলো প্রচলিত প্রবন্ধ-পাঠ-জনিত ভীতির সঞ্চার করে না আদৌ। এগুলো রচনায় লেখকের বড় কৃতিত্ব বোধ হয় এইখানেই। অনেকদিন পূর্বে 'কালপুরুষ' এই ছদ্ম নামে সুবোধ ঘোষ এই জাতীয় অনেকগুলো লেখা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেছিলেন। লেখাগুলো বেরুনোর সময় পাঠক-পাঠিকা মহলে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বর্তমানে পুস্তকাকারে গ্রথিত হয়ে লেখাগুলো যে পাঠক সমাজের মনোরঞ্জন করতে পার্‌বে—সে বিশ্বাস আমাদের আছে। লেখক নিজে অবশ্য লেখাগুলোর উপর খুব বেশি সাময়িক মূল্য চাপিয়ে দিয়ে এদের লিলির সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন: "নিতান্তই সাময়িক এই ক্ষণিকের কথার মালা—লিলির মত এর প্রাণ, শুধু যাবার আগে অবসরের ক'টি মুহূর্ত রাঙিয়ে দিয়ে যাওয়াই এর ধর্ম।" আমরা কিন্তু এবিষয়ে লেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত নই। অংশত লেখাগুলোর সাময়িক মূল্য যে আছে তা' নয়—সব লেখা সমান রসোত্তীর্ণও হয়নি—তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে সুবোধ বাবু তাঁর স্বাভাবিক গল্প বলার ক্ষমতার সাহায্যে এরূপ অদ্ভুত রস-সঞ্চারে সমর্থ হয়েছেন যে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, তাঁর এসব লেখা নেহাৎ সাময়িক মূল্যের ঊর্ধ্বে উঠ্‌তে পেরেছে। এটা কি কম কৃতিত্বের কথা? আর তাঁর আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপকত্ব দেখেও বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। বইখানার 'সাত পাঁচ' নামকরণ দেখেই বোঝা যায় যে বিষয়-বস্তু নির্বাচনে লেখক কোথাও পরিসরের সংকীর্ণতাকে মানেন নি। তাঁর বিষয়-নির্বাচনের ক্ষেত্র যেমনই ব্যাপক, তেমনি বৈচিত্র্যময়। এক মুহূর্তের জন্যও পাঠকের মনে একঘেয়েমির দরুণ ক্লান্তিবোধ হয় না। একটি বৈচিত্র্যময় আলোচনা শেষ করতে না করতেই পরের আলোচনায় এক সম্পূর্ণ নতুন জগতে গিয়ে পড়তে হয়। সমাজ-বিজ্ঞান, সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব, ইতিহাস, জীব-বিজ্ঞান, স্থাপত্য-শিল্প, মনোবিজ্ঞান, পুরাণ-কাহিনী প্রভৃতি এত বিষয়কে তিনি তাঁর আলোচনার অঙ্গীভূত করেছেন, যে তার তালিকা দিয়ে ওঠা মুস্‌কিল। আলোচনায় শুধু যে লেখকের জ্ঞানের বিস্তার এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে তাই নয়। প্রতিটি আলোচনার মধ্যে তাঁর নিজের জীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং নিগূঢ় অনুভূতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু বহুপঠন নয়, আদর্শনেরও পরিচয় বইটির প্রতি পংক্তিতে সুস্পষ্ট। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় আর কোন আলোচনা-পুস্তক যে নেই একথা অনস্বীকার্য।

আলোচ্য বিষয় এত বিভিন্ন যে প্রত্যেক বিষয়ে লেখক এবং পাঠকের অভিমত না মিল্‌তে পারে। কিন্তু সাহিত্য-সৃষ্টিতে মতের বিভিন্নতাটা বড় কথা নয়। বড় কথা রস-সৃষ্টির দ্বারা

পাঠকের মনে আবেদন সৃষ্টি করা। গল্প-লেখক সুবোধ ঘোষ আলোচ্য আলোচনাগুলোতে তাঁর গল্প বলার কৌশল প্রয়োগ করে সাহিত্যরস সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এইখানেই তাঁর প্রধান সাফল্য। আলোচ্য বিষয়টি হয়ত মৌলিক নয়—কিন্তু আলোচনাটি মৌলিক। আর একটি কথা: ইতিপূর্বেই মন্তব্য করেছি সুবোধ বাবু বলিষ্ঠ সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর এই প্রগতিশীল দৃষ্টি-ভঙ্গির ছোট একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করি। 'যন্ত্র দানব নয়'—এই পর্যায়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন: পশু পক্ষীর যতই গুণ গরিমা থাক্ তবু তারা পর্। তারা মানুষের প্রতিবেশী। মানুষ তাকে সৃষ্টি করে নি। অপর দিকে যন্ত্র মানুষের নিজের জ্ঞানজ সন্তান। বিংশ শতাব্দীতে এত বড় একটি মহান্ সৃষ্টির গৌরব একান্তভাবে মানুষের নিজস্ব। এই যন্ত্র-সন্তানের সেবার মূল্য উপলব্ধি করে তাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে বিংশ শতাব্দীর ফিলসফিতে নূতন একটি মর্য্যাল্ সৃষ্টির সময় এসেছে।"

গোপাল ভৌমিক

ভাড়াটে বাড়ী—গজেন্দ্রকুমার মিত্র। আরতি এজেন্সী। দাম দুই টাকা।

ছোট গল্পের ক্ষেত্রে বর্তমানে বাংলা সাহিত্য যে অতি সুসমৃদ্ধ তা বলাই বাহুল্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির রচনা যে বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ও পরিমিত বাক্য-যোজনার দিক থেকে রসবিচারের প্রতিটি পরীক্ষা অবলীলায় উত্তীর্ণ হয়েছে, একথা বিদেশীয় সাহিত্যের একান্ত অনুরক্ত অতিউন্নাসিক সমালোচকেরাও এখন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র ঠিক পূর্বোক্তদের সমশ্রেণীভুক্ত নন; কিন্তু তাই বলে সাহিত্যজগতে নতুন আগন্তুক নন তিনি, বহুদিন ধরেই লিখছেন। এবং স্বকীয় পদ্ধতিতে তিনি যে ভালই লেখেন তা আমরা তাঁর আরও কয়েকটি বই-এ ইতিপূর্বেই দেখেছি এবং এও লক্ষ্য করেছি যে, তিনি যা' বলতে চান তা' সহজ কথায় সহজভাবেই বলতে পারেন এবং কখন বক্তব্য শেষ করতে হবে তাও তাঁর অবিদিত নেই। আলোচ্য গ্রন্থেও তার এই অনায়াসলব্ধ অভ্যাসের ব্যতিক্রম ঘটে নি।

গজেন্দ্রবাবুর রচনা মূলতঃ করুণরসাত্মক। অভাব অনটনের সংসারে একমাত্র আদর্শ ও উচ্চাশাকে পাথেয় করে যারা জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে সেই আদর্শবাদী মধ্যবিত্ত নরনারীর—স্বপ্নভঙ্গের ট্র্যাজেডিই তার মূল বিষয়বস্তু। বর্তমানে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নিদারুণ অস্তিত্ব অতি রূঢ় সত্য; গল্পের প্রত্যেকটী চরিত্রও তাই সত্য—কিন্তু রূঢ় নয়। ঠিক প্রতিবাদের সুরে নয়, গজেন্দ্রবাবু যেন কিছুটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেই চরিত্রগুলির স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। চরিত্র-চিত্রনে এই আকুতির ভাব হয়তো অনেকেই স্নেহদৃষ্টিতে দেখবেন না। "ভাড়াটে বাড়ী"র প্রত্যেকটী চরিত্র জীবন্ত—একথা ঠিক কিন্তু তা হলেও তাদের রক্তে উত্তাপ কম। সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে অব্যবস্থার ফলে তাদের জীবন অভিশপ্ত হয়ে যাচ্ছে

তার বিরুদ্ধে তার কোনও নায়কই জেহাদ ঘোষণা করেনি—ম্লান মুখে প্রায় সকলেই পটভূমিকা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে।—তাই বিধবাবেশী কুমারী কমলার উচ্ছ্বসিত রোদন, অরুণের স্ত্রী নীলিমা দেবীর অন্নাভাবে অবশেষে পররক্ষিতা হওয়া, কলমজীবী নির্মল ও গল্প লেখক অরুণের গল্প নিয়ে বৈশ্যবৃত্তি—আমাদের সমবেদনা পাবার দাবী রাখে। কিন্তু প্রশ্ন এই : মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এরাই কি আদর্শ প্রতিনিধি ?

আদর্শগত এই বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও গজেন্দ্রবাবুর ভাষা সুখপাঠ্য, গল্পের চরিত্রগুলির মতই তা' নিরাসক্ত ও নিরাভরণ।

পূর্ণেন্দু সেন

Printed and published by K. C. Banerjee at the Modern Art Press, 1/2, Durga Pituri Lane, Calcutta. Edited by Humayun Kabir.
Office: 123, Lower Circular Road.

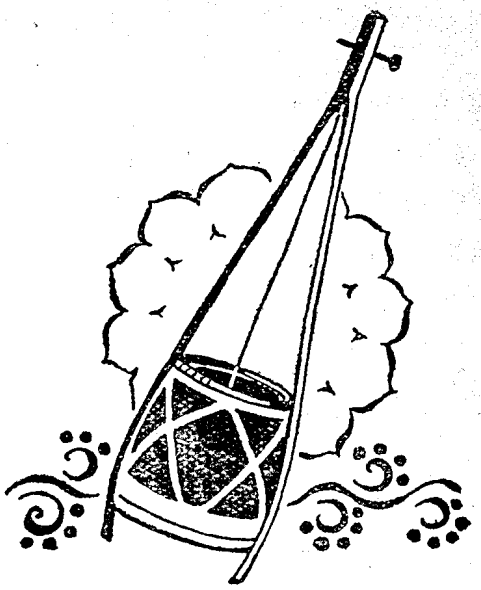
কাব্য অনুরাগীদের জন্য

★

একটি সুচিন্তিত সুলিখিত বই

★

হুমায়ুন কবিরের



বাঙলার কাব্য

আলাওল থেকে রবীন্দ্রপরবর্ত্তীযুগ পর্য্যন্ত ব
প্রেরণার পশ্চাৎপটে কবির অন্তর্লোকের
বহির্জগতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব যুগে যুগে কাব্যকে রূপ
করেছে। সমাজমননের সঙ্গে কাব্যের এই যোগ
আবিষ্কারের চেষ্টা বাঙ্‌লা ভাষায় এই প্রথম। গ
অন্তর্দৃষ্টি ও প্রামাণিক গবেষণা দ্বারা বহু প্রচ
মতামতের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা হয়েছে।
তর্কসাপেক্ষ বিষয়ের অবতারণার জন্য বইখানি
শীঘ্র সুধীসমাজে গভীর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবে।
যথাযথ শব্দপ্রয়োগে, বাক্যের নির্দ্দিষ্ট মিতব্যয়ি
ভাবের ঘনসন্নিবদ্ধতায় বাঙ্‌লায় এরকম সমাদে
ভাষা এর পূর্ব্বে কেউ ব্যবহার করেন নি।

নিখুঁত ছাপা ও বাঁধাই। দাম দুই



গুপ্ত রহমান এ্যাণ্ড গুপ্ত

৫-১, রামময় রোড, কলি

চতুরঙ্গ

[ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা চৈত্র ১৩৫০]

মার্ক্সবাদ ও সমাজতন্ত্র

বটকৃষ্ণ ঘোষ

পৃথিবীর সকল দেশেই যে সমাজতন্ত্র এক রূপে না হয় আর এক রূপে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে একাধিপত্য বিস্তার করিবে এবিষয়ে বোধ হয় আজিকার দিনে কাহারও মনে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সমাজতন্ত্রের নামে যাঁহারা ভয় পান তাঁহারাও মনে মনে জানেন যে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি রোধ করা অসম্ভব। ভারতেও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এখন হইতেই আমাদের বিশেষ করিয়া চিন্তা করা দরকার বহুরূপী সমাজতন্ত্রের কোন্ রূপটি আমাদের দেশে গ্রহণের যোগ্য। যাঁহারা মনে করেন যে নিজের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভারতবাসীর ভাবনা চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজনই নাই, বাহির হইতে যেমন হুকুম আসিবে তদনুযায়ী কাজ করিয়া গেলেই চলিবে—তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া অবশ্য এ-কথা বলিতেছি না, কারণ ভক্তিতে অবনত সমর্পিত চিত্তের নিকট যুক্তির ঔদ্ধত্য বিসদৃশ না ঠেকিয়াই পারে না। কিন্তু যুক্তিদ্বারাই যে কেবল সত্যসন্ধান সম্ভব হয় এ-কথা মানিয়া না লইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে যে-মানুষ নিজেকে পশুর সমান বলিয়া মনে না করে তাহার পক্ষে প্রবৃত্তির দাসত্ব ও যুক্তির নেতৃত্ব এই উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টিকেই গ্রহণ করা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই, কারণ ইহাই হইল পশুত্ব হইতে পৃথক্ যে মনুষ্যত্ব তাহার লক্ষণ। বিশেষ করিয়া সমাজতন্ত্রবাদীর পক্ষে মনুষ্যত্ববাচক এই বিশেষ গুণ যুক্তিশীলতা পরিত্যাগ করা অসম্ভব, কারণ সমাজতন্ত্রবাদের শ্রেষ্ঠ অবদান হইল এই যে মানুষ

তৎসাহায্যে জীবনের জন্য সংগ্রাম রূপ যে পশুধর্ম তাহা অতিক্রম করিয়া মৈত্রীমূলক প্রকৃত নরধর্মে অবতীর্ণ হইতে পারে। মনুষ্যকে প্রকৃত মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার ভার সমাজতন্ত্রীর উপর; তাহাকেই যদি আজ মনুষ্যত্বের প্রধান লক্ষণ যুক্তিশীলতা পরিত্যাগ করিয়া পুরাপুরি পশু হইয়া উঠিবার মোহ পাইয়া বসে তবে আর মনুষ্যজাতির আশা কোথায়? যথাসম্ভব যুক্তির পথ অনুসরণ করা সমাজতন্ত্রীর একান্ত কর্তব্য। এবং ইহাও সমাজতন্ত্রীকে মনে রাখিতে হইবে যে অবিচারে অপরের যুক্তি গ্রহণ করা বাহ্যতঃ যুক্তিবাদ হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভক্তিবাদ ভিন্ন কিছুই নহে, এবং যে-ভক্তিবাদ যুক্তিবাদের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া থাকে তাহাই সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর।

সমাজতন্ত্রের অসংখ্য রূপ আছে। শুনা যায় যে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপ হইল মার্ক্সবাদ, কারণ ইহাই নাকি বিজ্ঞানসম্মত বা scientific; এবং মার্ক্সবাদ রূপ যে শ্রেষ্ঠ সমাজতন্ত্রবাদ তাহাই ভারতবর্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে। যদিও মার্ক্সবাদ একটি দুর্বোধ্য গ্রন্থের মধ্যেই পঙ্গু হইয়া পড়িয়া আছে, যদিও কার্য-ক্ষেত্রে তৎপরিবর্তে লেনিনবাদ, ট্রটস্কিবাদ, ষ্ট্যালিনবাদ প্রভৃতি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, যদিও স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এই লেনিনবাদ প্রভৃতিরও অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ও আশ্চর্যকর বিভিন্ন মূর্তি দেখা গিয়াছে এবং যাইতেছে, এবং যদিও ইহাও ঠিক যে রাশিয়ায় ট্রটস্কির পরাজয় না ঘটিলে মার্ক্সবাদ বলিতে আজ ট্রটস্কিবাদই বুঝাইত—তথাপি এক শ্রেণীর ভারতীয় সমাজতন্ত্রী অনবরতই বলিয়া থাকেন ভারতের যাহা প্রয়োজন তাহা হইল মার্ক্সবাদ (অর্থাৎ ষ্ট্যালিনবাদ)। স্বীকার করিতে হইবে যে, যাঁহারা এই কথা বলেন ও বিশ্বাস করেন তাঁহাদের মনে যুক্তি ভক্তির নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে। অবশ্য ইহাও সম্ভব যে তাঁহাদের অনেকের বিশ্বাস, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হউক প্রবর্তনের পক্ষেও এই মিথ্যা যুক্তি কার্যকরী হইতে পারে। কিন্তু এ-ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। রাশিয়াতে সমাজতন্ত্র যে এতবার রূপ পরিবর্তন করিল তাহা দেখিয়া পৃথিবীর সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট ইহা নিশ্চয়ই সুপরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে যে সমাজতন্ত্রের কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে কিন্তু নির্দিষ্ট কোন রূপ নাই। এই বিশিষ্ট লক্ষণগুলি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমাজতন্ত্রবাদ বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন রূপে প্রকাশ ও প্রচার লাভ করিবে। সমাজতন্ত্রী আজ যদি এই অতিপ্রকট সত্য অস্বীকার করিয়া হিটলার-এর মত সর্বত্র Gleichschaltung প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করেন তবে ফ্যাসিজম-এর মত সমাজতন্ত্রেরও পরাজয়

অবশ্যম্ভাবী। ধনতন্ত্রবাদ ভিন্ন আর কোন রাষ্ট্রার্থনীতি যে জগতে এ-পর্যন্ত বিশ্বজয়ী হইতে পারে নাই তাহার কারণ কি ইহাই নহে যে তাহা স্থান, কাল ও পাত্রভেদে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সমঞ্জস বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র আপত্তি করে নাই? সমাজতন্ত্রী যদি বিপক্ষের এই অভিজ্ঞতা নিজের স্বার্থে প্রয়োগ করিতে না পারেন তবে তাঁহার জয়ের আশা বৃথা।

যদিও মার্ক্সবাদ স্ব-রূপে কোথাও কার্যসিদ্ধ হয় নাই তথাপি তৎপ্রতি আমাদের এই যে অহৈতুকী মোহ তাহার কারণ বোধ হয় এই যে অপর কোন প্রকারের সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি "বৈজ্ঞানিক" আখ্যা প্রযুক্ত হয় নাই। সুতরাং বিচার করা প্রয়োজন "বৈজ্ঞানিক" কথাটির প্রকৃত অর্থ কি এবং সেই অর্থে মার্ক্সবাদ-কে বাস্তবিকই "বৈজ্ঞানিক" বলা যায় কিনা। আমি প্রথমেই বলিব "science" কথাটি হইল একটি elliptic term, কারণ "science" বলিতে সর্বত্রই বুঝায় "science of hypothesis"। যেখানে hypothesis-এর অবকাশ নাই সেখানে science-এর কথা উত্থাপনই করা যায় না। এই কথাটি আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার।—এখনকার যুগে না হইলেও প্রাক্-আইনষ্টাইন কালে নিউটন প্রবর্তিত মাধ্যাকর্ষণবাদ "বৈজ্ঞানিক" অর্থাৎ বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া পরিগণিত হইত, এবং গল্প আছে যে একটি আপেল ফল গাছ হইতে মাটিতে পড়িল দেখিয়াই নিউটন-এর মনে মাধ্যাকর্ষণবাদের কথা প্রথম উন্মেষিত হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে আপেল নামক একটি বিশেষ বস্তুর স্থানগত ও কালগত দুইটি পৃথক্ অবস্থার (প্রথম স্থান-কাল হইল বৃক্ষশাখা এবং দ্বিতীয় স্থান-কাল হইল পৃথিবী) মধ্যে যে পরস্পর সম্বন্ধ, নিউটন নামক ব্যক্তির অনুমানে সেই সম্বন্ধটির যাহা কারক, তাহাই হইল "বৈজ্ঞানিক" মাধ্যাকর্ষণ। মাধ্যাকর্ষণবাদের এই ন্যায়সঙ্গত সংজ্ঞা হইতে মনে হইতে পারে যে ইহার সবটাই অবৈজ্ঞানিক, কারণ প্রকৃতপক্ষে ইহা কতকগুলি assumption ও hypothesis-এর সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এ-কথা যাঁহারা মনে করিবেন তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে science কাহাকে বলে সে-সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণাই তাঁহাদের নাই। যাহা সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ—যেমন ২+২=৪—তাহা science-এর বহির্ভূত; যাহা hypothesis ও অনুমানসাপেক্ষ—যেমন মাধ্যাকর্ষণ—কেবল তাহাই science-এর বিষয়ীভূত। সুতরাং সমাজতন্ত্রীকে মনে রাখিতে হইবে যে মার্ক্সবাদ-এর প্রতি "বৈজ্ঞানিকত্ব" আরোপ করার যদি কোন অর্থ হয় তবে তাহা হইল মার্ক্সবাদ যে সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ নহে তাহা স্বীকার করা। এবং

সেইজন্য তাঁহাকে আরও স্বীকার করিতে হইবে যে নিউটন-এর মাধ্যাকর্ষণবাদ আজ যেমন লাঞ্ছিত, অপমানিত ও পরিত্যক্ত, মার্ক্সবাদ-এর ভাগ্যেও সেইরূপ ঘটা আদৌ অসম্ভব নহে। সুতরাং অদ্ভুত শুনাইলেও এ-কথা যুক্তিসাপেক্ষ যে মার্ক্সবাদ-কে যাঁহারা scientific বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের পক্ষে মার্ক্সবাদ-এর অনুবর্তন করা হইবে অযৌক্তিক।

ইহার উপর আরও বিবেচ্য, মাধ্যাকর্ষণবাদ যে-অর্থে বৈজ্ঞানিক, মার্ক্সবাদ কখনই সে-অর্থেও বৈজ্ঞানিক হইতে পারে না। উপরে দেখান হইয়াছে যে মাধ্যাকর্ষণবাদ হইল বিশিষ্ট ক্ষেত্রে জড়জগতের দুইটি নির্দিষ্ট স্থান-কালের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ক অনুমান। মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে কিন্তু বলিতে হইবে যে তাহা জীবজগতের দুইটি অজ্ঞাত ও অনির্দিষ্ট স্থান-কালের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ক মিথ্যা অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। মার্ক্সবাদীর মতে আদিম মানব-সমাজ ছিল এন্‌ঙ্গেলস্ যেরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন সেইরূপ, এবং এন্‌ঙ্গেলস্ বর্ণিত আদিম মানব-সমাজ হইল আধুনিক মার্ক্সবাদীর অনুমান-যন্ত্রের প্রথম স্থান-কাল; তাঁহার অনুমান-যন্ত্রের দ্বিতীয় স্থান-কাল হইল বর্তমান মানব-সমাজ। এই দুইটি স্থান-কালের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টাই হইল মার্ক্সবাদী জড়বাদ। কিন্তু এন্‌ঙ্গেলস্-এর যুগ ছিল সমাজতত্ত্বের শৈশব কাল; Lowie প্রভৃতি আধুনিক সমাজতত্ত্ববিৎ আদৌ স্বীকার করেন না যে আদিম মানব-সমাজ এন্‌ঙ্গেলস্ যে-রূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন বাস্তবিকই সেইরূপ ছিল। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে অতি আদিম মানব সমাজেও—যে সমাজে মানুষ খাদ্য-সংগ্রহ স্তর অতিক্রম করিয়া খাদ্য উৎপাদনের স্তরে পৌঁছায় নাই—স্বসম্পদ বুদ্ধি (sense of property) পূর্ণভাবে বর্তমান, এবং যৌনমিলন ও গর্ভ-সঞ্চারের মধ্যে যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে এ-কথাও যে আদিম সমাজে অবিদিত সেই প্রকার আদিম সমাজেও বিবাহপদ্ধতির প্রচলন আছে এবং ছিল। সুতরাং মার্ক্সবাদীর অনুমান-যন্ত্রের প্রথম স্থান-কাল অসিদ্ধ। ইহার দ্বিতীয় স্থান-কাল বর্তমান সমাজ অবশ্য অসিদ্ধ নহে, কিন্তু তাহার স্বরূপ যে কি তাহা কে বলিয়া দিবে? কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে নিউটন-এর hypothesis অপেক্ষা Marxist hypothesis আরও অনেক দুর্বল, কারণ নিউটন-এর অনুমান-যন্ত্রের দুইটি স্থান-কালই সিদ্ধ ও নির্দিষ্ট, কিন্তু মার্ক্সবাদীর অনুমান-যন্ত্রের প্রথম স্থান-কাল অসিদ্ধ এবং দ্বিতীয়টি অনির্দিষ্ট। এখন নিউটন-এর অনুমান প্রামাণিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে; এ-ক্ষেত্রে কি মার্ক্স-এর

অনুমান অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যাইবে? মার্ক্সবাদ-এর "বৈজ্ঞানিকত্ব" সম্বন্ধে ইহাই বোধ হয় যথেষ্ট।

মার্ক্সবাদ-এর "বৈজ্ঞানিকত্ব" একটি অভাব মাত্র, দোষ নহে। ইহার দোষ হইল পরমার্থসত্যের (transcendental absolute truth) অস্বীকরণ। এবং এই দোষের জন্যই মার্ক্সবাদ একটি যুক্তিসহ দর্শনপ্রস্থান রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। কোন প্রকার মত প্রকাশ না করিয়া মার্ক্সবাদী হওয়া যায় না; কিন্তু মত প্রকাশ করিলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অ-পরতন্ত্র পরমার্থসত্যের উপর নির্ভর অবশ্যম্ভাবী। আমি যদি প্রমাণ করিতে চাই যে কোন জিনিষ ভাল তবে সব বস্তু হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র "ভালত্ব" নামক একটি পদার্থ স্বীকার না করিয়া আমার উপায় নাই। আমি যদি কেবল "আমার মতে ভাল" এই বলিয়াই প্রমাণ করিতে চাই যে একটি বিশেষ জিনিষ ভাল তবে তাহা গায়ের জোর পরীক্ষা করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ মাত্র; অপর কোন ব্যক্তি যদি সেই জিনিষ সম্বন্ধে কেবল বলে "আমার মতে ইহা খারাপ" তাহা হইলেই সেই "যুক্তির" যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়া যাইবে। বাস্তবিক যাহা কোন বিশেষ মতে বা কাহারও বিশেষ স্বার্থের পক্ষে ভাল তাহাকে প্রকৃত পক্ষে ভাল বলা যায় না। সর্বসাধারণ যদি একমত হইয়া কোন জিনিষ সম্বন্ধে বলে যে তাহা ভাল তবে তাহাও সত্যই ভাল বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য হইয়া উঠিবে না, কারণ সর্বসাধারণের মতও একটি মত মাত্র, যাহা ভ্রান্ত হওয়া সম্ভব। কাজেই সম্পূর্ণ রূপে যাহা স্বতন্ত্র ও বস্তুনিরপেক্ষ এইরূপ একটি পদার্থ—যাহার নাম ভালত্ব—স্বীকার না করিলে কোন বস্তু সম্বন্ধেই বলা চলিবে না "ইহা ভাল", কারণ "ভাল"-র একমাত্র যুক্তিসঙ্গত লক্ষণই হইল এই যে তাহাতে "ভালত্ব" আরোপ করা যায়। এই "ভালত্ব" হাত দিয়া ছোঁয়াও যায় না, দাঁড়িপাল্লায় ওজনও করা যায় না। কিন্তু তথাপি এই "ভালত্ব" স্বীকার করিতেই হইবে—যদি মানুষ কোন বস্তু সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করিতে চায় যে তাহা "ভাল"। অবশ্য "ভালত্ব" যে প্রত্যেক মানুষকে স্বীকার করিতেই হইবে তাহা নহে; কিন্তু "ভালত্ব" যিনি স্বীকার করেন না তিনি যুক্তি অতিক্রম না করিয়া কোন বস্তুকেই "ভাল" এই আখ্যা প্রদান করিতে পারিবেন না। এইখানেই মার্ক্সবাদীর দর্শনের প্রধান দোষ। মার্ক্সবাদী ভালত্বে বিশ্বাস করেন না কিন্তু দাবী করেন যে তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল; তিনি সত্যে বিশ্বাস করেন না কিন্তু বলিয়া থাকেন যে আর্থিক জগতে (পারমার্থিক

জগতের প্রশ্নই তাঁহার নাই) মার্ক্সবাদ-ই একমাত্র সত্য; স্ব-তন্ত্র সৌন্দর্যে তাঁহার আস্থা নাই, কিন্তু তাঁহার মুখেই আবার শুনা যায় যে ভবিষ্যৎ মার্ক্সবাদীয় জগৎ সুন্দর। মার্ক্সবাদীর মুখে এ সকল কথার কোনই অর্থ হয় না।

Vandalism যদি একটি বিশিষ্ট শিল্পপদ্ধতি বলিয়া পরিগণিত না হয় তবে মার্ক্সবাদ যে কেন একটি বিশিষ্ট দর্শনপ্রস্থান রূপে স্বীকৃত হইবে তাহা বাস্তবিকই আমি বুঝিতে পারি না। স্বার্থোদ্ধারই যাহার নিকট সত্যমিথ্যা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি সে যে তস্কর, সজ্জন নহে,—একথা বোধ হয় মার্ক্সবাদীও অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু জনসাধারণকে স্ব-তন্ত্র পরমার্থসত্য অস্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়া মার্ক্সবাদী কি এই তস্করবৃত্তিরই প্রচারক হইয়া পড়েন নাই? সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মনোবৃত্তি যদি তস্করোচিত হয় তবে তাহা হইতে কি জগতের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে? প্রত্যেকে ব্যক্তিগত জীবনে স্বার্থোদ্ধারকেই চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিবে অথচ সেই সঙ্গেই জাতীয় জীবনে এই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিবে যে সকলের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ—মার্ক্সবাদীর এই আশা কি একান্ত অযৌক্তিক নহে? মার্ক্সবাদী বলিতে পারেন, রাশিয়াতে যখন এই আশা সফল হইয়াছে তখন ভারতেই বা তাহা হইবে না কেন? কিন্তু রাশিয়াতে যাহা সফল হইয়াছে তাহা মার্ক্সবাদ নহে, ষ্ট্যালিনবাদ, এবং অন্তর্বিপ্লবের ভিতর দিয়া রাশিয়াতে এই ষ্ট্যালিনবাদ-এর আরও অনেক পরিবর্তন সাধিত হইত যদি সমস্ত পৃথিবীর প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন প্রতিকূলতায় রুশদিগকে বাধ্য হইয়া ক্রমোন্নতির পরিবর্তে আত্মরক্ষার প্রতিই অধিক মনোযোগ দিতে না হইত।

সমাজতন্ত্রবাদীর যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাহার সহিত মার্ক্সবাদ-এর সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সমাজতন্ত্রী নিশ্চয়ই প্রগতিশীল। তিনি ইহাও মনে করেন যে পশুর জীবনেও যাহা অত্যাবশ্যক তাহার ব্যবস্থা প্রত্যেক মানুষের জন্য করাই হইল সর্বসাধারণের প্রধান না হউক প্রথম কর্তব্য। কিন্তু মার্ক্সবাদীর মত এ-কথা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না যে এই উদ্দেশ্যে মানুষকে পশুতে পরিণত করাও অনুচিত নহে। মানুষকে পূর্ণরূপে মানুষ হইতে না দিয়া তাহার সংকীর্ণ ব্যক্তিত্বের সকল অভাব মোচন করিলেও মানুষের প্রকৃত উপকার করা হইবে না। এই জন্যই H. G. Wells-এর কথায় সায় দিতে হয় যে মার্ক্সবাদ হইল "Sabotage of civilization by the disappointed"। ক্ষুধায় সকল মানুষই পশুতে

পরিণত হইতে পারে। মার্ক্সবাদ হইল ক্ষুধার তাড়নায় পশুভাবাপন্ন গণমানবের চরম তিক্ততার পরম পরিণাম। সেই অবমানিত ও ক্ষুৎপীড়িত গণমানব যদি আজ জগতের সমস্ত খাদ্য কেবল তাহারই বলিয়া দাবী করে তবে কাহারও তাহাতে আপত্তি করা নৃশংসতা। কিন্তু সে যদি বলে যে অন্নসমস্যাই মনুষ্য-সমাজের প্রধান সমস্যা, এবং সেই সমস্যার যেরূপ সমাধান যে-সমাজে হয় তাহাই হইল সেই সমাজের সভ্যতার প্রধান নির্দেশক, তবে তাহাতে আপত্তি না করিয়া পারা যাইবে না। ইহা কিন্তু মার্ক্সবাদীর কথা, এবং ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। মার্ক্সবাদী যদি প্রগতিবাদী হ'ন তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে প্রগতির ফলে এমন একদিন নিশ্চয়ই আসিবে যেদিন অন্নসমস্যাকে আর সমস্যা বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ থাকিবে না। কিন্তু এই অন্নসমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাটির সমাধাতৃ মার্ক্সবাদীর-ও অবসান ঘটিবে, কারণ মার্ক্সবাদী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে অন্নসমস্যাই তাঁহার প্রধান সমাধেয় বস্তু। কাজেই মার্ক্সবাদীর নিজের কথা হইতেই অনুমিত হয় যে অন্নসমস্যার সমাধানের পর প্রকৃত মানবত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সম্মুখে যে অনন্ত উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে তৎসম্বন্ধে মার্ক্সবাদীর কোন কৌতূহলও নাই। অর্থাৎ, সমাজতন্ত্রীর নিকট পশুচিত জীবনসংগ্রামের অন্তে প্রকৃত মনুষ্য-জীবনের আরম্ভ, যে-জীবনে প্রতি মানুষ প্রতি বিষয়ে আপনার বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া প্রকৃত মানবোচিত উচ্চতর কৃষ্টির অধিকারী হইবার সুযোগ লাভ করিবে; মার্ক্সবাদীর কিন্তু নিজেরই প্রতিজ্ঞা এই যে অন্নসমস্যাশূন্য প্রকৃত মানবোচিত সমাজে তাঁহার কোন স্থান নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, যিনি নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই মানবোচিত সমাজের বহির্ভূত তিনি কিরূপে মানব-সমাজের নেতৃত্ব করিবেন? কাজেই ভারতীয় বা বৈদেশিক সকল সমাজতন্ত্রীরই কর্তব্য মার্ক্সবাদীর নেতৃত্ব অস্বীকার করা।

কবিতা

একটি খণ্ড কবিতা

বুদ্ধদেব বসু

দিন মোর কর্মের প্রহারে পাংশু,
রাত্রি মোর জ্বলন্ত জাগ্রত স্বপ্নে।
ধাতুর সংঘর্ষে জাগো, হে সুন্দর শুভ্র অগ্নিশিখা,
বস্তুপুঞ্জ বায়ু হোক, চাঁদ হোক নারী,
মৃত্তিকার ফুল হোক আকাশের তারা।
জাগো, হে পবিত্র পদ্ম, জাগো তুমি প্রাণের মৃণালে,
চিরন্তনে মুক্তি দাও ক্ষণিকার অম্লান ক্ষমায়,
ক্ষণিকেরে করো চিরন্তন।
দেহ হোক মন, মন হোক প্রাণ, প্রাণে হোক মৃত্যুর সঙ্গম,
মৃত্যু হোক দেহ, প্রাণ, মন।



বুদ্ধদেব বসু

পনেরো বছর আগে বুদ্ধদেব বসু যখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভূত হলেন, তখন তাঁকে কেন্দ্র ক'রে যে উত্তেজিত আলোচনার সৃষ্টি হয়েছিলো, আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। এ-কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না যে প্রথম আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এমন অকৃপণ প্রশংসা ও সুতীব্র নিন্দা অন্য কোনো বাঙালি লেখকের ভাগ্যেই জোটেনি। এই দুই পক্ষের আন্দোলন বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে এখনো চলছে, কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার অনন্যতা আজ কারো পক্ষেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ নেই যাতে তিনি আপন স্বাক্ষর না রেখেছেন। সম্পূর্ণ সাহিত্যিক বলতে যা বোঝায়, বুদ্ধদেব বসু তা-ই ; কারণ তাঁর কর্মসূচী শুধু রচনাতেই আবদ্ধ নয়, আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রতিপত্তিশীল ব্যক্তিত্বও তাঁরই, তাঁকে ঘিরেই বার-বার এমন সাহিত্যিক-গোষ্ঠী গ'ড়ে উঠেছে, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস যাকে ভুলতে পারবে না। ছাত্র-জীবনে 'প্রগতি'র পর্ব শেষ করে পরিণত বয়সে তিনি 'কবিতা' পত্রিকা স্থাপন করেন এবং তাঁর অধি-নায়কত্বে কবিতাভবন আজ শ্রেষ্ঠ আধুনিক সাহিত্যের পরিবেশকরূপে পরিচিত। বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে কবি ও কর্মীর যে সমাবেশ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক হিসাবে সেইটেই সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস। বর্তমানে তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের সমস্ত দিক নিয়ে একটি সুবৃহৎ সমালোচনা গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত আছেন।

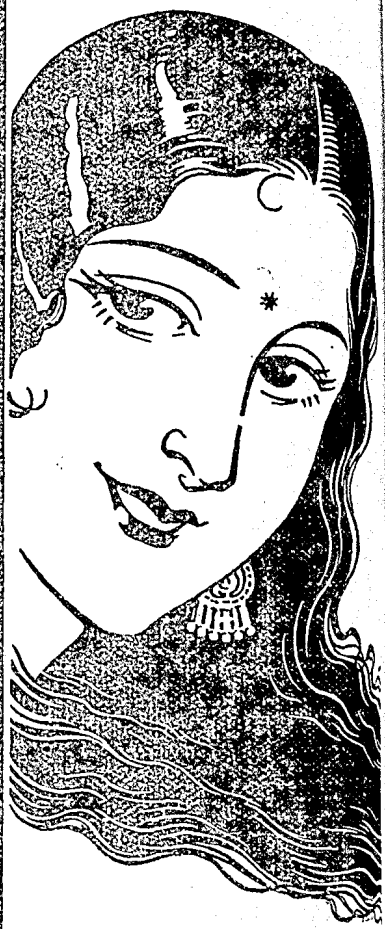
বুদ্ধদেব বসু বলেন—"পার্ক ইনক ব্যবহার ক'রে খুশি হলুম। এর বর্ণ স্নিগ্ধ, প্রবাহ স্বচ্ছন্দ, লেখনীর সঙ্গে অফুরন্ত সহযোগিতা লেখকের পক্ষে তৃপ্তিকর।"



খোঁপা কর, প্রফুল্ল, কী গোছার ছিরি!
খুলি রাখ বাবুগিরি!

কেশবিন্যাস বিষয়ে আপনার ভিন্নমত হইতে পারেন, কিন্তু কেশতৈল কিনিবার সময় ভুলিবেন না যে আপনারই দরকার কেবল···





বাথগেটের
সুবাসিত
ক্যাষ্টর অয়েল

নকল হইতে সাবধান

Bathgate & Co
CHEMISTS CALCUTTA

প্রতিরোধ

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ওরা বলে—
প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ব আমরা
দেশের চারিদিকে—
হিমাচল থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত।
রুগ্ন দেহ ও অসাব্যস্ত মনের প্রতিক্রিয়ায়
ওরা আজ বিভ্রান্ত।
হাতের শক্তি ওদের অপহৃত
মনের শক্তিও ওরা হারাল
মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে।
দুঃস্বপ্নের খেয়াল থেকে
কে ওদের বাঁচাবে?

প্রতিরোধ?—
বন্দীশালায় শৃঙ্খলিত জীবনে
ওরা দেখে প্রতিরোধের দুঃস্বপ্ন।
চারিদিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীর
নির্জ্জন কক্ষের লৌহ-অর্গলগুলি
মাকড়সার জালে ঢাকা,
সূর্য্যের আলো সেথায় পড়ে
কদাচ কখনো;—
তবু আলোর দিশারী হবে ওরা?
পায়ের তলায় কঠিন পাষাণ
সেই পাষাণে পদাঘাত করে
ওরা দেখায় ওদের শক্তির দম্ভ;

কারাগারের সদর দেউড়ীতে
সান্ত্রীপাহারার মন্থর পদসঞ্চার
ওদের মনের পর্দ্দায় মারে ঘা
ওরা ভাবে মুক্তির ঘণ্টা বাজল !

অন্নরিক্ত দেশে মুক্তি ?
হৃতসর্ব্বস্বের জীর্ণ কুটীরে
সম্পদের আতস বাজি ?
কণ্ঠরোধের দলে মুক্তির গান ?
সহস্র বন্ধনের বেদনায় রক্তাক্ত জীবন,
সেই সব জীবনে একে একে পড়ছে পূর্ণচ্ছেদ,
স্তূপিভূত নর কঙ্কালের উপর
প্রতিরোধের প্রাচীর গড়বে তারা ?

কণ্ঠে ভাষা নাই, অবরুদ্ধ,
দেহে শক্তি নাই, বিপর্য্যস্ত,
ধনজন পূর্ণ গ্রামে ও নগরে
চিতাবহ্নি জ্বলে আজ দাউ দাউ করে ;
ফেরুপালের অসময় চিৎকারে
জীবন্ত মানুষও ভাবে আমি মৃত ;
তবু বল্‌বে ওরা নবজীবনের কথা ?
তবু গাইবে ওরা নূতন দিনের
ফসল ফলানর গান ?
পড়ো জমির আলে বসে' তুলবে ওরা
খোন্তা কুড়ুল নিড়ানির
সমবেত ঐক্যতান ?
মরচেপড়া কাস্তেয় তবু ওরা দেখ্‌বে
নবচাঁদের ছবি ?

সবল পেষীর ঠেলায় ঠেলায়
লাঙলের ফালে যারা খুঁড়লে মাটি

দাক্ষিণ্যে কাঙাল হয়ে গেছে যে উর্ব্বর মাটি ;
বীজ ছড়ালে যারা আখেরের আশায় ;
ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার ধান ফল্‌ল,
মনে মনে সোনার আশা কিন্তু ফল্‌ল না।
গাঁইতির চোটে যারা রাস্তা বানাল
হাতুড়ির ঘায়ে পেনেট করে দিলে হাতিয়ার,
হাতের কায়দায় সানিয়ে দিলে যারা
খরসান হাতিয়ার,
কেই বা তাদের ডাক্‌ল ?
কেই বা তাদের মিছিল করে
এগিয়ে নিয়ে গেল দুর্গম পথে
দুর্গতির প্রতিরোধে প্রাচীর তুলতে ?

আশ্চর্য্য বটে—
আশ্চর্য্য এদের রঙীন কল্পনা
শ্মশানে ব্যূহ রচনার কল্পনা ;
বিপন্ন বিধ্বস্ত দেশে
কারাপ্রাচীরের চারিদিকে
প্রতিরোধ গড়ে তোলার উন্মাদ কল্পনা।

তমসা

জ্যোতির্ম্ময় রায়

সমাজের যে অবস্থায় জন্মেছি তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারলাম না—এ আমার অপরাধ না গুণ সে-কথা থাক। বাধানিষেধের ঝাঁপির ভেতর সাপুড়ের সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছি। দু' একবার ফোঁস্ ক'রে না উঠেছি এমনও নয়, কিন্তু তখনই টের পেয়েছি আমার ফণার চেয়ে থাবড়ার জোর বেশি। তারপর থেকে নারীজীবনের চলতি কর্ত্তব্যই ক'রে চলেছি। প্রকৃতির দাবি মেনে একাধিক জীব গড়লাম কিন্তু মনের দাবি মেনে একটী জীবন গড়া হলো না।

মানুষ কোনো বোঝাকেই বোঝা ব'লে গণ্য করে না যতক্ষণ সামনে থাকে আশার হাতছানি। দুর্ব্বহ তার কাছে একমাত্র ভবিষ্যৎহীন ব্যর্থতার ভার। সে ভারই আমাকে বইতে হচ্চে। মানলাম না, মানিয়ে নিতেও পারলাম না—এ এক বিষম বিড়ম্বনা! অবশ্য তা নিয়ে কাঁদুনি গাইতে বা নালিশ জানাতে বসিনি। মাঝে মাঝে এমন মুহূর্ত্ত আসে যখন ইচ্ছে হয় যত দূর দৃষ্টি চলে গত জীবনটাকে একবার খতিয়ে দেখি।

নারীজীবনের চারচারটে বড় অধ্যায়ই এ বুকের ওপর দিয়ে পার হ'য়ে গেছে। পুতুল বুকে নিয়ে জীবনের শুরু, বই বুকে চেপে কাটলো কৈশোর, যৌবনে স্বামী তারপর সন্তান। অতখানি নিবিড়ভাবে নতুন ক'রে বুকে টেনে নেবার মতো আর কিছুই নেই। এর পর আর যা আসবে তা হয় আস্বাদিত নয়ত কোথাও কোন ফাঁক তাতে থাকবে। এ চার পর্ব্ব পার হ'তে গিয়ে অনেক কিছুই ঘটলো। যার দৌলতে স্মৃতির কোঠা আজ বিচিত্র ঘটনার যাদুঘর।

তিরিশটা বছর পার ক'রে দিলাম। আজও যখনই পেছন ফিরে তাকাই মনে পড়ে পনের বছর আগেকার কথা, সবে তখন পনেরয় পা দিয়েছি। বাড়ন্ত গড়ন ছিল আমার দেহের—তার চেয়েও দ্রুত ছিল মনের গতি। বয়সের তুলনায় অনেক বেশী বুঝতাম ও ভাবতাম। দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেই ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরলাম। পরিচ্ছদে এ পরিবর্ত্তনের মূলেও অঙ্গ সম্পর্কে আমার অতিরিক্ত সচেতনতা। সুগঠিত পা হাঁটুর ওপর অবধি অনাবৃত। কৈশোরের সেই নির্ভাষ

চামড়ায় যৌবনের আমেজ লেগে আমন্ত্রণের আভাস জেগে উঠেছে এটা আমার নিজের চোখেই ধরা পড়েছিলো—যুবকদের চোখে পেলাম তার সমর্থন। ফ্রক প'রে স্বস্তি বোধ করতাম না।

অঙ্গ ও অন্তরের আলোড়ন আমাকে কিন্তু উচ্ছল করলো না, ক'রে দিল স্তব্ধ। মুখেচোখে এবং সমস্ত দেহে কেমন একটা থমথমে ভাব। যেন মহা একটা শক্তিকে ভেতরে বন্দী ক'রে রেখেছি। মনে হতো আমার দৃষ্টি-ভঙ্গী-চাল-চলন সবারই একটা মূল্য আছে। দিদি ছিল দু' বছরের বড়, সে ঠিক উল্টো স্বভাবের। চপল চলন, তরল তার কথাবার্ত্তা। বাবা কলেজের একজন নামকরা অধ্যাপক, অতএব বাড়ীতে ছাত্রদের আনাগোনাটা ছিল নিত্যনিয়মিত। দিদি মেতে থাকতো ওদের নিয়ে। ওর উৎসাহ পেয়ে বিজ্ঞানের ছাত্ররাও অনেকে দর্শন শাস্ত্রে উৎসাহী হয়ে উঠলো। ঘন ঘন আসতো বাবার মুখে দার্শনিক ব্যাখ্যা শুনতে। সবার দিকেই দিদি এমন চোখে চাইতো যে দর্শনে আগ্রহ না এসে যায় না। রূপে আমার চেয়ে খাটো হয়েও ছাত্রমহলে ওরই নামডাক ছিল বেশি। ছাত্ররা চ'লে গেলে তাদের নিয়ে নানা রকম হাসি-ঠাট্টা করা ছিলো দিদির আর এক কাজ। যারা একটু বেশি ঝুঁকে পড়েছে মনে করতো তাদের সব নামকরণ হতো, গবেট, লম্বা, চালিয়াৎ—এই রকম। ওদের হাসি-কথা-তাকানোর বাঁকাচোরা নকল ক'রে বন্ধুদের নিয়ে আসর জমিয়ে হাসাহাসি হতো—সেকি উচ্চ হাসি! মেয়েদের গলাছাড়া হাসি এখন তো রীতিমতো কুৎসিত মনে হয়, তখনও আমার ভালো লাগতো না। একদিন দিদি বন্ধুদের বলছিলো, 'জানিস ভাই, দু' দিন গবেটটার দিকে তাকিয়েছি আর ও ভেবে নিয়েছে আমি ওর প্রেমে প'ড়ে গেছি—ঢুলুঢুলু চোখ ক'রে ক্যাবলার মতো তাকিয়ে থাকে।' এক কোণে ব'সে শুনছিলাম—ভারি রাগ হলো। বললাম, 'গবেটও হয়তো বাড়ী থেকে ভেবে বেরোয়—যাই, স্যার-এর মেয়ের সঙ্গে একটু ইয়ার্কি দিয়ে আসি গে—' দিদি ততক্ষণে গবেটের তাকানো নকল করছে। পরিহাস কিন্তু জমলো না। দিদি ধম্‌কে উঠলো, 'তুই গেলি এখান থেকে গোমড়ামুখী!' বেরিয়ে এসে মনে হলো দিদি যেন দামি-দামি সব শাড়ি-কাপড় আর গয়না মেঝেয় ছড়িয়ে পায়ের তলায় চট্‌কাচ্ছে আর খিলখিল ক'রে হাসছে—একে মেয়ে তাতে ঐ বয়স, বোধহয় তাই সহজ টানে শাড়ী-গয়নার কথাটাই উপমা হিসেবে মনে এসেছিলো।

এখানেই ব'লে রাখি, গোমড়ামুখী কথাটা শুধু দিদির গাল নয়. ওটা আমার নামও। স্কুলের মেয়েদের মধ্যে আড়ালে ও-নামই আমার চলতি ছিল। আমার

গাম্ভীর্য্যের বিকৃত ব্যাখ্যা ওটা। এক বছর আগেকার একটি ঘটনা থেকেই এ নামের সুরু। টিফিনের সময় ক্লাসে নিজের জায়গাটিতে ব'সে একটা গল্পের বই পড়ছিলাম, পাশেই দল পাকিয়ে মেয়েরা নবাগত ছাত্রীটিকে নিয়ে হল্লা করছে। অল্প সময়ের মধ্যেই মেয়েটি সকলের মধ্যে খুব প্রিয় হ'য়ে উঠেছে। শুনেছি সে নাকি ভারি সব মজার মজার রসের কথা বলে—অবশ্যি সে-রস আমার সামনে পরিবেশন করতে কেউ কখনো আসেনি। পড়তে-পড়তে চোখটা বুজে এসেছিলো, মেয়েটি এসে দাঁড়ালো আমার সামনে, পেছনে দলের অন্য মেয়েরা। সবারই মুখেচোখে একটা চাপা হাসি আর মজা দেখার ভাব। মেয়েটি আমার তন্দ্রা উপলক্ষ্য ক'রে বেয়াড়া প্রশ্ন করলো, স্কুল-কুমারীদের চলতি সেই ফাষ্টবুক-ফাজলা-মোটাও আমার জানা ছিলো না। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। মেয়েরা এ-ওকে জড়িয়ে হেসে গড়িয়ে পড়লো। প্রথমটা বুঝলাম না এত হাসির কি আছে ওতে। বোকামি দেখে প্রশ্নকারিণী এমন ভাবে কথাটার পুনরাবৃত্তি করলো, প্রচ্ছন্ন কুৎসিত ইঙ্গিতটা বুঝতে আর বাকি রইলো না। লজ্জায় রাগে মুখচোখ আমার লাল হ'য়ে উঠলো, সজোরে এক চড় ক'ষে দিলাম মেয়েটার গালে। নরম সাদা গালে তিনটে আঙুলের দাগ কি ভাবে ফুটে উঠছিলো এখনো চোখে ভাসছে। এ নিয়ে কোনো নালিশ গেল না বড়দিমণির কাছে, ওরা জানতো আমি সব কথাই ব'লে দেব। এর পর আরোও কুৎসিত অনেক কৌতুক ও আলোচনা ছুটোছাটা কানে এসেছে কিন্তু আমাকে বিজ্ঞ বানাতে কেউ কখনো আর এগিয়ে আসে নি। গোমড়ামুখী নাম দিয়ে সবাই আমাকে দল থেকে বাতিল করেছিলো।

স্কুলেও একা, বাড়ীতেও একা। ছেলেদের সঙ্গে মিশতে পারি না, মেয়েদের সঙ্গেও খাপ খায় না। বাড়ীর সামনের গাছে ছিলো একটা দোলনা, ব'সে ব'সে তাতে দোল খেতাম! পায়ের তলা থেকে কোমর অব্‌ধি শিরশির ক'রে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়তো একটা সুখকর অনুভূতি—বেশ লাগতো। আর এক কাজ ছিলো টক খাওয়া। টক খেতে খুবই ভালবাসতাম—মেয়ে মাত্রেই যা ভালোবাসে। মনে প্রশ্ন জাগতো, দোলনায় দুলতে, টক খেতে ছেলেরা কেন ভালোবাসে না—এ শিহরণ কি তাদের শরীরে জাগে না! এমন কত কথাই ব'সে ব'সে মনে হতো। সামনে দিয়ে আসা যাওয়া করত বাবার ছাত্ররা। কত সুদর্শন যুবক ছুতোনাতায় আলাপ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে—আমল দেই নি, কেমন যেন ভালো লাগতো না। একা একা ব'সে পরিষ্কার ক'রে ভাবতে চেষ্টা করতাম, কি আমি চাই।

কি আমি চাই এ সমস্যার মীমাংসা একদিন হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। সন্ধ্যার পর বসবার ঘরের একটা কৌচে ব'সে পা দোলাচ্ছি, ছড়ি ঘোরাতে-ঘোরাতে ঘরে এসে ঢুকলেন এক ভদ্রলোক।

'ডক্টর চক্রবর্ত্তী বাড়ী আছেন?'

'হ্যাঁ আছেন—বসুন।' উঠে দাঁড়িয়ে বললাম। লোকটির চোখের দিকে চাখ পড়লো, মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত একবার দেখে নিয়ে ভেতরের দিকে পা বাড়ালাম।

পেছন থেকে বললেন, 'শোনো খুকি, কি নাম তোমার?"

'খুকি' কথাটা আপত্তিকর শব্দের মতো কানে এসে লাগলো। মুখচোখ আরও গম্ভীর ক'রে বলতে গেলাম, 'শ্রীমতী—'

'শ্রীমতী-ট্রীমতী নয়, ডাকনাম কি বলো—ডাকনাম।'

'বাবলি।'

'বাঃ খাসা নাম, যেমনি ফুটফুটে চেহারা, তেমনি সুন্দর নাম।' ছড়িটা একপাশে রেখে একটা কৌচের ওপর ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লেন। 'যাও, বাবাকে বলো গে মিষ্টার চৌধুরী—সুকান্ত চৌধুরী এসেছেন।'

ইনিই সুকান্ত চৌধুরী! আর একবার ভালো ক'রে দেখে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। বাবার মুখে এঁর নাম আগেই শুনেছি। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, দিনকয় হলো এ জেলায় বদলি হ'য়ে এসেছেন। খুবই নাকি বিদ্বান আর গুণী লোক—ভালো গাইতে পারেন। ক'দিনের পরিচয়েই বাবা এঁর গুণ, বিদ্যা ও ব্যবহারে বিশেষ মুগ্ধ হয়েছেন তাঁর কথা শুনেই বুঝেছি।

খবর পেয়ে বাবা ছুটে এলেন। হাঁকডাক ক'রে বাড়ীর সবাইকে ডেকে এনে আলাপ করিয়ে দিলেন। আমার পালা আসতেই সুকান্তবাবু বললেন, 'বাবলির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সবার আগে।' বাবা বললেন, 'ইনি তোদের নতুন কাকাবাবু বুঝলি।' বাবা বুঝিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু এ-ডাক একবারের জন্যেও আমার মুখ দিয়ে বেরোয় নি।

আর সবাই বেরিয়ে গেল। আমি বাবার গা ঘেঁষে ব'সে রইলাম। কোনো পুরুষ সম্পর্কে এতখানি আগ্রহ ইতিপূর্ব্বে কখনো আমার আসে নি। সুকান্তবাবু আমার দিকে খুব যে একটা মনোযোগ দিচ্ছিলেন তা নয়, বাবার কি একটা প্রশ্নের উত্তরে নিজের ঝোঁকেই কথা ব'লে যাচ্ছিলেন। খুঁটিয়ে নজর ক'রে দেখবার পথে কোনো বাধাই ছিলো না। লোকটিকে সুপুরুষ বলা চলে না। বয়স পঁয়ত্রিশের

ওপরে। মাথার চুল সামনের দিকে হালকা হয়ে টাকের আভাস দেখা দিয়েছে, চওড়া কপাল তাতে আরও চওড়া দেখায়। তীক্ষ্ণ উঁচু নাক। সবচেয়ে বেশি নজরে পড়ে বুদ্ধিদীপ্ত চকচকে মিশকালো একজোড়া চোখ। বুদ্ধির দীপ্তি ছাড়া সে-চোখে আরও কিছু ছিলো, যা প্রেমিক বা ভাবুকের পরিচয় নয়। সে যে কি তখন বুঝিনি, বুঝেছিলাম পরবর্ত্তী জীবনে—পরিণত বয়সে আরবার যখন ও-জাতীয় চোখের দৃষ্টিপথে দাঁড়িয়েছিলাম।

বিদায় নেবার জন্য সুকান্তবাবু উঠে দাঁড়ালেন। আমার চোখের ওপর তাঁর চোখ পড়লো। মুহূর্ত্তে তাঁর মুখের ভাবে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিলো—একটু যেন অন্যমনস্ক ভাবেই দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

'কাল আবার এসো সুকান্ত—' খুব ভালো লাগলে আপনি বলতে পারেন না বাবা। 'বৌমা আর ছেলে মেয়ে দুটিকেও সঙ্গে এনো কিন্তু।'

'আনবো।'

সংক্ষেপে জবাব দিয়ে সুকান্তবাবু চ'লে গেলেন।

হঠাৎ অনুভব করলাম কেমন একটা ভালো লাগার আবেশে মনটা আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে, সেই সঙ্গে মিশে আছে বিশেষ একটা ব্যক্তিত্ববোধের অনুভূতি। উপস্থিত বা ভবিষ্যতের কোনো ভাবনাই তাতে ছিলো না, বড়ো হ'য়ে জেগে ছিলো শুধু একটা কথা—কাল আবার দেখা হবে।

দেখা হ'লো। শুধু পরের দিন নয়, প্রতি সন্ধ্যায়ই দেখা পেতে লাগলাম। বাবার সান্ধ্য আসরে যে-কোনো আলোচনায়ই তিনি হ'য়ে উঠলেন প্রধান বক্তা। গল্পও বলতেন চমৎকার। চাকুরি জীবনের অভিজ্ঞতায় রং ফলিয়ে টুকরো-টাকরা মজার সব ঘটনা বলতেন। বাবার মতো রাসভারী লোককেও কথার মাঝখানে হাত তুলে অবকাশ নিতে হতো উদ্গত হাসিকে আয়ত্তে আনতে।

বাবার পাশে আমিও একটি জায়গা ক'রে নিয়েছিলাম, বসে বসে তাঁর মাথায় হাত বুলোতাম, আর ওঁর কথা শুনতাম। একদিন রাজনীতি নিয়ে আলোচনা চলছে মাঝে সুকান্তবাবু ব'লে উঠলেন, 'বাবলি শুধু গল্পই শোনে না, আমাদের সব আলোচনাই বেশ মন দিয়ে শোনে দেখছি।'

'হ্যাঁ, তোমার কথা শুনতে ও ভারি ভালবাসে।' বাবা বললেন। 'রাতের পড়াশুনো তো ছেড়েই দিয়েছে—আমিও তেমন চাপ দিই না, এসব আলোচনা না বুঝেও যেটুকু বুঝবে, তাতে পাঠ্য বই-গেলার চাইতে কাজ বেশিই হবে।' ব'লে মৃদু হাসলেন।

আমার উপস্থিতি একেবারে অবহেলার বস্তু নয়, তাও একদিন জানতে পেলাম। একটু দেরি হয়েছিলো আসরে যোগ দিতে, ঘরে ঢুকতেই সুকান্তবাবু বললেন, 'এতক্ষণে এলো আমার প্রধান শ্রোতা। বাবলি না থাকলে দর্শনের আলোচনাও যেন দানা বাঁধে না।' বলেই তাকালেন আমার দিকে। কথাটা যত সহজভাবে বললেন, দৃষ্টিটা তত সহজ মনে হলো না।

কিছু দিনের মধ্যেই উনি আমাদের পরিবারের একজন মুরুব্বি হ'য়ে উঠলেন। বাবাও আত্মসমর্পণ করলেন ওঁর ব্যক্তিত্বের কাছে, সুকান্তের মত না নিয়ে এক পা চলেন না। বাড়ীর সকলের সঙ্গেই তাঁর স্নেহ আর শ্রদ্ধার সম্পর্ক। মাকে সাংসারিক উপদেশ দিতেন, দিদিকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতেন, কেমন একটা দূরত্ব বাঁচিয়ে চলতেন কেবল আমার বেলায়। আমার সঙ্গে যে-কটা কথা বলতেন তা এমনভাবে বলতেন, 'তুই' কি 'তুমি' বলেন তাও বোঝবার সুযোগ দিতেন না। অবিশ্যি তাঁর ব্যবহারের এই বৈষম্য আর কারুর চোখে ধরা পড়তো না। সূক্ষ্ম বুদ্ধির জোরেই সকলের লক্ষ্য তিনি এড়িয়ে যেতেন।

কোথা দিয়ে কি ক'রে যেন আমার মনে একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিলো, ওঁর ওপর আমার বিশেষ একটা দাবি আছে। কোনো কোনো দিন সকালে আসতেন —'কোর্টের সময় হলো' ব'লে যখনই উঠে পড়তেন, খুবই ছেলেমানুষী উপায়ে দাবির মাত্রাটা মনে মনে ক'ষে নিতাম। ভাবতাম আমি যদি ওঁকে আজ কোর্টে যেতে বারণ করি তো কিছুতেই উনি যাবেন না। অপরীক্ষিত এই সত্যে এতখানি আস্থা ছিলো যে কথাটা ভেবেই মন গর্ব্বে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠতো।

এক সন্ধ্যায় তিনি এলেন না। পরের দিন বাবা খবর নিয়ে জানলেন শরীরটা নাকি তেমন ভালো নেই। স্কুল ফেরতা হঠাৎ ঝোঁকে গাড়ী থামিয়ে নেবে পড়লাম ওঁর বাড়ীর সামনে—ঝি'কে ব'লে দিলাম বাড়ীতে বলতে। গাড়ী চ'লে যেতেই মনে হলো না নামলেই ছিলো ভালো। এ-সময় এ-ভাবে কেন এলাম তার একটা সঙ্গত অজুহাত কিছুতেই মনে দাঁড় করাতে পারলাম না। লজ্জায় সঙ্কোচে পা দুটো যেন ভারি হ'য়ে এলো। দ্বিধা নিয়েই ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকলাম। বারান্দা পার হয়ে শোবার ঘরের সামনে গিয়ে দেখলাম আরাম-কেদারায় শুয়ে তিনি কি একটা বই পড়ছেন। আশেপাশে আর কারুর সাড়াশব্দ নেই। হিলের খুটখুট শব্দে চোখ তুলে তাকালেন। আমি বই বুকে চেপে দাঁড়িয়ে পড়লাম—বইয়ের তলায় ধ্বক-ধ্বক করছিলো বুকটা।

উনি আরাম-কেদারা ছেড়ে একেবারে উঠে পড়লেন, 'আরে—বাবলি যে—'

ওভাবে দাঁড়িয়ে ওঠার মতো অভ্যাগত আমি নই সে-বিষয়ে সচেতন হলেন যেন। আস্তে এগিয়ে এসে একটু থেমে বললেন, 'কিন্তু উনি তো বাড়ী নেই, এই মাত্র পাশের কোন্ বাড়ীতে যেন গেলেন—'

আমার মুখ দিয়ে কোনো কথাই সরলো না। অস্পষ্ট এই সঙ্কোচের জড়িমা ঝেড়ে ফেলতেই হঠাৎ তিনি ব'লে উঠলেন, 'তারপর বাবলি হঠাৎ তুই ইস্কুল থেকে এখানে?' এই প্রথম তিনি স্পষ্ট 'তুই' ব'লে সম্বোধন করলেন। দিদিকে যে-ভাবে আদর করেন, তেমনি হাত ধরে কাছে টেনে নিলেন। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছিলো। বইগুলো হাত থেকে খ'সে মাটিতে প'ড়ে গেল, দেহটা এলিয়ে পড়লো তাঁর বুকের ওপর। অনিচ্ছাকৃত এই ঘটনার পারম্পর্য্যের জন্যে দু'জনের কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। অর্দ্ধ-চেতনের মতো চোখ তুলে চাইলাম তাঁর মুখের দিকে, সে-মুখও বিবর্ণ—তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন। ধীরে ধীরে আমাকে বসিয়ে দিলেন একটা চেয়ারে। বইগুলো কুড়িয়ে গুছিয়ে রাখলেন টিপায়-এর ওপর, তারপর একটা জামা গায় চড়িয়ে বললেন, 'চলো বাবলি তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছি।'

মনে আছে সে রাতে শুয়ে শুয়ে খুবই কেঁদেছিলাম। দুঃখ আর হতাশায় মনটা সেদিনই প্রথম মুষড়ে পড়লো। কেন হলো, কি হলো, কিছুই যেন ভালো ক'রে ভাবতে পারলাম না। শরীর খারাপের জের টেনে তিনিও আমাদের বাড়ী আসা কয়েক দিনের জন্য বন্ধ করলেন। যেদিন এলেন, দেখে মনে হলো গোটা মানুষটাই বদলে গেছে—দেহে-মনে সেই সজীবতার লেশমাত্র নেই।

এদিকে আমাদের বাড়ীর ঘটনা-প্রবাহের গতি হঠাৎ যেন দ্রুত হলো।

দিদির বিয়ে স্থির হয়ে গেল। সুকান্তবাবু নিয়মিত আসা বন্ধ করেছিলেন, বাবা আবার রোজ তাঁকে ধ'রে আনতে লাগলেন। প্রতি কাজে তাঁর পরামর্শ চাই। তিনিও যথারীতি কর্ত্তব্য সেরে চ'লে যেতেন।

বাবা কিসের ফর্দ্দ তৈরী করছেন, আমি কাছেই ব'সে ছিলাম। সুকান্তবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। বাবা সাগ্রহে তাঁকে ডেকে বসালেন। আমি উঠবো ভাবছি এমন সময় বাবা বললেন, 'বাবলি, তুই একটু যা তো মা, আমাদের একটু কথা আছে।'

কেমন একটা কৌতূহল হলো, বেরিয়ে পর্দ্দার পেছনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। যে-কথা কানে এলো, তাতে জ'মে যেন পাথর হ'য়ে গেলাম। ভালো একটি পাত্র পাওয়া যাচ্ছে, এক সঙ্গেই কাজ সেরে ফেলবেন কিনা সে-বিষয়ে ওঁর পরামর্শ

চাচ্ছেন। বিয়ে যখন দিতেই হবে তখন পাত্র হাতছাড়া করা সমীচীন নয় এ সম্পর্কে যথাসম্ভব যুক্তি দেখিয়ে সুরু করলেন বরের পরিচয়। ছেলেটি তাঁরই ছাত্র। এম্, এ, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হ'য়ে রিসার্চে নিযুক্ত আছে। অদ্বৈত ব্রাহ্মণ! বাপ গুরু-পুরোহিত, বহু ঘর শিষ্য আছে। আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। এসব কোনো কিছুকেই বাবা বাধা বলে গণ্য করেন না, তিনি নিজেও ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান। নিজের জীবন নিজের হাতে গড়বে এমন ছেলেই তিনি চান। সরকারী পরীক্ষায় মাথা দিলে চাকরির ক্ষেত্রে এ ছেলে অনেক উঁচুতে স্থান ক'রে নেবে সে-বিষয়ে তিনি নিশ্চিত।

শ্রোতার মুখের ভাব দেখতে পেলাম না, তিনি ব'সে ছিলেন দরজার দিকে পেছন দিয়ে। অস্ফুট কণ্ঠের উত্তর শুনলাম, 'দেখুন, আপনি যা ভালো বোঝেন—তবে কিনা বয়েসটা বিয়ের পক্ষে খুবই কি অল্প নয়? তা ছাড়া অমন গোঁড়া পরিবার, মানিয়ে নিতে পারবে কি?'

আগ্রহের আতিশয্যে বাবা নিজের মতের সমর্থনে অনেক যুক্তিরই অবতারণা করলেন। তাঁর আগ্রহ দেখে কি অন্য কারণে জানিনে সুকান্তবাবু কিন্তু একেবারেই চুপ ক'রে গেলেন।

আমার কান্নাকাটি ও প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেই কনে-দেখা থেকে সুরু ক'রে বিয়ের দিন অবধি ধার্য্য হ'য়ে গেল। সুকান্ত বাবুর স্ত্রী এসেছেন আমাদের বাড়ী, সে-সুযোগে বন্ধুর বাড়ীর নাম ক'রে বেরিয়ে ওঁর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লাম, 'এ বিয়ে আপনাকে বন্ধ করতে হবে।' কোলে মুখ লুকিয়ে প'ড়ে রইলাম, তিনিও আমার মাথায় হাত রেখে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন। তারপর থেমে থেমে বললেন, 'এ বিয়ে আমি বন্ধ করতে পারতাম—এখনও হয়তো পারি—কিন্তু তা করবো না—আমার আদেশ হিসেবেই এটা তুমি মেনে নাও বাবলি, এতে তোমার ভালো হবে।' আমি দুরন্তভাবে মাথা নেড়ে উঠলাম। হালকা হাতে পিঠে চাপড় দিতে দিতে বললেন, 'পাগলী—আমারও অনেক কথা বলবার রইলো তোকে, বছর চার পরও শোনবার মতো আগ্রহ থাকে যদি তো বলবো—আমার মতো বেপরোয়া চরিত্রকে কি ভাবে যে দাবিয়ে রেখেছি—' হঠাৎ থামলেন, '—না বাবলি, এ বিয়ে হ'য়ে যাক, এ আমারও ইচ্ছে—'

চার বছর পরে কি তিনি বলবেন, আজকেই বা বলছেন না কেন—সে কি বুঝবো না ব'লে না অন্য কারণ আছে জিজ্ঞেস করতেও ভরসা পেলাম না।

বিয়ে আমার হলো। শুভদৃষ্টির সময় বরের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন

সুকান্তবাবু, তাঁর সঙ্গেই হলো প্রথম দৃষ্টি-বিনিময়। পরে সকলের পীড়াপীড়িতে আর একবার চোখ তুলে রীতি রক্ষা করেছিলাম মাত্র।

বর দেখে সকলেই খুসি। মা ব'লে বেড়াতে লাগলেন, ফুটফুটে কার্ত্তিকের মতো বর হয়েছে। আমার চোখে কিন্তু গৌরবর্ণ নিষ্প্রাণ একটি নিরীহ জীব ছাড়া আর কিছুই মনে হয় নি। তখনকার জন্যে তা নিয়ে আমার মনে কোনো নালিশ ছিলো না। কারণ ঐ একটি লোক ছাড়া আর কাউকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করবো এ ছিলো ধারণার অতীত।

ফুলশয্যার রাতেই স্বামী টের পেলেন, দুর্ব্বহ এক বোঝাকে তাঁর সঙ্গে সাত-পাকে জড়ানো হয়েছে। শুকনো চোখে রওনা হলাম শ্বশুরবাড়ী। দিদির কান্না তখনো সবার কানে লেগে আছে। আমার এই অস্বাভাবিক কাঠিন্যে সকলে যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। আত্মীয়-বন্ধু সকলেই উপস্থিত ছিল, ছিলেন না শুধু একজন।

দু'মাসের মধ্যে আমার দুর্ভেদ্য নীরবতা দিয়েই স্বামী শুদ্ধ, শ্বশুরবাড়ীর লোকদের আমি ক্ষিপ্ত ক'রে তুললাম। অপরের সঙ্গে 'হুঁ'-'না' যেটুকু বা উচ্চারণ করেছি, স্বামীর প্রশ্নের বেলায় ছিলাম পাষাণের মতো নীরব। বেচারার জন্যে দুঃখ বোধ না করেছি এমন নয়, কিন্তু কেমন একটা জেদে পেয়ে বসেছিলো। স্বামীর চোখে মাঝে-মাঝে ফুটে উঠতো অক্ষমের অসহায় হিংস্রতা, তাতে বিদ্রোহের ভাবটা আমার মধ্যে হ'য়ে উঠতো আরও তীব্র।

অপরিসীম তিক্ততা নিয়ে ওরা আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন পিত্রালয়ে। ব'লে গেল বৌ পায়ে ধ'রে অনুরোধ না জানানো অবধি তাঁরা তাকে গ্রহণ করবেন না। অবশ্য চাওয়া মাত্র ধরবার মতো পদ-প্রাপ্তির ভরসাটা এ ধমকের মধ্যে ছিলো—থাকবার কারণ যে আমার অপরিণত বয়স, সেটা জানিয়ে দিতেও তাঁরা ত্রুটি করেন নি।

পরিবারে ব্যাপ্তভাবে দেখা দিলো একটা অশান্তির ছায়া। ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যেও আমার মনে যে ক্ষীণ আলেটুকু জ্বলছিলো, বাড়ীতে পা দিয়ে তাও দপ্ ক'রে নিভে গেল। সুকান্তবাবু হঠাৎ বদলি হ'য়ে চ'লে গেছেন দিন কয়েক আগে—আকস্মিক এই বদলির পেছনে তাঁর নিজেরই হয়তো বা হাত ছিলো। অন্তর ও আবেষ্টনের এই কালো ছায়াপাতে আমার জেদ কিন্তু চমকালো না। মায়ের চোখের জল, বাবার স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য, আত্মীয়-স্বজনের ক্লান্তিকর উপদেশ উপেক্ষা ক'রে আমি বাপের বাড়ীতেই র'য়ে গেলাম।

কৈশোরের এই পটভূমিকায় হলো যৌবনের আবির্ভাব। চারদিক থেকে হতাশা আর তিরস্কার করলো তার অভ্যর্থনা। দুঃখের চাপে দেহকে কিন্তু ভুললাম না। গোপনে তার যত্ন নিতাম। কোথায় এই দেহ আর রূপের সার্থকতা ভাবতে পারতাম না, তবু সুযোগ পেলেই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতাম নিজের বস্ত্রবিমুক্ত দেহের দিকে—মনে হতো শিশিরসিক্ত ফুলরেণুর লাবণ্য নিয়ে জেগে উঠেছে প্রতিটি রোমকূপ।

একে একে দু'বছর কেটে গেল—গেল বর্ণবৈচিত্র্যহীনভাবে। দিন রাত প'ড়ে-প'ড়ে শুধু বই পড়তাম। বাবার লাইব্রেরীর দিশি-বিলিতি সাহিত্য প্রায় শেষ ক'রে এনেছিলাম। ইংরিজি সাহিত্য বুঝতাম কম, পড়তাম বেশি। ভাষাটাকে জয় করার একটা অদম্য প্রয়াস ছিলো ভেতরে। দর্শনেও দাঁত বসাতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তখন পেরে উঠিনি।

এই আঘাত পেয়েই হ'ক বা যে কারণেই হ'ক, শুনলাম, স্বামী নাকি সরকারী বড় চাকুরির চেষ্টা না ক'রে ঢুকে পড়েছেন কলকাতার একটা কলেজে দর্শনের অধ্যাপক হয়ে। বাড়ীর সকলের ধারণা ছিলো শ্বশুরালয়ের ধর্ম্মনিষ্ঠা আর গোড়ামীর জন্যেই আমার এই বিতৃষ্ণা। হয়তো তা হ'তে পারতো, কিন্তু আমি যে অপর পক্ষের দোষগুণ খতিয়ে দেখার দরকারই বোধ করিনি সে-কথা কেমন ক'রে বোঝাবো? ভালো মানুষ হিসেবে আমার স্বামীর বিশেষ সুনাম ছিলো। সকলেই বলতো, এমন ভালো মানুষের সঙ্গে না বনবার কি কারণ থাকতে পারে, তাঁরা বোঝেন না। পরবর্ত্তী জীবনেও এ-কথা বহুবার শুনলাম, কিন্তু একটা কথা আজও বুঝলাম না, মেয়েদের মুখ থেকে এ কথাটা কি ক'রে বেরোয়—ভালো মানুষ হ'লেই ভালো স্বামী হবে! ভালোমানুষ হলেই ভাল কেরানি বা রাজনীতিক হয় না, ভালো স্বামীই বা হবে কেন—তথাকথিত এই ভালোত্ব স্বামীত্বের কতটুকু!

স্বামীর চাকরি হয়েছে এখন আনায়াসেই তিনি আমাকে নিয়ে কলকাতায় থাকতে পারেন—অতএব নতুন উদ্যমে সুরু হলো আবার আমার মধ্যে স্বামীর প্রয়োজনবোধ জাগিয়ে তুলবার। সকলের মুখেই এক কথা, যা হবার হ'য়ে গেছে এখন এরই সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে—তা ছাড়া উপায় কি। কেন উপায় থাকবে না? একটা জীবনকে উপায়হীন করবার কি তোমাদের অধিকার আছে? যা মুহূর্ত্তে জীবনকে উপায়হীন ক'রে ফেলে, এমন উপায়কে আঁকড়েই বা আছ কেন! কথাটা শোনা মাত্র আমার দেহ-মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠতো। বই প'ড়ে প'ড়ে মনের নানা প্রকোষ্ঠে যেন বাতি জ্বলে উঠেছিলো, নিজের সমর্থনে যুক্তিরও অভাব

হতো না। এমন সময় এক চিঠি পেলাম সুকান্তবাবুর কাছ থেকে। এই প্রথম পত্র। বোধ হয় বাবার অনুরোধে পড়েই লিখেছেন। এইটুকু সকলেই জানতো তাঁর প্রতি আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা। খুবই ছোট চিঠি। অনুরোধ বা আদেশ তাতে নেই, শেষ লাইনে লেখা একটি মাত্র উপদেশ—'সহ্য বা সাহস যে-কোনো একটিকে সম্বল ক'রে এগিয়ে চলো বাবলি, থেমে থেকো না।'

তাইতো। থেমে থাকবো কেন? সাধারণ নারী-জীবনে যৌবন গেলে আর রইলো কি? আখের আগা আর গোড়ার মতো আর দুটো অংশ তো মধ্যেরই ভূমিকা আর উপসংহার—একটা জলো, অন্যটা রূপহীন বিকৃত রসের আধার মাত্র। স্থির ক'রে ফেললাম, সাহসকেই আমি সম্বল করবো। কোনো না কোনো রকমে সার্থকতার পথ খুঁজে বার করতে হবে। কি সেই পথ, কেমন ক'রে খুঁজবো ভেবে দেখার আগেই একদিন বাবা নিজে এলেন আমাকে বোঝাতে। অন্য বারের মতো প্রতিবাদ না তুলে কি ভেবে যেন মৌন হ'য়ে রইলাম। সম্মতির প্রথম অভাস পেয়েই বাবা চ'লে গেলেন কলকাতায়, ফিরে এলেন স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে।

সকলের স্বস্তির নিঃশ্বাস পিঠে নিয়ে এবার আমি সত্যি-সত্যি রওনা হলাম স্বামীর ঘর করতে। এখান থেকেই সুরু আমার জীবন ও যৌবনের অভিযান।

বড়লোকের রূপসী মেয়েকে তুষ্ট করার ইচ্ছা যে স্বামীর মধ্যে আছে তা কলকাতার বাড়ীতে পা দিয়েই টের পেলাম। আমাদের বাড়ীর অনুকরণে ছোট্ট একটি বসার ঘর তিনি সাজিয়ে রেখেছেন। খুব অসুবিধা বোধ করলে অভ্যাস অনুযায়ী খাবার ব্যাবস্থাটা আমি টেবিলেও করতে পারি, বাড়ী পৌঁছে এ অনুমতিটাও তিনি দিয়ে রাখলেন। অর্থাৎ পারিবারিক গোঁড়ামিটা তাঁর মধ্যে তেমন তীব্র নয়, বা সেটা আমার জন্য বর্জ্জন করতে তিনি প্রস্তুত।

অন্তরে যাকে গ্রহণ করবার তা করেছি, দেহটা ওঁরই হাতে সঁপে দেব এটা স্থির ক'রেই এসেছিলাম। আস্তে আস্তে মনও যদি বদলায়, ভালো। স্বামীর আদর তাই বেশ সহজ হয়েই গ্রহণ করলাম। প্রথম রাত্রির একটা ঘটনা স্মরণ হ'লে আজও হাসি পায়, ভাগ্যের বিড়ম্বনা দেখে সেদিন কিন্তু দুঃখও হয়েছিলো। শারীরিক সান্নিধ্যে একটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে মুখের কাছে মুখ নিয়েছি। স্বামী চমকে মুখ সরিয়ে বললেন, 'না, মুখে না।' অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলাম, 'কেন?' বললেন, 'মুখ এঁটো হবে যে।' সমস্ত স্নায়ুকে তিক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু আমি যেন সব কিছুর জন্য তৈরী হয়েই ছিলাম—খিলখিল ক'রে হেসে উঠলাম। লজ্জা পেয়ে বললেন, 'না ঠিক তা নয়, আমার দাঁত খুবই খারাপ কিনা—'। বিভিন্ন ঘটনার

মধ্যে দিয়েই ওঁর সংস্কারের পরিচয় আমি পেতে লাগলাম। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, ভাদ্রমাস এ সবে দাম্পত্যজীবনের নিবিড়তম সংসর্গ তিনি এড়িয়ে চলতেন নানা অছিলায়। আমি বুঝেও না-বোঝার ভাণ করতাম। খাওয়া সম্পর্কেও তাঁর বাছবিচার ছিলো নিষ্ঠাবান হিন্দুর। কিন্তু আমার রুচিতে আপত্তি তুলতে আসতেন না। সব চেয়ে সচেতন ও সতর্ক ছিলেন নারীদেহের পবিত্রতায়। পরপুরুষের স্পর্শেই যেন তা কলঙ্কিত হ'য়ে যায় এমনি ছিলো তাঁর মনোভাব। পথ চলতে কারুর সঙ্গে আমার গা ঠেকে গেলেও তিনি যেন শিউরে উঠতেন। সতীত্বের প্রতি ওঁর এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকেই একদিন আমি বেছে নিয়েছিলাম আমার মুক্তির সহায়ক ব'লে—সে কথা এখন থাক।

নিষ্ঠার সঙ্গে স্ত্রীর কর্ত্তব্য ক'রে চলেছি দেখে আত্মীয়-স্বজন, এমন কি স্বামীও যখন তুষ্ট, আমার মধ্যে তখন ধীরে ধীরে জমে উঠছে একটা বিষাক্ত বিদ্রোহ। স্বামীর হিন্দুয়ানীকে, সমগ্র পুরুষ জাতটাকে এলোপাতাড়ি আঘাত আর অপমান করতে সে উদ্যত। নিজের এই রূপ নিজের কাছে ধরা পড়বার আগেই তার ক্রিয়া সুরু হলো। ওঁর এক মামাতো ভাই আসতো আমাদের বাড়ী, প্রায় ওঁরই সম-বয়সী। তাকে আমি কাছে টানলাম শুধু চোখের দৃষ্টি আর চালচলন দিয়ে। উনি কলেজে চলে যেতেন, আমরা দু'জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখোমুখী ব'সে থাকতাম। একটা মাত্রায় পৌঁছে ও আঁর নিজেকে সামলাতে পারলো না, আমার হাত চেপে ধ'রে নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ ক'রে ফেললো। বর্ণচোরার মতো মুহূর্ত্তে আমার মূর্ত্তি যেন বদলে গেল। রূঢ় ভাষায় তাকে তিরস্কার করলাম, অনাবিল স্নেহকে এমন কদর্য্য অর্থে গ্রহণ করেছে ব'লে। লোকটি সিক্ত চোখে পায়ে হাত দিয়ে মার্জ্জনা চেয়ে বিদায় নিলো। একটা পাশবিক উল্লাসে মনটা আমার নেচে উঠলো।

এর পর থেকেই সুরু হলো এই খেলা। আত্মীয়-বন্ধু যুবক-প্রৌঢ় নির্ব্বিচারে কাছে টানতাম আর আঘাত দিয়ে সরিয়ে দিতাম। দিদির সেই খেলার রাজ সংস্করণ, যার ছিঁচকে রূপ দেখেই একদিন ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। যাকে আকর্ষণ করতাম, সে যখন আমার গ্রহণ সম্পর্কে নিশ্চিত হ'য়ে নিবেদন করতে উদ্যত, তখন তাকে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে আমন্ত্রণ করতাম চা-এ—স্বামীর অনুপস্থিতি বুঝে সময় নির্ব্বাচনটা হতো ইঙ্গিতের একটা অঙ্গ। এ চা কেউ তারা গলাধঃকরণ করতে পারে নি। কেউ বলেছে দেবী, কেউ ক্ষোভে অপমানে মুখচোখ রক্তবর্ণ ক'রে উঠে পড়েছে, কেউবা দুটো রূঢ় কথা ব'লে বেরিয়ে গেছে। সব অবস্থায়ই আমার উল্লাস ছিলো সমান। এ অভিজ্ঞতা থেকে এটা আমি জেনেছিলাম, কোনো

মেয়ের সচেষ্ট আকর্ষণ অবহেলা করতে পারে এমন পুরুষের সাক্ষাৎ কদাচিৎই মেলে —আমি অন্ততঃ পাই নি। তবু জানি এ নিয়ে গুরুতর একটা কিছু ঘটে গেলে আইনগত শাস্তিটা পড়বে পুরুষেরই অংশে। পুরুষের সমাজ—তাই দায়িত্বটা সে নিজের ঘাড়েই গছে নিয়েছে। নারী যখন বস্তু বলে গণ্য হতো এ আইনের জন্ম তখন—যখন তাকে নিয়ে লড়াই চলতো এবং বস্তুরই মতো সে হতো বিজেতার করতলগত। আজ আমরা ব্যক্তি হয়েও সে আইনেরই বাঁধন সইছি। ভেবে হাসি পেতো।

সংসারের কাজে বড় একটা হাত ছোঁয়াতাম না, সবই ছাড়া ছিলো ঠাকুর-চাকরের হাতে। কেবল ঐ খেলা নিয়েই কেটে গেল আরও তিনটে বছর। এক এক সময় গ্লানিতে মনটা ভ'রে উঠতো। নিজেকে মনে হতো বড়ো একা। সন্তানের আবির্ভাব ঠেকিয়ে রেখেছিলাম সযত্ন প্রয়াসে—পাছে দেহের বাঁধন শ্লথ হ'য়ে পড়ে। এ বিষয়ে স্বামীকে বাধ্য করতে কম বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু ঘুরে ফিরে মনে হ'তে লাগলো, কি হবে এই দেহ আর রূপ দিয়ে, কিসের জন্যে এ পসরা সাজিয়ে আমি দিন গুণছি—কি আমি চাই!

আমার এ প্রশ্নের জবাব দিতে ভাগ্য এবারও যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলো। কিছু দিন হলো স্বামীর কাছে দর্শনশাস্ত্রের পাঠ নিচ্ছিলাম, তারই একটা বই-এর পাতা ওল্টাচ্ছি, চাকর এসে একখানা চিঠি হাতে দিলো। জানালো, যে বাবুটি চিঠি নিয়ে এসেছেন তিনি বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছেন, ঠিকানার হস্তাক্ষর দেখেই চিনেছিলাম সুকান্তবাবুর চিঠি। তাড়াতাড়ি খুলে পড়লাম। সংক্ষিপ্ত খবর। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হ'য়ে কলকাতায় এসেছেন। অবসর মতো একবার যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি—তাড়াহুড়োর কোনো দরকার নেই, সে কথাও লিখেছেন।

বহুদিনের সঞ্চিত অভিমান গুমরে উঠলো। জীবনের দিনগুলো যাঁর জন্যে একটানা অবসর দিয়ে ভরিয়ে রেখেছি, তিনি লিখছেন, তাঁরই জন্যে অবসর খুঁজতে। অভিমান ঝেড়ে উঠে বসলাম। কি অসুখ, কতদিন থাকবেন কলকতায়—ছুটলাম বাইরের ঘরে পত্রবাহকের সঙ্গে দেখা করতে। ঘরে ঢুকে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলাম। যে যুবকটি উঠে দাঁড়লো, ব'লে দিতে হয় না সে সুকান্তবাবুর ভাই। সব চেয়ে বেশি মিল চোখের চাউনিতে—সেই চোখ! এবার মুহূর্তে এ দৃষ্টির বিশেষত্ব আমার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ধরা দিলো। এতে কবিত্ব নেই, নেই প্রেমালুতা। শুধু সূক্ষ্ম একটা রেখা যেন টেনে দেয় নারী-পুরুষের মাঝখানে। অশরীরী একটা বৈশিষ্ট্যের

আভাস জেগে থাকে আর জাগিয়ে দেয়—তুমি নারী, আমি পুরুষ। তাতে দম্ভ বা কৃপা নেই। নেই কামনার আবেদন।

একে সুকান্তবাবুর ভাই তাতে আবার তাঁরই মুখের প্রতিচ্ছবি ওর মুখ। লোকটিকে আপনার ভেবে নিতে সময় লাগলো না। নাম সুজিত। বয়স সাতাশ কি আটাশ হবে, দৈর্ঘ্যে সুকান্তবাবুর চেয়ে সামান্য বেশি। গলা খুলে কথা বলে, উঁচু গলায় হাসে। কথা বলার সময় চোখের দিকে খুব কমই তাকায়। ওর দাদার সঙ্গে আত্মিক পরিচয়ের কথাটা স্মরণ ক'রে পর্য্যায়ে একটা গুরুত্ব নিয়ে কথা বলতে লাগলাম। নবাগত ভদ্রলোকের প্রাপ্য সম্মানের চেয়ে স্নেহের ভাবটাই রইলো বড়ো। প্রশ্নের পর প্রশ্নে বেচারাকে বিব্রত ক'রে তুললাম। শুনলাম, সুকান্তবাবু কঠিন হাঁপানি রোগে ভুগছেন। খুবই কাতর অবস্থা। দীর্ঘদিনের ছুটি নিয়েছেন—কাজে যোগ দেবার ইচ্ছা উৎসাহ কোনটাই নেই। সুজিত বারবারই বললো, দাদা কেমন যেন হ'য়ে গেছেন। কোনো বিষয়েই আর তাঁর আগ্রহ নেই, এমন কি স্বাস্থ্য ফিরে পাবার দিকেও না।

ব্যথায় মনটা টনটন করতে থাকে। ইচ্ছে হয় সব ভেঙে-চুরে ছুটে যাই ওঁর কাছে। তবু অপেক্ষা করতে হয় স্বামীর অনুমতির। সুজিতকে বসিয়ে রাখলাম। অবিশ্যি জানতাম ওঁর অমত হবে না। সুকান্তবাবু প্রবীণ মানী লোক, তা ছাড়া তিনি যে বাবার বিশেষ বন্ধু এবং আমাদের পরিবারের একজন মুরুব্বিবিশেষ তা উনি ভালোই জানতেন।

একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে রওনা ক'রে দিতে স্বামীর মন বুঝি সরলো না, তিনিও সঙ্গে গেলেন পৌঁছে দিতে। কাজের তাড়া ছিলো, সুকান্তবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করেই তিনি বিদায় নিলেন। আমি ঘরে ঢুকে স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিলাম —এই সেই দেহের রুগ্নাবশেষ! বুকে মালিশ দেওয়া হচ্ছিলো, মনে হলো বুক নয় তো ছোট একটি কারখানা ঘর। যেখানে যে কলটি নড়ছে, বাইরে থেকে ব'লে দেওয়া যায়। মাথায় টাক প'ড়ে গেছে, যে ক'গাছি চুল আছে, তারও বেশির ভাগই পাকা।

মালিশ বন্ধ ক'রে স্ত্রীকে কি একটা কাজে বাইরে পাঠালেন।, বুকের ওপর চাদরটা টেনে নিয়ে বালিশে হেলান দিয়ে ব'সে বললেন, 'কি বাবলি, একেবারে চুপ ক'রে গেলে যে—'

তবু কোনো কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোলো না।

একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সহজ মনে সব মেনে নিতে পেরেছ?'

মাথা নেড়ে জানালাম, 'না।'

বড় রকমের একটা শ্বাস টেনে নিয়ে খুব ধীরে-ধীরে সেটা ছাড়লেন। 'অনেক কথাই বলতে ইচ্ছা হয়, ব'লে লাভ কি—' থেমে থেমে সুকান্তবাবু বলতে লাগলেন। 'বড় দেরীতে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো বাবলি—তখন আর কোনো উপায় ছিলো না—' সেই উপায়হীনতার কথা, দুঃখের মধ্যেও আমার মাথা জ্বালা ক'রে উঠে। 'ভাবতে গিয়ে যখন দেখলাম আমি সবই করতে পারি, কিন্তু অমলাকে মুক্তি দিতে পারি না।' অমলা ওঁর স্ত্রীর নাম। '—সে অধিকার আমার হাতে নেই। তখন—তখন বাধ্য হ'য়েই—' কথা শেষ না ক'রেই থামলেন। একটু চুপ ক'রে থেকে ম্লান হেসে বললেন, 'মনে ও দেহে এমন রোগই সংগ্রহ করলাম যা শেষ ক'রে ফেলবে না, ভোগাবে। যার হাত থেকে রক্ষা পাবার পথ আজও খুঁজে পেলাম না, কেবল চেপে রাখতে পারি মাত্র—' রুগ্ন চোখে অর্থহীন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে।

চোখের জল আর গোপন রাখতে পারলাম না। কণ্ঠ চেপে আসছিলো উচ্ছ্বসিত কান্নায়, সামলে নিতে উঠে গেলাম বারান্দায়।

ও বাড়ী থেকে যখন বেরোলাম রাত হ'য়ে গেছে। সুজিতই সঙ্গে এলো পৌঁছে দিতে। ট্রামের ভীড়ে গা ঢোকাতে আর ইচ্ছে হ'লো না। বললাম, 'বেশি তো দূর নয়, চলুন এ পথটুকু হেঁটেই যাওয়া যাক।'

মন ক্রমে শান্ত হ'য়ে এলো। দুঃখের ঘন বাষ্প কেটে যেতে স্পষ্ট অনুভব করলাম, সুকান্তবাবুর দিকে যে তীব্র টান আমার ছিলো, সেটা কোথায় যেন ঢিলে হ'য়ে গেছে। লোকটির জন্যে মনের মধ্যে জেগে আছে একটি করুণার সুর। কেন এমন হলো? মনপ্রাণ দিয়ে যাকে চেয়েছিলাম তার সুষ্ঠু রূপের স্বাদ আমি পাই নি, তাই বুঝিবা তার পরিত্যক্ত এই অবলম্বনটাকে আঁকড়ে থাকতে পারছি না। যে আমাকে টেনে ছিলো সে আজ যেই—নেই মন, সেই দেহ। মধুর কোনো স্মৃতির শৃঙ্খলেও সে আমাকে জড়িয়ে যায় নি এ কঙ্কালের সঙ্গে। আমার মনের এতদিনকার একমাত্র অবলম্বন আজকের এই আঘাতে যেন ধ্বসে পড়েছে। অবসন্ন পদক্ষেপে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম সুজিতের সঙ্গে। সারাটা পথ একটিও কথা বলেছি ব'লে মনে পড়ে না।

বাড়ীর দরজায় পৌঁছে সুজিত বললো, 'আমি তা হ'লে যাই—'

সঙ্গীর অস্তিত্ব সম্পর্কে নতুন ক'রে সচেতন হলাম। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'একটু বসবেন না—' চোখ তুলে তাকাতেই সুজিতের মুখ চোখে পড়লো। মন

যেন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো। এই তো—এই তো সে দাঁড়িয়ে আছে তোমার সামনে, যাকে তুমি পাঁচ বৎসর ধ'রে কামনা করছো। সেই চোখ, সেই মুখ, সেই বুদ্ধি ও প্রাণের দীপ্তি।

পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলাম সুজিতের মুখের দিকে। সুজিত কেমন একটু অবাক হয়েই নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলো। আমি কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চল হ'য়ে রইলাম সেইখানে।

সুকান্তবাবুর অসুখের সূত্র ধ'রে ওদের বাড়ী রোজই প্রায় যেতে লাগলাম। সুকান্তবাবুর শারীরিক অবস্থার খবরাখবর নিয়ে চ'লে যেতাম সুজিতের ঘরে। সুজিত চিত্রকর। ঘরের এখানে-ওখানে সব ছবি দাঁড় করানো, অল্প সময়ে সে নামও করেছে। তার ছবিতে নাকি প্রতিভার পরিচয় রয়েছে। গেলেই সুরু হতো ছবির আলোচনা। তার ব্যাখ্যার কিছু বুঝতাম, কিছু বা শুনতাম বক্তার কথা শোনবার জন্যই। সুজিতের চোখের দিকে যখনই চোখ পড়তো, কেবলই মনে হতো, এ খেলার সামগ্রী নয়। এ যখন হাত পাতবে অঞ্জলি ভ'রে আদায় ক'রে নেবে। ভয়ে বুক কেঁপে উঠতো, আবার না গিয়েও থাকতে পারতাম না।

কি ভেবে স্বামীকে সঙ্গে নিতে সুরু করলাম। সান্ধ্য ভ্রমণের নাম ক'রে ওঁকে নিয়ে বেরোতাম, ফেরার পথে কর্ত্তব্য হিসেবেই যেন স্মরণ করিয়ে দিতাম সুকান্তবাবুর শারীরিক খবরটা একবার নিয়ে যাবার কথা। স্বামী মোটেই নিশুক ন'ন, তবু সুজিতের সঙ্গে মোটামুটি তাঁর বেশ ভাব হ'য়ে গেল। স্বামীর সাজপোষাক সম্পর্কেও এ সময় আমি অকস্মাৎ যেন অত্যধিক সচেতন হ'য়ে পড়লাম। নিজে বাজার ঘুরে পছন্দ মতো তাঁর ধুতি-পাঞ্জাবী-জুতো-রুমাল সব কিনেকেটে আনলাম। চুল আচড়ানো থেকে সামান্য চলনটির প্রতি রইলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সুজিতের সামনে ওর নিষ্প্রাণ শান্ত প্রকৃতি আর সেকেলে হাবভাব নিয়ে নিজেকে বড়ই লাঞ্ছিত বোধ করতাম। অহেতুক এক-এক সময় স্বামীর উচ্চ ডিগ্রীর উল্লেখ করতাম সুজিতের সামনে—থেকে থেকে একটা দৈন্য বোধ কেবলই পীড়া দিতো। স্বামী খুশিই হতেন, তাঁর প্রতি আমার এই যত্ন ও নজর দেখে, তবু আকস্মিক এই পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝতে না পারার অস্বস্তি তাতে থাকতো। মাঝে-মাঝে বলতেন, 'ব্যাপার কি বলো তো? তুমি যে আমাকে নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছ, বাবু না বানিয়ে ছাড়বে না দেখছি।'

কিন্তু কিছুতেই নিজেকে রোখা গেল না। স্বামীত্বের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ

ক'রে যে তরঙ্গ ব'য়ে গেল, তা সুজিতের মনেও আলোড়নের সৃষ্টি করেছে আমার চোখে গোপন রইলো না। সুরু থেকেই সুজিত সচেষ্ট একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলছিলো, স্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'তে তার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলো। তার এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি অপমান করতো আমার অন্তরাত্মাকে।

সেদিন দুপুরে একা চ'লে গেলাম ওদের বাড়ী। গিয়ে নিরাশ হলাম, সুজিত বাড়ী নেই। হঠাৎ কি খেয়াল হলো টেবিল থেকে লাল পেন্‌সিলটা নিয়ে ওর শিথানের একটু নিচে বিছানার চাদরের ওপর লিখলাম 'স্যরি', তারপর একখানা বই-এর তলায় লেখাটা চাপা দিয়ে বাড়ী চ'লে এলাম।

কিছুক্ষণ পরেই এলো সুজিত। 'আপনি আমার বিছানায় কি সব আঁকিবুকি ক'রে এসেছেন?' হাসতে-হাসতে বললো।

'আমি—না তো।' অবাক হবার ভাণ করলাম। 'বসুন।'

সুজিত বসলো। সামান্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল তার মুখের ভাবে। 'আচ্ছা, আমার সঙ্গে দেখা না হ'লে সত্যি আপনি দুঃখিত হন?'

'নয়তো কি মিথ্যে লিখে এসেছি?' স্থির দৃষ্টি মেলে তাকালাম ওর চোখে; এই প্রথম সুজিতও নিষ্পলক চেয়ে রইলো চোখে চোখ রেখে। তারপর ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিলো। ওর মুখেচোখে ফুটে উঠলো সেই ভাব—কিন্তু উপায় নেই। এ কথার আভাসেও আমার মাথায় আগুন ধ'রে যায়। মনের জ্বালা চেপে রেখে বললাম, 'আপনি হাত দেখতে জানেন, দেখুন তো আমার হাতটা।' বাঁ হাতখানা বিছিয়ে ধরলাম ওর সামনে। 'এক গণক আমার হাত দেখে কি বলেছে জানেন—বিশ বছর বয়সে আমার জীবনে নাকি একটা ওলটপালট কাণ্ড হ'য়ে যাবে, এমন কি বিবাগীও হ'য়ে যেতে পারি—দেখুন তো সত্যি কিনা!'

'ও বিদ্যে আমার জানা নেই।' ম্লান হেসে সুজিত বললো। ওর মুখ যেন বিবর্ণ হ'য়ে গেছে। একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি এখন যাই—'

সুজিত চ'লে গেল। স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলাম। যৌবনের প্রারম্ভ থেকে যে-মানুষ কামনা ক'রে আসছি এই তো সেই মানুষ। তাকে বেঁধেও বাঁধতে পারছি কই—মাঝখানে উপায়হীনতার দুস্তরতা। সে-বাধা লঙ্ঘন করার সাধ্য ও সাহস ওর মতো পুরুষের আছে—কিন্তু আমার, আমিও তো সাহসকে সম্বল করবো ব'লেই বেরিয়েছিলাম।

পরের দিন দুপুরেই আবার দেখা হলো। আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম ওর

ছবি আঁকার ঘরে। অসমাপ্ত একটা ছবির সামনে সুজিত ব'সে আছে তুলি হাতে। কি ভাবছিলো সে-ই জানে। আমি যেতেই তুলি রেখে উঠে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। ধরা গলায় সুজিতই প্রথম সুরু করলো, 'আপনাকে —আপনাকে একটা কথা বলবো—' নিজে একটা চেয়ারে ব'সে বললো, 'বসুন— কাল থেকে কি ভাবে যে আমার সময় কেটেছে—'

সুজিতের মুখ-চোখ আর কণ্ঠস্বরের স্বাদ পেয়ে হঠাৎ আমার মধ্যেকার সেই খেলোয়াড়টা যেন জেগে উঠলো। একটু আঘাত করার লোভ সামলাতে পারলাম না। মুখের ভাব যথাসম্ভব স্বাভাবিক ক'রে নিয়ে বললাম, 'আপনি ভাবকাতুরে হ'য়ে পড়ছেন মনে হচ্ছে—'

মুহূর্ত্তে সুজিতের মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। একটু দম ধ'রে থেকে বললো, 'হ্যাঁ, সেন্টিমেণ্টালই বলতে পারেন—এটা প্রকাশ ক'রে আপনাকে সম্মানিত করলাম।' একটু থেমে ব্যঙ্গের সুরে বললো, 'আপনার তরফটা যদি অস্বীকার করেন তো বলতেই হবে, প্রেম আপনার কাছে প্রাণের বস্তু নয়, নিছক আর্ট মাত্র।'

'কোনো কিছুকে আর্ট ক'রে তোলা তো কৃতিত্বেরই কথা।'

একটু হাসলো। 'আর্টের অবকাশ খাদ্য তৈরীতে, খাদ্যে নয়—মূল খাদ্যটাই যদি আর্ট হ'য়ে ওঠে, তাতে স্বাদই থাকবে প্রাণ থাকবে না, তেমনি—থাক এ নিয়ে আলোচনা করতে আমার প্রবৃত্তি নেই।' তার মুখে দেখা দিলো বিতৃষ্ণা। 'আপনি অতিথি, আপনাকে যেতে বলতে পারি না, আমিই যাচ্ছি—' সুজিত দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

এ কি ক'রে বসলাম? ছুটে গিয়ে ওর পথ আগলে দাঁড়ালাম। মুখ তুলে চেয়ে রইলাম ওর চোখের দিকে, একটু বুঝি কাঁপছিলামও। গলা চেপে আসছিলো, অস্ফুট স্বরে বেরোলো, 'বাধা দেওয়া যে আমার কর্ত্তব্য, সেটুকুও বোঝ না—'

ফিরে এসে ধপ ক'রে নিজের আসনটায় মুখ গুঁজে বসে পড়লাম। সুজিত একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। দু'জনের মাঝে একটা টিপয়। তাতে দুটো কনুই রেখে সুজিত চেয়ে রইলো আমার দিকে। আমি মুখ তুলতেই চোখাচোখি হলো। দু'জনেই স্থির হ'য়ে রইলাম। ওর কপালের শিরাগুলো, স্ফীত হ'য়ে উঠেছে উত্তেজনায়। মনে হলো বিরাট একটা শক্তি স্তব্ধ হ'য়ে আছে আমার সামনে, বাঁধটা সামান্য একটু ভেঙে দিলে, মুহূর্ত্তে আমাকে ভাসিয়ে নেবে।

টিপয়ের ওপর একটা খড়কে প'ড়ে ছিলো। তার এক মাথায় সামান্য লালচে পানের দাগ। ওটা তুলে মুখের দিকে নিতেই সুজিত বললে, 'ওটা আমি

মুখে দিয়েছি—' ওর কথা যেন কানেই যায় নি এমনি ভাব নিয়ে খড়কেটা মুখে পুরে উঠে দাঁড়ালাম। 'আমি যাই--' পা বাড়াতেই সুজিত এগিয়ে এসে তার সব শক্তি নিংড়ে আমাকে তার বুকের ওপর জড়িয়ে ধরলো।

পরের দিন খুবই সেজেছিলাম মনে আছে। আঁটো ছোট জামার ওপর নেট-এর একটা ব্লাউস, জর্জ্জেট-এর ঝুলে পড়া শাড়ীর গা বয়ে ফুটে উঠেছে দেহের প্রতিটি বক্র রেখা—আঁচলটাকে গুটিয়ে বুকের ওপর দিয়ে টেনে দিয়েছি ক্রস্‌বেল্ট-এর মতো। ঘষা-মাথায় চুলগুলো কপালের সামনে অলক হ'য়ে উড়ছে। সুজিতের শিল্পী-চোখ যে মুগ্ধ হবে সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম।

সুজিতের ঘরে ঢুকলাম। দু'হাত বাড়িয়ে আমার দুটো কাঁধ চেপে ধ'রে বিহ্বল দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইলো। তার আঙুলগুলো যেন পিঠের নরম মাংশপেশিতে ব'সে যাচ্ছে এমনি বোধ হ'লো। উত্তেজনার তীব্রতাকে ছাপিয়ে উঠছিলো শারীরিক ক্লেশ। হঠাৎ ওর হিঁচ্‌কে টানে শাড়ীর আঁচলটা খ'সে পড়লো। আমার কণ্ঠ থেকে বেরোলো একটা চাপা আর্ত্তনাদ, ব্যথাকে অস্বীকার করেও এতক্ষণ যা গলায় আট্‌কে ছিলো। দু' হাত চেপে ব'সে পড়লাম। কিন্তু সুজিতের শক্তির কাছে হার মানতে হলো। দাঁড় করিয়ে দিয়ে আদেশের সুরে বললো, 'বাধা দিও না বাবলি।' আকস্মিক এই আক্রমণে আমার সভ্য মন ছিছি ক'রে উঠলো। কিন্তু পুরুষ-কামনার বর্ব্বর প্রকাশের প্রতি নারী-মনের গুপ্ত লোভটা ভয়-ভাবনার তলায় ব'সেও বেশ যেন খুসি হলো। লুণ্ঠনের এই অবিমিশ্র আগ্রহে নারীত্বের যে স্বীকৃতি কোনো শঙ্কার বাইরে নারী হ'য়ে তাকে বুঝিবা অস্বীকার করা যায় না। নির্ম্মোক মুক্ত কম্পিত দেহে আমি তখন শুধু ভাবছিলাম এর পরের স্তরে নিজেকে আমি বাঁচাই কি ক'রে।

হঠাৎ কি ভেবে সুজিত একটু দূরে স'রে গেল। তীক্ষ্ম দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো আমার সকল অঙ্গের ওপর দিয়ে। ক্রমে তার মুখ থেকে কামনার ছায়া কোথায় সরে গেল। 'যেমন দাঁড়িয়ে আছ তেমনি থাকো বাবলি।' বলেই সে তুলি নিয়ে বসলো। ওর রক্তমাংসের মানুষটা এমন ক'রে হার মানলো ওর শিল্পী মনের কাছে, বিষয়টা আমার নারী-চরিত্রের কোথায় গিয়ে কাঁটার মতো বিঁধলো।

ক্রমে দু'জনের পরিচয় সান্নিধ্যের শেষ সীমায় গড়িয়ে গেল। অতি গোপন সত্যও তার আভাষ ছড়িয়ে দেয় পারিপার্শ্বিকে। স্বামীর মনে গুরুতর সন্দেহ দেখা দিল। বাধ্য হয়েই নকল আদরে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখলাম। এটা

আমি দেখেছি প্রেমের ব্যাপারে পুরুষকে প্রতারণা করা সহজ। অবিশ্বাস করায় যে আত্মাবমাননা, সেটা ওরা সইতে পারে না, বিশ্বাস করতে পারলেই যেন বেঁচে যায়। কিন্তু প্রেমই হলো আমাদের প্রাণ—তাই তার অস্তিত্বে আঘাত পড়লে মানসম্মান ভুলে আমরা মরিয়া হ'য়ে উঠি।

একদিন সুজিত বললো, 'আর নয় বাবলি, এ লুকোচুরি আর সহ্য হয় না—নিজের ওপর নিজে শ্রদ্ধা হারাচ্ছি।'

'কি করতে চাও?' শান্ত স্বরে প্রশ্ন করলাম।

'সকলের চোখের সামনে আমাদের এ সম্পর্ক স্বীকার করতে চাই—সাহস থাকে এগিয়ে এসো, নয়তো এখানেই ছেদ টেনে দাও।'

অন্তরে আমি উল্লসিত হ'য়ে উঠলাম। এই তো এসেছে সুযোগ, অবাঞ্ছিত বন্ধনে চরম আঘাত হানবার। নিজের সাহস উপলব্ধি ক'রে নিজেই অবাক হ'য়ে গেলাম। বললাম, 'কিন্তু পালিয়ে আমি যাব না—মুখের সামনে ব'লে ক'য়ে বিদায় নেবো।'

'তা পারবে না বাবলি—তোমার স্বামী তোমাকে ছাড়বে না। সবাই চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়াবে সাত-পাকের সম্মান বাঁচাতে।'

'তুমি জান না আমার স্বামীর গোঁড়ামির মাত্রা—একবার যদি আমাদের সম্পর্কের সীমা জানতে পারেন তো আমাকে আর আঙুল দিয়েও তিনি ছোঁবেন না—আমি ব'লে ক'য়েই আসবো।'

পরের দিন রাত ন'টার মধ্যে শেষ বিদায় নিয়ে সুজিতের সঙ্গে এসে মিলবো প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলাম।

দরকারি কথার নাম ক'রে স্বামীকে সেদিন বিকেলে বেরুতে দিলাম না। আমার মুখের অবস্থা দেখেই তিনি ভড়কে গিয়েছিলেন, বার-বার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কি কথা। ঘরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। উনি উঠে বাতিটা জ্বালতে গেলেন, আমি আপত্তি জানালাম। আবছা অন্ধকারে ব'সে ব্যক্ত করলাম আমার জীবনের সত্য। স্বামীর মুখ ভালো ক'রে দেখতে পেলাম না। তিনি উঠে ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ পাইচারি করলেন। কাছে এসে রুদ্ধস্বরে বললেন, 'যা হবার হ'য়ে গেছে, সব ভুলে যাও—এখন থেকে নতুন-জীবন সুরু করতে চেষ্টা করো—কথা দাও আমাকে, তা-ই করবে—' কাছে এসে সজোরে হাত চেপে ধরলেন।

আমার দেহ ও মন থরথর ক'রে কাঁপছিলো। 'তা হয় না—আমাকে যেতেই হবে—এর পরও তুমি আমায় গ্রহণ করবে?'

'করবো।'

লোক-লজ্জার কাছে ওঁর আজন্মের সংস্কারও হার মেনে গেছে—ভীরুতা দেখে অশ্রদ্ধায় মন ভ'রে গেল। কি ভাবে সময় পার হলো টেরও পাই নি। ঢং ঢং ক'রে ন'টা বাজলো। আবিষ্ট সত্তা আঘাত খেয়ে জেগে উঠলো। দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমি যাই—'

স্বামী জড়িয়ে ধরলেন। তিনিও কাঁপছিলেন। 'আমার—নিজের—সর্ব্বনাশ না ক'রে ছাড়বে না বুঝি—তুমি কি পাগল হ'লে!' ঘন নিশ্বাস পড়ছে তাঁর। চেপে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

মাথা ঘুরছে—অনেক চেষ্টায় চেতনাকে আঁকড়ে রইলাম। সময় পার হয়ে গেছে, তার পরেও ব'য়ে গেল অনেক্ষণ। মরিয়া হ'য়ে নির্ম্মম অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলাম। 'ওর সন্তান আমার শরীরে—এর পর নিশ্চয়ই—' জিভ জড়িয়ে আসছিলো, মুখ থেকে আর কথা সরলো না।

'তোমাকে যখন নিচ্ছি সবই আমি মেনে নেব—' অসহিষ্ণু স্বরে বললেন।

হঠাৎ স্বামী দেবতা হ'য়ে ওঠেন নি আমি জানি। এ তাঁর মহত্ব নয়, শুধু মান বাঁচানো। কিন্তু আমি এত বড় অসত্যকে স্বীকার ক'রে নেব কেন? আমার তো সাহসের অভাব নেই!

কিছু একটা বলবার চেষ্টা করছি এমন সময় দরজায় কড়া নড়লো। বাইরের ঘরেই আমরা ছিলাম। সেখানে কাউকে প্রবেশ করতে দেবার মতো অবস্থা তখন নয়। দরজা খুলে উনি বাইরে গেলেন, ওঁর গা ঘেঁষেই একটি লোক ঘরে ঢুকলো—ঢুকেই আলোটা জ্বেলে দিলো। দেখি সুজিত। স্বামী ছুটে এসে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়ালেন। বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলেন সুজিতের দিকে।

'ন'টা অনেকক্ষণ বেজে গেছে, তাই জানতে এলাম তোমার মতের কোনো পরিবর্ত্তন হয়েছে কিনা।' শান্ত স্পষ্ট কণ্ঠে সুজিত জিজ্ঞাসা করলো।

আমার সমগ্র সত্তা কেঁপে উঠলো। এবার সত্যি সব ছাড়তে হবে—বাঞ্ছিত জন ও জীবনের মুখোমুখী দাঁড়িয়েও মনের গভীরতম তলদেশ থেকে একটা আবেদন উঠে মনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়লো—ওগো আমাকে তোমরা ধ'রে রাখো, একে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই। মুখে বললাম, 'মত আমার বদলায় নি—চলো—' বহু শতকের দৃঢ় মুষ্টিতে ক্ষীণ আকর্ষণের মতোই দুর্ব্বল কণ্ঠ থেকে কথাটা নিঃসৃত হলো।

স্বামী হাতটা চেপে ধরলেন। সুজিত তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো। বললাম, 'তুমি যাও—অপেক্ষা ক'রো, আমি ঠিক আসবো—'

সুজিত বেরিয়ে গেল। চোখ বুজে ব'সে পড়লাম।

চাকরকে ডেকে স্বামী কি বললেন কানে এলো না। একটু পরেই দরজায় মোটর থামার শব্দ হলো। স্বামী হাত ধ'রে টেনে তুললেন, ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা ক'রে বললাম, 'না, আমি কোথাও যাবো না—জোর করো তো চীৎকার করবো।'

'বেশ, তাই করো, তবু যেতে হবে।' হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চললেন। চীৎকার কিন্তু আমি করলাম না—

ট্যাক্সী ছেড়ে দিলো। চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হ'য়ে আসছিলো, মাথাটা ঝুলে পড়লো একপাশে। স্বামীর কণ্ঠ কাণে এলো। 'শেষে যে-কথাটা বললে তা সুজিত জানে?'

অর্দ্ধচেতন অবস্থায় গলা দিয়ে বেরোলো— 'না—'

স্বস্তির শ্বাসের মতো একটা শব্দ কাণে এলো—অগাধ অন্ধকার তখন আমাকে ঘিরে ফেলেছে। সে কি অন্ধকার—যেন আঁজলা ভ'রে তুলে নেওয়া যায়।

বাংলায় হিন্দুরাজত্বের অবসান

নীহাররঞ্জন রায়

সেন রাজবংশ বাংগালী ছিলেন না, দক্ষিণের কর্ণাট দেশ হইতে এদেশে আসিয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া পালবংশ এবং পালযুগ সৃষ্ট বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষণীয় এই যে, এই যুগে আর একটি রাজবংশ (পূর্ব) বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন; এই বর্মণ রাজবংশও কিন্তু অবাঙালী; ইঁহারাও বিদেশাগত, বোধহয় কলিঙ্গাগত। পালবংশ মুখ্যতঃ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, সেন বংশ গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী। আর, যে-চন্দ্ররাজবংশকে অধিকারচ্যুত করিয়া বর্মণবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাঁহারাও পালরাজাদের মত পরমসুগত অর্থাৎ বৌদ্ধ; আর বর্মণেরা এবং মেঘনা অঞ্চলের দেববংশের রাজারা সেনদের মতনই গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী। এই দুই তথ্যের মধ্যে এই যুগের সামাজিক ইঙ্গিত অনেকাংশে নিহিত; ইহাদের ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা অবহেলার বস্তু নয়। ক্রমে তাহা স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি।

সুদীর্ঘ পালযুগের রাষ্ট্রীয় আদর্শ এই যুগে অপরিবর্তিত; নূতন কোনও রাষ্ট্রীয় আদর্শ এই যুগে গড়িয়া উঠে নাই, রাষ্ট্রযন্ত্রেরও বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় নাই। স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য ও আত্মকর্তৃত্বের আদর্শ সমভাবে বিদ্যমান; সুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্রমাগ্রসরমান মুসলমান শক্তির নিরন্তর করাঘাতেও রাষ্ট্রীয় আদর্শের কোনও পরিবর্তন হয় নাই; সামগ্রিক ভারতীয় ঐক্যবোধ ও আদর্শ, বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় আদর্শ কিছু গড়িয়া উঠে নাই। সামন্ততন্ত্র সমভাবে সক্রিয়। উত্তরোত্তর ভূমির চাহিদা বাড়িতেছে, পুরোহিত ব্রাহ্মণেরাও ভূমি সংগ্রহে তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন; সমাজ ক্রমশ ভূমিনির্ভর কৃষিনির্ভর হইয়া উঠিতেছে। অথচ, রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে ক্ষেত্রকর, কৃষক সম্প্রদায় অবজ্ঞাত। রাজকীয় ভূমিসংক্রান্ত দলিলপত্রে তাঁহারা ভুলেও উল্লিখিত হইতেছেন না। সমাজের নিম্নতম স্তরের লোকদেরও কোনও উল্লেখ দেখিতেছি না। অথচ, পালযুগের লিপিমালায় সর্বত্রই কৃষক-কর্ষক-ক্ষেত্রকরদের উল্লেখ ত আছেই, চণ্ডালদের পর্যন্ত উল্লেখ আছে; অর্থাৎ সমাজের কোনও স্তরই তখন রাষ্ট্রের দৃষ্টির বহির্ভূত ছিল না।

স্পষ্টই দেখিতেছি সেনযুগে রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টি সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। রাষ্ট্রের আধিপত্যের বিস্তার অর্থাৎ রাজ্যপরিধিও পালসাম্রাজ্যের বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই; তাহাও সংকীর্ণই বলা যায়, যদিও লক্ষ্মণ সেন প্রায় মহীপালের রাজসীমা উদ্ধার করিয়াছিলেন, তবে স্বল্পকালের জন্য মাত্র। অথচ, অন্যদিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল রাজ-ও সামন্তবংশেরই রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ক্রমবর্ধমান। নূতন নূতন রাজকর্মচারীদের নাম এই যুগে প্রথম শোনা যাইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে ক্রমসংকুচীয়মান নূতন নূতন রাজ্যবিভাগ: খণ্ডল, চতুরক, আবৃত্তি, পাটক ইত্যাদি। ছোট ছোট রাজপদ যেমন বাড়িয়াছে তেমনই বাড়িয়াছে "মহা"-পদের সংখ্যা: মহামন্ত্রী, মহাপুরোহিত, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাপিলুপতি, মহাগণস্থ, মহাধর্মাধ্যক্ষ ইত্যাদি—"মহা" পদের আর শেষ নাই! কম্বোজ-রাজ নয়পালের ইর্দা পট্টোলিতে নূতন রাষ্ট্রযন্ত্র বিভাগের নামও শোনা যায়: করণ অর্থাৎ কেরাণী মণ্ডলসহ "অধ্যক্ষবর্গ"; সেনাপতিসহ "সৈনিকসংঘমুখ্য", দূতসহ "গূঢ়পুরুষ"বর্গ, এবং আরও কত কি! পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, একদিকে রাষ্ট্রের সমাজদৃষ্টি যত সংকীর্ণ হইতেছে, পরিধি যত সংকীর্ণ হইতেছে, আমলাতন্ত্রের বিস্তার হইতেছে তত বেশী, রাজ-পাদোপজীবির সংখ্যা তত বাড়িতেছে, চাকুরীজীবি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তত বিস্তৃত হইতেছে। দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর তালিকা দিয়াও যখন ইহাদের শেষ করা যাইতেছে না তখন বলা হইতেছে, ইহার পর অন্যান্য অনুল্লিখিত রাজকর্মচারী যাঁহারা রহিলেন তাঁহাদের নাম "অর্থশাস্ত্র" গ্রন্থের 'অধ্যক্ষপ্রচার' অধ্যায়ে লিখিত আছে। আমলাতন্ত্র যে সংখ্যায় ও অধিকার-বৃদ্ধিতে স্ফীত ও অতিমাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবারও অবকাশ নাই। শুধু তাহাই নয়, রাজার সর্বময় কর্তৃত্বও বাড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় আড়ম্বরও, এই যুগে দেখিতেছি তাঁহার নূতন নূতন উপাধিগ্রহণের আতিশয্য। পালযুগের রাজকীয় বিজ্ঞপ্তিতে রাণীর উল্লেখ দেখা যায় না; কিন্তু এখন দেখিতেছি রাজ্ঞী, মহিষীরাও উল্লিখিত হইতেছেন। রাজপরিবারের আভিজাত্য ও দরবারী জৌলুস বাড়িতেছে, এমন অনুমান করা বোধহয় অন্যায় নয়। বর্মণ, কম্বোজ ও সেন বংশ সকলেই ত বিদেশাগত; মাতৃপ্রধান অথবা মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজের স্মৃতি তাঁহারা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, এমনও হইতে পারে। এইখানেই শেষ নয়; পুরোহিত, মহাপুরোহিত, শান্তাগারিক, শান্তাগারাধিকৃত, শান্তিবারিক, মহাতন্ত্রাধিকৃত প্রভৃতি নূতন নূতন রাজপুরুষ (ইহারা সকলেই ধর্মাচরণ-ধর্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত) রাজসভা জাঁকাইয়া বসিয়াছেন।

সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ রাজপণ্ডিতও আছেন; তিনিও এই যুগে অন্যতম রাজকর্মচারী। আমলাতন্ত্রের এই সুদীর্ঘ ও সর্বব্যাপী বাহু এবং সর্বময় প্রভুত্ব জনসাধারণ কি দৃষ্টিতে দেখিত তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই।

রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টিসংকীর্ণতার কথা বলিয়াছি। অন্য সাক্ষ্য প্রমাণ হইতেও এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। পূর্বতর যুগের তুলনায় পালযুগের রাষ্ট্রে শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীর প্রাধান্য কম ছিল, একথা সত্য; কিন্তু সমাজে তাহাদের একটা স্থান ছিল, স্বীকৃতি ছিল। সেন আমলে দেখা যাইতেছে, শিল্পী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোকেরা সমাজের একেবারে নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এ-সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাহার বিস্তৃত বিচারালোচনা বর্ণবিন্যাস ও শ্রেণীবিন্যাস অধ্যায়ে করা হইয়াছে। এই দুই গ্রন্থে বর্ণবিন্যাসের যে-ছবি পাওয়া যায়, যদি তাহা সেন আমলের সমাজবিন্যাসের কিছুমাত্র ইঙ্গিতও বহন করে তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হয়, অনেক শিল্পী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সৎশূদ্র বলিয়াও গণ্য হইতেন না; বর্ণবিন্যাসের নিম্নস্তরে ছিল তাহাদের স্থান। গন্ধবণিক, কর্মকার, তৌলিক (সুপারী ব্যবসায়ী), কুম্ভকার, কাংস্যকার (কাঁসারী), শাঙ্খিক বা শঙ্খকার (শাঁখারী) ইত্যাদি যদি বা জলচল উত্তমসঙ্কর বলিয়া গণ্য হইতেন, তবু তাঁহাদের স্থান করণ (কায়স্থ), অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) প্রভৃতিদের নীচে ছিল। আর, সূত্রধার, চিত্রকর, স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক প্রভৃতিরা 'পতিত' বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে মধ্যম সঙ্কর বলিয়াই গণ্য হইতেন; অট্টালিকাকার, তৈলকার, কৈবর্ত, রজক, ধীবর, জালিক প্রভৃতিরাও 'পতিত'। শিল্পী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের, এবং উৎপাদক-শ্রমিকের এই সামাজিক অধোগতিও রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টিসংকীর্ণতারই দ্যোতক।

এই দৃষ্টিসংকীর্ণতা সেন রাজবংশ ও রাষ্ট্রের উপর কেন আরোপ করিতেছি তাহার কারণ বলিতে হইলে রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। সেন আমলের রাজকীয় লিপিমালার সাক্ষ্য লইয়াই আরম্ভ করা যাইতে পারে। বর্মণ ও সেন বংশের প্রত্যেকটি লিপিতেই দেখা যায় ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি, সংস্কার ও পূজার্চনার জয়জয়কার; বিভিন্ন তিথি উপলক্ষে তীর্থস্নান, উপবাস; নানাপ্রকারের বৈদিক ও পৌরাণিক যাগযজ্ঞ হোম ইত্যাদির বিবরণ। এই সব অনুষ্ঠান উপলক্ষেই যত ভূমি দান, এবং সমস্ত দান লাভ করিতেছেন ব্রাহ্মণেরা। এই যুগের একটি লিপিতেও এমন প্রমাণ নাই যেখানে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী কেহ, বা কোনও বৌদ্ধবিহার বা সংঘ কোনওপ্রকার রাজানুগ্রহ লাভ করিতেছে।

বাংলা দেশে যত বৌদ্ধমূর্তি ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশ অষ্টম হইতে একাদশ শতকের। অল্প কয়েকটি মূর্তিই দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের। পট্টিকেরা রাজ্যের এক রণবঙ্কমল্ল হরিকাল দেব ছাড়া এই যুগে আর কোনও বৌদ্ধ নরপতির খোঁজ পাওয়া কঠিন। মধুসেন পরমসৌগত সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি সেনবংশের রাজা কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; আর এই ধরণের ২।১টি দৃষ্টান্তের সাহায্যে রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ ধরাও কঠিন। বর্মণ ও সেনবংশীয় রাজারা কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব, কেহ সৌর, কিন্তু প্রত্যেকেরই আশ্রয় পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও সংস্কার, এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই এই স্মৃতি ও সংস্কার প্রচার ও বিস্তারে সর্বদা সক্রিয়। রাজপরিবারের লোকদেরও এ-সম্বন্ধে আগ্রহের সীমা নাই। বৌদ্ধধর্ম এই সময় বিলীন হইয়া গিয়াছিল, সংঘ বিহার ইত্যাদি ছিল না, একথা বলা চলে না; অথচ রাষ্ট্রের কোন অনুগ্রহই সেদিকে বর্ষিত হইল না! শুধু যে বর্ষিত হয় নাই, তাহা নয়, বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি একটা বিরোধীতাও বোধ হয় আরম্ভ হইয়াছিল, এবং রাষ্ট্রের সমর্থনও এই বিরোধীতার পশ্চাতে ছিল। বর্মণরাজ জাতবর্মণের রাজত্ব কালেই সম্ভবত বর্মণ রাষ্ট্রের বঙ্গাল সৈন্যদল সোমপুরের বৌদ্ধ মহাবিহার ধ্বংস করিয়া পুড়াইয়া দিয়াছিল; নালন্দার একটি লিপিতে এই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি উল্লিখিত আছে। এই আক্রমণ শুধু কৈবর্তনায়ক দিব্যর বিরুদ্ধেই নয়; বৌদ্ধধর্মেরও বিরুদ্ধে। ভট্ট ভবদেব ছিলেন রাজা হরি বর্মণের সান্ধিবিগ্রহিক; তাঁহার পিতামহ আদিদেব ছিলেন বঙ্গরাজের সন্ধিবিগ্রহিক। এই পরিবারের রাষ্ট্রীয় প্রভাব সহজেই অনুমেয়। তাহার উপর ভবদেব নিজে ছিলেন সমসাময়িক কাল এবং সংস্কৃতির একজন প্রধান নায়ক, কুমারিল ভট্টের মীমাংসা বিষয়ক তন্ত্রবার্ত্তিক গ্রন্থের টীকাকার, হোরাশাস্ত্র, মীমাংসা, সিদ্ধান্ত, তন্ত্র, গণিত এবং ফলসংহিতা বিষয়ক গ্রন্থাদির রচয়িতা, কর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি বা দশকর্ম-পদ্ধতি প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ প্রভৃতি স্মৃতিবিষয়ক গ্রন্থের লেখক এবং ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিত। এই ভবদেব ভট্ট অগস্ত্যের মত বৌদ্ধরূপ সমুদ্রকে গণ্ডুষে পান করিয়াছিলেন এবং পাষণ্ড বৈতণ্ডিকদের যুক্তিতর্ক খণ্ডনে দক্ষ ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রশস্তি-লিপিতে দাবি করা হইয়াছে। পাষণ্ড বৈতণ্ডিকেরা যে বৌদ্ধ দার্শনিক এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। দেখা যাইতেছে এই যুগের ব্রাহ্মণ্যধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি বৌদ্ধ দর্শন ও সংস্কৃতির বিরোধী। বর্মণ বংশের রাষ্ট্রে ভবদেব যেমন সামাজিক আদর্শের প্রতিনিধি সেনরাষ্ট্রে তেমনই হলায়ুধ। এই হলায়ুধও ভবদেবেরই মতন ব্রাহ্মণ-কুলতিলক এবং তেমনই প্রথম রাজপণ্ডিত, তারপর লক্ষ্মণসেনের মহামাত্য, এবং সর্বশেষে

লক্ষ্মণসেনেরই ধর্মাধিকারিন্ বা ধর্মাধ্যক্ষ। তাঁহার পিতা ধনঞ্জয়ও ছিলেন রাজকীয় ধর্মাধ্যক্ষ। এই পরিবারেরও রাষ্ট্রীয় প্রভাব অনস্বীকার্য। হলায়ুধের দুই ভাই ঈশান এবং পশুপতি যথাক্রমে আহ্নিক এবং শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে দুইটি পদ্ধতি রচনা করিয়াছিলেন। পশুপতি একখানা পাকযজ্ঞ গ্রন্থেরও রচয়িতা। আর, হলায়ুধ নিজেও ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব এবং পণ্ডিতসর্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। সুস্পষ্ট বিরোধীতার ইঙ্গিত ভবদেব ছাড়া আর কাহারও জীবনে হয়ত পাওয়া যায় না, কিন্তু নিঃসন্দেহে এ-যুগের রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ একান্তই ব্রাহ্মণ্যধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি আশ্রয়ী। দু'টি মাত্র দৃষ্টান্ত আহরণ করা হইল, কিন্তু বস্তুতঃ, বাংলা দেশ আজও যে স্মৃতি শাসনে শাসিত, যে বর্ণবিন্যাসে বিন্যস্ত সেই স্মৃতি ও বর্ণবিন্যাস দুই-ই এই সেন-বর্মণ যুগের সৃষ্টি। বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া জিতেন্দ্রিয়, বালক, ভবদেব, হলায়ুধ এবং বোধ হয় জীমূতবাহন, ইঁহারা প্রত্যেকেই সেন-বর্মণ আমলের লোক; এবং হারলতা-পিতৃদয়িত হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবহার-মাত্রিকা-দায়ভাগ-কালবিবেক পর্যন্ত সমস্ত স্মৃতি, ব্যবহার ও মীমাংসা গ্রন্থ এই যুগের রচনা। এই স্মৃতি-ব্যবহার-মীমাংসাই শূলপাণি-রঘুনন্দন কর্তৃক পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত হইয়া আজও বাংলার সমাজ শাসন করিতেছে। এই ধর্ম ও সাংস্কৃতিক আদর্শের পশ্চাতে রাষ্ট্রের সক্রিয় পোষকতা ও সমর্থন না থাকিলে একশত-দেড়শত বৎসরের মধ্যে ইহাদের এমন সমৃদ্ধ রূপ কিছুতেই দেখা যাইত না। পোষকতা ও সমর্থন যে ছিল তাহার প্রমাণ বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন স্বয়ং। বল্লাল স্বয়ং আচার-সাগর, প্রতিষ্ঠা-সাগর, দান-সাগর এবং আংশিকতঃ অদ্ভুত-সাগর এই চারিটি স্মৃতিবিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা। দানসাগর তিনি লিখিয়াছিলেন তাঁহার গুরু অনিরুদ্ধের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া। অসম্পূর্ণ অদ্ভুত সাগর সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন লক্ষ্মণসেন স্বয়ং এবং তাহা পিতৃনির্দেশে।

এই একান্ত ব্রাহ্মণ্য আদর্শের শাসন অন্যদিক দিয়াও কি করিয়া রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার ইঙ্গিত আগেই করিয়াছি। এই যুগের সেন-বর্মণ রাষ্ট্রেই প্রথম দেখা যাইতেছে, পুরোহিত-মহাপুরোহিত, শান্তাগারিক-শান্তিবারিক, তন্ত্রাধিকৃত প্রভৃতিরা রাজকর্মচারী বলিয়া গণ্য হইতেছেন। রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য, ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং রাষ্ট্র ও রাজবংশ এই সংস্কৃতি বিস্তারে সচেষ্ট, ইহা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমাজ-নিয়ন্ত্রণ রাজার কর্তব্য বলিয়া ভারতবর্ষে বরাবরই স্বীকৃত হইয়াছে; পালরাজারাও বর্ণাশ্রম

রক্ষণ ও পালন করিয়াছেন ; কিন্তু সেন আমলে রাষ্ট্র ও রাজবংশ যেমন করিয়া দেশের সকলের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট ক্রিয়া কর্তব্য হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ধর্ম ও সমাজগত আচার ও আচরণ, পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এমন সজ্ঞান সচেতন এবং সর্বব্যাপী কর্তৃত্বমূলক চেষ্টা বাংলা দেশে ইহার আগে বা পরে আর কখনও হয় নাই। এই যুগের সর্বপ্রধান চেষ্টাই যেন হইতেছে, বাংলার সমাজকে একেবারে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজা, নূতন করিয়া গড়া, এবং তাহা একান্ত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি-সংস্কৃতির আদর্শানুযায়ী—সেই চেষ্টার পশ্চাতে রাষ্ট্র ও রাজবংশের পরিপূর্ণ সক্রিয় সমর্থন, উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর লোকেরাও তাহার পোষক ও সমর্থক। এই যুগের লিপিমালা এবং ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে ইহা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। কুলজী গ্রন্থমালার সাক্ষ্য, বাংলার কৌলিন্য প্রথার সাক্ষ্য হয়ত ইতিহাসে প্রামাণ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নয় ; সে আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি। কিন্তু লোকস্মৃতি ও লোকেতিহাসের যদি কিছুমাত্র ঐতিহাসিক মূল্যও থাকে তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হয়, শ্যামল বর্মণ এবং বল্লাল সেনের সঙ্গেই বাংগালার প্রচলিত বর্ণ-বিন্যাস ও সামাজিক স্তরবিভাগের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। লোকস্মৃতির নীচে কোথাও একটা কিছু সত্য গোপন থাকে ; বর্মণ ও সেনবংশের সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে যে অকাট্য নিঃসংশয় প্রমাণ সুবিদিত, লোকস্মৃতি এই ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে না। আনন্দ ভট্টের বল্লাল চরিত গ্রন্থ খুব প্রামাণ্য গ্রন্থ না হইতে পারে—সে আলোচনাও অন্যত্র করিয়াছি—কিন্তু ইহার সামাজিক ইঙ্গিতও মিথ্যা নয়। বল্লালসেন বণিকদের উপর অত্যাচার এবং সুবর্ণ বণিকদের 'পতিত্' করিয়া দিয়াছিলেন, এবং কৈবর্ত, মালাকার, কুম্ভকার ও কর্মকারদের সৎশূদ্র স্তরে উন্নীত করিয়াছিলেন বলিয়া এই গ্রন্থে যে-বর্ণনা আছে তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না-ও হইতে পারে, কিন্তু সেনরাষ্ট্র ও রাজবংশের আমলে এইভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তর নির্ণয় এবং কোন্ স্তরে কোন্ সম্প্রদায়ের স্থান ইত্যাদি নির্দেশ করা হইতেছিল তাহা অস্বীকার করা চলে না। হয়ত তাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রের রাজকীয় নির্দেশও কিছু ছিল।

এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল বরেন্দ্রী ও রাঢ়দেশ, এবং পরবর্তী কালে বিক্রমপুর অঞ্চল। কিন্তু বিক্রমপুর বৌদ্ধ সাধনা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রস্থল থাকাতে সেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতাপ রাঢ়-বরেন্দ্রীর মতন এতটা প্রবল হইয়া উঠিতে পারে নাই। আর, ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ সাধনার প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত প্রবল ছিল। এ সম্বন্ধে লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান।

বোধহয় এইজন্যই মৈমনসিংহ-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম-শ্রীহট্ট অঞ্চলে আজও ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির শাসন অপেক্ষাকৃত শিথিল।

সেন ও বর্মণ উভয় বংশই দক্ষিণাগত। এ তথ্য সুবিদিত যে অন্ধ্র-সাতবাহন আমল হইতেই দক্ষিণ দেশ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির খুব বড় কেন্দ্র। পল্লব, চোল, চালুক্য ইত্যাদি সকল রাজবংশই এই ধর্ম ও সংস্কৃতির পোষক, ধারক ও সমর্থক। বস্তুত, উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারত এই বিষয়ে অধিকতর গোঁড়া, পরিবর্তন-বিবর্তনবিমুখ। শুধু আজই এইরূপ নয়; প্রাচীন কালেও তাহাই ছিল। কলিঙ্গ-কর্ণাট হইতে বর্মণ ও সেনেরা সেই আদর্শ লইয়াই বাংলা দেশে আসিয়াছিলেন, এবং রাষ্ট্রের বিপুল ও সক্রিয় সমর্থন এবং রাজবংশের মর্য্যাদার বলে ও সহায়তায় সেই আদর্শ ও তদনুযায়ী স্মৃতি ও ব্যবহার শাসন বাংলা দেশে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই চেষ্টা সফল হইয়াছিল। বাধা-বিরোধিতা তখনও হইয়াছিল, পরেও হইয়াছে —বল্লালী সমাজ-পদ্ধতি ও শাসন বাংলার সর্বত্র সমভাবে স্বীকৃত ছিল না, এখনও নাই—কিন্তু কোনও বাধাই যথেষ্ট কার্যকরী হয় নাই। আজ পর্যন্ত উচ্চতর বর্ণ ও সমাজ সেই যুগেরই স্মৃতি ও ব্যবহার শাসন মানিয়া চলিতেছে; নিম্নতর বর্ণেরও তাহাই আদর্শ ও মাপকাঠি।

কিন্তু সমসাময়িক বাংলা দেশের পক্ষে কি তাহা সার্থক ও কল্যাণকর হইয়াছিল? পরবর্ত্তী ইতিহাসের কথা বলিব না, কিন্তু সমসাময়িক কালে ইহার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত নির্ধারণ ঐতিহাসিকের কর্তব্য।

আগের পর্বে দেখিয়াছি, পালযুগের সামাজিক আদর্শ ছিল বৃহত্তর সামাজিক সমন্বয় ও সমীকরণ। ইতিহাসের চক্রাবর্তে বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যে-স্রোত বাংলা দেশে প্রবাহিত হইতেছিল সেই স্রোতকে ব্রাহ্মণেতর ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোতের সঙ্গে মিলাইয়া মিশাইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই কাঠামো ও আদর্শানুযায়ী একটি বৃহত্তর সামাজিক সমীকরণ গড়িয়া তোলাই ছিল পালরাষ্ট্র ও রাজবংশের সাধনা। সমসাময়িক অন্যান্য রাষ্ট্র ও রাজবংশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শও ছিল তাহাই। গুপ্ত আমল হইতে আরম্ভ করিয়াই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলা দেশে সুস্পষ্ট এবং ক্রমবর্ধমান; তখন হইতেই না হউক অন্ততঃ সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতিই বলবত্তর। কখনও তাহা অস্বীকৃত হয় নাই। বৌদ্ধ পাল বা খড়্গ বা চন্দ্ররাজারাও তাহা করেন নাই, বরং তাঁহারা সেই আদর্শই মানিয়া লইয়াছেন, ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করিয়াছেন, পুরোহিতার্পিত শান্তিবারি

মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মন্দির স্থাপন করিয়াছেন, চাতুর্বর্ণ্য সমাজ রক্ষা ও পালন করিয়াছেন, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ পাঠ শুনিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, পালযুগে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য এবং হিন্দু-বৌদ্ধ দেবদেবীদের মধ্যেও একটা বৃহৎ সমন্বয়-সমীকরণ ক্রিয়া চলিতেছিল ; বৌদ্ধ ও শৈবতন্ত্র বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের একটী বৃহৎ সমন্বয়সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতেছিল ; বৌদ্ধেরা অসংখ্য ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, আর্যেতর ব্রাহ্মণেতর সংস্কৃতির দেবদেবীদের পংক্তিভুক্ত করিতেছিল ; অন্যদিকে ব্রাহ্মণেরাও বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণেতর আর্যেতর দেবদেবীদের কিছু কিছু মানিয়া লইতেছিলেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই সমন্বয়-সমীকরণ ক্রিয়া সমভাবে চলিতেছিল। বর্ণবিন্যাস ও সামাজিক স্তরভেদের ব্যাপারেও তাহা লক্ষ্যণীয়। পাল আমলে চণ্ডাল পর্যন্ত সকল শ্রেণী ও বর্ণের লোকেরাই রাষ্ট্রের দৃষ্টিভূত ; সেন আমলে শুধু উচ্চতর বর্ণের লোকেরাই রাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আছেন। এমন কি রাষ্ট্রযন্ত্রেও ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের প্রাধান্য। পাল রাজারা চাতুর্বর্ণ্য সমাজ রক্ষা ও ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু সেন ও বর্মণ রাজারা ইচ্ছামত এবং স্মৃতিনির্দেশমত চতুর্বর্ণের বিভিন্ন স্তর ঢালিয়া সাজিয়াছেন। বস্তুতঃ, পাল আমলে ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির সমন্বয় ও সমীকরণের আদর্শ এই যুগে একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছিল ; সেই আদর্শের স্থানে সবলে ও সোৎসাহে তাঁহারা এক নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—এই আদর্শ স্মৃতিশাসিত বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির আদর্শ, সর্বপ্রকার সমন্বয় ও সমীকরণ বিরোধী আদর্শ।

কুলজীগ্রন্থধৃত লোকস্মৃতির যদি কিছুমাত্র মূল্যও থাকে, বল্লাল-চরিত গ্রন্থোক্ত কাহিনীর পশ্চাতে যদি কোনও সত্য থাকে তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় সেন ও বর্মণ রাজারা পালযুগ গঠিত বাংলার সমাজ ও বাঙালী জাতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন। এই গড়ার মূলে কোনও সমন্বয় বা সমীকরণের আদর্শ সক্রিয় ছিল না। বর্ণবিন্যাসের দিক হইতে দেখিলে দেখা যাইবে সমাজ বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত ; প্রত্যেকটি স্তর সুনির্দ্দিষ্ট সীমায় সীমিত ; এক স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের মিলন ও আদান প্রদানের বাধা প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য, অনতিক্রম্য। মাঝে মাঝে ক্বচিৎ যেখানে মিলন ও আদান প্রদান হইতেছে সেখানে স্মৃতিশাসনের ব্যতিক্রম হইতেছে, এবং এই ব্যতিক্রমগুলিও সুনির্দিষ্ট নিয়মে নিয়মিত। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের বর্ণবিন্যাস ও তাহার যুক্তি, এই যুগের অসংখ্য স্মৃতিগ্রন্থাদির বিবরণ ও যুক্তি পাঠ করিলে সমাজের

এই স্তরভেদ কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। সর্বোচ্চ বর্ণ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যদি বা উত্তর সঙ্কর বা সৎশূদ্রদের খাওয়া দাওয়া বিষয়ে আদান-প্রদানের পথ খানিকটা উন্মুক্ত ছিল, মধ্যম সঙ্কর ও অন্ত্যজদের সঙ্গে একেবারেই ছিল না। এক স্তরের সঙ্গে আর এক স্তরের, কিংবা একই স্তরের মধ্যে এক শাখার সঙ্গে আর এক শাখার বৈবাহিক আদান-প্রদান একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। এক একটি স্তরের মধ্যেও আবার নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ উপস্তর; এবং সেখানেও বিভিন্ন বিচিত্র উপস্তরের মধ্যে বিচিত্র বাধা নিষেধের প্রাচীর। এসব সাক্ষ্য কুলজী গ্রন্থমালা বা বল্লালচরিতের নয়—এই যুগের স্মৃতিগ্রন্থাদির, লিপিমালার এবং এই যুগেরই প্রতিফলন যে সব গ্রন্থে পড়িয়াছে অর্থাৎ বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের সাক্ষ্য। এবং তাহা অস্বীকার করা কঠিন। শেষোক্ত পুরাণ দুটিতে দেখা যাইবে, ব্রাহ্মণদের মধ্যেই বিভিন্ন স্তর। এ-যুক্তি স্বীকার্য যে সেন-বর্মণ আমলে এই সব স্তরভেদ ও বিভিন্ন স্তর-উপস্তরের মধ্যে বিধি-নিষেধের প্রাচীর পরবর্তীকালের মত খুব সুনির্দিষ্ট খুব কঠোর হয়ত হইয়া উঠে নাই; কিন্তু রাষ্ট্র ও উচ্চতর বর্ণগুলির সামাজিক আদর্শ যে তাহাই ছিল এবং সেই আদর্শই তাঁহারা সবলে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহের এতটুকু অবকাশ নাই। সেন-বর্মণ যুগের লিপিমালা এবং স্মৃতিগ্রন্থমালাই তাহার অকাট্য প্রমাণ। সমাজের এই স্তরভেদ এবং স্তরে স্তরে আদানপ্রদানের বিচিত্র বিধিনিষেধ নবগঠিত বাংলার সমাজ ও বাঙালী জাতিকে দুর্বল ও পঙ্গু করে নাই তাহা কে বলিবে? পরবর্তী কালে যে করিয়াছে তাহা ত অনস্বীকার্য, কিন্তু বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির সেই শৈশবে এই ভেদবুদ্ধি ও বিভেদাদর্শ নবজাত শিশুকে বিভ্রান্ত করে নাই, কে বলিবে?

বর্ণবিন্যাসের ক্ষেত্রে যেমন শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রেও তাহাই। কৃষক-ক্ষেত্রকর হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্যজ চণ্ডাল পর্যন্ত লোকেরা ত রাষ্ট্রের দৃষ্টির অন্তর্ভুক্তই ছিল না, আর ব্রাহ্মণেরা যে-রাষ্ট্রে ক্রমশঃ আধিপত্য বিস্তার করিতে-ছিলেন, ধর্মানুষ্ঠানের কর্তারা যে ক্রমশঃ রাজপাদপোজীবি হইতেছিলেন তাহা ত আগেই বলিয়াছি। ভবদেব ভট্টের মতন একজন পণ্ডিত ও রাষ্ট্রনায়ক ব্রাহ্মণদের কৃষিকার্য সমর্থন করিয়াছেন; লিপিমালায় প্রমাণ পাইতেছে ব্রাহ্মণেরা রাষ্ট্রকার্যে যোদ্ধৃ ব্যবসায়ে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত আছেন; অথচ ভবদেবই ব্রাহ্মণদের পক্ষে অন্য প্রায় সকল বৃত্তিই নিষিদ্ধ বলিয়া বলিতেছেন, এমন কি অব্রাহ্মণকে শিক্ষাদান এবং অব্রাহ্মণের যাগযজ্ঞ পূজা অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য পর্যন্ত! শ্রেণীতে শ্রেণীতে

বিভেদের সৃষ্টি, ভেদবুদ্ধি সৃষ্টির প্রমাণ ইহার চেয়ে আর কি থাকিতে পারে? ব্রাহ্মণদের পক্ষে চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা, চিত্রবিদ্যার চর্চাও নিষিদ্ধ ছিল! যাঁহারা তাহা করিতেন তাঁহারা 'পতিত্' হইতেন। জ্যোতির্বিদ্যার চর্চাও নিষিদ্ধ ছিল; দেবল ব্রাহ্মণরা ত এই জন্যই 'পতিত্' হইয়াছিলেন। অথচ ভবদেব ভট্ট, বল্লালসেন স্বয়ং এবং আরও অনেক সমসাময়িক প্রধান প্রধান পণ্ডিত ব্রাহ্মণ জ্যোতিষ, ফলসংহিতা, হোরাশাস্ত্র ইত্যাদির চর্চা করিতেন। তাঁহারা ত 'পতিত্' হন নাই! ব্রাহ্মণেতর বর্ণের পৌরোহিত্য যাঁহারা করিতেন তাঁহারা ঐসব নিম্ন বর্ণের বর্ণভুক্ত হইতেন! শ্রেণী-ভেদবুদ্ধির আর কি প্রমাণ প্রয়োজন? এই সব সাক্ষ্য সমস্তই সমসাময়িক। ইহার উপর বল্লালচরিতের সাক্ষ্য যদি প্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, বল্লালের সেনরাষ্ট্র কোনও না কোনও কারণে বণিকদের সমর্থন হারাইয়াছিল, এবং তাহারই ফলে সমাজে সুবর্ণবণিকদের 'পতিত্' হইতে হইয়াছিল। সেক শুভোদয়ার একটি গল্পে দেখিতেছি, লক্ষ্মণ-সেনের এক শ্যালক, রাণী বল্লভার এক ভ্রাতা কুমারদত্ত, এক বণিক্ বধূর উপর পাশবিক অত্যাচার করিতে গিয়াছিল। বণিকবধূ মাধবী যে শেষপর্যন্ত রাজ-সভায় সুবিচার পাইয়াছিল তাহা শুধু তেজস্বী ব্রাহ্মণ সভাকবি ও পণ্ডিত গোবর্ধন আচার্যের জন্য। নইলে রাজসভায় মন্ত্রী, রাজমহিষী ও স্বয়ং রাজার যে আচরণ এই গল্পের মধ্যে প্রকাশ তাহা সেন-রাজসভার পক্ষে খুব প্রশংসনীয় নয়! বল্লালসেন যে মালাকর, কর্মকার, কুম্ভকার এবং কৈবর্তদের উন্নীত করিয়াছিলেন, এইখানেও ত শ্রেণীগত ভেদবুদ্ধির প্রমাণ সুস্পষ্ট। বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও দেখিতেছি, অনেকগুলি সমৃদ্ধ ও অর্থশালী শিল্পী ও বণিক সম্প্রদায় মধ্যম সঙ্কর ও অসৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত এবং স্বর্ণকার ও সুবর্ণ বণিকদের স্থান এই পর্যায়ে। বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা যে সেনরাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, তাহার ইঙ্গিত ত তারানাথের বিবরণীতেও খানিকটা পাওয়া যাইতেছে। তাহাদের দোষও দেওয়া যায় না; সেন-বর্মণ রাষ্ট্র ত তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধিত ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল না, আর রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শও বৌদ্ধস্বার্থবিরোধী ছিল। বর্ণভেদবুদ্ধি এবং এই শ্রেণীভেদবুদ্ধি একত্র জড়িত হইয়া নবগঠিত বাংলা দেশ ও জাতিকে, সেনরাষ্ট্রকে ভিতর হইতে দুর্বল করিয়া দেয় নাই, এ কথাই বা কে বলিবে? সামন্ততন্ত্র এবং অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত আমলাতন্ত্র বিন্যস্ত সেন-বর্মণ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আদর্শে ভেদবুদ্ধির দুর্বলতা, স্থানীয় অতি-কর্তৃত্বের দুর্বলতা ত ছিলই; তাহার উপর বর্ণ ও শ্রেণীগত এই ভেদবুদ্ধি, সমাজাদর্শগত

ভেদবুদ্ধি মুসলমান আক্রমণকে প্রশ্রয় দেয় নাই, সহজ করিয়া দেয় নাই তাহা কে বলিবে? বিহার ধ্বংসের কথা শুনিয়াই নবদ্বীপের প্রায় সমস্ত লোক ভয়ে আতঙ্কে পলাইয়া গিয়াছিল, রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান উপদেষ্টা ও মন্ত্রীবর্গ লক্ষ্মণ-সেনকে পলায়নের পরামর্শ দিয়াছিলেন, রাজ-জ্যোতিষীরা লক্ষ্মণসেনকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন, সমসাময়িক সামাজিক আদর্শ ও বিন্যাসের দিক হইতে দেখিলে মিন্‌হাজ-উদ্‌-দীনের এই সব উক্তি একেবারে মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। বণিকরা বিরোধীতা করে নাই তাহাই বা কে বলিবে? অন্ততঃ তাঁহারাও নিজেদের কর্তব্য ফেলিয়া দিয়া পলাইয়াছিল, মিনহাজ বলিয়াছেন। এই সব সর্বব্যাপী ভেদবুদ্ধির আচ্ছন্নতার মধ্যে লক্ষ্মণসেনের কিংবা তাঁহার পুত্রদের ব্যক্তিগত শৌর্য বীর্য, বা সৈন্যদলের প্রতিরোধ কতটুকু কার্যকরী হইতে পারে?

শুধু ত এইখানেই শেষ নয়। আর্যেতর ধর্মের আচারানুষ্ঠান এবং তন্ত্র ধর্মের বিকৃতি এই সময় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শৈব উভয় ধর্মকেই স্পর্শ করিয়াছিল, এবং উভয় ধর্মেরই ধর্মানুষ্ঠান এবং আচারকে নানাপ্রকার যৌনাতিশয্যে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছিল। বোধহয় তাহারই ফলে সমাজে, বিশেষভাবে উচ্চবর্ণ ও শ্রেণীগুলিতে নানাপ্রকারের কাম ও যৌন বিলাস দেখা দিয়াছিল। সেন-বর্মণ যুগের স্মৃতি ও কাব্যগ্রন্থাদি, লিপিমালা এবং ধর্মানুষ্ঠানের বিবরণগুলি পাঠ করিলে এসম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। যৌন আচার ব্যবহারে কোনও প্রকার শীলতা জ্ঞান এই সময় সমাজে ছিল বলিয়াই মনে হয় না। নাগর সমাজে প্রায় প্রত্যেকের বাড়ীতে ব্যক্তিগত উপভোগের জন্য দাসী রাখা নিয়মের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। জীমূতবাহন এবং টীকাকার মহেশ্বরের সাক্ষ্য এই সম্বন্ধে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। আর, সেন আমলেই দেবদাসী প্রথা বাংলা দেশে বিস্তৃতি লাভ করে। বাংলা দেশে এই প্রথা কল্যাণকর হয় নাই। এই প্রথা ক্রমশঃ যৌনাতি-শয্যের দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাজরাজড়া হইতে আরম্ভ উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর সমৃদ্ধ লোকেরা এই প্রথার আশ্রয়ে তাঁহাদের কামবাসনার চরিতার্থতা খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বিজয়সেন ও ভট্ট ভবদেব দুইজনই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্মমন্দিরে শত শত দেবদাসী উৎসর্গ করিবার গৌরব দাবি করিয়াছেন। সুহ্ম দেশে আর এক সেনরাজ (বোধ হয় লক্ষ্মণসেন) প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে দেবদাসীর (বার-রামা) উল্লেখ ধোয়ী কবির পবনদূত কাব্যে পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতেও দেববারবণিতার উল্লেখ সুস্পষ্ট। হয়ত পাল যুগেই এই প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল—রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে কমলা নর্তকীর

কাহিনী প্রাসঙ্গিক—কিন্তু সেন আমলে ইহার বিস্তৃতি ও সমসাময়িক কবিকণ্ঠে এই সব বাররামা-বারবণিতাদের উচ্ছ্বাসময় স্তুতিগান অনস্বীকার্য। ধোয়ী কবি এবং ভবদেব প্রশস্তির কবি এই সব বারবণিতাদের উপর কবিকল্পনার অজস্র মধুময় বাণী বর্ষণ করিয়াছেন। সেন-বর্মণরা দক্ষিণ দেশ হইতে এই দেবদাসী প্রথার প্রবাহ নূতন করিয়া বাংলা দেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। সমসাময়িক বাংলার নাগর সমাজের যুবক-যুবতীদের যে কামলীলার বিবরণ ধোয়ী কবির পবনদূতে পাওয়া যায় তাহাও খুব প্রশংসনীয় নয়, অথচ কবি তাহাকে সাধারণ সমাজ-জীবনের অঙ্গ বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বাৎসায়ন তাঁহার কামসূত্রে গৌড়বঙ্গের রাজান্তঃপুরের কামচাতুর্য লীলার এবং নির্লজ্জ কামক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন (চতুর্থ শতক) এবং বৃহস্পতিও বলিয়াছেন যে প্রাচ্যদেশের দ্বিজবর্ণের মেয়েরা যৌনব্যাপারে দুর্নীতিপরায়ণ। কিন্তু সমাজ তখন সেই সওদাগরী ধনতন্ত্র এবং সুগঠিত কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্রের আমলে এত দুর্বল ছিল না, ভেদবুদ্ধি এত প্রবল ছিল না, এইসব দুর্নীতি দ্বিজবর্ণ এবং রাজান্তঃপুর অতিক্রম করিয়া সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে নাই। পাল আমলের শেষের দিক হইতেই তাহা দেখা দিল এবং সেন আমলে সমগ্র সমাজ দেহকে তাহা কলুষিত করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ শূদ্র-নারীকে বিবাহ করিতে পারিত না, কিন্তু শূদ্রনারীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্বন্ধে বিশেষ কোনও বাধা ছিল না, নামমাত্র শাস্তিতেই সে-অপরাধ কাটিয়া যাইত—ইহাই সমসাময়িক স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান! বিলাস ও আড়ম্বরাতিশয্যও এই সময় নাগর সমাজকে গ্রাস করিয়াছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী রামাবতী এবং ধোয়ী কবি বিজয়পুরের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে এসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। এই যুগের প্রস্তরশিল্পেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পল্লবিত বাক্য, ভাবোচ্ছ্বাস বিলাসময় কল্পনা, আড়ম্বরময় অতিশয়োক্তি, অলঙ্কার প্রাচুর্য এবং লালস-বিলাসময় দৃষ্টিও এই যুগেরই সাহিত্য ও শিল্প বৈশিষ্ট্য! সদ্যোক্ত যৌনাতিশয্য ও কামবিলাস জনসাধারণের ধর্মানুষ্ঠানগুলিকেও স্পর্শ করিয়াছিল। শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় দশমী তিথিতে শাবরোৎসব নামে একটি নৃত্য-গীতোৎসব প্রচলিত ছিল; গ্রামে নগরে এই উৎসবে নরনারীর দল কর্দম লিপ্ত এবং বৃক্ষপত্র পরিহিত অর্ধ উলঙ্গ হইয়া নানা প্রকার যৌন-ক্রিয়াগত অঙ্গভঙ্গি করিয়া এবং তদ্বিষয়ক গান গাহিয়া উন্মত্ত নৃত্যে মাতিত—তাহা না করিলে নাকি দেবী ভগবতী ক্রুদ্ধা হইতেন, সমসাময়িক কালবিবেক গ্রন্থ এবং কিছু পরবর্তী কালিকা পুরাণে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে এই সম্বন্ধে

একটু বিধিনিষেধের বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহা শক্তি উপাসক বা উপাসিকার পক্ষে প্রযোজ্য নয়। তাঁহারা এইরূপ করিলে নাকি দেবীর সুখ উৎপাদিত হইত। যৌন অধোগতির প্রমাণ ইহার চেয়ে বেশী আর কি হইতে পারে! বসন্তের হোলাক (হোলী) এবং চৈত্র মাসে কাম-মহোৎসবেও প্রায় অনুরূপ অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। কালবিবেক গ্রন্থে বলা হইয়াছে, কাম-মহোৎসবে নানাপ্রকার যৌন অঙ্গভঙ্গি এবং জুগুপ্সিতোক্তি করিয়া নৃত্য-গীত করিলে কামদেবতা প্রীত হন, এবং তাহার ফলে ধনপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হয়। ইহাই কি ছিল সমসাময়িক কালের বিবেক?

শুধু ত ইহাই নয়। সেন রাজসভায় কবি ও পণ্ডিতের সমাদর ছিল খুব। বল্লাল-লক্ষ্মণ-কেশবের রাজসভা অনেক কবিরাই অলঙ্কৃত করিতেন; আর বল্লাল, লক্ষ্মণ এবং তাঁহার দুই পুত্র ত নিজেরাও ছিলেন কবি ও পণ্ডিত। বস্তুত, সেন আমল বাংলা দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণযুগ। এই ক্ষেত্রেও সেনরাজাদের সামাজিক আদর্শ সক্রিয়। কিন্তু, এই সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যও সমসাময়িক ঐশ্বর্য্য-বিলাস এবং কামবাসনার আতিশয্যদ্বারা স্পৃষ্ট। জয়দেব স্বয়ং বলিতেছেন, ত্রুটি-বিহীন শৃংগার কাব্যরচনায় গোবর্ধন কবির তুলনা ছিল না। আর, জয়দেবের গীতগোবিন্দও ত এক হিসাবে শৃংগার কাব্যই; কামবাসনার কাব্যোচ্ছ্বাসময় কল্পনাই ত এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য। বস্তুত, এই যুগের সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য এবং কবিতাগুলি ঐশ্বর্য্যবিলাসে এবং যৌন কামবাসনায় মদির এবং মধুর। রাজসভায় বসিয়া রাজা ও পাত্রমিত্র সভাসদ সকলে এই সব মদির মধুর কাব্য উপভোগ করিতেন। এই পরিবেশ ও আবেষ্টনীর সঙ্গে দেববারবণিতা ও দেবদাসীদের যে উচ্ছ্বাসময় স্তব সমসাময়িক কবিরা করিয়াছেন তাহার কোথাও কোনও অমিল নাই। এই মদির মাধুর্য্য এবং বিলাসলালসময় ভাবকল্পনা কি রাজসভার বাহিরেও বিস্তার লাভ করে নাই, বৃহত্তর সমাজ দেহের নাড়ীতে প্রবেশ করে নাই? কি করিয়া তাহা অস্বীকার করা চলিবে? এই প্রসঙ্গে সভাকবি উমাপতিধরের ম্লেচ্ছ রাজার সাধুবাদ সম্বন্ধে কবি শরণের একটি শ্লোকের সামাজিক ইঙ্গিত এবং সেক শুভোদয়া কথিত কুমারদত্ত-মাধবী কাহিনী স্মরণ করা যাইতে পারে। সেন রাজসভার চরিত্র ও আবহাওয়া তাহা হইতে কতকটা বুঝা যায়। সেক শুভোদয়ায় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার অন্যতম অলঙ্কার, কবি, স্মার্ত পণ্ডিত, বাল্যে রাজপণ্ডিত, যৌবনে মহামন্ত্রী এবং প্রৌঢ়াবস্থায় মহাধর্মাধ্যক্ষ, রাজার সর্বোত্তম আবাল্য সুহৃৎ হলায়ুধ মিশ্র শেখ জলাল্-উদ্দিন

তব্রিজির খুব পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ-তথ্য যদি সত্য হয়, সেক শুভোদয়ার সাক্ষ্য যদি প্রামাণ্য হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় সেনরাষ্ট্র ও সেন রাজসভার চরিত্র বলিয়া কিছু ছিল না! সভাকবি উমাপতিধর এবং মহা-ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ মিশ্র এই চরিত্রহীনতার দুইটি দৃষ্টান্ত মাত্র। পৃথিবীর সর্বত্রই ত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধোগতির এই একই চিত্র—প্রাচীন গ্রীসে, রোমে, অষ্টাদশ শতকের প্যারিসে, অষ্টাদশ শতকের কৃষ্ণনগরে, ঊনবিংশ শতকের কলিকাতায়। একাদশ-দ্বাদশ শতকের রামাবতী, বিজাপুর, নবদ্বীপেও সেই একই ছবি দেখিতেছি।

উত্তর-পূর্ব ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থাটাও এই ফাঁকে একটু দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে। বখ্‌তিয়ার কর্তৃক বিহার লুণ্ঠনের মিন্‌হাজ্‌ কথিত কাহিনী ত আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এসম্বন্ধে বৌদ্ধ লামা তারানাথও কিছু বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। তারানাথের বর্ণনা জনশ্রুতিনির্ভর, কাজেই তাঁহার সব উক্তি বিশ্বাস-যোগ্য নয়। তবু, সামাজিক তথ্যের খানিকটা ইঙ্গিত এই বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। তারানাথ বলিতেছেন, চন্দ্রবংশীয় লবসেনের বংশধরেরা (তারানাথ কর্ণাটাগত ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেনবংশের খবর নিশ্চয়ই জানিতেন না) আশী বৎসর রাজত্ব করিয়া ছিলেন। মগধে এই সময় তীর্থিক (ব্রাহ্মণ্য) ধর্ম ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতেছিল, এবং তাজিক (মুসলমান) ম্লেচ্ছধর্ম বিশ্বাসী অনেক লোকের উদয় হইতেছিল। ইহার পর গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থিত অন্তর্বেদীতে তুরষ্করাজ 'চন্দ্র' (মূল তুরুষ্ক নামের তিব্বতীয় অনুবাদ হওয়া বিচিত্র নয়; তিব্বতী পণ্ডিতেরা ত নামও অনুবাদ করিতেন) আবির্ভূত হন। তিনি অনেক সংবাদবাহী ভিক্ষুদের মধ্যবর্তিতায় বাংলা ও তাহার পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুরুষ্ক রাজাদের নিজের দলভুক্ত করিয়া মগধ লুণ্ঠন করিতে থাকেন, এবং অনেক বৌদ্ধ আচার্যকে হত্যা করিয়া ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলা বিহার ধ্বংস করেন। এই সব ও অন্যান্য বৌদ্ধ বিহারের অনেক পণ্ডিত নানাদিকে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন, এবং তাহার ফলে মগধে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হইয়া যায়।

তারানাথের বিবরণী হইতে মনে হয় একদল বৌদ্ধ ভিক্ষু মুহম্মদ বখ্‌ত্‌-ইয়ারের গুপ্তচরের কাজ করিয়াছিলেন এবং বাংলার সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগের ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছিলেন। মিন্‌হাজের ও তারানাথের বিবরণ একত্র মিলাইয়া দেখিলে মনে হয় বিহার-বাংলারই একদল লোক বিভীষণ-বাহিনীর কাজ করিয়াছিল। মগধে তখন পরিপূর্ণ নৈরাজ্য, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অবস্থাটা যে অচিরেই কি হইবে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছিল। তাহা না হইলে,

বিক্রমশিলা বিহারের প্রধান মন্ত্রাচার্য রত্নরক্ষিত যে-ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, দুই বৎসরের মধ্যেই তাজিকেরা মগধের দুইটি বিহার ধ্বংস করিবে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর কোনও অর্থই হয় না। মিন্‌হাজ্‌ ও লক্ষ্মণসেনের রাজ-জ্যোতিষীদের মুখে যে ভবিষ্যদ্বাণীর ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহার অর্থও এই যে, সকলেই অবস্থাটা জানিত, এবং মুসলমান তুরুষ্ক শত্রুরাই আক্রমণ-কর্তা তাহাও জানিত। অথচ প্রতিরোধের ব্যবস্থা তেমন কিছুই হইয়াছিল, বলা যায় না। সাহাব্‌-উদ্‌-দীন ঘোরী দুইবার পরাজিত হইয়া তৃতীয় বারের চেষ্টায় পঞ্জাব অধিকার করিয়াছিলেন, এবং এই কৃত-কার্যতার মূলেও ছিল বিশ্বাসঘাতকতা। পরেও হিন্দুরাষ্ট্রশক্তিপুঞ্জ মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে কোনও সামগ্রিক প্রতিরোধ রচনা করিতে পারে নাই। গজনীর মামুদের সকল আক্রমণের পর হইতে উত্তর ভারতের অনেক স্থানেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান বসতিকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গাহড়বাল রাজ্যেও বোধ হয় এই ধরণের ছোট ছোট তুরুষ্ক কেন্দ্র ছিল। জয়চন্দ্রের পিতামহ গাহড়বাল-রাজ গোবিন্দচন্দ্রের লিপিতে "তুরষ্ক দণ্ড" নামে এক প্রকার করের উল্লেখ আছে; এই সব কর বোধ হয় আদায় করা হইত গাহড়বাল রাজ্যান্তর্গত তুরস্ক-বাসিন্দাদের নিকট হইতে। মুহম্মদ বখ্‌ত্‌-ইয়ারের আক্রমণের আগেই উত্তর ভারতের বিহার পর্য্যন্ত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুরুষ্ক-কেন্দ্র কিছু কিছু গড়িয়া উঠিয়াছিল তারানাথের বিবরণ হইতেও তাহার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কি এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুরুষ্ক কেন্দ্রের সঙ্গেই বখ্‌ত্‌-ইয়ারের যোগ সাধন করিয়া দিয়াছিল? উত্তর পূর্ব ভারতের এই উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা কি লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার উপদেষ্টা ও মন্ত্রীবর্গ জানিতেন না?

একদিকে উত্তর ভারতের অর্ধেক যখন মুসলমানদের করতলগত, উত্তর-গাঙ্গেয় ভারতে অর্থাৎ বর্তমান যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে যখন রাষ্ট্রীয় অবস্থা প্রায় নৈরাজ্য বলিলেই চলে, তখন বাংলা দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ ভেদবুদ্ধি দ্বারা আচ্ছন্ন; স্তরে উপস্তরে দুর্লঙ্ঘ্য সীমায় বিভক্ত; রাজসভা চরিত্র ও আত্মশক্তিহীন, ধর্ম ও সমাজ বিলাসলালসায় ও যৌনাতিশয্যে পীড়িত; শিল্প ও সাহিত্য বস্তুসম্বন্ধবিচ্যুত ভাবকল্পনার জগতে পল্লবিত বাক্য, উচ্ছ্বাসময় অত্যুক্তি, আলঙ্কারিক আতিশয্য এবং দেহগত লীলাবিলাসে ভারগ্রস্ত ও মদির; জনসাধারণের দেহ মন বৌদ্ধ বজ্রযান-মন্ত্রযান এবং ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য-ডাকিনী-যোগিনীদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড তুক্‌তাকে পঙ্গু; উচ্চতর বর্ণসমাজ ব্রাহ্মণ পুরোহিততন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্যরাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে আড়ষ্ট। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধোগতির চিত্র সম্পূর্ণ; উভয়ই চরিত্রে ও

আত্মশক্তিতে দুর্বল ও দৈন্যপীড়িত। এই দুর্বল ও দৈন্যপীড়িত রাষ্ট্র ও সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এবং সমাজ-প্রকৃতির নিয়মে পরবর্তী কালে শতাব্দীর পর শতাব্দী দেশ তাহার মূল্য দিয়া যাইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়! বখ্‌ত্‌-ইয়ারের নবদ্বীপ জয় এবং একশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাংগালা দেশ জুড়িয়া মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়, ভাগ্যের পরিহাসও নয়—রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধোগতির দুর্নিবার্য পরিণাম!

মুসলমান অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্বে ভারতীয় বুদ্ধি ও সংস্কৃতির অবস্থার কথা বলিতে গিয়া প্রসিদ্ধ উর্দুভাষী মুসলমান কবি হালি বলিয়াছেন:

"ইধর্‌ হিন্দ্‌ মেঁ হর্‌তরফ্‌ অন্ধেরা।

বাস্তবিকই হিন্দুস্থানে তখন চারিদিকে অন্ধকার।

শতভিষা

সুবোধ ঘোষ

(৩)

পুঁটিমাসীমা সব উৎক্ষিপ্ত সমস্যাগুলিকে একরকম গুছিয়ে এনেছেন। ভাগ্যিস পুঁটিমাসী ছিলেন, নইলে এ বাড়ীর সুখ দুঃখের গ্রহটী এই আকস্মিক পথভ্রান্তির বিপাকে বোধ হয় এইখানেই চূর্ণ হয়ে ছন্নছাড়া বাষ্পের মত উড়ে যেত। সব গুছিয়ে আনছেন পুঁটিমাসী। পুঁটিমাসীর হৃদয়টার মধ্যেও যেন অদ্ভুত এক বনৌষধির ধর্ম্ম লুকিয়ে আছে। যেখানে ক্ষয় ক্ষতি ক্লেশ, যেখানে শোক তাপ জ্বালা, সেইখানে তিনি নিজের আবেগে ছুটে আসেন।

রজনীবাবুর বাড়ীর ব্যাপার নিয়ে পুঁটিমাসী যে-উদ্বেগ সহ্য করছেন, যে-দুর্ভোগ ভুগছেন, তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা না থাক্, অসাধারণত্ব একটু যেন রয়ে গেছে। পুঁটিমাসীর নিজের সংসার নেই; না থাক্, কিন্তু নিজে তো রয়েছেন! তাঁর হার্টের অসুখটাও ঠিক অটুট আছে। কিন্তু তার জন্য বড় বেশী ভাবনা করতে কখনো দেখা যায় না পুঁটিমাসীমাকে। মকতপুর সহরে আরও দশটা বাড়ীর অন্তরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে, তবু ঠিক অন্তরঙ্গ তো হয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু রজনীবাবুর বাড়ী—যতী অমি মঞ্জু মীনু প্রমীলা—এখানে অন্তরঙ্গ হবারও কোন প্রশ্ন আসে না। তাঁর অন্তরটাই যেন ছড়িয়ে আছে এদের মধ্যে। রজনীবাবুর বাড়ী পুঁটিমাসীর কাছে একটা মোহ। তাঁর জীবিকা, তাঁর চাকরী, তাঁর বাসা—সবই এ বাড়ীর বাইরে। শুধু কাজের জীবনের একটা ভেদ তাঁকে এ বাড়ীর সীমা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু মন পড়ে আছে এখানে। এ বাড়ীর হৃদয়ের আনাচে কানাচে তাঁর মন যেন কাজ খুঁজে বেড়ায়। মনের মত কাজ পেতে হলে, এইখানেই আসেন।

প্রমীলাবালা তো সংসারে থেকেও অবসর নিয়ে লুকিয়ে পড়েছে ঠাকুর ঘরে। আজ রজনীবাবু একেবারে একা। যতী কবেই চলে গেছে। মঞ্জু মীনুও চলে যাবার জন্যই যেন গোপনে খেয়া ডেকে বসে আছে। আর অমিয়। অমিয় যে-কাজ করলো তার নির্ম্মমতার তুলনা নেই। এক অন্ধকারের খরস্রোতে ঝাঁপ দিয়েছে অমিয়, কিন্তু তার আগে যেন রজনীবাবুর সাধের নৌকাটীর বৈঠা

ভেঙে দিয়ে গেছে। তাই রজনীবাবু শুধু একা নন, একেবারে অচল হয়ে পড়েছেন। প্রতি মিনিটে বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন—বিছানা নিয়েছেন।

এই অচলতার মধ্যে একটু চঞ্চলতার ছোঁয়ার মত, এই একাকীত্বের মধ্যে একটু সাথীত্বের পূর্ণতার মত যেন পুঁটিমাসী শুধু সজীব হয়ে আছেন। এইভাবে আগলে রেখে এ বাড়ীর হৃদয়কে অবসাদে নেতিয়ে পড়তে দেবেন না তিনি। মীনু মঞ্জুর মুখের হাসি শুকিয়ে যেতে দেবেন না। রজনীবাবুকে বুড়ো হতে দেবেন না। পুঁটিমাসী তাই সব গুছিয়ে আনছেন। তাই অমিয় ফিরে এসেছে। তিনিই ফিরিয়ে আনিয়েছেন অমিয়কে।

অমিয়র সঙ্গে শুভার বিয়ে হয়ে গেল। এই অনাড়ম্বর হাস্যকোলাহলহীন বিবাহরাত্রির বাতিটাও যেন অপরাধীর মত সঙ্কোচে টিম্ টিম্ করে জ্বললো। সারা মকতপুর একটা গোপন সংশয়ে বিড়ম্বিত হলেও রজনীবাবুর মহত্ত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। বিয়ের শেষে শুভার মা একবার আড়ালে গিয়ে নিঃশব্দে কেঁদে নিলেন। নশুবাবু হুঁকো নিয়ে দূরে সরে রইলেন। মঞ্জু মীনু শুধু কলের মত কাজ করে গেল। এক পুরুতের মন্ত্র ছাড়া আর কোন শব্দ সুর সাড়া শোনা গেল না। শুধু সব দিক সাম্‌লাতে, খেটে খেটে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন পুঁটিমাসী।

পরের দিন ভোরেই শুভা আর অমিয় চলে গেল। মকতপুর ছেড়েই চলে গেল ওরা। কোথায় গেল, সে খবরও কেউ জানলো না, জানতে চাইল না, জানবার আগ্রহও বোধ হয় কারও নেই। হয়তো শুধু পুঁটিমাসী জানেন।

যাবার আগে বিদায় নেবার পালাটা বড় বিচিত্ররূপে দেখা দিল। নশুবাবু তাঁর মেয়ে জামাইয়ের দিকে চোখ তুলে তাকালেন না, তবু হাত তুলে আশীর্ব্বাদের ভঙ্গী করলেন। শুভার মা সজল চোখে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু আশীর্ব্বাদ করতে ভুলে গেলেন। হতভম্ব ভুলু শুধু শুভাকে নিভৃতে পেয়ে একবার জিজ্ঞাসা করলো।—দিদিভাই, তুই কি লভ্ করে বিয়ে করলি ?

তারপর এ-বাড়ী। মঞ্জু ও মীনু চুপ করে থাকলেও, তাদের, কর্ত্তব্যের ভুল হয়নি। ঘোড়ার গাড়ী ডাকিয়েছে, একটী একটী করে জিনিষপত্র দেখে শুনে গাড়ীতে তুলে দিয়েছে। অমিয়-র বই আর ছবি আঁকার সব সরঞ্জামও বেঁধেছেঁদে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে।

অমিয় কারও দিকে তাকিয়ে দেখেনি। তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে পারলেই

যেন সে বেঁচে যায়। একটা অস্বস্তিতে ছটফট করছিল অমিয়। এই মূক অভিনয়ের দুঃসহ গ্লানি থেকে ছুটে একবার পালাতে পারলেই যেন সে শান্তি পাবে।

আশ্চর্য্য করলো শুভা। মঞ্জু ও মীনু আজ মনে মনে শুভাকে কেন জানি ক্ষমা করতে পারছিল না। শুভার আচরণে কোন আড়ষ্টতা নেই, তেমনি কোন চাঞ্চল্যও নেই। সমস্ত বর্ত্তমানের দিকে যেমন শান্তভাবে তাকিয়ে আছে, ভবিষ্যৎটাকে যেন তেমনি একেবারে উপেক্ষা করে রয়েছে শুভা। ওর জীবনের মুহূর্ত্তগুলি যে কী প্রবল বিপ্লবে ভেসে গেল, সেই বোধটুকু ওর আছে কি না সন্দেহ। মঞ্জু ও মীনু আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে—শুভাকে বুঝতে কী ভুল হয়েছিল তাদের। মাটীর ঢেলা নয় শুভা, যে এই স্রোতের আবর্ত্তে গলে মিলিয়ে যাবে। শিলাতলের মত নিজের কঠিনতায় কেমন স্থির হয়ে আছে শুভা, এই স্রোতের আঘাত একটু নড়াতে পারছে না তাকে।

পুঁটিমাসীর নির্দ্দেশ মত পূজার ঘরের বদ্ধ দরজার কাছে বিদায় নিতে এসে দাঁড়ালো শুভা আর অমিয়। পুঁটিমাসী বার বার প্রমীলাবালাকে ডাকলেন। তবু প্রমীলাবালার কোন সাড়া শোনা গেল না। শুধু বদ্ধ দরজাটা একবার সামান্য একটু ফাঁক হলো। দুটো ফুল শুধু দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে ছিট্‌কে এসে পড়লো। আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পুঁটিমাসীর মুখটা বেদনায় বিবর্ণ হয়ে উঠলো।

পুঁটিমাসীর শত অনুরোধেও একবার বিছানা ছেড়ে উঠলেন না রজনীবাবু। —উঠুন, ওরা চলে যাচ্ছে, আশীর্ব্বাদ করুন ওদের। পুঁটিমাসীর তাগিদে বিরক্ত হয়ে রজনীবাবু বললেন।—আশীর্ব্বাদ করার ক্ষমতা নেই আমার।

পুঁটিমাসী।—উঠুন উঠুন, খুব আছে।

রজনীবাবু।—থাকলেও, এক্ষেত্রে আমি অসমর্থ।

পুঁটিমাসী।—কেন ?

রজনীবাবু উত্তর দিলেন না। তিনি হয়তো বলতে চান যে, তাঁর জীবনে যারা অভিশাপটাকেই বড় করে তুলেছে, তাদের তিনি আশীর্ব্বাদ করবেন কোন্ আনন্দে ? কাঁটা গাছেও ফুল ধরে, কিন্তু এরা শুধু কাঁটাটাকেই সত্য করে তুললো। —এ বিয়ে বিয়েই নয়। যে যাই ভাবুক, আমি প্রাণ থাকতে এ বিয়েকে স্বীকার করতে পারি না।

কথাগুলি নেহাৎ অজ্ঞাতসারে একটু স্পষ্ট করেই বলে ফেলেছিলেন রজনীবাবু। পুঁটিমাসী একটু রাগ করেই অনুযোগ করলেন।—ছি ছি, কি সব কথা আজকের দিনে বলছেন আপনি।

রজনীবাবু আবার চুপ করে গেলেন। তিনি যা বলতে চান, পুঁটিমাসী ঠিক তা' বুঝতে পারলেন না। রজনীবাবু হয়তো তার মনের ধিক্কার কখনো স্পষ্ট করে বলতে পারবেন না। মুখে বাধ্‌বে, সঙ্কোচ হবে। তাই তাঁর দুঃখটুকুও কেউ বুঝতে পারবে না। অমিয় আর শুভা। কে এরা? একজন রজনী মিত্রের ছেলে আর একজন নশু রায়ের মেয়ে। এ-ছাড়া এদের কোন পরিচয় নেই। এদের জীবনে কোন আদর্শ নেই। কোন সাধনা নেই। এরা শুধু বিয়ের জন্যই বিয়ে করলো। এ বিয়ে না হলে জগতের কতটুকু ক্ষতি হতো? বিয়ের পর পৃথিবীর কাছে এদের কোন কর্ত্তব্য নেই। কোন কর্ত্তব্যের দাবীতে এরা তো জীবনে এক হলো না। পৃথিবীর কোন্ কল্যাণ সত্য করে তুলবে এদের মিলন? এ নিতান্তই ত্বগস্থিমাংসের মিলন। শুধু অসামাজিক নয়, অমানুষিক। পশু পক্ষীও ঠিক এই ভাবেই ……।

রজনীবাবু হাত তুলে ইসারায় পুঁটিমাসীকে চলে যেতে বললেন। অমিয় ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়েই রইল। মঞ্জু ও মীনুকে আরও আশ্চর্য্য করে দিয়ে শুভা ঘরের ভেতর এসে ঢুকলো। রজনীবাবুর বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলো।—জেঠা বাবু!

রজনীবাবু পাশ ফিরে শুয়ে রইলেন।

সমস্ত ঘটনাটা এতক্ষণ চুপচাপ থেকে ঠিক বিদায় নেবার সময় যেন আবার উপদ্রবের মত দুরন্ত হয়ে উঠছে। মঞ্জু ও মীনু বিরক্ত হয়ে শুভার ব্যবহার লক্ষ্য করছিল। এতটুকু মেয়ের এই ঔদ্ধত্য বড় বিসদৃশ লাগছিল। বিছানা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে কি দুঃসাহসে সে আবার জেঠাবাবুকে ডাকছে? জেঠাবাবুর সব বিদ্রোহ ভেঙে দেবার জন্যই যেন শুভা নির্ভীক আনন্দে চ্যালেঞ্জ করছে। তা করতে পারে শুভা, ও সব পারে। ওর চোখে মুখে কত প্রশ্ন, কত উত্তর চিক্‌চিক্ করছে। মঞ্জু ও মীনুকে এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত করলেন পুঁটিমাসী। পুঁটিমাসী ডাকলেন—এস শুভা। গাড়ীর সময় হয়েছে।

শুভা আর অমিয় চলে গেল।

মঞ্জু ও নীহারের বিয়ে হয়ে যেতে বেশী দেরী হলো না। এ বিয়েতে কোন অতি-সংশয়ীর মনেও আপত্তি করার মত কোন যুক্তি ছিল না। কোন অতি-নিন্দুকেও নিন্দে করার মত কিছু খুঁজে পায়নি। চরকা আর সেবাশ্রমের সেবা নিয়ে বিভোর হয়ে আছে নীহার। তার খদ্দরের দোকানটীও তার কাছে

শুধু জীবিকা নয়, ঐ তার জীবন। অকুণ্ঠ নিষ্ঠায় নীহার তার খদ্দরবাদকে আদর্শরূপে বরণ করে নিয়েছে। নীহার বিশ্বাস করে, এই পথেই জাতির মুক্তি আসবে। সকলে জানে, আইনের পরীক্ষায় সোনার মেডেল পেয়েও, একটা মুন্সেফী পদ পায়ের কাছে পেয়েও নীহারের নিষ্ঠা কখনো বিচলিত হয়নি। নিজের মনের সাধের দাবীতেই সে খদ্দরসেবার ব্রত গ্রহণ করেছে। এর মধ্যেই সে নিশ্বাসবায়ুর মত সহজ আনন্দ পায়। সে প্রীত তুষ্ট কৃতার্থ।

পুঁটিমাসী জানেন, মঞ্জুও বর্ণে বর্ণে এই আদর্শে বিশ্বাস করে। আজ চার বছর ধরে মঞ্জু চরকা কাটে। মঞ্জুর গায়ের সাড়ীজামার প্রতিটী সূতো তার নিজেরই শ্রমের সৃষ্টি। এর মধ্যে কোন ফাঁকি নেই। নীহারের আদর্শ মঞ্জুকে যেন আজ চার বছর ধরে মনে প্রাণে জড়িয়ে আছে।

মঞ্জু যদি নীহারের জীবনে দোসর হয়ে আসে, তবে ওদের জীবনের পূর্ণতা পূর্ণতর হয়ে উঠবে। একই ছন্দের দুটী কবিতার মত ওরা দুজন। এ মিলন আদর্শের মিলন। এ যেন জীবনে জীবনে কাঞ্চনসন্ধি। জীবনের একটী নিখুঁত দৃশ্য। এ বিয়েতে ওরা দু'জনে এক হয়ে যাবে, দুজনের জীবনের উপহারে আদর্শটাই বড় হয়ে উঠবে। নীহারের সাধনা মঞ্জুর মধ্যে পাবে এক নতুন প্রেরণা। মঞ্জুর সাধনা পাবে নতুন এক স্থিতি।

বিয়েটা নিরাড়ম্বর ভাবেই সমাধা হলো। তবু বিয়ের রাতটা একেবারে উদাস হয়ে ছিল না। চারদিকে একটা সুস্মিত চাঞ্চল্য ছড়িয়ে, কলরব জাগিয়ে আনন্দের গুঞ্জনের মধ্যেই বিয়ের পাট শেষ হলো।

সবচেয়ে আশ্চর্য্য, রজনীবাবু তাঁর ভস্মশয্যা ছেড়ে হঠাৎ উঠে এলেন। বিয়ের আয়োজন তদারক করলেন। ঘুরে ফিরে দেখলেন।

হঠাৎ যেন বুঝতে পেরেছেন রজনীবাবু, তিনি ব্যর্থ হয়ে যান নি। মঞ্জু আর নীহারের মধ্যে যেন তাঁর মূক মন্ত্র আবার সবল হয়ে উঠেছে। তাঁর আজীবন পরীক্ষার তিমিরক্লিন্ন দুঃখের পথ আজ সফল আলোকে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে— মঞ্জু ও নীহার যেন তারই ইঙ্গিত।

অমিয় চলে গেছে, সে-আঘাতের ক্ষত হয়তো আজও রয়ে গেছে। কিন্তু আজ যেন সেই জ্বালা একেবারে ভুলে গেছেন রজনীবাবু। নইলে আজ সকাল থেকে এত ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারতেন না। এই কটা দিন যেন তাঁর জীবনের পরাভবকেই সত্য বলে মেনে নিয়ে আড়ালে সরে পড়েছিলেন। আজ মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর ভুল তাঁর নিজের কাছেই ধরা পড়ে গেছে। তাঁরই মেয়ে মঞ্জু।

বিদায় নেবার সময়ও রজনীবাবু প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করলেন। এই আশীর্ব্বাদের মধ্যে তাঁর জীবনের চিরকেলে গর্বটাই যেন প্রতিধ্বনি করে উঠলো। —তোমাদের জীবনের আদর্শ অটুট থাকুক্।

প্রমীলাবালা অবশ্য তাঁর পূজোর ঘরের নিভৃতে অবিচল ছিলেন। মঞ্জু ও নীহার বিদায় নিতে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। প্রমীলাবালা কপাটটা ততটুকুই খুললেন, যতটুকু খুললে দুটো ফুল ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেওয়া যায়। অমিয় আর শুভা যে-আশীর্ব্বাদ নিয়ে গেছে, মঞ্জু ও নীহারের বেলায়ও তার পরিমাণের কোন কমবেশী হলো না। সংসার থেকে কোন্ সুদূরে সরে গেছেন প্রমীলাবালা! বোধ হয় তিনি এ'কে সংসার বলেই স্বীকার করতে চান না। তিনি জানেন, কাঁটার বনে কাঁটা ফল্‌বে শুধু, ফুল ফুটবে না কখনো। তাঁর কাছে অমিয় যা, মঞ্জুও বোধ হয় তাই। ওরা সবাই কাঁটা। প্রমীলাবালার কাছে কোন ভেদাভেদ নেই। যতীর জন্য আজকাল কাঁদতেও ভুলে গেছেন প্রমীলা-বালা। সেই বেদনার মূর্চ্ছা আর হয় না। যতী গেছে, অমিয় গেছে, মঞ্জু চললো—একে একে সবাই যাবে। এ ভাবে চলে যাবার জন্যই এরা জন্ম নিয়েছে এ সংসারের মাটীতে। এক অন্তর্ধানের অভিশাপ এ-সংসারের বাতাসে ছড়িয়ে আছে। যতী অমিয় মঞ্জু মীনু—নতুন পৃথিবীর জ্যোৎস্নার পুতুলের মত এক একটী আবির্ভাব প্রমীলাবালার জীবনে কী সমারোহ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আজ তিনি জানেন, সব মিথ্যা, সব মিথ্যা। আজ ওরা বড় হয়েছে, আজ ওদের চেনা যাচ্ছে—ওরা সবাই রজনী মিত্রের ছেলেমেয়ে, সেই পুরনো অভিশাপের আলেয়া। পিতৃগুণের উত্তরাধিকার পেয়েছে ওরা।

রজনীবাবু আজও যে-বস্তুকে আদর্শ বলে চীৎকার করেন, প্রমীলাবালা সে-বস্তুকেই পাপ বলে জানেন। ঐ এক ছুতো। রক্তে যার মরণ ডাকে, একটী সুন্দর মুখ দেখে সব সংসারের নিয়ম ভুলে যায়, ঝাঁপিয়ে পড়ে, ভেসে যায়—ঐ আদর্শের কপট বচন তাদেরই সান্ত্বনা। প্রমীলাবালা তাঁর জীবন দিয়ে এই সত্য উপলব্ধি করেছেন। তবু তিনি তাঁর জীবনের সব অপসৃষ্টিকে, এই কাঁটার বনকেই আপন করে নিয়ে, সব মেনে নিয়ে, সুখী হতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে-সাধ ব্যর্থ করে দিয়েছেন রজনীবাবু, যিনি স্বয়ং সব আদর্শের উৎস, পঁয়ত্রিশ বছর আগে যাঁর আদর্শ রাজপাটপুরের এক তরুণী বধূকে রাহুর মত লুটে নিয়ে চলে গেল। অদৃশ্য হয়ে গেল তাঁর পুরনো সংসার, পুরনো সম্ভ্রম, পুরনো হাসি-কান্না, সুখ আর শান্তি।

সব বঞ্চনার বিনিময়ে তবু যদি তিনি যতীকে ধরে রাখতে পারতেন, তবে হয়তো এই পূজোর ঘরের বন্দীত্ব তিনি নিজের থেকেই সৃষ্টি করতেন না। কিন্তু তিনি পারেন নি। রজনী মিত্রের আদর্শ আবার নির্লজ্জ গর্জ্জন করে উঠলো, যতীকে তাড়িয়ে দিল।

মঞ্জু ও নীহার চলে গেল। মীনুর চোখ ছলছল করলো। পুঁটিমাসী ক্লান্ত হয়ে বসে রইলেন। রজনীবাবু বাগানে পায়চারী করে বেড়ালেন। বাতাসে যেন একটা সফলতার গুঞ্জন তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তারই আবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন রজনীবাবু।

পুঁটিমাসীর ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখে শুধু অদ্ভুত এক জোড়া চোখের প্রভাময় দৃষ্টি ঝকঝক করছিল। তিনি দেখছিলেন রজনীবাবুকে। রজনীবাবু আবার সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সেই পুরাতন মনুষ্যত্বের শিখা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—সব ধোঁয়ার সমাধি মিথ্যে হয়ে গেছে।

শুধু পূজোর ঘরে পূজো করছিলেন প্রমীলাবালা।

খুব খুসী দেখাচ্ছিল রজনীবাবুকে। পুঁটিমাসীকে সাম্‌নে পেয়েই বললেন।—যতীকে একটা চিঠি দিতে পারেন?

পুঁটিমাসী বিস্মিত হয়ে বললেন।—যতীকে?

রজনীবাবু।—হ্যাঁ। যতী একবার এসে দেখা করে যাক্। আমি যতীকে আজ মাপ করতে পারছি। অন্যদিকে যত জঘন্য ভুল করুক্ না কেন, একটা ভুল তার হয়নি। সে আদর্শ ছাড়েনি। তার জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে। তার পলিটিক্স আছে। একদিকে সে অন্ততঃ ঠিক আছে। না, তার ওপর রাগ করার কিছু নেই।

রজনীবাবুর কথার উচ্ছ্বাস হঠাৎ ধীরে ধীরে এক আন্তরিক ক্ষমার সুরে গভীর হয়ে এল।—নরেন মাষ্টারের বউকে বিয়ে করেছে যতী, লোকের চোখে এ ঘটনা সহ্য হবে না জানি। কিন্তু সেই মেয়েটীর ওপরেও রাগ করার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।

রজনীবাবুর প্রিয় থিয়োরীটা আজ সব সংশয় ভেদ করে আরও স্পষ্ট এবং আরও সত্য হয়ে উঠেছে। এতদিন রাগের মাথায় বুঝতে পারেন নি রজনীবাবু। যতীর দোষ নেই, নরেন মাষ্টারের বউটীরও দোষ নেই—এক আদর্শে কাজ করতে গিয়ে ওরা এক হয়ে গেছে। জীবনে এক দুরূহ বিপ্লবী রাজনীতির ব্রতে ওরা আপন হয়েছিল, তাই জীবনেও ওরা আপন হতে বাধ্য হলো।

রজনীবাবু বললেন।—বিয়ের জন্যই বিয়ে করা, পশুত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। শত হোক্, যতীর গায়ে এ পাপ লাগেনি।

পুঁটিমাসী।—যখন বল্‌ছেন, তখন যতীকে চিঠি দেন। আর যদি বলেন, অমিয়কেও একটা···।

রজনীবাবু গর্জ্জন করে উঠলেন।—এতক্ষণ আপনাকে বৃথাই বোঝালাম! কিছুই বুঝলেন না আপনি। আমার সংসারে অমিয় এই পশুত্বের পাপটাকেই সত্য করেছে। আজ আমি এই ধিক্কার নিয়েই মরে যেতাম, যদি না দেখতাম যে যতী মঞ্জু মীনু···।

পুঁটিমাসী যেন রজনীবাবুর এই থিয়োরীর উল্লাসটাকে আঘাত দেবার জন্যই রূঢ়ভাবে বলে ফেললেন।—শরদিন্দুর সঙ্গে মীনুর বিয়ে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে রজনীবাবুর মূর্ত্তিটা সঙ্কোচে করুণ হয়ে উঠলো। ভয়ার্ত্তের মত বললেন।—কেন?

পুঁটিমাসী।—শরদিন্দু রাজী নয়।

রজনীবাবু।—কেন?

পুঁটিমাসী।—মীনু রাজী নয়।

রজনীবাবু অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন।—কেন কেন? হঠাৎ আবার এই অনাচার ঢুকলো কোথা থেকে?

পুঁটিমাসী।—সাধনের সঙ্গে মীনুর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি।

রজনীবাবু।—কেন?

পুঁটিমাসী।—সাধন রাজী হয়েছে।

রজনীবাবু।—কেন?

পুঁটিমাসী।—মীনু রাজী হয়েছে।

রজনীবাবুর চোখ দু'টো জ্বলছিল।—এ কী ভয়ানক ব্যভিচারের কাহিনী শোনাচ্ছেন? আর কত শোনাবেন?

পুঁটিমাসী বিরক্ত হয়ে উঠলেন।—আপনি এত আবোল তাবোল বকেন কেন?

রজনীবাবু।—এ বিয়ে হতে পারে না। যদি হয় তবে জানবেন আমি এর মধ্যে নেই। অমিয় যেভাবে বিদায় নিয়েছে, মীনুকেও সেই ভাবে···।

হঠাৎ চীৎকার করে ডাকলেন রজনীবাবু—মীনু মীনু।

মীনুর সন্ত্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়েও রজনীবাবুর গলার স্বরে কোন মমতা দেখা দিল না। সোজাসুজি প্রশ্ন করে ফেল্‌লেন।—তুমি না সোস্যালিষ্ট?

মীনু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রজনীবাবু।—শুনেছি শরদিন্দু সোস্যালিষ্ট। তবে, হলো কি? এ মতিচ্ছন্নতা কেন তোমাদের?

মীনু।—তিনি সোস্যালিষ্ট কি না আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

রজনীবাবু একটু সন্দিগ্ধ ভাবেই প্রশ্ন করলেন।—কবে জেল থেকে ছাড়া পেল সাধন? সাধনও কি সোস্যালিষ্ট?

মীনু।—হ্যাঁ।

রজনীবাবু ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলেন।—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মীনু। শরদিন্দুর মধ্যে কোন ফাঁকি দেখতে পেয়েই কি তুমি···।

আপত্তি করলেন পুঁটিমাসী।—আপনি কেন এসব কথা জিজ্ঞেসা করছেন? আপনার কাছে মীনু যা মুখ খুলে বলতে পারে না, আপনি তবু সেই কথা নিয়ে বার বার···। মীনু তুই যা।

রজনীবাবুও একটু বিব্রত হয়ে বললেন।—আচ্ছা, যাও।

অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তার মধ্যে ডুবে থেকে আবার যেন একটা সার্থক তৃপ্তির সিক্ততা নিয়ে ভেসে উঠলেন রজনীবাবু।—মীনুর কোন দোষ নেই। কোন ভুল হয়নি মীনুর। এটাই হওয়া উচিত ছিল। শরদিন্দুর আদর্শে ফাঁকি আছে, মীনু সাবধান হয়ে গেছে। ঠিক করেছে। মীনু আমার সবচেয়ে জেদী মেয়ে।

কোন আগ্রহ নেই, তবু চুপ করে নিস্পৃহ ভাবে রজনীবাবুর তত্ত্বকথা শুনছিলেন পুঁটিমাসী।

রজনীবাবু।—আমি শুধু বলতে চাই পুঁটুদি···।

চমকে উঠলেন পুঁটিমাসী। স্থান কাল ভুল হয়ে গেছে রজনী মিত্তিরের। চল্লিশ বছর আগের এই গেঁয়ো আত্মীয়তার ডাক কবে বাতিল গিয়েছে! আজ হঠাৎ আবার...।

রজনীবাবু।—আপনি তো সবই জানেন পুঁটুদি। জীবনে যদি কোন অপরাধ করে থাকি, তা আদর্শের জন্যই করেছি। আপনি আমার দুঃখের ইতিহাস জানেন। একটা প্রতিজ্ঞার জন্য সব ক্ষতি সহ্য করেছি। যতী মঞ্জু মীনু মানুষ হয়ে উঠেছে; তারা দেশের কাজ করবে, পলিটিক্স করবে—এই তো আমার শেষ জীবনের ভরসা। কিন্তু আজ যদি ওরা ভুল করে ফেলে, আমার কী গতি হবে পুঁটুদি? আমার তো পূজোর ঘর নেই, আমি বাঁচ্‌বো কি করে?

পুঁটিমাসী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে একটা রুদ্ধ নিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে হাল্‌কা হয়ে গেলেন।

রজনীবাবু।—এরা যদি ব্যর্থ হয়ে যায়···।

পুঁটিমাসী একটু জোর গলায় ধমকের সুরে যেন সান্ত্বনা দিলেন।—না না, কেউ ব্যর্থ হবে না। আপনি মিছিমিছি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন।

রজনীবাবু।—কিন্তু অমিয়? অমিয় যে অহরহ আমার সব ভরসায় কাঁটা হয়ে বিঁধে রইল।

পুঁটিমাসী।—ছেড়ে দিন অমিয়র কথা। আপনার যতী মঞ্জু মীনু রয়েছে। তারা আপনার নাম রেখেছে এবং রাখবে। সারা মকতপুরের কে না ওদের ভালবাসে?

মীনু আর সাধনের বিয়ে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই হয়ে গেল। রজনীবাবু তেমনি খুসী হয়ে প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করে মেয়ে জামাইকে বিদায় দিলেন। পুঁটিমাসী একটু অবসন্ন হয়ে পড়লেন। প্রমীলাবালা তেমনি পূজোর ঘরের দরজার ফাঁকে দুটো ফুল ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

(ক্রমশঃ)

সমাজতন্ত্রবাদ ও ভারতবর্ষ

সেকেন্দর চৌধুরী

চতুরঙ্গের আশ্বিন সংখ্যায় অধ্যাপক কবির সমাজতন্ত্রবাদ নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে। যুদ্ধের দৌলতে তরুণ সম্প্রদায়ের বাইরেও আজ বামপন্থীদের অভাব দেখা যায় না, তাঁদের সকলের কাছেই প্রবন্ধ-বিষয়টী আগ্রহণীয় নিশ্চয়ই ; আর যাঁরা সমাজতন্ত্রে আস্থাহীন তাঁরাও বিষয়টীর গুরুত্ব সম্বন্ধে একমত। তাই আজ পাঁচ মাস পরেও কবির সাহেবের মতামতের বিচার করা অসাময়িক বা অনর্থক হবে না বলে বিশ্বাস করি।

প্রবন্ধের প্রথমার্দ্ধে সমাজতন্ত্রবাদের মূল সূত্রগুলির যে ভাষ্য কবির সাহেব প্রচার করেছেন বর্ত্তমান আলোচনা প্রধানতঃ সেই প্রসঙ্গে। শেষ ভাগে তিনি বর্ত্তমান যুদ্ধের গতি, স্বরূপ ও পরিণতি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। তাঁর বিবেচনায় এ যুদ্ধকে জনস্বার্থ প্রসারের যুদ্ধ বলে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এ অভিমত প্রকাশ করায় সমূহ বিপদ আছে, কবির সাহেব তা' অগ্রাহ্য করে সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। পুরস্কার লাভও হয়েছে ইতি-পূর্ব্বেই ; জনযোদ্ধৃবীরেরা নিজেদের সাপ্তাহিকের পাতায় যুক্তিতর্কের ভরসা ছেড়ে ব্যক্তিগত কটূক্তি করে নিজেদের ক্লৈব্যের স্বাক্ষর লিখে দিয়েছেন। যুদ্ধের প্রকৃতি ও পরিণতি সম্বন্ধে কবির সাহেব যে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন সে বিষয়ে আমরা মোটা-মুটি একমত, যদিও যে যুক্তির সাহায্যে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন তার বহুলাংশ আমরা নির্ভরযোগ্য বলে মনে করি না। ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রের যুগে প্রত্যেক যুদ্ধের মধ্যেই জনযুদ্ধের সম্ভাবনা নিহিত থাকতে বাধ্য, বর্ত্তমান মহাসমরের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি নিশ্চয় ; কিন্তু নিহিত সম্ভাবনাকে সংঘটিত সাফল্যে পরিণত করতে হলে সজ্ঞান প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এক সোভিয়েট ছাড়া মিত্রশক্তির অন্যান্য যুদ্ধ নেতাদের মধ্যে এ প্রত্যয়ের অভাব কেউ অস্বীকার করে না ; তাঁদের মধ্যে লক্ষ্য হয় শুধু এই উপলব্ধির অভাব নয়, এ পরিণতি সম্ভাবনার প্রাণপণ বিরোধ। আজকের মিশ্রযুদ্ধকে সত্যকার জনযুদ্ধে রূপান্তরিত কর্‌বার একমাত্র উপায় তাই প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রনেতৃত্বের অপসারণ, শ্রেণীশত্রুর সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করে শোষকের শক্তিবর্দ্ধন নয়, যুদ্ধের

স্থিতিকালেই বিপ্লবী জনশক্তির উদ্বোধন করে প্রকৃত জননেতাদের রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জ্জন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় লেনিনের এই নির্দ্দেশ উপেক্ষা করে দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনাল তার অযোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিল; এই যুদ্ধে সেই একই অক্ষমতা হেতু তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনাল তার বিপ্লবী সার্থকতা হারিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। রক্ত-পতাকাবাহী আজকের নেতাদের কাছে এ যুক্তির যথার্থতা যে একেবারেই অজ্ঞাত এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন, তাঁদের অপরাধী মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে তাই এখনও জনশক্তি প্রতিষ্ঠার মৌখিক ধুয়ো তাঁরা ত্যাগ করতে পারেন নি; কিন্তু সে সাধনার একমাত্র পথ যে সক্রিয় সংগ্রামশীল অভিজ্ঞতার পথ তা' মার্ক্স্-লেনিন-পন্থী বিপ্লবীদের স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন হওয়া উচিৎ ছিল না। তাই তাঁদের বাক্-সর্ব্বস্ব আস্ফালনের সাহায্যে গণমতসংগঠনের কার্য্যসূচী হতবুদ্ধি আত্ম-প্রবঞ্চনা বা ঘৃণ্য শঠকারিতারই শুধু সাক্ষ্য দেয়। তাঁদের স্বপক্ষে একমাত্র মামুলী কৈফিয়ৎ, সোভিয়েট শক্তি রক্ষা ও সাহায্যের জন্য মিত্র পক্ষীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টা অক্ষুণ্ণ, অব্যাহত ও নির্ব্বিঘ্ন রাখার দায় আজ সর্ব্বাগ্রে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শক্তিবৃদ্ধি ভবিষ্যৎ গণবিপ্লবের শ্রেষ্ঠ সহায় তা' সত্য; কিন্তু মিত্রপক্ষীয় যুদ্ধনীতির সোভিয়েট আনুকূল্য যে নির্ভর করে তাদের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায় সংহত জনমতের প্রভাবের ওপর, এ কথাও নিঃসন্দেহ। সুতরাং সোভিয়েট তথা বিশ্বশ্রমিকস্বার্থের খাতিরেই জনসংগঠন ও বর্দ্ধমান শ্রেণীপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জনশক্তির প্রাধান্যবিস্তার আজ জননেতৃত্বের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। ঐ কর্ত্তব্য পালনে যে শৈথিল্য দেখা গিয়েছে তাতে কবির সাহেব প্রমুখ অনেকের পক্ষেই মনে করা বিচিত্র নয় যে বর্ত্তমান যুদ্ধের বিরতি ঘটবে সাম্রাজ্যবাদী সাময়িক শান্তিতে, শোষণমুক্তি ও জনশক্তি প্রতিষ্ঠার আশা সুদূর পরাহত।

কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের স্বরূপ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। সমাজতন্ত্রবাদ আখ্যা দিয়ে কবির সাহেব যে মতবাদের অবতারণা করেছেন তার মূল বিশ্লেষণ, প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটন ও সমাজ প্রগতি পরিকল্পনায় তার মূল্য নির্দ্ধারণ আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। তাঁর প্রবন্ধের আরম্ভেই কবির সাহেব বলেছেন, "সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমস্ত পৃথিবী সংগঠিত না হলে যে মানুষের কল্যাণের কোনো সম্ভাবনা নাই, এ বিষয়ে বর্ত্তমানে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বোধ হয় সকলেই একমত।" কিন্তু সংগঠনের আগ্রহ বা উৎসাহ যতটা প্রবল ও ব্যাপ্ত, তার ভিত্তি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা বা জ্ঞান সেই অনুপাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি-দের কাছেও আজ অবধি সুস্পষ্ট হয় নি। তার কারণ এ বিষয়ে উৎসাহ স্বভাবতঃই

আদর্শ-অনুপ্রাণিত, শ্রেয়োবোধ থেকে তার উদ্ভব। কিন্তু শুধু জড়প্রকৃতি নয়, জীবপ্রকৃতির ক্রমবিকাশও যে নিয়মে চলে তা' শ্রেয়োবোধের অপেক্ষা রাখে না এবং মানব-সমাজের বিবর্ত্তনের ইতিহাসেও অনুরূপ অভীপ্সা নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক নিয়ম মূলতঃ কার্য্যকরী বলে দেখতে পাওয়া যায়; আমাদের ভাবরাজ্য, ন্যায়ান্যায়-বোধ তাই মুখ্যত সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি, ইতিহাসের ধারার ওপর তাদের প্রভাব নিতান্তই গৌণ। অত্যাচার, নির্য্যাতন ও ধনবৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সমাজে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করবার পরিকল্পনা ইতিহাসে প্রাচীন হয়েও বাস্তব জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারে নি, কারণ সভ্যতার ক্রমবিকাশের মূল রহস্য সে যুগের মানুষের ছিল অজ্ঞাত, সমাজপ্রগতির স্বাভাবিক নিয়ম সে আবিষ্কার করতে না পেরে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আদর্শ গোষ্ঠির গোড়াপত্তন করতে তখন সে ছিল অপারগ। মার্কসের গবেষণাই প্রথম সমাজ-তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনাকে বাস্তবের কোঠায় এনে দিয়েছে। এই কারণে সমাজ-তন্ত্রবাদ ও মার্কস্‌বাদ এখন আর দুই পৃথক মতবাদ নয়, এবং বর্ত্তমান যুগে মার্কসের শিক্ষা অবহেলা করে সমাজ সংগঠনের প্রচেষ্টা কেবল কল্পনাবিলাস ও বাতুলতা নয়, প্রগতিপরিপন্থী ও সমূহ অকল্যাণকর। নতুন সমাজ সংগঠনের জন্য তাই সংস্কারকের উদ্যম, আদর্শবাদে উৎসাহ, অত্যাচার অসহিষ্ণুতা বা শোষণ নিবারণের আগ্রহ বা স্পৃহা যথেষ্ট নয়; সদিচ্ছাকে দিতে হবে মার্কসীয় সমাজ-বিজ্ঞানের অভ্রান্ত দৃষ্টি, তার সাহায্যে অতীতকে বুঝে নিয়ে বর্ত্তমানের পথ সে বাঁধবে, ভবিষ্যৎকে করবে সুগম। কবির সাহেবের সাধু অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমাদের কোনোই সন্দেহ নেই, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি অন্যতম, অথচ মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে তিনি সমাজতন্ত্রবাদের নামে যে সব ভ্রমাত্মক ধারণার প্রচার করেছেন তা' পরিণামে কর্ম্মীদের লক্ষ্যচ্যুত করবে বলে আশঙ্কা করি। ক্রমোন্নতির ইতিহাসে শ্রেণী শোষণের স্থান ও উদ্ভবের কারণ স্পষ্ট নির্ণয় করতে না পেরে একাধিক পরস্পরবিরোধী মতের তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন। শোষণ মনোবৃত্তিকে তিনি মানুষের দুর্দ্দশার কারণ বলে অনেক স্থানে উল্লেখ করেছেন। "যতদিন মানুষ মানুষকে শোষণ করবে, ততদিন আন্তর্জাতিক ও অন্তর্জাতিক শোষণের শেষ নাই। যতদিন মানুষ মানুষকে দাস করে রাখবে, ততদিন মানুষের দুঃখ ও দৈন্যের অবসান হতে পারে না।.....শোষণের ইচ্ছাই বিদেশ জয় ও শাসনের ভিত্তি, এমন কি দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায়ও এ শোষণ মনোবৃত্তির আভাস মেলে।" কিন্তু শোষণ প্রথার জন্যে মানুষের বিশেষ কোনো মনোবৃত্তি দায়ী নয়

এবং মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তনের ভরসায় থাকতে হলে কোনো দিনই এই প্রথার সমাপ্তি দেখবো বলে আমরা আশা রাখি না। বস্তুতঃ সভ্যতার আদিম যুগে দাসত্ব প্রথার প্রবর্ত্তনে শ্রেণীশোষণের সূচনা হয়েছিল, সমাজের শ্রীবৃদ্ধির তাগিদে, শ্রম-শৃঙ্খলনের এই বিশিষ্ট ব্যবস্থা ছাড়া অগ্রগতির অন্য পথ সেই কালে ছিল না। তারপর থেকে ধনতান্ত্রিক যুগের চরম বিকাশ অবধি মানুষ তার বস্তুজগতের সম্পদ বৃদ্ধি করে এসেছে শ্রেণীভেদ ও শ্রেণীশোষণেরই পথে; বিভেদ ও শোষণের রূপ বদ্‌লেছে, শোষণের অধিকার এক শ্রেণীর হাত থেকে অন্যের হাতে পৌঁচেছে, কিন্তু শোষণনীতির উচ্ছেদ সম্ভব হয় নি, কারণ সভ্যতা-উন্মেষের সেই অধ্যায়ে শোষণের বিলোপ ঘটলে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনাও রহিত হোত। শ্রেণীশোষণ ছাড়া অন্য কৌশলেও যে বস্তুসমৃদ্ধির উৎকর্ষ সম্ভব তা' প্রথম স্পষ্ট হয় ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার যুগে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি তাই এই সময়ে। দেখা যায়, ধনতন্ত্রের মধ্যস্থতায় ধনোৎপাদিকা শক্তির যেমন একদিকে অভূতপূর্ব্ব বিকাশ, তেম্‌নি অন্যদিকে শোষকশ্রেণীর ক্রমশঃ সংখ্যাসঙ্কোচ ও শোষিতদের আনুসঙ্গিক সংখ্যাস্ফীতিজনিত শ্রেণীসংঘাতের নগ্নতাপ্রকাশ, তীব্রতাবৃদ্ধি ও প্রসার। ধনতন্ত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তখন লক্ষ্য হয় তার ধনোৎপাদন ব্যবস্থায় যেমন শ্রমসমবায়ের প্রসারণ ও বর্দ্ধিষ্ণু শ্রমসমষ্টি গঠন, তার বণ্টনব্যবস্থায় তেমনি স্বার্থবিচ্ছেদবর্দ্ধন। ধননিয়ন্ত্রণের এই ব্যবস্থার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এর অন্তর্নিহিত এই বিরোধ ক্রমশঃ উগ্রতর হয়ে তার ধনোৎপাদন শক্তিকেও ব্যাহত করে দিতে বাধ্য। শ্রেয়নিরপেক্ষ সমাজপ্রকৃতির ইতিহাসে স্বার্থসংঘাত ও শোষণনীতির সার্থকতার শেষ এইখানে। যে শোষণব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত ছিল সমাজপ্রগতির পরিপোষক ও সহায়ক, এই পরিণতির পরমুহূর্ত্তে সে হয় ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক। সমাজ স্থাণু নয়, গতিশীল, এই নিত্যবিবর্ত্তনশীলতার প্রতি লক্ষ্য না রেখে সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণ করা তাই ভ্রান্তিমূলক ও বিপজ্জনক। ডায়ালেক্‌টিকাল দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন সেই কারণে। এই দিক দিয়ে ইতিহাসের বিচার করলে কবির সাহেব বল্‌তেন না "প্রাচীন যুগে মানুষের যে অর্থনৈতিক দাসত্ব তার সমর্থন না করলেও তা বোঝা যায়।" দাসত্বের ঐতিহাসিক কার্য্যকরিতা তিনি কি অর্থে বুঝেছেন সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগে এখানে বলা প্রয়োজন যে আমাদের শ্রেয়োবোধ আপেক্ষিক বলে অতীতের সমাজব্যবস্থাকে আজকের তুলাদণ্ডে যাচাই করা চলে না, এবং সে কালের শোষণপ্রথাকে সমর্থন বা অসমর্থন করার প্রশ্ন অবান্তর ও অর্থহীন। এ ক্ষেত্রে এঙ্গেল্‌সের

কথার পুনরাবৃত্তি করে বল্‌তে হয় : "Without the slavery of antiquity, no modern socialism....The introduction of slavery under the conditions of that time was a great step forward....In the historical conditions of the ancient world, and particularly of Greece, the advance to a society based on class antagonisms could only be accomplished in the form of slavery....All historical antagonisms between exploiting and exploited, ruling and oppressed classes to this very day find their explanation in this same relatively undeveloped productivity of human labour." (*Anti-Duhring, Part 2; Chapter 4*). কবির সাহেব যখন বলেন "প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞানকে ভিত্তি না করে বরং মানুষকে শোষণের ভিত্তিতেই ইয়োরামেরিকার তথাকথিত সভ্যতা গড়ে উঠেছে", তিনি ভুলে যান শ্রেণীশোষণ ইয়োরামেরিকার সভ্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ নয়, মানব-ইতিহাসের এক অনিবার্য্য অধ্যায়, বিশ্বসভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে অপরিহার্য্য সোপান। এ সোপান অতিক্রম করতে না পারলে আজ যেমন মানুষের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই, তেমনি এ কথাও সত্য যে অতীতের শ্রী-সঞ্চয়, শ্রেণী-শাসন, শ্রেণী-শোষণ ও শ্রেণী-সংঘাত ভিন্ন সম্ভব ছিল না। জড়প্রকৃতির সম্পদ ও মানুষের বর্দ্ধমান জ্ঞানকে কার্য্যকরী করবার জন্যই ছিল শোষণের প্রয়োজন। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি "তথাকথিত" বিশেষণটীর প্রয়োগ কৌতূহলের উদ্রেক করে। এ কটাক্ষ যদি বস্ত্রজাত সভ্যতার উদ্দেশ্যে হয় তবে আমাদের জিজ্ঞাস্য, কবির সাহেব কি জড়সম্পদ উপেক্ষা করে অধ্যাত্ম সাধনার প্রয়াসী ? অথচ তিনি অর্থনৈতিক ভূমিকার ওপর আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করতেও প্রবৃত্ত। তাঁর মত অভিজ্ঞ লেখকের পক্ষে ভাষার এ শিথিল ব্যবহারের কারণ কি দায়িত্বজ্ঞানহীনতা না স্পষ্ট প্রতীতির অভাব ? লঘুচিত্ততার প্রমাণ তিনি আর একবার দিয়েছেন মুনাফালোভী অব্যবস্থার দৃষ্টান্ত খুঁজতে গিয়ে। "একদিকে বিলাসের প্রাচুর্য্য ও প্লাবন এবং অন্যদিকে অভাবযন্ত্রণার নিদারুণ নিপীড়ন।...বিলেতে খোরাকীর খরচ টাকায় চার আনাও বাড়ে নি, আর বাংলা দেশে ধান চালের দাম বেড়েছে সাত আট গুণ।" ধনতন্ত্রের উভয় সঙ্কটের উদাহরণ হিসাবে এই তুলনামূলক বিবরণটী যে অব্যবহার্য্য সে কথা কি কবির সাহেব একবারও বিবেচনা করেন নি ? বিলাতের তুলনায় এ দেশের খাদ্যসঙ্কট যে অধিক সঙ্গীন তার জন্যে মুনাফালোভী সমাজব্যবস্থা দায়ী নয়, যেহেতু দুই

দেশেই বর্ত্তমানে সেই একই ব্যবস্থা প্রচলিত। তার কারণ খুঁজতে হয় দুই দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্যে।

কবির সাহেবের মতে "যতদিন পৃথিবীতে একটী দেশও পরাধীন থাকবে ততদিন সাম্রাজ্যবাদের স্বাভাবিক অনুসঙ্গ হিসাবে যুদ্ধবিগ্রহের অবসান হওয়াও অসম্ভব।" ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই কালবিশেষে উপনিবেশ স্থাপন ও সাম্রাজ্যবিস্তৃতির আকারে নিজের পরিণতি খোঁজে, সুতরাং এই যুক্তির যথার্থতা বিচার করার আগে ধনতন্ত্রের আত্মস্ফূর্ত্তির মূল ধর্ম্ম বা নিয়ম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা প্রয়োজন। ধনতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য এই যে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, যানব্যবস্থা প্রভৃতি যে পুঞ্জিত সম্পদ-সম্ভার ধনোৎপাদনের উপকরণ, যাকে ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় production-goods বা capital-goods, এবং বাংলায় বলা যেতে পারে উৎপাদিকা সম্পত্তি, তার ওপর সমাজের সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণী-প্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত অধিকার। বাকী লোকের পরিশ্রমের সংযোজনায় এই পুঞ্জিত সম্পদ বর্দ্ধিত হয়ে নতুন সম্পদের সৃষ্টি হয়। এই সৃষ্টি-প্রকরণে পুরাতন, পুঞ্জিত সম্পদের রূপান্তর হয় মাত্র, নতুন বৃদ্ধি যা' ঘটে তা' সম্পূর্ণভাবে মানুষের পরিশ্রমের ফল। কিন্তু উৎপাদিকা-সম্পত্তির সংযোগ ভিন্ন পরিশ্রম ফলপ্রসূ হতে পারে না, এবং সেই সম্পত্তির যারা মালিক সেই পুঁজিপতিরা এই সুযোগ গ্রহণ করে শ্রমিককে তার শ্রমশক্তির মূল্যস্বরূপ গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানটুকু মাত্র দিয়ে তার পরিশ্রম-লব্ধ ফলের বাকী পরিমাণের সাহায্যে পুঁজি বৃদ্ধি করে। এই যে শ্রমশক্তির মূল্য বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত পরিশ্রম-ফল তাকেই আমরা মুনাফা বলি। অতএব মুনাফার উৎপত্তিমূল মানুষের কায়িক পরিশ্রমে, এবং যন্ত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ধনসৃষ্টির প্রকরণে বিযান্ত্রিক শ্রমের স্থান যেমন অল্প-পরিসর হচ্ছে তেমনি মুনাফার হারের হ্রাস হতেও বাধ্য। এ অবস্থায় মুনাফাহার বৃদ্ধির বা সংরক্ষণের উপায় দ্বিবিধ : প্রথমতঃ শিল্পে অনগ্রসর বিদেশে পুঞ্জিত অর্থ রপ্তানি করে ধনতান্ত্রিক সম্পদ-কর্ষণের ভিত্তি-প্রসারণ; অন্যথায় মুনাফাখোর শ্রেণীর সংহতি ও রাষ্ট্রক্ষমতা বৃদ্ধি করে আভ্যন্তরীণ ধনবণ্টন ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর লভ্যাংশের আরও সঙ্কোচসাধন। ধনতন্ত্রের প্রথমোক্ত বহির্মুখী বিকাশ দেখা গিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে; বর্ত্তমান সময়ে প্রসারক্ষেত্রের অভাবে দ্বিতীয় নীতি অবলম্বন করে তার অন্তর্মুখী অভিব্যক্তি ফ্যাসীবাদে। অবশ্য এ দুয়ের কোনো উপায়েই ধনতন্ত্রের মুনাফালোভী ধর্ম্ম স্থিতিলাভ করতে পারে না, তার অনিবার্য্য বিনাশ স্থগিত রাখতে পারে মাত্র; কিন্তু ইতিমধ্যে মানব সমাজকে

তার মূল্য দিতে হয় পৃথিবীব্যাপী দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধিতে। এই দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের মূল কারণ ধনতন্ত্রের ধননিয়ন্ত্রণ প্রণালী এ যুগের সম্পদ-সৃজনী শক্তির পূর্ণ বিকাশের পথে অন্তরায়। এই নিয়ন্ত্রণ প্রথার উচ্ছেদ ব্যতীত প্রগতিমুখী বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠা অসাধ্য। সাম্রাজ্যবাদী রূপই ধনতন্ত্রের একমাত্র রূপ নয়, এবং পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ ও উপদেশ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করা মাত্রই যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটবে এ আশাও সম্পূর্ণ অমূলক। চীন ও ভারতবর্ষের মত বস্তুসম্পদের উৎকর্ষ বিষয়ে যে সব দেশ আজও অপরিণত, সেখানে স্বরাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের প্রসারভূমি এখনও বর্ত্তমান; অথচ সেই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনে যে অন্তর্বিরোধ ও ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী তার পুনরভিনয় এ যুগে শুধু নিষ্প্রয়োজন নয়, প্রতিবিপ্লবীও বটে। অধিকন্তু, রাষ্ট্রীয় আধিপত্য বিস্তার না করেও এক দেশের পুঁজিপতিরা যে বিদেশ শোষণে সক্ষম তার প্রমাণস্বরূপ চীন ও দক্ষিণ আমেরিকার আর্থিক ইতিহাস ও আরও সম্প্রতি মার্কিনী ধনতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী প্রসারচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ বিগত দুই শতাব্দীর উপনিবেশ-স্থাপনই ধনতন্ত্রের আন্তর্জাতিক শোষণের একমাত্র পদ্ধতি নয়। রাষ্ট্রীয় শাসন আর্থিক শোষণকে সহজ ও কায়েম করে বলে সেই শাসন মুক্তির দায় আজ অগ্রগণ্য; কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভের পরেও যে অদৃশ্য বিদেশী শোষণ ও প্রকাশ্য স্বদেশী শোষণের সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান সে বিষয় অবহিত না হওয়া সমাজতন্ত্রবাদীর পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

আমাদের সন্দেহ হয়, ধনতন্ত্রের মূল তত্ত্ব তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি বলেই তার গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে কবির সাহেবের ধারণা এত অস্পষ্ট; এবং সেই একই অক্ষমতা-হেতু ইতিহাসে এই সমাজব্যবস্থার উৎপত্তির কারণ ইঙ্গিত করতে গিয়েও তিনি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কথায় "মানুষ যখন প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করতে পারে নি, সে দিন ব্যক্তিসম্পত্তি বা মুনাফার হয়তো প্রয়োজন ছিল, কারণ তা নইলে তখন মানুষের সমাজে উন্নতি বা অগ্রগতির সম্ভাবনা থাকত না। বর্ত্তমানে প্রাকৃতিক শক্তির শৃঙ্খলনে সমস্ত মানুষের জন্যই প্রাচুর্য্যের সম্ভাবনা রয়েছে।" অর্থাৎ তিনি মনে করেন—(১) প্রাকৃতিক শক্তি আয়ত্ত করার এতাবৎ একমাত্র উপায় ছিল "ব্যক্তিসম্পত্তি বা মুনাফা", (২) মানুষের পক্ষে জড়প্রকৃতিকে আয়ত্তাধীন করার এক নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, (৩) বর্ত্তমানে মানুষ সেই সীমানায় এসে পৌঁচেছে। বলা বাহুল্য, মানুষের জ্ঞানের পরিধি নিরন্তর বর্দ্ধমান, জড়বিজ্ঞানের উন্নতির কোন দিনই শেষ নেই, সুতরাং ব্যবহারিক বা ফলিত

বিজ্ঞানের সাহায্যে সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনাও নিশ্চয়ই অসীম। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধনোৎপাদন শক্তির অব্যাহত পরিচালন ঘটতে দিলে আজ সে যে শুধু সব মানুষের জন্যে স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতেই সক্ষম তা' নয়, তার উত্তরোত্তর স্বাচ্ছন্দ্য বা প্রাচুর্য্য বৃদ্ধির ক্ষমতাও স্পষ্ট প্রতীয়মান। বর্ত্তমান ধননিয়ন্ত্রণ নীতির অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রবর্ত্তনে জড়সভ্যতা যে সমপ্রাচুর্য্যের এক নির্দ্দিষ্ট স্তরে এসে স্থিতি লাভ করবে, কবির সাহেবের কথায় সাধারণ পাঠকের মনে এমন একটা ভ্রান্ত ধারণার প্রশ্রয় পাওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের বিশ্বাস, লেখকের এই ত্রুটী অনবধনতাজনিত; কিন্তু সভ্যতার ইতিহাসে ব্যক্তিসম্পত্তি ও মুনাফার প্রয়োজন সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা এত সহজে মার্জ্জনীয় নয়। সম্পত্তির ওপর মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার ধনতান্ত্রিক সমাজের বিশেষ লক্ষণ নয়, অথচ ব্যক্তি-সম্পত্তি ও মুনাফা ধনতন্ত্রের সমার্থসূচক বৈশিষ্ট্য বলে কবির সাহেব প্রচার করেছেন। বস্তুতঃ সভ্যতার আদিম অবস্থায় সমষ্টিপ্রধান সমাজব্যবস্থা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পত্তির ওপর মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারের প্রবর্ত্তন দেখতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগে ধনতন্ত্রের উদ্ভবের অব্যবহিত আগে এই অধিকার জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশঃ প্রসার পেয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে সব চেয়ে ব্যাপ্ত ছিল। তখনকার ধনব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ লোক স্ব স্ব ভূখণ্ড বা ছোট ছোট শিল্প-উপকরণের সাহায্যে পরিশ্রম করত। আর্থিক উন্নতির তাগিদে প্রয়োজন ছিল সম্পদ সৃষ্টির উপকরণ এই সব বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত উৎপাদিকা-সম্পত্তির একত্রীকরণ ও সমাবেশ। তাই উৎপাদিকা-সম্পত্তি থেকে জনসাধারণের ব্যক্তিগত অধিকার হরণেই ধনতন্ত্রের সূচনা। মার্ক্‌সের ভাষায়: "At a certain stage of development it (the pre-capitalist mode of production) brings forth the material agencies for its own dissolution. From that moment new forces and new passions spring up in the bosom of society; but the old social organization fetters them and keeps them down. It must be annihilated; it is annihilated. Its annihilation, the transformation of the individualized and scattered means of production into socially concentrated ones, of the pigmy property of the many into the huge property of the few, the expropriation of the great mass of the people from the soil, from the means of subsistence and from the means of labour, this fearful and painful expropriation of the mass of the people forms the prelude to the history of capital. It comprises a series of forcible methods...of the primitive accumulation

of capital.'' (*Capital, Vol. I, Chapter 32*). অবশ্য জনসাধারণের স্বাধিকার হরণ তাদের কল্যাণার্থ হয় নি, হয়েছিল ক্ষমতাবান ব্যক্তিবিশেষদের স্বার্থের লোভে; এবং এই সমষ্টিকৃত সম্পত্তিনিচয়ের ওপর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাদেরই ব্যক্তিগত অধিকার। সুতরাং দেখা যায় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ও পরে দুই কালেই সম্পত্তিতে ব্যক্তিস্বত্বের প্রচলন, কিন্তু পার্থক্য এই যে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক যুগে ব্যক্তিসত্ত্ব সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত ছিল, ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিসত্ত্ব শ্রেণী বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ। ব্যক্তিস্বত্বের এই শ্রেণীগত রূপই এই সমাজের ধনোৎপাদন প্রণালীর মূলনিয়ন্তা, এবং এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখলে ধনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক নিয়ম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। ধনতন্ত্রের স্বধর্ম্ম উৎপাদিকা-সম্পত্তির অধিকারী শ্রেণীর উত্তরোত্তর সংখ্যা-সঙ্কোচ। তার এই বৈশিষ্ট্যই কালে তার ধ্বংসের কারণ হয়, এবং উত্তর-ধনতান্ত্রিক যুগে অধিকার-চ্যুত জনগণের মধ্যে হৃত অধিকারের পুনঃপ্রসারণ ঘটে। ''...The further expropriation of private proprietors takes a new form. That which is now to be expropriated is no longer the labourer working for himself, but the capitalist exploiting many labourers. This expropriation is accomplished by the action of the immanent laws of capitalist production itself, by the centralization of capital.... The knell of capitalist private property sounds. The expropriators are expropriated.'' (*Ibid.*).

জড়সভ্যতার ধারার এই অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা যে সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করে তার ফলে বলা যায় যে অতীত ইতিহাসে জন-ব্যক্তি-স্বত্ব ও ধনতন্ত্রের ইতিহাসে শ্রেণী-ব্যক্তি-স্বত্ব মানুষের ধনসৃষ্টিশক্তির ক্রমবিকাশের অবলম্বন। আমরা যাকে মুনাফা বলি তা' শ্রেণী-ব্যক্তি-স্বত্ব-নিয়ন্ত্রিত ধনোৎপাদন ব্যবস্থার গর্ভজাত সৃষ্টি। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ধনসৃষ্টির আদি প্রেরণা এই ব্যক্তিস্বত্বের বিলুপ্তি ঘটে ধনতন্ত্রের ধ্বংসের পর, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনকালে; ব্যক্তিস্বত্বের পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠা হয় সমষ্টিস্বত্বের। স্বার্থের লালনস্বত্বের ভিত্তির ওপর, তাই ধনতান্ত্রিক সমাজের ব্যক্তিস্বার্থের স্থানে নতুন সমাজের গণস্বার্থ অগ্রগতির ভবিষ্যৎ প্রেরণা জোগায়। মনে রাখতে হবে, এই স্বত্ব ও স্বার্থের পরিবর্ত্তন মানুষের মনে শ্রেয়োবোধের সার্ব্বভৌম বিপ্লবের মুখাপেক্ষী নয়, তাহলে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা চিরদিনই আকাশকুসুম হয়ে থাকতো। জড়সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে আজ এ পরিবর্ত্তন অপরি-হার্য্য বলেই সমাজের ক্রমবিকাশে এর স্বীকৃতি। বর্দ্ধমান ধনসৃষ্টির শাশ্বত মূল

তত্ত্ব উৎপন্ন সম্পদের কিছু অংশ সঞ্চয় করে ভবিষ্যৎ উৎপাদন-প্রকরণে তার নিয়োগ, উৎপন্ন ফলের সম্পূর্ণ পরিমাণই উপস্থিত ভোগে ক্ষয় হতে না দেওয়া। এই সঞ্চিত ধনকে আমরা বলি উৎপাদিকা-সম্পদ, আর যা' আশু ব্যবহারে ক্ষয় করি তাকে বলা যেতে পারে ভোগ্য-সম্পদ। ভোগ্য-সম্পদের প্রাচুর্য্যই জড়-সভ্যতার মানদণ্ড, এবং সেই প্রাচুর্য্য বৃদ্ধির উপায় উৎপাদিকা সম্পদের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধিসাধন। এই জন্যে আর্থিক উন্নতির মূল প্রয়োজন ধন-সঞ্চয়। ধনবৈষম্য ও সম্পত্তির ওপর ব্যক্তি ও শ্রেণীবিশেষের অধিকার সমাজের অজ্ঞানে এই সঞ্চয়ের সাহায্য করেছে বলেই ইতিহাসে ব্যক্তি-স্বত্ব ও মুনাফার সার্থকতা। ধনবৈষম্য ও শ্রেণীস্বার্থের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার অবসান হয় সেই মুহূর্ত্তে যখন এই সঞ্চয়ের দায় সমাজ সজ্ঞানে, সমষ্টিগতভাবে বইতে সক্ষম। জড় প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য আমরা কতখানি ভোগে আনতে পেরেছি তা' এই পরিণতির মানদণ্ড নয়।

তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে কবির সাহেব বলেছেন: "ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্থিতি, ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সংগঠন—এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে বর্ত্তমান পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপ নির্ণয় করতে হবে, কারণ সমাজতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতবর্ষই হবে ভবিষ্যৎ বিশ্ব সমাজতন্ত্রের ভিত্তি।" বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এ উক্তির কোনো সদর্থ আমরা খুঁজে পাই নি। আমাদের দুর্গতি আমাদের শোষণ ও শাসন ব্যবস্থার ফল, সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাহায্যে এই ব্যবস্থা প্রতীকারের আমরা প্রয়াসী। অতীত ও বর্ত্তমানের দুর্গতি এই প্রয়াসের নিয়ামক তো নয়ই, তার চরম আক্রমণ-লক্ষ্য। ভারতীয় সমাজের শোচনীয় অপরিণতি আমাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রকে বহুদিন অবধি ক্ষুণ্ণ করতে বাধ্য, কিন্তু নিজেদের ত্রুটী ও দৌর্ব্বল্য বিশ্বসমাজতন্ত্রের আদর্শ উপাদান বলে প্রচার করা দুঃসাহসের কাজ। স্বদেশ প্রেমের এ হাস্যকর আত্মকণ্ডূয়ন কবির সাহেবের কাছে আমরা প্রত্যাশা করি না।

সমাজতন্ত্রবাদের মূল তত্ত্ব নিয়ে বাংলায় বিশদ আলোচনার যে কত প্রয়োজন কবির সাহেবের প্রবন্ধই তার প্রমাণ। বর্ত্তমান আলোচনার সার্থকতা সেই কারণে; ব্যক্তিবিশেষের মতামতের প্রতিবাদ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সমাজতন্ত্রের নামে যে মতবাদ কবির সাহেব প্রচার করেছেন শিক্ষিত সমাজে অধুনা তার বহুল প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এই মেকী সমাজতন্ত্রবাদের ত্রুটী বিশ্লেষণ আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁর প্রবন্ধ আমাদের সমালোচনার এই অবকাশ দিয়েছে বলে কবির সাহেব আমাদের ধন্যবাদার্হ।

সুরু

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

রীতিমতো পুরুষ মানুষ উৎপল। ইন্সিওরেন্সের সামান্য দালালি থেকে সুরু করেছে জীবন—এখন সে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। মামার জোরে নয়, স্রেফ পুরুষকারের জোরে। বছর পাঁচ লাখ টাকার বিজ্‌নেস্ যায় তার ব্রাঞ্চ থেকে। এখনও একটা মোটা রকমের পার্সোন্যাল বিজ্‌নেস্ হয়। পরিশ্রমে ক্লান্তি নেই—অফিস্-মাষ্টার হয়েছে, তবু। অফিস্-মাষ্টার কিন্তু অফিসে থাকে সে কতক্ষণ? বাইরে-বাইরেই ঘোরাঘুরি শুধু। তারপর সন্ধ্যায় যখন নিজের ছোট ফ্ল্যাটে সে ফিরে আসে—ভাতের অপেক্ষায় যা একটু সময় যায়—নইলে তক্ষুণি ঘুম। নিটোল, নিরুপদ্রব ঘুম। বছর শেষে কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তির খানিকটা ঘাট্‌তি দেখা গেলেও এ ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। ভোর হলেই হয়ত বিরাট বিরাট অঙ্কের আঁকিবুকি আর দফায় দফায় হিসাবনিকাশের গুঁড়োগুড়ো অক্ষর তার মগজের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু রাত্রিতে মাথা একদম পরিষ্কার।

উৎপল তা-ই ভাবছিল কাল কেন তার ঘুম হল না। যাতে তার ঘুম হলনা অন্যের পক্ষে অবশ্যই তা ঘুম না হবার কারণ হতে পারে। কিন্তু তার পক্ষেও কি তা-ই? ঘুম যখন হল না তাছাড়া আর কি? কিন্তু কেন? এমন কিছু অপরাধ ত তা'রা করে নি! সুলেখাকে সে বিয়ে করবে এ ত সবাই জানে—জানে সুলেখার দাদা-বৌদি, এমন কি তার ভাইপো-ভাইঝিরাও। সুলেখা উৎপলের ফ্ল্যাটে আসে তা-ও সবার জানা। সুলেখার কোনো সঙ্কোচই আর নেই—উৎপলও হৃষ্ট মনে সুলেখাকে তার জীবনে গ্রহণ করে নিয়েছে। এই অসঙ্কোচ মেলামেশা কাল রাত্রির কয়েকটি মুহূর্ত্তে যদি একটু বেশি দূরই এগিয়ে থাকে তাতে এমন কি অপরাধ? সুকুমার তার বন্ধু, তাছাড়া ভালোমানুষ—কিন্তু বোনকে একটা বিশ্রী অবস্থায় পড়তে দেখ্‌লে, উৎপল তাকে বিয়ে করবে জেনেও, কি অস্থির না হয়ে থাক্‌তে পারবে? তাছাড়া বৌদি! বৌদির কাছে সংযমের জয়-ঘোষণা অনেকদিনই করেছে উৎপল। এখন? তারপর সুলেখা নিজেও বা কি ভাবছে এখন? সুলেখা যে এত দুর্ব্বল কাল রাত্রির সেই কয়েকটি মুহূর্ত্ত ছাড়া আর কোনো দিন, কোনো সময় ভাববার সুযোগ পায়নি উৎপল। কিছু

যদি মনে করে থাকে সুলেখা ? দিনের আলোতে কালকের ঘটনাটা ত অন্যকরম মানে নিয়েও উপস্থিত হতে পারে ! তা না-ই বা হ'ল কিন্তু ভাব্‌তে ত পারে তাকে আরো দশপাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো—যারা, সুলেখার মতে, মেয়েদের জান্‌তে চায় শুধু শরীর দিয়ে।

আর কারো কাছে নয়, সুলেখার কাছেই অপরাধী হয়ে উঠেছিল উৎপল—তাই রাত্রিতে কাল ঘুমুতে পারে নি। সুলেখার অনেক দিনের অনেক কথা মনে পড়ে' বিছানার উপর একা একা সে সঙ্কুচিত হয়ে উঠ্‌ছিল। উৎপলের কাছে বসে বসে যখন কথাগুলো বল্‌ত সুলেখা, তখন তা শোনাত একটি আহত মনের অভিযোগেরই মত। কিন্তু কাল রাত্রিতে স্মৃতি থেকে উঠে এসে কথাগুলো যেন উৎপলকে বিদ্রূপে বিদ্ধ করে গেছে। দেয়াল থেকে স্পষ্ট সুলেখার গলার স্বর শুন্‌তে পেয়েছে উৎপল : "ছি ছি উৎপলদা, তুমিও শেষটায় আমার শরীরের উপরই লোভী হয়ে উঠ্‌লে ? পুরুষরা সত্যি তাহলে সবাই একই রকম ?"

উৎপল সেই অশরীরী স্বরের কাছেই কৈফিয়ৎ দিতে চেয়েছে : "কেবল তোমার শরীরের উপরই আমার লোভ, একথা কেন ভাব্‌ছ ? তোমায় ভালোবাসি বলেই তোমার শরীরকেও ভালো লাগে, এমন কি হতে পারে না ?"

"হতে পারে। কিন্তু আমার ভয় হয়—ভাবি, তুমিও বুঝি আমার শরীরটাকেই শুধু ভালোবেসেছ। জানো উৎপলদা, মেয়ে হওয়া একটা অভিশাপ !"

উৎপল্ ছট্‌ফট্ করে বিছানা ছেড়ে উঠে গেছে। অন্ধকারে দেয়াল হাতড়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়েছে। আলোতে ঝকঝকে তার ঘর—সে একা। কেবল রাত্রির হাওয়ার খুট্‌খাট্ শব্দ ঘরের ভিতর। সিগারেট ধরিয়ে উৎপল চেয়ার টেনে বসেছে।

তবু সুলেখার কথা শোনা গেল : "দাদার একরত্তি ছেলে কানুটার সঙ্গে পর্য্যন্ত আমার ঘুমোবার উপায় নেই—তা জানো উৎপলদা ? বয়েসে ছোট হলেও পুরুষের জাত কিনা—পুরুষের মতো করেই মেয়েদের জানে ! বল্‌তে পারো উৎপলদা, তোমাদের লোভের দাবী মেটানো ছাড়া মেয়েদের সত্যি কি আর কোনো দরকার নেই ? পুরুষ দেখে দেখে একেক সময় তা-ই মনে হয় আমার। বৌদির এক ভাইপো এসেছিল একবার তিন দিনের জন্যে। লম্বা-চওড়া সার্টিফিকেট্ দিয়েছিলেন বৌদি, এমন ছেলে না কি হয় না—এম্-এ পাশ, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে স্বদেশী করে বেড়ায়। কারো সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌তে আমার সঙ্কোচ নেই জানো।

আমার সেই অপরাধে তৃতীয় দিনেই ছেলেটি একা পেয়ে আমায় দাবী করে বস্‌ল। ওর স্পর্দ্ধায় হেসে ফেলাই আমার উচিত ছিল, কিন্তু আমি রেগে গেলুম।"

তিন ঘণ্টা আগে এ ঘরে যে-সুলেখা ছিল সে যেন সত্যিকারের সুলেখা নয়। সত্যিকারের সুলেখা হলে সে উৎপলের দেহের স্পর্শ থেকে ছিট্‌কে সরে গিয়ে দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে যেত। কিছুতেই তবে উৎপলের দেহের প্রত্যেকটি রোমাঞ্চের সঙ্গে তার দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ত না এম্‌নি আগ্রহে। আর কেউ —বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল উৎপলের, একটু আগে যে মেয়েটি এখানে ছিল সে আর কেউ। সুলেখা নয়—সুলেখা হতে পারে না।

উত্তেজিত হয়েই উৎপল বাতি নিভিয়ে দিয়েছিল—বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছিল উত্তেজনা নিয়েই—কিন্তু রাত্রিতে এক সময়ও সে-উত্তেজনা ঘুমে ঠাণ্ডা হয়ে এলো না।

তারপর সুলেখার সঙ্গে আর তার দেখা না হোক্‌—স্বার্থপরের মতো এমন চিন্তা করবার সাহস উৎপলের ছিল না। দেখা হোক ঠিক আগেকার নিরুদ্বেগ দেখা হওয়ার মতোই, মনে মনে সে প্রার্থনাই করছিল সে—সেদিনকার রাত্রির স্মৃতি যেন সুলেখার মনে জড়িয়ে না থাকে। ভেবে কিনারা করতে পারে না উৎপল, সেদিন কি সুলেখাই তার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়েছিল, না কি সে-ই নিতে চেয়েছিল সুলেখার কোনো দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের সুযোগ! সুলেখার মুখে হাসি দেখে এ-প্রশ্নই ঘোলাটে হয়ে ঘুরতে লাগল তার মাথায়। আগেকার মতোই সুন্দর, স্বাভাবিক সুলেখার হাসি। কিন্তু আশ্চর্য্য, উৎপল হাস্‌তে পারছিল না।

"মাষ্টারি করতে আর ভালো লাগে না, উৎপলদা—" উৎপলের বসবার চেয়ারটায় বসে পা দোলাতে সুরু করল সুলেখা।

উৎপল সুলেখার মুখের দিকে নিবিড়ভাবে তাকিয়ে নিঝুম হয়ে বিছানার উপর বসে রইল—সুলেখার চোখ-মুখ-শরীরের কোনো পরিবর্ত্তনের আভাস যেন অনুসন্ধান করছে।

"কি? কেবল চুপ করে আছো!" মুখ ভার করে অভিমান দেখাতে চাইল সুলেখা।

"না—" একটু অপ্রতিভ হাসি নিয়ে উৎপল চোখের তন্ময়তা ভেঙে দিলে।

"কি বসে বসে ভাব্‌ছ? আমার কথা কানেই যাচ্ছে না!"

"মাষ্টারি করবে না কেন?" একটা স্বাভাবিক হাসির চেষ্টা করল উৎপল।

"মেয়েদের জন্যে ঐ ত কাজ তোমরা ছকে রেখেছ—মাষ্টারি আর নার্সগিরি!"

"ও, তা-ই?"

"তা-ই। কেন ছকে'-দেওয়া কাজ করব? পুরুষরা যে কাজ পারে আমরা পারিনে?"

"সোভিয়েট রাশ্যায় ত তোমরা তা করছ!"

"ঠাট্টা করো না—সত্যি মেয়েরা সেখানে সব কাজই করছে।"

"ভুল বুঝ্‌ছ কেন, ঠাট্টা ত আমি করিনি।"

"জানো উৎপলদা, আমার কিন্তু ইচ্ছে করে পুরুষদের কাজ করতে—ধরো কোনো ফ্যাক্টরীতে—"

"ফ্যাক্টরীতে ত মেয়েরা কাজ করে—চটকলে বিলাসপুরী কুলি মেয়েরা গঙ্গার ওপারেই কাজ করছে—"

"বাঃ, তা বুঝি? স্কিল্ড্ লেবারের কাজ। পারেনা মেয়েরা?"

"পারেনা কে বলে?"

"আমি পারতুম, তা জানো? দাদা আমায় কিছুতেই আই-এস্-সি পড়ালেন না—তোমাদের কি ধারণা জানো?—মেয়েদের যে আই-এ, বি-এ পড়তে দেওয়া হয় এই ঢের!"

সুলেখার কথা বলবার উৎসাহ বেড়েই চল্‌ছিল—উৎপলের কাছে এলে মুখ তার ফোয়ারার মতো খুলে যায়। কিন্তু উৎপল যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়ছিল, সুলেখার আদর্শকে আজ সে আর তেমন উৎসাহিত করতে পারছে না। এসব কথা শুনতেও যেন আজ আর রুচি নেই। সুলেখার উপর থেকে চোখ সরিয়ে না নিলেও মন সরিয়ে নিয়েছে উৎপল।

"মেয়েদের শরীরের কতগুলো বিচ্ছিরি অসুবিধে আছে—" খুবই বিষণ্ণ শোনাল সুলেখার কথা: "পুরুষের কাজ করতে গেলে সেই অসুবিধেগুলো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিচ্ছিরি মেয়েদের শরীর। আমার তাই মনে হয়, পুরুষ যদি হতাম!"

অন্যমনস্কতা থেকে হঠাৎ উঠে এল উৎপল। উৎকর্ণ হয়ে আরো কিছু শুন্‌তে চাইল সুলেখার মুখে। সুলেখা তখন চুপ করে গেছে। বিষণ্ণ তার মুখ আর তাই সুন্দর। অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর মনে হল সুলেখাকে। উৎপল মনে-মনে অস্থির হয়ে উঠ্‌ল—কেন আজ সুলেখাকে বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে?

জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হল—কেন? মনের অন্ধকার থেকে একটা সন্দেহ জেগে উঠে' সতেজ রোগবীজাণুর মতো তার শরীরের সমস্ত রক্তকে আক্রমণ করল।

"তোমার শরীর ভালো আছে?—খারাপ হবে না ত, লেখা?" অসংলগ্ন প্রশ্ন করল উৎপল।

"না ত! কেন?"

"আমার ভয় করছে!"

"ওঃ। তা ভয় কিসের?"

"একটা কিছু হলে কি মনে করবে সুকুমার—বৌদিও বা কি ভাব্‌বে!" উৎপলের স্বরটা করুণ শোনাল।

"কি ভাব্‌বে আবার!"

"নিশ্চয়ই একটা খারাপ ধারণা হবে। আমার খুবই খারাপ লাগছে ভাব্‌তে।"

"কিছু হলে ত!"

"যদি হয়?"

"হলে আর তুমি কি করতে পার?"

"কিছু করতে পারিনে—তাই ত ভয়।"

চুপ করে গেল উৎপল—সুলেখাও চুপ করে রইল। বিশ্রী হয়ে উঠ্‌তে লাগল আবহাওয়াটা। সুলেখার মুখের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে গেছে উৎপল—মাথা নীচু করে বিমর্ষতায় যেন সে ডুবে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। সুলেখা কথা বল্‌তে পারছিল না—সন্দেহের ছায়া থেকে মুক্তি পেতে প্রাণপণ করছিল তারও মন।

"বিচ্ছিরি মেয়েদের শরীর—তাই বল্‌ছিলাম। দুর্ব্বলতার ক্ষমা নেই এই শরীরের কাছে!" উৎপলের ফাউণ্টেন-পেনটা নিয়ে টেবিলের উপর আঁকি-বুকি করতে করতে বল্‌ল সুলেখা—তারপর অসহায়ের মতো চোখ তুলে তাকাল উৎপলের দিকে। উৎপলের মুখ আরো অসহায়। দেখে দুঃখ হয়। যেন অপরাধের ক্ষমা পাবার জন্যে উৎপল প্রার্থনা করছে তেত্রিশ কোটি দেবতার কাছে। চোখ সরিয়ে নিলে সুলেখা। কি এমন অপরাধ করেছে উৎপলদা—কি এমন ভীষণ অন্যায়—যার জন্য অনুতাপে শুকিয়ে উঠতে হবে?

"কি এত চিন্তা করছ উৎপলদা—"

সুলেখার কথায় চম্‌কে উঠে' অভিভূতের মতো তাকিয়ে রইল উৎপল।

"যদি কিছু হয়ই—আমাদের তা স্বীকার করবার সাহস আছে !"

সুলেখার কথা শুনে উৎপল কথা বল্‌তে পারল না।

তারপর যেদিন উৎপলের সঙ্গে দেখা, সুলেখা চোখেমুখে আশঙ্কা নিয়ে বল্‌লে : "এ কী তোমার চেহারা হয়েছে, উৎপলদা ?"

"খারাপ হয়েছে ?" চেষ্টা করে উৎপল একটু হাস্‌তে চাইলে।

"একদিনও আমাদের বাড়ি যাচ্ছ না—বৌদি বল্‌ছিলেন।"

"সময় পাচ্ছি না—মোটেও সময় করে ওঠা যায় না।" এ কথা ক'টি বল্‌তেও চেষ্টা করতে হল।

"চাকরি ছেড়ে দিয়েছি উৎপলদা—মাষ্টারি—" একটা অদ্ভুত উল্লাস নিয়ে বল্‌লে সুলেখা। উৎপল খুব উৎসাহিত হল না।

"নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবে—পুরুষের গলগ্রহ হয়ে থাক্‌বে না এ ইচ্ছা নিয়েই ত মেয়েরা রোজগার করতে যায় ? মেয়েদের মনের এই মুক্তিকামনা মাষ্টারিতে গিয়ে বাঁচ্‌তে পারে ভাবো ? কখখনো না। সেখানে কর্ত্তৃপক্ষ পুরুষ —তাদের ইচ্ছায় অনিচ্ছায়ই মাষ্টারদের চল্‌তে হয়। ঘরে থাকা তার চেয়ে অনেক ভালো—বাপমাভাইদের মুখে সমাজের শাসানিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না—কিন্তু মাষ্টারি করতে গিয়ে দেখ্‌বে চারদিক থেকে সনাতনী সমাজ মুখ খিঁচোচ্ছে।" এ ধরণের কথা বল্‌তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সুলেখার চোখ। অনেক দিন সে-উজ্জ্বলতায় উৎপলের মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আজ আর ওসব কথার কোনো সবেগ, সতেজ মানে খুঁজে পেলনা উৎপল। বাইরে থেকে যত অসাধারণই মনে হোক সুলেখাকে, দেহের দিক থেকে সাধারণ মেয়ের চেয়ে এক তিল উঁচুতেও ত উঠ্‌তে সে পারবে না। উঁচু কথা অনেক বলেছে তারা, উঁচু আদর্শের অনেক আকাশ-কুসুম তৈরী করেছে—কিন্তু মেয়ে-পুরুষের আদিম ঘনিষ্ঠতার আদিম ফল থেকে অন্য রকম ফল ত হবে না তাদের ঘনিষ্ঠতায়। উৎপল নিজেকে ক্ষমা করে' ক্রমেই সুলেখার শরীরকে অপরাধী করে তুল্‌ছিল। সেই সঙ্গেই মনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সন্দেহের ছায়া, সুলেখা মাষ্টারি ছেড়ে দিয়েছে ! কেন ? ভালো লাগে না বলেই কি ? অন্য কারণও ত থাক্‌তে পারে। হয়ত শরীরই তার কারণ। কিন্তু কথাটা সুলেখাকে জিজ্ঞেস করবার সাহস নেই উৎপলের। সুলেখার কাছে নিজের দুর্ব্বল মনের পরিচয় দেবার সাহস নেই।

"বেরুবে আজ, উৎপলদা—ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে অনেক দূর ? বার

করতে বলো না গাড়িটা—" উৎপল যে অনেকক্ষণ চুপ করে আছে সে খেয়ালই ছিল না সুলেখার।

"ড্রাইভার ত নেই।"

এ-ধরণের উত্তরে আহত হতে পারত সুলেখা। হয়ত অন্য কোনো দিন উৎপলের মুখে একথা শুন্‌লে—অন্তত অনেকক্ষণ সে গম্ভীর হয়ে থাক্‌ত। কিন্তু মনে হ'ল সুলেখার, সেদিনকার রাত্রির সে-ঘটনার সঙ্কোচ উৎপলদা কিছুতেই মুছে ফেল্‌তে পারছে না, কিছুতেই নিজেকে স্বাভাবিকতায় টেনে তুল্‌তে পারছে না। তাই বাইরে একটু বেড়িয়ে হাল্কা হয়ে আসা আরো দরকার। ড্রাইভার নেই ত কি হয়েছে?

"বাঃ রে তুমি বুঝি আর চালাতে পার না?"

অনিচ্ছাকে আর উগ্র করে তোলা যায় না। উৎপল অনিচ্ছুক হাসিতে মুখটা করুণ করে বল্‌লে: "চলো—"

শেষে বৌদি একদিন বলে বস্‌লেন: "উৎপলবাবুও আমাদের এখানে আসা ছেড়ে দিলেন—তুমিও মাষ্টারি ছাড়লে, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই কাকতালীয় নয়?"

হেসে লুটিয়ে পড়বার উদ্যোগ করছিলেন বৌদি—যা তাঁর অভ্যাস। কিন্তু ফিজিক্সের একটা মোটা বই থেকে চোখ তুলে এম্নি দৃষ্টিতে তাকাল সুলেখা যে হাসির জন্যে বৌদির মুখে অনুশোচনা ফুটে উঠ্‌ল।

"মাষ্টারি সত্যি ছেড়ে দিলে, না?" বৌদি কথার ভঙ্গীটাও পাল্টে দিলেন।

সুলেখার দয়া হল। হেসে বল্‌লে: "হুঁ। গাধা বনে যাবার ভয় হল।"

খানিকটা আশ্বাস পেয়ে দুঃসাহস করলেন বৌদি: "তারপর এবার?"

"পড়ব। সায়ান্স পড়ব।"

"ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্?"

"ইন্সিওরেন্সের লাইন ভালো লাগ্‌লে তা-ও পড়ব।"

"ভালো লাগ্‌বে!" এবার বৌদি হেসে সত্যি লুটিয়ে পড়লেন।

সুলেখা গম্ভীর হয়ে বই-এর উপর চোখ ফিরিয়ে আনলে। কিন্তু ততটুকুই বৌদির যথেষ্ট। সুলেখাকে নিয়ে একটু হাস্‌তে পারলেই তিনি খুসী।

বই-এ চোখ এনেছিল সুলেখা শুধু বৌদিকে তাড়াবার জন্যে। পড়া আর এখন হবে না। মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। বৌদি মনে করিয়ে দিয়ে গেলেন উৎপলের কথা। উৎপলকে দশপাঁচজন পুরুষের মতো ভেবে নিতে এখনও কষ্ট

হয় সুলেখার। একটু স্বতন্ত্র, একটু অসাধারণ নিশ্চয়ই সে ছিল। নইলে কিছুতেই সুলেখার ভালো লাগতনা তাকে। শুধু ভালো লাগাই নয়, উৎপলের কাছে গেলে সে যেন অন্য রকম হয়ে যেত—সবার কাছে সে যে-রকম তা থেকে স্বতন্ত্র একটা মানুষ যেন। এরই নাম হয়ত ভালোবাসা। সুলেখা যাকে ভালোবাস্‌তে পারে কি করে সে সাধারণ মানুষের মতো হয়? সাধারণ মানুষের মতোই ভীরু! শুধু ভীরু নয়, হয়ত স্বার্থপরও। সুলেখাকে না জানিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার কি কৈফিয়ৎ দিতে পারে উৎপল? অফিসের কাজ? হঠাৎ যেতে হয়েছে? কিন্তু সুলেখাকে জানিয়ে যাবার সময়ই হল না এমন কোনো অসাধারণ ঘটনা ঘট্‌তেই পারে না। একে পালিয়ে যাওয়াই বলে। উৎপল পালিয়েছে। কথার হাত থেকে, অপমানের হাত থেকে মুখ ঢাক্‌তে চায় সে। যদি কিছু হয়ই সুলেখার, সুলেখার পাশে দাঁড়িয়ে তা স্বীকার করে নেবার সাহস তার নেই। আশঙ্কায় মুমূর্ষু হয়ে উঠেছে উৎপল। মিথ্যা আশঙ্কায়। একটা মিথ্যা সন্দেহকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এত বড় করে তুলেছে সে যা এখন তার চোখের উপর বিভীষিকার মতো। এ বিভীষিকা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে পুরুষরা মেয়েদের খুনও করতে পারে। উৎপল সুলেখাকে খুন না করে পালিয়ে বাঁচতে চায়। একই কথা। নিজেকে বাঁচাবার আগ্রহ এত, ভয়টা যে মিথ্যা তাও চোখ মেলে দেখবার সময় হল না উৎপলের। খুনীদের চেয়েও ভীরু সে।

কপালের রগ দপ্‌দপ্‌ করতে থাকে সুলেখার। মনে পড়ে, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর গাড়িতে উৎপলের রক্তহীন মুখ। ফ্যাকাসে, মরা মুখ। মরে গিয়ে সে-মুখ সুলেখার কাছে পর হয়ে গেছে। মন থেকে এখন তা কেবল মুছে যেতেই সুরু করবে। তার জন্যে সুলেখা তৈরী।

এক মাস পর। সুকুমার বলে: "সায়ান্স যদি পড়িস্‌ই তাহলে মাষ্টার রেখে দি। ও-সাবজেক্ট নিজে-নিজে পড়া যায় না।"

"এম্নিতেই বেকার বসে থেকে তোমার খরচান্ত করছি—মাষ্টারের আর দরকার নেই!" সুলেখা হাস্‌তে থাকে।

"খুব হিসেবী হয়েছিস্‌,—না? তিনমাস মাষ্টারি করেই এত লাফঝাঁপ?"

"হিসেবী মানে? তুমি কি চাও, চিরকাল তোমার উপর বোঝা হয়ে থাকি?"

"আমি যা-ই চাই, তোর বড় বড় কথা শুনতে চাইনে।" হাত তুলে

সুকুমার সুলেখাকে থামিয়ে দিতে চাইলে: "মাষ্টারের দরকার থাকে ত বল্। আমার এক বন্ধু আছে ফিজিক্সে ফার্ষ্ট ক্লাশ,—বলি তাহলে আস্‌তে।"

"তোমার বন্ধু? থাক্।" কথাটা বলেই সুলেখা কেমন একটু বিপন্ন হয়ে গেল—তাই আবার তাড়াতাড়ি বল্‌তে সুরু করলে: "অতবড় দিগ্‌গজ পণ্ডিত দিয়ে আমি কি করব? আমি পড়ছি অ-আ, ক-খ।"

"অ-আ ক-খটাই পণ্ডিতের কাছে পড়তে হয়। নিজে পণ্ডিত হয়ে উঠলে তখন আর পণ্ডিতের দরকার হয় না।"

"বেশ উৎপাত সুরু করেছ ত তুমি—" সুলেখা সুকুমারকে শাসন করতে চাইল: "তোমার উৎপাতে আমায় পড়া ছাড়তে হবে দেখছি!"

"তা মন্দ নয়—" সুকুমার ঠোঁটে হাসি চেপে বল্‌লে: "মেয়েদের বেশি পড়াশুনো করতে নেই।"

"তা কি আর জানিনে? আই-এস্-সি পড়তে দিলে না মনে নেই—পাছে এম্-এস্-সি পর্য্যন্ত যেতে চাই সেই ভয়ে!"

"তাছাড়াও আরেকটা ভয় ছিল। পাছে শরীরটা টেষ্ট্-টিউবের মতো হয়ে ওঠে!"

"পড়াশুনো না করে রান্নাঘরে তোমাদের সমাজের মেয়েরা ত শশীকলার মতো দিনেদিনে পুষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে—না?"

"ওটা রান্নাঘরের দোষ নয়—ওদের নিজেদের দোষ! যা রান্না করে ওরা তা খায় না! এমন সুযোগ থাক্‌লে চুরি করে খেয়ে আমি মোটা হয়ে যেতুম।"

দুজনেই জোরে জোরে হেসে উঠ্‌ল। বৌদি এসে ঘরে ঢুক্‌লেন—মনে হল ভাইবোনের হাসিতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়েই তিনি উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু তা নয়। তাঁর পেছনে একটি বিস্ময় ছিল। অনেকদিন পর উৎপলের আবির্ভাব হয়েছে।

"আরে—" সুকুমার প্রায় চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, সজোর হাসির রেশটা গলায় ছিল বলেই চেঁচিয়ে উঠ্‌ল: "কোথায় ছিলি অ্যাদ্দিন—"

"কোম্পানীর ভ্রাম্যমান চাকর আমরা, তোমাদের মতো স্থিতিশীল গৃহ-দেবতা ত নই!" খুব সহজভাবে কথাটা বল্‌তে গিয়েও একটু নাটকীয় ভঙ্গী এসে গেল উৎপলের গলায়।

"যতদিন আসেন নি, ওয়ার্ল্ড টুরে-ও তত সময় লাগে না!" বৌদি রসিকতায় মন দিলেন, তারপরই একটু সূক্ষ্ম পরিহাস করতে ইচ্ছা হল তাঁর: "অবিশ্যি না এসেও যদি ক্ষতি না হয়, তাহলে কে-ই বা আস্‌তে চায়!"

সুকুমার একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল—উৎপল ঝাঁপিয়ে পড়ল কথাটার উপর : "না, না-তা কেন ? সত্যি, বাইরেই ছিলাম এতদিন। অপিসের কাজ—"

চুপ করে বেরিয়ে গেল সুলেখা ঘর থেকে। কথার মাঝখানে থেমে যাওয়া যায় না, উৎপল তাই কথাটা শেষ করতে চাইল সুলেখার যাবার পরও—কিন্তু বলার ভঙ্গী স্তিমিত হয়ে এলো অনেক : "এখানে থাক্‌লেও বা কি—দিনরাত্তির ছুটোছুটি করে ত রুটির যোগাড় হয়—সময় কোথায় বলুন !"

বৌদি ম্লান হয়ে গেলেন—উৎপলের কথার ভঙ্গীতে নয়, সুলেখার যাবার ভঙ্গীতে। সুকুমারের এত কিছু লক্ষ্য করবার দরকার নেই। উৎপলের সঙ্গে কথায় জমে উঠ্‌তে চাইল সে—অফিস-নীতি থেকে রাষ্ট্রনীতি, এবং যুদ্ধ-রীতি থেকে সিনেমা-রীতি-তে উঠা-নামা করে চল্‌ল তার কথার পর্দ্দা। উৎপল বারবার অন্যমনস্ক হয়ে শেষ পর্য্যন্ত যখন সুকুমারকে বিদায় করতে পারল, তখনও সুলেখার দেখা নাই। অগত্যা খুঁজে বার করতে হল সুলেখাকে। সঙ্কুচিত হয়েই জিজ্ঞাসা করল উৎপল : "ভালো আছ ?"

"খারাপ থাক্‌বার ত কথা ছিল না !" নিরুত্তাপ, নিরুত্তেজ গলায় বল্‌লে সুলেখা।

নিজেকে অপমানিত মনে করতে পার্‌ত উৎপল, কিন্তু তা করলে না : "শরীরের কথা বল্‌ছিলুম।"

"আমার অসুখ করেছিল বলে ত মনে পড়ে না।"

"আমার ভয় ছিল—"

"আমার সম্বন্ধে আপনার ভয় করবার কি খুব দরকার আছে ?"

"ওঃ" মুখ বুজে নিল উৎপল।

সুলেখা দাঁড়িয়ে রইল—আবেগের কোনো রেখা নেই মুখে। বিদ্বেষে ঠোঁটের রেখা বিকৃত নয়, আনন্দে উজ্জ্বল নয় চোখ। কিন্তু পাথরের মূর্ত্তি বলে ভুল করা তাকে চলে না। উৎপল কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে আনায়াসে তার উত্তর দিতে পারে সুলেখা। কিন্তু বলবার মতো কথা উৎপলের আর ছিল না। অসহায়ের মতো চারদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে ঠোঁটে একটু করুণ হাসি মাত্র ফুটিয়ে তুল্‌তে পারল সে—কথা বল্‌তে পারল না।

গলি থেকে গাড়িটা বার করে নিতে কষ্ট হয়—ব্ল্যাক আউটের রাত বলে নয়, গলিটা সরু বলে। তবু এই শেষ কষ্ট—উৎপল ভাব ছিল।

অদ্ভুত হাল্কা হয়ে উঠ্‌ছিল সুলেখা দিন-দিন। গ্রন্থকীট প্রজাপতি হয়ে উড়ল। ওর কথায়, গল্পে আর গানে তিষ্ঠোবার উপায় নেই কারো। বৌদি ছাড়া পেলে দাদা, হাতের কাছে দাদা না থাক্‌লে কানু, নাটাই নিয়ে কানু ছাতে গেল ত বাচ্চা মেয়ে মীনুকে নিয়েই কথায় জমে গেল সুলেখা। বৌদি শঙ্কিত হলেন। উৎপলের সঙ্গে সুলেখার সেদিনকার ব্যবহার ভুলে যাবার মতো নয়। মনান্তর এদের কেন হল? সাধারণ ছেলেমেয়েদের মতো ত এরা নয়! তবে? সুলেখাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করতেও সাহস হচ্ছিল না তাঁর। বৌদির সঙ্গে হাজার রকম কথাইত বলে সুলেখা, কিন্তু কোনো কথায় এমন সুযোগ আসে না, যাতে উৎগলের কথা জিজ্ঞেস করা যায়। তবু বৌদি আশায় থাকেন। কোনো সময় সুযোগ হয়ত একটা মিল্‌বেই।

বৌদি সে সুযোগের খোঁজেই কথা পাড়েন: "পড়াশুনো সব পাটে উঠ্‌ল?"

"রোজগার করব এবার। পড়াশুনা বড়লোকেরই ভূষণ, গরীবের পোষায় না।" সুলেখা ঘাড় দোলায়।

"বড়লোক হলেই ত হয়—দেরি কেন?"

"রোজগার করে তা-ই হ'ব ভাব্‌ছি।"

"উৎপলের টাকাগুলো কি সব অচল? তা দিয়ে বড়লোক হওয়া যায় না?"

"কেন যাবে না? আমি কি বলেছি তিনি বড়লোক নন?"

"আর উৎপলও কি বলেছে তোমায় রোজগার করে বড়লোক হতে?"

সুলেখা খিলখিল করে হেসে উঠ্‌ল: "তুমি ত বৌদি কোনদিন মাষ্টারি করোনি, তাহলে এত বোকা হলে কি করে? ও ভদ্রলোক আমায় বড়লোক হতে কেন অনুরোধ করবেন?"

"বড়লোক হ'তে অনুরোধ না করুন—অন্যকিছু হ'তে ত অনুরোধ করেছেন?"

"মনে ত পড়ছে না।"

"মনটা হঠাৎ এমন বিগড়ে দাঁড়াল কেন?"

"কই, না ত!" মসৃণ হাসিতে সুলেখা স্বাভাবিক দেখাতে চায়।

"সবার মতো তোমরাও ছেলেমানুষি করবে?" বৌদির মুখ ম্লান হয়ে ওঠে।

"তার মানে?"

"তার মানে তোমরা ঝগড়া করেছ।"

"ঝগড়া ?" বৌদির ধরণেই সুলেখা হেসে লুটিয়ে পড়্ল : "কে ঝগড়া করেছে ? কী সব আবোল-তাবোল বল্ছ তুমি ?"

"উৎপলকে তুমি অপমান করলে সেদিন—একটা কথা পর্য্যন্ত বল্লে না—মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বেচারা—তবু বল্ছ ঝগড়া করনি ?" একটু থেমে নিয়ে বৌদি আবার সুরু করলেন : "শরৎবাবুর নায়িকার পক্ষে হয়ত এ ঝগড়া নয়, কিন্তু তোমরা ত বল শরৎবাবুর নায়িকা তোমরা নও।"

"কথা বলিনি, দরকার ছিল না—তার জন্যে বল্তে হবে ঝগড়া করেছি ?"

"কথা বলার দরকার কোনো দিন হবে আর ?"

"হতে পারে। দরকার হবে এমন গ্যারাণ্টিও তোমায় দিতে পারিনে, দরকার হবে না তেমন দম্ভও করা যায় না।"

বৌদি চুপ করে গেলেন। কিন্তু সুলেখার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। আশ্চর্য্য, সে-মুখ থেকে উৎপল সম্বন্ধে একটু আসক্তি বা অনাসক্তি আবিষ্কার করা যায় না! মেয়ে হয়েও এ মেয়েটিকে আজ যেন বৌদি কিছুতেই চিন্তে পারছেন না। এ যেন বৌদির অভিজ্ঞতার বাইরেকার জিনিষ।

বৌদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাক্তে দেখে সুলেখা একটু হাস্লে, বৌদিও হাস্লেন। কিন্তু কেউ কারো হাসির মানে খুঁজে পেল না

অফিস-কামরায় সুলেখার কার্ডটা হাতে নিয়ে প্রথম চম্কে উঠেছিল উৎপল—মনে হয়েছিল তার সমস্ত প্রতাপ বুঝি ধূলিসাৎ হতে চলেছে। কিন্তু সুলেখা এসে যখন তার সাম্নে দাঁড়াল, স্বাভাবিক গলায়ই সে বল্তে পারল : "বোসো।"

চেয়ারে বসে সুলেখা আর সময় নষ্ট করলে না : "তুমি নিশ্চয়ই ইন্সিওরড্ উৎপলদা—কিন্তু এমন হয়ত নয় যে আর ইন্সিওর করতে পার না। আমি যে কোম্পানী রিপ্রেজেণ্ট করছি, তোমার কোম্পানীর চেয়ে প্রিমিয়াম-রেটে বা বোনাসে তা খারাপ নয়। ইন্সিওরেন্স বাড়াবার যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, একটা প্রোপজেল তুমি সই করতে পার।"

স্বপ্নে কতগুলো কথা শুন্ছে বলেই উৎপলের মনে হচ্ছিল কতক্ষণ—কিন্তু সুলেখাকে সে জানে—বোধ হয় সে-ই একমাত্র চেনে—তা-ই সে অত্যন্ত সহজ সাধারণ প্রশ্ন করলে : "কতদিন এ-কাজ করছ, ক'হাজার বিজ্নেস্ হয়েছে ?"

"হাজার বারো। আধা পরিচিত প্রোপন্যাণ্ট—ফিরায়নি কেউ, হয়ত মেয়ে বলে।"

"ষ্টিক্ করে থাক্‌লে ভালো করতে পারবে।" এন্‌ভেলাপ ওপেনারটা হাতে নিয়ে উৎপল টেবিলে ঠুকতে সুরু করলে।

"তুমি সই করবে একটা? কাগজপত্র পড়ে দেখ্‌তে পার।" হাতের এটা-চির দিকে মনোযোগ দিলে সুলেখা।

"ও-কোম্পানীর কাগজপত্র আমার পড়া আছে।"

"ওঃ। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই পড়া আছে তোমার। দেখেছ ত, কোম্পানী খারাপ নয়।"

"ভালো কোম্পানী।"

"কোম্পানী ভালো না হলে নতুন এজেণ্টদের পক্ষে কাজ করা মুস্কিল।"

"সত্যি তাই।"

"যাক্, তোমার সময় আর নষ্ট করব না। আজ ব্যস্ত থাক্‌লে বলো—আরেকদিন আস্‌ব।"

"কি জানো, আমার পক্ষে সম্ভব হবে না—" টেবিল-গ্লাসের উপর সুলেখার ছায়াটাকে লক্ষ্য করে বল্‌লে উৎপল।

"আচ্ছা—" টেবিল-গ্লাস থেকে সুলেখার ছায়া সরে গেল—উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

"আমাদের রাইভ্যাল কন্‌সার্ন কিনা—"

"সত্যি তাই।" পুশ্-ডোরে ছোট্ট হাল্কা একটু আওয়াজ হল।

বাইরে এসে এতো ভালো লাগ্‌ছিল সুলেখার! এই প্রথম, যেখানে সে মেয়ে বলে খাতির পায় নি।

আধুনিক সাহিত্য

কিছুদিন আগে প্রাভদা পত্রিকা আমেরিকার অন্যতম প্রখ্যাত ব্যক্তি মিষ্টার ওয়েণ্ডেল উইল্‌কিকে বেশ কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিল। সোভিয়েট রুশিয়া সম্পর্কে মিষ্টার উইল্‌কির অভিমতটাই প্রাভ্‌দা পত্রিকার উষ্মার কারণ। লোকের স্বাভাবিক কৌতুহল হতে পারে, মিষ্টার উইল্‌কি কী এমন বিরুদ্ধ কথা বলেছেন যার জন্য সোভিয়েট রুশিয়ার মুখপত্র ক্ষুব্ধ হতে পারে?

সম্প্রতি মার্শাল স্টালিন একখানা এবং মিষ্টার উইল্‌কি একখানা বই লিখেছেন। এই দুই বইয়ের মধ্যে কোন্ বই কত লক্ষ বিক্রী হয়ে গেছে, দৈনিক সংবাদপত্রে এই রকম একটা খবরের রেষারেষি আমরা লক্ষ্য করেছি। এটা কোন 'গুরুত্বপূর্ণ' ঘটনা নয়; তবু এর মধ্যেও যেন কিছুটা রহস্যের আমোদ রয়ে গেছে। আমেরিকা সম্বন্ধে তবে কি সোভিয়েট রুশের মনের গহনে নিগূঢ় কোন প্রতিবাদ রয়ে গেছে? অবশ্য মাঝে মাঝে এক একটা সংবাদে এই মনোদ্বন্দ্বের আভাস স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

বর্ত্তমানে মিত্রপক্ষ যে যুদ্ধ করছেন, তাকে 'জনযুদ্ধ' আখ্যা দিয়েছেন সবার প্রথম আমেরিকা। ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ওয়ালেস সবার আগে এই 'জনযুদ্ধ' তত্ত্বের ঘোষণা করেছিলেন। তারপরেই আমাদের ব্রিটিশ কম্যুনিষ্টদের সৌজন্যে আমরা শুনলাম—সত্যিই এ-যুদ্ধ জনযুদ্ধ। নিরীহ ভারত-বাসী হিসাবে আমাদের কাছে এই তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব আরও দুর্বোধ্য এবং আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে। আমেরিকা বলতে চায়, যেহেতু এই যুদ্ধে আমেরিকা যোগ দিয়েছে, সেই হেতু এই যুদ্ধ জনযুদ্ধ। ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট বলতে চায়, যেহেতু সোভিয়েট রুশিয়া যুদ্ধে যোগ দিয়েছে, সেই হেতু এ যুদ্ধ 'জনযুদ্ধ'। একটা অগুরুত্বপূর্ণ সামান্য কথার দাবী নিয়েই সোভিয়েট রুশিয়া বনাম আমেরিকার এই খ্যাতিগত দ্বন্দ্বটাও আমাদের কেমন একটু বিস্মিত করে তোলে।

মিষ্টার উইল্‌কি সম্প্রতি পৃথিবী ঘুরে এসে যে বই লিখেছেন, তার মধ্যে সোভিয়েট রুশের প্রশংসাটাই আগে চোখে পড়ে। পাতায় পাতায় প্রশংসা। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে, এই প্রশংসার আড়ালে সূক্ষ্ম একটা নিন্দার অন্তঃস্রোত রয়ে গেছে। সোভিয়েট রুশিয়ার কারখানাগুলি দেখে মিষ্টার উইল্‌কির মনে শুধু তাঁর দেশের ত্রিশ বছর আগের অর্দ্ধগ্রাম্য ও অনুন্নত কলকব্জা ও ইঞ্জিনগুলির কথা মনে পড়ে। সোভিয়েট রুশিয়ার আধুনিক একটা সড়ক দেখে তাঁর দেশের ত্রিশ বছরের আগের এব্‌ড়ো থেব্‌ড়ো গেঁয়ো রাস্তাগুলির কথা মনে পড়ে।

মিষ্টার উইল্‌কি তাঁর বক্তব্যের প্রসঙ্গে এই ধরনের শ্লথ উক্তি করেছেন, যা তাঁর পক্ষে আদৌ শোভন হয়নি। বর্ত্তমান যুদ্ধরত সোভিয়েট রুশিয়ার উৎপাদন ও সামরিক সংগঠনের যে ছবি মিষ্টার উইল্‌কি এঁকেছেন তার মধ্যে তাঁর মনের বিরূপতার দিকটাই সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠেছে। মোটের ওপর আমেরিকার সাংস্কৃতিক প্রাধান্য প্রচারের আবেগে মিষ্টার উইল্‌কি মাঝে মাঝে নির্লজ্জভাবে যুক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। তাঁর সব শ্লেষোক্তি চরম হয়ে উঠেছে এবং নিজেকে বেফাস ব্যক্ত করে ফেলেছেন দুটী প্রাঞ্জল লাইনের মধ্যে—The best answer to communism is a living, vibrant, fearless democracy—economic, social and political।

এই নির্ভীক গণতন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের মনে একটু সংশয় ও আতঙ্ক না এসে পারে না, মিষ্টার উইল্‌কি যত মিষ্টি ভাষায় তা বোঝাতে চেষ্টা করুন না কেন!

এই ভাবে টেক্কা দেবার রোগটা আমেরিকার মনে সম্প্রতি প্রবল হয়ে উঠেছে। আমেরিকার—কম্যুনিষ্ট নেতা আর্ল ব্রাউডারের মুখে সম্প্রতি একটী চমৎকার সাম্যবাদের ভাষ্য আমরা শুনতে পেয়েছি—'সাম্যবাদের সঙ্গে ধনতন্ত্রের বিরোধ নেই। সব দেশে ধনতন্ত্রকে একটু ঘসে ঝকঝকে করে তুলতে পারলেই পৃথিবীতে সাম্যবাদ আসবে।' মিষ্টার উইল্‌কি তবু 'গণতন্ত্রকে' ঘসামাজা করতে চেয়েছেন, কম্যুনিষ্ট ব্রাউডার আর এক কাঠি ওপরে—তিনি ধনতন্ত্রকেই ঢেলে সাজতে চান।

এতক্ষণ শুধু মিষ্টার উইল্‌কির অভিমতের দোষের দিকটাই বলা হলো। এই দিকটা বাদ দিলে, মিষ্টার উইল্‌কির অভিমতের একটা খুবই যুক্তিপূর্ণ প্রশংসনীয় ও বলিষ্ঠ দিক আছে।

এ যুদ্ধের লক্ষ্য কি? মিষ্টার উইলকি অভিযোগ তুলেছেন যে, এ বিষয়ে মিত্রপক্ষের যুদ্ধের আদর্শের ভাবের ঘরে চুরি আছে। যুদ্ধের ঘোষিত আদর্শের মধ্যে বহু ফাঁকি ও অস্পষ্টতা রন্ধ্রে গেছে এবং ঘোষিত নীতির সঙ্গে যুদ্ধপন্থারও মিল নাই।

এই এলোমেলো লক্ষ্য, সাময়িক সামরিক সুবিধার জন্য বৃহত্তর আদর্শকে খর্ব্ব করা, আদর্শ সম্বন্ধে ঐক্যের অভাব, কলোনিবাসীদের মুক্তি সম্বন্ধে নীরবতা—এই সব কারণেই মিত্রপক্ষের যুদ্ধপ্রচেষ্টার মধ্যে এক অহিতের বীজ লুকিয়ে আছে।

ভারত ও চীন সম্বন্ধে মিষ্টার উইল্‌কি নিঃসংশয় উদার বিচার করেছেন, ভারতের জাতীয় মুক্তি পৃথিবীর সবার কাছে কত বড় প্রশ্ন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মিষ্টার উইল্‌কির লেখায়—

From Africa to Alaska men and women asked me the question which has become almost a symbol all through Asia: What about India?

মিন্‌হাজ

One World by Wendell Wilkie. Cassel & Company, Ltd., London.

সঙ্গীত

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আধুনিক বাংলা গানে তফাৎ

'আধুনিক বাংলা গান' পদবাচ্য গান 'রবীন্দ্রসঙ্গীত'কে কাঠামো ক'রে গ'ড়ে উঠেছে একথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, কিন্তু তাদের ভেতরকার তফাৎটা তলিয়ে দেখি না। 'আধুনিক বাংলা গান' নিঃসন্দেহে একটি নতুন আন্দোলন; রবীন্দ্রসঙ্গীত তার ভিত্তি হ'তে পারে কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে তার সৌসাদৃশ্য যতোটা, পার্থক্য তার চাইতে ঢের বেশি। সেই পার্থক্যবিচারই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

কবির প্রথম জীবনে রচিত ধ্রুপদ, ধ্রুপদপ্রভাবান্বিত গান, ভাঙা খেয়াল, বিদেশী-সুরের গানগুলোকে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে'র পর্যায়ভুক্ত করা সঙ্গত হবে না। কেন না, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' নামধেয় গানগুলো মুখ্যত কবির পঞ্চাশোত্তর বয়সের রচনা—তার রঙ রস রূপ এতোই আলাদা যে কবির প্রথম অধ্যায়ের গানগুলোর সঙ্গে চেষ্টা ক'রেও তাকে এক করা চলে না। কবির পরিণত জীবনের গানগুলোকেই এক্ষেত্রে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' বলে ধরা হবে সেকথা বলাই বাহুল্য।

আধুনিক বাংলা গানের সৃষ্টি হয়েছে ইদানীংকার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সুরকার ও গায়কের সমবেত প্রচেষ্টায়। রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনবোধে একই গানে বিভিন্ন সুর মেশাতেন। সেই আদর্শের প্রভাব অজ্ঞাতসারে আধুনিক সুরকারদের ওপর কাজ ক'রে থাক্‌বে, কিন্তু নিঃসন্দেহে আধুনিক বাংলা গানের মূল প্রেরণা এসেছে হিন্দুস্থানী গানের পদ্ধতি থেকে। যে কোনো আধুনিক বাংলা গান শুনলেই একথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। তার ভঙ্গি, রূপ ও রস রবীন্দ্রসঙ্গীতের থেকে কতোই না আলাদা! সুরযোজনার ভঙ্গিতে যদি বা কিছু মিল দেখা যায়, প্রকাশভঙ্গি একেবারেই পরস্পরবিরোধী। সেই তারতম্যের বিচারই আপাতত আমাদের লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত একটি সুরের আশ্রয়েই একটি গান খাড়া করতেন। যেটা ভীমপলশ্রীর গান তাতে আগাগোড়াই ভীমপলশ্রীর আমেজ থাকৃত; যেটা ভৈরবী সুরের গান তাতে ভৈরবীর আমেজটিই ছিল প্রধান। পিলু সুরের গান মুখ্যত পিলু সুরটিকেই লীলায়িত করতে চাইত। কবি তবে কি সুরের মিশ্রণের পক্ষপাতী ছিলেন না? ছিলেন, তবে তিনি যেভাবে সুরের মিশাল দিতেন তাতে কোনোকিছুই স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ ছিলো না, সবটা প্রক্রিয়াই আড়ালে আড়ালে চল্‌তো।

আধুনিক বাংলা গানে ঠিক তার উল্টো। এখানে মিশ্রণটা নির্লজ্জভাবে অবারিত—যেন চোখে (কানে) এসে লাগে। যে কোনো আধুনিক বাংলা গানে 'অন্তরা' থেকে 'সঞ্চারী'তে আস্‌তে সুর যেভাবে বদ্‌লে যায় তাতে সুরের মিশ্রণটা প্রকট না হ'য়েই পারে না। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতে এই মিশ্রণ ফল্গুধারার মতো আড়ালে আড়ালে চলে—সর্বদাই তার গতি লোকচক্ষুর অগোচর। আধুনিক বাংলা গানে কিন্তু এই মিশ্রণ বরাবরই নিজেকে জানান দিয়ে যাচ্ছে—

যে গায় অথবা যে শোনে দুইই সে সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন থাকে। এই বিশ্লেষণাত্মক চেতনা ভাবপ্রকাশের প্রতিবন্ধক, সুতরাং অশ্রদ্ধেয়।

তারপর আরেকটি তফাৎ এই যে কবি গানের সুরে সমপ্রকৃতির রাগের মধ্যেই শুধু মিশ্রণ পছন্দ করতেন—একটি অসম রাগের সঙ্গে আরেকটি অসম রাগের মিশ্রণ কখনই সমর্থন করতেন না। তিনি মনে করতেন ভীমপলশ্রীর সঙ্গে বড়ো জোর সমজাতীয় খাম্বাজ, পিলু, কাফি, পটদীপ, ধানী, ধানেশ্রী প্রভৃতি সুরের মিশ্রণ চল্‌তে পারে কিন্তু ভীমপলশ্রীর সঙ্গে পুরিয়া অথবা মল্লার জাতীয় রাগিণীর সঙ্গে পুর্বী-মার্বা জাতীয় রাগিণীর মিশ্রণ কখনই নয়।

এ বিষয়ে আধুনিক সুরকাররা নিরঙ্কুশ। নির্বিচারে এঁরা রাগিণীর মিশ্রণ চালান, রাগিণীগুলোর মধ্যে গোত্রসম্বন্ধ আছে কিনা তার বড়ো একটা বাছবিচার করেন না। তাঁরা যে 'ঠাট' প্রকরণ জানেন না এমন নয়, কিন্তু এইপ্রকার মিশ্রণকে তাঁরা খুব দোষাবহ মনে করেন না। যেমন ধরুন, 'দেশ'-এর ঠিক পরেই 'বাগেশ্রী' কিম্বা 'পুরিয়া', 'ভৈরবী'র ঠিক গায়েই 'বেহাগের' খোঁচ—এরকম মিশ্রণ আধুনিক বাংলা গানে আজকাল হামেসাই চল্‌ছে। এটা নিন্দনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু কেউ সেটা দেখেও দেখছেন না অথবা দেখলেও তার প্রতিকার সাধনে যত্ন নিচ্ছেন না।

কয়েকটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। যেমন ধরুন কবির প্রসিদ্ধ 'দিনশেষে রাঙা মুকুল' গানটি। আগাগোড়া পুরবী সুরের একটা নিঃসাড় প্রবাহ যেন এর ভেতর দিয়ে ব'য়ে চলেছে। অবশ্য এই পুরবী সুর আর মার্গসঙ্গীতকথিত পুরবী সুর এক নয়, তাহ'লেও বাংলাদেশে কবিপ্রযুক্ত সুরটিই সাধারণত পুরবী সুর নামে প্রচলিত। কিম্বা কবির সর্বশেষ রচনা 'সম্মুখে শান্তি পারাবার' গানটির কথাই ধরা যাক্। সেখানেও একই পুরবী সুরের লীলা। একটু পুরিয়া-ধানেশ্রীর আমেজ হয়ত আছে—কিম্বা দুটো একটা ভিন্ন সুরের খোঁচ—কিন্তু সেসব মূল সুরের সঙ্গে চমৎকার মিশ খাইয়ে গেছে। ছোটো ছোটো স্রোতের ধারা যেমন ক'রে বড় নদীর ধারাতে এসে নিঃশেষে বিলীন হ'য়ে যায়। অথবা তাঁর বাউল গানগুলো নিন। যেমন ধরুন 'সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে,' 'কবে তুমি আস্‌বে ব'লে' অথবা 'আজি কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে' প্রভৃতি। সবগুলো গানেই মুখ্যত বাউল সুরের ঝিলিমিলি—তাতে অন্য সুরের প্রভাব যে নেই তা নয়, তবে মূল রসটি বাউলের। 'হে ক্ষণিকের অতিথি' অথবা 'কী মায়া লাগ্‌লো চোখে' প্রভৃতি গানগুলোতে তেমনি মূল ভাবটি হ'লো ভৈরবীর, অন্যান্য মিশ্রিত (যদিও সামান্য) সুরের ভাব মূল ভাবটিতে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে যেন একদেহে লীন হ'য়ে আছে।

কিন্তু আধুনিক বাংলা গানে সুরমিশ্রণের প্রক্রিয়া একেবারেই আলাদা। সেখানে ভোরবেলাকার সুরের সঙ্গে দুপুর বেলার সুরের গলাগলিতে কেউ আপত্তি করে না, এমন কি সাঁজবাতির সুরও প্রয়োজনবোধে (বাণীর তাৎপর্য অনুযায়ী) সকালবেলার সুরের সঙ্গে হাতে হাত মেলাতে পারে। সেখানে গোধূলি আকাশের তারার সঙ্গে শুকতারার দিব্যি হাতছানি চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সুরসাগরের সুর দেওয়া 'নমো নমো বরণীয়' গানটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মূল সুরটি রয়েছে যোগিয়ায়, অথচ দেখুন বাণীর সহিত সঙ্গতি রাখ্‌তে গিয়ে সঞ্চারীর

সুরকে করা হয়েছে পুরবী-ঘেঁষা। এটা সত্যই একটু বিসদৃশ। তারপর কুমার শচীন দেববর্মণ-গীত 'এই মহুয়া বনে' গানটির কথা ধরুন। সেখানে দেশ সুরের ভাবটি প্রবল অথচ সঞ্চারীতে একরকম জোর ক'রেই বাগেশ্রীর আমদানী করা হয়েছে। এই ধরণের মিলনের ফল কখনই ভালো হয় না। সর্বদাই উভয় পক্ষের ভেতর খিটিমিটি লেগে থাকে। চাঁদপুরের কাছে পদ্মা ও মেঘনা একসঙ্গে মিশেও যেমন যে যার ধারা অব্যাহত রেখে চলেছে এ অনেকটা সেইরকম। গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের মতো তা কখনই পরিপূর্ণ মিলনে সার্থক নয়।

এই তো গেলো আধুনিক বাংলা গানের নিন্দার দিক। প্রশংসার দিকও আছে। আর সেটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রাপ্য প্রশংসার চাইতেও অধিক কীর্তনীয়।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে যাকে সুরের স্থায়িত্ব বলে রবীন্দ্রসঙ্গীতে তার একান্ত অসদ্ভাব। গান গাইবার সময় উচ্চাঙ্গের গায়কদের লক্ষ্য থাকে মুদারা অথবা তারার সা পর্দায় এসে সুর যেন স্থায়িত্ব লাভ করে, যেন খরজের সুর সমস্ত ঘরের আবহাওয়ায় গম্‌গম্‌ করে—এককথায় তাঁরা সুরের 'ধুন' সৃষ্টি করতে চান। আধুনিক বাংলা গানের গায়করা তাঁদের কণ্ঠে এই কৌশলটির সফল প্রয়োগ করেছেন দেখা যায়। গানের সুর 'সা'-য়ে ফিরে ফিরে আসে এটা সবাই জানেন কিন্তু আসার সঙ্গে সঙ্গেই যদি তাকে গ্রামান্তরে বিহার করতে দেওয়া হয় তবে সমস্ত সুরের আবহাওয়াটাই মাটি হ'য়ে যায়—মনে কেমন একটা অতৃপ্তির ভাব জাগে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত যাঁরা গান তাঁরা এবিষয়ে পুরোপুরি অবহিত নন ব'লে মনে হয়। তাঁদের কণ্ঠে সুর শুধু পর্দা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, একটি পর্দায় তা অধিকক্ষণ স্থিতিলাভ করে না। আদরের ভঙ্গিতে এ শুধু ঠোঁট বারে বারে স্পর্শ করা, পূর্ণ চুম্বন মুদ্রিত করতে যেন কত সঙ্কোচ! এজন্যে গায়কদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের গঠনের মধ্যেই সেই স্বাধীনতার অভাব।

আরও আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুর বড়ো আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা—ইউরোপীয় সঙ্গীতের ধরণে সেখানে গায়কের মর্যাদা নিতান্তই স্বল্প—সুরকারই সমস্তটা কৃতিত্ব আত্মসাৎ করতে ব্যস্ত। আধুনিক বাংলা গানের গায়কদের স্বাধীন স্পৃহা এবিষয়ে একেবারেই অনর্গল, ইচ্ছা মতো সুরকে লীলায়িত করতে কেউ তাঁদের আট্‌কাচ্ছে না। ইচ্ছা হয় সুরকে টেনে বাড়াও নয় তো তাকে লাগাম ধ'রে টেনে রাখো; ছোটো ছোটো তান অথবা সুরের বিস্তার প্রয়োগ কর,—কেউ তোমাকে বাধা দেবার নেই। কী উজ্জ্বল মুক্তি ভাবুন তো! অবশ্য সীমারেখা কোথাও নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আধুনিক গায়কের পক্ষে সেটা মোটেই ভয়াবহ নয়। বর্তমান সমাজে স্ত্রীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্বের অধিকার প্রায় অপ্রতিহত, তা হ'লেও সময় সময় স্ত্রীর আরোপিত অধীনতাটুকু ভোগ করতে মন্দ লাগে না এ অনেকটা সেই গোছের মধুর পরবশ্যতা—তাতে কারও কৌলীন্য নষ্ট হয় না। কিন্তু রবীন্দ্র-গীতির গায়কেরা সুরকারের হাতের যন্ত্র মাত্র, বড়ো জোর মিঠে সুরের খেলনা বাঁশী। তাদের স্তব্ধ ক'রে রাখা হয়েছে, যতক্ষণ না চাবি টেপা হবে ততক্ষণ আর মুখ খুলতে পারবে না। সুরের ওপর দিয়ে স্বাধীন ইচ্ছার 'ষ্টীম রোলার' চালানো এর থেকে কোন্ অংশে খারাপ তা বুঝতে পারিনে।

নারায়ণ চৌধুরী

সিনেমা

যুদ্ধের আবেষ্টনে বাস করছি বলে অসামরিক জীবনকে আমরা উপেক্ষা করে চল্‌ছি না। অসামরিক জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত থাক্‌লে, সে অবস্থাটা পরোক্ষে যুদ্ধোদ্যমের পক্ষে সহায়ক হয়ে ওঠে। সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক জীবনের সমস্যাগুলো যুদ্ধের কোলাহল-পূর্ণ আয়োজনে চাপা পড়ে যায়নি—সমস্যাগুলো সমস্যা হিসেবে এখনো বর্ত্তমান। কাজেই এসব সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা রণোপকরণ সজ্জিত করবার মতোই প্রয়োজনীয় বলে আমরা মনে করি।

অসামরিক জনসাধারণের খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্যে প্রাদেশিক সরকার যতটা সচেষ্ট, সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য স্থাপনের চেষ্টায় ঠিক ততটাই উদাসীন। সাম্প্রদায়িক প্রীতিবর্দ্ধনের জন্যে বাংলা সরকারের বাজেটে একটা মোটা টাকা বরাদ্দ ছিল, কিন্তু সে টাকাটা খরচ করার কোন উপায় খুঁজে পেলে না এদিকে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এ-টাকাটা খরচ করবার কোনো উপায়ই যে নেই তা নয়। উপায় আছে এবং তাতে যে শুধু সাম্প্রদায়িক মৈত্রী স্থাপনের সুযোগই হবে এমন নয়, বাংলাদেশের একটি মুমূর্ষু শিল্পও তাতে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠ্‌বার অবকাশ পাবে। আমি বাংলা সিনেমার কথাই বল্‌ছি। ফিল্ম নিয়ন্ত্রিত হয়ে বাংলাদেশে ছবি তোলার কাজ আজ প্রায় বন্ধ। যে-অল্প পরিমাণ ফিল্ম ভারতবর্ষে আমদানী হয়—যুদ্ধকালীন প্রচারের কাজে ব্যয়িত হয়ে তা থেকে যে কিছুই আর উদ্বৃত্ত থাকে না, একথা আমরা জানি। তবে এটুকু মাত্র আমাদের বলবার আছে যে, সাম্প্রদায়িক কলহ মিটানোর কাজটাও যুদ্ধকালীন প্রচারের তালিকায় পড়ে, কেননা অসামরিক জনসাধারণের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ যুদ্ধোদ্যমকে অনেকটা ব্যাহত করে তোলে। সাম্প্রদায়িক প্রীতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে বাংলা সরকার বরাদ্দ টাকার ফিল্ম কিনে নিয়ে নিজেদের তত্ত্বাবধানে অনায়াসেই ছবি তৈরী করাতে পারেন। তাতে তাদের উদ্দেশ্যও সুচারুরূপে সফল হয় আর তাছাড়া বাংলাদেশে ছবি তোলার কাজ হ্রাস হয়ে যাওয়াতে যে সব কর্ম্মী ও যন্ত্রী আজ বেকার হয়ে পড়েছে, তাদেরও একটা উপার্জ্জন করবার পথ খুলে যায়।

সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য প্রচারের পক্ষে ছায়াচিত্রের কার্য্যকারিতা বহু প্রাদেশিক সরকারই স্বীকার করে নিয়েছেন। বহু প্রাদেশিক সরকারই 'পড়শী' 'ভক্তকবির' চিত্র দু'টির

উপর কোনো প্রমোদ-কর (Entertainment Tax) ধার্য্য করেন নি। এ থেকে মনে হয় এ দু'টি ছবি সাম্প্রদায়িক প্রীতি-প্রচারের উপযোগী বলেই প্রাদেশিক সরকারদের কাছ থেকে এ সুবিধাটুকু অর্জ্জন করতে পেরেছে। 'পড়শী' আদর্শের ছবি বাংলাতে অনায়াসেই তৈরী হ'তে পারে এবং বাংলাদেশেই এ-ধরণের ছবি সবচেয়ে বেশী তৈরী হওয়া দরকার। যারা সাম্প্রদায়িক মিলনের পক্ষপাতী এ নিয়ে তাদের মনে আর কোনো সংশয় জাগতে পারে না। আমরা আশা করি বাংলা সরকারও এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হবেন।

আ

রেডিও

বাঙালীদের আত্মবিস্মৃতির যে অপবাদ দেওয়া হয় প্রাচীনপন্থীদের মহল থেকে, তা সম্ভবত ভুল, কেননা ঊনিশ শতকের তৃতীয়ার্ধ পর্য্যন্ত শিল্পে সাহিত্যে রাজনীতিতে ব্যবসাবাণিজ্যে বাঙালীর যে পরিচয় পাই তা নিয়ে বড়াই না করাই ভালো। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকে বাঙালীর যে জয়যাত্রা তার গতি মন্দীভূত অতি-সম্প্রতি। এমন কী সংস্কৃতির এই ক্ষণিক ভাটার কালেও বাংলার কাছাকাছি আসে এমন প্রদেশও ভারতে দুর্লভ। তবু দুঃখ হয়, সিনেমা এবং রেডিও সংস্কৃতি প্রকাশের এই আধুনিকতম উপকরণ দুটিতে বাংলার উৎকর্ষ কদাচিৎ নজরে আসে। সিনেমা প্রতিযোগিতামূলক শিল্প, কোম্পানীর কেরাণীত্বে যে জাতির প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন, এ ব্যাপারে তার মাথা দেরীতেই খোলা স্বাভাবিক। কিন্তু রেডিও? তার কৈফিয়ত কী মালিকানায়?

নিছক উপভোগের উপকরণে তবু বেতারকেন্দ্র আমাদের মাঝে মাঝে খুশী করেছে, বিশেষ করে যুদ্ধপূর্ব আমলে। কিছু ভালো গান, দু'চারটি সুন্দর অভিনয়, কিছু অপূর্ব বাজনা, সময়ে সময়ে কতকগুলি মনোরম হাস্যকৌতুকাভিনয়, আমাদের মন কেড়েছে। কিন্তু সত্যিকার সারবান অথবা ভারবান পদার্থ রেডিও কখনো পরিবেশন করেনি বললেই চলে। এ আপত্তি পূর্বেও করেছি, আজো করতে হচ্ছে। আসল গুণী লোক যদি বা দু'একবার দেখছেন জ্ঞানী লোক আজো চোখে পড়ে না। কিন্তু গুণীরাও সব এক শ্রেণীর, গায়ক এবং বাদক। কোন কবি এসে তার একটি কবিতা আবৃত্তি করছেন কী কোন গল্প লেখক তার গল্প পড়ে শোনাচ্ছেন অথবা কোন চিত্রশিল্পী তার অঙ্কন অভিজ্ঞতার কথা বলছেন, কলকাতা কী ঢাকার বেতার-কেন্দ্র সম্পর্কে এ কথা কল্পনা করতে পারেন? অথচ বিলেত কী আমেরিকার ভালো ভালো বেতার কেন্দ্র থেকে এসব প্রোগ্রাম যুদ্ধের পূর্বে হামেশাই শুনতে পেতাম, এখনো যে মাঝে মাঝে পাইনে তা নয়। বি, বি, সিতে বক্তৃতা হিসেবে ব্যবহৃত এমনি কতকগুলি মজার খবর আমিই জানি যা পরে বই হিসেবে যথেষ্ট নাম করেছে। লিষ্টনারের যে কোন সংখ্যা খুললেই দু'একটা সত্যিকারের পঠনীয় লেখা চোখে পড়বেই। আমাদের 'বেতার জগতে' প্রকাশিত কোন লেখা কেউ পড়ে থাকেন, এটা শোনবার মতো খবর!

তবু শোনবার জিনিস আমরা দু'একবার পেয়ে থাকি। পাইনে স্মরণীয় পদার্থ। 'স্কুলের ছেলেদের জন্য' ব্যবস্থা বহুদিন থেকেই আছে, সম্প্রতি 'বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও'

একটা প্রোগ্রাম দেওয়া হয়েছে। প্রথমটিতে যে কোন লোক হলেই চলে এবং দ্বিতীয়টীর জন্য যার পি-এইচ-ডি নেই তাকে কী করে নেওয়া যায়! এ সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রামটিতে আমরা মাঝে মাঝে ভালো বক্তৃতা শুনে থাকি। বিষয় নির্ব্বাচন অবশ্য বিশেষ সুখকর হয় না। লেণ্ডলীজের ষ্টাটিস্‌টিক্‌স্, কোয়ান্‌টাম থিয়োরী, মৃচ্ছকটিকের লেখক আবিষ্কার অথবা ব্যাকরণতত্ত্ব কী এই জাতীয় টেকনীকাল আলোচনার স্থান রেডিও নয়, গবেষণাগার, এ কথা মনে রেখে বক্তা এবং বিষয় নির্ব্বাচন করলে শ্রোতারা অনেকখানি মাথা ধরার হাত থেকে রেহাই পাবেন। সত্যিকার জ্ঞানী অথচ গুণী লোকই কেবল রেডিওর এই সব প্রোগ্রাম বাঁচাতে পারেন।

সবচেয়ে হাস্যকর শ্রমিক এবং কৃষকদের জন্য প্রোগ্রামে যে ব্যবস্থা। ওরা সব মুখ্যুসুখ্যু লোক, শেখবার কী শোনবার কথা ওদের জন্য তো চলবে না! চাই কিছুটা হাসিঠাট্টা, অতএব কথোপকথন। আর এই কথোপকথনটা যে কী ব্যাপার তা যদি কেউ কখনো শুনে না থাকেন তা হলে কিছুতেই ধারণা করতে পারবেন না। তবে গান জিনিসটা ভালো, সুতরাং ওর সবই চলবে, তা সে ঠুংরীই হোক, কী খেয়াল কী ব্রাহ্মসংগীতই হোক। সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে এখনো শ্রমিক অথবা কৃষকেরা রেডিও শোনে না। তবু এ কথা না ভেবে উপায় নেই, দেশের কৃষি এবং শিল্পচেতনা উদ্বোধনে রেডিও এবং সিনেমা আজো এগিয়ে আসছে না।

কিন্তু এতখানি আশা করাই হয়তো ভুল। কোন ব্যাপার উদ্যোগী হওয়া দূরে থাক রেডিও দেশের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির অনুসরণ করলেই আমরা বর্তে যেতাম। সব প্রথমেই যে ক্রটীর কথা মনে আসে সেই উদাহরণই দি। এ যুগের বাঙালী সাহিত্য এবং শিল্পসর্ব্বস্ব হলেও রেডিওতে তার ছাপ অল্পই। সাহিত্যিকেরা যদি বা আমন্ত্রিত হন, বিষয় থাকে রাজনীতিকের, যুদ্ধবিদের কী সাংবাদিকের। সাহিত্য সম্পর্কে একমাত্র বিষয় বোধ হয় পুস্তক সমালোচনা। অথচ তাও কখনো যত্ন নিয়ে করা হয় না। যে কোন বই নিয়ে আলোচনা করলেই হলো, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যতগুলি ইচ্ছা বইএর বিষয় বলা চলে, যে কোন লোক হলেই সমালোচনা করতে পারে, একই বই হয়তো দু' তিনবার আলোচিত হচ্ছে। এই দুঃসহ অবস্থার প্রতিকার নেই?

আবুল হোসেন

সমালোচনা

A WEEK WITH GANDHI. Louis Fischer (George Allen & Unwin, 1943). 6s. net.

ক্রিপ্‌স্‌ নাট্যকে শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ প্রহসন ব'লেই মেনে নিয়েছে কেননা ভারতভাগ্যনিয়ন্তা হঠাৎ বিমানযোগে আবির্ভূত হয়ে যে-ভাবে পুনর্বার অদর্শন হলেন তাতে দেবতাদের হনুকরণ করবার চেষ্টাই স্পষ্ট হয়েছিল। একথা সত্য যে রাজসিক ভক্তের দল এবং ভারতীয় অতি-মানসিক সম্প্রদায় ক্রিপ্‌স্‌-এর অবতরণকে দৈবঘটনা ব'লে মেনেছিলেন কিন্তু দিল্লীর হাওয়ায় দুর্লভ বক্তার প্রাত্যহিক বাণী-বদলকে জনসাধারণ বিস্মিত কৌতুকের রঙ্গরসের মতোই উপভোগ করে। অলীক বচন এবং ক্রুদ্ধ বাক্যবান বর্ষণ করতে করতে যখন দৈববক্তা আরোহণের পুষ্পকরথে চড়ে পলায়ন করলেন তখন সত্য সত্যই মনে হয়েছিল অকালেই নকলের নাকাল হোলো, পরিহাস মাত্রাটা আরো দীর্ঘকাল চল্‌লে বেশ জম্‌ত। কিন্তু ক্রিপস্‌ নাট্য যেমন একদিকে ঠাট্টা তেমনি অন্যদিকে তাকে গ্রীক ট্রাজেডিও বলা চলে,—যে-সকল অভিনেতা আপন স্বভাবের নিয়মে অনিবার্য এই পরিণামে উপস্থিত হলেন দেশকালপাত্রের যোগে তাঁদের প্রত্যক্ষ করলে বোঝা যায় ঘটনার অমোঘতা পূর্বনির্ধারিত। দাবানল জ্বলতেও দেরি হোলো না, লেজের আগুনে যাঁরা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে গেলেন যেখানেই তাঁরা ইতিহাসের পাতা বদ্‌লে, কাল্পনিক তথ্যের আড়ালে অদৃশ্য হোন্‌ না কেন একদিন তাঁদের দায়িত্ব প্রমাণিত হবেই। এখনো শান্তিপর্ব নামেনি কিন্তু এই আঁধির মধ্যেই লুই ফিসারের বই ঐতিহাসিক স্বচ্ছদৃষ্টিপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। বলা বাহুল্য ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতাদের চারজন স্বতন্ত্রভাবে এবং একত্র যে-সকল তথ্য বলেছিলেন এবং ক্রিপ্‌স্‌ অবরোহণ-আরোহণের বিভ্রান্ত অবস্থায় কখনো তা স্বীকার কখনো অস্বীকার করেন—ফিসার ভারতের হয়েই সেই সকল তথ্য নিজ দায়িত্বে লিপিবদ্ধ করেছেন। শুধু তাই নয়, ঘটনার অতি প্রাঞ্জল প্রমাণসহযোগে তিনি এই চিত্তাকর্ষক ডায়েরি আজ আমাদের উপহার দিলেন; সত্যসন্ধ পাঠক বিভিন্ন দেশে বসে ভারতের একটি দুঃখাবহ প্রহসনের স্বরূপ দেখতে পাবেন।

কিন্তু এই বইখানি মুখ্যত ক্রিপস্‌-এর বিষয়ে নয়। ভারতসূর্যপ্রতীক একটি মহাপুরুষের সঙ্গে লেখকের পরিচয়ের উজ্জ্বল কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে। প্রাত্যহিক পরিবেশে এমন সহজ ক'রে শ্রেষ্ঠ মানুষকে দেখানো দুরূহসাধ্য; সম্ভ্রমে, স্নেহে, প্রীতিভরা কৌতুকে মিশ্রিত

এই সুন্দর রচনাটি মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের একটি শুভ্র পরিচয় নিয়ে প্রকাশিত। লুই ফিসার আপন স্বতন্ত্র মতামত কোথাও প্রচ্ছন্ন রাখেন নি; সেবাগ্রামে ভোজন সম্বন্ধে তাঁর নিরামিষ তপস্যা যেমন করুণ রঙে রঞ্জিত তেমনি কঠিনতর ক্ষেত্রেও তিনি সত্যের বিবিধ বর্ণ নির্ভয়ে ব্যবহার করেছেন। ইংরেজবিরোধী তিনি নন, অন্যায়ের বিরোধী; ভারতমিত্র বল্‌লে সব কথা বলা হয় না, তিনি স্বাধীনতার স্বপক্ষে। এই বইখানিতে রাষ্ট্রনীতির উপরে মানবনীতিক স্বীকার করা হয়েছে এবং রচনার প্রসাদগুণে নীতির চেয়ে যেটা আরো বড়ো, অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তির সহজাত ছন্দ তার ধ্বনি শুনতে পাই। পৃথিবী জুড়ে যে জনজাগরণের পর্ব সুরু হোলো মার্কিন লেখক তারই ভূমিকায় ভারতীয় জাগরণকে একান্ত অনুভব করেছেন; বইখানির মতামত সম্পূর্ণ স্বীকার না ক'রেও এই কারণে আমরা তাকে বহুমান দেবো।

বইখানি অমূল্য হলেও ছয় টাকা মূল্য ভারতবর্ষের পক্ষে বেশি; এদেশের উপযোগী সুলভ সংস্করণ বেরোনো দরকার। পনেরোটি সুন্দর ফোটো বইয়ের শেষে দেওয়া হয়েছে, তার বেশির ভাগই সেবাগ্রামের এবং মহাত্মাজির ঘরোয়া ছবি। কিন্তু ছবির সংখ্যা কম করা যায়; তাতে দামও কমবে এবং চিত্রিত পুনরুক্তির দোষ ঘুচবে।

অমিয় চক্রবর্তী

MODERN ISLAM IN INDIA by W. Cantwell Smith (Minerva, Rs. 10/-).

বর্ত্তমান ভারতবর্ষকে বুঝতে হলে ভারতীয় মুসলমানের ইতিহাস ও ঐতিহ্য জানা চাই, অথচ এটা দেশের পক্ষে দুর্ভাগ্যের কথা যে মুসলমানের মধ্যেও তার সম্যক পরিচয় নাই। আরবী, ফারসী এবং উর্দুতে সে ইতিহাস রচনার মালমসলা ছড়ানো রয়েছে, এবং ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায়ও তার অনেক তথ্য মেলে, কিন্তু সে সমস্ত বিক্ষিপ্ত মালমসলা একত্রিত করে ভারতীয় মুসলমানের জীবন-ইতিহাসের পরিচয় দেবার চেষ্টা এখনো হয়নি। মোসলেম জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়েও কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে, কিন্তু বিশেষ দিক নিয়ে যে বিশ্লেষণ, সমগ্রদৃষ্টির অভাবে তা অপূর্ণ হতে বাধ্য। অসম্পূর্ণ পরিচয়ের ফলে কেবল যে মুসলমানের ক্ষতি হয়েছে তা নয়—ভারতীয় রাজনৈতিক সাধনার ব্যর্থতার কারণও অনেকখানি এই ঐতিহাসিক অজ্ঞতা। নিজের অতীত সম্বন্ধে অচেতন মুসলমান বর্ত্তমানের সমস্যাকে স্পষ্টদৃষ্টিতে বিচার করতে পারেনি, এবং মুসলমানের আশা ও আশঙ্কার সঙ্গে পরিচয়ের অভাবে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে তার বিপ্লবী শক্তি ও সাম্রাজ্যবিরোধী মনোবৃত্তির পূরোপূরি ব্যবহার হয়নি।

এ আত্মপরিচয় দেবার দায়িত্ব ভারতীয় মুসলমানেরই গ্রহণ করা উচিত ছিল। যে পরিমাণ অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য ও মানসিক সহানুভূতির ফলে সে আত্মপরিচয় আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিত্তি হতে পারে, ভারতীয় মুসলমান ভিন্ন অন্য কারু মধ্যে তা মেলা সম্ভব নয়। দুঃখের কথা যে তা সত্ত্বেও ভারতীয় মুসলমান সে আত্মবিশ্লেষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই। রাজনীতি, সমাজনীতি বা ধর্ম্ম নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে, প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই তা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। বিদেশী হয়েও

অধ্যাপক ক্যান্টওয়েল স্মিথ সে অভাব দূর করতে চেষ্টা করেছেন বলে তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীরই কৃতজ্ঞতাভাজন, এবং এটা তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক যে বিদেশী হয়েও এ গুরু দায়িত্ব পালনে তিনি অনেকখানি সাফল্য অর্জ্জন করেছেন।

অধ্যাপক স্মিথের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোথাও ছেদ বা ফাঁক নাই। যে জীবনদর্শন তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে, তার যাথার্থ্য নিয়ে মতভেদের অবকাশ আছে, কিন্তু তিনি যে একাগ্রতার সঙ্গে সে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মোসলেম জীবনের বিভিন্ন দিকের বিচার করেছেন, তা নিয়ে মতভেদ চলে না। চিন্তাপ্রবাহ ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন ও আন্দোলনের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথবার চেষ্টা করেছেন, এবং তার ফলে জীবনের বিভিন্ন প্রকাশের গোপন ঐক্য অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। সমাজতান্ত্রিকের দৃষ্টিতে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই তিনি সমাজ ও ব্যক্তির বিভিন্ন বিকাশের মর্ম্ম খুঁজেছেন। ইতিহাসের অনেক জটিল সমস্যাও তাঁর চোখে তাই সহজ হয়ে ধরা দিয়েছে।

চিন্তা ও ভাবজগতে প্রধানত ইকবালকে কেন্দ্র করেই তাঁর আলোচনা—সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের ইতিহাসে লীগের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পশ্চাদপটেই তাঁর বিশ্লেষণ। এ সমস্ত আলোচনার মধ্যে কিন্তু মার্ক্সবাদের অন্ধ অনুরক্তির লক্ষণ মেলে, এবং তার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্লেষণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। একথা প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত যে বিজ্ঞানের অপর্য্যাপ্ত সাফল্য সত্ত্বেও জীবনদৃষ্টির অভাবে আজো ইয়োরোপিয় সভ্যতা ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব সমন্বয় করতে পারেনি—কোথাও ব্যক্তির প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁকে নৈরাজ্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, কোথাও সমাজের কঠিন নিষ্পেষণে সমষ্টিবাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হতে বসেছে। লক্ষ্য এবং উপায়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচারে ব্যর্থতা এবং অর্থনৈতিক সংগঠনের বিশ্লেষণে মুক্তদৃষ্টি সত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয় এবং বহুলাংশে ভ্রান্ত দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে তার সংযোগ করেছে বলেই যে মার্কসবাদ সে সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, সেকথাও প্রায় সর্ব্বগ্রাহ্য স্বীকৃত, অথচ অন্ধ অনুরক্তির ফলে স্মিথ সাহেবের চোখে এ সহজ সত্য ধরা দেয়নি। তাই মার্কস্‌বাদ ভিন্ন অন্য ধরণের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা বা প্রচেষ্টাকে তিনি বিনাবিচারে বর্জ্জন করেছেন। মার্কসবাদের ভাষ্য নিয়েও আজ মতান্তরের অন্ত নেই—সে ক্ষেত্রেও অধ্যাপক স্মিথ যে গুরুবাদী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাতে মার্কসের ভাষাতেই বলতে হয়—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি মার্কসপন্থী নই!" ইকবাল সম্বন্ধে অধ্যাপক স্মিথের আলোচনায় তাই গোঁড়া ও একদেশদর্শী ভারতীয় সাম্যবাদীদের মনোবৃত্তির পরিচয় মেলে।

লীগের পরিণতির আলোচনায়ও দৃষ্টিভঙ্গীর এ ত্রুটীর পরিচয় মেলে। যেখানে কেবলমাত্র ঐতিহাসিক বিচার, সেখানে অধ্যাপক স্মিথের পাণ্ডিত্য, নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও তথ্যজ্ঞান বিস্ময়কর, কিন্তু যেখানে ভারতীয় সাম্যবাদী দলের মার্কসবাদী ভাষ্যের অবকাশ, সেখানেই স্মিথ সাহেব বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। ১৯০৬-৩৬ সাল পর্য্যন্ত লীগের গোঁড়ামী ও নিষ্ক্রিয়তা, এবং ১৯৩৬-১৯৪২ পর্য্যন্ত প্রতিক্রিয়াশালী শক্তির প্রতীক হিসাবে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ট

লীগের স্ফীতি ও শ্রীবৃদ্ধি তিনি নিপুণভাবে দেখিয়েছেন। কিন্তু ১৯৪২ সালের পরে লীগ-রাজনীতিতে বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তন ও লীগের সংগ্রামশীল সক্রিয় ভঙ্গী ভারতীয় সাম্যবাদীদল ছাড়া আর কারু চোখে ধরা পড়েছে বলে শুনিনি। বরং ১৯৪২ সালের পরে থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাধাসৃষ্টি এবং মুসলমানের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উদ্যমকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টায় লীগের চরম বিকৃতিই প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুতপক্ষে অধ্যাপক স্মিথ তথাকথিত "জনযুদ্ধের" ভূমিকায় এ সমস্ত প্রশ্ন বিচার করেছেন বলেই এত সূক্ষ্ম ও নিপুণ বিশ্লেষণের পরে এরকম হাস্যকর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী জনযুদ্ধে বাধা দেয়নি বলে লীগ তাঁর মতে বিপ্লবী ভূমিকায় অবতীর্ণ, এবং সে যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে অস্বীকার করার ফলেই অধ্যাপক স্মিথের মতে ১৯৪০ সালের পর থেকে কংগ্রেস বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যহারা, আহরার দল প্রতি-বিপ্লবী, অথচ ১৯৪০ সালের পূর্ব্বে এ দুই দলের কর্ম্ম ও লক্ষ্য নিয়ে স্মিথ সাহেবের উৎসাহের অন্ত নাই!

অধ্যাপক স্মিথের উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচয় অন্তরঙ্গ এবং উর্দ্দু ভাষায় মুসলমান সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে যত আলোচনা, সেগুলির বিচার তিনি করেছেন। পূর্ব্বের দিকে তাঁর দৃষ্টি খোলে নাই, এবং সেজন্য বাঙালী মুসলমান ভারতীয় সংস্কৃতিধারায় নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে যে ইতিহাস রচনা করেছে, সে সম্বন্ধে তিনি সজাগ নন। নানা ঐতিহাসিক কারণে বাঙলাদেশে ইসলামের যে ভারতীয় রূপ, অন্য কোন প্রদেশে তার নিদর্শন মেলে না। বর্ত্তমান জগতের চিন্তাধারার ঘাতপ্রতিঘাতে ইসলামের যে আধুনিক রূপ, তার বিচারের জন্যও তাই বাঙলাদেশের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় অবশ্য প্রয়োজনীয়।

এ রকম দোষ ত্রুটী থাকা সত্ত্বেও অধ্যাপক স্মিথের বইখানি ভারতীয় রাজনীতি এবং মুসলমান জীবনের পরিচয়ের জন্য অপরিহার্য্য। যে কাজ ভারতীয় মুসলমানের করা উচিত ছিল, তিনিই কৃতিত্বের সঙ্গে সে কাজ সম্পাদন করেছেন। বহু তথ্যের একত্র সমাবেশ এবং জটিল ঘটনাবলীর নিপুণ বিশ্লেষণের ফলে ভারতীয় রাজনীতির আলোচনার আসরে তাঁর জন্য গৌরবান্বিত আসন নির্দ্দিষ্ট থাকবে।

বইখানির ছাপা বাঁধাই ভালো, কিন্তু দাম অত্যন্ত বেশী। বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে বইখানির দাম কমানো বাঞ্ছনীয়।

হুমায়ুন কবির

পঞ্চগ্রাম (গণদেবতা) ঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কাত্যায়ণী বুক ষ্টল। দাম ৪৲ টাকা

'গণদেবতা (চণ্ডীমণ্ডপ)'-এর দ্বিতীয় পর্ব্ব 'পঞ্চগ্রাম (গণদেবতা)' উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু সময়কেই সামনের দিকে বিস্তৃত করে ধরেন নি, স্থানের পরিধিও তিনি অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছেন। শিবকালীপুরের চণ্ডীমণ্ডপকে ঘিরে একদল মানুষের জীবন তৈরী হয়ে চল্‌ছিল, এ-উপন্যাসে তারাই এসে উঁকি দিয়েছে সত্যি, কিন্তু তাদের জীবন

এখানে পাঁচটি গ্রামের পটভূমিকায় প্রতিফলিত। তাই কয়েকটি নূতন গ্রামের কয়েকজন নূতন লোকের সঙ্গেও এখানে আমাদের পরিচয় হয়েছে। তাছাড়া মহাগ্রামের যে ন্যায়রত্নকে 'গণদেবতা'-য় দু-এক পলক দেখ্‌তে পেয়েছিলাম, 'পঞ্চগ্রামে'র কাহিনীতে তিনি পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বল্‌ব 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসের নায়ক সেই পাঁচটি গ্রাম নয়, নায়ক 'গণদেবতা'রই একটি প্রধান চরিত্র—দেবু পণ্ডিত। 'গণদেবতা'য় চণ্ডীমণ্ডপটাকেই নায়কের স্থান দেবার সুযোগ পেয়ে আমরা যে নূতনত্বের স্বাদ অনুভব করেছি, নবতর আঙ্গিকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যতটা শক্তির পরিচয় পেয়েছি, 'পঞ্চগ্রামে'ও তা' একেবারে অনুপস্থিত নয় কিন্তু এখানে একটি মাত্র চরিত্রের গতিতেই পাঁচটি গ্রামের জীবন-দৃশ্য নিয়ন্ত্রিত, সে-চরিত্রটিকে ছেড়ে দিলে উপন্যাসটি আর এমন কোন আশ্রয় পাবে না যাকে ধরে তা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। লেখক একটি চরিত্রের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করে এসেছেন বলেই উপন্যাসের ৪৪০ পৃষ্ঠায় প্রবাহিত ধীরমন্থর সময়ের স্রোত শেষের ৩৫ পৃষ্ঠায় দীর্ঘ ছেদে খণ্ডিত হয়ে ছন্দপতনের উপক্রম করেছে। দেবু পণ্ডিত যখন ছয়মাসের জন্যে গ্রামছাড়া বা তিন বৎসরের জন্যে জেলে, তখন আর পঞ্চগ্রামের জীবন পাঠকেব চোখের উপর নেই—কিন্তু পঞ্চগ্রামে তখনও জীবন ছিল, 'পঞ্চগ্রামে'র কাহিনীকারের কাছে কি পাঠক সে জীবনের ছবি আশা করতে পারে না? আশা করলেও পাঠকের সে আশা পূরণ হবে না, কেননা পঞ্চগ্রাম উপন্যাসের নায়ক পঞ্চগ্রাম নয়, নায়ক দেবু পণ্ডিত।

কোনো একটি বিশেষ চরিত্র উপন্যাসের নায়ক হবে তাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নেই। বরং অধিকাংশ উপন্যাসে তা-ই হয়ে এসেছে। সে সব ক্ষেত্রে এ প্রসঙ্গে একটি কথাও বলা চলে না। কিন্তু 'পঞ্চগ্রামে'র বেলায় এ প্রসঙ্গে অনেক কথাই বল্‌তে হ'ল। তার কারণ, লেখক উপন্যাস-রচনায় পাঁচটি গ্রামের সত্তা শেষদিককার ৩৫ পৃষ্ঠার আগে কখনও ভুলে যান নি। এখানে পাঠক এই অভিযোগ করতে পারে, 'গণদেবতা'র লেখকের এ'টুকু ত্রুটীও বা থাকবে কেন, উপন্যাসের একনায়কত্বে তিনি কেন বিশ্বাসী হয়ে উঠ্‌বেন? 'পঞ্চগ্রামে' কুসুমপুরের মুসলমানরা এসেছে, দেখুড়িয়ার ভল্লারা এসেছে, কঙ্কনার বাবুরা এসেছে কিন্তু তাদের জীবনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় হবার সুযোগ পাঠকদের কই? বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষগুলোর মধ্যে যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাক্‌বার কথা এবং যে-বৈশিষ্ট্যের আকর্ষণে ঔপন্যাসিক তাদের এনে উপন্যাসে স্থান করে দিতে চান, তার পরিপূর্ণ স্ফুরণ বা বিকাশ আমরা 'পঞ্চগ্রামে' পাইনি বলে অতৃপ্ত।

এই অতৃপ্তির সঙ্গে অভিযোগ যা-ই থাক্ কিন্তু তার পেছনে এই স্বীকারোক্তি আছে যে, 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের হাত থেকে আমরা এমন কিছু পেয়েছি যাতে আমাদের পাবার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেছে। সাধারণতঃ বাংলা উপন্যাসে যা পাওয়া যায় না সত্যি তেমন কিছু এ-উপন্যাসটিতে আমরা পেয়েছি। পাঁচটি গ্রামের অনেকগুলো মানুষকে নয়ে তারা-

শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কারবার করেছেন—অনেকগুলো চরিত্র যা বাংলা উপন্যাসে দুর্লভ। পাঁচটি গ্রামকে একটি উপন্যাসের কলেবরে জড়ো করে আন্‌বার দুঃসাহসিক চেষ্টা বাংলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আমরা আর দেখ্‌তে পাইনি। সে-চেষ্টায় যখন দেখ্‌তে পাচ্ছি যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আংশিক সাফল্য লাভ করেছেন তখনই আমাদের খানিকটা মুগ্ধ হ'তে হয়েছে। পাঠক যখনই উপন্যাসটির বিশাল পটভূমি উপলব্ধি করতে পারবে তখন সে নির্বিবাদে স্বীকার করে নেবে যে এখানে লেখকের সূক্ষ্ম কারুশিল্পে অবকাশ নেই। এই বিরাট ক্যান্‌ভাসের উপর মোটা দাগের ছবিই হয়ত ভালো; সমস্ত ক্যান্‌ভাস্‌টা সূক্ষ্ম কাজে ভরে তোলা অশোভন না হলেও দুঃসাধ্য। পঞ্চগ্রামের পাঁচমিশেলি এতোগুলো মানুষকে নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুল্‌তে মনোবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের পথে যতটা পর্য্যন্ত লেখকের যাওয়া উচিত এতটা পরিভ্রমণ কারো শক্তির বা আয়ুর পক্ষে হয়ত সম্ভব নয়। তাই তারাশঙ্কর মোটা দাগের ইতিহাসের পথ ধরেছেন—ছাঁটাই বাছাই অনেক তাঁকে করতে হয়েছে—এমন কি শেষটায় একটি চরিত্রকেই নায়ক হিসেবে অবলম্বন করতে হয়েছে। লেখকের এই স্বাভাবিক পরাজয়ে তাঁর সৎ এবং মহৎ চেষ্টাকে আমরা কিছুতেই ভুলে যেতে পারি নে। কঠোর পাঠকের ভূমিকা না নিয়ে আমাদের মনে করা উচিত যে গণ-দেবতাকে লেখক স্বেচ্ছায় ভুলে যান নি, তাদের সবার সঙ্গে এগিয়ে আসা সম্ভব নয় বলেই তারা পেছনে রয়ে গেছে।

কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষের প্রতি অপরিসীম মমতাবোধ—যা স্মরণীয় ঔপন্যাসিকদের একটি বিশিষ্ট গুণ—তারাশঙ্করের এই উপন্যাসে স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন হয়ে ফুটে উঠেছে। মানুষ মানুষ হিসেবে খারাপ হ'তে পারে না, যতটুকু সে খারাপ তা শুধু ঘটনার পাকচক্রে—এই অতি বড় বৈজ্ঞানিক সত্যকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পেরেছেন তারাশঙ্কর। সমাজ বিজ্ঞানের এই প্রগতিশীল মতবাদকে গ্রহণ করে মনোবিজ্ঞানের মর্য্যাদা স্থানে স্থানে ক্ষুণ্ণ করলেও তিনি এই উপন্যাসের চরিত্রগুলোতে একটা সজীব দৃঢ়তা এনে দিতে পেরেছেন—আর গ্রামের লাঞ্ছিত, পর্য্যুদস্ত জীবনকে ভরে তুল্‌তে পেরেছেন আশ্বাসে, আশায়। মানুষের প্রাণশক্তিতে লেখক বিশ্বাস হারান নি—ব্যক্তিমানসের পরিবর্ত্তে সমাজমানসের দিকে তাকিয়ে এটুকু লাভ তাঁর হয়েছে। অন্যায়ের, বিদ্রূপের, অত্যাচারের অজস্র গ্লানি সহ্য করেও তাই তাঁর নায়ক দেবু পণ্ডিত ভাব্‌তে পারে:

> "মানুষের পরম কামনার মুক্তি একদিন আসিবেই। সেইদিনের দিকে চাহিয়াই মানুষ দুঃসহ বোঝা বাহিয়া চলিয়াছে। সযত্নে রাখিয়া চলিয়াছে, পালন করিয়া চলিয়াছে—আপন বংশপরম্পরাকে। যে মহা আশ্বাস সে পাইয়াছে তাহাতে তাহার স্থির বিশ্বাস, মুক্তি একদিন আসিবেই। যেদিন আসিবে সেদিন পঞ্চগ্রামের জীবনে আবার জোয়ার আসিবে; সে আবার ফুলিয়া ফাঁপিয়া গর্জ্জমান হইয়া উঠিবে। শুধু পঞ্চগ্রাম নয়, পঞ্চগ্রাম হইতে সপ্তগ্রাম, সপ্তগ্রাম হইতে নবগ্রাম, নবগ্রাম হইতে বিংশতি গ্রাম, পঞ্চ-বিংশতি গ্রাম, শতগ্রাম, সহস্র গ্রামে জীবনের কলরোল উঠিবে।"

'গণদেবতা'য় তারাশঙ্কর ধর্ম্মকে এবং ধর্ম্মগত ন্যায়বোধকেই পল্লীসমস্যা সমাধানের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে মহাগ্রামের ন্যায়রত্নের নৈতিক জীবন লেখকের শেষ আশ্বাস-স্থল হয়ে উঠেছিল। 'পঞ্চগ্রামে' তাঁর সে ধারণা ভেঙে গেছে—তিনি দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন

যে ধর্ম্ম আর পল্লীসমাজকে বাঁচাতে পারে না—ন্যায়রত্নের শক্তি নেই পল্লীকে সুস্থ, সবল করে তুলবার। তাই লেখক এখানে সত্য সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর নায়ক দেবু পণ্ডিত তাই দেখতে পায় যে পল্লীর গণমানসের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা, জনগণের জীবন শক্তি এখনো নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়নি, তাদের মুক্তি এনে দিতে হলে নেতৃত্বে বা সেবায় নয়, তাদের আপনার জন হয়ে তাদের মধ্যে বসবাস করতে হবে। কোনো আদর্শবাদের ফাঁকা বুলিতে তাঁদের বাঁচবার উপায় নেই—নিরাপদ অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরই এই ছিন্নভিন্ন শীর্ণদীর্ণ জীবনগুলো সুস্থ হয়ে উঠ্‌তে পারে।

উপন্যাস-গঠনে বা চরিত্র-চিত্রণে হয়ত কিছু কিছু ত্রুটী 'পঞ্চগ্রামে' রয়ে গেছে কিন্তু সে-ত্রুটীর সামান্যতা উপন্যাসকারের বলিষ্ঠ আশাবাদের অসামান্যতায় হারিয়ে যায়। বহু ক্লান্তিকর বর্ণনার শেষে 'পঞ্চগ্রাম' থেকে আমরা এই তৃপ্তি নিয়ে উঠ্‌তে পারি যে মানুষ বাঁচবে। মানুষকে বাঁচবার ইঙ্গিত দেবার মহৎ দায়িত্ব যদি উপন্যাসকারের থেকে থাকে, তাহলে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিক দিয়ে সার্থক ঔপন্যাসিক।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

LONGMANS MISCELLANY 1943: Longmans Green & Co., Calcutta. Price: Rs. 5/-.

কিছুদিন হইল এই বিবিধ রচনা সংগ্রহের বইখানি প্রকাশিত হইয়াছে। উপক্রমণিকায় প্রকাশক বলিয়াছেন যে যুদ্ধ উপলক্ষে বহু প্রতিভাবান শিল্পী ও সাহিত্যিক এদেশে রহিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের রচনা প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। রচনা সংগ্রহটি প্রকাশিত করিবার উদ্দেশ্য উক্ত লেখক ও শিল্পীদের সাহায্য করা। এতদ্ব্যতীত বিদেশ হইতে বর্ত্তমান এই আমদানী করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই এদেশে আরও ইংরাজী বই প্রকাশ করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই হিসাবে প্রকাশকের এই উদ্যম সমর্থনযোগ্য।

এই ধরণের রচনা সংগ্রহ প্রকাশ করিতে হইলে যে পরিকল্পনার প্রয়োজন বইখানি পাঠে তাহার একান্ত অভাবই পরিলক্ষিত হয়। বিদেশী লেখকদের সম্বন্ধে তাঁহাদের রচনার গুণাগুণই একমাত্র বিবেচ্য, কিন্তু দেশের যে সকল লেখকের রচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার দোষগুণ ছাড়াও আর একটি বিষয় ভাবিবার আছে। রচনা সংগ্রহটি ইংরাজীতে, কাজেই উহা বহু বিদেশী পাঠকের দৃষ্টিতে পড়িবে। এই রচনা সংগ্রহ হইতে আধুনিক ভারতের লেখকদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও ধারণা করা যায় না। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের সকল লেখকের সহিত সংযোগ স্থাপন করা প্রায় অসম্ভব হইলেও, চেষ্টা করিলে বর্ত্তমান সংগ্রহ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রচনা অধিক সংখ্যায় পাওয়া কঠিন হইত না। উপক্রমণিকায় আরও একটি মিসেলেনী প্রকাশিত করিবার আভাস দেওয়া হইয়াছে। সেই সময়ে সম্পাদক মহাশয় যদি এদিকে দৃষ্টি দেন তাহা হইলে দ্বিতীয় রচনা সংগ্রহটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই বিশ্বাস।

বিদেশী লেখকের যে সকল প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে পাঠকের আপনার রুচি অনুযায়ী তাহা গ্রহণ করিবে, পড়িবার মত বিষয়ের অভাব তাহাতে নাই। বাঙ্গালী লেখকদের রচনা সম্বন্ধেই বাঙ্গালী পাঠকের আগ্রহ অধিক, কাজেই তাঁহাদের রচনাগুলি আলোচনা করাই সঙ্গত।

সুধীন্দ্র দত্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া যামিনী রায়ের শিল্পকলা আলোচনা করিতেছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিতেও যামিনী রায় সম্বন্ধে তাঁহার একটি প্রবন্ধ রহিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে যাঁহারা আধুনিক পদ্ধতিতে ছবি আঁকেন যামিনী রায় তাঁহাদের অন্যতম। সুধীন বাবুর প্রবন্ধ হইতে যামিনী রায়ের কলানৈপুণ্য ও তাহার বিশেষত্ব কি তাহা জানিতে পারা যায়। কিন্তু প্রবন্ধে একটি অভাব বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে। যামিনী রায় চিত্রাঙ্কণে গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করিয়া নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, ফলে সমগ্রভাবে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা লাভবান হইয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু এই উপলক্ষে ভারতীয় তথা বাংলা দেশের আধুনিক চিত্রকলার কিছু আভাস দেওয়া যাইত। সুধীন্দ্রবাবু সে সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। যামিনী রায় প্রতিভাবান শিল্পী, কিন্তু বাংলা দেশের আধুনিক চিত্রকলার মূল সূত্রগুলি কি তাহা কি যামিনী রায়ের চিত্রাবলী হইতে পাওয়া যায়? যামিনী রায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া ইউরোপের নানা শিল্পীর সহিত সাদৃশ্য অথবা অসামঞ্জস্য প্রদর্শন করা উচিত হইলে বাংলা দেশের রিবেল আর্ট ক্লাবের কার্য্যাবলীর পরিচয় দেওয়া শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র দত্তের মত সহৃদয় সমালোচকের পক্ষেই তাহা সম্ভব ছিল।

আবু সৈয়দ আয়ুব মহাশয়ের আধুনিক বাংলা কবিতার ধারা প্রবন্ধটিতে বিতর্ক তুলিবার মত বহু বিষয় আছে। বাংলা কবিতায় দৃঢ়তার অভাব উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি গদ্য এবং বিশেষ করিয়া বাংলা গদ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন না।

বাংলা গদ্য সম্বন্ধে তাঁহার উক্তির সারবত্তা যে কতখানি একটু ধীরভাবে বিবেচনা করিলে তিনি নিজেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জীবনই কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর মাত্র। এই একশত বৎসরে তিনি মাত্র তিনটি উল্লেখযোগ্য গদ্যলেখক আবিষ্কার করিয়াছেন! বঙ্কিমচন্দ্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতির কথা উল্লেখ না হয় নাই করিলাম। বীরবলের অননুকরণীয় স্বকীয় স্টাইল বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব্ব। কিন্তু বাংলা গদ্যের অভিব্যক্তির মূল ধারা হইতে তাহা স্বতন্ত্র, তাই পরবর্ত্তীকালে বাংলা গদ্যে বীরবলীয় স্টাইলের অনুসরণ অথবা প্রভাব বিশেষ দেখা যায় নাই। আধুনিক কালের বিশিষ্ট গদ্য-লেখকদের পরিচয় দিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গর্ব্বের বিষয় তাহার গদ্যসাহিত্য। গদ্যরীতি চরম উৎকর্ষ লাভ করে নাই বটে, কিন্তু ভাবের তারতম্য প্রকাশ ক্ষমতায় উহা কোন অংশেই হীন নহে। কেবলমাত্র একজন লেখকই যে এদিক দিয়া উল্লেখ পাইবার যোগ্য তাহা নহে। গদ্যসাহিত্যের উৎকর্ষতার সহিত কাব্যের বিকাশের যে সম্বন্ধ তিনি নিয়ম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কোন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত নহে। সাহিত্য হিসাবে গদ্য দেখা দিবার বহুপূর্ব্বেই

কবিতার উন্নতি সর্ব্ব দেশেই ঘটিয়াছে। বাংলা কাব্যের কাল্পনিক ত্রুটি তিনি স্বকপোল কল্পিত নিয়ম দ্বারা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বাংলা সাহিত্যে আজকাল সাম্যবাদী কবিতা রচনা করা ফ্যাশান দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সবল আদর্শ হিসাবে সাম্যবাদের দুর্নিবার আকর্ষণ আছে। কিন্তু আমাদের দেশে যাহারা সাম্যবাদী কবিতা অথবা গল্প লিখিতেছেন আদর্শের স্পষ্ট রূপ সম্বন্ধে তাঁহাদের সঠিক ধারণা আছে কি না সন্দেহ হয়। বোধ হয় এই অভাবের জন্যই এই শ্রেণীর রচনা না হয় সাহিত্য, না হয় সাম্যবাদ। কিন্তু যাঁহার এই আদর্শে বিশ্বাস আপনার সত্তায় মিশিয়া গিয়াছে তাঁহাদের রচনা রসোত্তীর্ণ হইতে কোন বাধা নাই। অবিশ্বাস ও দ্বিধা আধুনিক মনের একটি ব্যাধি, আদর্শবাদই উহা হইতে মুক্তির উপায়। সত্যই কোনও একটি আদর্শবাদ গ্রহণ করিলে অবিশ্বাস ও দ্বিধার প্রশ্ন আর উঠে না। আদর্শবাদ সাহিত্য রচনার পরিপন্থী নহে। শ্রীযুক্ত আয়ুব মতবাদ সাহিত্যসৃষ্টির পথের অন্তরায় বলিয়া যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা সমর্থন করা যায় না।

বিষ্ণু দের কবিতার অনুবাদ ভালই হইয়াছে, তবে বিষ্ণু দে ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল কবিতা লিখিয়াছেন।

করালীকান্ত বিশ্বাস

ঋণ ঃ সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বাশা লিমিটেড্, পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভেনিউ। মূল্য ১।০।

'ঋণ' সঞ্জয়বাবুর নতুন গল্পের বই। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'দিনান্ত' বের হবার পর থেকেই বাংলার পাঠকের মনে এই লেখক সম্বন্ধে কৌতূহলের শেষ নেই। ভঙ্গুর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তিনি যে গভীর বর্ণবৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে সঞ্জয়বাবুর স্থান নির্ব্বাচিত হয়ে গেছে। উপন্যাস-সাহিত্যে তিনি নতুন ধারার প্রবর্তক এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। কিন্তু ঔপন্যাসিকের শক্তিশালী লেখনী গল্পের বেলায় ঠিক স্বচ্ছন্দপ্রবাহী হয় নি, মনে হয় 'ঋণের' অনেকগুলো গল্পই উপন্যাসের উপাদান। গল্পের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে এদের শুধু বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অন্তত প্রথম চারিটি গল্প সম্বন্ধে এ কথা বেশ জোরের সঙ্গে বলা চলে।

সঞ্জয়বাবুর চিন্তাকুশলতার ব্যাপকতা প্রকাশ পেয়েছে প্রথম চারটি গল্পে। বাংলার আবহাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত বিদেশী চরিত্র আপন ঐতিহ্য বজায় রাখতে পাচ্ছে না। এদের মধ্যে অনেকখানি বাঙ্গালীত্ব উঁকিঝুঁকি মারছে যা ট্রাজেডির কারণ। বাংলার মাটিতে আঙ্গুর ফলালে এর আঙ্গুরত্ব থাকবে না। কিন্তু একে বিকতে হবে আঙ্গুর বলেই। 'ঋণের' গৌরীর মনে বাংলার মাধুর্য্য, কিন্তু তাকে দেহদান করে যে ঋণ স্বীকার করতে হলো, তা বাঙ্গালী মেয়েকে দিয়ে সম্ভবপর ছিল না। 'শিকড়ে' যশোদা রবার্টসের রক্তে আফ্রিকান হিংস্রতা ছিল, কিন্তু যশোদা বাংলার মাটিতে শিকড় মেলে দিয়ে নিষ্ফল উত্তেজনায় অসহায় হয়ে উঠেছে।

'বাংলার মাটি'র রহস্য ফিরে গেল পিতৃভূমি আফগানিস্থানে। বাংলায় তার জন্ম, মুখে তার বাঙ্গালী মসৃণতা। তবু বাংলাকে সে মন বিলিয়ে দিতে পারলো না, কাবুলীওয়ালা বলে উপেক্ষিত হলো।

তিনটি বৃদ্ধের চরিত্রচিত্রণে সঞ্জয়বাবু অনন্যসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন শেষের দিককার তিনটি গল্পে। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারের তিনটি অসহায় বৃদ্ধ। গল্প হিসেবে 'দায়' ও 'সিড়ি'র তুলনা মেলা ভার। এই দুটি সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের সর্ব্বশেষ রচনা এবং গল্পকার হিসেবে তাঁর প্রতিভার পরিচয়। বাংলা সাহিত্যে এই দুটি গল্প টেকনিক ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। বাংলার গল্প অলঙ্কার ও চাকচিক্য বর্জিত। বাংলার লেখক মনের গহনে নেমে যেতে চেয়েছে। চমকের কোনো ফুরসৎ এতে নেই। সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের লেখা দিয়ে এ কথা আমরা বার বার স্মরণ করতে পারছি।

অমল দত্ত

জুপিটার ঃ শ্রীমতী বাণী রায়। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। দাম ১৷৷০ টাকা।

লেখিকার এটি প্রথম কবিতার বই। অনভিজ্ঞতাপ্রসূত অনবধানতার সুযোগ তাঁর স্বভাবতই প্রাপ্য। জুপিটারের ভূমিকা লিখতে অনুরুদ্ধ হয়ে শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত সম্ভবত এই কথাই মনে রেখেছিলেন। তবু এই ভূমিকাটি পেয়ে আমাদের একটা মস্ত লাভ হ'ল, জানলুম অতুল বাবুও বাংলা কবিতায় বৈদেশিক বিষয় অথবা উপমা ব্যবহার বরদাশ্‌ত্‌ করতে পারেন, এমন কী অনেকখানি স্বাভাবিকও মনে করেন: আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে তাঁর যে সব আপত্তি তা থেকে একটা 'পদ' বাদ পড়লো; বৈদেশিক ভাব আদানপ্রদানের এই অনিবার্য্যতা স্বীকৃতির পর আধুনিক কাব্যের রীতিনীতি অথবা আঙ্গিক সম্পর্কিত তাঁর অনুযোগগুলির কী হয় জানবার কৌতুহল রইলো।

এসব কথা শ্রীমতী বাণী রায়ের কাব্যালোচনা সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু তা নয়। কারণ শ্রীমতী রায়ের এই কবিতাগুলি নাম এবং বিষয়ের আধুনিকতা সত্ত্বেও পুরাতনপন্থী। এবং ছন্দ-ব্যবহারে যে মামুলিত্ব, শব্দচয়নে অসতর্ক শৈথিল্য এবং ভাষা-প্রয়োগে অস্বাচ্ছন্দ্য ও প্রত্যাশাহীনতা রবীন্দ্রনাথের অক্ষম ঐতিহ্য-অনুসারীদের জরাজীর্ণ কবিতার বৈশিষ্ট্য 'জুপিটার' তার উর্ধে উঠতে পারে নি। নিছক মিলের জন্য অর্থহীন শব্দপ্রয়োগ, ছন্দের খাতিরে বেখাপ্পা ভাষা ব্যবহার, এমনি খুঁত দরাজ দিল নিয়ে পড়লেও চোখ এড়াতে পারে না। উদাহরণ হাতের কাছেই অনেক আছে, কিন্তু দিলুম না, কেননা পাঠকেরা বইটি পড়বেন।

এ অনুরোধ অনর্থক নয়। কারণ শ্রীমতী রায়ের কবিতায় এমনি একটি সহজ স্বাভাবিক

আড়ষ্টতাহীন নারীর সুর ধরা পড়ে যা বাংলা কবিতায় আমরা পাইনি, আজো পাইনে। এই অকৃত্রিম মনোভাব বজায় রাখা বর্তমান অবস্থায় দুঃসাহসিক। কিন্তু শ্রীমতী রায় কিছুটা নির্ভিক হলে বাংলা কবিতায় একটি নতুন সুর যোজিত হবে। অবশ্য সমস্তই নির্ভর করে ভালো কবিতা রচনার উপর, বিশেষ করে সেইজন্যই তাঁর কবিতায় রচনাশৈথিল্য অক্ষমনীয়।

আবুল হোসেন

Printed and published by K. C. Banerjee at the Modern Art Press,
1/2, Durga Pituri Lane, Calcutta. Edited by Humayun Kabir.
Office; 123, Lower Circular Road.

চতুরঙ্গ

[ষষ্ঠ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা আষাঢ় ১৩৫১]

আড্ডা

বুদ্ধদেব বসু

পণ্ডিত নই, কথাটার উৎপত্তি জানি না। আওয়াজটা অ-সংস্কৃত, মুসলমানি। যদি ওকে হিন্দু ক'রে বলি সভা তাহ'লে ওর কিছুই থাকে না। যদি ইংরেজি ক'রে বলি পার্টি তাহ'লে ও প্রাণে মরে। মীটিঙের কাপড় খাকি কিংবা খাদি; পার্টির কাপড় ফুরফুরে কিন্তু ইস্ত্রি বড়ো কড়া; সভা শুভ্র, শোভন ও আরামহীন। ফরাশি সালঁর অস্তিত্ব এখনো আছে কিনা জানিনে, বর্ণনা প'ড়ে মনে হয় এত সমারোহ ভালো না। পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই আড্ডার ঠিক প্রতিশব্দটি আছে কিনা জানিনে, খুব সম্ভব নেই। অন্যান্য দেশের লোক বক্তৃতা করতে জানে, রসিকতা করতে জানে, তর্ক করতে জানে, আড্ডা দিতে জানে না। অত্যন্ত হাসি পায় যখন শুভানুধ্যায়ী ইংরেজ আমাদের করুণা ক'রে বলে—আহা বেচারা, ক্লব কাকে বলে ওরা জানে না! আড্ডা যাদের আছে, ক্লব দিয়ে তারা করবে কী? আমাদের ক্লবের প্রচেষ্টা কলের পুতুলের হাত-পা নাড়ার মতো, ওতে আববয়িক সম্পূর্ণতা আছে, প্রাণস্পন্দন নেই। যারা আড্ডাদেনেওলা জাত তারা যে ঘর ভাড়া নিয়ে, চিঠির কাগজ ছাপিয়ে, চাকরদের চাপরাশ পরিয়ে ক্লবের পত্তন করে, পরাধীনতার চরম দুর্গতির ফলেই সেটা সম্ভব।

আড্ডা জিনিশটা সর্বভারতীয়, কিন্তু বাংলাদেশের সজল কোমল মাটিতেই তার পূর্ণবিকাশ। আমাদের ঋতুগুলি যেমন কবিতা জাগায়, তেমনি আড্ডাও জমায়। আমাদের চৈত্রসন্ধ্যা, শ্রাবণের রিমঝিম দুপুর, শরতের জ্যোছনা-ঢালা

রাত্রি, শীতের মধুর উজ্জ্বল সকাল—সবই আড্ডার নীরব ঘণ্টা বাজিয়ে যায়, কেউ শোনে কেউ শোনে না। যে-দেশে শীত-গ্রীষ্ম দুই-ই অতি তীব্র, সেখানে আড্ডার ক্ষীণতা অনিবার্য। বাংলার কমনীয় আবহাওয়ায় গাছপালার ঘন শ্যামলতার মতোই আড্ডার উচ্ছ্বাস। ছেলেবেলা থেকে এই আড্ডার প্রেমে আমি আত্মহারা। সভায় যেতে আমার বুক কাঁপে, পার্টির নামে দৌড়ে পলাই, কিন্তু আড্ডা! ও-না হ'লে আমি বাঁচি না। বলতে গেলে আড্ডার হাতেই আমি মানুষ। বই প'ড়ে যা শিখেছি তার চেয়ে বেশি শিখেছি আড্ডা দিয়ে। পরীক্ষায় ভালো পাশ করেছিলুম সেটা আড্ডারই উপহার। আমার সাহিত্যরচনার প্রধান নির্ভর-রূপেও আড্ডাকে বরণ করি। ছেলেবেলায় গুরুজনেরা আশঙ্কা করেছিলেন সে আড্ডায় আমার সর্বনাশ হবে, এখন দেখছি আড্ডায় আমার সর্বলাভ হ'লো। তাই শুধু উপাসক হয়ে আমার তৃপ্তি নেই, পুরোহিত হ'য়ে তার মহিমা প্রচার করতে বসেছি।

যে-কাপড় আমি ভালোবাসি আড্ডার ঠিক সেই কাপড়। ফর্শা, কিন্তু খুব ফর্শা নয়, অনেকটা ঢোলা, প্রয়োজন পার হ'য়ে খানিকটা বাহুল্য আছে, স্পর্শ-কোমল, নমনীয়। গায়ের কোনোখানে কড়কড় করে না, হাত-পা ছড়াতে হ'লে বাধা দেয় না, লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়তে চাইলে তাতেও মানা নেই। অথচ তা মলিন নয়, তাতে মাছের ঝোল কিংবা পানের পিক লাগেনি; কিংবা দাওয়ায় ব'সে গা-খোলা জটলার বেআব্রু শৈথিল্য তাকে কুঁচকিয়ে দেয়নি। তাতে আরাম আছে, অযত্ন নেই; তার স্বাচ্ছন্দ্য কোনোখানেই ছন্দোহীনতার নামান্তর নয়।

শুনতে মনে হয় যে ইচ্ছে করলেই আড্ডা দেয়া যায়। কিন্তু তার আত্মা বড়ো কোমল, বড়ো খামখেয়ালি তার মেজাজ, অতি সূক্ষ্ম কারণেই উপকরণের অবয়ব ত্যাগ ক'রে সে এমন অলক্ষ্যে উবে যায় যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বোঝাই যায় না যে কোথাও কোনো গোলমাল হয়েছে। আড্ডা জমাতে গিয়ে প্রায়ই আমরা পরাবিদ্যার আসর কিংবা পরচর্চার চণ্ডীমণ্ডপ ক'রে তুলি। হয়তো স্থির করলুম যে সপ্তাহে একদিন কি মাসে দু' দিন সাহিত্য-সভা ডাকবো তাতে জ্ঞানীগুণীরা সবাই আসবেন এবং নানা রকম সদালাপ হবে। পরিকল্পনাটি অত্যন্ত ভালো তাতে সন্দেহ নেই; প্রথম কয়েকটি অধিবেশন এমন জমলো যে নিজেরাই অবাক হ'য়ে গেলাম, কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেলো যে সেটি আড্ডার স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে কর্তব্যপালনের বন্ধ্যা জমিতে নেমে এসেছে। নির্দিষ্ট সময়ে কর্মস্থলে যাওয়ার মতো নির্দিষ্ট দিনে যেখানে যেতে হয় তাকে, আর যাই হোক, আড্ডা বলা চলে না।

কেননা আড্ডার প্রথম নিয়ম এই যে তার কোনো নিয়মই নেই; সেটা যে অনিয়মিত, অসাময়িক, অনায়োজিত সে-বিষয়ে সচেতন হ'লেও চলবে না। ও যেন বেড়াতে যাবার জায়গা নয়, ও যেন বাড়ি; কাজের শেষে সেখানেই ফিরবো, এবং কাজ পালিয়ে যখন-তখন এসে পড়লেও কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না।

তাই ব'লে এমন নয় যে এলোমেলোভাবেই আড্ডা গ'ড়ে ওঠে। নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে তার পিছনে কোনো-একজনের প্রচ্ছন্ন কিন্তু প্রখর রচনা-শক্তি চাই। অনেকগুলি সর্ত পূরণ হ'লে তবে আড্ডা ঠিক আড্ডা হ'য়ে ওঠে। একে-একে বলছি।

আড্ডায় সকলেরই মর্যাদা সমান হওয়া চাই। ব্যবহারিক জীবনে মানুষে-মানুষে নানারকম প্রভেদ; সে-ভেদবুদ্ধি আপিশের কাপড়ের সঙ্গে-সঙ্গে যারা ঝেড়ে ফেলতে না জানে, আড্ডার স্বাদ তারা কোনোদিন জানবে না। যদি কোনো মানুষ থাকেন যিনি এতই বড়ো যে তাঁর মহিমা কখনো ভুলে' থাকা যায় না, তাঁর পায়ের কাছে আমরা ভক্তের মতো বসবো, কিন্তু আমাদের আনন্দে তাঁর নিমন্ত্রণ নেই, কেননা তাঁর দৃষ্টিপাতেই আড্ডার রেশমি তরলতা বরফ হ'য়ে জমে যাবে। আবার অন্যদের চাইতে অনেকখানি নিচুতে যার মনের স্তর, তাকেও বাইরে রাখা দরকার, তাতে তারও শান্তি। আড্ডায় লোকসংখ্যার একটা স্বাভাবিক সীমা আছে; উপরের সীমা দশ কিংবা বারো; নিচের সীমা তিন। দশ-বারোজনের বেশি হ'লে অ্যালবার্ট হল হ'য়ে ওঠে, কিংবা বিয়ে-বাড়িও হ'তে পারে; আর যদি হয় ঠিক দু'জন তাহ'লে তার সঙ্গে কূজনই মেলে—পদ্যেও, জীবনেও। যে-ক'জন থাকবেন তাঁদের স্বভাবের উপর-তলায় বৈচিত্র্য তো থাকবেই, কিন্তু নিচের তলায় মিল না-থাকলে পদে-পদে ছন্দপতন হবে। পারস্পরিক অনুরাগ ও অনুকম্পা সতই যাদের কাছে টানে আড্ডা তাদেরই জন্যে, এবং তাদেরই মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত; চেষ্টা ক'রে সংখ্যা বাড়াতে গেলে আড্ডার প্রাণ-পাখি তখনই উড়ে পালাবে।

ঐ ক'জন এক সুরে বাঁধা মানুষ একত্র হ'লেই যে-আড্ডা জমে উঠবে তাও কিন্তু নয়। জায়গাটিও অনুকূল হওয়া চাই। আড্ডার জন্য ঘর ভাড়া করা আর শোক করবার জন্য কাঁদুনে ভাড়া করা আমার মনে হয় একই কথা। অধিগম্য বাড়িগুলির মধ্যে যেটির আবহাওয়া সবচেয়ে অনুকূল, সেই বাড়িই হবে আড্ডার প্রধান পীঠস্থান। সেই সঙ্গে একটি দুটি পারিপার্শ্বিক তীর্থ থাকাও ভালো, মাঝে-মাঝে জায়গা-বদল করাটা মনের ফলকে শান দেয়ার সামিল; ঋতুবৈচিত্র্য

এবং চাঁদের ভাঙাগড়া অনুসারে ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে ছাতে, এবং ছাত থেকে খোলা মাঠে গেলে সেই সম্পূর্ণতা লাভ করা যায়, যা প্রকৃতিই শুধু দিতে পারে। কিন্তু কোনো কারণেই, কোনো প্রলোভনেই ভুল জায়গায় যেন না যাওয়া হয়। ভুল জায়গায় মানুষগুলোকেও ভুল মনে হয়, ঠিক সুরটি কিছুতে লাগে না।

আড্ডার জায়গাটিতে আরাম থাকবে পুরোপুরি, কোনো আড়ম্বর থাকবে না। আসবাব হবে নিচু, নরম, অত্যন্ত ঝকঝকে নয়, যদি মরজি-মতো অযথাস্থানে সরিয়ে নেবার আন্দাজ হালকা হয় তাহ'লে তো খুবই ভালো। চেয়ার টেবিলের কাছাকাছি একটা ফরাশও থাকবে—যদি রাত বেড়ে যায়, কিংবা কেউ খুব ক্লান্ত থাকে, তাহ'লে শুয়ে পড়বার জন্যে কারো অনুমতি নিতে হবে না। চা থাকবে, সিগারেট থাকবে, আর খাদ্য যদি কিছু থাকে তা স্বাদু, স্বল্প এবং শুকনো, যেন শুয়ে-শুয়েও খাওয়া যায়, এবং খাবার পরে হাত-মুখ ধোবার জন্য উঠতে হয় না। বাসনগুলি জমকালো হবে না; পরিচ্ছন্ন হবে; এবং ভৃত্যদের ছুটি দিয়ে গৃহকর্ত্রী নিজেই যদি খাদ্যপানীয় নিয়ে আসেন এবং বিতরণ করেন তাহ'লে আড্ডার যথার্থ মানরক্ষা হয়।

কথাবার্তা চলবে মসৃণ, মন্থর, স্বচ্ছন্দ স্রোতে, তার জন্যে কোনো চেষ্টা কি চিন্তা থাকবে না; প্রাণের মধ্যে যে-সব ঢেউ সব সময় উঠছে পড়ছে, কেজো দিনের কালিমার তলায় যা চাপা প'ড়ে থাকে, কথাগুলি যেন তারই ছলছলানি। এখানে সংকোচ নেই, বিষয়বুদ্ধি নেই, দায়িত্ববোধ নেই। ভালো কথা বলবার দায় নেই এখানে। ভালো কথা না আসে, এমনি কথাই বলবো; এমনি কথারও যদি খেই হারিয়ে যায়, থাকবো চুপ ক'রে—চুপ ক'রে থাকাতে ভয় কিসের। জোর ক'রে মেকি কথার অবতারণার চাইতে চুপ ক'রে থাকা অনেক ভালো। নানা কথার টানা-পোড়েনে যে-কাপড়টি বোনা হয়, চুপ ক'রে থাকা তো তারই সোনালি পাড়। পাড় জিনিশটা কাপড়কে রূপ দেয়, চুপ ক'রে থাকাটা কথাকে সুস্পষ্ট ক'রে তোলে। এইজন্যেই চুপ ক'রে থাকাকে যাঁরা বুদ্ধির পরাভব কিংবা সৌজন্যের ত্রুটি মনে করেন, আড্ডা জিনিশটা তাঁরা বোঝেন না। তার্কিক এবং পেশাদার হাস্য-রসিক—আড্ডায় এই দুই শ্রেণীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। যাঁরা প্রাজ্ঞজন, কিংবা যাঁরা লোকহিতে বদ্ধপরিকর, তাঁরাও এখানকার পথ খুঁজে পাবেন না। আড্ডার ইডেন থেকে যে-সূক্ষ্ম সর্প বার-বার আমাদের ভ্রষ্ট করে, তার নাম উদ্দেশ্য। যত মহৎই হোক, কিংবা যত তুচ্ছই হোক, কোনো উদ্দেশ্যকে ভ্রমক্রমেও কখনও ঢুকতে

দিতে নেই। এটা ধ'রে নিতে হবে যে আড্ডা কোনো উদ্দেশ্যসাধনের উপায় নয়, তা থেকে কোনো কাজ হবে না, নিজের কিংবা অন্যের কোনো উপকার হবে না। আড্ডা বিশুদ্ধ, নিষ্কাম, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ।

শুধু পুরুষদের নিয়ে, কিংবা শুধু মেয়েদের নিয়ে আড্ডা হয় না। শুধু পুরুষরা একত্র হ'লে কথার গাড়ি কাজের রেল ধ'রেই চলবে, যদি লাইন থেকে চ্যুত হয়, তাহ'লে গড়াতে-গড়াতে একেবারে সুরুচির সীমাও পেরিয়ে চ'লে যাবে। শুধু মেয়েরা একত্র হ'লে ঘর-সংসার, শাড়ি-গয়নার কথা কেউ ঠেকাতে পারবে না। আড্ডার উন্মীলন স্ত্রী-পুরুষের মিশ্রণে। মেয়েরা কাছে থাকলে পুরুষের, এবং পুরুষ কাছে থাকলে মেয়েদের, রসনা মার্জিত হয়, কণ্ঠস্বর নিচু পরদায় থাকে, অঙ্গভঙ্গি শ্রীহীন হ'তে পারে না। মেয়েরা দেন তাঁদের স্নেহ, তাঁদের লাবণ্য; পুরুষ আনে তার ঘর-ছাড়া মনের উদাসীনতা। বিচ্ছিন্নভাবে মেয়ের দ্বারা এবং পুরুষের দ্বারা পৃথিবীর অনেক ছোটো-বড়ো কাজ হয়; ছন্দ হয় দুয়ের মিলনে।

আড্ডা স্থিতিশীল নয়, নদীর স্রোতের মতো বহমান। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তার রূপের বদল হয়। মন যখন যা চায়, আড্ডাতে তা-ই পাওয়া যায়। কখনো কৌতুকে উজ্জ্বল, কখনো খামকা ভালো-লাগায় ভরপুর, কখনো স্বপ্নে মদির। বুদ্ধিতে লাগে হৃদয়ের স্পর্শ, হৃদয়ে জাগে বুদ্ধির আলো। আড্ডা যা দিতে পারে, আর-কিছুই তা পারে না। কিছুই আড্ডার মতো নয়। বিশ্ব-সভায় অখ্যাতির কোণে আমরা নির্বাসিত; যারা ব্যস্ত এবং মস্ত জাত, যাদের কৃপাকটাক্ষ প্রতি মুহূর্তে আমাদের বুকে এসে বিঁধছে, তারা এখনো জানে না যে পৃথিবীর সভ্যতায় আড্ডা আমাদের অতুলনীয় দান। যারা ছিলো বিশ্বজয়ী, তারা আজ স্বরচিত পুঞ্জ-পুঞ্জ উপকরণের তলায় চাপা প'ড়ে মরছে—প্রকৃতির প্রতিশোধের হাত থেকে তো বিশ্বজয়ীরও নিস্তার নেই। এই প্রায়শ্চিত্তের মহাযজ্ঞ যখন শেষ হবে, তখন নবজন্মের দুয়ার খুলে বেরিয়ে পড়বো আমরা, অস্ত্র নিয়ে নয়, মানদণ্ড নিয়ে নয়, ধর্মগ্রন্থ নিয়েও নয়, বেরিয়ে পড়বো আড্ডার নিশান উড়িয়ে, বিশুদ্ধ বেঁচে থাকার মন্ত্র নিয়ে, উদ্দেশ্যহীন ব্রত নিয়ে—আড্ডা দিয়ে আমরা বিশ্বজয় করবো, জয় করবো কিন্তু ধ'রে রাখবো না, জীবনটা যে বাঁচবারই জন্যে, এই কথাটা পৃথিবীর লোককে বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে আসবো আপন ঘরে। তারপর আমরাও বসবো প্রায়শ্চিত্তে, কারণ আড্ডাকে কাজে খাটিয়ে আমরাও পাপ করেছি।

কবিতা

সেই দিন

অমিয় চক্রবর্ত্তী

মহাত্মাজি যদি মারা যান
আকাশ হবে না খান্ খান্
পৃথিবী ঘুরবে।
কঠিন প্রাণ নেবে কিনে
মাঠে অগণ্য চাষী
জলে রোদে দিনে দিনে।
ধনিক বণিক আর বহু বেতনিক
দুমুঠো পুরবে;
উপবাসী
তিনি চলে গেলে।
প্রত্যহ হবে না প্রাণান্তিক
ভারতবর্ষের এই জেলে।

কেবল হঠাৎ-স্পষ্ট বেলা
(আরক্ত হবে না মধ্যবেলা)
(বিদ্যুৎ দেবেনা বহু চোখে)
জাগাবে হয়তো কারো চোখে
ছবি এই—

দোকানে বাজারে
আজো সবে হাজারে হাজারে
যেমন ছিলাম তাই আছি,
মুমূর্ষু হয়েও যারা বাঁচি
মেনে-নেওয়া কেমন স্বদেশে।
গান্ধীজি যাবার স্তব্ধ শেষে॥

দ্বারকায় বড় ভীড়

সুধীরকুমার চৌধুরী

দ্বারকায় বড় ভীড়, দ্বারকায় পথ চলা দায়,
মানুষ হারায় সেথা মানুষেরই গোলকধাঁধাঁয়।
একক মানুষে কেউ কাণাকড়ি হাঁকে না বাজারে,
হিসাব কোটিতে লক্ষে, বেচাকেনা অযুতে হাজারে।
কেহ কারে নাহি চেনে, কেহ কার মুখ নাহি চাহে,
দ্বারকায় বড় ভীড়, পাশাপাশি শ্মশানে বিবাহে।
মানুষেরা পঙ্গপাল, মানুষেরা পিপীলির সারি,
দ্বারকায় বড় ভীড়, কি মনে ভাবিছ চক্রধারী ?

বল্মীক সকল ঠাঁই মসূরিকা-গুটিকার মত,
আহার সংগ্রহ আর আহার-সঞ্চয় অবিরত।
কেবল অভাব আছে, কারও সেথা নাই অবসর,
সবাই সবারে শুধু সারাদিন করে সর সর।
দ্বারকায় স্থান নাই, নাই স্থান তিল-ধারণের,
কোথা রচি পাদপীঠ দেবতার অবতারণের ?
ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি, দ্বারকায় শুধু কাড়াকাড়ি,
দ্বারকায় বড় ভীড়, কি মনে ভাবিছ চক্রধারী ?

কেবল জঞ্জাল জমে ঈর্ষ্যায় বিদ্বেষে অবিশ্বাসে,
নিঃশ্বাস রুধিয়া যায় মানুষের কলুষ-নিঃশ্বাসে।
ধরা সেথা নিষ্পাদপ, তৃণশস্য দলিত নির্ম্মূল,
ফল-ছায়া-হীন মরু, দ্বারাবতী বিধাতার ভুল।
হৃদয় কি পাবে দাম ? হৃদয় ত থাকে না ভীড়ের,
প্রেম সেথা হোলিখেলা পূতিগন্ধ পচা আবিরের।
দ্বারকায় জমে পাপ, দ্বারকায় বাধে মহামারী,
দ্বারকায় বড় ভীড়, কি মনে ভাবিছ চক্রধারী ?

চুনি-পান্নার কান্না

হরপ্রসাদ মিত্র

স্ফটিকের মতো উজ্জ্বল বুদ্ধি
ঐকান্তিক মার্জ্জন এবং বিশুদ্ধি
সমস্তই ক্ষয় হ'লো।
আগামী কালের কানে কানে ব'লো
মানুষের রক্তে
পান্নার মতো সবুজ ঘাস
চুনির মত লাল হ'লো।

হায় রে প্রাণ,
হায় বিশুদ্ধ, আধ্যাত্মিক অভিমান!
বুদ্ধের শিষ্য,
খ্রীষ্টের বিশ্ব,
সব সত্ত্বেও মানুষ কী নিঃস্ব!

বারে বারে
বীরের নাসায় বারুদের সৌরভ।
পুরাকালের পাণ্ডব-কৌরব,
এ কালের দুর্দ্দমনীয় ভৈরব!
তোমরা কি ইতিহাসের গৌরব—
অথবা পৃথিবীর পৌনঃপুনিক রৌরব?
কাটা মানুষের কণ্ঠনলী
কথা কয় না
চোখ দেখে না, কান শোনে না
ত্বক্ ছোঁয় না।
অপূর্ণ সভ্যতারও কণ্ঠনলী
কথা কয় না,

চোখ দেখে না, কান শোনে না
ত্বক্ ছোঁয় না।
শুধু দাঁতের দংশনে বিষের লালা ঝরে
মড়ক-মারীর জন্য নিমন্ত্রণ ঘরে ঘরে।
বণিক বলেন, জয় হ'লো।
জ্ঞানীরা বলেন, অবশ্য কিছু ক্ষয় হ'লো।
কে জানে কি হ'লো!

আগামী কালের কানে কানে ব'লো,
মানুষের রক্তে
পান্নার মতো সবুজ ঘাস
চুনির মতো লাল হ'লো।

মোংলা

মনোজ বসু

বয়স আর কি তখন মোংলার—বারো কি তেরো। যাত্রা শোনার বড় শখ। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতেও অতটুকু ছেলের ভয় করে না, দু-তিন ক্রোশ মাঠ ভেঙে গ্রামান্তরে গিয়ে গান শোনে। সঙ্গের সম্বল একটি কলকে আর ছিলিম দুই তামাক।

বাপ সন্ধ্যাবেলা ভাঙ খেয়ে ব্যোম-ভোলানাথ হয়ে থাকে, তার চোখে ধূলো দেওয়া কঠিন নয়। শয়তান হচ্ছে সৎমা—মাথার প্যাঁচে প্যাঁচে বুদ্ধি। এমনি কখন চেয়েও দেখে না, কিন্তু যেদিনটা মোংলা পালিয়েছে সেদিন যেন হাত গুণে টের পায়। টেমি নিয়ে দো-চালাটা ঘুরে দেখে যায়। যা ভেবেছে, দুয়োর হাঁ-হাঁ করছে, মাদুর একপাশে গুটানো। শিকল তুলে তালা এঁটে দিয়ে যায় সৎমা—ভোর রাত্রে ফিরে চুপি-চুপি শুয়ে পড়তে না পারে।

সকালে হয়তো দেখা গেল, পোয়াল-গাদায় কি গোলার পিছনে কিম্বা নারিকেল-বাগানে শুকনো নারিকেল-পাতা বিছিয়ে অঘোরে মোংলা ঘুমুচ্ছে। একা দেখে সৎমা সুখ পায় না, বাপকে ডেকে এনে দেখায়। জাগাবার সবুরটুকুও সয় না—ঘুমন্ত অবস্থায় বেদম পিটুনি। সমস্ত পাড়া সচকিত হয়ে ওঠে।

বাপ মরল। মোংলাও বাড়ি ছাড়ল। নানা ঘাটের জল খেয়ে বেড়িয়ে অনেক দিন পরে আবার সে ফিরে এল। সংসারের বোঝা চাপল তার কাঁধে। বোঝাটা কিছু বেড়েছে ইতিমধ্যে; ঐ সৎমারই মামাতো ভাইয়ের ছেলে-মেয়ে এসে জুটেছে—নীলকান্ত আর চণ্ডী। কোন কুলে তাদের কেউ নেই এই পিসী ছাড়া। নীলকান্ত নিপাট ভালমানুষ, ঠিক তার উল্টো চণ্ডী। বর মরেছে, তা যেন এক লাটসাহেব হয়ে উঠেছে মেয়েটা।

বিয়ে হয়েছিল, তখন চণ্ডীর বয়স সাত। মোংলা গিয়েছিল সে বিয়েয়। নিমন্ত্রণ আসেনি, কাঁর মুখে যেন শুনেছিল কথাটা। তার নিমন্ত্রণ লাগে না, স্বজাতের মধ্যে কোন সামাজিক ভোজের খবর পেলে তক্ষুনি সে রওনা হবে, গিয়ে যথাসময়ে কলাপাতা টেনে নিয়ে লাইনের মধ্যে বসবে। চণ্ডীর বরকে দেখেছিল, ইয়া দশাসই জোয়ান, মোটা একজোড়া গোঁফ। লোকটার মনিহারি

দোকান ছিল হাটখোলায়, পয়সা করেছিল। বিয়ের সময় সোনার তাবিজ আর সোনার চিক দিয়েছিল চণ্ডীকে। গ্রামের লোকের তাজ্জব লেগেছিল। সাত বছরের ছোট্ট নতুন বউ ঝিকমিকে গয়না পরে বেড়াত, দেমাকে মাটিতে পা পড়ত না যেন।

বেশি নয়, চার-পাঁচটা বছর পরে বর মরে গেল। বাঁচল চণ্ডী। বরের ঐ বিষম গোঁফ দেখলে তার ভয় করত। অথচ সবাই ঠেলেঠুলে তাকে সেই বরেরই কাছে পাঠাত। চণ্ডী আসত, না এলে খুব পিটুনি দিত মা আর শাশুড়ী। তা ছাড়া ঐ মোটা গোঁফ জোড়া ছাড়া বরের আর কিছু ভয়ানক ছিল না। প্রায়ই সে এটা-সেটা এনে দিত চণ্ডীকে। সেই বর যখন মরল, চণ্ডীর একটু মনোকষ্টও হয়েছিল—আহা, আলতা-পাতা আর গন্ধ-তেল কে এনে দেবে তার জন্যে ?

আরও ক'বছর পরে চণ্ডীর চেহারা বড় খোলতাই হয়েছে, পথ চলে—যেন বিদ্যুতের ঝিলিক দিয়ে যায়। পরনে ধবধবে কাপড়, সর্বাঙ্গে কোথাও একছিটে ময়লা লাগতে দেয় না।

মোংলা ডাকে, চণ্ডী।

কি ? মারমুখী হয়ে ওঠে মেয়েটা।

অমন করিস কেনে ? কত দুঃখু হয় জানিস ?

চণ্ডী একটু নরম হয়ে বলে, তা জ্বালাস কেনে বারে বারে ? তা হলে তো গালমন্দ শুনতে হয় না।

জ্বালানো বললি এরে ? হা রে কপাল ! যৌবনে যুগিনী হয়ে থাকবি নাকি তুই ?

মুখ টিপে হেসে চণ্ডী বলে, মরণ !

মোংলা সাহস পেয়ে যায়। বলে, সাঙা যখন চলে আমাদের ঘরে—

চণ্ডীর রাগ কি মস্করা বোঝা যায় না।

তা তোকে সাঙা পুষব কেনে ? গলায় দড়ি দিই তো বাস্তুঘরের আড়ায় দেবো, শ্যাওড়ার ডালে দিতে গেলাম কেনে ?

সে হল তা হলে শ্যাওড়া-গাছের ডাল। মনে মনে মোংলা বড় আহত হয়, চণ্ডীর মরা বরের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে। কি এমন সোনার কার্তিক রে ! টাকা-পয়সা ছিল অবশ্য, কিন্তু বয়স ? আর চেহারা ?

মোংলা শুকনো মুখে বেরিয়ে যাচ্ছে, নীলকান্ত এসে চোখ টিপে জিজ্ঞাসা করে, বলে কি ?

বলছে তো ভালোই, মন্দ আর বলে কিসে ?

সে যে আমল পাচ্ছে না, এটা বলতে পৌরুষে বাধে।

নীলকান্ত বলে, বড় সাফ-সাফাই আমার বুনডি। নোংরা কিছু দু-চক্ষে দেখতে পারে না। তা তুমি ভাল লোক—তোমায় ভাল ছাড়া কি মন্দ বলবে ?

ছাঁৎ করে বুকের ভিতরে কেঁপে ওঠে মোংলার। ভাল লোক তো সে নয়। বাবা মারত বটে, তবু মনে মনে তার টান ছিল। সে চোখ উলটাল। মোংলা তখন 'দুত্তোর' বলে বেরিয়ে পড়ল এক যাত্রাদলের সঙ্গে। গান জানে, কিছু কিছু বাজনাও শিখেছে—তার ভাবনা কি দুনিয়ায় ?

যাত্রাদল থেকে শেষে জুটল এক বাইজির সঙ্গে তবলচি হয়ে। সেখানে মারামারি—বাইজির এক পেয়ারের মানুষ নাক কামড়ে নিয়েছিল ; মোংলা ছাড়েনি, ঠ্যাঙ ভেঙে দিয়ে এসেছে তার। লোকটার নাম রতন।

এ সব গোপন খবর, কেউ জানে না। কিন্তু চণ্ডীর সামনে এলে গা কাঁপে—যেন জাদু জানে চণ্ডী, চোখের দিকে চেয়ে সব গোপন খবর টেনে বের করে নেয়।

সেই খোঁড়া রতন একদিন খোঁজে খোঁজে এল। বলে, সেই যে একদিন গাঁয়ের নামটা শুনেছিলাম তোর মুখে। আমি ভুলিনে। লেখাপড়া করলে জজ-ম্যাজিষ্টর হয়ে যেতাম। অতিথ এসেছি ; কি খাওয়াবি, জোগাড় দেখ্—

আছে তো আছেই, একটা হাট গিয়ে আবার হাটবার এসে পড়ল, অতিথ নড়বার নাম করে না। মোংলা শেষটা স্পষ্টাস্পষ্টি বলে, মাগ্যিগণ্ডার বাজার—চালাই কি করে ? খসে পড়্ ভাই, খসে পড়্—

রতন ঘাড় নাড়ে, সে হচ্ছে না। দিব্যি আছি তোর এখানে। ঝামেলা নেই। তা আমিও রোজগার করে দিচ্ছি কিছু-কিছু।

আজকাল মোংলা বাবুর বাড়ি ঘরামির কাজ করে, ক্ষেতের বেড়া বাঁধে, কাঠ চেলা করে দেয়। কিন্তু এই খোঁড়া মানুষটাকে মজুরি দিয়ে ডাকবে কোন আহাম্মক ?

রতন চোখ মিটমিট করে বলে, বটে ! তোর রোজগারের দুনো-তেদুনো আনতে পারি। দেখবি ?

মোংলা কাতর হয়ে বলে, না ভাই, রোজগারে কাজ নেই। তুই চলে যা।

রতনের সঙ্গে সেই আগেকার অশুচিতার ছোঁয়াচ লেগে আছে যেন।

চণ্ডীর মতো মোংলারও এই একরকম শুচিবাই হয়েছে। রতন বিদায় হলে সে বাঁচে।

সকালে উঠে দেখে, রতন নেই—চলে গেছে। আরামের নিশ্বাস ফেলে বাইরে এল। চণ্ডী গোবর-মাটি দিয়ে দাওয়া নিকোচ্ছে। কর্তার মেজ ছেলে মধুসূদন উঠানে মোড়ার উপরে বসে; প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে মেজবাবু এদিকে এসে পড়েছেন। চণ্ডী ডেকে বসিয়ে কাজ করছে, আর তাঁর মুখে কলকাতা শহরের গল্প শুনছে।

দুপুরবেলা খুব একচোট ঝগড়া হল চণ্ডীর সঙ্গে।

মধুবাবু কেন আসে আড্ডা দিতে যখন তখন?

ভাল লোক—এই মোটা মোটা বই পড়ে। একদিন দেখে এসো ওদের বাড়ি গিয়ে।

আর আমরা মুখ্যু, খারাপ। তাই ফিরেও তাকাস না—উঁ?

মোংলা কি মধুবাবুকে প্রতিদ্বন্দ্বী ঠাউরেছে? খারাপ ইঙ্গিতে চণ্ডী চটে গেল। বলে, আমিই নিয়ে আসি ডেকে। রোজ আনব। কি করবে করো।

কি করবে, সে কি করবে? আচ্ছা, দেখিয়ে দেবে ভাল করে। গজগজ করতে করতে মোংলা কাজে চলে গেল। সারাদিন ঐ একটা কথা ভাবে, কি করা যায়? সাঙা করে ফেলবে সে চণ্ডীকে। ঘাড় নাড়লে শুনবে না, জোর করবে। নীলকান্তর মত রয়েছে, তখন আর ভাবনা কিসের? সমাজের মোড়লরাও তার দিকে ঢলবে, খুব একটা ভাল খাওয়া দেবে তাদের। ঐ পরিচ্ছন্ন মেয়েটা সত্যি সত্যি ঘরণী যদি হয়, তার স্বভাবে যা-কিছু কালি-ময়লা আছে সমস্ত শুধরে যাবে, সে ভাল হবে, নিষ্কলঙ্ক হবে।

মনে মনে মোংলা শান্ত এক ঘর-গৃহস্থালীর ছবি ভাবছে। বিয়ে করে চণ্ডীকে সে অঞ্চল-ছাড়া করে ছাড়বে। এমন জায়গায় নিয়ে যাবে, যেখানে মধুবাবুর চোদ্দপুরুষে নাগাল না পায়।

টাকা—টাকার দরকার। বিয়ের খরচ, মোড়লদের খাওয়াবার খরচ, চণ্ডীকে নিয়ে কোন এক নিরাপদ দূর শহরে তোলবার খরচ। বাবুদের বেড়া বেঁধে আর ঘর ছেয়ে আশী বচ্ছরেও তো এ টাকার জোগাড় হয়ে উঠবে না।

রতন দিন তিনেক পরে ফিরে এল। টাকার ধান্দায় বেরিয়েছিল, একেবারে চলে যায় নি। ক'টা টাকা সে দিল মোংলার হাতে। আর হেসে ফিসফিস করে একটা সুখবর বলে, একটা অনুরোধ জানায়, লোভ দেখায়। মোংলা ঘাড় নাড়ে,

না-না—সে কিছুতে হবে না। জানতে পারলে চণ্ডী আস্ত রাখবে না। মুখ দেখাবে সে কেমন করে? সব ভেস্তে যাবে। না ভাই, দরকার নেই এই কর্মে।

রতন বলে, কোন ঝক্কি নেই। বাড়িতে দুটো মাত্র মেয়েমানুষ—বুড়ি আর মেয়ে। মেয়েটা অঢেল গয়না নিয়ে এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। যা করতে হয় আমি করব, তুই থাকবি সাথে-সঙ্গে। একার কাজ তো নয়। চার আনা বখরা—পাই পয়সা অবধি হিসেব করে দেব দেখিস।

একবার—জীবনে এই শেষ বারের মতো পঙ্কজলে ডুব দিয়ে উঠবে নাকি? তারপর চণ্ডী আর সে···শহর, পাকা দালান···শান্ত স্বচ্ছন্দ ঘর-সংসার···ছেলে-মেয়ে···মোংলা নয়—তখন সে ভদ্রলোক, মঙ্গলাচরণ বাবু। আর রতনের পাকা বন্দোবস্ত বরাবর দেখে আসছে তো—কাক পক্ষীতেও টের পাবে না।

রতন ম্লান হেসে বলে, সেসব দিন আর আছে কি রে ভাই? বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, তার উপর পায়ের দোষ, ছুটতে পারিনে। তাই তো খোসামোদ করি তোদের। একটা হুলিয়া ঝুলছে, এদ্দিন তোর এখানে লুকিয়ে ছিলাম। কাজটা হাসিল হলে দু'ভাই একসঙ্গে সরে পড়ব। আমারও ঐ মত—আর এ পথে নয়। খাবো-দাবো, ঘুমুবো—ব্যস।

জায়গাটা এখান থেকে ক্রোশ ছয়েক দূর। দুপুরে খেয়ে-দেয়ে বেরিয়েছে। সন্ধ্যার পর গাঁয়ে গিয়ে উঠল। অন্ধকার, টিপিটিপি বৃষ্টি হচ্ছে, বাতাসও আছে।

অনেক রাত্রে রোয়াকে উঠে দু'জনে জানলায় কান পাতে। নাঃ, নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে মা আর বেটি। রোয়াকের হাতখানেক উপরে জানলাটা। এইটেই জুতমতো জায়গা। সিঁদকাঠি দিয়ে খুব সাবধানে খুঁড়তে লাগল। কষ্ট নেই, কাদার গাঁথনি। ইটের পর ইট সরাচ্ছে—কিন্তু টের পাওয়া যায় না, এমন পোক্ত হাত রতনের।

খোঁড়া শেষ হয়ে গেলে আবার খানিক কান পেতে থাকে। না, কোন রকম নড়াচড়া নেই। বুড়ি আর তার মেয়ে যেন মরে ঘুমুচ্ছে। উঠানে কুমড়ার মাচার এক পাশে কোণ-ভাঙা একটা খোলা-হাঁড়ি। লাঠির মাথায় হাঁড়িটা বসিয়ে সিঁদের মুখ দিয়ে রতন ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়, অল্প অল্প নাড়া দেয় লাঠিটা। অর্থাৎ একটা মানুষের মাথা যেন ভয়ে ভয়ে সিঁদের পথে ঢুকছে। রতন অনেকবার নাড়াচাড়া করল; কিন্তু না চেঁচামেচি, না কিছু—

মোংলার গা ঠেলে রতন বলে, এবারে তুই। তুই একবার পরখ করে দেখ, তারপর আমি—

মাথা ঢোকাতেই—সর্বনাশ, জাপ্‌টে ধরেছে ভিতর থেকে। বুড়ি বা বুড়ির মেয়ে নয়—পুরুষ মানুষ; বুড়ির জামাই এসেছে সন্ধ্যাবেলা, অত্যন্ত ঝানু লোক।

সকালবেলা ঐ বারান্দায় খুঁটির সঙ্গে গরুর দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে মোংলা। রক্ষা, তার গ্রাম থেকে অনেক দূরে—কেউ চেনে না। উঠানে ভিড় জমেছে। ছোট্ট একটা মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বয়সে তারই চেয়ে বছর দুয়েকের বড় একটা ছেলেকে ধাক্কা দেয়, কই খোকা-দা, চোর কোথায়?

ঐ যে—

দূর! ও দেখি মানুষ—

দারোগা এল সাইকেলে বেলা প্রহর দেড়েকের সময়।

এসেই একজোড়া ফুলো কঞ্চি কাটিয়ে আনল। সপাং-সপাং করে মারছে। মোংলার পিঠ ফুলে দড়ি-দড়ি হয়ে গেল।

সঙ্গে আর কারা ছিল? বল্ হারামজাদা, বল্—

মোংলা বারম্বার ঘাড় নাড়ে। না হুজুর, কিচ্ছু জানিনে আমি, একেবারে কিচ্ছু না—

তবে?

যাচ্ছিলাম দুব্বোডাঙায়। মাঠের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি—হু-হু করে হাওয়া এল, একেবারে যেন উড়িয়ে নিয়ে এল, হুজুর। জিনপরীর কাণ্ড—আমি কিছু জানিনে—

দারোগা হেসে বলে, সিঁদকাঠিটাও জিনপরী হাতে এনে দিল নাকি? তোর সেই জিনপরীটারই ঠিকানা চাচ্ছি রে শয়তান—

তারপর এত মারধোর—মোংলা একেবারে নির্বাক হয়ে রইল।

আদালতে হাকিম বললেন, বয়স কম দেখছি। সব বৃত্তান্ত খুলে বল, মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেব।

মোংলা কথা বলে না।

বাড়ি কোথায় তোর?

তা-ও বলে না। নাম বল্‌ল, জন্মেজয় দাস।

রাগ করে হাকিম ঠেসে দিলেন দু'বচ্ছর।

জেল থেকে বেরুল বছর দুয়েক পরে। খানিকটা এগিয়ে দেখে রতন। সে এসেছে, তারই জন্য অপেক্ষা করছে। রতন তার উপর খুব খুশি। বলে, সাবাস—তুই যে নাম বলিসনি, খাসা করেছিস।

রতন এই শহরেই আস্তানা নিয়েছে, কাজকর্ম দিব্যি চলছে। বলে, ঘরবাড়ি আছে তো সব? খোঁজখবর রাখিসনে? আচ্ছা শ্বশুড়বাড়ি এদ্দিন থেকে এলি, বাপের বাড়ি ঘুরে আয় দিন কতক। ফিরে আসিস। বিশ্বাসী মানুষ তুই—উন্নতি হবে। তোকে মানুষ করে দেব।

একখানা দশটাকার নোট তার হাতে দিল। মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, উঁহু—দু'বচ্ছর, দু'খানাই নে পুরোপুরি। আর এই একখানা দিচ্ছি, তোর সেই প্রাণেশ্বরীর জন্য। মিঠাই নিয়ে যাস। নোট তিনখানা তিনদিনে ফুঁকে দিয়ে আসতে পারিস তো বলব বাহাদুর। ধর্, সোনার চাঁদ ভাইটি আমার—

মুঠোয় নোট নিয়ে মোংলা বেরুল। নোংরা জেলের ভিতর দু'বছর কেটেছে, তারপর রতনের ঐ নোংরা বস্তিতেও কাটল তো ঘণ্টা দুয়েক। আর নয়, আর নয়। ছুটে বেরিয়ে সে বাঁচে।

কিনল ধোলাই-করা কাপড়, ধোয়া আদ্দির পাঞ্জাবি, চকচকে নূতন জুতা। চুল কাটল ফ্যাসান করে। গাঙে স্নান করতে গিয়ে সাবান ঘসে ঘসে সর্বাঙ্গের ধূলো তুলল। শুচি হয়েছে—আর মাত্র একটি মিথ্যাকথা জীবনে, চণ্ডীকে একটা কোন গল্প বানিয়ে বলতে হবে। এই ধরো, অনেক দূরে গিয়েছিল ব্যবসা করতে, কিম্বা আসামের চা-বাগানে আড়কাঠির খপ্পরে পড়ে। আর যাবে না, কোথাও সে যাবে না কোনদিন।

স্টেশন।

অভ্যাস বশে থার্ড-ক্লাসে উঠতে যায়। না, নোংরা কাপড়-চোপড় কত চোর-ডাকাত-গুণ্ডা মেথর-মুদ্দফরাস যাচ্ছে। পোড়া বিড়ি, ছড়ানো মুড়ি, শাল-পাতার ঠোঙা, থুতু-কাশি মেজের উপর। না, না, না—এখানে নয়। টিকিট বদলে নিল সেকেণ্ড ক্লাসের।

গাড়ি ছেড়েছে। মাঠের ফাঁকা বাতাস। আঃ—কতকাল পরে বাড়ি ফিরছে। ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগল কত দিন পরে!

পাকাচুল ফিটফাট সোনার চশমা-পরা এক ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়ছেন। স্থূলকায় মহিলা—ভদ্রলোকের স্ত্রীই হবেন—ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালছেন কাপে।

মোংলা বলে, যুদ্ধের কি খবর বা—? অভ্যাসবশে 'বাবু' বেরুচ্ছিল, চেপে নিল।

ভদ্রলোক যেন শুনতেই পেলেন না। মোংলা নাছোড়বান্দা। সে যে এঁদেরই

দলের—সুস্থ স্বচ্ছন্দ ভদ্রব্যক্তি। আবার প্রশ্ন করে। বিরক্ত মুখে ভদ্রলোক চোখ তুলে চাইলেন।

কি ?

আজকের খবরটা জানতে চাচ্ছি।

ভদ্রলোক কাগজটা তার দিকে এক রকম ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, ঐ সব চেয়ার খালি রয়েছে। পড়গে ওদিকে বসে।

মুখ ফিরিয়ে তিনি স্ত্রীর দেওয়া চায়ের কাপ তুলে নিলেন, আর ফিরেও তাকালেন না।

কাগজ নিয়ে করবে কি মোংলা ? ইংরেজি কাগজ। ফ্যাল-ফ্যাল করে সে চেয়ে থাকে। মুখের উপর কি পরিচয় লেখা আছে ? এত খরচ করে জামা-কাপড় কিনল, উঁচু ক্লাসের গাড়িতে যাচ্ছে—দাগ মুছল না কিছুতে ?

গ্রামে গিয়ে বাবুদের বাড়ির ধার দিয়ে চলেছে। ফটকে রসুনচৌকি—মধুবাবুর বিয়ে। পড়াশুনোয় ইস্তফা দিয়ে তিনি আজকাল গ্রামেই থাকেন। উঠানে পা দিতেই নীলকান্ত তাকে এই মারে তো মারে—

কুলে কালি দিয়েছিস আমাদের। সমাজে মুখ দেখাবার জো রাখলি নে।

টের পেয়ে গেছে নাকি এরা ? তবে চণ্ডীও জেনেছে ? তাই বা কেমন করে ? দারোগার কাছে বেতের পর বেত খেয়েছে, সে তো পরিচয় দেয়নি। তবে জানবে কি করে ? কোথায় চণ্ডী, কোথায় ? পাপের গন্ধে রাগ করে আড়ালে কোথাও হয়তো গিয়ে বসেছে। পৃথিবীতে পাপ ছাপাবার জো নেই···চাঁদ দেখছে সূর্য দেখছে—তারাই বোধ করি ভালমানুষদের কানে কানে নিঃশব্দ ভাষায় বলে দেয়।

মোংলা এসেছে শুনে দেখতে দেখতে লোকারণ্য। এয়ার-বন্ধুরা চোখ টিপে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় রেখে এলি সেটাকে ?

চণ্ডী গ্রামেই নেই। সে যেদিন গেল, সেই রাত্রে চণ্ডীও চলে গেছে। অতএব তারই সঙ্গে গেছে, সবাই ধরে নিয়েছে।

আরও অনেকক্ষণ পরে উত্তেজনার বেগ কিছু প্রশমিত হয়ে এলে নীলকান্ত বলে, মুখপুড়ীটা আছে কেমন ?

মোংলা হেসে বলে, ভালো—বেশ ভালো।

এলো না ?

উঁহু। একটু ভেবে বলে, লজ্জা লাগে কিনা মেয়েমানুষের! তা আসবে, আসবে বই কি! শহরে গিয়ে আমরা সাঙা করেছি—

নীলকান্ত বলল, এখান থেকেই করলে না কেন? হ্যাঙ্গাম হত না। মোড়লরা আমাদের একঘরে করে রেখেছে।

মিটে যাবে। ভাল করে একটা ভোজ দেব মোড়লদের। ঘাট যখন করে ফেলেছি, দশের মধ্যে নাকে খত দিতেও রাজি আছি আমি।

খরচপত্র হয়ে যে ক'টা টাকা ছিল মোংলা সমস্ত নীলকান্তর হাতে দিল। মোড়লদের ভোজের আয়োজন হচ্ছে। কিন্তু সে ক'টা দিনও সে থাকতে পারল না, কে যেন বিছুটি মারছে। পালাল। শহরে এসেছে, কিন্তু রতনের কাছে যাবে না, মরে গেলেও না। চাকরি করবে, সৎভাবে থাকবে, যেখানে সৌন্দর্য আনন্দ আর শান্তি, তার জায়গা সেইখানে।

দপ্তরিখানায় একটা কাজ জুটিয়ে নিল। দশটা থেকে খেটে খেটে এখন সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরছে। মন ভাল নেই। রোজই এই সময়ে মনটা খারাপ হয়ে যায়। ঘুরপথে ভদ্রপাড়ার ভিতর দিয়ে পিচ-ঢালা ঝকঝকে পথে সে বাড়ি ফেরে, সুবেশ সুশ্রী মেয়ে-পুরুষদের দেখে, সিমেণ্ট-মাজা পরিচ্ছন্ন কোন রোয়াকে হয়তো বসে থাকে খানিকক্ষণ।

আজ রাস্তাটা আঁধার-আঁধার, কৃষ্ণপক্ষের কোন তিথি হবে। হঠাৎ পাশের একটা জানলা খুলে গেল, স্নিগ্ধ সাদা আলোর ধারা পড়ল তার সামনে। হাসি ···কি মিষ্টি হাসি—হাসির ধারা রাস্তায় উছলে এসে পড়ছে। কি ভালোই লাগল মোংলার, মন হালকা হয়ে যেন উড়ছে। দেখতে চেষ্টা করে, ভিতরে কি ব্যাপার—কারা হাসছে, কেন হাসছে। জানলা উঁচুতে—নাগাল পায় না। ডিঙি মেরে ওঠে। না—নজর চলে না তো। হাতখানেক দেয়াল বেয়ে উঠে দেখবার আগ্রহ; কাঠবিড়ালের মতো আঁচড়ে আঁচড়ে উঠতে যায়। পারে না, পড়ে গেল, জানলাও বন্ধ করে দিল এইসময়। মোংলার দেখা হল না।

আচ্ছা, কাল—কালকে দিনমানে যখন ফটক খুলবে।

সত্যিই সে সকালবেলা আবার এসেছে। গান হচ্ছে। ভারি স্ফূর্তির বাড়ি এটা তো! ফুটফুটে একটি মেয়ে কচি গলায় গান গাইছে। খাসা গাইছে। পায়ে পায়ে মোংলা এগিয়ে দাঁড়ায়। ঘরে দশ-বারো জন লোক। ডুগি-তবলা পড়ে আছে, মেয়েটি শুধু এসরাজ বাজিয়ে গাইছে। আহা, সঙ্গত হচ্ছে না এ রকম গানের! তবলা দেখে মোংলার হাত নিসপিস করে উঠল। সকলের

পিছনে বসে পড়ল। তবলা সেখানেই; বোল তুলছে, ধিন তারে তেরে কেটে—

ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে মেয়েটি গান থামাল। কিন্তু কেন? তবলার তাল কাটেনি। তা হলে রাগ কেন?

লম্বাপানা মুখ এক ভদ্রলোক ভাঁটার মতো চোখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন, কে তুমি?

থাকি ঐ সামনের বাড়িতে—।

বাড়ি কোথা সামনে? লখার বস্তিতে থাকিস তুই? নাম্ ফরাস থেকে, বেরিয়ে যা—

হঠাৎ দরজার দিকে চেয়ে আরও উচ্চকণ্ঠে তিনি রুখে উঠলেন, বেরো—আবি নিকালো হিঁয়াসে—

সেখানে মাটির সানকি তুলে ধরে একটি মেয়ে ভিক্ষা চাইছে। নোংরা শতচ্ছিন্ন কাপড়—দু'হাত বিষাক্ত ঘায়ে ভরে গেছে, রস গড়িয়ে পড়ছে। মোংলা চক্ষের পলকে হাত ধরে মেয়েটাকে বাইরে নিয়ে গেল। ভদ্রলোক তখন দরোয়ানের উপর হুমকি ঝাড়ছেন, ফটক খুলে রাখিস কার হুকুম মতো? রাস্তার যত আপদ এসে জোটে, দেখতে পাস না?

সেই চণ্ডী এখানে এই অবস্থায়। ফুটপাথে গাছের তলায় বসে মোংলা তার কাহিনী শুনল। পশ্চিম অঞ্চলে এক স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে তাকে ফেলে পালিয়েছিল মধুবাবু। নিঃসম্বল—না মরে কেমন করে সে যে এতদূর এসে পৌঁচেছে, সে এক ইতিহাস। আর এইটুকু পথ গ্রাম অবধিও সে যেতে পারত—মতলবও ছিল তাই, গ্রামে গিয়ে মধুবাবুর কীর্তি ফাঁস করে দেবে—কিন্তু এ অবস্থায় এই রোগপীড়া নিয়ে আপন-লোকের মধ্যে যেতে পারে নি, ইচ্ছা থাকলেও লজ্জায় আটকেছে—

মোংলাও মানা করল, না—যাস নে তুই চণ্ডী। সবাই জানে, আমার সঙ্গে সাঙা হয়েছে—সুখে স্বচ্ছন্দে তুই ঘরকন্না কচ্ছিস—

চণ্ডী নয়—মোংলাই চলল। গ্রাম অবধি যেতে হল না, স্টেশনে মধুবাবু। নূতন বউ বাপের বাড়ি গেল, বিদায় দিয়ে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে তিনি রুমাল উড়াচ্ছিলেন।

চণ্ডী কোথায় বাবু?

চণ্ডী ? চণ্ডী আবার কে ?

চেনোই না মোটে ? মোংলা বিশ্রীভাবে হেসে উঠল।

বলে, সে আমার সঙ্গে এসেছে। দেখা করবে বলে উ-ই যে দাঁড়িয়ে আছে।

মধুর মুখ সাদা হয়ে গেল। বলে, কোথা ?

মোংলা তার হাত ধরে প্ল্যাটফরমের নির্জন শেষপ্রান্তে নিয়ে চলল।

ভীতকণ্ঠে মধু প্রশ্ন করছে, কোথায় ? কোথায় সে ?

নিচে, পাতালে—

জোরে ধাক্কা দিয়ে মধুকে ফেলে দিল লাইনের উপর। লোহার লাইনে কপাল ফেটে রক্তের ধারা বইল। অচেতন, নিশ্বাস বইছে কিনা কে জানে !

সেই থেকে মোংলা পালিয়ে বেড়ায় শিয়ালের মতো। বনে জঙ্গলে আস্তাকুড়ে—ভাল লোকেরা যেখানে পা দেয় না।

ধরা পড়লে তার বিচার হবে ; আদালতে পাখার নিচে অতিকায় পুঁথি খুলে অজস্র কথার বৃষ্টি হবে। ভারিক্কি চালচলন ; হাকিম থেকে পেয়াদা—সকলেরই ধারণা, তারা এক একটা মহাকীর্তি করছে, জগতের মহোপকার সাধন হচ্ছে।

ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সেই গলি—রতনের বস্তি। যেখানে মোংলা কোনদিন আর ঢুকবে না বলেছিল।

রতন গাঁজা টানছিল, কলকে বাড়িয়ে সাগ্রহে তাকে অভ্যর্থনা করে।

তিনদিনে ফিরবি তা তিন মাস করে ফেললি যে, সোনার চাঁদ। ভাবলাম, আর আসরি নে—

মোংলা বলে, না এসে যাই কোন চুলোয় ? ভদ্দোর শালারা একঘরে করেছে। ও দাদা, দেখে এলাম সব সমান—তোমার এই গোটা পিরথিমটাই হারামজাদা—

শোঁ-ও-ও করে সুখটান দিল কলকেয়। কলকে ফেটে যাবার দাখিল।

মার্ক্সবাদ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

কথাটা হয়ত অদ্ভুত শোনাবে: বাংলাদেশ কার্ল মার্ক্সের নামের সঙ্গে যতই পরিচিত হয়ে উঠছে, মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে বিকৃত এবং হাস্যকর ধারণা ততই এখানে শিকড় মেলবার চেষ্টা করছে। অদ্ভুত শোনালেও কথাটা সত্য। মার্ক্সবাদ যদি সুবিধাবাদে পরিণত হয় তাহলে সুবিধাবাদী শ্রেণীর মধ্যে মার্ক্সের নাম চৈত্রের আগুনের মতো হু-হু করে ছড়িয়ে পড়বেই। তাছাড়া আরো একটি শ্রেণী আছে যার আশ্রয়ে অনবরতই এই অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে চলেছে; এ শ্রেণীর মানুষরা ভারতবর্ষের স্বাতন্ত্র্যরক্ষী। কিম্বদন্তীর মতো তাঁরা শুনতে পেয়েছেন যে মার্ক্স ঘোরতর জড়বাদী, কাজেই তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে একটা বিকৃত ধারণা করে নিয়ে তাঁরা মার্ক্সবাদকে খণ্ডন করবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে প্রায় সবাই মার্ক্সের সঙ্গে শত্রুতা করেই চলেছেন; মার্ক্সের লাভের ঘরে মাত্র এটুকু দেখা যায় যে নামটা তাঁর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

মার্ক্সের নামের সঙ্গে, যে করেই হোক, আমরা যখন আর অপরিচিত থাকতে পারছিনে, তখন মার্ক্সবাদ বস্তুটির আসল চেহারা যে কি তা জেনে নেবার একটা সুস্থ কৌতুহল অন্তত আমাদের থাকা উচিত। ভারতীয় দর্শনকে আমরা ত্যাগ না করতে পারি কিন্তু যা অভারতীয় তাকে হীন প্রতিপন্ন করতে হলে তার যথার্থ রূপটাকে বিকৃত করে নোব এমন একটা প্রতিজ্ঞা মনে মনে পোষণ করা খুবই অশোভন এবং অসুস্থ।

এ ধরণের কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায় যে মার্ক্স না কি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না, মার্ক্স বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, এমন কি—মার্ক্সবাদীও ছিলেন না। তিনি কি কি ছিলেন না সে গবেষণা করবার আগে আমাদের জেনে নেওয়া উচিত তিনি কি কি ছিলেন। এটুকু নির্ভুল ভাবে জানতে পারলে হয়ত মার্ক্সবাদও আমাদের কাছে খানিকটা নির্ভুল হয়ে আসবে। অন্তত এতটা ভুল আমরা নিশ্চয়ই করব না, গত চৈত্র সংখ্যা 'চতুরঙ্গে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে অধ্যাপক বটব্যাল ঘোষ যা করেছেন। ভারতবর্ষের যে সমাজতন্ত্র ছাড়া গত্যন্তর নেই এই ভূমিকা নিয়েই প্রবন্ধটি সুরু হয়েছে কিন্তু কিছু দূর গিয়েই দেখা গেল

প্রবন্ধকার মার্ক্সবাদকে সহ্য করতে পারছেন না। অবশেষে আমাদের শুনতে হ'ল মার্ক্সবাদ বিজ্ঞান বা দর্শন কিছুই নয় এবং মার্ক্সবাদীরা তস্করবৃত্তিরই প্রচারক।

ভুল বুঝবার অধিকার মানুষের থাকতে পারে, কিন্তু অধিকার বুঝে নেবার ভুল সভ্য মানুষ নিশ্চয়ই সমর্থন করবে না: কথা বলবার স্বাধীনতা আছে বলে কথা বলবার শালীনতা আমরা হারাতে পারিনে। অধ্যাপক ঘোষ মার্ক্সবাদকে ভুল বুঝেই নিরস্ত হননি, ভ্রান্তির পুঁজি নিয়ে আবার কটূক্তি বর্ষণও করেছেন। আমরা জেনে নিলাম যে কটূক্তি বর্ষণের ক্ষমতা তাঁর আছে, কিন্তু এই শক্তি প্রদর্শনের আগে তাঁরও জেনে নেওয়া উচিত ছিল মার্ক্সবাদের রূপটা কি! তিনি বল্‌ছেন:

"সমাজতন্ত্রের অসংখ্য রূপ আছে। শুনা যায় যে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপ হইল মার্ক্সবাদ, কারণ ইহাই নাকি বিজ্ঞানসম্মত বা scientific....."

জনশ্রুতিকে অবলম্বন না করে নিজের চেষ্টায় যদি অধ্যাপক ঘোষ মার্ক্সবাদের রূপটা উপলব্ধি করবার কষ্ট স্বীকার করতেন তাহলে হয়ত তাঁকে আর এই প্রবন্ধটি লিখবার সময় ও শ্রম অপচয় করতে হত না। সমাজতন্ত্রের অসংখ্য রূপ নেই—সমাজতন্ত্রের রূপ একটিই, তা সমাজের এমন একটি অবস্থা যেখানে শোষক আর শোষিত এই দুই শ্রেণীর কোনটিরই অস্তিত্ব থাকবেনা। তবে সমাজতন্ত্রে পৌঁছুবার পথ সম্বন্ধে নানা লোক নানা মত পোষণ করে গেছেন—ধনতান্ত্রিক ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টনের শৈশব থেকেই এসব মতবাদ মানবতাধর্ম্মীদের মারফৎ সমাজের আবহাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। একই সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্যে আন্দোলনের গতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন চেহারা নিয়ে চলতে সুরু করল। ইংলণ্ডে আওয়েন সাহেবের প্রচেষ্টা এবং চার্টিষ্ট আন্দোলন, ফ্রান্সে বিপ্লবী গুপ্তসমিতি এবং সেণ্ট সাইমনের আন্দোলন সবই এক লক্ষ্যে পৌঁছুবার বিচিত্র পথ।

মার্ক্স সমাজতান্ত্রিক হিসেবেই জীবন আরম্ভ করেন নি—কিম্বা তাঁর সময়কার সমাজতান্ত্রিক যে কোনো একটি পথ ধরেও চলতে সুরু করেন নি। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ মনে দানা বাঁধবার আগে তিনি হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করে নিয়েছিলেন। হেগেলকে বর্জ্জন করে যখন তিনি হেগেলের বামপন্থী শিষ্য ফয়ারব্যাকের দলে এসে ভিড়লেন তখনও তাঁর মন হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে বর্জ্জন করতে পারল না। আবার প্রকৃতি-পরায়ণ ফয়ারব্যাককেও যখন সমাজবোধের তাড়নায় তিনি ছেড়ে আসতে বাধ্য হলেন, ফয়ারব্যাকের জড়বাদকে পুঁজি হিসেবেই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি আর ফয়ারব্যাকের জড়বাদ এ দুয়ের মিশ্রণেই মার্ক্সীয় দর্শন বা দ্বান্দিক জড়বাদের উৎপত্তি হয়।

দ্বান্দ্বিক জড়বাদের মূল সূত্র হল এই যে বস্তুজগৎ বা প্রকৃতি মানুষের অনুভূতি বা চেতনার সঙ্গে সম্পর্ক না রেখেই বর্ত্তমান। যেহেতু বস্তুনিরপেক্ষ কোনো ভাবপ্রক্রিয়া থাকতে পারে না মার্ক্স সেই জন্যেই বলেছিলেন, "চেতনা সচেতন জীব ছাড়া আর কিছু নয়; মানুষের সত্যিকারের জীবন-পদ্ধতিই তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে।" কিন্তু মার্ক্সের এই দ্বান্দ্বিক জড়বাদ তখনও দর্শনের বৈতণ্ডিক এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বান্দ্বিক জড়বাদ যে 'মানুষের সত্যিকারের জীবন-পদ্ধতি'র বা সমাজগত মানুষের জীবনধারার নির্ভুল ব্যাখ্যা দিতে পারে তা প্রমাণ করতে ধনবিজ্ঞানের সাহায্য দরকার। বিভিন্ন যুগের সামাজিক অবস্থা যদি ধনবিজ্ঞানের সহায়তায় দ্বান্দ্বিক সূত্রানুযায়ী ব্যাখ্যাত হয়ে যায় তাহলেই দ্বান্দ্বিক জড়বাদকে বিজ্ঞানের মর্য্যাদা দেওয়া সম্ভব। মার্ক্সের হাতেই দ্বান্দ্বিক জড়বাদ সে-মর্য্যাদা পেয়েছে কিন্তু তা কিছুদিন পরে। তার আগে কয়েক বৎসর তিনি অক্লান্ত ভাবে অর্থনীতি ও অর্থনীতির ইতিহাস পড়াশুনো করেছেন, ফরাসী ও জার্ম্মেণ শ্রমিক-আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন এবং পরিচিত হয়ে উঠেছেন ইংলণ্ডের যান্ত্রিক ধনোৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করবার চেষ্টায় ফরাসী চিন্তা-নায়ক ও শ্রমিক আন্দোলনের পুরোহিত প্রুধঁ একটি গ্রন্থ রচনা করেন ('The System of Economic Contradictions'—subtitle—'The Philosophy of Poverty')। গ্রন্থটিতে প্রুধঁ ইতিহাসকে উপেক্ষা করেছেন, অর্থনীতির কতগুলো অপরিবর্ত্তনীয় সূত্র মেনে নিয়েছেন তারপর হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির অপপ্রয়োগ করে সমাজতন্ত্রে পৌঁছুবার একটা পথ বাৎলে দিয়েছেন। প্রুধঁর প্রত্যুত্তরে মার্ক্স সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় গ্রন্থ—"Poverty of Philosophy"—রচনা করলেন। এই গ্রন্থেই ব্যাখ্যাত হল 'ঐতিহাসিক জড়বাদ'—প্রকৃতি-বিজ্ঞানে ডারুইনের দানের মতই সমাজ-বিজ্ঞানে যার মূল্য অপরিমেয়। মার্ক্স প্রমাণ করলেন মানুষ কতগুলো ঐতিহাসিক অধ্যায় অতিক্রম করে এসেছে, প্রত্যেক অধ্যায়েই সমাজ গঠন নির্ভর করেছে ধনোৎপাদনের উপর; সমাজের কাঠামোটাই সে-সে অধ্যায়ের রাষ্ট্রিক ও মানসিক ইতিহাসের ভিত্তি; ফলে মানুষের ইতিহাস হয়ে উঠেছে শ্রেণীদ্বন্দ্বেরই ইতিহাস—দ্বন্দ্ব চলেছে শোষক আর শোষিতের, শাসক আর শাসিতের মধ্যে সংঘাত বাধছে। সমাজের অগ্রগতি এই দ্বান্দ্বিক ও সাংঘাতিক শক্তির গতিবেগের উপরই নির্ভর করে। এই সংঘাত এখন এমন একটি অবস্থায় এসে উপস্থিত, যখন নির্য্যাতিত শ্রেণী, মানে বিত্তহীন শ্রমিক, সমাজকে চিরদিনের

জন্য শোষণ ও নির্য্যাতন থেকে মুক্ত না করে উৎপীড়ক ধনিকশ্রেণীর খর্পর-মুক্ত হতে পারে না। ইতিহাসের প্রামাণ্য নজির সংগ্রহ করে বিশুদ্ধ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে মার্ক্স এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের ইতিহাস উদ্ঘাটন করে দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রুধঁ বলেছিলেন অর্থনৈতিক সম্বন্ধগুলো মানুষের ইচ্ছা দ্বারাই শাসিত, মার্ক্স প্রুধঁর এই অবৈজ্ঞানিক উক্তি খণ্ডন করে প্রমাণ করলেন যে এ সম্বন্ধ উৎপাদন-শক্তির অবস্থা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই প্রুধঁর বিখ্যাত উক্তি: "সম্পদসঞ্চয় চৌর্য্যবৃত্তি মাত্র"—যুক্তিসহ নয়, ইচ্ছা করে কেউ সম্পদসঞ্চয় করতে পারে না—উৎপাদন-শক্তির অবস্থা-ই এক শ্রেণীর ভাণ্ডারে সম্পদ সঞ্চয় করে' অপর শ্রেণীকে নিঃস্ব, রিক্ত করে তোলে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীতে 'সারপ্লাস ভ্যালু' কি করে পুঁজির কলেবর স্ফীত করতে থাকে তার নিখুঁত ও বিশদ ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী কালে 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে বর্ণনা করলেও তার আভাস 'Poverty of Philosophy" গ্রন্থেই মার্ক্স দিয়ে গেছেন। 'সারপ্লাস্ ভ্যালু'র আবিষ্কার যে শুধু ধনতান্ত্রিকতার ফাঁকিই ধরিয়ে দিয়েছে তা নয়, এই আবিষ্কারই শ্রমিক-শক্তিকে তার ন্যায্য অধিকার-বোধে উদ্দীপিত করে ভবিষ্যৎ সমাজ-গঠনের অবিসংবাদী নায়ক হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছে।

আজকের দিনের শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাকে আগামী দিনের শোষণহীন অবস্থায় নিয়ে যাবার ঐতিহাসিক ভূমিকা বিত্তহীন শ্রমিকদের উপরই ন্যস্ত—মার্ক্স ধনবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তিতে এ তথ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন; তাতে আবেগ-প্রবণতা নেই, ভাববিলাস নেই—আছে শুধু বিশুদ্ধ যুক্তি। অবশ্যম্ভাবী শ্রেণীদ্বন্দ্বের জন্যে শ্রমিক-সৈনিকদের তিনি সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে বলেছেন, বলেছেন রণসজ্জায় সজ্জিত হ'তে। সমাজতন্ত্রের এই পথই মার্ক্স আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন; প্রুধঁর মতো তিনি বিত্তহীন শ্রমিকদের জ্ঞান-পিপাসু করে তুলতে চাননি; ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীবিভাগ হয়ে শ্রেণীদ্বন্দ্ব এগিয়ে চলেছে; মার্ক্স তাই বলেছেন, জ্ঞান দিয়ে শ্রমিকদের মগজ ভর্ত্তি করে লাভ নেই, চোখের উপর যা তারা দেখতে পাচ্ছে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করুক, উপদেশ-নির্দ্দেশ দেবার সময় আর জ্ঞানের নেই, জ্ঞান এখন বিপ্লবী, ইতিহাসের গতি-জাত সচেতন পদার্থ। এরই নাম মার্ক্সবাদ—মার্ক্সবাদ শ্রমিকের কর্ম্ম-নিয়ন্তা। মার্ক্স এর নাম দিয়েছিলেন 'কম্যুনিজ্‌ম্'—আর বলেছিলেন: "কম্যুনিজ্‌ম্ মানব-সমাজের কোনো রূপ নয়, আসন্ন ভবিষ্যতে যাবার একটি পদ্ধতি মাত্র।"

ধনোৎপাদন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল শ্রেণীসত্তা, শ্রেণীপ্রাধান্যে গঠিত সমাজ

রূপ, শ্রেণীদ্বন্দ্বে সামাজিক বিবর্ত্তন, এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা হিসেবে বিত্তহীন শ্রমিকশক্তিকে চিনে নেওয়াই মার্ক্সবাদের বৈজ্ঞানিক সূত্র। মার্ক্সবাদ অনুমানের উপর নির্ভর করে নেই। Hypothesis বা অনুমান বিজ্ঞান নয়। প্রাকৃতিক কোনো পদ্ধতি আমাদের কল্পনায় নিখুঁত ভাবে এলেও তা হয়ত বিজ্ঞান হয়ে ওঠেনা ; সেই পদ্ধতিকে করায়ত্ত করে আমাদের প্রয়োজনে নিয়োগ করতে পারলেই আমাদের কল্পনা বিজ্ঞানের রূপ পায়। যুক্তিতর্কনজির পেছনে থাকা সত্ত্বেও মার্ক্সবাদ হয়ত একটি Hypothesis হয়েই থাকত কিন্তু রুশবিপ্লবের পর যে কোনো সন্দেহাকুল মনই বলতে বাধ্য হবে মার্ক্সবাদ বৈজ্ঞানিক। বিপ্লবোত্তর রাশিয়া কেন আঁকাবাঁকা পথে যেতে বাধ্য হয়েছে সে তর্কের সঙ্গে মার্ক্সবাদের বৈজ্ঞানিকতার কোনো সম্বন্ধ নেই। তাছাড়া অর্থনীতির দিক থেকেও মার্ক্সের বিচারপদ্ধতির বৈজ্ঞানিকতা আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে। ধনতান্ত্রিক ধনোৎপাদন 'মনোপলি ক্যাপিটেলে' এসে যে পরিণত রূপ গ্রহণ করে মার্ক্সের বিচারপদ্ধতি একশো বছর আগেই তার সন্ধান দিতে সক্ষম হয়েছিল—মার্ক্সের সময়ে 'মনোপলি ক্যাপিটাল' রূপ পরিগ্রহ করেনি, মাত্র বিংশ শতকে তার সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে পারছি—কাজেই আজকের দিনে আমরা মার্ক্সের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তকে অবৈজ্ঞানিক বল্‌ব কোন্ স্পর্দ্ধায় ?

মার্ক্সবাদকে যথার্থভাবে চিনতে চেষ্টা করলে তার উপর কাদা ছিটানোর প্রয়োজন কোনো বুদ্ধিজীবী অনুভব করতে পারেন কিনা সন্দেহ। এইচ্, জি, ওয়েল্‌সের মতো যাঁর বুদ্ধি ব্যক্তিস্বার্থে ঘোলাটে হয়ে উঠেছে তাঁর কথা অবশ্যি আলাদা—তাঁর কাছ থেকে মার্ক্সবাদের বিকৃত ব্যাখ্যা এবং স্বার্থান্ধ যুক্তিই আশা করা যায়। তাঁর প্রসঙ্গে মার্ক্সের ভাষায় আমরা এ-কথাই বলতে পারি : "Reason has always existed, but not always in a rational form."

শতভিষা

সুবোধ ঘোষ

৪

রজনীবাবুকে দেখলে মনে হয় এক প্রত্যূষের শান্তি যেন তাঁর সকল ভাবনাকে ছেয়ে রয়েছে। শান্ত অথচ সজীব। এই শান্তির পেছনে যেন প্রচুর আলো, পাখির ডাকের সাড়া আর বাতাসের দোলা অদৃশ্য ও অশ্রুত হয়ে রয়েছে। সংশয় ও প্রত্যয়ের দীর্ঘ দ্বন্দ্বের আঁধিয়ারা মিটে গিয়ে এক নতুন দিনের অধ্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যেন এক কঠিন পরীক্ষার সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন, সফল হয়েছেন, পরাভবের বিভীষিকা সরে গেছে। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেই বাইরে চলে আসেন। বারান্দায় বেঞ্চটার ওপর বেশীক্ষণ বসেন না। ফুলবাগানে পাইচারী করে বেড়ান অনেকক্ষণ, যেন নতুন করে নিশ্বাস নিচ্ছেন রজনীবাবু।

কিন্তু প্রমীলাবালাকে খোঁজ করলেও সহজে তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে না। পূজোর ঘরেই বন্দী হয়ে আছেন। পূজোর ঘরের কপাটটা আজকাল বেশীক্ষণই খিল-বন্ধ থাকে। সারাদিনের মধ্যে আচম্‌কা হয়তো একবার বাইরে আসেন প্রমীলাবালা, ভেতর-বারান্দার এক কোণে একটা তোলা উনুনে পেতলের মালসায় দু'মুঠো চাল-ডাল যা হয় সেদ্ধ করে নেন। কখন্ খান, কখন্ স্নান করেন, কোন সাড়া পাওয়া যায় না। কোন কোন দিন তা'ও হয় না। এক এক দিন রান্না করেও খেতে ভুলে যান। পূজোর ঘরের খিল-আঁটা কপাট স্তব্ধ হয়ে থাকে। প্রমীলাবালার ঘরের দিকে তাকালে এই কথাই মনে হবে, এখানে এসে যেন তাঁর শেষ অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। বাইরে ভোরই হোক্ বা দুপুরই হোক্, এর ভেতরে যেন রাত্রি ফুরোয় না।

রজনীবাবুর প্রাত্যহিক সংসার ঠাকুর আর চাকরের হাতে কোন মতে কর্কশ ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যায়। সপ্তাহান্তে আসেন পুঁটিমাসী, প্রতি রবিবার। বাড়ীর আবহাওয়া সেদিনের মত সত্যিই স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। ঘর গোছানো হয়, সিঁড়ি বারান্দা মেজে ধোয়ানো হয়। ধোপা আসে, ধোয়া কাপড় চোপড় দিয়ে যায়, ময়লা কাপড়-চোপড় নিয়ে যায়। পুঁটিমাসীই হিসেব নেন, হিসেব লিখে রাখেন।

ধোয়া চাদরে আর ওয়াড়ে রজনীবাবুর বিছানা সেদিন সুশ্রী ও কমনীয় হয়ে ওঠে। পুঁটিমাসী নিজের হাতেই চা তৈরী করেন। স্বাচ্ছন্দ্যের আবেগে রজনীবাবু এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়ান, পুঁটিমাসীর সঙ্গে গল্প করেন।

কিন্তু প্রমীলাবালার পূজোর ঘরের কপাট স্তব্ধ হয়েই থাকে। পুঁটিমাসী মাঝে মাঝে গিয়ে পরিত্রাহি ডাকতে থাকেন—প্রমীলা প্রমীলা। সাড়া না পেয়ে কড়া নাড়েন, প্রবল ভাবে ধাক্কা দিতে থাকেন। দরজার চৌকাঠ কাঁপতে থাকে, তবু কপাট খোলে না। পুঁটিমাসী রাগ করে, হতাশ হয়ে এবং ভয়ানক রকম বিরক্ত হয়ে ফিরে আসেন।

রজনীবাবু বলেন—'ওকে আর ঘাঁটিয়ে লাভ নেই পুঁটুদি। ও যেমন আছে তেম্‌নি থাক্।'

পুঁটিমাসীর মুখটা হঠাৎ বড় করুণ ও বিবর্ণ হয়ে ওঠে। অবসন্নের মত নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসে থাকেন, রজনীবাবুর কথার উত্তর দেন না। রজনীবাবু তখনো সাম্‌নে দাঁড়িয়ে নিজের মনের আবেগে কথা বলে যান। কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন পুঁটিমাসী। অস্বস্তি হতে থাকে। এসময় কিছুক্ষণের জন্য যদি অন্য ঘরে চলে যান রজনীবাবু, তবেই যেন পুঁটিমাসী আবার সহজ হয়ে নিতে পারেন।

মীনু ও সাধন আসে মাঝে মাঝে। রতনডিহি কোলিয়ারী মজদুর ইউ-নিয়নের সেক্রেটারী হয়েছে মীনু। ইউনিয়নের কাজ নিয়ে এরই মধ্যে সে মেতে উঠেছে।

মঞ্জু আর নীহার একবার মাত্র এসেছিল। তারপর আজ পর্য্যন্ত আসার আর সুযোগ হয়নি। মঞ্জু তাই মাঝে মাঝে চিঠি দেয়। রান্নাবান্না থেকে আরম্ভ করে সংসারে সব কাজ মঞ্জু নিজেই করে। নীহার কৃপণ নয়, তবু চাকর-বাকর দিয়ে কাজ করানো নীতি হিসাবেই পছন্দ করে না নীহার। একটু প্লেন লিভিং ও হাই থিংকিং গোছের লোক নীহার।

শরদিন্দু ভিন্ন একটী ইউনিয়ন গড়ে তুলেছে। দু' ইউনিয়নে জোর রেষারেষি চলে। কিন্তু মীনু ও সাধনের মিলিত প্রতিভা উৎসাহ আর উদ্যোগের সঙ্গে শরদিন্দু টেক্কা দিতে পারে না। রতনডিহি কোলিয়ারী মজদুর ইউনিয়ন যেমন দিন দিন ফেঁপে উঠছে, তেমনি দিন দিন দীনতর হয়ে আসছে শরদিন্দুর মজদুর ইউনিয়ন।

সব কথা শুনে আহ্লাদের উচ্ছ্বাসকে কোনমতে চেপে রাখেন রজনীবাবু,

পুঁটিমাসী যতদিন না আসেন। রবিবারের সকালে পুঁটিমাসীকে সম্মুখে পাওয়া মাত্র ছেলেমানুষের মত চঞ্চল হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন রজনীবাবু—'মীনু ও সাধন এসেছিল পুঁটুদি। যেমন দেবা তেমনি দেবী! কেউ কম যায় না। এরই মধ্যে যা-সব কাণ্ড করতে আরম্ভ করেছে যদি শোনেন তো ···।'

পুঁটিমাসী নিরুত্তর থাকেন। রজনীবাবু বলেন—'ডোবালে, মেয়েটা আমার নাম ডুবিয়ে ছাড়লে।'

পুঁটিমাসী বুঝতে পারেন, রজনী মিত্রের মেয়ে মীনু নিশ্চয় একটা বড় রকম আদর্শ নিয়ে পলিটিক্স করতে আরম্ভ করেছে। হয়তো বাপকেও ছাড়িয়ে উঠছে। সেই উপলব্ধির গর্বে নিজেকে ইচ্ছে করেই ডুবিয়ে দিয়ে কথাগুলি উল্টো করে বলছেন রজনীবাবু।

মঞ্জুর চিঠি আসে। সাগ্রহে চিঠি নিয়ে পড়তে বসেন রজনীবাবু। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই দৃষ্টির আগ্রহ শিথিল হয়ে আসে। কুঞ্চিত ভুরু দুটো যেন নেহাৎ অবহেলার তাড়ায় তর্‌তর্‌ করে লেখাগুলিকে দূর থেকে লক্ষ্য করে সরে যেতে থাকে। পড়বার মত কিছুই নেই, জানবার মত কিছু নেই। অতি-সাধারণ সাংসারিকতার এক বিস্তৃত ইতিবৃত্ত।—দুটো নতুন ঘর উঠছে। নীহার তাই খুব ব্যস্ত, খুব খাটুনি পড়েছে। মঞ্জুরও অবসর খুব কম। সব কাজ নিজের হাতে করতে হয়। যদি বা কিছু অবসর পাওয়া যেত, কিন্তু নতুন একটা গরু কেনা হয়েছে সম্প্রতি। গো-সেবার ভার মঞ্জুর ওপর। নিজের হাতে খড় কুচোতে হয় মঞ্জুকে। তা ছাড়া, এখন বাগানের যত কাপাসের সুঁটি পেকেছে, সেই জন্য ···।

দম ধরে চিঠিটাকে পড়ে প্রায় শেষ করে আনেন রজনীবাবু। পড়া শেষ হলেই যেন ছুঁড়ে ফেলে দেবেন, সেই রকম ভঙ্গীতে চিঠিটা তুলে ধরেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছে হঠাৎ আবার কুঞ্চিত ভুরু টান হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। বার বার শেষের সেই লাইনটা পড়েন—'এরই মধ্যে সময় করে গীতা পড়তে হয়, চরকা চালাতে হয়। তোমার জন্য একটী নতুন ডিজাইনের খদ্দরের চাদর তৈরী করছি বাবা।'

পুঁটিমাসী আশা মাত্র রজনীবাবুর রুদ্ধ আনন্দ বাচালতায় ফেটে পড়ে—'মঞ্জুটা ভয়ানক কাটখোট্টা মেয়ে পুঁটুদি! কী সাংঘাতিক টেনাসিটি! এত কাজ, এত দায়িত্ব, এত খাটুনি—তবু চরকাটী তার ঠিক আছে। এই হয় পুঁটুদি। জীবনে যারা আদর্শ খুঁজে পায়, জীবনে যারা একটা বিশ্বাসকে মনপ্রাণ দিয়ে ধরতে

পেরেছে, তাদের দমিয়ে দিতে পারে এমন কোন বাধা পৃথিবীতে নেই। বেশ মিলেছে দু'জন। নীহারও বড় কঠোর আদর্শবাদী।

পুঁটিমাসী নিরুত্তর থাকেন। তিনি শুধু নীরবে রজনীবাবুর পরিপূর্ণ বিশ্বাসে টলমল, সজীব ও চঞ্চল মূর্ত্তিটাকে লক্ষ্য করতে থাকেন। কোন ভিন্ন মত বা ভিন্ন প্রশ্ন তুলতে তিনি চান না। চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলে নিয়ে পায়চারী করে বেড়ান রজনীবাবু, মাঝে মাঝে চুমুক দেন। লঘু স্ফূর্ত্তির আবেশে রজনীবাবুর বয়সের ভার যেন হাল্‌কা হয়ে আসতে থাকে। তারপরেই অতিরিক্ত রকম চঞ্চল হয়ে পড়েন। চাদরটা কাঁধে ফেলে বাইরে রওনা হন। পুঁটিমাসী একটু বিমর্ষ হয়েই জিজ্ঞেসা করেন—কোথায় চললেন এসময়? আজ তো আপনার শরীর তেমন ···।

—না না, আমার শরীর আজ খুব ভাল আছে।

রজনীবাবুর উদ্ভ্রান্ত উত্তরটাকে যেন এক পাশে ঠেলে সরিয়ে পুঁটিমাসী জিজ্ঞাসা করেন—কোথায় চললেন?

—গান্ধী-জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যাচ্ছি। একশো চুয়াল্লিশ জারি করেছে। তা করুক্, অনুষ্ঠান হবেই।

রজনীবাবু চলে যান। অল্পক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন পুঁটিমাসী। একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন। কখন্ ফিরবেন রজনীবাবু কে জানে! আদৌ ফিরবেন কি না বলা যায় না। হয়তো গ্রেপ্তার হবেন।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করারও উপায় নেই পুঁটিমাসীর। সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে, স্কুলের বোর্ডিংয়ে ফিরে যাবার সময় হয়েছে। হার্টের কষ্টটা আজ যেন দমিত অভিমানের মত মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে উঠছে। এলোমেলো ভাবনার মধ্যে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন পুঁটিমাসী। উঠতেই হবে তাঁকে—এই ক্লান্তির ভার নামিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন এমন কোন ঠাঁই কোথাও নেই, এখানেও নয়।

ধীরে ধীরে উঠে পড়েন পুঁটিমাসী। ছাতাটা হাতে তুলে নিয়ে রওনা হন। চাকরটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে ফটক পর্য্যন্ত পথ দেখাবার জন্য এগিয়ে আসে।

পুঁটিমাসী একটু বিরক্ত ভাবেই চাকরটাকে বলেন—খুব হয়েছে, তুই যা এবার, তোকে আর পথ দেখাতে হবে না।

দিন যায়, মাস শেষ হয়, বছর ঘুরে আসে। আকাশের তারাগুলিরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়, শুধু বদ্‌লান না রজনীবাবু। অন্ততঃ রজনীবাবুর তাই

বিশ্বাস। তিনি এক আদর্শে অবিচল আছেন। রামমোহন স্মৃতিবার্ষিকী, শিবাজী উৎসব, স্বদেশী মেলা, স্বাধীনতাদিবস—জাতীয় জীবনের মুক্তির যত স্বপ্ন স্মৃতি ও ব্রতের ভীড়ে তিনি বিভোর হয়ে মেতে আছেন।

পুঁটিমাসী আসেন। তিনিও বিশ্বাস করেন, তাঁর স্বগ্রামবাসী কুটুম্ব, কৈশোরের পরিচিত রজনী মিত্রকেই তিনি দেখতে আসেন কর্ত্তব্য হিসাবে।

মীনু ও সাধন আসে না। তারা দু'জনে এখন আর মকতপুর নেই, কানপুর চলে গিয়েছে। মীনুর চিঠি আসে মাঝে মাঝে। একটা স্ট্রাইকের ব্যাপারে মাঝে তিন মাস জেল হয়েছিল মীনুর। সাধনের চিঠিতে এই খবরটা প্রথম পড়লেন রজনীবাবু। তার পর আরও দশবার পড়লেন। তার পর চিঠিটা ফাইল করে রাখলেন, সার্থক আদর্শবাদের গর্বে ভরা একটা কুলপঞ্জী যেন তিনি তৈরী করে রাখছেন। মীনুর চিঠি আজও এসেছে, শরীর খারাপ, মন ভাল নয়।

মকতপুর থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে নীহারের খাদি-আশ্রম, গোশালা আর বাসা। তবু মঞ্জুর পক্ষে বাপের বাড়ী আসা সব চেয়ে দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা বছরের মধ্যে মাত্র দু'বার এসেছিল মঞ্জু। রজনীবাবুর জন্য খদ্দরের চাদর এখনো এসে পৌঁছয়নি। শীঘ্রই পৌঁছবে, রজনীবাবুর সংশয়হীন সেই আশা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

যতীর খবর কি? মাঝে মাঝে পুঁটিমাসীকে প্রশ্নে প্রশ্নে বিব্রত করে তোলেন রজনীবাবু।

পুঁটিমাসী যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দেন।—হ্যাঁ, যতীর চিঠি পেয়েছি। আসবে বোধ হয়। তবে শিগ্‌গির আসতে পারবে না।

—কেন?

রজনীবাবুর প্রশ্নে মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠেন পুঁটিমাসী।

রজনীবাবু বলেন—লিখে দিন, সস্ত্রীক এসে একবার দেখা করে যাক্।

পুঁটিমাসী একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে জবাব দেন—সস্ত্রীক আসতে পারবে না।

—কেন?

আবার কেন। পুঁটিমাসী বিরক্ত হলেও, রজনীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে তখুনি শান্ত হয়ে যান। মমতা হয়।

রজনীবাবু তাঁর নিজের ধারণার নেশায় যেন মাতাল হয়ে আছেন।—লিখে দিন পুঁটুদি, ওরা দু'জনেই একবার দেখা করে যাক্। যতীটা ভয়ানক

দুঃসাহসী। মেয়েটাও শুনেছি সেই রকম্। বেশ মিলেছে দুজনে। কি কাজ জানি ওরা করছে পুঁটুদি? কৃষক সংগঠন?

পুঁটুদি—হ্যাঁ।

রজনীবাবু—করুক্ করুক্, যার যেমন অভিরুচি একটা আদর্শ নিয়ে থাকলেই হলো। যতীর ব্যবহারে প্রথমে বড় অপমানিত বোধ করেছিলাম পুঁটুদি। কিন্তু আমি বোধ হয় একটু বেশী রেগে গিয়েছিলাম। একটু ভুল হয়েছিল আমার। শত হোক্ যতী, আমার যতী, অন্ততঃ একটা আদর্শ ছাড়া কখনো কোন কাজ করতে পারে না। আজ আর যতীর ওপর আমার কোন রাগ নেই পুঁটুদি।

সন্ধ্যের আলো জ্বলেছে। চা তৈরী করতে চলে গেলেন পুঁটিমাসী। আধ্ দিস্তা কাগজ খরচ করে মঞ্জু ও মীনুকে চিঠি লিখলেন রজনীবাবু।

বোর্ডিংয়ে ফিরবার সময় হয়ে এসেছে পুঁটিমাসীর। রজনীবাবু পরিতৃপ্তির সঙ্গে চায়ে চুমুক দিচ্ছিলেন। রজনীবাবুর চেয়ারেব কাছেই একটা বেতের মোড়ার ওপর বসেছিলেন পুঁটিমাসী।

বিনা কারণে নয়, রজনীবাবুর কপালটা ঘেমে উঠেছিল তাই পুঁটিমাসী নেহাৎই তাঁর সেবাপরায়ণ অভ্যাসের বশে আস্তে আস্তে পাখার বাতাস দিচ্ছিলেন রজনীবাবুকে।

হঠাৎ পূজোর ঘরের ভেতর শাঁখের শব্দ বেজে উঠল। চম্‌কে উঠে পাখা নামিয়ে নিলেন পুঁটিমাসী।—ও কি!

রজনীবাবু দুঃখ করলেন—আজকাল বোধ হয় মাথা খারাপ হতে আরম্ভ করেছে। শাঁখ বাজাবার ব্যাধিতে ধরেছে, যখন তখন বাজাচ্ছে।

—আমি উঠি। পুঁটিমাসী সন্ত্রস্তের মত যেন ছটফট্ করে উঠে দাঁড়ালেন।

রজনীবাবু—এখনি উঠবেন?

পুঁটিমাসী—হ্যাঁ, আজ আমার শরীরটাও বিশেষ সুবিধার নয়।

(ক্রমশঃ)

সঙ্গীত ও বিনয়

অজিভ দত্ত

যদিও বাংলাদেশই হচ্ছে বৈষ্ণব ধর্মের লীলাভূমি আর বৈষ্ণব-বিনয়ই বিনয়ের পরাকাষ্ঠা, তবু বাঙালী যে স্বভাবতই অতি বিনয়ী জাতি এ বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কুল-লক্ষণের মধ্যে বিনয়ের স্থান উপরের দিকে বটে, কিন্তু বাঙালী যে কুলীন জাতি নয় একথা কে না জানে? কাজেই বাঙালী চরিত্রে বিনয়ের অভাব বিস্ময়কর নয়। 'হিংটিং ছট্'-এ যবন পণ্ডিতদের যে গুরু-মারা চেলা সগর্বে দু'চার কথা বলবার জন্য অগ্রসর, সে সাধারণ বাঙালীর মোটামুটি নির্ভুল প্রতিনিধিত্বের দাবি করতে পারে। জাতি হিসেবে নিজের শ্রেষ্ঠত্বে বাঙালীর বিশ্বাস এতই ব্যাপক ও অটল যে একজন অশিক্ষিত বাঙালীও একজন বুদ্ধিমান্ শিক্ষিত বিহারীকে খোট্টা বা মেড়ো বলে' অনায়াসে অবজ্ঞা করে। বাঙালীর কাছে সংস্কৃতি মানেই বাংলা দেশের সংস্কৃতি, সাহিত্য অর্থই বাংলা সাহিত্য, এমন কি ফুটবল মানেই বাঙালীর খেলা। আত্ম-শ্রেষ্ঠত্বের গভীর প্রত্যয়ে সে এমনি মশগুল যে অন্য দেশ বা প্রদেশকে নিন্দে করবার আগে সে-সব দেশ-প্রদেশের সম্বন্ধে সামান্য সাধারণ জ্ঞান আহরণ করাও সে প্রয়োজন মনে করে না।

ব্যক্তিগত জীবনেও বাঙালী সাধারণত বিনয়ের অবতার নয়—সত্যের খাতিরে একথা স্বীকার করাই সঙ্গত। রাস্তায়-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, অহরহ বাঙালীর অবিনয় এত সহজে চোখে পড়ে, যে সত্যি কথা বলতে কি, অনেক সময়ই সেটা যেন আর চোখেই পড়ে না। নজরটা আমাদের এমনি বিকৃত হয়ে গেছে যে বিনয়ের আতিশয্যেই যেন আমরা কেমন মুষ্‌ড়ে পড়ি।

চরিত্রগত এই দুর্বলতা, বিনয়ের বাড়াবাড়িতে বিব্রত হবার এই দুরপনেয় প্রবৃত্তি গোড়াতেই স্বীকার করে' নেওয়া ভালো। বিনয় জিনিষটা তো ভালোই। তবু, নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, মনটা যখন হয়তো বেশ উৎফুল্লই, ভাগ্যের বিরুদ্ধে অধিকাংশ অভিযোগই যখন প্রায় ভুলে' যাওয়া গেছে—সেই দুর্লভ শুভ-মুহূর্তেও অহেতুক বিনয়ের ধাক্কায় অনেক সময় সহসা আমরা একেবারে ভূমিসাৎ হয়ে যাই, কোথায় হারিয়ে যায় সে লগ্ন, যাকে ধরে' রাখতে পারলে স্মৃতির সিন্দুকে জমিয়ে রাখবার মতো দামি জিনিষ হতে পারতো।

সঙ্গীতের বিশেষত নারীকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত-সুধার সঙ্গে বিনয়ের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা বলছিলাম। বাঙ্গালী মেয়েরাও যে বেশ সুকণ্ঠী একথা কে অস্বীকার করবে? নেহাৎ বিয়ের দুর্লঙ্ঘ্য বেড়াটা অতিক্রম করবার জন্যই যাঁদেরকে অন্তত দু'খানা বাংলা গান মোটামুটি আয়ত্ত করতে হয় তাঁদের কথা ছেড়ে দিলেও বাংলাদেশে সুগায়িকার কোনোই অভাব নেই। কিন্তু তবুও কোনো সর্বজনবিদিতা সঙ্গীত-পারদর্শিনীকেও কোনো আসরে একখানা গান গাইতে অনুরোধ করে' আপনারা কি কখনো বিনা-বিনয়ে আপনাদের আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ হতে দেখেছেন? আপনারা কি শোনেন নি যে ঠিক সেই দিন, সেই মুহূর্তে তাঁর গলার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, কিংবা তাঁর সামান্য, তুচ্ছ, শোনবার অযোগ্য গান আপনারা আর কী শুনবেন, কেনই বা শুনবেন—সেই বিস্মিত প্রশ্ন? মনে করুন, কোনো সদাশয়, অতিথিবৎসল বন্ধুর বাড়িতে অনেকে সমবেত হয়েছেন। আপনাদের দলে আছেন আড্ডা জমানো রসিক, গল্প বলিয়ে কথক এবং আছেন দু'একজন সর্ব্বজনপ্রশংসিত গায়িকা। আড্ডা জমেছে, গল্পের স্রোত ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এসেছে এক মন্থরতার হ্রদে—যেখানে সকলের মনেরই উল্লাসের কলধ্বনি একটা স্নিগ্ধ আনন্দের আমেজে স্তব্ধ হয়ে এসেছে। মনে করুন, এই ব্ল্যাক-আউটের দিনে জানালা দিয়ে একটুকরো চাঁদের আলোও ঘরে এসে পড়েছে! এমন সময়, এমন মাহেন্দ্র সময়েও, যদি আপনারই অন্তরঙ্গ বান্ধবী সেই গায়িকাদের একজনকে একটা গান গাইতে অনুরোধ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ, রাত্রির পর যেমন প্রভাত, সুখের পর যেমন দুঃখ, জন্মের পর যেমন মৃত্যু, তেমনি অভ্রান্ত, অবধারিত, নিশ্চিতরূপে আপনাকে শুনতেই হবে, "আমার গান আর কী শুনবে?" কিংবা "আজকে আমার গলাটা ভালো নেই।" ভারত সম্বন্ধে আমেরি সাহেবের বিবৃতির মতোই এ উক্তি ব্যবহারে ভোঁতা হয় না, অথবা পুনরুক্তিতে মলিন হয় না। এইরূপ বিনয় ও প্রতিবিনয়ের সুদীর্ঘ বিনিময়ের পর, প্রত্যেকের বিচ্ছিন্নভাবে এবং সমবেত ভাবে অনুরোধ জ্ঞাপনের পালা শেষ হলে', গানটা হয়তো শেষ পর্যন্ত হয়। কিন্তু সুধাবর্ষণ সুরু হবার আগেই দেখা যায় হ্রদ শুকিয়ে সেখানে হয়ে গেছে প্রায় মরুভূমি, গান আর তেমন জমে না।

সঙ্গীতের সঙ্গে বিনয়ের এ অবিচ্ছেদ্য যোগ কী করে', কবে থেকে সৃষ্টি হয়েছে জানবার উপায় নেই, কিন্তু এখন এটা দাঁড়িয়ে গেছে একটা অলঙ্ঘ্য ব্যবহারিক রীতিতে। এমন কি সুকুমার রায় তাঁর হ-য-ব-র-লতে যে অপরূপ ন্যাড়াকে

এঁকেছেন, সে লোককে গান শোনাবার জন্যই যদিও সর্বদাই ব্যগ্র, তবু প্রথমেই, অনুরুদ্ধ হবার আগে থেকেই সে বলে' নেয়, "না ভাই, আমাকে গান গাইতে বোলো না। সত্যি বলছি আজকে আমার গলা তেমন খুলবে না।" অবশ্য ন্যাড়া গায়িকা নয়, গায়ক, এবং এইজন্যই বোধহয় বিনয়-প্রকাশের স্থান-কাল সে ঠিক রাখতে পারে নি, তবুও দেখা যাচ্ছে, একথা ন্যাড়াও জানে যে কাউকে গান শোনাবার আগে একটু বিনয় প্রকাশ না করলেই নয়। তাই সে আগে থাকতেই সেই অবশ্য কর্তব্যটুকু সেরে রাখে।

অবশ্য, এ কথা বলা চলে যে গান গাইতে অনুরোধ করা মাত্রই কি সব সময় গান গাওয়া যায়? সঙ্গীত একটা উঁচুদরের ললিতকলা। আর আর্ট জিনিষটা মুহূর্তের ফরমাশে সৃষ্টি হতে পারে না। একজন কবি কি বলবামাত্রই তক্ষুনি একটা কবিতা রচনা করতে পারেন? কবি তা পারেন না, মানি। কিন্তু কবি, সাহিত্যিক, চিত্রকর ও সঙ্গীতজ্ঞের সাধনার পথ এক নয়, সিদ্ধিও এক নয়। লেখকের যাঁরা সমজদার ও শ্রোতা, যাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁর সাধনা, তাঁরা আছেন বহু দেশ, বহুকাল জুড়ে। তাই তাঁকে এতটুকু কথাকে এতখানি ব্যঞ্জনায় ভরে দিতে হয়, নতুন নতুন উপলব্ধির সম্ভাবনায় তাঁর রচনাকে রাখতে হয় পরিপূর্ণ করে'। কেবল আজকের দিনের মুষ্টিমেয় পাঠকের মন জোগালে তাঁর চলে না, অসংখ্য দিনের অসংখ্য মানবের মনের কথা তাঁকে ভাবতে হয়। সিদ্ধি তাঁর অনিশ্চিত। যারা এ-জীবনে যশ পেলো না, তারাও আশা হারায় না। নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর অনাবিষ্কৃত সমানধর্মার কথা ভেবে এগিয়ে চলে তাদের সাধনায়। যারা প্রচুর যশ পেয়েছে তারাও অনাগত মানবের মনে তাদের রচনা কোনো স্থান পাবে কিনা এই সন্দেহে লিখতে চায় আরো ভালো করে'। কাজেই লেখকের দায়িত্ব অনেক বেশি, সাফল্য অনিশ্চিত; যতোই নামজাদা লেখক হোক, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সমস্ত লেখাকেই সে সাধনার সোপান বলে' জানে। পাঠক তার চোখের আড়ালে, কালের আড়ালে। তাই তাকে প্রত্যেকটি কথা ওজন করে' বসাতে হয়। লিখতে হয়, কাটতে হয়, আবার লিখতে হয়। সহস্রবার অদল বদল করেও তার মন ভরে না, মনে হয় আরো বুঝি ভালো হতে পারতো। তাই তাকে নির্জনে লিখতে হয়, সময় নিয়ে লিখতে হয়। সমস্ত অনাগত কালের মানব যা পড়ে আনন্দ পাবার সম্ভাবনা, তার সৃষ্টিতে একদিন কি একমাস, এমন কি এক বছর কাটলেও দোষ হয় না। অধ্যাপক থেকে শুরু করে' ইস্কুলের ছেলে পর্যন্ত যা নিয়ে সোরগোল করতে পারে, তার মূলে নীরব তপস্যার প্রয়োজন আছে।

সঙ্গীতের বেলাতে কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই উলটো। সুগায়ক হাতে হাতে পান নগদ দাম। গানের আলাপের সূত্রপাতেই শুরু হয় বাহবা, শেষ হয় উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়। গায়কের সমজদার চোখের আড়ালে লুকিয়ে নেই। কালের আড়ালে সে গা ঢাকা দেয় নি। সে আছে সামনে বসে'। সঙ্গীত যিনি আয়ত্ত করেছেন তিনি জানেন শ্রোতাদের তিনি কী পরিবেশন করতে পারেন বা করতে যাচ্ছেন। অপর পক্ষে লেখক লেখা শেষ করবার আগের মুহূর্তেও ভালো করে' জানেন না কী তাঁর কলম থেকে বেরুলো। সম্মুখবর্তী শ্রোতাদের বাদ দিলে গায়কের গান গাওয়ার কোনো মানেই হয় না। কাজেই গায়ক গায়িকারা যদি অনুরুদ্ধ হয়ে গান গাওয়াটা বিনয়ের বেড়া তুলে' বন্ধ করতে চান, তাহলে তাঁদের বিনা অনুরোধেই গান গাইতে অভ্যাস করা দরকার।

সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের আরো একটা বড়ো তফাৎ এই যে লেখক যখন তাঁর সাহিত্য সাধনায় নেহাৎই কাঁচা থাকেন, তখনও যদি তিনি তাঁর সেই অপরিপক্ক রচনা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেন, তাতে জগতের কারুরই কোনো ক্ষতি নেই! লোকে পড়বে না এই পর্যন্ত। অর্থাৎ লেখকের সাধনার সমস্ত পর্যায়গুলিই পাঠকরূপী সমালোচকের কঠোর দৃষ্টির সামনে খোলা রয়েছে, কিন্তু সঙ্গীত তার সমজদারদের কাছে এসে পৌঁছয় একেবারে সর্বাঙ্গসুন্দর রূপে-তার সাধনার স্তরগুলির সঙ্গে শ্রোতাকে পরিচিত হতে হয় না। সঙ্গীতের যিনি শিক্ষানবিশ তাঁকে কেবল লোকচক্ষুর নয়, লোককর্ণের আড়ালেই বিদ্যাভ্যাস করতে হয়, অন্তত করা উচিত। একজন লেখক যদি সারা জীবন লিখে কিছুই তাঁর জীবৎকালে প্রকাশ না করেন তবু তাঁর লেখার যদি যথার্থ মূল্য থাকে, তা হারাবে না এবং চিরকালই তা লোকে উপভোগ করতে পারবে। কিন্তু সঙ্গীতবিদ্‌কে তাঁর যা কিছু কৃতিত্ব এ জীবনেই দেখাতে হবে, যেটুকু আনন্দ দেবার এই জীবনের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যেই সেটুকু করতে হবে নিঃশেষে বিতরণ। গায়ক যদি তাঁর বিদ্যা সকলের উপভোগের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দিতে পরাঙ্মুখ হন, তবে তিনিই ঠকবেন। তাঁর সঙ্গীত তাঁরই সঙ্গে হারিয়ে যাবে।

তা ছাড়া ফরমায়েশের উত্তরে ললিতকলা পরিবেশন করাতেই বা সঙ্কোচের কী হেতু থাকতে পারে? লেখক-শিল্পী-ভাস্কর সবাইকেই ফরমায়েশী জিনিষ রচনা করতে হয়। নিজের নিজের বিদ্যার চরিত্রগত পার্থক্যের দরুন সবাই হয়তো সামনে বসে' তক্ষুনি অনুরোধ পালন করতে পারেন না, কিন্তু ললিত-কলাবিৎ এরকম অল্পই আছেন যাঁকে কখনো ফরমায়েশী জিনিষ রচনা করতে

হয়নি। আর ফরমায়েশী হলেই যে সৃষ্টি নিকৃষ্ট হবে, ইতিহাস এ-কথার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় না। সেক্স্‌পীয়র, কালিদাসের কাব্য-নাটকও তো এক হিসেবে ফরমায়েশী। রাফায়েলের প্রাচীর চিত্রও কি ফরমায়েশী নয়? অথবা তাজমহলের শুভ্র লঘু অর্ধোড্ডীন রূপ! আজকালকার দিনে সম্পাদকসংখ্যা বৃদ্ধির অনিবার্য ফলে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক গল্প-উপন্যাস লেখকদের একটা নিরবচ্ছিন্ন তাগিদের উপর থাকতে হয়। কারো ফরমাশ প্রেমের গল্প, কারুর বা অ্যাড্‌ভেঞ্চার। এই তাগিদের ফলে লেখকদের কলমে যা বেরোয় তার সবই কি বাজে? এর মধ্যে অনেক জিনিষই হয়তো শাশ্বতকাল পাঠকদের আনন্দ জোগাবে। সবরকম ললিতকলাই ফরমায়েশে বেশ বেরোয়, এবং সর্বদাই ফরমায়েশেই সৃষ্ট হচ্ছে। অবশ্য প্রাচীনকালের কাব্যবিলাসী বদান্য রাজা-রাজড়ারা গত হয়েছেন পর কবিতার ফরমায়েশে ঢিলে পড়েছে। এমনও হতে পারে যে আজ-কাল কবিদের কেউ পোঁছে না, কারুর ফরমায়েশ মাফিক তাঁরা লেখেন না বলেই।

যাই হোক, এ বিষয়ে কোনোই মতদ্বৈধ থাকা উচিত নয় যে গান যদি গাইতেই হয়, তবে শ্রোতাদের অনুরোধেই গাওয়া উচিত। কেননা বিদগ্ধ শ্রোতা ভিন্ন গান হতে পারে না। এবং গান গাইতে অনুরুদ্ধ হলে গায়ক মোটামুটি নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে শ্রোতারা তাঁর গান শ্রদ্ধা-সহকারে শুনবে। সঙ্গীত এমনি একটি কলা যা পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিক অভিনন্দনের অপেক্ষা রাখে।

"একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে,
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বন-সভা শিহরি' কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে।"

শ্রদ্ধাবান্, রসজ্ঞ শ্রোতার কাছ থেকে যদি গান গাইবার অনুরোধ আসে, তাহলে বুদ্ধিমান্ সঙ্গীতবিদের সে-সুযোগ কখনই ছাড়া উচিত নয়। কেননা এরকম ক্ষেত্রে তাঁর কলা প্রাপ্য মর্যাদা পাবে বলেই তিনি ধরে নিতে পারেন। সাহিত্য যেমন পড়বার, ছবি যেমন দেখবার, গান তেমনি শোনবারই জিনিষ। শ্রবণের মধ্য দিয়েই তার উপভোগ। কাজেই কাউকে সঙ্গীত-পারদর্শী জেনে যদি কেউ তাঁর কাছে গান শুনতে চায় তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না, বরঞ্চ তার রসপিপাসু প্রবৃত্তির তারিফই করতে হয়। অপরপক্ষে দক্ষ গায়ক রসিক

শ্রোতাকে সামনে পেয়ে গান শোনাতে চাইবেন এটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত, কারণ শোনানোতেই গানের সার্থকতা।

"তোমায় গান শোনাবো
তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখো।"

এ-জাগরণে বেদনাকে ছাপিয়ে ওঠে তৃপ্তির আনন্দ। "আমার এ গান শুনবে তুমি যদি, শোনাই কখন বলো!" শোনাবার যদি সুযোগ না হয় সেটাই তো চরম দুর্ভাগ্য। রবীন্দ্রকাব্যে অসংখ্য ছত্রে ছড়িয়ে আছে গান শোনাবার জন্য ব্যাকুল বেদনা, গান শুনিয়ে অসহ আনন্দের কথা। এটাই স্বাভাবিক। কারণ ললিতকলার যিনি প্রকৃত সাধক—তিনি কবি বা শিল্পী যাই হোন না কেন—নিজের যা দেবার তা পরিবেশনেই তাঁর আনন্দ। সৃষ্টির আনন্দ ও তৃপ্তি অপরের মনে সঞ্চারিত করবার আর তো কোনো পথ নেই! কৃপণের ধনের মতো যতোটুকু লুকিয়ে রাখবেন, সেইটুকুই জানবেন হারিয়ে গেলো। সার্থক শিল্পই সত্যিকারের সেই ধন যা "যতোই করিবে দান, ততো যাবে বেড়ে"। একটা কবিতা বিশ্বমানবের হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দের স্পর্শ দেয়,—একটি গান স্মৃতির সৌরভের মতো সকলের মনে গভীর আনন্দের আবেশ নিয়ে জড়িয়ে থাকে। কাজেই গান শোনবার আগ্রহের চেয়ে গান শোনাবার আকাঙ্ক্ষা কম হবার কোনো সঙ্গত যুক্তি নেই।

সাহিত্যের সাক্ষ্যকে যদি আমল দেওয়া যায়, তবে বলা যেতে পারে যে বাংলা কথা-সাহিত্যের যেটা শ্রেষ্ঠাংশ তার মধ্যে গান শোনাবার অনুরোধ প্রায় নেই বল্লেই হয়। তার কারণ বোধহয় এই সব নমস্য লেখকেরাও আমার মতোই বিশ্বাস করতেন যে সঙ্গীত কবিতা ও বনিতার মতো স্বয়মাগতা হলেই সুখের হয়। আজকালকার সিনেমা ও থিয়েটারের প্রযোজকরা সাহিত্যে কথায় কথায় গান গাইবার অনুরোধের অভাবকে নিঃসন্দেহ একটা দুর্ভাগ্য বলেই মনে করবেন। এবং সে অভাব তাঁরা নিজেদের প্রযোজনায় যথেষ্টই পরিপূরণ করতে চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথের নাটক তো সঙ্গীতে এত সমৃদ্ধ, কিন্তু সেখানে প্রায় সর্বদাই গানকে দেখতে পাই স্বতঃ-উৎসারিত, নিজের আনন্দেই প্রকাশমান্।

অন্যান্য ললিতকলায় যেমন, সঙ্গীতেও তেমনি, খানিকটা প্রতিভা, খানিকটা যোগ্যতা নিয়েই হয়তো মানুষ জন্মগ্রহণ করে। চর্চা দ্বারাই তা প্রকৃত সৃষ্টির পর্যায়ে উঠতে পারে। সঙ্গীতের কঠোর সাধনায় যাঁরা অনেক দূর

এগিয়ে গেছেন, তাঁদের সঙ্গীতের আমরা অনেকেই যোগ্য শ্রোতা নই, স্বীকার করি। উঁচুদরের সঙ্গীতের আসরে তাই আমরা অনেকেই মুখ বুজে থাকি। যদি কিছু ভালো লাগে, ভালো লাগে। যা কিছু ভালো না লাগে, বুঝতে না পারি, তার জন্য ভাগ্যকে ধিক্কার দিই না। মনে একটা সান্ত্বনা থাকে যে হয়তো ওস্তাদজীর রবীন্দ্রকাব্যের উপভোগ 'দুই বিঘা জমি'র চেয়ে বেশি অগ্রসর নয়। কিন্তু এটুকু শুধু নিজের মনের সান্ত্বনা। মনে মনে জানি ওঁর বিদ্যে বোঝবার আমার ক্ষমতা নেই। তাই আমাদের মতো সঙ্গীতপ্রিয় কিন্তু সঙ্গীতের সূক্ষ্ম কারুকার্য হৃদয়ঙ্গম করতে অপারগ পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যদি তেমন উঁচু-দরের দুর্বোধ্য স্তরের সঙ্গীতবিদ্ আবির্ভূত হন, তবে আমরা স্বভাবতই তাঁকে গান গাইতে অনুরোধ করতে ইতস্তত করি,—এমনকি গান শোনবার জন্য ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের অত্যন্ত ইচ্ছে হলেও সেটা আমরা সাধারণত প্রকাশ করতে সঙ্কুচিত হই। যদিবা কোনো দুঃসাহসী বন্ধু সেই আনাড়ির আসরেও পূর্বোক্ত অতি-উঁচুদরের গায়ককে গান গাইতে অনুরোধ করেন, এবং তার জবাবে আমরা শুনি তাঁর সবিনয় অক্ষমতার কথা, তাহলে আমাদের মর্মাহত হবার কোনো কারণ থাকে না। কারণ ও-বিনয়কে আমরা তখন আমাদের প্রাপ্য ভর্ৎসনা বলেই ধরে নিতে পারি। বাস্তবিক উঁচুদরের সঙ্গীতের আমরা কতোটুকুই বা বুঝি?

কিন্তু যখন বন্ধুবান্ধবের আসরে বন্ধুবান্ধবকে গান গাইতে অনুরোধ করা হয়, তখন বোঝাবুঝির প্রশ্নের চেয়ে ভালো লাগার প্রশ্নটাই বড়ো হয়ে ওঠে। হতে পারে আপনি একজন ভালো গায়ক। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের কলাকৌশল অনেকখানিই আপনার আয়ত্তে। তবু আপনি যদি সুকণ্ঠ হন, আর আপনার বিদ্যা যে কতো গগনচুম্বী তা আমাদের সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করাবার জন্য যদি আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হন, তবে আমাদের কাছে আপনার মধুর সঙ্গীত পরিবেশন করতে দয়া করে কার্পণ্য করবেন না। আপনার বিদ্যার উপভোগ তো সাহিত্যের মতো সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়! সাহিত্যের রস পাবার জন্য প্রয়োজন খানিকটা শিক্ষার, খানিকটা মানসিক সংস্কৃতির। সঙ্গীতের সূক্ষ্ম কলাচাতুর্যের বেলাতেও হয়তো সে-কথা খাটে। কিন্তু সঙ্গীতের আরো একটা দিক আছে যেটা শুধুই মাধুর্যময়। একটা নিরক্ষর জেলেডিঙির মাঝিও গান গায়—এবং হয়তো ভালোই গায়, এবং তার একান্ত অশিক্ষিতা অর্ধসভ্যা প্রেয়সীও হয়তো তাই শুনেই মুগ্ধ হয়। সঙ্গীতের বিদ্যায় আমরাও হয়তো নিরক্ষর। তবু বিশ্বাস করুন, মাধুর্য আমাদেরও মুগ্ধ করে। আপনার কণ্ঠের চারুচাতুর্যের মর্ম হয়তো আমরা

সব বুঝতে পারবো না, কিন্তু বিস্মিত আনন্দে তারিফ করতে পারবো। অতএব হে একান্ত বিনয়ী গায়ক-গায়িকাগণ, আড্ডায়-আসরে আমরা যদি আপনাদের দু'একখানা গান গাইতে অনুরোধ করি, দয়া করে' আমাদের সঙ্গীত-সুধারস থেকে বঞ্চিত করবেন না। আপনাদের বিনয়ের দুস্তর বারিধি পার না হয়েই যেন আমরা আপনাদের সঙ্গীতলোকে পৌঁছুতে পারি।

কয়লাভাঁটা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল বেলা। চা খাওয়া শেষ করেই দেবেন মাইতি কনট্রাক্টর আমাকে বল্লে—চলুন একবার মাঠাবুরু ওঠা যাক্। আমাদের ডাকবাংলার পিছনেই সুদীর্ঘ শৈলমালার মাঠাবুরু শিখর, উটের পিঠের কুঁজের মত ডলোমাইটের অনাদৃত গম্বুজ। শেষ দু তিনশো ফুট গাছপালা বড় একটা দেখা যায় না, একটা বিরাট শিবলিঙ্গ যেন নীল আকাশে মাথা তুলে আছে।

বল্লাম—কত উঁচু ?

—হাজার ফুট।

—বড্ড খাড়াই দেখচি—

—একটু কষ্ট হবে কিন্তু ওপর থেকে চমৎকার সিনারি, আপনি যা ভালবাসেন স্যর—

—ওই যে কি একটা গাছ মাথার ওপরে, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে—

—ওটা একটা পাকুড় গাছ। মস্ত বড় গাছ ওটা, ওপরে উঠলে টের পাবেন।

আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। একটা বড় পাকুড় গাছ এখান থেকে দেখাচ্চে যেন আশশেওড়া গাছের মত! কত উঁচু মাঠাবুরু শিখরটা! দেবেন মাইতি বল্লে—আপনি রেডি আছেন তো ?

—চলুন ওঠা যাক—

আমার বাংলো থেকে হাত কুড়ি দূরে গিয়েই জঙ্গল। জঙ্গলে হরিতকী, আমলকী, কেঁদ, শাল ও পলাশ গাছই বেশী, এখানে ওখানে বড় বড় পাথর ছড়ানো, নানা আকারের পাথর, কোনো কোনোটার ওপর দিব্যি চৌরস সমতল, এত বড় যে, পাঁচ ছ'জন লোক বিছানা করে শুয়ে থাকলে পরস্পরের খুব বেশী ঘেঁসাঘেঁসি হয় না। আবার কোনোটা সত্যিই ছোট।

একটি ক্ষীণকায়া ঝর্ণা পাহাড়ের দিক থেকে নেমে বয়ে চলেচে অসংখ্য ছোটবড় পাথরের ওপর দিয়ে। বেশ স্বচ্ছ, ঠাণ্ডা জলটা। দেবেন মাইতি বল্লে—এর নাম ছাৎনা জোড়—

—কোথায় গিয়ে মিশলো ?

—এ ওই আগে গিয়ে নাকটিটাঁড় ফরেষ্টের নীচে ভাটাই জোড়ের সঙ্গে মিশেচে—

—আর ভাটাই জোড় ?

—কুসুমডি'র নীচে শঙ্খনদীর সঙ্গে মিশলো—

ক্রমে সমতল ভূমি ছেড়ে মাঠাবুরু পাহাড়ের ওপর উঠতে আরম্ভ করলাম। রাস্তা খুব সরু, উঁচু নীচু পাথরের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে ওপরের দিকে চলেচে, দুধারে শাল, কাঞ্চন, পলাশ, আমলকী গাছের ঘন ছায়া, মোটা মোটা চীহড় লতা, লতা-পলাশ দুলচে এ-ডাল থেকে ও-ডাল থেকে, প্রথম বসন্তে করঞ্জা ফুলের সুগন্ধ সকালের বাতাসে, কোথাও একটা মস্ত বড় লতায় থোকা থোকা নতুন ফোটা অগ্নিবর্ণ পলাশ ফুল পথের ওপর ঝুঁকে পড়েচে, কোথাও দীর্ঘচঞ্চু ধনেশ পাখী লতাপাতার আড়াল থেকে কর্কশ স্বরে ডেকে উঠলো।

আমি অবিশ্যি জানতাম না—স্বরটা শুনে চমকে উঠে বলি—ওটা কি ডাক ?

দেবেন মাইতি হেসে বল্লে—ধনেশ পাখীর, স্যর।

—যার তেল হয় ?

—হ্যাঁ স্যর—দেখবেন ? এ দিকটা তাকিয়ে থাকুন—

একটু আগিয়ে গিয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ব্যস্তভাবে বল্লে—উই—উই—বড় বড় ঠোঁট—

এক এক স্থান কি সুন্দর ছায়া শীতল! করঞ্জা ফুলের সুবাস ভুরভুর করচে বাতাসে, বড় বড় চৌরস শিলাসন চারদিকে বিছানো, মনে হয় এমন শান্ত, নিভৃত, মৌন বনানীতলে সেকালে মুনিঋষিদের কুটির ছিল, বনবিহঙ্গের কলধ্বনি মুখরিত এমনি প্রভাতে তাঁদের দার্শনিক দৃষ্টি জীবনমৃত্যুর রহস্য ভেদ করতে ব্যস্ত থাকতো এই নিভৃত বনাঞ্চলে। আর সেইখানে দেবেন মাইতি কনট্রাক্টর আর আমি এসেচি কাঠকয়লার ভাঁটা কিনতে।

পা বড় ব্যথা করছিল। একটা লতা-পলাশের ফুলের থোকা দোলানো আমলকী গাছের তলায় পাথরের ওপর বসে সিগারেট ধরাই। অতি সুন্দর স্থান, এত নিবিড় ডালপালা ঝুঁকে আছে সানুদেশে যে, এখান থেকে সমতল ভূমি বা ডাকবাংলো দেখাই যায় না।

দেবেন মাইতি বল্লে—উঠুন, এখনো অনেকটা—

—কতটা উঠলাম ?

—শ চারেক ফুট হবে। এখনো অনেক বাকি—

এমন সময় অনেকগুলি তরুণীকণ্ঠের উছলিত হাসি কলরবে বনভূমি মুখর হয়ে উঠলো। আমাদের সামনে দিয়েই ছ' সাতটি মানভূমি বাউরি কি ভূমিজ মেয়ে লম্বা ধরণের লতায়-বোনা ঝুড়ি মাথায় হরিণীর মত লাফিয়ে লাফিয়ে সরু পথটা বেয়ে ওপরে উঠে চল্লো।

বল্লাম—এরাই বোধহয় কুলি ?

দেবেন মাইতি বল্লে—হ্যা।

—মজুরি কত ?

—এখানকার রেট আমি ঠিক জানিনে।

এই ঘটনার এবং পথের ধারে বিশ্রামের পর ঝাড়া চল্লিশটি মিনিট কেটে গিয়েচে, আমরা তখনও মাঠাবুরু আরোহণ করচি তো করচিই। যা ভেবেছিলাম খুব কাছে, তা হয়ে পড়েচে বহুদূর, বন আগের চেয়ে একটু পাৎলা হয়েচে বটে কিন্তু এখনও ওপরে উঠতে কত দেরি আছে বুঝতে পারচি নে—পা ভেঙে পড়চে।

দেবেন মাইতি আশ্বাসের সুরে বলচে—এই এলাম স্যর, ওই এক নম্বর কিলিন্ দেখা যাচ্ছে—আর একটু—

কিন্তু ওর আশ্বাসের ওপরে বিশ্বাস হারিয়েচি। মোটে হাজার ফুট বল্লে, কিন্তু এখন মনে হচ্চে আরও বেশি—অনেক বেশি। সত্যি কষ্ট হচ্চে। সোজা খাড়াই না হোলে এত কষ্ট হোত না।

আমি বল্লাম—আর এক নম্বর কিলিন্! অনেকক্ষণ থেকেই তো বলচেন—

—আপনি দেখুন আর একটু গিয়ে—ওই যে পিয়াসাল গাছটা দেখচেন ওই হোল ওপরের লেভেল্—

বসবেন একটু এই পাথরটাতে ?

এমন সময় আবার সেই রকম সম্মিলিত নারীকণ্ঠের গান ও কলরব ওপর থেকে নীচে নেমে আসচে শোনা গেল। আগের সেই দলটি এবার কাঠকয়লার ঝুড়ি মাথায় মাঠাবুরু থেকে নীচে নামচে। এতক্ষণ লেগেচে ওদের ওপরে পৌঁছুতে এবং কয়লা আনতে।

কিন্তু দেবেন মাইতি আমার ভুল ভেঙে দিলে। বল্লে—এরা সে দল নয়। এরা আমাদের অনেক আগে পাহাড়ে উঠেছিল। এদের উঠতে দেখিনি আমরা।

আমি বল্লাম—আগের দল এখনও পৌঁছোয় নি ?

—তা—এতক্ষণ প্রায় পৌঁছে গেল বোধ হয়।

তার মানে এখনও পৌঁছায় নি।

চারিদিকে চাইলাম। বড় বড় কেঁদগাছ আর মউল গাছ লতাপলাশের বেষ্টনীর মধ্যে ধরা দিয়ে নিশ্চেষ্ট পৌরুষের মোহস্বপ্নে বিভোর। বনজুঁইয়ের ঝাড় উঁকি মারচে মস্ত বড় গ্যাবরো পাথরের গুহাসদৃশ ফাটলের অন্ধকার পর্দ্দার পেছন থেকে। ঝক্‌মক্ করচে অভ্রকণিকা পায়ের তলার পথের বুকে। উষ্ণ হয়ে আসচে সকালের অরণ্যস্নিগ্ধ বাতাস।

বল্লাম—হ্যাঁ মশাই, মাঠাবুরু পিক্ কোনটা ? সামনের এটা না উইটা ?

এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য এই যে হঠাৎ বনানীর ফাঁক দিয়ে আকাশপানে চোখ পড়াতে আরবী ড্রোমেডারি উটের পিঠের দুটো কুঁজের মত দুটো চূড়ো দেখতে পেয়ে সশঙ্ক হয়ে উঠেচি। দূরের উইটে যদি মাঠাবুরু হয় তবে যতদূর দেখচি ও আরও হাজার ফুট। এর আর মার নেই—তবে যদি এইটে হয়, তাহোলে আর শ পাঁচেক ফুট। এতক্ষণ একটা চূড়ো দেখছিলুম, তা এমন ভাবে দুটো হয়ে গেল কি ভাবে ? এমন হয়ে থাকে পাহাড়ের দেশে পাহাড়ের রাজ্যে, কোথা থেকে কোনভাবে অদৃশ্য কোন শিখর মাথা তুলে ঠেলে উঠলো শিলাযবনিকা ভেদ করে, শিলীভূতা মায়াবিনী অপ্সরীর মত।

দেবেন মাইতি হেসে বল্লে—দূরের ওটা গুর্গাবুরু স্যর। বাঁ দিকে অনেক দূরে। মাইল পাঁচেক দূরে হবে—উচ্চতম চূড়া এই রেন্‌জের—

—কত ?

—বাইশ শো বাইশ—

হেসে বল্লাম—বারে, রেলির বাড়ীর ধূতি নাকি ? ঠিক নম্বরটা পড়ে গিয়েচে দেখচি।

দেবেন মাইতি সম্ভবতঃ না বুঝে বোকার মত হাসলে। বল্লে—বসবেন একটু ?

—না না আবার কি বসবো ? উঠুন—

একটা পাহাড়ী কেলিকদম্বের আড়াল সরে যেতেই দেখি অগণ্য, গোলগোলি ফুল ফুটে আছে পাহাড়ের গায়ে—স্বর্ণকান্তি পুষ্পস্তবক পাষাণ-পটভূমিকার গায়ে কোন শিল্পী যেন মায়াতুলি দিয়ে এঁকে রেখেচে। সুদূর পার্ব্বত্যভূমির স্বপ্ন যখন দেখেচি বাংলাদেশের বর্ষাবাদলে ভেজা হয়তো এক একঘেয়ে দিনমানের শেষপ্রহরে —কোথা থেকে মনে উদয় হয়েচে রুক্ষ ব্যাসাল্টের স্তূপে নিষ্পত্র শুভ্রকান্ত বৃক্ষে

এই পীত পুষ্পস্তবকের ছবি, তাদের সে অপূর্ব্ব ইঙ্গিত। যে স্বপ্ন শীতের দেশ থেকে এসে লেগেছিল উদ্ভিদবিজ্ঞানবিৎ হুকারের চোখে—হিমালয়ের বনপ্রদেশের বহু ম্যাগনোলিয়া বহু রক্ত রডোড্রেণ্ডনের মোহ ছাপিয়ে জয় করেও ছোটনাগপুরের পর্ব্বতারণ্যের এই ফুল স্থায়ী প্রভাব এঁকে দিয়ে গিয়েছিল তাঁর মনে—হুকারের বইয়েতে তাঁর নিজের হাতে আঁকা গোলগোলি ফুলের ছবিতে তার প্রমাণ আছে।

দেবেন মাইতিকে কিছু বলবো এ সম্বন্ধে বলে মুখ খুলেই আবার বন্ধ করলুম। ও কিছু বুঝবে না এ সম্বন্ধে। ও বোঝে এত কিউবিক ফুট মাটি বা বালির কাজ হয়েচে, এত নম্বরের কুলির গ্যাং এত নম্বরের খাটালে কাজ করচে—মজুরির সঙ্গে অন্যান্য খরচ ধরে মালের দরের পড়তা কত হয়, পুরুলিয়ার বিহার ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের খাতায় কত জমা পড়লো। গোলগোলি ফুলের পীত পাপড়িতে পাপড়িতে যে স্বপ্ন আপনাতে আপনি মুগ্ধ, এমনিতর মুক্ত আকাশের তলায় পর্ব্বতরাজ্যে তার যে অলেখা বাণী প্রাণের কাণে অক্ষান্ত চঞ্চলতা এনে দেয়—বেচারী দেবেন মাইতির কাণে সে সবের খবর পৌঁছোয় নি।

এইবার দেখি একদল কুলিমেয়ে নেমে আসচে, ওদের মাথায় কাঠ-কয়লার ঝুড়ি।

দেবেন মাইতি বল্লে—এই, কত নম্বর কিলিনের মাল ?

একটি ঢেঙা, পাথরে কোঁদা দেবীমূর্ত্তির মত সুঠাম তরুণী হাসি মাখানো সুরে টেনে টেনে বল্লে—ছ'নম্বর কিলেন গো—

দেবেন মাইতি আবার বল্লে—কে আছে রে ?

—ওঝাজি আছে গো—ওঝাজি—

কুলিরমণীর দল একপাল প্রমোদমত্তা নীলাকুরঙ্গীর মত হাসি কলরব করতে করতে নেমে গেল। আমি ওদের দিকে চেয়ে রইলাম—ওরা ক'বার ওঠানামা করতে পারে এই দুরারোহ পাহাড়ের মাথায় কয়লার ভাঁটাতে। কত ওদের রোজগার হয় সারাদিনের এই হাড়ভাঙা খাটুনির পরে !

পাহাড়ের ওপরে বেশ সমতল ময়দান—জঙ্গল বেশি নেই, এখানে ওখানে দেবকাঞ্চন, মহুয়া ও লুদাম গাছ—গাছগুলির বাড় বন্ধ হয়ে গিয়েচে শক্ত পাথুরে মাটিতে। স্বল্পছায় বিটপিতলে ছোট বড় কয়লার ভাঁটা। সুঠাম তরুণী কুলি-মেয়েরা ভাঁটা ভেঙে সরু কয়লা মোটা কয়লা বাছাই করচে—বিষম রোদের তেজ, ঘাম ঝরে পড়চে ওদের সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে।

একটি মেয়ে ওদের মধ্যে সবচেয়ে সুঠাম, সুন্দর। ওর গলায় কুঁচের মালা, নিটোল হাত দুটিতে কাঁসার বাউটি—মাথায় ঠাস বুনুনি চুল, মুখে হাসি লেগেই আছে।

কাছে গিয়ে বল্লাম—কি নাম রে?

মেয়েটি খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। কিন্তু আমার কথার কোনো জবাব দিলে না। পাশের মেয়েটি বল্লে—ঔ তোদের হিন্দি বাত বুঝতে পারবে। উয়াকার বাপের ঘর রাঁচি—

ভাল রে ভাল। হিন্দি কখন বল্লাম? যে মেয়েটি বাংলা ভাষায় জবাব দিলে তারও তো বোঝা উচিত ছিল। দেবেন মাইতি হেসে বল্লে—শুনুন গল্প। এক সাহেবের বিশ্বাস তিনি ভাল উড়িয়া শিখেচেন। উড়িষ্যার এক পল্লীগ্রামস্থ পাঠশালা পরিদর্শনে গিয়ে তিনি ঘণ্টাখানেক ধরে উড়িয়া ভাষায় ছাত্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল কথা বলবার পরে পাঠশালার উড়িয়া গুরুমশায় হাতজোড় করে বল্লে—হুজুর, একটা কথা আছে। আমার পাঠশালার এ ছাত্র নিতান্তই পাড়াগেঁয়ে, এরা হুজুরের হিন্দি কথা বুঝতে পারচে না। সাহেব তো অবাক! ছাত্রদের কথা চুলোয় যাকগে, গুরুমশায়ের তো বোঝা উচিৎ ছিল তিনি কি ভাষায় এতক্ষণ কথা বলে গেলেন অনর্গল?

দেবেন মাইতি একজন লোককে বল্লে—হো ভাষায় ওকে জিজ্ঞেস করো ওর নাম কি?

প্রশ্ন করা গেল, এবার উত্তর দিলে মেয়েটি, তার নাম—বুধনি কুই।

—কত করে রোজ দেয় এখানে?

—ঝুড়ি পিছু ছ' পয়সা বাবুজি—

—ক' ক্ষেপ ওঠানামা করতে পারো সারাদিনে?

—ছ'বারের বেশি নয়।

—ছ'বার ওঠানামা না তিনবার ওঠা তিনবার নামা?

—ছ'বার ওঠা, ছ'বার নামা।

কি কাণ্ড! এই দুরারোহ মাঠাবুরু শিখরে ছ'বার ওঠা যে কি কঠিন পরিশ্রমের কাজ, তা কেউ বুঝতে পাররে না যে নিজে অন্ততঃ একবারও না উঠেচে। পা কি আর থাকে তার পরদিন? এর চেয়ে কেদার বদরী যাওয়া বোধ করি সহজ। আর এই সব সুঠাম তরুণীর দল আধমণ ত্রিশ সের কাঠকয়লার ঝুড়ি মাথায় হাসিমুখে দিব্যি উঠচে নামচে। যে কঠিন লোহার পাথর দিয়ে মাঠাবুরু

গড়া, সেই ধাতুর শক্ত উপাদানে তৈরি হয়েচে ওই সব হো ও বাউরি মেয়েদের হাড়। নমস্কার করি শক্তিময়ীদের উদ্দেশ্যে।

দেবেন মাইতি বল্লে—মজুরি সস্তা বলেই তো এখানে কাঠকয়লা পুড়িয়ে দু'পয়সা থাকে। ওপরে দেখবেন অনেক ভাঁটা আছে। সাড়ে ন' আনা মণ আর কোথাও পাবেন না ও জিনিসের।

আমার উৎসাহ অনেক কমে গিয়েচে। দেবেন মাইতি যা বলচে তা করতে গেলে অনেক লোককে আমায় ফাঁকি দিতে হবে বেশ বুঝতে পারচি।

আমরা সাত আটটা ভাঁটা দেখলুম। দেবেন মাইতি ফিতে বার করে কত হাজার কিউবিক ফুট কাঠকয়লা এখানে পাওয়া যেতে পারে তার হিসেব করতে বসলো।

আমি বল্লাম—মশাই, মজুরি বড্ড কম—

দেবেন মাইতি আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—আজ্ঞে, মানে ?

—মানে এই এখানে কয়লার ভাঁটা আমার নেওয়া হবে না। আপনি অন্য পার্টনার দেখুন।

—বেশ, বেশ। আপনি মজুরির রেট বাড়িয়ে দিন না ? দিন সাত পয়সা করে। তাতেও আপনার মন খুঁৎ খুঁৎ করে, দিন সাড়ে সাত পয়সা। কেমন হোল তো ? ও সব কবি-টবি লোক নিয়ে কি বিজনেস চলে স্যর ? ও আমি বুঝতে পেরেছি।

পাঁচ দিন পরের ব্যাপার। ছ' পয়সা থেকে মজুরির রেট বাড়িয়ে আমার কথায় করা হয়েচে তিন আনা। দেবেন মাইতি হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার করেছিল আমি শুনিনি। তার সব প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেছি।

সকালে ডাকবাংলাতে বসে আছি, কয়লাভাঁটার চৌকিদার গুপীনাথ মালিয়া এসে জানালে—বাবু, বড় মুস্কিল, কুলি পাওয়া যাচ্চে না।

আশ্চর্য্য হয়ে বল্লাম—কেন ?

—কেউ এলো না।

—ব্যাপার কি ? মজুরী আরও বেশি চায় ?

—আজ্ঞে না, সেজন্যে নয়। আপনি গিয়ে একবার দেখুন না ?

গুপীনাথ মালিয়ার পিছু পিছু চলি। ডাকবাংলা থেকে বার হয়ে কিছু দূরে বাঘমুণ্ডী-ঝালদা পাকা সড়কের ওপর নিমডি গ্রামে ওর বাড়ী। এক সময়ে

ওরা নাকি ছিল এই অঞ্চলের জমিদার, তাই ওদের উপাধি 'বাবু'। এখনও সকলে ওকে ডাকে গুপীবাবু বলে।

কিছুদূর গিয়ে নিমডি গ্রামের বাইরে বাটাইজোর নদী বা নালা বা ঝর্ণা যাই বলুন, তারই ধারে একটা বড় অর্জ্জুণ গাছের তলায় গ্রামের ভাঁটিখানা—মহুয়া মদ চোলাই ও ক্রয় বিক্রয় হয়। গিয়ে দেখি কয়লাভাঁটার মেয়েপুরুষ সব কুলি নেশায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ওঠা ত দূরের কথা, চোখ মেলে চাইবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত নেই।

বল্লাম—এ কি ব্যাপার গুপীবাবু?

গুপী দাঁত বার করে হেসে বল্লে—আজ্ঞে হবেই তো। হাতে কড়ি যাঁহাতোক আসা, তাঁহাতোক ও জাতের—

—তোমার কি মনে হয় মজুরির রেট বাড়িয়ে—

—আজ্ঞে, নির্ঘাৎ।

কাজ হোল না! বিকেলে যখন ওদের নেশা ভাঙলো তখন তারা কাজের উপযুক্ত নয়। শরীর শিথিল, অবশ্য বেলাও পড়ে এসেচে, মাঠাবুরুর সানুদেশের জঙ্গলে মহুয়া ফুল খেতে ভালুক বেরোয়, অবেলায় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওঠা-নামা নিরাপদ নয়। দেবেন মাইতি দেখি খুব খুসি। আমায় দেখে টেনে টেনে বল্লে—আপনাকে বল্লাম স্যর, তা আপনারা কবি লোক—

—কবি লোকের কি দোষ হোল?

—দোষ হোল এই যে কয়লাভাঁটা উঠে গেল। আর এখানে কুলি পাবেন না।

—কেন?

মজুরি তিন আনা দিলে মাথা পিছু আঠারো আনা পড়ে। সব দেখবেন মদ খেয়ে চিৎপাৎ হয়ে এমনি রোজ পড়ে থাকবে। আপনার কবিত্বের এই ফল হোলো। বিজ্‌নেস, স্যর, আলাদা জিনিস। আমার হাতে দিন ছেড়ে, দেখুন কি করে চালাই।

দিব্যি চলতে লাগলো পরের দিন থেকে কয়লার ভাঁটা।। ছ'পয়সা রেটেই নামিয়েছে মজুরি দেবেন মাইতি। কোনো কুলিই অনুপস্থিত নেই। আমি আর কোনো কথা বলিনে। দেবেন মাইতি যা করে তাই। পয়সা আসচে।

মাঠাবুরুর সানুদেশের অরণ্যপথে বড় বটগাছের তলায় একদিন আমি বসে আছি। ঘন ছায়াভরা গ্রীষ্ম অপরাহ্ণ, পাহাড় তেতে উঠেচে, কয়লাভাঁটা

একেবারে পাহাড়ের ওপরে গাছপালাহীন রুক্ষ অনুপদেশে, এই গরমে তিষ্ঠুবার যো নেই সেখানে। তাই এখামে এসে আশ্রয় নিয়েছি। হঠাৎ দেখি কুলির দল নেমে আসচে। সেই কুলির দল।

একজন বাউরি কুলি আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। বল্লে—তোর কাছে জানাচ্চি, ছ'পয়সা রেট আমাদের পোষাচ্চে না রে—

—কেন ?

—তিন আনা করিছিলি আবার কাটলি ক্যানে ?

—মদ খেয়ে মাতলামি করে কাজ কামাই করছিলি ক্যানে ?

পেছনে মেয়ে কুলির দল দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে সেদিনকার বুধনি কুইও ছিল। ওরা সবাই হাসচে দেখে কুলিটাকে বল্লাম—কি ব্যাপার রে ? সব হাসচে কেন ?

ওরা কিছু না বলে নেমে গেল।

রাত্রে ডাকবাংলোর চৌকীদার আজকে গোপনে বল্লে—বাবু, সব কনট্রাক্টর বাবুর কাজ। পাঁচটাকা খরচ করে নিজের ট্যাঁক থেকে—বিল্‌কুল সব মদ খাইয়েছিল সেদিন।

কেন ?

—নইলে আপনি মজুরির রেট কমাবেন না। আপনার শুধু এই মাঠা-বুরুর ভাঁটা ওর সঙ্গে ভাগে, কিন্তু ও বাবুর এ অঞ্চলে আরও অমন কত জায়গায় ভাঁটা, মজুরির রেট বাড়ালে ওর লোকসান কত। কুলিরাও সেটা জানে, তাই জেনেশুনে হাসছিল, আপনার কাছে রেট বাড়াবার কথা বলে হাসছিল। আমি সব শুনেছি।

আমার এতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই, অথচ যারা সত্যিই ঠকেচে এ ব্যাপারে তারা পরের পাঁচ ছ'দিন ধরে আমাকে দেখলেই হাসে, গা ঠেলাঠেলি করে পরস্পরের, যেন আমাকে তারা খুব বোকা বানিয়েচে। তাদের দলের সেই হো তরুণী বুধনি কুই এ কাজে অগ্রণী।

এ সরলা বন্যবালাদের আমি কি বোঝাবো ? দেবেন মাইতির জয় হোক, মাঠাবুরুর কয়লাভাঁটার মহাজন বলরামপুরের বিরিজলাল ঘনশ্যামদাসের সাড়ে তেত্রিশ পার্সেণ্ট মহাজনীর জয় হোক।

আধুনিক সাহিত্য

"সোভিয়েট রুশিয়ায় দৈনিক একলক্ষ ত্রিশ হাজার মোটর গাড়ী তৈরী হয়ে থাকে।" ভারতের একটী রুশবাদী পার্টির কাগজে এই বিস্ময়কর তথ্যটী প্রকাশিত হয়েছিল। এই হলো একটি দিক। অপর দিকে দেখতে পাই, রুশবিদ্বেষী এমন লেখকের অভাব নেই যিনি লিখেছেন—"সোভিয়েট রুশিয়ায় নিজের স্ত্রী বলতে কোন নারী নেই, সবই স্টেটের স্ত্রী।"

এখন প্রশ্ন করতে পারি, একদিকে এই উদ্ভট স্তাবকতার মিথ্যা এবং অপরদিকে এই উদ্ভট কুৎসার মিথ্যা, এই দুই ননসেন্স কার ক্ষতি করলো? এতে সোভিয়েট রুশিয়ার ক্ষতি, না ঐ দুই মিথ্যাবাদীর ক্ষতি, না কৌতূহলী জনসাধারণের ক্ষতি?

সোভিয়েট রুশিয়ার কোন ক্ষতি নয়। ঐ মিথ্যাবাদীদেরও ক্ষতি নয়, কারণ তারা জেনেশুনে ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থের জন্য এই সব অসার কথা বলে। সত্যিকারের ক্ষতি হলো বিশ্বাসী জনসাধারণের। তারা শুধু বিশ্বাসের ভুলে সোভিয়েট রুশিয়াকে এক স্বর্গভূমি বলে ঠাউরে বসে, অথবা একটি অধম অধঃপতিত দেশ বলে মনে করে।

বাংলা দেশের বৈঠকী জীবনে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রসঙ্গ একটি মস্ত বড় গলাবাজি তর্ক ও বিতণ্ডার বিষয়। এটা জাতীয় চিন্তার স্বাস্থ্যের লক্ষণরূপে দেখা দেয়নি। বরং এর মধ্যে অকেজো ফাঁকিবাজী রাজনীতি ও অপ-তাত্ত্বিকতার একটা অবলম্বন দেখা দিয়েছে। দুঃখের বিষয় হলেও এই অভিযোগ সত্য। এর মধ্যে ক্ষতি এইটুকু হচ্ছে যে—কম্যুনিষ্ট বিপ্লব, নব্য রুশের অভ্যুত্থান এবং সোভিয়েট রুশিয়ার বিবিধ দুরূহ সামাজিক সংগঠন সাধনা ও সৃষ্টির নৈতিক প্রেরণার সজীব স্পর্শটুকু পেতে আমাদের বাধা হচ্ছে। আসল বাধাটা কিন্তু রুশ-বিদ্বেষী নিন্দুকদের দিক থেকে নয়। ইতিহাসের কোন বৈপ্লবিক সত্যের প্রচারকে কোন নিন্দুকের কুৎসা বন্ধ করতে পারেনি। আসল বাধা সৃষ্টি করছে ঐ স্তাবকের দল। মার্ক্সবাদ, লেনিনের সমাজবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা, সব কিছুকে উপেক্ষা করে নিছক রুশবাদ নামে এক ধরণের রাজনীতি আমদানী করে তারা দেশের আবহাওয়া দূষিত করছে। এই রুশবাদের ব্যাকরণটুকু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ব্যাপারটা গুণেধর্ম্মে ঠাকুরপূজো মাত্র। নিজের দেশের ইতিহাস সমস্যা ও সমাজবিজ্ঞান শিকেয় তুলে রেখে সোভিয়েট রুশের কতগুলি দেশজ সংস্কার ও প্রতীককে ভজনা ও আরাধনা করাই এই সম্প্রদায়ের একমাত্র কাজ। এরা জাতীয় সংগ্রাম থেকে শতহস্ত দূরে থাকে, ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রস্তাব

করতে ভয়ানক রকম একটা লজ্জায় এরা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে এবং ইংরেজী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনলে চটে ওঠে।

এখন প্রশ্ন, সোভিয়েট রুশিয়া কি এদের কাছে ডেকে নিয়ে এসব অপচার করতে শিখিয়ে দিয়েছে? এক শ্রেণীর লোক সত্যিই ভারতীয় রুশবাদীদের কার্য্যকলাপ দেখে সোভিয়েট রুশিয়ার ওপর চটে যান। এইখানে তাঁদের ভুল হয়। ভারতীয় রুশবাদীদের কানে কানে সোভিয়েট রুশিয়া মন্ত্র পড়ে এই মনোভাব ঢুকিয়ে দিয়েছে, এই রকম কোন প্রমাণ আমরা পাই না। অন্ততঃ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। সুতরাং ভারতীয় রুশবাদীদের সঙ্গে সোভিয়েট রুশিয়াকে একই অভিযোগের দায়ে সমন করার কোন অর্থ হয় না।

তবে এই রুশবাদের সার্থকতা কি? কি লাভ তাদের? এই 'রুশবাদ' একটী কথার কথা মাত্র, রুশবাদীরা রুশবাদে বিশ্বাস করে না। (অন্ততঃ চাঁই রুশবাদীরা করে না, কয়েকজন নিরীহ ছাত্র-ছাত্রী হয়তো আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে)। এই রুশবাদকে বিশ্লেষণ করলেই বেরিয়ে পড়ে থলিবাদ অর্থাৎ আপন আপন ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনা। কেউ মোটা চাকুরী লাভের জন্য, কেউ কাউন্সিল ইত্যাদিতে সদস্যপদের জন্য, কেউ বা বই বেচে দু'পয়সা করার জন্য রুশবাদের আশ্রয় নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষের মাটিতে কতগুলি দল হয়েছে। আসলে এরা এক একটি প্রাচীন মঠ-ধর্ম্মী সম্প্রদায়ের মত জাতির বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে যোগাযোগহীন, কিন্তু 'পার্টি' নাম নিয়ে খানিকটা আধুনিকতা রাখার চেষ্টা আছে।

মিঃ এম আর মাসানী একখানি বই লিখেছেন যার মধ্যে তিনি সবার আগে সোভিয়েট রুশিয়াকেই অভিযুক্ত করেছেন। মিঃ মাসানীর বক্তব্য—১৯১৭ সনের রুশিয়া আর ১৯৩৫ সালের রুশিয়াতে অনেক তফাৎ। ১৯১৭ সনে রুশিয়া তার সাম্যবাদের আদর্শে যুক্ত ছিল, কিন্তু ১৯৩৫ সনে আদর্শচ্যুত হয়। অর্থাৎ সোভিয়েট রুশিয়ার অধঃপতন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ট্রট্স্কির বিতাড়ন ইত্যাদি ঘটনার আলোচনা করেছেন। তিনি স্বয়ং দু'বার রুশিয়ায় গিয়ে স্বচক্ষে অনেক কিছু দেখে এসেছেন। তারপর, পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি পররাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েট রুশিয়ার আচরণের কথাও তিনি তুলেছেন। সব বিষয় আলোচনা করে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, 'শ্রেণীহীন গণতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক' সমাজ তৈরীর বদলে সোভিয়েট রুশিয়া ধীরে ধীরে নিজেকে প্রায় একটী শক্তিমদ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চলেছে। তিনি বলতে চান, বর্ত্তমান সোভিয়েট রুশিয়া একপার্টি-শাসিত দেশও নহে, এক-ব্যক্তি-শাসিত দেশ। স্টালিনের ইচ্ছাই সেখানে আইন। সোভিয়েট রুশের শাসনপদ্ধতির গঠনতন্ত্রের সম্বন্ধেও তিনি সাংঘাতিক সব ত্রুটীর কথা লিখেছেন। মিঃ মাসানী তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করতে গিয়ে কিছু কিছু ফ্যাক্ট বা প্রমাণও উদ্ধৃত করেছেন।

মিঃ মাসানীর সব কথা গ্রাহ্য না করেও আমরা তাঁকে এইটুকু প্রশংসা করতে পারি যে তিনি তাঁর বক্তব্যকে যুক্তি ও তথ্য দিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাঁর যুক্তিগুলি মাঝে মাঝে শুধু আংশিক সত্যকে প্রমাণিত করেছে। তার দ্বারা তাঁর সিদ্ধান্ত সমগ্রভাবে সমর্থিত হয়নি। তাই আমরা সোভিয়েট রুশিয়ার ভুল ত্রুটী এবং অনেক

দুর্বোধ্য কার্য্যকলাপের অস্তিত্ব স্বীকার করি, কিন্তু 'অধঃপতন' স্বীকার করি না। মিঃ মাসানী নিজেই বলছেন যে, য়ুরোপ ও আমেরিকার গোঁড়ারাও আজ সোভিয়েট রুশিয়ার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছে, তাই রুশিয়া সম্বন্ধে তাঁর আরও বেশী সন্দেহ হয়। কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে যেসব লেখকের লেখা থেকে তিনি 'প্রমাণ' উদ্ধৃত করেছেন, তার মধ্যে অনেকগুলি বিশিষ্ট গোঁড়া রয়েছেন।

মিঃ মাসানীকে আমরা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করি যেখানে তিনি বলেছেন যে সমাজবাদের সাধনা ও পদ্ধতি নতুন পথে রূপ নিতে চলেছে। একমাত্র সোভিয়েট রুশিয়াতেই সমাজবাদের পরীক্ষা চলেছে, একথা মিঃ মাসানী স্বীকার করেন না, আমরাও করি না। মাসানীর সঙ্গে আমরাও বিশ্বাস করি যে গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত ভারতের কংগ্রেসী সংগ্রাম ও আন্দোলনের মধ্যে পবিত্রতর এক সমাজবাদের পরীক্ষা চলেছে। গান্ধীজীও একটী ঐতিহাসিক স্বরূপ, তাঁর মধ্যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এক নতুন সমাজবিপ্লব আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বকল্যাণের প্রেরণা রূপ নিতে চলেছে।

দুঃখের বিষয় মিঃ মাসানীর বই সোভিয়েট রুশিয়া সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে কিছুটা বিরূপ ভাব সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে। ভারতবাসীর পক্ষে নীতি হিসাবে সোভিয়েট রুশিয়ার বিরোধী হবার মত কোন ঘটনা আমরা আজও দেখতে পাইনি। স্তাবকতার যেমন প্রয়োজন নেই, নিন্দাবাদও তেমনি অর্থহীন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বর্ত্তমান সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। তবুও দেখা যায়, বহু কংগ্রেসী ভদ্রলোক প্রকাশ্যভাবে সোভিয়েট রুশিয়ার নিন্দা প্রচার করে বেড়ান। সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী ও নিষ্ঠাবান কংগ্রেসীর পক্ষে সোভিয়েট রুশিয়াকে নিন্দা করার কোন নিয়ম নেই এবং সেইরকম কোন কারণও ঘটেনি।

মিনহাজ

Socialism Reconsidered by M. R. Masani, Padma Publications Ltd., Bombay, Re. 1/-.

নূতন দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ—মিনু মাসানী। পূর্ব্বাশা লিমিটেড্, পি ১৩ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ। মূল্য ৸৹ আনা।

সঙ্গীত

আব্দুল করিম খাঁ ও ফৈয়াজ খাঁ

কিছুদিন আগে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব কল্‌কাতায় গান গেয়ে গেলেন। এর আগেও তাঁর গান শোনবার সৌভাগ্য বারকয়েক কল্‌কাতাবাসীর হয়েছে। যে কয়বারই তিনি এখানে এসেছেন, এখানকার নিস্তরঙ্গ সাঙ্গীতিক আবহাওয়াটাকে বেশ খানিকটা নাড়া দিয়ে গেছেন। একদিকে তাঁর গানের নিন্দায় যেমন কান রাখা দায় হয়েছে অন্যদিকে তেমনি প্রশংসায়ও একমুখ পাঁচমুখ হ'য়ে উঠ্‌তে দেখেছি। এ দু'য়েরই কোনো তালবেতাল ছিলো না। কল্‌কাতায় সঙ্গীতক্ষেত্রে এতো এতো সমালোচক, রসজ্ঞ রয়েছেন কিন্তু কেউ কাগজে-কলমে ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গানের যথাযথ মূল্যবিচার করেছেন ব'লে মনে পড়ে না। যথাযথ কেন, আদপেই বোধ হয় করেন নি।

লোকান্তরিত আবদুল করিম খাঁ সাহেব কল্‌কাতায় এসেছিলেন সাত আট বছর আগে। সেবারে সঙ্গীত-মহলে একটা সাড়া প'ড়ে যায়। তাঁর গান লোকের মনে একটা জাদু বিছিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো। রসিক, আধা-রসিক তো আছেই এমন কি নিতান্ত বেরসিককেও তাঁর গানের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতে দেখেছি। এই একটি মাত্র গায়ক যাঁর ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো মতদ্বৈধ দেখা দেয়নি—সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন যে না, এতোদিনে সত্যিকার ওস্তাদি গান শুন্‌লুম। এর আগেও কল্‌কাতায় আবদুল করিম খাঁ একবার এসেছিলেন। এখন থেকে প্রায় পচিশ বৎসর আগে দিলীপকুমার তাঁকে প্রথম কল্‌কাতায় নিয়ে আসেন। কিন্তু সেবারে ততোটা সাড়া জাগে নি। তার কারণ দ্বিতীয়বার অল্ বেঙ্গল মিউজিক কন্‌ফারেন্সের মতো সর্বজন অধিগম্য সাধারণ সঙ্গীত-বাসরের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তাঁর গান সাধারণ্যে প্রচারিত হ'তে পেরেছিলো; প্রথমবারে সে সুবিধা ছিলো না। দিলীপকুমারের সমাজ অর্থাৎ অভিজাত সমাজের প্রাচীরে প্রতিহত হ'য়ে শুধু কতকগুলো ঘরোয়া বৈঠকের একান্তেই সে গান শুধু গুঞ্জরিত হ'য়েছে, প্রাচীর অতিক্রম ক'রে জনগণ মধ্যে তা বাহিত হ'তে পারে নি।

সঙ্গীত-রসজ্ঞদের মধ্যে যাঁরা স্বাতন্ত্র্যবাদী, অর্থাৎ জনসাধারণের রুচি থেকে নিজেদের রুচিকে ভিন্নধর্মী ভেবে যাঁরা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে ভালবাসেন তাঁরা বলেন ফৈয়াজ খাঁ সাহেব আবদুল করিম খাঁ সাহেবের তুলনায় অনেক বড়ো গুণী। এঁদের বিচারে ফৈয়াজ খাঁ সাহেব ঠিক ততোটুকুই

অনায়ত্ত যতোটুকু লোকে তাঁকে বুঝতে পারে না। জনগণের রুচি একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত উঠেই থেমে যায়—ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের সঙ্গীতবিহার তারও ঊর্ধ্বে। করিম খাঁ সাহেব লোকের অধিগম্য, সেইজন্যেই তাঁকে নিয়ে এতো মাতামাতি।

কিন্তু রুচির এই উন্নাসিকতা আমরা সমর্থন করি না। জনগণের রসবোধের অসম্পূর্ণতা কিম্বা রসগ্রহণের আংশিক অপারগতা মেনে নিয়েও একথা বলা যায় যে ফৈয়াজ খাঁ সাহেব ঠিক ততোটুকুই অসার্থক যতোটুকু তিনি সাধারণের অধিগত নন। আবদুল করিম খাঁ সাহেব শুধু সস্তা সুরের চটক দেখিয়ে লোকচিত্ত জয় করতে চেষ্টিত ছিলেন একথা বল্‌লে সত্যের অপলাপ করা হবে। ওস্তাদির ক্ষেত্রে ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের সঙ্গে হয়ত তাঁর ঊনিশ-বিশ ছিলো—কিন্তু তিনি ওস্তাদ ছিলেন না এ অভিযোগ তাঁর অতিবড়ো শত্রুতেও করতে পারবে না। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের মতো তাঁর গানের পেছনেও সুদীর্ঘকালবিলম্বিত সঙ্গীতসাধনার ইতিহাস লুকিয়ে আছে।

ধ্রুপদ—হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে যার স্থান সর্বাগ্রগণ্য—সেই ধ্রুপদ সঙ্গীতে করিম খাঁ সাহেবের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য ছিলো। করিম খাঁ সাহেব যে একজন শ্রেষ্ঠ বীণকার ছিলেন একথা কে না জানে? যন্ত্রসঙ্গীতে অপ্রতিবাদ্য শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হ'লে তৎপূর্বে বহু বৎসর একাগ্র সাধনায় ধ্রুপদ সাধনা দরকার, যন্ত্রীদের মধ্যে এই বিশ্বাস ও রেওয়াজ প্রচলিত। কাজেই যেদিক থেকেই বিচার করি না কেন, এই সিদ্ধান্তেই আস্‌তে হয় যে করিম খাঁ সাহেব ওস্তাদিতেও কম যেতেন না। তাঁর কণ্ঠ অপরূপ মিষ্টি ও সুরেলা ছিলো, সেটা তাঁর একটা অতিরিক্ত সম্পদ, তাতে তাঁর ওস্তাদিয়ানা খারিজ হ'য়ে যায় না। সুতরাং নিছক সস্তায় বাজী মাৎ করার বাড়া আর কোনো কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য নয় এই অভিমত আমরা হেসে উড়িয়ে দিতে পারি।

ওস্তাদ হিসেবে ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অপরিসীম কিন্তু কেন জানি না তাঁর গানে সম্পূর্ণ মন ভরে না। যে কয়বারই তিনি কল্‌কাতায় এসেছেন—প্রত্যেকবারই আশান্বিত হৃদয়ে তাঁর গান শুন্‌তে গেছি। কিন্তু প্রত্যেকবারই গান শোনার পর কোথায় যেন একটা অতৃপ্তি থেকে গেছে, মনে হয়েছে পরিপূর্ণ রসাস্বাদে কোথায় যেন খানিকটা ফাঁক রয়ে গেলো।

ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের সুরসৃষ্টির কৌশল বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। কোথায়ও অর্ধস্ফুট স্বরে, কোথায়ও কণ্ঠে সমূহ জোর দিয়ে তিনি যেভাবে সুরসৃষ্টি করেন এবং তুম্-তা-না-না-না-র সাহায্যে সেই সুরকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেন তাতে মুগ্ধবিস্মিত হ'তে হয়। গানের প্রারম্ভে তাঁর অনেকটা সময় এই সুর জমানোর চেষ্টায় ব্যয়িত হয়। খাদ থেকে ক্রমশ চড়ার দিকে তিনি এমন কৌশলের সঙ্গে রাগিণীর বিস্তার করতে থাকেন যে সুর আপনা থেকেই ঘরের আবহাওয়ায় গম্ গম্ করতে থাকে। এইভাবে সুর একবার জমে গেলে তাঁকে আর বিশেষ বেগ পেতে হয় না, গানের মূল পর্দায় গলা রাখ্‌লুম কি না রাখ্‌লুম সুর নিজে থেকেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সুরের মহিমায় অস্ফুট স্বর পর্যন্ত তখন দূর থেকে স্পষ্ট শ্রুত হয়; এমন কি কণ্ঠে আওয়াজ না তুল্‌লেও মনে হয় যেন এইমাত্র আওয়াজ

শুন্‌তে পেলুম। এ যেন অনেকটা সানায়ের পোঁ— মূল সুরটুকু কানে লেগে থাকার মতো। সেই সুরের সঙ্গে যখন আবার রাগিণীর মূল সুরটি (সা) এসে মিলিত হয় তখন এক অনির্বচনীয় সুরের আবেশে মন আচ্ছন্ন হ'য়ে যেতে চায়।

কিন্তু আব্‌দুল করিম খাঁ সাহেবের কায়দা অন্যরকম। তিনি গানের প্রারম্ভিক অধ্যায়ে সুরবিস্তারের জন্যে অতোদূর চেষ্টা ও সময় ব্যয় করেন না—খানিকটা আলাপ ক'রেই গান ধ'রে দেন। এবং গানের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে সুরের রসরূপ প্রকাশ করতে থাকেন। গান যতো অগ্রসর হ'তে থাকে সুরের অপরূপ মায়া ততোই শ্রোতার মনকে অভিভূত করে—শ্রোতা এক অনির্বচনীয় সুরের আনন্দলোকে প্রবেশ ক'রে চরম চরিতার্থতা লাভ করে। ফৈয়াজ খাঁর গানে আসল গানের অংশটুকু হ্রস্ব, আলাপের অংশটাই দীর্ঘ। করিম খাঁর গানে আলাদা আলাপের অংশ ব'লে কিছু নেই, সবটাই আস্থায়ী-অন্তরার অন্তর্ভুক্ত। গানের মধ্যে দিয়েই তিনি রাগিণীর রূপপ্রতিষ্ঠা করেন, গানের সুরুতে তাঁকে আর আলাপের গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজতে হয় না। তাঁর কণ্ঠের এমনই জাদু যে গানের এক একটি কথা তিনি উচ্চারণ করতে থাকেন আর মনে হয় যেন তিনি সুরের এক-একটি ভাঁজ খুল্‌ছেন। যাকে বলে সুরের জাল বিস্তার করা সেটা তিনি গানের মধ্যে দিয়েই সম্পাদন করেন, তার জন্যে তাঁর আর আলাপ-বন্দনার প্রয়োজন হয় না। উভয়ের মুখেই আমরা 'টোড়ি'রী খ্যাল্ শুনেছি—কিন্তু তাদের প্রকাশভঙ্গিতে কতো পার্থক্য! ফৈয়াজ খাঁ সুর সৃষ্টি ক'রে তবে গান ধরেন, করিম খাঁ গান ধরলেন কি সুরের আবেশে বিভোর হ'য়ে পড়লেন। অনেক প্রক্রিয়ার পরে তবে ফৈয়াজ খাঁর ভাবাবেশ, করিম খাঁ ধ্যানে বসামাত্রই সমাধিস্থ। একের ষোড়শোপচারে দেবী-আবাহন; অপরের গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজো।

দুয়ের সুরবন্দনা-পদ্ধতির এই মূলগত পার্থক্যবিচারে তাঁদের কণ্ঠের তুলনামূলক বিচার অবান্তর নয়। ফৈয়াজ খাঁর গলা খাদের দিকে, করিম খাঁর গলা স্বভাবতই উঁচু পর্দায় বাঁধা। একের গলা যদি bass, অপরের tenor। ফৈয়াজ খাঁর গলা গম্ভীর, করিম খাঁর গলা অপেক্ষাকৃত হাল্কা ও সুচিক্কণ। ফৈয়াজ খাঁর কণ্ঠ পুরুষোচিত কিন্তু বাজখাঁই; করিম খাঁর কণ্ঠ ততো বলিষ্ঠ নয়, কিন্তু অপরূপ মিষ্টি। তবে মনে রাখ্‌তে হবে সেটা নারীসুলভ মিষ্টত্ব নয়; পুরুষের চড়া গলায় যতোদূর মিষ্টত্ব ধারণ ও ধারণা করা যায় করিম খাঁ সেই মিষ্টত্বেরই অধিকারী। ফৈয়াজ খাঁর কণ্ঠে সূক্ষ্ম কলাকারুর অভাব; করিম খাঁর কণ্ঠ অপূর্ব নমনীয় ও সূক্ষ্ম চারুতাযুক্ত। ফৈয়াজ খাঁ মোটা মোটা ঢেউ তুলে সুর সৃষ্টি করেন; করিম খাঁর সুরসৃষ্টিতে শতসহস্র বীচি-বিভঙ্গের লীলা। সুরের পাতে একের মোটা হাতের কাজ; অপরের হাতে সেখানে সূক্ষ্ম কট্‌কি ঝালর।

তবে এক বিষয়ে ফৈয়াজ খাঁর জিৎ। ফৈয়াজ খাঁর কণ্ঠ স্বভাবত কর্কশ হ'লেও তাতে মূলসুরের সঙ্গে সেতারের 'জোয়াড়ি'র মতো একটি সমান্তরাল সুর সারাক্ষণ আনাগোনা করছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এর প্রসাদে এমন যে বাজখাঁই আওয়াজ তাও দরদায়িত হ'য়ে ওঠে। বিশেষত 'তারা'র পর্দায় এই দরদের ভাবটুকু যেন আরও বেশি পরিস্ফুট। কিন্তু করিম খাঁর কণ্ঠে 'জোয়াড়ি'র একান্তই অসদ্ভাব—তাতে সেতারের ঝঙ্কারের ভাবটুকু পাওয়া যায় না।

ফৈয়াজ খাঁর কণ্ঠ গম্ভীর ও ভারী ব'লে খ্যালের অধিকতর উপযোগী, করিম খাঁর কণ্ঠে ঠুংরীর লীলাই সমধিক স্ফূর্তি পায়। তানের ক্ষেত্রেও ফৈয়াজ খাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মানতে হয়। তাঁর তান শুধু অসম্ভব দানাদারই নয়, তার ঘোরপ্যাঁচও করিম খাঁর তানের চাইতে অনেক বেশি। বিশেষ ক'রে 'বোলতান' করবার বেলা ফৈয়াজ খাঁ যে ছন্দের কাজ করেন তা তাঁর গানের এক বিশেষ সম্পদ। করিম খাঁর তানের সেই সম্পদ নেই। তবে করিম খাঁর তান অনেক শান্ত ও সমাহিত, ফৈয়াজ খাঁর তানের মতো তা উদ্বেল আলোড়ন সৃষ্টি করে না। এক হিসেবে রসসৃষ্টির পক্ষে শান্তসুন্দর তানই প্রশস্ত; তান নিয়ে অতিরিক্ত হৈ চৈ মাঝে মাঝে রসগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে বই কি।

করিম খাঁর গানে এমন একটা সুরের আবেশ আছে যাতে সমস্ত মন থিতিয়ে আসে—ফৈয়াজ খাঁর গানে সে ভাবটি পাওয়া যায় না। করিম খাঁ রসিক অরসিক নির্বিশেষে সকলেরই চিত্ত জয় করতে পারতেন, ফৈয়াজ খাঁ শুধু একশ্রেণীর শ্রোতাকেই তৃপ্তি দিতে পারেন। সাধারণের ভালো লাগা মন্দ লাগা দিয়ে রসের বিচার করার সময় এখনও আসে নি সত্য (পরিপূর্ণ সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সেটা সম্ভব) কিন্তু এটা ভুল্‌লে চল্‌বে না যে করিম খাঁ সমভাবে রসিকজনের চিত্ত আকর্ষণ করতেও জান্‌তেন। আর, তা ছাড়া, যে সঙ্গীত তিনি পরিবেষণ করতেন সেটা বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-ই, 'ধিন্ তা ধিনা পাকা নোনা' গোছের গান নয়। কাজেই জনগণের অধিগম্য ব'লেই তিনি বাতিল এ কথা শ্রদ্ধেয় নয়। বরং সেটাই একটা কারণ যার জন্যে ফৈয়াজ খাঁর চাইতে করিম খাঁকে আমাদের সমধিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করা উচিত। একই সঙ্গে যিনি বিদগ্ধ অবিদগ্ধ জনের হৃদয় স্পর্শ করতে পারেন নিঃসন্দেহে তিনি প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। ফৈয়াজ খাঁ সেই অনুপাতে অসার্থক যেই অনুপাতে তিনি জনমনের গ্রাহ্য নন। রসবিচারের ক্ষেত্রে এতোদিন একশ্রেণীর লোকের অভিমতটাই প্রামাণ্য ছিলো, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে জনমতের হিসাবটাও গ্রহণীয় ক্রমেই এই সামাজিক লক্ষণ চারদিকে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌ছে। সেই লক্ষণ মিলিয়ে রসবিচারের মাপকাটি নতুন ক'রে তৈরী হোক এই কামনা নিয়ে আজকের মতো বিদায় হই।

নারায়ণ চৌধুরী

সিনেমা

'আর্ট ফর আর্টস্ সেকিস্ট'-রা আর্টের এলাকায় 'প্রচারে'র গন্ধ পেলে যতই নাক সিঁটকোন —একটু ভেবে দেখলে আমরা বলতে বাধ্য হব যে সব রকম আর্টের মূলেই একটা-না-একটা কিছু প্রচারের প্রেরণা কাজ করে যাচ্ছে। তবে বড়ো আর্টিস্টের লক্ষণ এই যে তাঁর আর্টে প্রচার-টা দাঁত বার করে থাকে না। প্রচারের খোঁচায় যদি সাহিত্যের পাঠককে, চিত্রের দর্শককে বা সঙ্গীতের শ্রোতাকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌তে হয় তখনও অবশ্যি আমরা বলতে দ্বিধা করবনা যে ওসব আর্ট নেহাৎই নিকৃষ্ট স্তরের।

আজ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ চলেছে—আমরা যুদ্ধের আবহাওয়াতেই আজ বেঁচে আছি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চারদিক থেকে আমাদের জীবনকে স্পর্শ করে যাচ্ছে যুদ্ধ। তাই আজকের দিনে যে-শিল্প তৈরী হবে, যুদ্ধের গণ্ডী পেরিয়ে যাবার উপায় তার নেই। যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই তৈরী হবে তার রূপ। আমাদের জীবনলগ্ন যুদ্ধকালীন সমস্যাগুলোকে সাহিত্য যেমন উপেক্ষা করতে পারে না—আজকের দিনের সব চেয়ে জনপ্রিয় শিল্প সিনেমাকেও তাদের প্রতি উদাসীন থাক্‌লে চলে না। যুদ্ধকালীন সমস্যাগুলোকে নিয়ে ছবি তৈরী করা অস্বাভাবিক ত নয়ই বরং প্রয়োজনীয়। যুধ্যমান দেশগুলোতে তা হয়ে চলেছে—ভারতবর্ষের ছবি তৈরীর কারখানাগুলোও এ ব্যাপারে খুব পেছনে পড়ে নেই।

ভারত সরকার বিভিন্ন চিত্রপ্রতিষ্ঠানের যুদ্ধসমস্যামূলক চিত্রোপযোগী গল্প অনুমোদন করে দিয়েছেন আর সে গল্প-রচয়িতাদের মধ্যে কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকও আছেন। কিন্তু সেসব গল্প অবলম্বন করে সার্থক ছবি তৈরী হওয়া ত দূরের কথা এমন কি সাধারণমতো উপভোগ্য ছবিও তৈরী হয়নি। কেন? এই 'কেন'-র উত্তরে হয়ত বহু সূক্ষ্ম ওজর এনে উপস্থিত করা যায় কিন্তু এই শোচনীয় অসাফল্যের সব চেয়ে স্থূল কারণ হল এই যে গল্পগুলো শোচনীয়ভাবে প্রচার-সর্ব্বস্ব। গল্পকে গল্প হ'তে হলে জীবনের পথে চল্‌তে হয়—রক্তমাংসের মানুষের জীবনের ধারা হারিয়ে ফেলে গল্প যদি মতবাদের বা বক্তৃতার অলিগলিতে মানুষ-গুলোকে ঘোরাতে সুরু করে, তা নিয়ে বার্ণার্ডশ'-র চল্‌তে পারে, সিনেমার তাতে কিছুতেই চলে না। প্রচারসর্ব্বস্বতা যদি গল্পগুলোকে স্বধর্ম্মচ্যুত করে 'নিউজ-রীলে'র পর্য্যায়ে নিয়ে আসে তাহলে এ-সব ছবির কোনো দরকার আছে বলে আমরা মনে করিনে। সাহিত্য সংবাদ-পত্রের খবর হয়ে দাঁড়ালে ব্যাপারটা যেমন অসহ্য মনে হয়—এ-ও ঠিক তেম্নি।

যুদ্ধের প্রচার নিয়ে উপভোগ্য গল্প তৈরী অসম্ভব হ'লে—আর ইংরিজি ছবিতে তার পরিচয় না পেলে হয়ত বাংলা বা হিন্দি ছবিতে আজ আমরা যা পাচ্ছি তা নিয়েই খুসী থাকতে পারতুম। যুদ্ধের প্রচার নিয়েই 'নর্থ স্টার' ছবিটি তৈরী কিন্তু জীবনের উষ্ণ স্পর্শে তা সার্থক শিল্পের পর্য্যায়ে উঠে গেছে। তাতে করে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যতটা গভীর দাগ কেটে গেছে দর্শকের মনে, প্রচার-টা যত সার্থক হয়ে উঠ্‌তে পেরেছে—প্রচারের অনাবৃত ঢক্কানিনাদ তার শতাংশের একাংশও করতে পারত কিনা সন্দেহ। প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ধরণের উপভোগ্য ছবি যদি বিদেশে তৈরী হতে পারে, আমাদের দেশের সুসাহিত্যিকের রচনায়ও বা সে ধরণের ছবি তৈরী করার উপাদান থাক্‌বে না কেন? আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের সে-ক্ষমতা আছে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। তবু তাঁদের কাছ থেকে যে ভালো গল্প পাওয়া যায়নি তার কারণ এই যে সে-ক্ষমতা নিয়োগ করে তাঁরা এধরণের গল্প লেখেন না। তাঁদের এই হেলাফেলার প্রশ্রয় গল্পনির্ব্বাচকরা নির্ব্বিবাদে দিয়ে থাকেন বলেই ছবিতে ভালো গল্প দেখবার সুযোগ দর্শকদের হয় না। যাঁদের উপর সরকার থেকে গল্প-নির্ব্বাচনের ভার দেওয়া হয়েছে, ছবি তৈরী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ত তাঁরা থাক্‌বেনই তাছাড়া সাহিত্য-বিচারের দক্ষতাও তাঁদের থাকা চাই। ভালো লেখকের রচনা মাত্রই যে ভালো সাহিত্য নয় একথা বলবার সাহস যাঁদের নেই, তাঁরা কোনো কারণেই গল্প-নির্ব্বাচক বলে গণ্য হতে পারেন না।

আমাদের মনে হয়, সুযোগ্য নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর মধ্য থেকে যদি ছবির গল্পগুলো অনুমোদিত হয়ে আসে তাহলে সুসাহিত্যিকদের কাছ থেকে সত্যিকারের সুসাহিত্য পাবার আশা দর্শকরা করতে পারে আর ছবিগুলোও সত্যিকারের ছবির মর্য্যাদা পায়। জীবনের মারফৎ কোনো বিষয় প্রচার করাই গল্প, প্রচারের আশ্রয়ে জীবনকে উপস্থিত করার নাম গল্প নয়—এ কথা সাহিত্যিকরা জানেন কিন্তু মানেন না আর নির্ব্বাচকরা একথা জানেনও না, মানেনও না। নির্ব্বাচকদের কঠোরতা আর দক্ষতাই কেবল আজকের দিনের চিত্রজগতের নৈরাশ্য দূর করতে পারে বলে আমাদের ধারণা। প্রত্যেক প্রদেশের সুযোগ্য সাহিত্যসমালোচক ও চিত্রসমালোচক নিয়ে যদি ভারতসরকার এই নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠন করেন, তাতে যে শুধু যুদ্ধকালীন প্রচারমূলক ছবিগুলোই সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে তা নয়—যুদ্ধোত্তর যুগেও ভারতীয় চিত্রপ্রতিষ্ঠানগুলো এই নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সাহায্যে এমন ছবি তৈরী করতে পারবে যা ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কল্যাণের পথে অনায়াসে নিয়ে যেতে পারে।

আ

রেডিও

রেডিওর জনপ্রিয়তা এতো দ্রুত বাড়ছে যে ভাবলে অবাক হতে হয়। বিশ বছর পূর্ব্বেও এই যন্ত্রটি আমাদের দেশে এক রকম অজানাই ছিলো। অথচ আজকের দিনে অন্ততঃ একটি শ্রেণীর মধ্যে রেডিও জিনিসটি নিছক বিলাসের সামগ্রী থেকে প্রয়োজনীয়ের কোঠায় উঠে এসেছে। ক'লকাতার বেতারকেন্দ্রের প্রবেশমুখে গত ৫ বছরে রেডিওর জনপ্রিয়তা কী হারে বেড়েছে তার একটি চার্ট ঝুলানো আছে, সেটি দেখলে অনেকেরই টনক নড়বে, রেডিও যে আর হেলাফেলার জিনিস নয় তা অন্ততঃ আমাদের খবরকাগজ ও পত্রিকাওয়ালারা বুঝতে পারবেন। এখন অবশ্য সিনেমাই বাজার সরগরম ক'রে রেখেছে, এবং পপুলারিটির বিচারে এর জোড়া মেলে না। কিন্তু এ কথাও মনে রাখা দরকার, আমোদ-প্রমোদের উপকরণ হিসাবে সিনেমাতেই বোধ হয় সবচেয়ে কম খরচে বেশী উপভোগ সম্ভব। তার জনপ্রিয়তার মূলে এ কারণটা থাকাই স্বাভাবিক। এদিক দিয়ে রেডিওর প্রসার পথে প্রচুর বাধা, কেননা আমাদের দরিদ্র দেশ। তবু যখন আজ পথ দিয়ে হেটে যেতে বারবার চমকে উঠি রেডিওর গলা শুনে তখন এর কথা আরো একবার ভেবে দেখতে হয় বৈকি!

প্রথম দিকে আমরা ভাবতাম খবর শোনার জন্যই রেডিও, সে ভুল আজ সকলেরই ভেঙেছে কিন্তু এখনো আমাদের দেশে লোকে রেডিওকে খবরকাগজ না ভাবলেও গ্রামোফোন মনে করে। বেশীর ভাগ লোকই নিছক গানবাজনা শোনার জন্যই রেডিও কেনে, অন্যেরা খবরের মোহে। কিন্তু গানবাজনা অথবা খবর দেওয়াই রেডিওর একমাত্র কাজ নয়, তারজন্য খবর-কাগজ এবং গ্রামোফোন আছে। অথচ সাহিত্যের মজলিশ অথবা স্কুলকলেজও রেডিও নয়। তার বিশেষত্ব এইখানে যে সে সর্বভুখ, তার সোনার তরীতে আছে সকলের ঠাঁই। সে একাধারে খবরকাগজ, গ্রামোফোন, সিনেমা-থিয়েটার, সাহিত্য মজলিশ; স্কুলকলেজ, বক্তৃতা মঞ্চ, আরো কী। এক কথায় রেডিও একটি জাতির সমগ্র মানস প্রতীক। যে কোন কাজে তাকে লাগাতে পারা যায়, কোন একটা বিশেষ ক্ষেত্রে সে আটকে থাকেনি, এবং সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশী লোকের কাছে কোন একটি জিনিস পৌঁছিয়ে দেবার ক্ষমতা তার অসাধারণ। আসলে রেডিওর যদি বিশেষ কোন কাজ থাকে তবে তা এই। বহুর দরবারে বহুলাংশ হাজির করা, স্বল্প সময়ে এবং অল্প মূল্যে। কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক যুগের আবিষ্কার মনে করলে একে ঠিক চেনা যায় না, সিনেমার মতো, রেডিও যন্ত্রটিও একান্তরূপে গণতান্ত্রিক যুগের জিনিস। জনগণের

প্রয়োজনে তার আবির্ভাব, গণতন্ত্রেই কেবল তার সার্থকতা। আবার গণতন্ত্রের অন্যতম বাহন সে। এইজন্যেই রেডিও যখন প্রথম দেখা দিল তখন অনেকেই আশান্বিত হয়েছিলেন —এইবার বুঝি গণতন্ত্রের পথ সুগম হ'লো, দেশের অন্দরমহলের অসন্তোষ বুঝি মিটল। শুধু তাই নয়, কেউ কেউ আবার বিশ্বশান্তির বীজ দেখলেন এর মধ্যে, মনে মনে এই ভেবে খুশী হলেন যে মন কষাকষি হলেই আর দুই দেশ তলোয়ার খুলে বসবে না, শরণ নেবে যুক্তির, আলাপ আলোচনার। মেঘ জমতে না জমতেই হাওয়া দিতে সুরু করবে রেডিও, মুহূর্ত্তে উড়ে যাবে গুমোট, হেসে উঠবে সুনীল আকাশ। সে আশা সফল হয়নি। তার প্রধান কারণ প্রায় সব দেশেই রেডিও আজ ধনিকবনিকদের মুঠোর মধ্যে, তাদের লোভ এবং অহংকারের নিরুপায় বাহন। স্বভাবতই রেডিওর প্রধান কাজ আজ প্রোপাগাণ্ডা, তাকে দিয়ে সব দেশই আজ যা বলাচ্ছে তার একটি মাত্র ধুঁয়ো : তোমার চেয়ে আমি বড়। সুতরাং তোমাকে আমার হুকুম মানতেই হবে। গণতন্ত্র এবং জনগণের জন্য যে শিলনোড়ার সৃষ্টি তা দিয়ে আজ তাদেরই দাঁত ভাঙছে।

তাই এখন আর রেডিওর মারফত জনকল্যাণের পথ সুপথ করার কথা বলতে সাহস হয় না। যে অস্বাভাবিক সমাজব্যবস্থার ফলে মুষ্টিমেয়র হাতে সর্বকতৃত্ব তার উচ্ছেদ না হলে অন্য অনেক কিছুর মতো রেডিও-ও ব্যর্থ হবে। জনসাধারণের যন্ত্র যদি কোনদিন জনতার হাতে আসে তবে সেইদিন কেবল তার সার্থকতা মিলবে। তখনো হয়ত তার প্রধান কাজ হবে প্রোপাগাণ্ডা কিন্তু ইংরেজী অর্থে নয়, বাংলায় আমরা যাকে প্রচার বলি তাই। তার মূল লক্ষ্য জনসাধারণ, তাদের কল্যাণ। দেশকে শিক্ষিত ক'রে তোলা। আজ যা হয় না, তাই।

আবুল হোসেন

নাটক

রামের সুমতি ঃ রঙমহল।

'রামের সুমতি' শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের রচনা এবং নিছক একটি ছোট গল্প। এই গল্পকে নাট্যাকারে গ্রথিত করে মঞ্চস্থ করবার মধ্যে বেশ একটু সাহসের পরিচয় আছে। নাটকটি দেখবার আগে যথেষ্ট কৌতূহল মনে মনে পোষণ করেছি কারণ 'রামের সুমতি'তে নাটকীয় পরিবেশের অভাব। শরৎচন্দ্রের রচনা মাত্রই নাটকীয় তবু 'দেবদাস' বা 'বিপ্রদাসে'র ঘটনা-সংঘাত নাট্যকারদের যে সুযোগ দিয়েছে 'রামের সুমতি'র নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি শরৎচন্দ্রের ভাবধারাকে বজায় রেখে যে সূক্ষ্ম শিল্পীমনের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসা পাবার যোগ্য।

'দেবদাসে'র নাট্যরূপ শরৎচন্দ্রের নয়, শচীন সেনগুপ্তের—'বসন্তে'র প্রাদুর্ভাবে 'দেবদাস'কে আর চেনাই যায় না। 'বিপ্রদাসে'র নাট্যকার 'দয়াময়ী'কে খর্ব করে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য বিষয় ম্লান করে দিয়েছেন। তাছাড়া যেখানে তিনি নাটকের ধারায় নিজস্ব সংলাপ যোজনা করেছেন, শরৎচন্দ্রের সংলাপের পাশে তা অত্যন্ত বেসুরো ঠেকেছে। এ জন্যেই দেবনারায়ণ গুপ্তকে প্রশংসা করতে হয় যে তিনি শরৎচন্দ্রের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেছেন। 'রামের সুমতি'তে কোথাও 'দেবত্ব' উঁকি ঝুঁকি মারে নি অথচ দেবনারায়ণ গুপ্তকেই লিখতে হয়েছে বেশী সংলাপ নইলে 'রামের সুমতি'র মতো ছোট গল্প পরিপূর্ণ একটী নাটকে রূপান্তরিত হতো না। 'রামের সুমতি'র সফলতার মধ্যে নাট্যকারের হাত যথেষ্ট।

'রামের সুমতি'র প্রধান চরিত্র রামলাল। তাকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য চরিত্রগুলোর কার্য্য-কলাপ। বালক রামলালের বেয়াড়াপনা গল্পের বিষয়বস্তু এবং অন্যান্য চরিত্রগুলো সজীব হয়ে উঠেছে এর প্রতিক্রিয়ায়। কাজেই রামলালের চরিত্রাভিনয়ে শিথিলতা প্রকাশ পেলে নাটক জমে উঠবার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু কিশোর অভিনেতা বুদ্ধদেব সমস্ত আশঙ্কা জয় করে নিয়েছে।

'রামের সুমতি' প্রেমবর্জিত নাটক এবং নাটকের নায়ক একজন বালক। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এ দুটোই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা যদিও 'রঙমহলে'র কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রের গল্প বলে এই নতুনত্বকে গ্রহণ করেছেন, তবুও তাঁদের সৎসাহস প্রশংসার্হ। 'রামের সুমতি'র সফলতায় একথা আজ মনে হচ্ছে যে, 'একজনের কসরৎ' দেখবার দিনের অবসান হয়েছে। Team

work-ই অভিনয়ের প্রধান কথা। সংঘবদ্ধতায় অভিনয়ের ধারা পালটে যেতে পারে এবং নাটকও সমাজমুখীন হয়ে ওঠে, কারণ কোনো বিশিষ্ট নটের বাহাবা নেবার মতো চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজন পড়ে না। রঙ্গমঞ্চ সমাজের প্রতিফলন, গিরিশচন্দ্রের পর একথা আমরা ভুলে যেতে বসেছি। আজ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র রঙ্গালয়কে বাঁচিয়ে রেখেছেন, কারণ তাঁর রচনায় সামাজিক সমর্থন আছে। কিন্তু আমাদের নাট্যকাররা গিরিশচন্দ্রের ব্যর্থ অনুকারক মাত্র, অথচ সমাজ এগিয়ে গেছে অনেকদূর।

অমল দত্ত

সমালোচনা

REFLECTIONS ON THE REVOLUTION OF OUR TIME. By Harold J. Laski. George Allen & Unwin Ltd. 15s.

অধ্যাপক ল্যাস্কি প্রখ্যাতনামা লেখক—বহুত্ববাদী রাষ্ট্রবিদ হিসাবে ইংরাজি ভাষায় তাঁর তুলনা বেশী মেলে না। মৌলিকত্বের দাবী অবশ্য তিনি কোনদিনই করেন নাই, প্রথমতঃ ডুগুই এবং পরে মার্কসের প্রভাবেই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা গড়ে উঠেছে, কিন্তু বিশ্লেষণ ও প্রাঞ্জল বর্ণনার দৌলতে তাঁর রচনা মৌলিক না হয়েও বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ দুই শ্রেণীর পাঠকের কাছেই সমাদর লাভ করেছে। তাঁর লেখার আর একটী প্রধান গুণ সজীবতা এবং সেই জীবনশক্তির বলে সম্মুখে এগিয়ে যেতে তিনি কোনদিন পিছু পা হন নি। একবার গ্রহণ করেছেন বলে চিরদিনই তা আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে এ রকম রক্ষণশীলতার কোন পরিচয় তাঁর রচনায় মেলে না। পরীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে তাই তাঁর মতবাদে বহু বিবর্ত্তন, কিন্তু পরিবর্ত্তনের মধ্যেও দৃষ্টিভঙ্গীর একটী অন্তর্নিহিত ঐক্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

খুব মোটামুটীভাবে বলতে গেলে অধ্যাপক ল্যাস্কি প্রথমত এবং প্রধানত উদারপন্থী। তাঁর প্রথম যৌবন বৃটীশ রাজনীতিতে উদারনৈতিক মতবাদের স্বর্ণ যুগ—সেদিন বুদ্ধির প্রাধান্য এবং গণতন্ত্রের প্রসারে বিশ্বাস প্রায় সর্ব্বজনীন। সে যুগের প্রভাব ল্যাস্কি কোনদিনই ছাড়িয়ে উঠতে পারেননি, তাই সমাজতান্ত্রিক মতবাদের দিকে তাঁর ঝোঁক যতই বাড়ুক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত উদারনৈতিক রাজনীতির গণ্ডী পার হয়ে আসা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে তাঁর পরবর্ত্তী প্রায় সমস্ত রচনাই দোটানায় দ্বিমনা, এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে কেবল যে তাঁর যুক্তি ও সিদ্ধান্ত বহুক্ষেত্রে দুর্ব্বল, তা নয়, তার ফলে সময় সময় তাঁর রচনায় এসেছে অমার্জ্জনীয় শৈথিল্য। একই কথা বারে বারে ফেনিয়ে ফেনিয়ে বলার মূলে যে কেবল-মাত্র অপরকে বোঝাবার প্রয়োজন, তা নয়—এই পুনরুক্তির আসল উদ্দেশ্য নিজের মনকে প্রবোধ দেওয়া।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে অধ্যাপক ল্যাস্কির রচনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর এ দোষগুণ দুইই সমান পরিষ্কার। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় খুবই স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত। বর্ত্তমানে মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনা যে স্তরে পৌঁছেছে, তার উপযুক্ত প্রয়োগে পৃথিবীর সকল মানুষেরই অভাব দূর করা সম্ভব। এক কথায় অভাবের বদলে প্রাচুর্য্যের ভিত্তিতে জগতের অর্থনৈতিক

সংগঠন আজ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে এসেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্ব্বত্রই মানুষ নিদারুণ অভাব অনটনে হাহাকার করে। তার একমাত্র কারণ এই যে উৎপাদন শক্তি সমাজের কল্যাণে ব্যবহৃত না হয়ে ব্যক্তির মুনাফার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং রাষ্ট্রশক্তির বর্ত্তমান সংগঠন এ অপব্যবহারে বাধা না দিয়ে বরং তাকে কায়েমী করে রেখেছে। সেই কথাটীকেই অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলা চলে যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে না পারলে রাজনীতির ক্ষেত্রেও গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। রাষ্ট্রিক গণতন্ত্রের ফলে ব্যক্তির যে মর্য্যাদা বোধ জাগ্রত হয়, ধনতন্ত্রের আর্থিক বৈষম্য ও অবিচারের মধ্যে তার বিকাশ বর্ত্তমানে অসম্ভব। ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্রের এ দ্বন্দ্ব পূর্ব্বে এত স্পষ্টভাবে ধরা পড়েনি। ধনতন্ত্রের সম্প্রসারণের যুগে যে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি, তারই আংশিক ভাগ পেয়ে সেদিন জনসাধারণ তৃপ্ত ছিল। বর্ত্তমানে ধনতন্ত্রের সংকোচনের দিনে জনসাধারণকে সম্পদের অংশ দেওয়া কঠিন, অথচ জনসাধারণও আজ একথা বুঝতে সুরু করেছে যে শিল্পবিজ্ঞানের বর্ত্তমান পরিণতিতে অভাব অনটন সহ্য করবার কোন প্রয়োজন নাই। তাই জনসাধারণের মধ্যে যারা প্রগতিশীল, সচেতন ও জাগ্রত, তারা চায় যে ধনতান্ত্রিক আর্থিক সংগঠন অতিক্রম করে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের বনিয়াদে সমস্ত মানুষের কল্যাণের পথ খুঁজে নিতে হবে। যারা সচেতন ও জাগ্রত কিন্তু প্রগতিবিরোধী, তারা কিন্তু চায় যে ধনতান্ত্রিক আর্থিক সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য স্বদেশকে পরাধীন করে তার সম্পদের ব্যবহার করবে, অথবা প্রয়োজন হলে গণতন্ত্রকেই বিসর্জ্জন দিতে হবে। রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে হয় এগিয়ে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে পরিণত করতে হবে, অথবা গণতন্ত্রের মুখোস খুলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের নগ্নরূপে দেখা দিতে হবে। অধ্যাপক ল্যাস্কি সেই সঙ্গে এ কথাও বলতে চান যে এ রূপান্তর যদি অহিংস উপায়ে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঘটানো যায়, তবে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সমাজতান্ত্রিক বিকাশ সহজ ও স্বাভাবিক হবে। যদি সর্ব্বসম্মতভাবে অহিংস উপায়ে না ঘটে এ রূপান্তর সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়, তবে তার ফলে রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিলুপ্ত হতে বাধ্য। শ্রমিকশ্রেণীর সর্ব্বনায়কত্বের প্রয়োজন শুধু তখন, যখন অহিংস উপায়ে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের সমস্ত সম্ভাবনা ফুরিয়ে গেছে। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে রুশদেশে সশস্ত্র সহিংস বিপ্লবের পথে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপনের ফলে সেখানে যে কেবল জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা ও অভাব বহুগুণে বেড়েছে, তা নয়, তার ফলে রুশদেশে ব্যক্তিস্বাধীনতার গুরুতর হানি এবং বিদেশে রুশবিপ্লবের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিতৃষ্ণা বৃদ্ধির অবকাশ ঘটেছে। অবশ্য এ কথা অধ্যাপক ল্যাস্কিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে ইয়োরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বিদ্বেষ ও শত্রুতা এত প্রবল না হলে রুশদেশে গণতন্ত্রের বিলোপ এত সুদূর-প্রসারী অথবা এত দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়তো হ'ত না।

এ কথা সকলেই স্বীকার করবে যে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর যদি অহিংস উপায়ে আপোষের মধ্য দিয়ে হয়, তবে তাতে পৃথিবীর সমূহ কল্যাণ। অধ্যাপক ল্যাস্কি এ কথাও বারে বারে বলেছেন যে ইংলণ্ডের কঠিন বিপদের দিনে যখন ইংরেজ দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্বপণ করতে প্রস্তুত হয়েছিল, তখন ব্যক্তিস্বার্থের বিসর্জ্জনের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রস্থাপনের

সুযোগ গিয়েছে। সে সুযোগ কিন্তু গৃহীত হয়নি এবং অধ্যাপক ল্যাস্কির নিজেরই মত যে বিপদ যতই কমে আসবে, চিরাচরিত অভ্যাস ও পুঁজি-স্বার্থের প্রাবল্য ততই বাড়বে। একথাও তিনি বারে বারে বলেছেন যে যুদ্ধের মধ্যে যদি এ অহিংস বিপ্লব সাধিত না হয়, তবে যুদ্ধের শেষে তার সম্ভাবনা খুবই কম; অথচ এ সমস্ত স্বীকৃতির পরেও যে ইংলণ্ডে শাসকসম্প্রদায় স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রশক্তি বিসর্জ্জন দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পত্তন করতে পারে, তাঁর এ বিশ্বাসকে ইচ্ছাপূরণ ও আশাবাদ ভিন্ন কি বলা চলে?

বস্তুতপক্ষে প্রাচীন উদারপন্থী ও অধুনা সমাজতান্ত্রিক ল্যাস্কি এখন পর্য্যন্ত নিজের মনস্থির করতে পারেন নি বলে তাঁর মতবাদেরও স্থিরতা নাই। পরাধীন দেশ সম্বন্ধে আলোচনায় তাঁর এ মতিচাঞ্চল্য সব চেয়ে বেশী ধরা পড়ে। ভারতবর্ষের ব্যাপারে প্রগতিবাদী সমাজতান্ত্রিকের সমস্ত বক্তব্য বলেও অবশেষে কিন্তু ইংরেজশাসন অপসারণের ব্যাপারে তাঁর মতবাদে সাম্রাজ্যবাদী গন্ধ ধরা পড়ে যায়। অন্যান্য উপনিবেশ সম্বন্ধেও তিনি ম্যানডেট শাসন যে ভাবে মেনে নিয়েছেন, তাতে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করতে হয় যে সমাজতান্ত্রিক ল্যাস্কির অবশেষে এই পরিণতি? শেষ পর্য্যন্ত বলতে হয় যে সাম্রাজ্যবাদী যে বিষ আজ পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মানুষকে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অবমানবের পর্য্যায়ে এনে ফেলেছে, তারই প্রতিক্রিয়ায় বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতেও মানসিক ও চারিত্রিক অবনতি আজ মানুষের ভবিষ্যতকে বিপদসঙ্কুল করে তুলেছে। সেই জন্যই অধ্যাপক ল্যাস্কিও একথা বোঝেন নি, অথবা বুঝেও বুঝতে অস্বীকার করেছেন যে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রথম পদক্ষেপ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস। সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস তাই কেবলমাত্র পরাধীন দেশগুলির জন্যই প্রয়োজনীয় তা নয়, বিজেতা দেশগুলির কল্যাণের জন্যও আজ তা সমান প্রয়োজনীয়।

বইখানিতে ছাপার ভুল মাঝে মাঝে পীড়া দেয়, এবং পুনরুক্তির ফলে আকার অস্বাভাবিক স্ফীতি লাভ করেছে। অধ্যাপক ল্যাস্কির যা বক্তব্য তা বোধ হয় বইখানির চার আনাতেই বলা চলত।

হুমায়ুন কবির

TURNING POINT. Klaus Mann. Victor Gollancz, 12/6*d*.

বইখানি বিখ্যাত জার্ম্মান ঔপন্যাসিক টমাস ম্যানের পুত্র ক্লাউস ম্যানের জীবনী। ক্লাউস ম্যান এখনও যুবক—সম্মুখে তাঁহার সমস্ত কর্ম্মজীবন পড়িয়া রহিয়াছে। সাধারণতঃ যে খ্যাতি অর্জ্জনের পরে, অথবা জীবনে পরিণতির যে সম্ভাবনা দেখা দিলে আত্মজীবনী রচনায় ইচ্ছা জন্মে, ক্লাউস ম্যানের জীবনে তাহার কিছুই এখনও আসে নাই। পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবে তিনি আবাল্য সাহিত্য রচনার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকাশকেরা আগ্রহসহকারে তাঁহার অপরিণত রচনা প্রকাশ করিয়াছে। পিতার গৌরবের উৎসৃত আলোকে তাঁহার নাম জার্ম্মানীর

পাঠক সাধারণের কাছে পরিচিত, তাহারাও ক্লাউস ম্যানের সকল রচনা কৌতূহলসহকারে পাঠ করিয়াছে। সাহিত্যপ্রচেষ্টা পরিণত হইবার পূর্ব্বেই নাৎসী দলের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে মাতৃভূমি ত্যাগ করিতে হইয়াছে, মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনাও আর সম্ভব হয় নাই। কাজেই যে সকল গুণ থাকিলে কোনও ব্যক্তির আত্মজীবনী সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ক্লাউস ম্যানের তাহা নাই। তথাপি তিনি ইয়োরোপ ও আমেরিকার লেখক সমাজে প্রথম যৌবনেই পরিচিত হইতে পারিয়াছিলেন, লেখার গুণে না হইলেও অদম্য প্রাণশক্তির স্ফূর্ত্তিতে। নাৎসীদের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বেই তিনি তাহার ভগিনী এরিকাকে সঙ্গে লইয়া প্রায় কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় আমেরিকা, জাপান, চীন ও রুশ দেশ ভ্রমণ করেন। এই দুঃসাহসী ভ্রমণই বোধহয় প্রথমে তাঁহাকে ইয়োরোপ ও আমেরিকার লেখক সমাজে পরিচিত করে। তাঁহার আত্মজীবনী সম্বন্ধে কৌতূহল সৃষ্টি করিতে এই ভ্রমণ কাহিনীই যথেষ্ট। উপরন্তু তাঁহার পরিচয় দিতে গিয়া টমাস ম্যানের নাম অনিবার্য্যরূপে আসিয়া পড়ে। টমাস ম্যানের নামের ম্যাজিকের গুণেও বইখানি পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে। তৃতীয়ত, ক্লাউস ম্যান সমরোত্তর জার্ম্মানীতে বড় হইয়াছেন, তাহার মনের বিকাশ হইয়াছে সেই সমাজ হইতে যাহা নাৎসীবাদেরও জনক। জার্ম্মানীর ব্যাধিদুষ্ট সমাজ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিদের নিষ্ক্রিয়তায় ক্রমে নাৎসীদের কবলে পড়িয়া মানব সভ্যতার বর্ত্তমান সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ নানা সূত্র হইতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সমাজের তাহা আংশিক পরিচয় মাত্র। এই রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিবেশ সমাজ ও ব্যক্তির মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিত তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। ক্লাউস ম্যানের আত্মজীবনী হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে পাঠকের মনে এই আশাই প্রথমে হয়।

প্রথমে আপনার পারিবারিক পরিচয় সমাপ্ত করিয়া, নিজের অধ্যাত্মীয় পরিচয় এবং নানা কর্ম্মের ইতিহাস বিবৃত করিয়া তিনি নাৎসীদলের অভ্যুত্থানের পরিচয় দিয়াছেন একটি অধ্যায়ে। সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনামা—ইয়োরোপ (১৯২৮-৩০)। ইয়োরোপের বিখ্যাত ও অখ্যাত বহু বুদ্ধিজীবি, লেখক, শিল্পী প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এই অধ্যায়ে। সমাজের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের জন্য এই অধ্যায়টি বিশেষভাবে পাঠ্য; ইয়োরোপের বুদ্ধিজীবিদের জীবনের অন্তরঙ্গ দিকের এক ঝলক দেখিতে পাই বলিয়া কোনও উদ্দেশ্য না থাকিলেও এই অধ্যায়টি আকর্ষণীয়। যে সমাজ পরিণতি লাভ করিয়াছে বর্ত্তমান ব্যাপক ধ্বংসে, তাহাতে কোনও সংহতি অথবা ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া অগ্রসর হইবার সচেতন চেষ্টা দেখিতে পাইবার কথা নহে। বরং লক্ষ্যহীন কোলাহল ও দ্বন্দ্বে সমাজ-সৌধের উপরিভাগ যে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িতেছে তাহার পরিচয় পাওয়াই স্বাভাবিক। সুরিয়েলিস্ট লেখক রেনে ক্রেভেল ও তাঁহাদের দলের কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় প্রসঙ্গে ক্লাউস ম্যান রেনেকে প্রশ্ন করেন "Etes-vous fous ?" "তুমি কি পাগল ?" এই প্রশ্ন রেনে ও আপনাকে বহুবার করিয়াছেন, তিনি উত্তর পান নাই। হয়ত তাঁহারা, হয়ত বা সমগ্র সমাজই উন্মাদ হইয়া পড়িয়াছে।

অষ্টম অধ্যায় অলিমপাস। ক্লাউস ম্যান আপনার প্যানথিয়নে নানা দেবতা প্রতিষ্ঠা

করিয়াছেন,—যাঁহারা আপনার চিন্তা এবং কর্ম্মদ্বারা মানুষের সম্মুখে নূতনতর আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, নূতন প্রেরণা দিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই আসন এই অলিমপাসে। এই সকল নামের সহিত অল্পবিস্তর সকলেই পরিচিত। নানা গ্রন্থের মারফতে পরিচয় পাইয়া যাহাদের সম্বন্ধে মনে মনে একটি রূপ কল্পনা করিয়া লইয়াছি তাহাদেরই নূতন আলোকে সাক্ষাৎ পাইয়া কৌতুক ও বিস্ময় অনুভব করিতে হয়। ফ্রয়েড ও কার্ল মার্কসের কথপোকথন বিশেষ করিয়া কৌতুকাবহ। মার্কস ও কম্যুনিজ্‌ম সম্বন্ধে লেখকের সহানুভূতির অভাব আছে, সেকথা তিনি গোপন করিবার চেষ্টা করেন নাই। ফ্রয়েডের আবিষ্কার মানুষের মনের সকল রহস্যের সন্ধান দিতে অক্ষম, মানব মনের অচিন্তনীয় অভিব্যক্তি, যাহা অনেক সময়েই বিকারের রূপে প্রকাশ পায়, তাহা সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান অপারক—এ কথাও হয়ত লেখক মনে করেন। লেখকের কাছে যাহারা দেবাদিদেব এবং যাহারা শুধু স্বর্গবাসী তাহাদের সম্বন্ধে একমত না হইলেও অধ্যায়টির অন্তরঙ্গ রচনারীতির জন্য ভাল লাগে।

জীবনে যাহারা খ্যাতির শিখরে উপনীত হইয়া নিজের কর্ম্মের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের সে ইতিহাস যে মন লইয়া লোকে পাঠ করে আলোচ্য আত্মজীবনীটি ঠিক সেইভাবে পড়িতে আরম্ভ করিলে নিরাশ হইবার কথা। আমাদের দেশে লেখকের নাম প্রায় অপরিচিত, কাজেই সে দিক হইতে আমাদের দেশের পাঠককে এই বইখানি আকর্ষণ করিবে না। কিন্তু এই বইখানি পূর্ব্বাপর একটি উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত :

> " To tell the story of an intellectual in the period from 1920 to 1940—a character who spent the best time of his life in a social vacuum; striving for a true community but never finding it; disconnected, restless, wandering; haunted by those solemn abstractions in which nobody else believes—civilization, progress, liberty.
>
> To tell the story of a German who wanted to be a European: of a European who wanted to be a citizen of the world. Of an individualist equally opposed to standardization and anarchy. . . .
>
> Every human life is at once unique and representative. Limited in its scope and moulded by specific conditions; and yet full of infinite suggestions, transcending the range of its own problems and objectives, pointing to potentialities far beyond its empirical margin. . . ."

অবশ্য এই উদ্দেশ্যে জীবন চরিত রচনা করা প্রসস্থ অথবা একখানা উপন্যাসে বক্তব্য আরও সুপরিস্ফুট করিয়া বলা সম্ভব তাহা লইয়া আলোচনা চলিতে পারে। গ্রন্থকার আত্মজীবনীতেই আপনার এই অধ্যাত্মীয় অভিযানের কাহিনীর বিবৃত করিয়াছেন এবং তাহা অসার্থক হয় নাই।

ইংরাজী গ্রন্থকারের মাতৃভাষা নহে। মাতৃভাষাতে আবার কবে আপনার মনের কথা প্রকাশ করিবার সুযোগ আসিবে সেই আশায় বসিয়া না থাকিয়া ইংরেজীতেই গ্রন্থরচনায় ব্রতী হওয়া সাহসিকতার পরিচায়ক।

গ্রন্থখানিতে একটি একান্ত ব্যক্তিগত স্পর্শ অনুভূত হয়; যে কোন সুলিখিত আত্মজীবনীর ইহাই অন্যতম প্রধান গুণ।

করালীকান্ত বিশ্বাস

WE NEVER DIE. D. F. Karaka. Thacker & Co., Ltd., Bombay. Rs. 7/14.

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংকল্প মনোবলের উপর নির্ভর করে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে এসেছে। নীরব বিপ্লবের বহ্নি মনের আকাশ রঙীন করে তুলেছে, হৃদয়-বিনিময়ের পথে ভারতীয় সমাজ নতুনভাবে গঠিত হচ্ছে। হিংস্র পশুশক্তির আশ্রয় নিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা-কামী নয়, স্বাধীনতার সৈনিক হত্যা করে উল্লসিত হয়ে ওঠে না, ভারতবর্ষের চিন্তায় রক্ত-লোলুপতা নেই। ভারতবর্ষের একমাত্র চিন্তা: সত্যাগ্রহ, একমাত্র অস্ত্র: চেতনা-উদ্বুদ্ধ মন। আজো সাম্প্রদায়িক দলাদলি, অশিক্ষা ভারতীয় আবহাওয়া কলুষিত করে রেখেছে। কিন্তু স্বাধীন ভারত শুধুমাত্র হিন্দুর নয়, শুধুমাত্র মুসলমানের নয় অথবা হিন্দু-মুসলমানের নয়। একদিন এই দুই জাতিকে বিপ্লবীদের প্রচেষ্টায় এক হয়ে যেতে হবে। তারা ভারতীয়, এই হবে তাদের পরিচয়।

শ্রীযুত কারাকা তাঁর এই উপন্যাসে এই কথাই জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন। আয়েষা ও রামচন্দ্র জীবিত থাকবে তাদের সন্তানের মধ্য দিয়ে, যে হবে ভারতবর্ষের সত্যকারের উত্তরাধিকারী। সাম্প্রদায়িক বিভেদ, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান'এর ধর্মগত বৈষম্য স্বাধীনতার চিন্তাকে খামিরের মতো চেপে ধরেছে। এই আত্মঘাতী কুসংস্কার দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত স্বাধীনতা-চিন্তা অনেকটা ব্যর্থ পরিহাস। কারণ কুসংস্কার-মুক্ত শিক্ষিত মন যার, সে-ই হতে পারে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিক।

শ্রীযুত কারাকা জাতীয়তাবাদী এবং বিগত কয়েকটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, স্বাধীনতা-আন্দোলনের কোথায় দুর্বলতা। তাই তিনি স্বপ্ন দেখেছেন, সাম্প্রদায়িক কালিমার অপনোদন কী ভাবে সম্ভব। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন ভারত-বর্ষের অনাগত সন্তানের যে হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়—স্বাধীনতা যার একমাত্র ধর্ম।

We Never Die কারাকার স্বপ্ন। উপন্যাস হিসেবে এর স্থান উঁচুদরের নয়। এমন কি কাহিনীটি একেবারে খাপছাড়া, কতকগুলো চরিত্রকে আশ্রয় করে লেখক তাঁর বক্তব্য বলে গিয়েছেন—তা চরিত্রটি গ্রাম্য চাষীই হোক, কিংবা আই-সি-এস'ই হোক। বই-এর পাতায় পাতায় লেখকের ভাবপ্রবণতা উপছে পড়ছে, অব্‌জেক্‌টিভ দৃষ্টিভংগী নিয়ে চরিত্র-চিত্রণের কোনো চেষ্টাই হয় নি। We Never Die কতকগুলো চরিত্রের ভগ্নাংশ নিয়ে গঠিত হয়েছে— তাই উপন্যাসখানিতে লেখকের উদ্দেশ্যই বড়ো হয়ে উঠেছে, আগাগোড়া তিনি এক জায়গায়ই আঘাত করেছেন, নইলে একটি গ্রাম্য মুসলমান চাষীর মেয়ে ও একজন আই-সি-এস ব্রাহ্মণের মধ্যে পরিণয় সম্ভবপর হতো না। এর মধ্যে মনস্তত্ত্ব, পরিবেশ বা ঘটনাসংঘাতের বালাই নেই, শ্রীযুত কারাকা যে প্রধানত সাংবাদিক ও প্রচারক, তারই পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।

অমল দত্ত

দুঃখ নিশার শেষে—মনোজ বসু। বেঙ্গল পাব্‌লিশার্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, মূল্য ২৲।

"দুঃখ নিশার শেষে" মনোজ বসুর সাম্প্রতিক ছোট গল্পের সঙ্কলন। ১৩৪৯ এবং ১৩৫০ সাল বাংলার জীবনে দুটি উল্লেখযোগ্য বৎসর। এই দুই বৎসরে বন্যা, ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্দৈবে বাঙালীরা ত ভুগেছেই—কিন্তু তাদের চরম দুর্দশা হয়েছিল মানব-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে। বাংলা দেশের এই দুটি বৎসরের করুণ ইতিহাসের পটভূমিকাতেই 'দুঃখ নিশার শেষে'র অধিকাংশ গল্প রচিত। এই জাতীয় বিষয়-বস্তু নিয়ে লেখা অন্যান্য লেখকের আরও অনেক রচনা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শিল্প সৃষ্টি হিসাবে তার কোনটাই খুব বেশী সার্থক হয়েছে বলে মনে হয় না। না হবার কারণও অবশ্য যথেষ্ট আছে। দুর্দৈবের ঘটনাগুলো এত প্রত্যক্ষ এবং আমাদের এত সম্মুখবর্ত্তী যে তাদের নিয়ে নিরাপদ শিল্পী-সুলভ দূরত্ব এবং নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি-কোণ থেকে সাহিত্য রচনা বোধ হয় বর্ত্তমানে প্রায় অসম্ভব। ফলে দুর্ভিক্ষ মহামারী মন্বন্তর প্রভৃতি নিয়ে যাঁরা গল্প লিখেছেন তাঁদের অধিকাংশের গল্পেই ভাসা ভাসা দুর্দশার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে বটে—কিন্তু অন্তর্নিহিত গভীর রূপটি ধরা পড়ে নি। মনোজ বসুর আলোচ্য গল্পগুলোও এদিক থেকে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নয়। তবে বাংলার লেখকদের সম্বন্ধে আমাদের আশান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ দেখা দিয়েছে। লেখকরা যথেষ্ট পরিমাণে সমাজ-সচেতন হয়ে উঠেছেন—তাঁদের হাতে যে একটা সুমহান সামাজিক দায়িত্ব আছে এ সত্য তাঁরা বুঝ্‌তে শিখেছেন।

বর্ত্তমান সংকলনে 'মন্বন্তর' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ গল্প। শেষ গল্প "দুঃখ নিশার শেষে"র অশিক্ষিত চাষা মাদার বিশ্বাসের চরিত্র-বিবর্ত্তন উপভোগ্য শিল্পসৃষ্টি: কি ভাবে শোষণকারীদের কাছে ক্রমাগত ঘাত-প্রতিঘাত পেয়ে অশিক্ষিত মাদার বিশ্বাস নিজের অজ্ঞাতসারে এসে জুট্‌ল বিপ্লবীদের দলে।

মনোজ বাবুর প্রতিটি গল্পে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুদৃঢ় আশাবাদের পরিচয় আছে। যে সব দুঃখদুর্দশার চিত্র তিনি এঁকেছেন, সেগুলো সাময়িক 'দুঃখ নিশা' মাত্র। 'দুঃখ নিশার শেষে' আবার নতুন সূর্য উঠ্‌বে—সংগ্রামরত জাগ্রত জন-শক্তি মুক্তিলাভ করবে—এই হল প্রগতিবাদী মনোজ বসুর সুদৃঢ় বিশ্বাস।

সামান্য দু'একটি ত্রুটি সত্ত্বেও মনোজবাবুর চিত্তাকর্ষক রচনা-কৌশলে, সমুজ্জ্বল, সুদৃঢ় আশাবাদে রঞ্জিত "দুঃখ নিশার শেষে" পাঠকপাঠিকাদের তৃপ্তি দিতে পারবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

গোপাল ভৌমিক

Printed and published by K. C. Banerjee at the Modern Art Press, 1/2, Durga Pituri Lane, Calcutta. Edited by Humayun Kabir. Office: 123, Lower Circular Road.

চতুরঙ্গ

[সপ্তম বর্ষ প্রথম সংখ্যা আশ্বিন ১৩৫১]

মার্ক্সবাদ ও ভবিষ্যৎ

হুমায়ুন কবির

বর্ত্তমান দুনিয়ায় যে সমস্ত চিন্তাধারার প্রচলন, তার মধ্যে মার্ক্সবাদের গুরুত্ব যে খুবই বেশী, সেবিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বঞ্চিত ও নির্য্যাতীতের কাছে মার্ক্সবাদ নতুন ভরসার বাণী এনেছে। বিত্তশালী ও সম্পদবান যে পরিমাণে মার্ক্সবাদের বিরোধিতা করেছে, দরিদ্র ও সর্ব্বহারা ঠিক সেই পরিমাণেই মার্ক্সবাদকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছে। রুষদেশে মার্ক্সবাদের ভিত্তিতে যে শ্রমিক বিপ্লব, তাতে ব্যক্তি ও সমাজের আমূল রূপান্তরের পরিচয় মেলে। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সে রূপান্তর আবদ্ধ থাকেনি, বরং রাষ্ট্রিক, সামাজিক এমনকি আধ্যাত্মিক সম্বন্ধেরও আমূল পরিবর্ত্তন সে বিপ্লবের লক্ষ্য। ইয়োরোপের সাম্প্রতিক মহাযুদ্ধে মার্ক্সবাদের বিশ্বাস ও কর্ম্ম-পদ্ধতির যে অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেল, তার ফলেও মার্ক্সবাদের প্রভাব আজ পূর্ব্বের চেয়ে আরো বেশী শক্তিশালী। মার্ক্সবাদের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে মার্ক্সবাদের বিরোধিতাও বেড়ে চলেছে, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই সমর্থন ও বিরোধিতা দুই-ই অন্ধ। একথা পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশ সম্বন্ধেই খাটে। প্রায় প্রত্যেক দেশেই সমর্থন অথবা বিরোধিতার পূর্ব্বসিদ্ধান্ত করে মার্ক্সবাদের আলোচনা সুরু হয়। সমর্থক বা বিরোধীর নিজের পছন্দ মত যুক্তি বা সাক্ষ্যও সহজেই মেলে। বহু মানুষের জীবনকে নানাদিক থেকে প্রবল ভাবে আলোড়িত ও পরিবর্ত্তিত করবার সাধনার যে বিভিন্ন দিক থাকবে, একথা

বলা বাহুল্য। নানাদিকে সাফল্যের পরিমাণও ভিন্ন হতে বাধ্য। তাই এই বহু ব্যাপ্ত ও বিক্ষিপ্ত ফল ও লক্ষণের মধ্যে নিজের প্রয়োজন মত যুক্তি খুঁজে পাওয়া মোটেই কঠিন নয়। ফল দাঁড়ায় এই যে পূর্ব্বসিদ্ধান্ত আরো প্রবল হয়ে উঠে, এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদের আলোচনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে বা বাঙলাদেশে এ নিরপেক্ষতার দৃষ্টান্ত আরো কম। পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের মনে আজো মার্ক্সবাদের বিভীষিকা অপণ্ডিতসুলভ কুসংস্কার ও গোঁড়ামির সৃষ্টি করে। অন্যপক্ষে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী নতুন বিশ্বাসের আবেগ ও উত্তেজনায় অন্ধ অনুসারী ও অনুকারকে পরিণত হয়। অথচ ভারতবর্ষের মতন পরাধীন ও নিপীড়িত দেশে মার্ক্সবাদের সম্যক জ্ঞান আরো প্রয়োজন। মার্ক্সবাদকে জানতে এবং বুঝতে হলে তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকা চাই, কিন্তু সে শ্রদ্ধা যেন তার প্রত্যেকটী সিদ্ধান্ত বা বক্তব্যকে ধ্রুবসত্য মনে করবার মতন মোহে পরিণত না হয়। মার্ক্সবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অথচ অন্ধমার্ক্সবাদ বিরোধী হিসাবে তাই এই ধারাবাহিক আলোচনার সুরু।

গোড়াতে মার্ক্সবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে জানা প্রয়োজন। সেজন্য সমালোচনা বা বিচারের প্রশ্ন প্রথমে না তুলে মার্ক্সবাদের প্রধান সূত্রগুলি উপস্থিত পাঠকের সামনে ধরা যাক। মার্ক্সবাদের সম্বন্ধে ধারণা খানিকটা স্পষ্ট হলে তখনই সমালোচনার প্রশ্ন উঠবে। তাই এ আলোচনার প্রথম অংশ দেখে ভয় পাবার বা উল্লসিত হবার কারণ নেই। মার্ক্সপন্থী বা মার্ক্সবিরোধী যেন মনে না করেন যে মার্ক্সবাদের প্রতিপাদ্যকে উপস্থিত করার অর্থই তাকে গ্রহণ করা।

১

অল্পদিন আগে পর্য্যন্ত দার্শনিক মহলে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল এই যে মতবাদ হিসাবে মার্ক্সবাদের মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নাই। এ বিশ্বাসের স্বপক্ষে বলা হত যে মার্ক্সবাদের প্রধান লক্ষ্য সামাজিক বিপ্লব। তাই সেই বিপ্লবের কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করেই মার্ক্স তৃপ্ত, দার্শনিক তত্ত্ব বিচারের সময় বা মনোবৃত্তি তাঁর ছিল না। মার্ক্সপন্থীরা কিন্তু একথা কখনো মানে নাই, বলেছে যে দার্শনিক মার্ক্সের সিদ্ধান্তের উপরই তাঁর কর্ম্মপন্থার ভিত্তি। তাই মার্কসীয় কর্ম্মপন্থাকে গ্রহণ করতে চাইলে মার্ক্সের দার্শনিক মতবাদকেও গ্রহণ করতে হবে। তারা আরো বলেছে যে মার্ক্স দর্শনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর যে সমন্বয় সাধন করেছেন, মার্ক্সবাদের বাইরে কোথাও তার তুলনা মেলে না। প্রায় একহাজার বৎসর ধরে ইয়োরোপে বিজ্ঞানবাদী দর্শনের যে বিকাশ, তারই চরম পরিণতি

হেগেল। হেগেলের সিদ্ধান্ত মার্ক্সের দার্শনিক বিচারের প্রারম্ভ, এবং হেগেলীয় মতবাদের যে সমালোচনা ফয়েরবাখ করেছিলেন, তারই প্রভাবে হেগেলীয় বিজ্ঞানবাদ অতিক্রম করে মার্ক্স দ্বন্দ্বমূলক বস্তুতন্ত্রবাদ আবিষ্কার করেন। কাজেই দর্শনের ক্ষেত্রে মার্ক্সকে অনভিজ্ঞ বা অপণ্ডিত মনে করা চলে না—পূর্ব্বের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে তাঁর নিগূঢ় পরিচয় ছিল। সামাজিক সম্বন্ধ বিচারে মতবাদ কিভাবে গড়ে উঠে, সেবিষয়ে মার্ক্সবাদ সমালোচনার নতুন ভঙ্গী এনে দিয়েছে। যুক্তির দিক থেকেও মার্ক্স-এর বিচারে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সমাবেশ আমাদিগকে বিস্মিত করে।

বিষয় এবং বিষয়ীর সম্বন্ধ বিচার দর্শনের চিরন্তন সমস্যা। সে সমস্যা মার্ক্সের আলোচনায় নতুন রূপ পেয়েছে, এবং এ রূপান্তরই মার্ক্সের দার্শনিক প্রতিভার প্রধান সাক্ষ্য। প্রাক-কান্টিয় ইয়োরোপিয় দর্শনে বহির্জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। বার্কলে এবং হিউমের দার্শনিক চিন্তায় বিজ্ঞানবাদের যে প্রাধান্য, তার পরিণতিতে বহির্জগত মনোজগতে পরিণত হয়। মার্ক্স বিজ্ঞানবাদী এ চিন্তাধারাকে অস্বীকার করে বহির্জগতের বাস্তব সত্তা ঘোষণা করেন। বিষয়ী-নিরপেক্ষ বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার তাই মার্ক্সবাদের প্রথম সূত্র। বার্কলীয় বিজ্ঞান-বাদের পরিণতিতে বিষয় ও বিষয়ীর বিচ্ছেদ অনিবার্য্য বলে হেগেল বিজ্ঞানবাদের রূপ বদলে দেন। বিষয় ও বিষয়ীর অবিচ্ছেদ্য ঐক্য এবং সেই ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ঐকান্তিক বিজ্ঞানবাদ বা ব্রহ্মবাদ হেগেলীয় দর্শনের ভিত্তি। মার্ক্স হেগেলীয় বিজ্ঞানবাদকে মানেন নি, বলেছেন যে বিষয় ও বিষয়ীর ঐক্যকে বিজ্ঞান-বাদের দৃষ্টিতে দেখায় হেগেলের বিপ্লবী আবিষ্কারও ব্যর্থ হয়ে গেল। তাই মার্ক্স জড়বাদী, কিন্তু ফরাসী বুদ্ধিবাদীদের দৃষ্টিতে জড়বাদের যে যান্ত্রিক ও সীমাবদ্ধ রূপ, মার্ক্স তাকেও স্বীকার করতে পারেন নি।

মার্ক্স তাই বিষয় ও বিষয়ীর সম্বন্ধ বিচারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এলেন। তাঁর মতে বিষয় পরিবর্ত্তনশীল ও সাংখ্যিক। সৃষ্টির ইতিহাস ধারাবাহিক, তাই পরিবর্ত্তনবিমুখ প্রকৃতির পরিচয় কোথাও মেলে না। সমস্ত পরিবর্ত্তনই নিয়মানুগ, কিন্তু সে নিয়ম দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক। যান্ত্রিক জড়বাদের দৃষ্টিতে বিষয় নির্গুণ, তাই বিষয়ের কোন পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর নাই। মার্ক্স যান্ত্রিক জড়বাদকে অস্বীকার করে বল্লেন যে বিষয় বাস্তব। মার্ক্সের মতে বিষয় আর এক অর্থেও ঐতিহাসিক। মানুষ প্রকৃতিকে যতখানি স্ববশে আনতে পেরেছে, বিষয়ও ততখানিই আমাদের কাছে প্রকাশিত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়

সম্বন্ধেও একথা খাটে। সামাজিক পরিণতি ও শিল্প বাণিজ্যের বিকাশের সঙ্গে নতুন নতুন বিষয় আমাদের অভিজ্ঞতার গোচর। বিষয়কে ঐতিহাসিক মনে করার প্রধান কারণও তাই ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক জীব হিসাবেই বিষয়ীর অস্তিত্ব এবং বিষয়ীর অভিজ্ঞতার বস্তু হিসাবেই বিষয় আত্মপ্রকাশ করে। ফয়েরবাখের সমালোচনায় মার্ক্স তাই বলেছেন যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতও চিরন্তন নয়—বহু পুরুষের অভিজ্ঞতা ও সাধনায় বর্ত্তমান জগতের রূপ, এবং আধুনিক মানুষের অভিজ্ঞতা ও সাধনার ফলে উত্তর-পুরুষের কাছে তার রূপান্তর হতে বাধ্য। এ কথার অর্থ অবশ্য এ নয় যে বিষয় কেবলমাত্র অভিজ্ঞতানির্ভর। বহির্জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মার্ক্স কোনদিনই অস্বীকার করেন নাই, তাই বিষয় যে কেবলমাত্র বিষয়ীনির্ভর, এ কথাও তিনি কোনদিন মানেন নাই। তার বক্তব্য এই যে বহির্জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেও বিষয়ের ঐতিহাসিক সত্ত্বা মানতে হবে।

বিষয়ী সম্বন্ধেও মার্ক্স প্রচলিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত মানতে পারেন নি। বার্কলে হিউম প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদীদের পরিকল্পনায় বিষয়ীর যে স্বরূপ, তার বাস্তবতা অত্যন্ত ক্ষীণ। কেবলমাত্র বুদ্ধিবিলাস ভিন্ন অন্য কোন ক্রিয়া বা কর্ম্ম সে বিষয়ীর প্রতি আরোপ করা চলে না। মার্ক্স-এর মতে বিজ্ঞানবাদীর এ বিষয়ী বাস্তব বিষয়ীর অসম্পূর্ণ ছায়া মাত্র। মার্ক্স সম্পূর্ণ পুরুষ হিসাবেই বিষয়ীকে দেখেছেন। তাঁর মতে ধনতান্ত্রিক সমাজে যে শ্রমবিভাগ, তার ফলে বুদ্ধি স্বাভাবিক উৎপাদনের ক্ষেত্র হতে দূরে সরে গিয়ে কেবলমাত্র চিন্তা-যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। সাংসারিক ও পারমার্থিক কল্যাণও তার ফলে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র মনে হয়। ফলে বুদ্ধিও স্বতন্ত্র ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানবাদীদের পরিকল্পনায় বিষয়ীর যে পরিচয় মেলে, জীবনের পূর্ণ প্রকাশের ধারাচ্যুত বুদ্ধির অপচ্ছায়া হিসাবেই তার প্রকাশ। বিজ্ঞানবাদীদের পরিকল্পনায় আরো ভুল রয়েছে। তারা বিষয়ীকে কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ ভাবে নাই, বিষয়ীর সামাজিক রূপও তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়ী বস্তুনির্ভর ও সমাজনির্ভর। সমাজে যে বহু মানবের বাস, তাদের বাদ দিয়ে মানুষ 'আমি'র চিন্তা করতে পারে না। ব্যক্তি সামাজিক জীব, তাই তার সমস্ত ক্রিয়া ও কর্ম্মই সামাজিক জীবনের প্রকাশ। মার্ক্স-এর ভাষায় প্রত্যেক মানুষ স্বতন্ত্র, এবং স্বতন্ত্র বলেই তাকে আমরা ব্যক্তি বলি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তিই সামাজিক জীব, সমাজের সচেতন আত্মপ্রকাশ হিসাবেই তার ব্যক্তিত্ব। একই সঙ্গে ব্যক্তি জীবনের মানবিক প্রকাশ এবং সামাজিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সমষ্টি।

ব্যক্তিকে তাই কেবলমাত্র সামাজিক জীব বলা চলে না—সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনে বিষয়ীর প্রকাশ বলে বিষয়ীও ঐতিহাসিক। সমাজের ঐতিহাসিক ধারার ফলে বিভিন্ন যুগে মানুষের চিন্তাধারায়ও পার্থক্য দেখা দেয়। তাই দেশকালহীন মানুষের বিচারে বৈজ্ঞানিক সত্য মেলে না। ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিণতিতে মানুষের স্বভাবের যে বিকাশ, সেই ঐতিহাসিক তত্ত্বই প্রকৃত সমাজবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব। বিষয়ীকে তাই সক্রিয় ও কর্ম্মী হিসাবেই বোঝা যায়, নিষ্ক্রিয় কর্ম্মহীন বিষয়ীর পরিকল্পনা কেবলমাত্র কল্পনাবিলাস। জীবনের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই বিষয়ীর কর্ম্মধারা। তার অস্তিত্ব রক্ষাকে কেন্দ্র করেই বিষয়ীর সক্রিয়তা। মার্ক্সের মতে চিন্তাজগত ও বাস্তবজগতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি শ্রমবিভাগেরই অন্যতম ফল। সমাজে মানসিক ও শারীরিক শ্রমের মধ্যে যে পার্থক্য, তারই পরিণতিতে বিষয়ী ক্রমে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন জীবনের প্রয়োজনীয় কর্ম্মধারাকে স্বীকারের বদলে বুদ্ধি নিজের স্বতন্ত্র জগত সৃষ্টির প্রয়াস পায়, এবং ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শন, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি অব্যবহারিক তত্ত্বের মধ্যে নিজেকে ভুলে যায়। সমাজের পূর্ণ জীবনপ্রবাহের সঙ্গে বুদ্ধিজীবির সংযোগ যখন ক্ষীণ হয়ে আসে, তখন বুদ্ধিজীবি নিজের চিন্তাধারার মধ্যেও বিভাগের সৃষ্টি করে, এবং সমাজনির্ব্বাসিত নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ ব্যক্তিসত্ত্বাকে বিষয়ীর মর্য্যাদা দেয়।

বিষয়ী ও বিষয়ের সম্বন্ধ বিচারে মার্ক্সবাদ দর্শনের নতুন দিক খুলে দিতে চেয়েছে। বহির্জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, জ্ঞানের সম্ভাবনা এবং সত্যের লক্ষণ—এই তিনটী প্রশ্নের বিচারেই দর্শন। তিনটী প্রশ্নের বিচারেই বিষয়ী ও বিষয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় প্রয়োজন। সে সম্বন্ধের যে স্বরূপ আমরা গ্রহণ করি, সেই অনুসারেই প্রশ্ন তিনটীরও উত্তর মিলবে।

মার্ক্স বলেছেন, বুদ্ধিবিলাসী দার্শনিকের চোখে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ প্রথম থেকেই বিকৃতভাবে ধরা দিয়াছে। কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারিক সম্বন্ধের বদলে তাঁরা এ সম্পর্ককে কেবলমাত্র বুদ্ধিগত সম্বন্ধ মনে করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মানুষ কিন্তু বহির্জগতের সঙ্গে জ্ঞানগত সম্বন্ধ স্থাপন করে জীবনযাত্রা সুরু করে না—অন্যান্য জন্তুর মতন মানুষেরও জীবনের গোড়ায় ভোজন, নিদ্রা প্রভৃতি ক্রিয়া। কেবল জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপন তাই মানুষের উদ্দেশ্য নয়, প্রথম থেকেই কর্ম্মের দ্বারা বহির্জগতকে আয়ত্ত করে নিজের অভাব পূরণই মানুষের লক্ষ্য।

ইতিহাস এবং ন্যায়—উভয় বিচারেই মার্ক্স কর্ম্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন

এ কথার অর্থ অবশ্য এ নয় যে মার্ক্স জ্ঞানের সমাদর করেন নাই। এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে বুদ্ধির বিচারে বাস্তবের অন্তর্নিহিত ও গভীর সম্বন্ধগুলি যখন প্রকাশিত হয়, তখনই তত্ত্ব পূর্ণতা লাভ করে। মার্ক্সের ভাষায় চেতনার অর্থ সচেতন জীব—মানুষের সত্তার অর্থ তার জীবনের সত্য। তাই কর্ম্মের ভিত্তিতেই মানুষের ঐতিহাসিক ও সামাজিক চেতনা গড়ে উঠে।

মার্ক্সের এ মতবাদ প্রচলিত দর্শনের একেবারে বিরোধী। অভিজ্ঞতায় যে সংবেদনা আমি পাই, আমার পক্ষে তাকে অতিক্রম অসম্ভব। সেই সংবেদনাই যদি জ্ঞানপ্রক্রিয়ার ভিত্তি হয়, তবে তাকে বর্জ্জন করারও কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যে সংবেদনাকে সাধারণতঃ জ্ঞানপ্রক্রিয়ার ভিত্তি বা প্রারম্ভ মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তা নিজেই বহু প্রক্রিয়ার ফল। সংবেদনা কখনো জ্ঞানপ্রক্রিয়ার ভিত্তি হতে পারে না, কারণ ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ফলেই সংবেদনা অভিজ্ঞতার বিষয় বলে ধরা দেয়। সৃষ্টির আদিমানব আদমের কথা হয়তো স্বতন্ত্র, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে অবিমিশ্র সংবেদনার সম্ভাবনা দুরূহ। সংবেদনার সঙ্গে সঙ্গেই নানাবিধ প্রত্যয় আমাদের জ্ঞানপ্রক্রিয়ায় কার্য্যকরী। প্রত্যেকটী প্রত্যয় ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ফল। বিষয়ী সর্ব্বত্রই সামাজিক ব্যক্তি, তাই "আমি" তখনই বলা চলে যখন আমরা "আমরা"র কথা ভাবতে পারি। প্রত্যেকটী সংবেদনা ও প্রত্যয়ের পিছনে তাই সমাজের ইতিহাসের বিবর্ত্তনের স্মৃতি। সংবেদনাকে অভিজ্ঞতা হতে স্বতন্ত্র করে দেখবার চেষ্টাতেই বিজ্ঞানবাদের জন্ম, কিন্তু এ স্বতন্ত্রীকরণের পদ্ধতিতেই গলদ রয়েছে। চিন্তা ও ব্যবহারের অপ্রাকৃত বিভেদই এ স্বতন্ত্রীকরণের মূল।

মার্ক্সের মতে বহির্জগত ও সমাজজীবি বিষয়ী পরস্পর-নির্ভর, এবং সে নির্ভরতার ফলে দুই-ই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। মার্ক্স তাই বলেন যে বহির্জগতকে পরিবর্ত্তিত করার সম্ভাবনার সঙ্গে জ্ঞানের সম্ভাবনাও নিহিত। কর্ম্ম এবং জ্ঞানের তাই মার্ক্সবাদে এত গুরুত্ব। বিষয়কে আয়ত্ত করার যে প্রক্রিয়া, তার সমস্যাই বিষয়ী ও বিষয়ের সম্বন্ধের সমস্যা। জ্ঞান এবং কর্ম্ম উভয়ই ক্রিয়া। যে বিষয়কে ব্যবহারিক আয়ত্তে আনা যায়, তার সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান সহজেই আসে। ব্যবহারিক জ্ঞানের বিকাশেই বিজ্ঞান, কিন্তু বিজ্ঞানের পরীক্ষা ও সার্থকতা ব্যবহারে। অভিজ্ঞতার নিম্নস্তরে ব্যবহারেরই প্রাধান্য। ব্যবহারের প্রয়োজনেই তথ্য ও বিজ্ঞানের সূত্রের আবিষ্কার। কর্ম্ম ও জ্ঞানের নিবিড় যোগের কথা মনে রাখলে কান্টিয় দর্শনের অজ্ঞেয় স্বয়ম্পূর্ণ বস্তুর অসারত্ব

বোঝা যায়। হেগেল বুঝেছিলেন যে সমস্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুত বস্তুর কল্পনা স্ববিরোধী—তাই কাণ্টিয় স্বয়ম্পূর্ণ বস্তুকে তিনি অসার কল্পনা বলে বর্জ্জন করেছিলেন।

জ্ঞানের বিষয়বস্তুর সমস্যা চিরদিনই দার্শনিককে বিভ্রান্ত করেছে। সেই সমস্যার সমাধানের চেষ্টায়ই কাণ্টের স্বয়ম্পূর্ণ বস্তুর পরিকল্পনা। সে চেষ্টাও যে ব্যর্থ হয়েছে হেগেলের সমালোচনায় একথা পরিষ্কার। মার্ক্স সমস্যাকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অন্য ভাবে দেখেছেন। তাঁর মতে জ্ঞানের বিষয়বস্তুর সমস্যা কেবলমাত্র বুদ্ধির সমস্যা নয়—তা ব্যবহার ও কর্ম্মপদ্ধতিরও সমস্যা। মানুষের জ্ঞান যথার্থ কিনা, বাস্তব প্রয়োগেই তার পরীক্ষা। অব্যবহারিক চিন্তার সত্যা-সত্যের প্রশ্নকে বুদ্ধিবিলাস ভিন্ন অন্য কিছু মনে করা চলে না। তাই ব্যবহারে মানুষ প্রকৃতিকে যে ভাবে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করে, চিন্তায় তারই বৃহত্তর প্রতিচ্ছায়া দেখি। ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটী অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র, চিন্তায় বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে একসঙ্গে গেঁথে তার সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করি। নতুন অভিজ্ঞতায় সে সূত্রের প্রয়োগ করেই আমরা তার যাথার্থ্য বা সত্যের বিচার করি। তাই একদিকে যেমন প্রয়োগেই সত্যের বিচার, অন্যদিকে সাধারণ সূত্রের আবিষ্কারেই ব্যবহারিক প্রয়োগের সম্প্রসারণ সম্ভব।

কর্ম্ম ও জ্ঞানের এ সংযোগে মার্ক্স জড়বাদের নতুন উৎকর্ষ সাধন করেন। মার্ক্সের পূর্ব্বে জড়বাদের ত্রুটী বহু। প্রাকমার্কসীয় জড়বাদ যান্ত্রিক, কেবলমাত্র সংখ্যার পার্থক্য নিয়ে তার কারবার। জড়বাদে বস্তু তাই নির্গুণ। প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশ ও ভঙ্গীর কোন বিবরণ সেখানে মেলে না। ফলে সে জড়বাদে ইতিহাস বা বিবর্ত্তনের স্থান নাই। বিজ্ঞানের বিশেষ সূত্র বা নীতির বিশ্লেষণের সেখানে একান্ত অভাব। জড়বাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ববাদের সমন্বয়ে তিনি যে দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদের সূত্রের সন্ধান পান, তার সাহায্যে মার্ক্স এ সমস্ত ত্রুটীই দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন। দ্বন্দ্ববাদেরও তাতে রূপান্তর ঘটে। হেগেলীয় দর্শনে যে দ্বন্দ্ববাদ কেবলমাত্র প্রত্যয়ের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে সমাপ্ত, মার্ক্সের দর্শনে প্রত্যয়ের সে দ্বন্দ্ববাদ সামাজিক ইতিহাসের দ্বন্দ্ববাদে পরিণত হয়েছে।

তাঁর প্রখ্যাত ডাস কাপিটাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় মার্ক্স হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে তাঁর নিজের দর্শনের সম্বন্ধ বিচার করেছেন। দ্বন্দ্ববাদের বিশদ ব্যাখ্যাও সেখানে মেলে। মার্ক্সের মতে হেগেলীয় দর্শনে চিন্তাধারাই বাস্তবের স্রষ্টা, এবং বাস্তব তাই প্রত্যয়ের বহির্প্রকাশ মাত্র। মার্ক্সের মতে প্রত্যয়ই বাস্তবের

প্রতিচ্ছবি—মানুষের মস্তিষ্কে বাস্তবের যে রূপান্তর ও প্রতিক্রিয়া তারই নাম জ্ঞান।

মার্ক্স দাবী করেছেন যে হেগেলীয় দর্শন যে সত্যকে ভুল বুঝেছে, সেই সত্যেরই যথার্থ প্রকাশ মার্ক্সীয় দর্শন। মার্ক্সের মতে বস্তু বা পদার্থই প্রধান—সেই বস্তুর বিশেষ সংগঠনে যে নতুন গুণ বা লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করে, তারই নাম চেতনা। চেতনায় তাই বস্তুই প্রকাশিত, এবং সেজন্য বাস্তবের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। চেতনায় বাস্তবের যে প্রকাশ, সে প্রকাশকে নিষ্ক্রিয় বলা চলে না। জ্ঞান সর্ব্বদাই সক্রিয় ও সার্থক। যে সমস্ত অভিজ্ঞতানির্ভর দার্শনিক বাস্তবের বিবরণ দিতে বলেন যে, নিশ্চেষ্ট চেতনায় বহির্জগতের ক্রিয়ার ফলে সংবেদনার উদ্ভব, বার্কলে হিউমের দর্শনের ব্যর্থতা তাঁদের উপহাস করে। তাই মানুষের অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণে জ্ঞানের বিষয়বস্তুরও সম্প্রসারণ ঘটে, অন্যপক্ষে জ্ঞানের সম্প্রসারণে অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুর প্রকৃতিও রূপান্তরিত হয়। এই পদ্ধতির ক্রমবিকাশে জ্ঞান ও বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য কমে আসে, কিন্তু কোনদিনই সে পদ্ধতির শেষ নাই, পার্থক্যও কোনদিনই সম্পূর্ণ মেটে না। ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের অর্থও এইখানে। মানুষের চিন্তায় প্রতিফলিত বস্তুই জ্ঞানের বিষয়। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের বিজ্ঞানবাদী রূপ এই সত্যেরই অসম্পূর্ণ প্রকাশ—দ্বন্দ্ববাদের সঙ্গে জড়বাদের সমন্বয়ই মানুষের দর্শনের প্রকৃত সূত্র।

দ্বন্দ্ববাদ ও জড়বাদের সমন্বয়ের একটী দিক মার্ক্সের উল্লিখিত রচনায় স্পষ্ট—তার অন্য দিকের পরিচয়ও মার্ক্স-এঙ্গেলসের রচনায় মেলে। যান্ত্রিক জড়বাদ যে বাস্তবকে প্রকাশ করতে পারে না—এই ধারণার ফলেই এঙ্গেলস বলেন যে জড়বাদকে দ্বন্দ্বমূলক রূপ দিতে হবে। দর্শনে দুইটী প্রধান দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। একটীর প্রত্যয় শাশ্বত ও পরিবর্ত্তনহীন—অন্যটীর প্রত্যয় পরিবর্ত্তনশীল ও পরিবর্দ্ধমান। দ্বন্দ্ববাদকে সংক্ষেপে বিরুদ্ধধর্ম্মীর ঐক্য বলা চলে। বাস্তবের সমস্ত রূপই নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। তাই সে রূপের উৎপত্তি, বিবর্ত্তন ও বিকলনের ইতিহাসই তার সত্ত্বাকে প্রকাশ করে। বাস্তবের তাই কোন চরম রূপ বা সীমা নাই। সংখ্যা বা পরিমাণের পরিবর্ত্তনে গুণেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। তাই সাংখ্যিক ধারাবাহিকতা সত্ত্বেও গুণগত নব আবির্ভাবের ফলে বিবর্ত্তনের ইতিহাসও সহজ বা সরল নয়। ফলে এক নিজেকে বহুতে বিভক্ত করে, এবং অংশসমূহের অন্তর্বিরোধে বিরুদ্ধ ও সমধর্ম্মীর দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় ঘটে। দ্বন্দ্ববাদ প্রকৃতি বা বস্তুর এই অনন্ত বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করে বলেই দ্বন্দ্ববাদ দর্শনের প্রকৃত রূপ।

বিবর্ত্তনের পরিকল্পনা বিজ্ঞানবাদেও মেলে, কিন্তু একমাত্র দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদই বিবর্ত্তনের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ করতে পারে। বিজ্ঞানবাদীর বিবর্ত্তনের মূলকথা ধারাবাহিকতা ও অবিচ্ছিন্নতা। প্রকৃতিতে যে আকস্মিক বিপর্য্যয় ও আবির্ভাবের স্থান আছে, বিবর্ত্তনবাদী সেকথা প্রকারান্তরে অস্বীকার করতে চায়। বিবর্ত্তনবাদ যে বিজ্ঞানবাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, একথা মানতেই হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিবর্ত্তনবাদ বিজ্ঞানবাদের মোহ সম্পূর্ণ কাটাতে পারে না বলে বিবর্ত্তনবাদের মধ্যে দুর্ব্বলতার পরিচয় মেলে। হেগেলীয় দর্শনে ঐতিহাসিকতা ও বিবর্ত্তনের গুরুত্ব সত্ত্বেও তিনি কোনদিন প্রুশিয় রাষ্ট্রস্বরূপকে অতিক্রম করতে পারেন নি। সমস্ত ঐতিহাসিক প্রগতি এসে প্রুশিয় রাষ্ট্রকল্পনায় পর্য্যবসিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে বিপ্লবী চিন্তাধারা ও কায়েমী কাঠামোর মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, তারই ফলে দ্বন্দ্ববাদের পরিকল্পনা সত্ত্বেও হেগেলীয় দর্শন নিস্ফলা হয়ে রইল। মার্ক্সের দাবী যে তিনি হেগেলীয় দর্শনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিরোধ দূর করেছিলেন। বিষয়ের প্রকৃতি ও স্বরূপ ঐতিহাসিক, বিষয়ীরও তাই, এবং বিষয়ী ও বিষয় দুই-ই দ্বন্দ্বমূলক বিবর্ত্তনের মধ্যে পরিণতি লাভ করে। বিষয়ী ও বিষয় পরস্পর-সম্বদ্ধ কিন্তু তাই বলে তাদের ঐক্য একাত্ম নয়। তাদের পরস্পরের ঐক্য ও বিরোধের ফলেই ইতিহাসের গতি। বাস্তবের পরিণতিতে সমাজের আবির্ভাব, তাই সমাজও বাস্তব, কিন্তু তাই বলে সমাজকে কেবলমাত্র জড়বস্তু বা জীবপ্রক্রিয়া মনে করলে ভুল হবে। বাস্তবের সঙ্গে প্রকৃতির সক্রিয় সম্বন্ধের ফলেই সমাজের উদ্ভব—সে সম্বন্ধের মধ্যে জ্ঞান ও কর্ম্ম দুইয়েরই স্থান আছে। সমাজের সংগঠনেও ঐক্য রয়েছে, কিন্তু বিরোধী সম্বন্ধের পরিচয়ও সমাজে মেলে। সমাজের সংগঠন ও উপাদানের মধ্যে যে বিরোধ, উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনী সম্বন্ধের যে দ্বন্দ্ব, তাই শ্রেণীবিরোধে আত্মপ্রকাশ করে। এই শ্রেণীবিরোধ সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের মূলশক্তি। এমনি ভাবে প্রকৃতি, সমাজ ও জ্ঞানের পরস্পরের সম্বন্ধ ও পরিণতির সূত্র প্রকাশ করে বলে জড়বাদী দ্বন্দ্ববাদ মার্ক্সবাদের ভিত্তি।

বিষয় ও বিষয়ীর নতুন পরিকল্পনা মার্ক্সবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এক কথায় বলতে গেলে বলা চলে যে প্রাকমার্ক্সীয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিক—মার্ক্সই প্রথম জ্ঞানের সামাজিক ভিত্তি ও স্বরূপকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছেন। জ্ঞানের সামাজিক স্বরূপ উপলব্ধি করার ফলে জ্ঞানের ধারাবাহিকতা ও পরিণতির পরিকল্পনাও স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। উৎপাদনী শক্তির যতখানি বিকাশ যে

সমাজে দেখা যায়, সে সমাজে জ্ঞানের বিকাশও ততখানিই সম্ভব। তাই উৎপাদনীশক্তির উৎকর্ষের সঙ্গে জ্ঞানের প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তন ও উৎকর্ষও অবশ্যম্ভাবী। যখন সমাজে যে শ্রেণীর হাতে উৎপাদনী শক্তির কর্তৃত্ব, সেই শ্রেণীর শ্রেণীচেতনাই আমাদের জ্ঞানের বিষয় ও সীমা নির্দ্ধারণ করে। যে শ্রেণীর হাতে কর্তৃত্ব থাকে, তারা প্রচলিত উৎপাদনের ধারা ও জ্ঞানপ্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করে। উৎপাদনশক্তির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃত্ব নতুন শ্রেণীর হাতে চলে আসে। আধুনিক সমাজে ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, দর্শনের ক্ষেত্রেও তা আত্মপ্রকাশ করেছে। ধনিকের শ্রেণীচেতনা প্রচলিত উৎপাদনের ধারা, সমাজব্যবস্থা ও জ্ঞানপ্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে চায় বলে তার দর্শনের প্রত্যয় অনাদি ও পরিবর্ত্তনহীন। ইতিহাসেও ধনিক শ্রেণীচেতনা তাই বিপর্য্যয় বা আকস্মিক আবির্ভাবকে অস্বীকার করে অবিচ্ছেদ ধারাবাহিকতার স্বপ্ন দেখে, এবং অবশেষে বহির্জগতের জ্ঞানের সম্ভাবনাকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করতে চায়। শ্রমিকের শ্রেণীচেতনা প্রচলিত উৎপাদনের ধারা, সমাজব্যবস্থা ও জ্ঞানপ্রক্রিয়াকে আমূল পরিবর্ত্তন করতে চায় বলে তার দর্শনের প্রত্যয় পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর। ইতিহাসে শ্রমিকের শ্রেণীচেতনা বিপ্লব আনতে চায় বলে তারা বিপর্য্যয় ও নতুন আবির্ভাব খোঁজে এবং যান্ত্রিক বিবর্ত্তনের প্রসার বাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিকে জ্ঞানের বিষয়বস্তু করে তুলতে চায়। একের পরিণতি কাণ্টের অজ্ঞেয়বাদ ও হেগেলীয় দর্শনের ব্রহ্মবাদ, অন্যের পরিণতি দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদ। মার্ক্সবাদী দাবী করে যে মার্ক্সবাদের উৎকর্ষের কারণও এইখানেই মিলবে।

কবিতা

সূর্য্যপ্রতিম

জীবনানন্দ দাশ

আমরণ কেবলি বিপন্ন হয়ে চ'লে
তারপর যে বিপদ আসে
জানি
হৃদয়ঙ্গম করার জিনিষ ;
এর চেয়ে বেশী কিছু নয়।

বালুচরে নদীটির জল ঝরে,
খেলে যায় সূর্য্যের ঝিলিক,
মাছরাঙা, ঝিক্‌মিক্ ক'রে উড়ে যায় ;
মৃত্যু আর করুণার দুটো তরোয়াল আড়াআড়ি
গ'ড়ে ভেঙে নিতে চায় এই সব সাঁকো ঘর বাড়ী ;
নিজেদের নিশিত আকাশ ঘিরে থাকে।

এ রকম হয়েছে অনেক দিন—রৌদ্রে বাতাসে ;
যারা সব দেখেছিল—
যারা ভালোবেসেছিল এই সব—তারা
সময়ের সুবিধায় নিলেমে বিকিয়ে গেছে আজ।
তারা নেই।
এসো আমরা যে যার কাছে—যে যার যুগের কাছে সব
সত্য হয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠি।
নব পৃথিবীকে পেতে সময় চ'লেছে ?

হে অবাচী, হে উদীচী, কোথাও পাখির শব্দ শুনি ;
কোথাও সূর্য্যের ভোর র'য়ে গেছে ব'লে মনে হয় !

মরণকে নয় শুধু—
মরণসিন্ধুর দিকে অগ্রসর হয়ে
যা কিছু দেখার আছে
আমরাও দেখে গেছি ;
ভুলে গেছি, স্মরণে রেখেছি।
পৃথিবীর বালি রক্ত কালিমার কাছে তারপর
আমরা খারিজ হয়ে দোটানার
অন্ধকারে তবুও তো
চক্ষুস্থির রেখে
গণিকাকে দেখায়েছি ফাঁদ ;
প্রেমিককে শেখায়েছি ফাঁকির কৌশল।
শেখাই নি ?

শতাব্দী আবেশে অস্তে চলে যায় ঃ
বিপ্লবী কি স্বর্ণ জমায়।
আকণ্ঠ মরণে ডুবে চিরদিন
প্রেমিক কি উপভোগ ক'রে যায়
স্নিগ্ধ সার্থবাহকের ঋণ।
তবে এই অলক্ষিতে কোন্‌খানে জীবনের আশ্বাস র'য়েছে।

আমরা অপেক্ষাতুর ;
চাঁদের ওঠার আগে কালো সাগরের
মাইলের পরে আরো অন্ধকার ডাইনী মাইলের
পাড়ি দেওয়া পাখিদের মত
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় জোগান দিয়ে
এ অনন্ত প্রতিপদে তবু
চাঁদ ভুলে উড়ে যাওয়া চাই,
উড়ে যেতে চাই।

পিছনের ঢেউগুলো প্রতারণা ক'রে ভেসে গেছে ;
সামনের অভিভূত অন্তহীন সমুদ্রের মতন এসেছে ;
লবণাক্ত পালকের ডানায় কাতর
ঝাপ্‌টার মত ভেঙে বিশ্বাসহন্তার মত কেউ
সমুদ্রের অন্ধকার পথে প'ড়ে আছে।
মৃত্যু আজীবন অগণন হ'ল, তবু
এ রকমই হবে।

'কেবলি ব্যক্তির—ব্যক্তির মৃত্যু শেষ ক'রে দিয়ে আজ
আমরাও মরে গেছি সব'—
দলিলে না ম'রে তবু এ রকম মৃত্যু অনুভব
ক'রে তারা হৃদয়বিহীনভাবে ব্যাপ্ত ইতিহাস
সাঙ্গ ক'রে দিতে চেয়ে যতদূর মানুষের প্রাণ
অতীতে ম্লানায়মান হয়ে গেছে সেই সীমা ঘিরে
জেগে ওঠে উনিশশো তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, অনন্তের
অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।

কম্পাস

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

স্ফুরিত তড়িতে খর অসি-নিষ্কাশ
উত্তাল ঢেউ, বিপুল বিপর্যাস।
জাহাজ যদিও ডুবো,
তারা আছে ঠিক ধ্রুব ;
উত্তর দিকে ঠিক রেখো কম্পাস।

বাজ নেই, নেই বাজপক্ষীর নখ,
সন্ধানী কেউ, কেউ বা সমর্থক।
নেই কুঁড়া নেই খুদ,
নিস্তৃণ, নিরায়ুধ,
ভঙ্গিটি শুধু রেখো তিল, তির্যক।

অরণ্যে রেখো অরণির প্রস্তুতি
রাতের অর্থ আগামী দিনের দ্যুতি।
আজি যা স্তব্ধ গণি
আসলে প্রতিধ্বনি ;
নিথর পাথরে ভিত্তি-প্রতিশ্রুতি।

শুকনো শাখায় কিশলয়-উল্লাস :
শ্বাসহীন বুকে রেখো এক বিশ্বাস।
জাহাজ যদিও ফুটো,
তীর তবু প্রস্ফুট
উত্তরে আছে উত্তরে কম্পাস॥

হেঁয়ালি

লীলাময় রায়

আজকাল ডিটেকটিভ নভেল পড়তে আট বছরের খোকাদেরও দেখা যায়, তাদের মা'দের তো কথাই নেই। গিন্নীরা মনে করেন এতে তাঁদের উপকার হচ্ছে। ছদ্মবেশী চোর ডাকাতদের দেখলেই চিনবেন আর ধরিয়ে দেবেন। চোর ডাকাতেরও লেখাজোখা নেই। কে যে নয় তাই জিজ্ঞাস্য।

কেউ সদর দরজার কড়া নাড়লেই গিন্নীর মনে পড়ে, চোর নয় তো। তিনি মডার্ন মেয়ে, চোরের নামে ভয় পান না, বরং একটু উৎসুক হন। উৎকর্ণ হয়ে কড়া নাড়া শোনেন, তার পর সন্তর্পণে নেমে আসেন। দরজা খুলে দিয়ে প্রত্যাশা করেন রবিন হুড কি দস্যু মোহনকে দেখবেন, কিন্তু প্রতি বারই নিরাশ হন। আর একটু হলেই একটা রোমহর্ষক ব্যাপার ঘটত। ঘটল না কেন? তবে কলকাতা শহরে থেকে সুখ কী?

রাগত ভাবে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে যান। দুপুর বেলাটা তিনি এক রকম একা। শাশুড়ী বুড়ো মানুষ, তাঁকে নীচে নামতে দেওয়া হয় না। তিনি তাঁর ঠাকুরঘরে পড়ে থাকেন। তিনিও এক চোরের ধ্যান করেন। তাঁর নাম হরি। যিনি একে একে সব হরণ করেন। পরিশেষে প্রাণ।

সেদিন গিন্নী আন্‌মনা ছিলেন, কখন যে কড়া নড়ল টের পেলেন না। খুব আস্তে আস্তে কড়ার আওয়াজ উপরে আসছিল। যেন কেউ কড়া নিয়ে খেলা করছে। মিনিট দশেক পরে তিনি কী একটা কাজে নেমে আসছিলেন, কড়া নাড়া শুনে চুপি চুপি পা টিপে টিপে দরজার কাছে গেলেন। একটুখানি ফাঁক করে দেখলেন একটি প্রিয়দর্শন যুবা, বয়স বিশ একুশ, সঙ্কোচের সঙ্গে তাঁকে নমস্কার করছে।

"কাকে চান আপনি?"

"আপনি কি মিসেস খাশনবীশ?"

"আমিই।"

"মল্লিকা দেবী তাঁর ছাতা নিয়ে যাননি। আমাকে পাঠিয়েছেন।"

"ওহ্! আচ্ছা, আপনি ভিতরে এসে বসুন, আমি এনে দিচ্ছি।"

বসবার ঘরে ছোকরাকে বসিয়ে গিন্নী যখন উপরে গেলেন তখন সেটা ছাতার খোঁজে নয়, কারণ ছাতা তো ছিল নীচেই সিঁড়ির সুমুখে যেখানে ছাতা-জুতো ছড়ি ও টুপি রাখার জায়গা। গিন্নী ভালো করে সাজলেন। তাঁর এত দিনের স্বপ্ন সফল হয়েছে। চোর এসেছে।

মল্লিকা তাঁর ননদ, কলেজে পড়ে। কোনো দিন ছাতা নেয়, কোনো দিন নিতে ভুলে যায়। এই ভদ্রবেশী চোর আজ লক্ষ্য করেছে যে মল্লিকার হাতে ছাতা নেই। তাই ছাতাখানি হাতাবার ফন্দী এঁটে এসেছে। আজকাল ওরকম ছাতা দশ টাকার কমে পাওয়া যায় না। যার ছাতা সে আর কিন্‌তে পাবে না, যার নয় তার দশ টাকা লাভ।

সাজতে সাজতে গিন্নীর বুদ্ধি খোলে, তাই সজ্জা। তা ছাড়া লোকটাকে দশ জনের সামনে ধরিয়ে দিতে হবে, তাদের খাতিরেও সাজতে হয়। গিন্নী কিন্তু দেরি করলেন না, কে জানে হয়তো ইতিমধ্যে লোকটা ছাতাসমেত সট্‌কেছে।

"হাঁ, ছাতার জন্যে আপনাকে পাঠিয়েছে মল্লিকা। আপনি কি তার সহপাঠী ?"

"আজ্ঞে।"

"বাস্তবিক আপনার দয়ার শরীর। ক্লাস কামাই করে একখানা ছাতা নিয়ে যেতে আসে ক'জন !"

"দিনটা মেঘলা কিনা। ফেরবার সময় বৃষ্টিতে ভিজলে যদি আপনি বকেন সেইজন্যে তিনি কিছু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।"

"অ ! তাই বলুন !" গিন্নী এতক্ষণে নিশ্চিত বুঝলেন যে এ পাকা চোর বটে। কিন্তু পুলিশ যদি বিশ্বাস না করে। দশজনে যদি বলে, প্রমাণ কী ! তিনি দেখলেন ছাতাটা চোরের হাতে দেওয়ার চেয়ে না দেওয়াটাই সুবুদ্ধি।

"তা ছাতা আপনি নিয়ে যেতে পারেন। ঐ তো ঐখানেই রয়েছে। কিন্তু দিনকাল খারাপ কিনা। তাই আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।"

"কেন ? কেন ?" ছেলেটি রুদ্ধশ্বাসে সুধালো।

"ছাতাটা জাপানী। মল্লিকা আবার তাতে সুভাষ বোসের ছবি ছাপিয়ে রেখেছে। দেখেন নি ?"

"কই, না ? সুভাষ বোসের ছবি ঠিক জানেন ? সুভাষ মুখুজ্যের নয় ? আমরা আবার ফাসীবিরোধী কিনা।"

"সুভাষ বোসের ছবি চিনিনে? আমরা আবার বসুপন্থী কিনা।"

"ভাবিয়ে তুললেন আমাকে। পুলিশে ধরবে তার জন্যে কেয়ার করিনে, কিন্তু আমার দল থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেবে। বলবে পঞ্চম বাহিনীর চর।"

"তা হলেই দেখুন কত বড় ঝুঁকি! জাপানী চরদের তো ধরে ধরে গুলি করাও হচ্ছে শুনি। পুলিশকে একটু ভয়ডর করবেন।"

ছেলেটি সত্যি উঠল। ইতিমধ্যে গিন্নীর নজর গেছে তার পকেটের প্রতি। পকেটগুলো অস্বাভাবিক স্ফীত। কে জানে হয়তো বসে বসে কত কী পকেটে পুরেছে। হয়তো ছাতার চেয়েও মূল্যবান কিছু।

"ও কী! আর একটু বসুন। আমি কিন্তু আপনারই মতো ফাসীবিরোধী। আপনাদের ইশ্‌তাহার পেলেই চুরি করে পড়ি। এবারকার আওয়াজটা কী? গোপন মজুতদারকে জব্দ করো। না আর কিছু? একবার কেমন মজা হয়েছিল শুনবেন? ওঁর চোখ আবার ভালো নয় কিনা। উনি পড়লেন গোপাল মজুমদারকে জব্দ করো।"

"এবার আমরা পাকিস্থানের জন্যে কোমর বেঁধেছি।"

"হাঁ, তিন হাজার বছর পরে আবার এ দেশ পাখীস্থান হতে চল্‌ল। উনি বলছিলেন মহাভারতে নাকি লেখা আছে যে বাঙালীরা পাখী আর বেহারীরা গাধা! আর মাদ্রাজীরা নাকি চেরপাদা, অর্থাৎ সাপ!"

"কই, তা তো কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ে না?"

"ইতিহাস আপনার পুনরাবৃত্তি করে। তিন হাজার বছর পরে পাখীস্থান। সবই প্রগতির খেলা। কিন্তু আমি বলছিলুম কী। আপনার পকেটে যদি কোনো ইশ্‌তাহার থাকে তো আমাকে একটু দেখতে দেবেন?"

"নেই। থাকলে দিতুম।"

"ওগুলো তবে কী? ঐ যে, ঠেলে বেরোচ্ছে।"

ছেলেটি তার ডান দিকের পকেট ঝেড়ে দেখাল। সিগরেট। দেশলাই। বাঁ দিকের পকেটে ছিল মনি ব্যাগ, চশমার খাপ, রুমাল।

গিন্নী হতাশ হলেন। না, চোর নয়। বেচারাকে বিদায় দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, "মল্লিকাকে বুঝিয়ে বলবেন আমার দোষ নেই।"

কিন্তু তার পরেই কী জানি কেন তাঁর সন্দেহ হলো যে কী যেন ছিল, কী যেন নেই। তিনি বসবার ঘরে ঢুকে খানাতল্লাস করে দেখলেন একটা আলবাম উধাও, একটা টাইমপীস নিখোঁজ, একটা হাতীর দাঁতের তাজমহল

নিরুদ্দেশ। আরো কিছু গেছে কিনা চিন্তা করতেই তাঁর মাথা ঘুরল, তিনি সেই ঘরেই শুয়ে পড়লেন। ছেলেটার নামধাম বিন্দুবিসর্গ জানেন না। পুলিশে খবর দিয়ে ফল কী!

মল্লিকা যখন বাড়ী ফিরল তিনি তাকে এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করলেন, "ছাতার জন্যে কাকে পাঠিয়েছিলে, তার নাম ঠিকানা জানতে পারি?"

"কই, আমি তো কাউকে পাঠাইনি? কে এসেছিল?"

"চোর গো চোর। আমার সর্ব্বস্ব চুরি করে নিয়ে গেল তোমার নাম করে। তোমার সহপাঠী বলে পরিচয় দিল। দেখতে সুন্দর। বয়স বিশ একুশ। রেশমের পাঞ্জাবী গায়ে। গলায় সোনার হার। চোখে চশমা। সিগরেট খায়। দাড়ি-গোঁফ কামানো। জুল্‌পি রাখে।"

"চিনেছি, চিনেছি। কিন্তু সে আমার সহপাঠী হতে যাবে কেন? সে তো এই পাড়ারই একটা বকাটে ছোঁড়া। প্রায়ই দেখি। কিন্তু কী তার নাম, কোন রাস্তায় বাড়ী অত খবর রাখিনে।"

"তবে আসুন তোমার দাদা।"

কর্ত্তা এসে সব শুনে বললেন, "ভালো করে খুঁজেছ?"

"ভালো করে খোঁজা কাকে বলে? তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে বিশ্বাস না করো তবে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

তিনি আর এক দফা খানাতল্লাস করলেন। টাইমপীসটা পাওয়া গেল বুক শেল্‌ফের পিছনে। হাতীর দাঁতের তাজমহলটা চেয়ারের তলায়। কিন্তু আলবামটা উদ্ধার হলো না। কর্ত্তা বললেন, "আছে কোথাও। কাল একবার কার্পেট উঠিয়ে দেখতে হবে।"

গিন্নীও অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। দুটো জিনিস যখন মিলল তখন তৃতীয়টাও মিলবে। তা হলে চোর নয়। যাক্, বাঁচা গেল। কিন্তু আফশোষও হলো। ঘটনাটা ঘটি ঘটি করে ঘটল না। অত বড় একটা রহস্য জলের মতো সোজা হয়ে গেল।

দেওর যখন ফিরল হেসে বলল, "বৌদির যা আক্কেল। লোকটা কোনখান দিয়ে চোরাই মাল নিয়ে যেত শুনি? পকেট তো দেখিয়েছে।"

পরের দিন ঠিক ঐ সময়টিতে আবার কড়া নাড়ার শব্দ হলো। গিন্নী যেন জানতেন যে অমন হবে, তাই আগে থেকে সেজে রয়েছিলেন।

যুবকটি ঘটা করে নমস্কার জানিয়ে বলল, "ইশ্‌তাহার পড়তে চেয়েছিলেন।

এনেছি। এর মধ্যে ডিমিট্রভের গোপনীয় নির্দ্দেশ আছে। আপনার পড়া হয়ে গেলেই আমি ফেরৎ নিয়ে যাব। আমি ততক্ষণ বাইরে দাঁড়াই।"

"না, না। বাইরে কেন? আপনি ভিতরেই আসুন।"

আলবামটা সকালবেলাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কোথায় গেল তবে? এই সুদর্শন যুবকটিকে আর সন্দেহ করাও যায় না, সামান্য একটা আলবামের জন্যে এ কখনো অত নীচে নামবে না। রহস্য! কিন্তু রহস্যেও আনন্দ আছে, যদি বেশী লোকসান না হয়। গিন্নীর মেজাজ ভালোই ছিল।

"পড়তে বেশ লাগছে কিন্তু। ইচ্ছা করে সবাইকে একবার করে পড়াতে। তা আপনি ফেরৎ না নিয়ে নড়বেন না।"

"আমি নড়তে চাইনে, আপনি যতক্ষণ ইচ্ছা পড়তে পারেন। কিন্তু দোহাই আপনার, কাউকে এসব পড়তে দেবেন না। দেখছেন না, উপরে লেখা আছে মোস্ট সীক্রেট। এ হলো খাস রাশিয়ায় ছাপা। কলকাতায় মাত্র পাঁচ কপি এসেছে। আমরা এখনো এর নকল তৈরী করবার সময় পাইনি।"

"আচ্ছা, আমি কাউকে পড়তে দেব না। কিন্তু নকল লিখে নিতে পারি?"

"তা পারেন বোধ হয়। কী জানি, আমি ঠিক জানিনে।"

"আমি উপর থেকে দশ মিনিটের মধ্যে আসছি। নকল করব আর আসব। আপনি ততক্ষণ সিগরেট খেতে পারেন। আপনার নিজেরটা না, আমাদেরটা। কেমন, আপত্তি আছে?"

"ব্যক্তিগত ভাবে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, তবে কিনা পার্টির আপত্তি থাকতে পারে। তা আপনি সেজন্যে ভাববেন না, আমার যথেষ্ট প্রভাব আছে।"

গিন্নী যখন ফিরে এলেন তখন চমকে উঠলেন হারানো আলবামটা যথাস্থানে লক্ষ্য করে। এ কি কখনো হতে পারে যে আলবামটা বরাবর ঐখানেই ছিল! তবে এলো কী করে? আনল কে?

"আলবামটা—"

"হাঁ, আমিই অপরাধী। নিয়ে গেছলুম আপনাকে না বলে। কিন্তু ক্ষতি করিনি। বরং আরো কয়েকটি ফোটো জুড়ে দিয়েছি।"

তিনি হাঁ করে দেখলেন যে মল্লিকার স্ন্যাপশট বিশ বাইশখানা আঁটা হয়েছে। তবে যে ছুঁড়ি বলে সহপাঠী নয়, নাম জানিনে!

"এসব কার তোলা ? আপনার ?"

"অধমের।"

"নাম জানতে পারি ?"

"নিশ্চয়। আমার নাম জ্যোৎস্না রায়।"

"আপনি মল্লিকার সহপাঠী তো ঠিক ?"

"সে আর বলতে ? এক বছর এক সঙ্গে পড়ছি।"

"কিন্তু ও যে বলে সহপাঠী নন।"

"বোধ হয় স্বীকার করতে চান না। আমাদের রাজনীতি এক নয়।"

"ওহ্! তাই বলো। তুমি বলতে পারি ?"

"স্বচ্ছন্দে।"

"তুমি ওকে ভালোবাসো ?"

"তা তো বলিনি। 'হাঁ' বললেও ভুল হবে। 'না' বললেও ভুল হবে। আমরা এক ক্লাসে পড়ি। আলাপ পরিচয় আছে। এই পর্য্যন্ত বলা যায়।"

"বুঝেছি। তুমি কমিট করতে চাও না। কিন্তু আমাকে গোপনে বলো দেখি, সত্যি ওকে ভালোবাসো কি না।"

"গোপনে বলার অধিকার যদি পাই তবে যা বলব তা শুনে সহ্য করবেন কি ? আমার তো মনে হয়, না বলাই নিরাপদ।"

"খুব সইতে পারব। যদি বলার বাধা না থাকে।"

"বাধা যা ছিল সে তো আপনি নিজেই সরিয়ে নিলেন। কিন্তু আমার মুখে বাধে। থাক, বলব না।"

"না, তুমি বলো। আমি কিছু মনে করব না।"

"আমি আরেক জনকে ভালোবাসি। সে আপ—"

"কী!"

"আমাকে মাফ কোরো, অনীতা। আমি চল্লুম।"

যুবক সত্যি ঝপ করে চলে গেল। অনীতা মূঢ়ের মতো বসে থাকলেন। একবার দাঁড়ালেনও না। ইশ্‌তাহার রইল তাঁর হাতেই। কতক্ষণ পরে চোখে পড়ল জ্যোৎস্না তার চশমাটি ফেলে গেছে।

এবার চুরি নয়। নিয়ে যায়নি কিছু। দিয়ে গেছে এমন একটি কথা যা শুনলে গিন্নী মানুষেরও প্রথম বয়স ফিরে আসে। মনে হয়, এখনো তরুণ

আছি। নয়তো তরুণের উক্তি মিথ্যা। মিথ্যা? মিথ্যা বলে তার লাভ? সে তো বলতে চায়নি। বলতে আসেওনি। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়েছে। সাপের দোষ কী?

অনীতার বয়স সাতাশ। ছেলেপুলে হয়নি বলে আরো কম দেখায়। কেউ কেউ তাঁকে মল্লিকার সমবয়সী বলে ভ্রম করেছেন। এ ছোকরা যে তাই করে বসে আছে তা তো স্পষ্ট। মা গো, বলে কি না, আমি আপ—

অনীতা লজ্জায় জিব কাটলেন। এ কি কখনো সম্ভব! কিন্তু সম্ভব নয়ই বা কেন? কথায় বলে, ভালোবাসা অন্ধ। যার যাতে মজে মন। থাক, ভেবে কাজ নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে। এর পরে যখন ও চশমা নিতে আসবে তখন ওকে বিনা বাক্যে বিদায় দিতে হবে।

তা বলে চশমাটা বসবার ঘরে ফেলে রাখা যায় না। যত্ন করে তুলে রাখা উচিত। পরের জিনিস। যদি হারিয়ে যায়? আর ঐ আলবামখানাও ওখান থেকে সরাতে হবে। অনীতা ওগুলি নিয়ে বাক্‌সে বন্ধ করলেন। আর অনেকক্ষণ ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বয়সের চিন্তায় বিভোর হলেন। বয়স বাড়ছে না কমছে? বয়স তো সৃষ্টিছাড়া নয়, আর সমস্ত বিষয়ের মতো রিলেটিভ। কমছে বললে কিছুমাত্র অসত্য হয় না। বাড়ছে বললেও তাই। সাতাশ বছর একটা কথার কথা। কেউ কুড়িতেই বুড়ী। কেউ সাতাশেও ষোড়শী। জ্যোৎস্না তা হলে তামাসা করেনি। কেনই বা করবে? লাভ?

ইশ্‌তাহার পড়ে খাশনবীশের চোখ দিয়ে প্রাণ বেরিয়ে যায় আর কী! তিনি বললেন, "সর্ব্বনাশ! আমি এই মুহূর্ত্তে চললুম শ্যামাপ্রসাদের কাছে। বক্তৃতার সময় আর নেই, কাজের সময় এসেছে।"

এই বলে তিনি আঙুলে গোনা সুরু করলেন। "উজবেকিস্থান। কাজাকস্থান। তুর্কমেনিস্থান। তাজিকস্থান। চার চারটে স্থান নিয়ে ওদের স্থান সংকুলান হচ্ছে না। চায় আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, পশ্চিম পাকিস্থান। তাই নির্দ্দেশ পাঠানো হয়েছে, ওহে রেড ইণ্ডিয়ান কমরেডগণ, তোমরা মুসলিমদের উস্কে দাও, উঠে পড়ে লাগো। ইংরেজরা বলে, ডিভাইড য়্যাণ্ড রুল। আমরা বলি, ডিভাইড য়্যাণ্ড সোয়ালো। পাকিস্থান গ্রাস করে হিন্দুস্থানে দাঁত বসাব।"

তিনি দন্তবিকাশ করলেন। কিন্তু সত্যি সত্যি তিনি শ্যামাপ্রসাদের সন্ধানে চললেন দেখে অনীতা বললেন, "ও কী! চা খাবে না?"

"আর চা! চায়ের সময় আর নেই, কাজের সময় এসেছে। রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে মোগলের নাতিরা যোগ দিলে খানা খাইয়ে ছাড়বে। একমাত্র ভরসা ইংরেজের নৌবল আর মার্কিনের বায়ুবল।"

"তার মানে তুমি স্বাধীনতা চাও না।"

"কখন বললুম ও কথা! স্বাধীনতার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি।"

"আমি তো জানতুম তুমি বসুপন্থী।"

"একশো বার। তা বলে জাত ধর্ম্ম টিকি পৈতে জমি জায়গা সুদ মুনাফা ছেড়ে দেব! একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি!"

অনীতা দেখলেন তর্কে ফল নেই। বললেন, "যা ভালো মনে করো তা করো। কিন্তু ডিমিট্রভের সার্কুলারখানা যদি কোনো গতিকে পুলিশের হাতে পড়ে তা হলে বাড়ী সার্চ হবে, যেন খেয়াল থাকে।"

জোঁকের মুখে নুন পড়লে যা হয়। খাশনবীশ এতটুকু হয়ে গেলেন।

"কই, চা কোথায়! তখন থেকে জল ফুটছে তো ফুটছেই। এ কী রকম চা খাওয়া! নিয়ে এসো।"

"চায়ের সময় আছে তা হলে?"

"হুঁ! স্বামীর সঙ্গে ইয়ার্কি!"

"তা তুমি অতটা উত্তেজিত হবে জানলে আমি তোমাকে ও ছাই পড়তে দিতুম না। আমার তো বেশ মজা লাগে ভাবতে যে আবার আমরা মোগল রাজত্বে বাস করব। পদবী যার খাশনবীশ সে তো আধা মুসলমান।"

"কাল থেকে আমি ওর বদলে শর্মা লিখতে আরম্ভ করব। প্রভঞ্জন শর্মা কি নেহাৎ খারাপ শোনায়?"

"আমি কিন্তু মিসেস খাশনবীশ থেকে যাব। মিসেস শর্মা যেন মিসেস্ পুরুষ। বীভৎস শোনায়।"

খাশনবীশ ক্রমে প্রকৃতিস্থ হলেন।

আলবামখানা তাঁর স্ত্রী তাঁর দৃষ্টিগোচর করেন নি। রাত্রে এক সময় ননদকে দেখিয়ে বললেন, "এসব কার স্ন্যাপশট?"

"ওমা···" মল্লিকা যেন মাটিতে মিশিয়ে গেল।

"আমার কাছে তোমার গোপন কিছু ছিল না বলেই জানতুম। এখন দেখছি তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না।"

"তোমার পায়ে পড়ি, বৌদি। তোমাকে আমি সত্যি কথাই বলেছি। আমি ওর নাম পর্য্যন্ত জানিনে। রাস্তায় আটক করে বলে, এক সেকেণ্ড দাঁড়ালে কৃতজ্ঞ রইব। এক সেকেণ্ড। ব্যস। ওর মধ্যেই ওর ফোটো তোলা হয়ে যায়। তার পরে আমি আমার পথে, ও ওর পথে। ফোটো কেমন উঠল তাও কোনো দিন জিজ্ঞাসা করিনি। বাক্যালাপই নেই। নিজের ফোটো নিজের চোখে এই প্রথম দেখছি, বৌদি। তুমি বিশ্বাস করো।"

"জ্যোৎস্না রায় তোমার সহপাঠী নয় ?"

"জ্যোৎস্না রায় বলে কোনো ব্যাটা ছেলে আছে এই প্রথম শুনলুম।"

"তুমি আমাকে অবাক করলে, মল্লিকা !"

"তুমিও আমাকে !"

"তা হলে কি লোকটা মিথ্যুক ?"

"পাগলও হতে পারে।"

"চোর। মিথ্যুক। পাগল। কোনটা ঠিক ?"

"সব ক'টাই বোধ হয়।"

"না, ভাই, তুমি যাই বলো না কেন, ও চোর নয়। মিথ্যুক হলে আশ্চর্য্য হব, কেননা মিথ্যা বলে তার কোনো লাভ নেই। হাঁ, পাগল হওয়া সম্ভবপর। এক রকম পাগল আছে, তাদের বলে সেয়ান পাগল। তাই, তাই হবে।"

সমস্যার সমাধান যে এত সোজা এতে অনীতার রহস্যবোধ পীড়িত হলেও মনের ভার নেমে গেল। তিনি মল্লিকার কাছে মাফ চাইলেন।

এর পরের দিন তিনি কান পেতে বসে থাকলেন কখন কড়া নড়ে, কখন পাগলটা আসে তার চশমাটা নিতে। কিন্তু পাগলের নাম ভোলা। সেদিন সে এলোই না। তার পরের দিনও না। তার পরের দিন ? না, সেদিনও না।

এমনি করে এক মাস কেটে গেল। অনীতা আর প্রতীক্ষাও করেন না, প্রত্যাশাও করেন না। মল্লিকাও আর তাকে দেখতে পায় না পথে। পাগল কি তা হলে পাড়া বদল করল ? কে জানে, হয়তো পাগলা গারদেই গেছে।

একদিন কিন্তু সত্যি সত্যি কড়া নাড়ার আওয়াজ এলো। অবিকল সেই শব্দ। অনীতা তখন প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু পাছে পাগল পালায় তাই তাঁর সাজ করা হয়ে উঠল না। এলো চুলে, ময়লা কাপড়েই তিনি তর্ তর্ করে নেমে গেলেন। দরজা খুলে দেখলেন, যা ভেবেছিলেন।

"নমস্কার।"

"নমস্কার। ভিতরে আসবেন না?"

"নাঃ। আমার সাহস হয় না। আমি তা হলে যাই।"

"সে কী! আপনার চশমা নেবেন না? দাঁড়ান, আমি এনে দিচ্ছি।"

"চশমা আমি সেই দিনই পালটেছি। ও আমি ইচ্ছে করেই ফেলে গেছি অকেজো বলে।"

"তা বলে আপনার চশমা আমরা কেন রাখব? আপনি নিয়ে যা খুশি করুন। আসুন, ভিতরে এসে এক মিনিট বসুন।"

এক মিনিটের স্থলে বারো মিনিট হলো। বেশ ভালো করে সেজেগুজে অনীতা যখন নামলেন তখন জ্যোৎস্না একমনে সিগরেট ফুঁকছে। দু' হাত পেতে চশমাটা নিল, নিয়ে মাথায় ঠেকাল।

"অকেজো বলছিলেন, কেন জানতে পারি?"

"জানাতে ভরসা হয় না। জানালে আমার কপালে কী আছে সেটা জানি। কিন্তু আর কথা বাড়াব না। আমি বোধ হয় শীগগির কলিকাতার বাইরে যাচ্ছি। নিকটে ফিরব না।"

"কোথায় যাওয়া হচ্ছে? রাঁচী নয় তো?"

"নাঃ। এখনো তত পাগল হইনি। আপাতত এলাহাবাদ।"

"সেখানে তো—"

"নাঃ। সেখানে এ রকম পাগল আশ্রয় পায় না, তেমন কোনো আশ্রম নেই। কিন্তু সত্যিকার পাগল হলেই আমি সব চেয়ে খুশি হতুম। পাগলরাই সুখী। তাদের কাছে বাপ মা কিছু প্রত্যাশা করেন না. তাদের দেহের উপর জুলুম চলে, কিন্তু মনের উপর জোর খাটে না। কেউ যদি আমাকে সার্টিফাই করে তো আমি আজকেই রাঁচীর টিকিট কিনিতে রাজি।"

"ছি। ও কথা বলতে নেই। আমি অমন কোনো ইঙ্গিত করিনি। কিন্তু থাক ওসব বাজে কথা। এখন বলুন দেখি চশমা কেন অকেজো হলো?"

"কারণ চশমাটা অনুবীক্ষণ নয়। যদি কাউকে দু'নয়ন ভরে দেখতে চাই, দেখতে পাইনে। অন্ধের মতো আঁকুপাঁকু করি।"

"এসব আপনার বানানো কথা। আচ্ছা, আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে। আপনি কি এই সময়টা একটু আধটু পান করেন?"

"আজ্ঞে না। আপনি তা হলে টের পেতেন। ধূমপান করি বটে, কিন্তু আপনি বোধ হয় সে অর্থে বলেন নি।"

"না, সে অর্থে নয়। তবে কি আমি বুঝব যে আপনি যা বলছেন তা নির্জলা সত্যি ? জলমেশানো নয় ?"

"চোখের জল মেশানো।"

"তবে যে মল্লিকার এক রাশ ফোটো তুললেন ?"

"হুকুম পেলে অনীতার এক লাখ তুলতে পারি। ক্যামেরা এনেছি।"

অনীতা এতক্ষণ পরে তুমি বলতে সুরু করলেন।

"আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কী।"

"শুনতে পারি ?"

"কথাটা ভালো নয়। কিন্তু শুনলে হয়তো তোমার স্বভাব শোধরাবে। তুমি খুব ফ্লার্ট করে বেড়াও। না ?"

"তুমিও ভুল বুঝলে, অনীতা ?"

"তা হলে আরো অনেকে ভুল বুঝেছে ! কেমন ?"

"আরো অনেকে ? হাঁ, তাই। কেমন, এবার হলো তো ? উঠি।"

"উঠলে ? একটু বোস। বলো আমাকে, কেন তোমার এমন স্বভাব ?"

"যখন যাকে ভালোবাসি তখন তাকে সত্যি সত্যি সত্যি ভালোবাসি। তিন সত্যি। বলতে চাইনে, বলিনে, কিন্তু বলতে বাধ্য হই। যেই বলি অমনি শুনতে পাই ফ্লার্ট করছি। হয়তো তাই। কিন্তু এখনো কারুর কোনো অনিষ্ট করিনি। তুমি যদি মনে করো আমার ভালোবাসাটা ভাণ তবে আমি চুপ করে সহ্য করব। সরে যাবও।"

"কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারছিনে। তুমি মল্লিকার সহপাঠী কি না। তুমি বললে, হাঁ। মল্লিকা বলল, না।"

"আমি মিথ্যা বলিনি।"

"তা হলে মল্লিকা মিথ্যা বলেছে ?"

"তা তো জানিনে।"

"আমি এই রহস্য ভেদ করতে চাই।"

"অনায়াসে। এটা একটা রহস্যই নয়। এর চেয়ে ঢের বড় রহস্য রয়েছে, নীতা। মানুষের হৃদয়। আমি তো যাবার মুখে, পাঁচ দশ মিনিট পরে আমাকে চাইলেও পাবে না। মিথ্যা বলে আমার কোনো দিক থেকে কোনো সুবিধা নেই। তাই যা বলছি তা সত্য বলেই মনে রেখো।"

"জ্যোৎস্না, তুমি কি আমাকে কাঁদাতে চাও ?"

"না। কিন্তু যদি কাঁদো তো আমার কান্না সার্থক হবে।"

"থেকে যাও না কেন? যেতে বলছে কে?"

"সেসব পারিবারিক ব্যাপার। থাক, আমি উঠি।"

"ক্ষমা কোরো, তোমাকে ফ্লার্ট করার অপবাদ দিয়েছি।"

"ও আমি গায়ে মাখিনে।"

"জ্যোৎস্না।"

"নীতা।"

"আমার একটা অনুরোধ রাখবে? মল্লিকাকে বিয়ে করবে?"

"বিয়ের কথা কোনো দিন মনে উদয় হয়নি। বিয়ে করলে ভালোবাসার স্বাধীনতা থাকে না।"

"তা বললে চলবে কেন? বিয়ে না করে মানুষ বাঁচতে পারে না। আবার ভালোবাসাও সমান দরকার। সামঞ্জস্য চাই।"

"আমাকে দিয়ে হবে না। আমি অভাগা। চলি।"

"চললে? আবার কবে দেখা হবে জানিনে। এই রইল অভিজ্ঞান।"

অনীতা তাঁর সোনার রিষ্ট ওয়াচ খুলে দিলেন। জ্যোৎস্না অমনি তার সোনার হার খুলে পরিয়ে দিল।

একদিন মল্লিকাকে অনীতা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শোনালেন। মল্লিকাও অনীতাকে। উদ্দেশ্য, রহস্যভেদ। প্রেমের জন্যে দু'জনের একজনও কাতর নন, কিন্তু রহস্য নিরাকরণের জন্যে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্ত চঞ্চল।

মল্লিকা বল্‌ল, "ও যে আমার ফোটো তুলত সে শুধু তোমার সঙ্গে ভাব করার আশায়। যখন দেখল আমি ওকে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব না তখন সরাসরি তোমার কাছে ছাতা চাইতে এলো। বৌদি, তোমাকেই ওর ভালো লাগত, আমাকে নয়।"

"তা হলে আলবাম নিয়ে গেল কেন? নিয়ে গেল তো তোমার ফোটো এঁটে ফেরৎ দিল কেন? বেশ বোঝা যায় ও চেয়েছিল ফোটোগুলো তোমার চোখে পড়ুক। না, ভাই, আমি হলুম ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো, আমাকে ওর ভালো লাগার কথা নয়, কাজে লাগানোর কথা।"

"কী যে বলো, বৌদি। তোমার মতো রূপসী ও গুণবতী ক'জন! ও কেন আলবামখানা চুরি করেছিল বলব? তোমার ফোটো খুলে নিতে। নিয়েছেও। তুমি লক্ষ করোনি?"

"য়্যাঁ!"

"তুমি লক্ষ করোনি তা হলে। যেখানে যেখানে তোমার ফোটো ছিল সেখানে সেখানে আমার ফোটো বসিয়েছে। তা ছাড়া ফাঁকা দিকটাতে আমার বহু ফোটো এঁটেছে। তুমি শুধু সেই দিকটাই দেখেছ।"

অনীতা স্তম্ভিত হলেন। আলবামটা বার করে দেখলেন তাঁর ফোটো-গুলি নেই। তা হলে ও চোর ঠিকই।

"চোর!" তিনি এর বেশী বলতে পারলেন না।

"চোর? না, চোর নয়। প্রেমিক।" মল্লিকা বল্‌ল।

"কিন্তু আমার সঙ্গে প্রেম করে ওর লাভ? বরং তোমার সঙ্গে বিয়ের আশা আছে।"

"তোমার বিশ্বাস লোকে একজনকেই ভালোবাসে ও বিয়ে করে?"

"সেইটেই তো উচিত।"

"যা হওয়া উচিত তাই বুঝি হয়ে থাকে?"

"কী জানি, আমি অত বুঝিনে। কিন্তু আমার মন বলে, ও তোমারই প্রেমিক। আমার নয়। সেদিন ওকে ছাতাটা দিয়ে দিলেই চুকে যেত। গোটা কয়েক টাকা বাঁচাতে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত রিষ্ট ওয়াচটা গেল।"

"কিন্তু হারটাও তো এলো।"

"কোনটা বেশী দামী? হারটা না রিষ্ট ওয়াচটা?"

"তুমি কি বেনের মেয়ে না বামুনের? আমার মতে হারটারই দাম বেশী। ও তোমার পাণিগ্রহণ করতে পারেনি, তাই মাল্যদান করেছে তোমাকে।"

"তোমার মরণ!"

"আমার মতো ক্ষুদ্র প্রাণীর মরণ বাঁচন দুই সমান!" মল্লিকার স্বরে উদাস ভাব। শ্বাস বিলম্বিত। চাউনিতে কুয়াশার আভাস।

"আমাকে ক্ষমা করো, ভাই মল্লিকা। আমি তোমার প্রেমিককে চুরি করে নিইনি। বিশ্বাস করো, আমি ওর কাছে তোমার বিয়ের প্রস্তাব তুলেছিলুম।"

"ও কী বলছ, বৌদি! ও চোর, না তুমি চোর, এই ভেবে বুঝি আমার ঘুম হচ্ছে না? আমি ওকে বিয়ে করলে তো ও আমাকে বিয়ে করবে!"

"কেন, তুমি ওকে বিয়ে করবে না কেন শুনি?"

"বাঃ। আমার যদি মনের মানুষ পাবার আশা থাকে?"

"যা পাওয়া উচিত তাই বুঝি পাওয়া যায়?"

"তা বলে আমি তোমার প্রেমিককে বিয়ে করতে পারব না। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো চাও তো তোমার ছোট বোন অমিতা রয়েছে। এক বোনকে ভালোবাসবে, আরেক বোনকে বিয়ে করবে। এক ঢিলে দুই পাখী।"

"যাও, তোমার সাথে জন্মের মতো আড়ি।" অনীতা ভীষণ-রাগ করলেন। রাগ করে উঠে গেলেন।

"তুমি করবে অব্যাপারেষু ব্যাপারং। আর তার সাজা ভুগবে আরেক জন। বৌদি, তুমি ধন্য!" মল্লিকা কেঁদে ফেলল। "তুমি অতি ধন্য! সুধন্য!"

বছর খানেক পরের কথা।

সিনেমায় নতুন বই এসেছে। খাশনবীশ পাস্ পেয়ে সপরিবারে বক্স দখল করেছেন। বইখানা যে মুসলমানের লেখা আর তারকারা যে বেশীর ভাগ মুসলমান "এ কথা জানিতে তুমি ভারতবৎসল প্রভঞ্জন।" তা সত্ত্বেও তোমার উৎসাহ দেখে ধাঁধাঁ লাগে।

ইন্টারভ্যালের সময় আবিষ্কার করা গেল পাশের বক্সে তথাকথিত জ্যোৎস্না রায় ও কে একজন মহিলা। খাশনবীশ বল্লেন, "আরে তুমি এখানে! তার পর···"

"আসুন, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। মিসেস্ সুধা ভট্টাচার্য্য। মিসেস্ নীতা—আই মীন, অনীতা—খাশনবীশ। মিস্ মল্লিকা খাশনবীশ। মিস্টার পি খাশনবীশ। মিস্টার—"

"নিরঞ্জন খাশনবীশ।" অনীতার দেওর বল্‌ল।

মহিলারা বসলেন খাশনবীশের বক্সে। আর খাশনবীশ বসলেন ভট্টাচার্য্যের বক্সে। খুব আড্ডা জমল। হো'হো হাসির রোল উঠল। সিগরেটের ধোঁয়ায় বাতাস ঘোলাটে হলো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাশির আওয়াজ এলো।

"তারপর! ছবি কেমন লাগছে হে! নাসিম কেমন খুবসুরৎ! সুন্দরী যদি বলো তো ওদের মধ্যেই আছে। আর আমাদের—!"

"আর আমাদের! স্বচক্ষেই দেখছেন!"

ভাগ্যক্রমে এসব কথা মহিলাদের কানে যায়নি। নইলে কুরুক্ষেত্র বাধ্‌ত। দস্তুরমতো গৃহবিবাদ। তার কাছে হিন্দু-মুসলিম সিভিল ওয়ার কিছু নয়।

ফেরবার পথে অনীতা বললেন, "ওর নাম বল্‌লে না যে?"

"ওঃ! তাই তো। জলধর ভট্টাচার্য্যের ছেলে সুধন্য, আমার আপিসে কিছু দিন কাজ শিখত। ওরা মস্ত কুলীন। বিয়ে করাই ওদের ব্যবসা। বাপ বৌ পিছু পঞ্চাশ হাজারের নীচে নামেনি। ছেলের রেট চল্লিশ হাজার।"

অগাষ্ট ১৯৪২

হোরেস আলেকজাণ্ডার

১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসের পর থেকেই যে গান্ধীজীর মনে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, সে কথার আভাস তাঁর তখনকার অনেক রচনায় মেলে। জাপানীরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করলে কি ভাবে তার প্রতিরোধ করা যায় সে সমস্যা নিয়ে কখনো তিনি চিন্তাকুল—কখনো তাঁর ভাবনা যে কিভাবে ভারতবর্ষ ইংরেজ সরকারকে স্ববশে আনতে পারে। তাঁর চোখে অন্ততঃ এক বিষয়ে ইংরেজ ও জাপানী একই পর্য্যায়ে পড়ে। তারা দু'দলই বিদেশী, একদল দেশের কর্ত্তা অন্যদল কর্ত্তৃত্ব-অভিলাষী। গান্ধীজীর মতে ভারতবর্ষ শাসন করবার অধিকার কেবলমাত্র ভারতবাসীরই আছে, এবং ভারত-বাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর অনেক আগেই করা উচিত ছিল, সে বিষয়ে আর বিলম্ব করা চলে না।

এ রকম মানসিক আবহাওয়ার সৃষ্টি একজন ইংরেজের পক্ষে সহজ নয়। সহজ না হলেও সে চেষ্টা করতেই হবে, কারণ কেবল গান্ধীজী বলে নয়, সমস্ত ভারতবাসীরই এই একই মানসিক পরিমণ্ডল। যদিও ইংরেজের সঙ্গে আলাপে অনেকে হয়তো মনের কথা লুকোতে চেষ্টা করে, তবু রাজা, প্রজা, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান নির্ব্বিশেষে ভারতবাসী মাত্রেরই এ মনোভাব। মানুষমাত্রেই হয় অক্ষশক্তির অনুরাগী, নয় সম্মিলিত জাতিসমূহের সমর্থক—একথা বিলেতে আজকাল আমাদের কাছে স্বতোসিদ্ধ বলে মনে হয়। সম্মিলিত জাতির যুদ্ধপ্রচেষ্টায় যে বাধা দেয়, সে যে মনে মনে অক্ষশক্তির অনুরাগী এ বিষয়ে বিলাতে কারু মনে কোন সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে কিন্তু অধিকাংশ লোক এ কথা মানবে না। অল্প কয়েক-জনের চোখে হয়তো অক্ষশক্তির সঙ্গে সম্মিলিত জাতির সংগ্রাম চরম প্রশ্ন বলে ধরা দেবে—তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো সরকারী চাকুরে, যদিও চাকুরেদের মধ্যেও অনেকের মনে দোটানা। রাজাগোপালাচারী এবং হয়তো পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুরও এই মত। অক্ষশক্তির পরাজয়কে প্রধান কর্ত্তব্য মনে করায় তাঁরা প্রয়োজন হলে এখনকার মত স্বদেশপ্রেমের দাবীকেও খাটো করে দেখতে পারেন। ভারতবাসীর বিপুল অংশের কিন্তু

এ মনোভাব নয়—হিন্দুস্থানই হোক আর পাকিস্থানই হোক, তাদের হৃদয়ে ভারতবর্ষ প্রধান। তাদের চরম লক্ষ্য অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা। যদি ইংরেজ এ দাবী মানতে না চায়, তবে জোর করে দাবী মানাতে হবে। যদি জাপান ইংরেজকে হটিয়ে ভারতবর্ষ অধিকার করতে চায়, তবে জাপানকেও বাধা দিতে হবে। ইংরেজের সমর্থকেরা যে যুক্তি দেয়, তাতেও এই মনোভাবই প্রকাশ পায়। সরকারসমর্থক এক নেতার মতে ইংরেজকে সাহায্য করা উচিত এইজন্য যে ব্রিটিশ শক্তি ক্ষীয়মান, তাই সত্বরই ইংরেজকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তখন আমরা স্বাধীন হব; আর জাপানকে সমর্থন করলে ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিকে সাহায্য করার ফলে আবার এদেশে নতুন সাম্রাজ্যবাদ সুরু হবে, এবং আবার হয়তো দেড়শো বছর পরাধীনতার গ্লানি সইতে হবে।

গান্ধী এবং নেহরু—দু'জনের মনোভাবই অনেকটা এ ধরণের—বোধ হয় জিন্নারও তাই। গান্ধী ও নেহরুর সিদ্ধান্ত এক হলেও তাদের যুক্তি এবং পথ কিন্তু ভিন্ন। দুজনের সামনেই ছিল কঠিন সমস্যা—যদিও দুজনের সমস্যা ঠিক এক নয়। দোটানার মধ্যে তাদের পথ ঠিক করতে হয়েছে। গান্ধীর সমস্যাকে বোধ হয় এভাবে প্রকাশ করা চলে—একদিকে তিনি চেয়েছেন যে পারতপক্ষে ইংরেজের মুস্কিল অথবা জাপানের সাহায্য হতে পারে এমন কিছু করবেন না। অন্যদিকে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে ভারতবর্ষে ইংরেজশাসন যে এখনো অব্যাহত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং সে শাসন কেবলমাত্র ভারতবর্ষ বলে নয়, ইংরেজের পক্ষেও ক্ষতিকর, এবং পৃথিবীতে ইংরেজের অপযশের কারণ। তাঁর বিশ্বাস যে ইংরেজ যদি ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা দেয়, এবং এমন সুস্পষ্ট ও নিঃসন্দেহ ভাবে দেয় যে আমেরিকা, চীন এবং ইয়োরোপের সকলেই দেখবে যে ইংরেজ সত্যই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়েছে, তবে সমস্ত পৃথিবীময় তার যে নৈতিক প্রভাব, সে প্রভাবের ফলে অক্ষশক্তিরও পরিবর্ত্তন হতে বাধ্য, এবং একমাত্র এই পথেই পৃথিবীময় সত্যিকার জয়—স্বাধীনতার জয় সম্ভব হবে। এই বিশ্বাসের বলেই তিনি জোর করে বলেছেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সময় যে এসেছে সে কথা ইংরেজ জাতিকে বোঝাবার জন্য প্রয়োজন হলে চরমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। তিনি বিশ্বাস করেছেন যে এ সমস্যা এবং তার সমাধানের উপর জোর দিয়ে তিনি ইংরেজ জাতি এবং সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের মিত্রের কাজ করেছেন। তাদের যে নৈতিক অপরাধ, এ সমস্যার সমাধানের দ্বারা তিনি সে অপরাধের বোঝা মিটিয়ে দেবেন।

নেহরুরও সিদ্ধান্ত এক, কিন্তু তিনি নিজের পথে সে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। অক্ষশক্তির পরাজয় তাঁর প্রধান লক্ষ্য। বিলাতের চেম্বারলেন মন্ত্রীসভা যেভাবে যুদ্ধের পূর্ব্বে তোষণনীতির অনুসরণ করেছে, গভীর বিরাগের সঙ্গে তিনি তা লক্ষ্য করেছেন কিন্তু আশ্চর্য্য হন নাই—তাঁর মতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সেটাই স্বাভাবিক নীতি। ফ্যাসিষ্ট ইতালি বা নাৎসি জার্ম্মানী যে ভাবে বিদেশ জয় ও শাসন করেছে, সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যাণ্ডের জয় ও শাসনপদ্ধতি হয়তো ভিন্ন, কিন্তু বিদেশ জয় ও শাসনের পদ্ধতি যতই ভিন্ন হোক না কেন, তাদের প্রকৃতিতে কোন পার্থক্য নাই। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই সে বিষয়ে একগোত্র। ১৯৩৯ সালে ইংল্যাণ্ড যখন নাৎসি জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, তখন নেহরু আশা করেছিলেন যে এবার বোধ হয় ইংরেজের নাৎসি-গন্ধী রাষ্ট্রনীতির পরিবর্ত্তন হবে। ইতালি যখন আবিসিনিয়া আক্রমণ করে, তখন ইংরেজ রাষ্ট্রনীতির দুর্ব্বলতা ও দ্বিধা ফ্যাসিজম্ প্রীতির লক্ষণ—সে প্রীতি আরো স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল যখন স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি ফ্রাঙ্কোরই স্বার্থে। বৃটিশ রাষ্ট্রনীতির সত্যিকার বদল হয়েছে কিনা তার পরীক্ষার স্থল ভারতবর্ষ। ইংরেজ সরকার যদি সত্য সত্যই মানুষের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে থাকে, তবে তার প্রথম কাজ হবে ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। নেহেরু কিন্তু তার কোন লক্ষণই দেখতে পেলেন না। ১৯৩৯ সালের সরকারী বিবৃতি, ১৯৪০ সালে অগাষ্ট মাসে বড়লাটের ঘোষণা—এককথায় ভারতবর্ষে ইংরাজ সরকারের সমস্ত ক্রিয়া কর্ম্মে একথাই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে প্রকৃত পক্ষে ইংরেজ সরকারের নীতি ও লক্ষ্যের কোন পরিবর্ত্তনই হয়নি।

এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি? আইন অমান্য আন্দোলনের কথা বারবার উঠেছে এবং ১৯৪০ সালের হেমন্তে ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হ'ল। ইংরেজ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে এ আন্দোলন, কিন্তু যাতে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা না আসে, সেজন্য ইচ্ছে করেই এ আন্দোলনকে গণ আন্দোলন না করে ব্যক্তি আন্দোলনের রূপ দেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে অনেকে কারারুদ্ধ হলেন। সরকারকে বিব্রত না করার জন্যই এ পদ্ধতি, কিন্তু এ আন্দোলনে বিশেষ কোন ফল হয়নি। এবং ১৯৪৩ সালের মধ্যেই আন্দোলন থেমে গেল। ১৯৪২ সালে এলেন ক্রীপস্। নেহেরুর তিনি বন্ধু। সেজন্য এবং ক্রীপসের রাজনৈতিক যে মতামত তাতে নেহরু প্রথমে ক্রীপস্ প্রস্তাবকে সুচক্ষেই দেখতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রস্তাব দেখে কিন্তু তাঁর

পছন্দ হলনা—তাঁর যে দাবী সে তুলনায় প্রস্তাব কিছুই নয়। তখন নেহরু এই সিদ্ধান্তেই এলেন যে ক্রীপস্ মন্ত্রীসভায় যাওয়ায় কোনই পরিবর্ত্তন হয়নি—ইংরেজ সরকারের মন বা মত বদল হয়নি।

নেহরুর সামনে সমস্যা হল—জাপানী চর উৎসাহ পেতে পারে এমন কিছু করা চলবেনা, অথচ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যে প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা, ইংরেজের রাষ্ট্র ও রণনীতিতে তা পদে পদে প্রকাশ পাচ্ছে। চীন ও রুষদেশের লোক অস্ত্রশস্ত্রের অভাব সত্ত্বেও বীরত্বের সঙ্গে শত্রুকে যে বাধা দিতে পারল, তার একমাত্র কারণ—স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রামে তারা উদ্বুদ্ধ। ইংরেজের অস্ত্রশস্ত্র ছিল, কিন্তু দেশবাসীর সোৎসাহ সমর্থনের অভাবে তারা মলয় ও ব্রহ্মদেশে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হ'ল—জাপানীরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করলে যে সে কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি হবে না, তার ভরসা কোথায়? ইংরেজ যে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে পারবে না এ বিষয়ে নেহেরু নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাঁর মতে ভারতের ইংরেজ অপটু ও অপদার্থ এবং ভারতবর্ষের জনগণের সমর্থনও তারা পায়নি, পাবার আশাও করতে পারে না। বোম্বাইয়ে নেহরুর এক জনসভায় একজন কম্যুনিষ্ট তাঁকে বাধা দিবার চেষ্টায় চেঁচিয়ে উঠে যে বর্ত্তমান যুদ্ধ 'জনযুদ্ধ'। নেহরু তাকে এক কথায় ঠাণ্ডা করে দেন—বলেন যে জনগণকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর তারা যুদ্ধকে কি বলে—তারা এ যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' মনে করে না। নেহরুর বিশ্বাস ছিল যে জাপানীকে সফলতার সঙ্গে বাধা দিতে হলে বর্ত্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধে' পরিণত করতে হবে। সে রূপান্তরের একমাত্র উপায় ভারতীয় জনগণের দ্বারা শাসনযন্ত্র অধিকার। তার আর অন্যকোন পথ নাই, ইংরেজ সহজে বা স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রশক্তি ছেড়ে দিতে চাইবে না—তাদের বাধ্য করতে হবে। তা করা কি সম্ভব? নেহরু এবং তাঁর সহকর্ম্মীদের মনে হয়েছিল যে তা সম্ভব। তাঁরা ভেবেছিলেন যে সমর শিল্পের মজুর ও রেলকর্ম্মীরা সকলেই ব্যাপক ধর্ম্মঘটে যোগ দেবে এবং যতদিন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা না হয়, ততদিন কাজে ফিরে যাবে না। ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে ফৌজী বিদ্রোহও হয়তো হতে পারে। অন্ততপক্ষে তারা জাতীয় সরকারের দাবী ইংরেজকে জানিয়ে দেবে। নেহরু জানতেন যে ভারতীয় বাহিনী তাঁকে শ্রদ্ধা করে। ইংরেজের সঙ্গে রাষ্ট্রিয় সংঘর্ষ তীব্র হলেও দীর্ঘস্থায়ী হবে না—দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই একটা সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। তাতেও হয়তো বিপদ আছে, কিন্তু সে বিপদ অস্বীকার করবার উপায় নাই। চীন ও রুষদেশের মতন ভারতবর্ষও যদি বর্তমান বিশ্বযুদ্ধে মানুষের স্বাধীনতার জন্য সার্থকভাবে সংগ্রাম করতে চায়, তবে এ পথ ভিন্ন অন্য কোন উপায়

নেই। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে নেহরু কয়েক ঘণ্টা ধরে আমাকে তাঁর মত যে ভাবে বুঝিয়েছিলেন তাতে আমার বিশ্বাস যে এই ছিল নেহরুর মনের কথা।

ভিন্ন পথে বিভিন্ন যুক্তিতে এমনি ভাবে গান্ধী এবং নেহরু একই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। পূর্ব্বেও বহুবার তা হয়েছে এবং এবার তার ফলে তাঁরা মিলিত ভাবে ১৯৪২ সালে কংগ্রেসকে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনে আহ্বান করলেন।

এ সিদ্ধান্তে যে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও নেহরু সেকথা ভুলতে পারেন নি। গান্ধী নিজে লিখেছেন যে নেহরু আমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে আবেগের সঙ্গে লড়েছেন, তা বর্ণনা করার ভাষা আমার নাই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাস্তব অবস্থার বিচারে কোন যুক্তি বা আবেগ টিকল না।

ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠক বসল। গান্ধীও উপস্থিত ছিলেন। ১৪ই জুলাই যে প্রস্তাব প্রকাশিত হল তাতে ইংরেজ সরকারকে এদেশ পরিত্যাগ করে জাতীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা সমর্পণের দাবী করা হলো। সে অস্থায়ী জাতীয় সরকারের রূপ সম্বন্ধে বলা হল যে "ভারতবর্ষের জনগণের সমস্ত বিশিষ্ট অংশের প্রতিনিধি নিয়ে সে সরকার গঠিত হবে, এবং তারাই পরে এমন ভাবে গণসংসদ গঠন করবে যে সে গণসংসদ দেশের সমস্ত সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ভারত শাসনের খসড়া প্রস্তুত করতে পারে। স্বাধীন ভারত ও ইংল্যাণ্ডের প্রতিনিধি একত্র বসে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধের রূপ নির্ণয় করবে এবং বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য একযোগে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।"

কিন্তু "যদি এ দাবী ব্যর্থ হয়, তবে বর্ত্তমান ব্যবস্থার সংরক্ষণকে কংগ্রেস আশঙ্কার চক্ষে না দেখে পারে না, কারণ বর্ত্তমান ব্যবস্থায় প্রতিদিন ভারতবর্ষের অবস্থার অবনতি এবং ভারতবাসীর প্রতিরোধের ইচ্ছা ও শক্তি হ্রাস হচ্ছে। ১৯২০ সালে কংগ্রেস যখন অহিংসাকে কর্ম্মপদ্ধতি বলে গ্রহণ করে, তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত কংগ্রেস যে অহিংস শক্তি অর্জ্জন করেছে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সে শক্তির ব্যবহার ভিন্ন তখন আর কংগ্রেসের অন্য কোন উপায় থাকবে না! এ ধরণের ব্যাপক সংগ্রাম একমাত্র গান্ধীজীর নেতৃত্বেই চালিত হতে পারে।"

এ প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ায় সমস্ত ভারতবর্ষে সাড়া পড়ে গেল। অদূর ভবিষ্যতে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্বন্ধের রূপান্তর করতে তিনি যে বদ্ধপরিকর, "হরিজনে" গান্ধীজীর অনেক লেখায় সে কথার আভাষ ছিল। আমাকে তিনি জুন মাসের মধ্যেও কিন্তু বলেছেন যে অদূর ভবিষ্যতে কারাবরণের কোন ইচ্ছা তাঁর নাই।

তাঁর কথায় মনে হয়েছিল যে কোন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের কর্ম্মপন্থার কথা তিনি ভাবছিলেন। তিনি বহুবার লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা বলেছেন, এবং সাধারণেরও বিশ্বাস ছিল যে তাঁদের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য রয়েছে। তাই অনেকেরই মনে হয়েছিল যে কোন সিদ্ধান্তে আসবার আগে গান্ধীজী একবার বড়লাটের সঙ্গে দেখা করবেন। এখনও হয়তো সময় চলে যায়নি। গত দুই বছর ধরে একজন ভারতীয় খৃষ্টান নেতা গান্ধী-জিন্না সমঝোতার চেষ্টা করছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার সঙ্গে সেবাগ্রামে রওয়ানা হলেন। আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে তিনি কি এখনো বড়-লাটের সঙ্গে আলাপ করতে রাজী? তিনি বল্লেন যে কেবল রাজী নয়, আলাপ করতে তিনি উৎসুক। ওয়ার্কিং কমিটির যে প্রস্তাব, সে তো কেবলমাত্র প্রস্তাবের খসড়া—আসল প্রস্তাব নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটীতে পাশ হবে। এর মধ্যে যদি বড়লাটের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়, তবে তাতে অবস্থার অনেক বদল হতে পারে। সাংবাদিকদের এ সময়ে গান্ধীজী বলেছেন যে এবার আর দর কষাকষির অবকাশ নাই, তাই বড়লাটের সঙ্গে আলোচনার এ ইচ্ছা আমার কাছে আশ্চর্য্য মনে হল। তিনি বল্লেন যে তাঁর নিজের বিশ্বাস, কোন সংঘর্ষ হবেনা, তার আগেই সমাধানের রাস্তা মিলবে। তাঁর অন্তরঙ্গ যাঁরা এ সময় তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন—রাজাগোপালাচারী তাঁদের মধ্যে একজন—তাঁরাও এই ধারণা নিয়ে এসেছেন যে গান্ধীজীর হঠাৎ কিছু করবার ইচ্ছা নাই।

তিনি একসঙ্গে যে দুইভাবে কথা বলছিলেন, তাদের মেলানো কঠিন মনে হয়। "দর কষাকষির অবকাশ নাই" একথার উপর জোর দিয়ে তিনি বলতে চাচ্ছিলেন যে স্বাধীনতা নিয়ে খেলা চলবে না—স্বাধীনতার অর্থ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। আলাপ-আলোচনা বা সমঝোতার স্থান নেই, একথা তিনি বলতে চাননি। তাঁর আশা ছিল যে বড়লাটের সঙ্গে আলাপে তিনি বুঝবেন যে লর্ড লিনলিথগো সত্য সত্যই জাতীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে ইচ্ছুক। যদি সে আশা পূর্ণ হয়, তবে সে সরকার প্রধানত কংগ্রেসী হোক অথবা লীগি হোক, তাতে কিছু আসবে না। ইঙ্গ-ভারতীয় সমস্যা সমাধানে মুস্কিল হবে না। যদি সে আশা পূর্ণ না হয়, তবে কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতার আগ্রহকে সংগ্রামের রূপ দিতে কংগ্রেস বদ্ধপরিকর। গান্ধীজী এ সময় "প্রকাশ্য বিদ্রোহের" কথাও বলেছেন। এরকম ঘোষণার পরেও বন্ধুভাবে বড়লাট তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবেন, গান্ধীজীর এ বিশ্বাসের ভিত্তি কি? গান্ধীজী নিজে বলবেন যে তিনি

তো সংগ্রাম ঘোষণা করেন নি, তিনি কেবলমাত্র সম্ভাবিত কর্ম্মপন্থা পূর্ব্ব থেকে সরকারকে জানাতে চেয়েছেন। বড় মিছিল যাওয়ার সময় রাস্তায় যে ভাবে পুলিশ মোতায়েন হয়, তাতে কি সংগ্রাম ঘোষণার কোন আভাষ আছে? বিশেষত গান্ধী সর্ব্বদাই এ ভাবে খোলাখুলি নিজের মনের কথা ও কর্ম্মপন্থা বলে থাকেন, বলায় বিশ্বাস করেন। তবু প্রশ্ন থেকে যায় যে বড়লাটের সঙ্গে একটা বোঝাপড়াই যদি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তবে প্রস্তাব প্রকাশিত হবার পূর্ব্বে সাক্ষাতই কি ঠিক হ'ত না? হিটলারের পূর্ব্বে অন্যান্য জার্ম্মান রাষ্ট্রনেতা যখন নিরস্ত্র ও শক্তিহীন ছিলেন, তখন তাঁরা ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের কাছে যে সুবিধা পেয়েছেন, সশস্ত্র হিটলার যুদ্ধের হুমকি দিয়ে তার চেয়ে যে অনেক বেশী আদায় করেছেন, একথা অবশ্য অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু ভারতবর্ষ ও জার্ম্মানীর অবস্থা এক নয়, এবং গান্ধীজীর কাছে কেউ হিটলারের মত ব্যবহার আশা করে না। বৃটিশ মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে গান্ধীজীর এরকম প্রকাণ্ড ভুল এই প্রথম নয়। গান্ধীজী যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, একথা লর্ড লিনলিথগোকে জানানো হ'ল, কিন্তু তাঁর কোন উত্তর পাওয়া গেল না। বোঝা গেল যে সরকার সিদ্ধান্ত করেছে যে কংগ্রেস এবং বিশেষ করে গান্ধীজী এখন সংঘর্ষের অভিলাষী। বিভিন্ন মধ্যপন্থী দল ও নেতার অনুরোধ উপদেশে কোন ফল হয় কিনা দেখবার জন্য সরকার খানিকটা অপেক্ষা করল। ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাব নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটীতে বিপুল সংখ্যাধিক্যে পাশ হয়ে গেল, সামান্য যা পরিবর্ত্তন হ'ল, তার মধ্যে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থার কথাই প্রধান। গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি এবার বড়লাটকে চিঠি লিখবেন, কিন্তু তার জন্য আর অপেক্ষা না করে সরকার সক্রিয় হয়ে উঠল, এবং গান্ধীজী ও অন্যান্য সমস্ত কংগ্রেস নেতাকে গ্রেফতার করল।

৯ই অগাষ্ট রবিবার সকালে গ্রেফতারের খবর সমস্ত ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে পড়ল। ট্রিনিটির পরে এটী দশম রবিবার। ইংরিজি প্রার্থনা পুস্তকে এই রবিবারের জন্য যে বিশেষ প্রার্থনা আছে, তাতে এই কথাগুলি রয়েছে—"যদি তুমি জানতে, কেবল তুমি জানতে, অন্ততপক্ষে এই একদিনের জন্য জানতে যে তোমার শান্তির জন্য কি প্রয়োজন! কিন্তু সে সব কথা তোমার চোখে লুক্কায়িত! তোমার একটী পাথরের উপর আর একখানি পাথর তারা রাখবে না—তুমি জানতে পারনি যে তোমার বিপদের দিন ঘনিয়ে এল!" দিল্লীর বাইরে পুরাতন রাজধানীর ভগ্নস্তূপের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ যে নতুন বিপুল রাজপ্রাসাদ

তৈরী করেছে, তার বিশাল কক্ষে কি সেই রবিবারের প্রভাতে বড়লাটের কানে এ কথাগুলির ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও একবার পৌঁচেছে? বোধ হয় নয়—লর্ড লিনলিথগো ছিলেন প্রেসবাইটিরিয়ান এবং তাঁর সেক্রেটারী রোমান ক্যাথলিক। রোমান ক্যাথলিক নিশ্চয় ভোরবেলার "মাস"-এ গিয়েছিলেন—ততক্ষণে বোধ হয় নিত্যনৈমিত্তিক ভাবে তিনি তাঁর দিনের কাজ সুরু করে দিয়েছেন! তা সত্ত্বেও বড়লাট এবং তাঁর সেক্রেটারীরা সকলেই'ত মানুষ! রাষ্ট্রনীতির দাবী, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব এবং সবচেয়ে বেশী, জাপানী আক্রমণের সম্মুখে অন্ততঃ বাহ্যিক ঐক্য রক্ষার প্রয়োজনেই তারা এ রকম ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। গান্ধীজী যদি বলেন যে তিনি যতদিন সম্ভব অপেক্ষা করেছেন, তবে সরকারও কি বলতে পারে না যে তারাও যতদিন সম্ভব অপেক্ষা করেছেন, দেখেছেন যে কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষের মনে "সুবুদ্ধি ও বিবেচনা"র উদয় হয় কিনা! সরকারের দিক থেকে এ রকম সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক কারণে বোধ হয় অনিবার্য্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের রাষ্ট্রিয় কর্ত্তারা বোধ হয় সেদিন রবিবারের সকালে নিজের মনে মনে বলেছেন,—"কি জানি, এসব ঘটনার শেষ পরিণতি কোথায়?···যদি তুমি জানতে, অন্ততঃ তুমি জানতে, তোমার শান্তির জন্য কি প্রয়োজন!"

নয়াদিল্লীর লাটপ্রাসাদে যারা ছিল, তাদের মনে এমন কথা আসা বিচিত্র নয়। ভারতবর্ষের পথেঘাটে যাদের বাস, তারা যে বার্ত্তা শুনল তাতে কোন সন্দেহ বা দ্বিধা ছিল না। চব্বিশ ঘণ্টা আগেও যারা গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের নিন্দা করছিল, তাদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল দীপ্ত স্বর। ভারতবর্ষ হিংস্রতা কাকে বলে জানেনা বল্লেই চলে, তবু যতখানি হিংস্রতা ভারতবর্ষে সম্ভব, ততখানি হিংস্রকণ্ঠে ধ্বনি উঠ্‌ল—"এবার শেষ—শান্তি এবার শেষ হল, ইঙ্গ-ভারতীয় সমঝোতার আর কোন আশা নাই।"

সংঘর্ষ বাধবার ঠিক আগে গান্ধীজীর যে ভাষা, তার মধ্যে অনেক কথা আমাদের বিস্মিত করেছে। তিনি বলেছিলেন—"এবার প্রকাশ্য বিদ্রোহ।" "সমস্ত সাবধানতা সত্ত্বেও যদি ঝগড়া বিবাদ হয়, তবে উপায় নেই।" "আন্দোলন মৃদু-ভাবে চালাবার জন্য যা প্রয়োজন, তা আমি করব, কিন্তু যদি দেখা যায় যে ইংরেজ সরকার বা মিত্রশক্তিদের মনে কোন দাগ পড়ছেনা, তবে চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করতেও আমি ইতস্ততঃ ক'রব না।" দেশের কাছেও তাঁর শেষ বাণী—"হয় কর, অথবা মর।" আমাদের পশ্চিম দেশী লোকের কাছে এ সব কথার একমাত্র অর্থ এই যে গান্ধী তাঁর অনুচরদের হিংস্র কর্ম্মপদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধ করছেন, অহিংসার

যে সব কথা আছে, সেগুলি আসল উদ্দেশ্য লুকোবার ফন্দীমাত্র। আমরা সশস্ত্র দ্বন্দ্বে অভ্যস্ত, তাই হিংসা ও সংগ্রামের কথা আমাদের সহজে মনে হবে, কিন্তু গান্ধীজীর বহু বৎসরের বক্তৃতা ও রচনার সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোকের মতন যারা গান্ধীজীর মানসিক জগতে বাস করেছে, তাদের কাছে এ উক্তিগুলির অর্থ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যত অহিংস ভাবেই হোকনা কেন, ভেবে চিন্তে ব্যাপক ভাবে আইন অমান্য আন্দোলনকে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ভিন্ন কি বলা চলে? আর গান্ধীজী কখনো রূঢ় সত্যকে লুকোবার চেষ্টা করেন না—কোদালকে কোদাল বলাই তাঁর রীতি। প্রতারণা বা ছদ্মবেশকে তিনি চিরদিনই ঘৃণা করেন। দাঙ্গা-হাঙ্গামা যদি বাধত তবু তিনি ভারতবর্ষে পুলিশ কি ভাবে কাজ করে, তা তিনি জানতেন। তিনি জানেন যে অনেক সময় পুলিশ এমন কাজ করে বসে যে শান্ত ও নিরুপদ্রব জনতাও উন্মত্ত হয়ে ওঠে—যারা শান্তিতে ও বিনা হাঙ্গামায় কাজ করতে চেয়েছিল, তারাও ক্ষেপে ওঠে। কেবল ভারতবর্ষ বলে নয়—অন্য দেশেও এরকম ঘটনা ঘটে। আমি যার কথা বিশ্বাস করতে পারি, এমন লোকের কাছে ১৯৪২ সালের অগাষ্ট মাসেও এরকম ঘটনার কথা শুনেছি। একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের খবর শুনেই প্রতিবাদে মিছিল বের করে, এবং বিনা দুর্ঘটনায় সুশৃঙ্খলভাবে সে জনসম্মেলন সাধিত হয়। পরের দিন ছাত্রেরা আবার সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ জনসম্মেলনের বন্দোবস্ত করে, কিন্তু পুলিশের উপর হুকুম ছিল যে জনতার উপর গুলি করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা গোপন সূত্রে পুলিশের কাছ থেকে এ খবর পান এবং সে অনুসারে ছাত্রদের নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন। মিছিল বন্ধ করবার প্রস্তাব ছাত্রেরা সরোষে প্রত্যাখান করে। এ ভাবে মিছিল বন্ধ করা কাপুরুষতা এবং তাদের মহান নেতার আদেশের বিরোধী। এ রকম ঘটনা ঘটতে পারে জেনেইতো তিনি বলেছিলেন—হয় কর অথবা মর। ছাত্রেরা স্থির করল যে তারা করবে—মিছিল নিয়ে তারা অগ্রসর হবে। পুলিশ যদি গুলি করে, তবে তারা মরবে, সে মৃত্যু হবে অহিংস বীরের মৃত্যু—যে বীর নিজে মরতে প্রস্তুত কিন্তু অন্যকে মারতে প্রস্তুত নয়। হলও ঠিক তাই। গুলি চলল, এবং তারপরে হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলারও সৃষ্টি হল—গুলি চলবার পরে তা হলো আগে নয়। হয়তো এরকম ঘটনা বেশী ঘটেনি। হয়তো আমি যে ভাবে খবর পেয়েছি ঘটনা ঠিক সে ভাবে ঘটেনি। আমি শুধু এইটুকু জানি—আমাকে যিনি এ ঘটনার কথা বলেন, ঘটনার সময়ে তিনি দায়িত্বপূর্ণ পদের অধিকারী হিসাবেই সে সহরে ছিলেন এবং ঘটনার সত্য সত্য বিবরণ হিসাবেই

আমাকে এসব কথা বলেন। আদতে যাই ঘটে থাকুক না কেন, এরকম ঘটনার সম্ভাবনা মনে ছিল বলেই তিনি বলেছিলেন—হয় কর, নয় মর। যদি 'হয় মার নয় মর' এ কথা বলবার তাঁর ইচ্ছা থাকত, তবে তিনি খোলাখুলি ভাবেই বলতেন হয় মার নয় মর। 'হয় কর নয় মর' এবং 'হয় মার নয় মর'—এ দুটী কথার মধ্যে বিলেতের লোক হয় তো খুব বেশী তফাৎ দেখবেনা কিন্তু ভারতবাসীর কাছে এ এ দুটী কথার তফাৎ অনেক।

আমাদের কাছে গান্ধীজীর এ সমস্ত কথা যতই কঠিন বা রূঢ় মনে হোক না কেন ভারতবর্ষের লোকের পক্ষে ভুল বুঝবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই। এ সময় তিনি বহুলোকের সঙ্গে আলাপে কথায় তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। এ সমস্ত আলাপ আলোচনার মধ্যে ১৯৪০ সালের ২৫শে অগাষ্ট তারিখের 'হরিজনে' প্রকাশিত একটী আলোচনার মর্ম্ম বোঝা আমার পক্ষে কঠিন। ১৯৩৯ সালের শরতে পোলেরা যেভাবে জার্ম্মান আক্রমণের প্রতিরোধ করেছিল, তাকে অহিংস প্রতিরোধ বল্লে অন্যায় হয় না—এ রকম একটী মত তিনি পূর্ব্বেই প্রকাশ করেছিলেন।

ইংরেজের কাছে এ সমস্ত কথা কঠিন ও চরমপন্থী মনে হতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষে তার ভুল মানে হবার বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই। এ সময় গান্ধীজী বহু লোককে আলাপের সময় দিয়েছেন, এবং দেখাশোনায় অনেক কথা হয়েছে—সে সব কথার পূর্ব্বে কোন মহড়া হয় নাই। এমনি একটী আলাপের যে বিবরণ ১৯৪০ সালের ২৫ অগাষ্টের 'হরিজনে' বেরিয়েছে, সেটা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। ১৯৩৯ সালে পোলেরা যে ভাবে জার্ম্মান আক্রমণ বাধা দেয়, তাকে গান্ধীজী অহিংস প্রতিরোধেরই সামিল বলে বর্ণনা করেছিলেন, একথা পূর্ব্বেই জানা গিয়েছিল। আলাপেচ্ছুক এক প্রশ্নকর্ত্তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে যে তাঁর যখন এরকম ধারণা, তখন ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাবে তাঁর আপত্তি কোথায়? ওয়ার্কিং কমিটীও তো ভারতকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে বহিরাক্রমণে বাধা দেবার সিদ্ধান্তই করেছিল। গান্ধীজী বল্লেন, "কেন, এদুটা অবস্থার মধ্যে তো কোন সাদৃশ্য নাই। যদি কেউ একা তলোয়ার হাতে নিয়ে একদল সশস্ত্র ডাকাতের বিরুদ্ধে যায়,—আমি বলব যে তার প্রতিরোধকে অহিংস বল্লেও চলে।...যদি বিড়ালের সঙ্গে যুদ্ধে ইঁদুর তার দাঁত ব্যবহার করে, তবে কি ইঁদুরকে অহিংস বলব? তেমনি পোলেরা যখন অস্ত্রশস্ত্রে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, মহাশক্তিশালী জার্ম্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে সাহস করে দাঁড়াল, তখন পোলদের সে বাধাদান প্রায় অহিংস বাধাদানের পর্য্যায়ে পড়ে। একথা আমি বার বার বলতে প্রস্তুত আছি—তবে

"প্রায়" কথাটীর উপর জোর দেওয়া দরকার। আমাদের এদেশে চল্লিশ কোটীর বাস। আমরা যদি বিশাল বাহিনী জড় করে সশস্ত্রভাবে বহিরাক্রমণে বাধা দিই, তবে আমাদের সে প্রতিরোধকে "অহিংস" তো দূরের কথা, "প্রায় অহিংস" বলবার সঙ্গতি কোথায়?···এদেশ যদি কোনদিন সে ভাবে অস্ত্র গ্রহণ করে, তবে ভারতবর্ষই হবে পৃথিবীর শান্তির সব চেয়ে বড় অন্তরায়।"

ভারতবর্ষকে সেনাবাহিনীতে পরিণত করার বিরুদ্ধেই গান্ধীজীর এসমস্ত যুক্তি। পোলাণ্ডের বিষয় তিনি যে কথা বলেছেন, ভারতবর্ষের বেলা আমরা যাতে তার প্রয়োগ না করি, এ চেষ্টাও স্পষ্ট। এসব কথা মেনে নিলেও গান্ধীজীর উক্তিতে হেঁয়ালী থেকে যায়, এবং পোলাণ্ডের বিষয় তাঁর যুক্তিকে অসঙ্গতই বলতে হয়। একটা কারণ হয়তো এই যে পোলাণ্ডের অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল। তবু একথা তো মানতেই হবে যে অহিংসা মনোবৃত্তির কথা—অস্ত্র অথবা অস্ত্রের অভাব দিয়ে অহিংসা মাপা যায় না। যে রকম অস্ত্র আমার আছে, তাই দিয়েই যদি আমি শত্রুকে বাধা দিই, তবে আমার অস্ত্র তেমন ভাল নয় বলে আমার প্রতিরোধকে তো আর অহিংস বা প্রায় অহিংস বলা চলে না। নিরস্ত্রভাবে দাঁড়িয়ে যদি আমি শত্রুকে শান্ত বিশ্বাসের বলে বলি—"তোমার যা খুসী কর", অথবা যদি বলি, "ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন আমার উপর তোমার কোন ক্ষমতাই খাটবে না" তবে কেবলমাত্র এরকম মনোবৃত্তিকেই অন্যায়ের সম্পূর্ণ অহিংস প্রতিরোধ বলা চলে। হয়তো গান্ধীজীর বলার উদ্দেশ্য ছিল যে অহিংস মনোবৃত্তির বিকাশেও স্তর আছে—ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে দাঁড়িয়ে একটা কাঠি ঘোরানোও ঢের ভালো। তাছাড়া এসমস্ত কথাই প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে—কাজেই কংগ্রেসের ১৯৪২ সালের অগাষ্ট প্রস্তাবের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই।

আমার মনে হয় না যে গ্রেফতারের পূর্ব্বে তিনি যে সমস্ত কথা বলেছিলেন তাতে তাঁর অথবা কংগ্রেসের হিংসা ও অহিংসা সম্বন্ধে মনোভাবের যে কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে, একথা তাঁর অনুবর্ত্তী কেউ ভেবেছে। ভাবুক অথবা নাই ভাবুক—আসলে প্রশ্ন কিন্তু হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন নয়। সে সম্বন্ধে এত বাজে কথাও লেখা হয়েছে যে বলা যায় না। রাষ্ট্রনেতা ও অন্যান্য ইংরেজও অনেকে আঁৎকে উঠেছেন যে গান্ধীজীর মত অহিংস রাজনীতিতে বিশ্বাসী লোক ভারত-বাসীকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস বিদ্রোহে আহ্বান করেছেন। এরকম "কপটতার" জন্য তাঁদের কত দুঃখ, কিন্তু একথা তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে

অহিংস কর্ম্মপদ্ধতির প্রতি ঘৃণা তাঁদের মুখে সাজে না! তাঁদের মধ্যে একজনও কোনদিন অহিংস পথকে সমর্থন করেছেন? রাজনীতিতে যারা অহিংস ভাবে চলতে যায়, তাদের যে পদে পদে কি বাধা, সে বাধা কল্পনা করবার শক্তি তাঁদের আছে? সে বাধা কেবলমাত্র সমাজের বাধা নয়—মানুষের চরিত্রের সংগঠনেও কি বাধা কম? আমরা কোয়েকার—এবং আমরা যদি গান্ধীজীর কোন কোন কথার তাৎপর্য্য নিয়ে প্রশ্ন করি, তবে আমরা অন্ততঃ একথা বলতে পারি যে আমরাও অহিংস কর্ম্মপন্থার সাধক। নাৎসী শাসনের অধীনে আসতে হতে পারে, এ ভয় ১৯৪০ সালে আমাদের মধ্যে কারু কারু ছিল। সে শাসনকে অস্বীকার করে অহিংস উপায়ে বাঁচা কি সম্ভব হবে? প্রয়োজন হলে কি ভাবে মরব এসব কথার সেদিন বিচার করেছি, পরাধীন ইয়োরোপের খৃষ্টান নরনারীমাত্রেরই আজ এ সমস্যা। তাদেরও মূলমন্ত্র—'কর অথবা মর', অনেকে তাদের মধ্যে মরেছে। ইয়োরোপের পরাধীন জাতিসমূহকে প্রত্যহ যারা বলছে যে তোমাদের শাসনকর্ত্তাদের সর্ব্বপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত কর, সশস্ত্র বিদ্রোহে তাদের তাড়িয়ে দাও, ভারতবর্ষেও যদি ঠিক সেই সমস্ত পদ্ধতির মক্‌স হয়ে থাকে, তবে সেজন্য ভারত-বাসীদের প্রতি ঘৃণা বা আক্রমণ তাদের মুখে সাজে না।

আসল প্রশ্ন এত জটিল নয়। ১৯৪২ সালের অগাষ্ট মাসে, সহিংসই হোক আর অহিংসই হোক, কোন ধরণের প্রকাশ্য বিদ্রোহ করলেই কি মানবত্বের এবং বিশ্বস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাকে অপরাধ বলে মনে করতে হবে? যাঁদের বিশ্বাস তাই, তাঁরা বলতে পারেন যে ভারতে ইংরেজ শাসন যতই মন্দ হোক না কেন, দেশের চেয়ে পৃথিবীর কল্যাণকে বড় করে দেখলে ১৯৪২ সালে কংগ্রেস বিশ্বস্বাধীনতার বিরুদ্ধে অপরাধী। আর দরকার হ'লে পৃথিবীর স্বার্থের খাতিরে দেশের স্বার্থ খাট করতেই হবে। যাঁরা এভাবে যুক্তি দেন তাঁদের কথা উড়িয়ে দেওয়া চলে না, কিন্তু গান্ধীজীর প্রশ্ন তবু থেকে যায়। গান্ধীজীর কথা হ'ল এই যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন ঘোষণা করলে তাতে সম্মিলিত জাতিসমূহের যে নৈতিক জয় হবে, সে জয় এত সর্ব্বব্যাপী যে তার জন্য সাময়িক ভাবে সামরিক অসুবিধা হলেও সে অসুবিধা সহ্য করা উচিত। গান্ধীজীর কথা সত্য বলে মেনে নিয়েও আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে ইংরেজকে জোর করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিতে বাধ্য করলে নৈতিক জয় কোথায়? কংগ্রেস অবশ্য অহিংস সংগ্রামের কথা বলেছে, কিন্তু অহিংস সংগ্রামও তো সংগ্রাম? ইংরেজ যদি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়, তবে মিত্রশক্তির

নৈতিক লাভ কি ভাবে হবে? ইংরেজ যদি বোঝে যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণা ন্যায়সঙ্গত, এবং আদর্শের আহ্বান যদি সে ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলে মানে, তবেই নৈতিক লাভের কথা উঠে, এবং কেবল সেই অবস্থাতেই সমস্ত পৃথিবীতে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। গান্ধীজী অবশ্য বলবেন যে তাঁর আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন। ইংরেজকে তিনি শক্তি দিয়ে বাধ্য করতে চান নি, সহিষ্ণুতা দিয়ে জয় করতে চেয়েছেন। হল কিন্তু বিপরীত—ক্ষমতা অবিলম্বে হস্তান্তরের যে দাবী, সে দাবীর বিরুদ্ধে ইংরেজ আরো বেশী শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

আমাদের প্রধানতঃ দুটী প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ১৯৪২ সালে কংগ্রেস যে পথ অবলম্বন করেছিল, তাকে সঙ্গত ও অনিবার্য্য বলব না অসঙ্গত ও অন্যায় বলব? তেমনি করে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের যে সরকারী নীতি, সে নীতি কি সঙ্গত ও অনিবার্য্য অথবা অসঙ্গত ও অন্যায়? এ দুটীই হোল আসল প্রশ্ন। ১৯৪২ সালে যে হিংসার স্রোত ভারতবর্ষকে প্লাবিত করেছিল, তার জন্য দায়ী কে, সে প্রশ্ন অবান্তর। তা সত্ত্বেও ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও দায়িত্বের আলোচনাও প্রয়োজন।

সরকারী হিসাবে গ্রেফতারের পরের কয়েক সপ্তাহে প্রায় ২৫০ রেলওয়ে ষ্টেশন ধ্বংস অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, প্রায় ৫০০ ডাকঘর আক্রান্ত হয়। তার মধ্যে পঞ্চাশটী পুড়ে যায় এবং দুশোর বেশী গুরুতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিহার এবং যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে রেলওয়ে চলাচল বহু সপ্তাহের জন্য ব্যহত ছিল। রেলগাড়ী যখন চলেছে, তখনও অত্যন্ত ধীরে এবং দেরী করে চলেছে। বহুক্ষেত্রেই চিঠির চেয়ে টেলিগ্রাফ পৌঁছতে বেশী সময় লাগত। ভারতবর্ষের বিপুল অংশে সকল রকমের চলাচলের গুরুতর ব্যাঘাত ঘটেছে।

প্রায় দেড়শো থানা আক্রান্ত হয়—তাছাড়া অন্যান্য সরকারী দালানেরও ক্ষতি হয়। ত্রিশজনের বেশী পুলিশ মারা যায়—কয়েকজন অন্যান্য কর্ম্মচারী এবং সৈনিকও মারা পড়ে।

এ কথা হয়তো অনেকেই জানে না যে টাটার কারখানার সমস্ত লোক ধর্ম্মঘট করে। তারা সংখ্যায় কুড়ি হাজার এবং টাটা ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড় গোলাবারুদের কারখানা। তাদের দাবী ছিল যে জাতীয় সরকার না হওয়া পর্য্যন্ত তারা কাজে ফিরবে না। তাদের মধ্যে সমস্ত প্রদেশের, সমস্ত জাতির, সমস্ত ধর্ম্মের লোক ছিল। একপক্ষ ধরে তাদের ধর্ম্মঘট চলে, তবু কোন

হাঙ্গামা বা ফ্যাসাদ হয় নাই। সকলেই ভেবেছিল যে ভারতময় শ্রমিক মহলে আলোড়ন উঠবে, কিন্তু তা হল না। যখন তারা দেখল যে রেলওয়ের লোকেরা অথবা অন্যান্য শ্রমিকেরা তাদের ধর্ম্মঘটে সদলে যোগ দিল না, এবং কংগ্রেসের যে তড়িৎ-যুদ্ধ, তা সফল হবার কোন আশা নাই, তখনই কর্ত্তৃপক্ষ অনেক বুঝিয়ে তাদের কাজে ফিরিয়ে নিতে পেরেছে। কর্ত্তৃপক্ষকে এ কথাও বলতে হয়েছে যে কর্ত্তৃপক্ষেরা নিজেরাই জাতীয় সরকার স্থাপনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করবে। সৈন্যদলে কোন গোলমাল হয়েছিল কিনা সে কথা জানা যায়নি। যতই গোপন হোক না কেন, ভারতবর্ষে সব খবরই ছড়িয়ে পড়ে। তাই মনে হয় যে গ্রেফতার নিয়ে সৈন্যদলে বিশেষ কোন চাঞ্চল্য দেখা যায়নি।

সরকারী হিসাব মতে অগাষ্ট থেকে নভেম্বরের মধ্যে বেসরকারী লোক মারা যায় নয়শো জন, এবং অনেকে আহত হয়। ভারতীয় হিসাবে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশী। পুলিশ অথবা সৈন্যদলের গুলির পরে যে মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে, সরকারী হিসাব বোধ হয় তারই ভিত্তিতে রচিত। জনতার মধ্যে বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বজন যারা থাকে, তারা অনেক মৃতদেহ সরিয়ে ফেলে। কলকাতায় হাঙ্গামা বেশীদিন চলে নাই। হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় ডাক্তারদের কাছে হতাহতের যে সংখ্যা পেয়েছি, সরকারী হিসাবের চেয়ে তা ঢের বেশী। যদি সরকারী হিসাবই আমরা মেনে নিই, তবু একথা স্পষ্ট যে সরকার পক্ষের হতাহতের চেয়ে বেসরকারী হতাহতের সংখ্যা প্রায় বিশগুণ।

সারা শরৎকাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে টাইপ করা অথবা বটতলার ছাপা ইস্তাহার বিলি হয়েছে। সরকারের বিরুদ্ধে কিভাবে আন্দোলন চালাতে হবে, সে বিষয়ে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর নির্দ্দেশ হিসাবেই এগুলি বিলি হয়েছে। বাজেয়াপ্তের পরে সরকারী কর্ম্মচারীর কাছে এরকম দুয়েকটী ইস্তাহার আমি দেখেছি। ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাসে যে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হয় অন্ধ্র দেশের একখানি "গোপন" ইস্তাহার তাতে ছাপা হয়েছে। তাতে অহিংস কাজের মধ্যে বলা হয়েছে যে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাট। সে নির্দ্দেশের পরেও সাবধান বাণী রয়েছে যে রেলের লাইন সরানো অথবা রেলপথের বাঁধ যেন কাটা না হয়—সর্ব্বদাই দেখতে হবে যে জীবন হানির আশঙ্কা যেন না থাকে। আমার যতদূর মনে পড়ে বাঙলা দেশের ইস্তাহারগুলি বোধ হয় একটু উগ্র, এবং সরকারী সম্পত্তি নাশের কড়া নির্দ্দেশও সেখানে ছিল।

কারা এসব ইস্তাহার বের করত? সরকারী মত হ'ল এই যে এ সমস্ত

ইস্তাহার গান্ধীজীর নির্দ্দেশে প্রকাশিত হয়েছে। আমার নিজের বিশ্বাস যে গান্ধীজী বা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সঙ্গে এসব ইস্তাহারের কোন সম্বন্ধ নাই। গ্রেফতারের পূর্ব্বে গান্ধীজী যে আন্দোলনের ধারা বা কার্য্যক্রম সম্বন্ধে সঠিক কিছু স্থির করতে পারেন নাই এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বল্লেই চলে। যারা বাইরে রইল তারা গান্ধীজীর মনোভাব বুঝতে এবং প্রকাশ করতে চেয়েছে। তিনি যেসব বিবৃতি দিয়েছেন এবং পূর্ব্বেকার আইন অমান্য আন্দোলন যে ভাবে চলেছে, সেগুলি মিলিয়েই তারা গান্ধীজীর নির্দ্দেশ বুঝতে চেয়েছে। এভাবে কিন্তু সমস্ত ইস্তাহারের বর্ণনা চলে না। কংগ্রেসের মধ্যে তরুণ একটী দল বহুদিন থেকে গান্ধীজীর দেরী ও মন্দগতিতে অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাঁর অহিংসার প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগকেও তারা কোনদিনই পুরোপুরি মানতে চায়নি। তাদের অনেকে স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করে আন্দোলন রূপ ও সংগঠন স্থির করতে চেয়েছে। যেখানে আন্দোলন তীব্র হয়েছে, এবং বিশেষ করে বিহার ও যুক্ত প্রদেশের যেসব ঘটনা, তার মধ্যে অনেক ঘটনার জন্য বোধ হয় তারা দায়ী। এ ছাড়াও অবশ্য অনেকে ছিল—তাদের মধ্যে কেউ কেউ গান্ধী বা কংগ্রেসকেও মানে না। ১৯৪৩ সালের ২৬শে জানুয়ারী "জনসাধারণের কাছে-আবেদন" বলে যে ইস্তাহার বেরোয়, সরকারী শ্বেতপত্রে তা স্থান পেয়েছে। ততদিনে দায়িত্বশালী নেতৃবৃন্দ সকলেই কারারুদ্ধ। এ ইস্তাহারটী এ সমস্ত পূর্ণ বিপ্লবীর কীর্ত্তি বলেই মনে হয়। আবেদনটীর মর্ম্ম স্পষ্ট। কর্ম্মীদের কাছে রয়েছে ধর্ম্মঘট ও কর্ম্ম নষ্টের আহ্বান, মজুর ও কিষাণদের গরিলা সৈন্যবাহিনী গঠনের প্রেরণা। এক কথায় অধিকৃত ইয়োরোপের অধিবাসীদের নাৎসিদের বিরুদ্ধে যেসব কর্ম্মসূচী, এ আবেদনে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীদের ঠিক সেই কর্ম্মসূচী নিতেই আহ্বান করা হয়েছে। আবেদনের যে কোন ফল হয়েছিল, তার কোন প্রমাণ নাই।

শতভিষা

সুবোধ ঘোষ

৫

অনেকদিন পরে এলেন পুঁটিমাসী। রজনীবাবু হয়তো একটু রাগ করে-ছিলেন। কিন্তু এই রাগের হেতু তিনি নিশ্চয় জানেন না। রাগটা যেন মনের অগোচরের পথে নিয়মিত চলে এসেছে। আজ প্রায় তিন সপ্তাহ হলো, রজনীবাবুর বিছানার ওপর খবরের কাগজ স্তূপ জমে উঠেছে; কাপড় চাদর ওয়াড় সবই নোংরা। তিন সপ্তাহের মধ্যে মাত্র দশটী দিন সময়মত চা পেয়েছিলেন। বিশেষ করে রবিবারগুলি বিনা চায়েই শুকিয়ে গেছে। পর পর তিন রবিবার পুঁটিমাসী আসেন নি। না এসে তিনি খুবই গর্হিত কাজ করেছেন। প্রতি সপ্তাহশেষের পর পর তিনটী নিরপরাধ উৎসবের আবির্ভাবকে তিনি যেন নেহাৎ অবহেলায় নিষ্প্রদীপ করে দিয়েছেন। রজনীবাবুর পক্ষে তাই রাগ হবারই কথা।

পুঁটিমাসী শান্তভাবেই রজনীবাবুর ঘরে ঢুকছিলেন। রজনীবাবুর চোখ দুটী যেন এতদিন গ্রীষ্মের কষ্টে পীড়িত হয়েছিল। দেরী হলেও বর্ষা আসবেই এবং এসেছে, রজনীবাবুর দৃষ্টিটা তাই যেন খানিকটা অভিমান-পীড়িত ও খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়ে ঘটনাটাকে নীরবে গ্রহণ করছিল। কোন চাঞ্চল্য ছিল না।

কিন্তু পুঁটিমাসীর ঠিক পেছনে আর একটী মূর্ত্তিকে দেখতে পেলেন রজনীবাবু। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁর স্তব্ধতা চূর্ণ হয়ে গেল। ব্যস্ত ও উত্তেজিতভাবে এলোমেলো আবেগের উৎপাতে হঠাৎ বিব্রত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—কে? যতী এসেছিস্?

রজনীবাবুর আকস্মিক চীৎকারে যতীর বিমর্ষ মুখের গুমোট কেটে গেল। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে হেঁট হয়ে রজনীবাবুর পায়ে হাত রাখলো যতী। হাত দুটো যেন নিজের ক্লান্তিতে ভারী হয়ে রজনীবাবুর পায়ের ওপর অনেক্ষণ ধরে পড়ে রইল। স্থির হয়ে অস্বাভাবিক রকম আনন্দের আবেশে দাঁড়িয়েছিলেন রজনীবাবু। যতীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। ছ'বছরের নির্ব্বাসিত বাৎসল্যকে আবার হাতের কাছে পেয়ে যেন আশ্বাস ও সান্ত্বনায় আপন করে নিচ্ছিলেন।

যতী হয়তো কয়টী মুগ্ধ মুহূর্ত্তের আস্বাদে নিঝুম হয়ে শুধু বুঝতে পারছিল যে রজনীবাবু তার সব অপরাধকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

রজনীবাবুও মনে মনে জানেন যে ক্ষমা তিনি ঠিকই করছেন, কিন্তু যতীকে নয়, তাঁরই নিজের গোঁড়ামি অন্ধতা ও অনুদারতাকে। সেই ভুলেরই প্রায়শ্চিত্ত করছেন রজনীবাবু। যতী যে তাঁরই আত্মার ছায়া, তাঁরই শাখায়িত আদর্শের একটী ভিন্ন রঙের ফুল, সে-সত্য ছ'বছর আগে তিনি বুঝতে পারেন নি। যতীর পক্ষে নরেন মাষ্টারের বৌকে বিয়ে করার অপরাধটাকেই তিনি বড় করে দেখেছিলেন। তাই না তাঁর বিচার এত হৃদয়হীন ও কঠোর হয়েছিল। যতীর জীবনের আদর্শের দিকটা তিনি সেদিন দেখেননি। দেখতে পেলে যতীকে সেদিনও ঠিক আজকের মত করেই তিনি চিনতে পারতেন। সত্যি করে চিনতে পারতেন কৃষক সংগঠনের একনিষ্ঠ কর্ম্মী যতীকে, যশ স্বার্থ সুখ ও কেরিয়ারের মোহ যাকে ঘরকুনো করে রাখতে পারেনি, পান্তা ভাত খেয়ে যে-যুবক চাষার বাড়ীর আঙিনায় খড়ের বিছানায় শুয়েছে, ম্যালেরিয়ায় ভুগেছে, পুলিশের হাতে অকারণ শত লাঞ্ছনা সহ্য করেছে। জীবনের সম্মুখ কাজের পথে মাত্র একবার পাশে উঁকি দিয়ে দেখেছিল যতী। দেখতে পেয়েছিল কৃষক সংগঠনের এক কর্ম্মিণী নারীকে, নরেন মাষ্টার বৌকে, সুলেখাকে। শিক্ষায় প্রতিভায় গুণে কাজে ও দুঃসাহসে উজ্জ্বল সুলেখা নামে মেয়েটী। রজনীবাবুও তো তাকে কতদিন থেকেই চেনেন। কত উপদেশ দিয়েছেন, উৎসাহ জানিয়েছেন, আশীর্ব্বাদ করেছেন। অপদার্থ নরেন মাষ্টারের ওপর মনে মনে কত রাগ করেছেন। সুলেখার মুখের দিকে কতবার স্নেহবিহ্বল দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে কত কি ভেবেছেন। সুলেখা চলে গেলে মঞ্জুকে ডেকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছেন রজনীবাবু—নরেনটার সঙ্গে সুলেখার বিয়ে হলো কেন রে মঞ্জু? কী অন্যায় কথা।

রজনী বাবুর অভিযোগের মর্ম্ম অবশ্য খুবই স্পষ্ট করে বোঝা যেত। কিন্তু মঞ্জু কোন উত্তর দিত না। তাঁর এই ক্ষোভের পেছনে হয়তো একটী ছবি খুবই গোপনে লুকিয়ে থাকতো। এই বেমানানকে মানানসই করে নিয়ে ছবিটীকে নূতন রঙে রাঙিয়ে তিনি একবার হয়তো মনে মনে দেখতেন, সত্যিকারের সুশোভন মিলনের ও দাম্পত্যের একটী ছবি—পাশাপাশি দুটী মূর্ত্তি—যতী ও সুলেখা। তা চিরদিন ছবি হয়েই থেকে যাবে। রজনীবাবুর ক্ষোভ শুধু ক্ষোভেই সারা হয়ে যেত।

কিন্তু যা হবার নয় তাই যখন হলো, কী আশ্চর্য্য, রজনীবাবু

সেই খবর শুনেই উন্মত্তের মত চীৎকার করে উঠেছিলেন—ব্যভিচার! ব্যাভিচার!

যতীর মাথায় হাত রেখে চকিত কতগুলি মুহূর্ত্তের মালাকে যেন মনে মনে জপ করে নিঃশেষ করছিলেন রজনীবাবু। ঘটনার ছবিগুলি জপের গুটির মত তর্ তর্ করে মনের ভেতর এক পাক পার হয়ে গেল। আজ তিনি তাঁর রাগের ভুল বুঝতে পারছিলেন, লজ্জিত হচ্ছিলেন। যতী আর সুলেখাকে আজ তিনি স্পষ্ট চোখে দেখতে পাচ্ছেন। অনিয়মের রূপে নয়, তারা দু'জন যেন খুবই সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মের সূত্রে এক আদর্শের দাবীতে বাঁধা পড়ে গেছে।

সুলেখাকে খুঁজছিলেন রজনীবাবু। বার বার দরজার দিকে তাকাচ্ছিলেন। তৃতীয় একটী সহাস্য ও সপ্রতিভ তরুণী-মূর্ত্তির প্রতীক্ষায় তাঁর দৃষ্টিটা আগ্রহে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তিনি আশা করছিলেন যতীর পেছনে পেছনে সে-ও আসছে। কুণ্ঠাহীন সান্ত্বনা আশ্বাস ও আদর নিয়ে তিনি আজ তাকে অভ্যর্থনা করে ঘরে তুলে নেবেন।

যতী উঠে দাঁড়ালো। রজনীবাবু সাগ্রহে বললেন—সুলেখা কই? মূহূর্ত্তের মধ্যে যতীর দৃষ্টিটা সন্ত্রস্ত হয়ে যেন আবার পুঁটিমাসীর দিকে বিড়ম্বিত আবেদনের মত করুণ হয়ে কাঁপতে লাগ্‌লো।

পুঁটিমাসী বললেন—সুলেখার কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? তার তো আসবার কথা ছিল না।

রজনীবাবু—কেন? আপনি আসতে লেখেননি?

পুঁটিমাসী—না, লিখিনি।

রজনীবাবু—কেন?

পুঁটিমাসী—আপনার কেন'র উত্তর দেবার সাধ্য আমার নেই।

যতীর নিষ্প্রভ চেহারার দিকে তাকিয়ে রজনীবাবুও যেন ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে পড়তে লাগলেন। পুঁটিমাসী বললেন—আমি তো অনেকদিন আগেই আপনাকে সে-খবর জানিয়েছি।

রজনীবাবু—কোন্ খবর?

পুঁটিমাসী—আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম যে যতী সস্ত্রীক আসতে পারে না।

একটু চুপ করে থেকে পুঁটিমাসীর গলার স্বর যেন বিরক্তিতে তীব্রতর হয়ে উঠলো—আপনি স্পষ্ট কথা বুঝতে পারেন না, স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিলেও দেখতে পারেন না। কিন্তু আমি আপনাকে স্পষ্ট করেই বলেছিলাম…।

রজনীবাবু দৃষ্টিটা লক্ষ্যহীন হয়ে যেন বাতাসে ভাসতে লাগ্‌লো।

পুঁটিমাসী বললেন—এতদিন পরে যতী এল, কিন্তু আপনি বেচারাকে বড় অপ্রস্তুত করে দিলেন। যা বলার নয়, সেই সকল কথা টেনে এনে মিছামিছি ...।

রজনীবাবু যেন ভয় পেয়ে উঠলেন—কি কথা? আমাকে স্পষ্ট করে শিগ্‌গির বলুন।

পুঁটিমাসী কিছুক্ষণ একটা মমতার সঙ্কোচে যেন ইতস্তত করে নিয়ে তারপর বললেন—আপনি ব্যাপারটাকে বেশী বড় করে ভাববেন না, তেমন ভয়ানক কিছু হয়নি। সুলেখার সঙ্গে যতীর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

চোখের দৃষ্টি নামিয়ে অলসভাবে রজনীবাবু হাতপাখাটা তুলে নিলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে যেন নিরাবেগ ভাবেই বললেন—সুলেখা কোথায়?

পুঁটিমাসী—আছে কোথাও, সংগঠনের কাজ নিয়েই আছে।

রজনীবাবু—তবে ছাড়াছাড়ি হলো কেন?

পুঁটিমাসী—আপনার কেন'র উত্তর আমি জানি না। কোন্ নিয়মে ছাড়াছাড়ি হয়, আর কোন্ নিয়মে গলাগলি হয় সে-তত্ত্ব আমি জানি না।

রজনীবাবু—কিন্তু আমি তো জানি।

পুঁটিমাসী হেসে ফেলে বললেন—হয়তো পৃথিবীতে আপনিই শুধু জানেন।

রজনীবাবুর মুখের ভঙ্গী নির্বোধের মত আরও অসহায় হয়ে উঠলো—দু'জনেই তো একই আদর্শে ও কাজে ঠিক ঠিক লেগে রয়েছে, তবে আবার এসব গণ্ডগোল হয় কেন? হবার তো কথা নয়।

পুঁটিমাসী—জানি না, কেন।

রজনীবাবু আর কারও দিকে তাকালেন না। মাথার বালিশটাকে একবার গুছিয়ে নিলেন। পায়ের কাছে চাদরটাকে টানলেন।

পুঁটিমাসীর মুখটা করুণ হয়ে উঠ্‌লো। রজনীবাবুর কাছে এগিয়ে এলেন, গলার স্বরটা যেন সান্ত্বনার আবেগে কোমল হয়ে নেমে এল। অনুরোধ করলেন—শুয়ে পড়ছেন কেন? অসময়ে শোবেন না। এরকম করতে নেই।

রজনীবাবু টান হয়ে শুয়ে পড়লেন।

—আয় যতী।

যতীকে ডেকে নিয়ে রজনীবাবুর সান্নিধ্য ছেড়ে অন্য দিকে চললেন পুঁটিমাসী। রজনীবাবুর কাছে এসে ঘটনাটা যে এইরকম বিসদৃশ ভাবে নাজেহাল হবে, পুঁটিমাসী আগে থেকেই কতকটা আঁচ করতে পেরেছিলেন।

তাঁর মনে মনে একটা গর্ব তবু সজীব ছিল যে তিনিই যতীকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন। তাই তাঁর মনে মনে একটা ভয়ও ছিল, যতী আবার অপ্রস্তুত হয়ে চলে না যায়। পরের সংসার সাজিয়ে দিতে তাঁর এত গর্ব, এত সফলতার লোভ আর এত বিফলতার ভয়, সব মিলে মিশে তাঁর দায়টাকেই শুধু গুরুভার করে তুলেছে। রজনীবাবুর ঘর ছেড়ে পুঁটিমাসী চল্‌লেন প্রমীলাবলার ঘরের দিকে। যতীকে অপ্রস্তুত হতে দেওয়া চল্‌বে না কোনমতেই। আবার ঘরের ছেলে হতে হবে যতীকে। নীতি কর্ত্তব্য ও আদর্শ নামে কতগুলি ব্যারামে এত ভাল একটা সংসার উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। পুঁটিমাসী যে আজ এসব কথা নতুন করে ভাবছেন, তা নয়। তিনি বিস্মিত হন, বিরক্ত হন, মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়েন। রজনীবাবু আর প্রমীলাবালা—এরা দুজন সংসারের নিয়মে চলতে চায় না। কতগুলি নিয়মকে এনে সংসারে এরা চালাতে চায়। পদে পদে এত ব্যর্থতা, তবু এদের শিক্ষা হয় না। নিজের নিজের ব্যাধির গর্বে দু'জনেই আত্ম-হারা হয়ে আছে। একজন ভস্মশয্যায় চিৎপাত হয়ে পড়ে আছেন, আর একজন বদ্ধদুয়ার পূজোর ঘরে বসে ঠুং ঠাং করছেন।

আর একটা কথা। কেন জানি মনে হয়, পুঁটিমাসীর এত অন্তরঙ্গতা, এত যেচে দায় নেবার নেশা আর এত উৎসাহ ও শ্রমের পেছনে যেন একটা প্রতিজ্ঞা লুকিয়ে আছে। রজনীবাবুর থিয়োরীটা নিজের মিথ্যায় একদিন চূর্ণ হবে, পুঁটিমাসীর প্রতিজ্ঞা যেন সকল আয়োজনকে এই একটী লক্ষ্যে গুছিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এই প্রতিজ্ঞাটা তাঁর হার্টের কষ্টেরই প্রায় সমবয়সী, প্রায় তেত্রিশ বছর।

—আয় যতী।

প্রমীলাবালা আবার ডাকলেন যতীকে। রজনীবাবুর কাছে আর কোন ভালমন্দ সাড়া পাবার আশা নেই। তাঁর থিয়োরী সুলেখাকে ধরে আনতে পারেনি। অন্ততঃ সাতটা দিন ধরে তাঁর স্বপ্নে তন্দ্রায় ও জাগ্রত চিন্তায় একটা অভিমানের বিপ্লব চলবে। কিন্তু তবু চৈতন্য হবে কিনা কে জানে? রজনীবাবু এখনও হয়তো সেই একরোখা বিশ্বাসের মোহে অন্ধ হয়ে আছেন। শুধু হয়তো আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছেন, সুলেখা ও যতীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হলো কেন? এক আদর্শে ও এক কাজের পথে ওদের হৃদয় একদিন এক হয়েছিল, তবে এই অঘটন হয় কেন?

ভাবতে থাকুন রজনীবাবু। তাঁর কাছে কোন ভরসা নেই। ভরসা শুধু

প্রমীলা। যতী ঘরছাড়া হবার পর থেকেই প্রমীলা যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। সব স্পৃহা মমতা ও আবেগের বেড়া ভেঙে প্রমীলার মন আজ আল্‌গোছে দূরে সরে গেছে। সংসারের কোন ক্ষতি আজ আর প্রমীলার ক্ষতি নয়, কোন বিদায় অপচয় বিসর্জ্জন আজ আর প্রমীলাকে ব্যথিত করে না। সংসারের নিয়মকেই ভালবেসে দু'হাতে যেন বুকে জড়িয়েছিল প্রমীলাবালা। নিয়মের সংসারকে সে চায়নি। রাজপাটপুরের বিধবা তরুণীকে তাই একদিন নিঃসঙ্কোচে তরুণ রজনী মিত্রের পাশে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল। কেন? রজনী মিত্র আজও বলবেন—আদর্শের দাবী, এক প্রেরণা, এক সাধনা ইত্যাদি ইত্যাদি। পুঁটিমাসী মনে প্রাণে রজনীবাবুর এই তত্ত্বটাকে ঘৃণা করেন। পৃথিবীর সকল হেয় বস্তুর চেয়ে অনেক বেশী করে ঘৃণা করেন।

এই তত্ত্ব যেদিন ভুয়ো প্রমাণিত হবে, বোধ হয় এক মাত্র সেইদিন পুঁটি-মাসী তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় তৃপ্তির আস্বাদ পাবেন। তাই কি পুঁটিমাসী তাঁর হার্টের কষ্টের বোঝা নিয়েও এই প্রতিশোধের অভিযানে দৃঢ়পদে এগিয়ে চলেছেন?

প্রমীলাকে পূজোর ঘর থকে বার করতে হবে। যতীকে সঙ্গে নিয়ে পূজোর ঘরের দিকে এগিয়ে চললেন পুঁটিমাসী। যতীকে একবার দু'চোখ চেয়ে ভাল করে দেখুক্ প্রমীলা, তার নিস্পৃহ তপস্যার খোলস ভাঙুক্।

আজ প্রমীলাবালার ছ'বছরের সমাধির অন্ধকার ঘুচিয়ে দিতে হবে। যতীকে যেন প্রদীপের মত সঙ্গে ক'রে এগিয়ে গেলেন পুঁটিমাসী, পূজোর ঘরের দিকে। নিরেট কঠিন যবনিকার মত দরজাটা তখনো বন্ধ ছিল। আজ এই দরজা খুলে যাবে। যতীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে প্রমীলাবালা যেন তাঁর হৃদয়কেও বনবাসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আজ সেই বনবাসের বন্যতা দূর হয়ে যাবে, আবার সজনতা ও সহৃদয়তার সংসারকে হাতের কাছে ফিরে পাবেন প্রমীলাবালা।

অদ্ভুত রকমের একটা আনন্দের আবেগে পুঁটিমাসীর চোখ দু'টো ক্ষণে ক্ষণে সজল হয়ে উঠছিল।

পূজোর ঘরের কপাটে ধাক্কা দিলেন পুঁটিমাসী। আস্তে আস্তে ডাকলেন—একবার বাইরে এস প্রমীলা। যতী এসেছে।

ঘরের ভেতর কিছুক্ষণের জন্য যেন কোশাকুশী ও ধূপ দীপ শাঁখ আর চামরের শান্তি ভঙ্গ হলো। ঠুং ঠাং করে এলোমেলো কতগুলি শব্দ হলো। স্তব্ধ পূজোর ঘরের ভেতর যেন একটা নিশ্বাস হঠাৎ উতলা হয়ে উঠেছে।

পুঁটিমাসীর সারা মুখে একটা কৃতার্থতার হাসি ছাপিয়ে উঠছিল। আবার ডাকলেন—শীগ্‌গির এস প্রমীলা।

প্রমীলাবালার উত্তর শোনা গেল। দরজাটার ফাঁকে যেন একটা সুকঠিন ও শান্ত কৌতুলে সশব্দে উঁকি দিল—আর কে এসেছে?

হঠাৎ চম্‌কে উঠে পুঁটিমাসী ভীতভাবে উত্তর দিলেন—আর কেউ নয়।

—কেন?

পুঁটিমাসী আরও অসহায় হয়ে পড়লেন। এ-প্রশ্ন আশা করেননি পুঁটিমাসী। এই বেয়াড়া কেন'র জবাব দেবার মত সামর্থ্য তাঁর নেই। পুঁটিমাসী তাই খানিকটা আবদারের সুরে মিনতি করে বললেন—তুমি একবার বাইরে এস প্রমীলা। তারপর সব কথা শোন।

—সুলেখা এল না কেন?

—সে আর আসবে না প্রমীলা। যতীর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

—কেন?

আবার কেন? প্রমীলাবালার এই কেন, রজনীবাবুর কেন'র মতই নির্বোধ আর অন্ধ। পুঁটিমাসী মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। তবু তাঁর বুঝতে ভুল হয়নি, এই দুই প্রচণ্ড কেন'র মধ্যে কী আকাশ পাতাল তফাৎ! রজনীবাবুর প্রশ্নগুলি আকাশের মতই, অনেক ওপরে উঠে একেবারে নীল হয়ে গেছে। সংসারের সবুজের দিকে বিরক্ত ও আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়ে আছে। প্রমীলাবালা ঠিক তার উল্টো। প্রমীলাবালার প্রশ্নগুলি পাতালের মত, গভীর মোহে একেবারে নীচে নেমে রয়েছে। সুখদুঃখের একান্তে, কামনা বাসনা ও ভালো-লাগায় একেবারে গলাগলি হয়ে আছে। তাই সংসারের বিচ্ছেদ বিরহ ও ছাড়াছাড়ির নিরর্থক হৃদয়হীনতার দিকে তাকিয়ে ধিক্কার দিয়ে ওঠে—কেন?

পুঁটিমাসী জেনেশুনে যেন একটু চালাকি চাল্‌বার চেষ্টা করলেন—ছাড়া-ছাড়ি হয়েছে, ভালই হয়েছে। বাইরে এসে সব কথা শোন, তাহ'লেই বুঝতে পারবে। এস, যতীর সঙ্গে কথা বল।

প্রমীলাবালার আর কোন উত্তর শোনা গেল না। পূজোর ঘরের দরজা তেমনি স্তব্ধ হয়ে রইল। অনেকক্ষণ ধরে পুঁটিমাসী ও যতী পূজোর ঘরের সাম্‌নে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বন্ধ দরজার ফাঁকে শুধু ফুরফুরে আল্‌পনার মত ধূপের ধোঁয়া বাইরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

পুঁটিমাসী অবসন্নের মত একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন—না, আমি আগেই জানতাম প্রমীলাও এই কাণ্ড করবে। দরজা খুলবে না।

—কেন মাসীমা।

এতক্ষণে কথা বললো যতী। আবার এক অন্তর্দ্ধানের নাটকের শেষ অঙ্কে চরম একটা দৃশ্যের মধ্যে যেন যতী দাঁড়িয়ে আছে। বিবর্ণ ও নিষ্প্রভ চেহারার মধ্যে যতীর চোখের দৃষ্টিটাই শুধু প্রখর অভিমানে তীব্র হয়ে জ্বলছিল।

যতীর মুখে আবার সেই 'কেন' শুনে মনে মনে হেসে ফেললেন পুঁটিমাসী। উত্তর দিলেন—সুলেখা এল না, তাই চটে গেছে প্রমীলা।

—কার ওপর চটেছে?

যতীর প্রশ্নে মুহূর্ত্তের মধ্যে পুঁটিমাসীর মনের হাসি উবে গেল। যতীর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন একটা মমতার সঙ্কটে পড়ে পুঁটিমাসী কিছুক্ষণ নিরুত্তর হয়ে রইলেন। সত্যিই তো, কী দুরূহ প্রশ্ন! কার ওপর চটেছে প্রমীলা? সুলেখার ওপর নিশ্চয় নয়। সুলেখার ওপর রাগ করতে পারলে আজ প্রমীলার পূজোর ঘরের দরজা খুলে যেত। পুঁটিমাসী চেষ্টা করেও শেষ পর্য্যন্ত কোন কথা বলতে পারলেন না।

যতী একটু সপ্রতিভ হয়ে এগিয়ে এসে পুঁটিমাসীকে প্রণাম করলো—আমি এবার চলি মাসীমা।

পুঁটিমাসী বিপদে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—খবরদার বলছি যতী, যেতে পারবি না।

—আমি বুঝেছি, মা আমার ওপর চটেছে।

—তাতে কি হয়েছে? তোর বাবা তোর ওপর একটুও রাগ করেনি।

—বাবাকে রাগ করার আমি কোন সুযোগ দিইনি মাসীমা। বাবা বলতে পারেন না যে, আমি সংগঠনের কাজ ছেড়ে দিয়েছি বা আদর্শ হারিয়েছি।

—আমিও তো তাই বলছি। তবে তুই এত ঘাব্‌ড়ে যাচ্ছিস্ কেন?

—কিন্তু মা'র কাছে যে আমি ব্যর্থ হয়ে গেছি মাসীমা!

পুঁটিমাসী সান্ত্বনা দিলেন—না না, তুই ওসব কথা ভাবিস্ না। প্রমীলার কথা ছেড়ে দে।

—তা হয় না মাসীমা।

পুঁটিমাসীকে প্রণাম করে যতী কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। শুক্‌নো মুখ আর বিব্রত চোখের দৃষ্টি দিয়ে জোর করে একটা কৃত্রিম হাসি ধ'রে রাখার চেষ্টা করছিল। প্রমীলাবালার কথাটাই সে আজ ছাড়তে পারে না। এই তো সব চেয়ে বড় কথা, যে-কথার আড়ালে চরম একটা বিদ্রূপ আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রমীলার কাছে সে-আজ একেবারে অপদার্থ। পেটের ছেলে বলে মাপ করতে পারেনি প্রমীলা, দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আজ যদি একটা জহ্লাদের চাক্‌রী নিয়ে ঘরে ফিরে আসতো যতী, তবে প্রমীলা কখনো দরজা বন্ধ করে দিত না। সেটা করতেন রজনীবাবু। কিন্তু যতী আজ ফিরে এসেছে শুধু তার পরাভূত পৌরুষের একটা ব্যর্থ কাহিনীর রিক্ততা নিয়ে। এর সঙ্গে প্রমীলাবালার কোন আপোষ নেই।

পুঁটিমাসীও চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। যতীকে সান্ত্বনা দেবার মত মিথ্যে কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পুঁটিমাসী ভাল করেই চেনেন প্রমীলাকে। প্রমীলার ঘৃণা ও ভালবাসার তত্ত্ব ও স্বরূপকে ভাল করেই জানেন। শুধু একদিন দু'চোখের দেখার নেশায় জীবনে যাকে যার ভাল লাগলো, সব তেয়াগিয়া ঐ ভাল-লাগাটুকুই তাদের জীবনের করমে ভরমে অটুট বন্ধন হয়ে বেঁচে থাকবে। এর মধ্যে ভাঙাভাঙি ছাড়াছাড়ির কথাই আসতে পারে না। যদি আসে তবে সেই প্রবঞ্চিত জীবনকে মৃত্যু রূপেই মেনে নেওয়া উচিত। সেই জীবন্ত মৃত্যুকে ঘৃণা করে প্রমীলা।

পুঁটিমাসী একটু দ্বিধা করে আস্তে আস্তে বললেন—সুলেখাকে আবার ফিরিয়ে আনা যায় না যতী?

যতী—না মাসীমা, আমাদের বেহার কমিটির সেক্রেটারী ভরদ্বাজের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যাপারটাও বোধ হয় এতদিনে চুকে গেছে।

পুঁটিমাসী—ছি ছি!

যতী—কা'কে ছি-ছি করলেন মাসীমা? আমাকেই বোধ হয়?

পুঁটিমাসী বিচলিত হ'য়ে কাঁদ-কাঁদ চোখে যতীর কাছে এগিয়ে এলেন, আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন—কি বলছিস্ পাগল ছেলে! তোকে ছি-ছি করবো কেন?

যতী—তা হ'লে সত্যি করে বলুন কা'কে ছি-ছি করলেন? সুলেখাকে?

নিরুত্তর হয়ে রইলেন পুঁটিমাসী। যতী আবার হেসে বললো—বলুন।

পুঁটিমাসী--না, সুলেখাকেই বা দোষ দেব কেন? আমি কাউকেই ছি-ছি করছি না।

যতী--বুঝলাম, আপনি পৃথিবীর সবাইকে বোধ হয় ছি-ছি করছেন। যাক্, আমি এইবার যাই মাসীমা।

পুঁটিমাসী অনেকক্ষণ ধরে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। বার বার আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। কী ভয়ঙ্কর সত্য কথা ব'লে চলে গেল যতী! তাঁর হার্টের কষ্টকে সারা জীবন ধরে এত গুরুভার করে রেখেছে বোধ হয় এই একটা অস্ফুট ধিক্কার। পৃথিবীর প্রণয়-মিলনের নির্বোধ রীতিনীতির দিকে তাকিয়ে তাঁর অন্তর যেন সারাক্ষণ ছি-ছি করছে। নরেন মাষ্টার ও যতীর ভাঙাঘরের করুণতার দিকে তাকিয়ে তাঁর মন ছি-ছি করে ওঠে। সুলেখা, মঞ্জু ও মীনুর ঘরবাঁধার ছুতো আর ছলনার দিকে তাকিয়ে ছি-ছি করে ওঠে। সব চেয়ে বেশী ছি-ছি করে রজনীবাবুর প্রকাণ্ড আদর্শবাদের মূঢ়তার দিকে তাকিয়ে। আদর্শের খাতির নাকি মিলন হয়? মিলনের নাকি একটা আদর্শ আছে? ছি-ছি!

উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন পুঁটিমাসী। বুকের ভেতরে অস্বাভাবিক রকমের একটা বদ্ধ বেদনা টিপ্ টিপ্ করে তাঁর নিশ্বাসের ছন্দ নষ্ট করে দিল।

পরমুহূর্ত্তে ব্যস্তভাবে রজনীবাবুর ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন পুঁটিমাসী। রজনীবাবু শান্তভাবেই তাকিয়ে দেখলেন।

পুঁটিমাসী বললেন—একটা কথা বলতে এলাম।

—বলুন।

—যতী চলে গেল, প্রমীলা দরজা খোলেনি। আমিও যাচ্ছি, আর কখনো আসবো বলেও আশা করি না।

ধড়ফড় করে উঠে বসলেন রজনীবাবু—যতী চলে গেল কেন?

—একদিন যতীকে আপনি তাড়িয়েছিলেন, এবার আমার পালা। প্রমীলাই যতীকে তাড়ালো।

—কি অধিকার আছে প্রমীলার?

—তা জানি না। আপনি বুঝে দেখুন।

—আমি সব বুঝেছি। প্রমীলা পাগল হয়ে গেছে, কোন আদর্শের জন্য, কারও আদর্শের জন্য আজ আর ওর কোন দরদ নেই।

—আদর্শের দোহাই আর দেবেন না।

—কেন?

—বলুন দেখি, এত দুঃসাহস করে, নিজের ঘরবাড়ী বাপ-মায়ের মায়া উপেক্ষা করে প্রমীলাকেই বিয়ে করেছিলেন কেন ?

—সেকি আপনি জানেন না ? আদর্শের জন্য।

—ঠিক প্রমীলার মতই আর একটী বিধবা তরুণী সেদিন আপনার আদর্শের দলে ছিল। কই, তা'কে তো বিয়ে করেন নি! নিশ্চয় একটা কারণ ছিল, আজ বলুন দেখি, কি সেই কারণ ?

নির্বোধ বিস্ময়ে শুধু চোখ দু'টী নিষ্পলক করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন রজনীবাবু—আজ আপনি এসব কি-কথা বলছেন পুঁটুদি ? আজ যে এসব কথার কোন অর্থ হয় না।

—কোন কালেই এর কোন অর্থ ছিল না।

কথা কয়টী শেষ করে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন পুঁটিমাসী।

রজনীবাবু বিমূঢ়ের মত জনহীন দ্বারপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে বিব্রতভাবে যেন আবেদন করলেন—আপনি কি সত্যিই বুঝতে পারছেন না পুঁটুদি, আজ আর এসব কথার কোন অর্থ নেই ?

ক্রমশঃ

সোভিয়েট রাশিয়ায় নারী

সুপ্রভা রায়

সমাজতন্ত্রবাদের গোড়ার কথা সাম্য—তাই সমাজতন্ত্রবাদ জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে সমান চোখে দেখে, জনসাধারণের মধ্যে এই সাম্যবোধ উদ্বুদ্ধ করে। সমাজতন্ত্রবাদের এই মূলতত্ত্বকে মার্ক্সবাদীরা শুধু 'থিয়োরী'র কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ রাখেন নি; একে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতার দাবী জানিয়েছেন। নারী জনগণেরই একটী অবিচ্ছেদ্য ও বিশেষ অংশ। তাই নারীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি আমাদের সামাজিক প্রগতির মানদণ্ড। মার্ক্সীয় সাম্যবাদে এই স্বীকৃতি সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। তাই সমাজতন্ত্রবাদী ফুরিয়ার বলেন—"আধুনিক সমাজে নারীর স্বাধীনতার পরিমাণ সামাজিক সভ্যতারও মানদণ্ড।" 'সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং স্বাধীনতা' বুর্জোয়া বিপ্লবের বাণী। এই বাণী মানুষকে ধ্বংসমুখী সামন্ততান্ত্রিক সমাজের দাসত্বময় জীবন হ'তে উদ্ধার হ'বার পথ দেখিয়েছিল সত্য, কিন্তু সামাজিক শ্রেণী-সংগ্রামকে লোপ করতে পারেনি। সে-বিপ্লবের ফলে নতুন শ্রেণী, নির্য্যা-তনের নতুন উপায়, সংগ্রামের নতুন রূপ দেখা দিয়েছে। সোজা কথায় সে বিপ্লবে শ্রেণী-সংগ্রামকে আরো সহজ করে দিয়েছে। "ধর্মোন্মাদনা, শৌর্য্য, ও ভাবপ্রবণতাকে স্বার্থের হিসাবনিকাশের শীতল জলে এরা ডুবিয়ে মেরেছে। এরা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে বিনিময়-মূল্যের চোখে দেখে। অসংখ্য, অখণ্ডনীয়, সনদ-প্রাপ্ত অধিকারের স্থানে এরা প্রতিষ্ঠা করেছে অবাধ বাণিজ্য। এককথায়, ধর্ম ও রাজনীতির মুখোস দেওয়া শোষণের স্থলে এরা উলঙ্গ, নির্লজ্জ, প্রত্যক্ষ পাশবিক শোষণের ব্যবস্থা করেছে।" স্বার্থ বা নগদ পাওনা ছাড়া মানুষের মধ্যে আর কোন যোগসূত্র তারা রাখেনি। ঠিক এই কারণেই তারা নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অগ্রাহ্য করে, বৃহত্তর জগতে নারীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে নারীকে তারা দেখে উৎপাদনের যন্ত্রহিসাবে। নারীকে তারা ব্যক্তিসম্পত্তি মনে করে। পুঁজি ও ব্যক্তিগত মুনাফা দিয়ে পারিবারিক জীবনের বনিয়াদ তারা রচনা করেছে। বুর্জোয়া বিবাহ প্রকৃতপক্ষে নারীকে করে তুলেছে পরিবারের সম্পত্তি। নিজেদের এই প্রভুত্ব ও স্বার্থ বজায় রাখার জন্য বুর্জোয়া পারি-

বারিক জীবনের গুণগানে মুখর হয়ে উঠেছে। বুর্জোয়া সাহিত্যিক এবং কবিরা রান্নাঘরের পরিশ্রম বা বৈঠকখানার বিলাসের গৌরবগাথায় শতমুখ। শুধু বুর্জোয়া সামাজিক জীবনের গুণকীর্ত্তনেই এরা ক্ষান্ত হয়নি, বর্তমান সামাজিক জীবনের বিরুদ্ধে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার যে কোন প্রচেষ্টাকে নির্মমভাবে দমন করেছে এবং করছে। ইংল্যাণ্ডে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভোটাধিকার রাষ্ট্রিক-জীবনে সর্বসাধারণের প্রাপ্য নাগরিকের সুবিধা। এই সামান্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার প্রচেষ্টায় বুর্জোয়া ডেমোক্রেসী নারীর প্রতি পুলিশ-জুলুম করতেও লজ্জিত হয়নি। 'আইন ও ন্যায়ের' কথা তুলে নিজের বর্বরোচিত ব্যবহারকে পৃথিবীর চক্ষে সমর্থন করবার ব্যর্থপ্রয়াসও করেছে। মোট কথা, বুর্জোয়া সমাজে নারী শোষিত, নিপীড়িত জনসাধারণের একটি বিশিষ্ট অংশ। তার মুক্তিসংগ্রাম বর্ত্তমান শোষণ-নীতির উচ্ছেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শোষণমূলক সমাজের উচ্ছেদই তার মুক্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুলে দেবে।

অক্টোবর বিপ্লবের সার্থকতা এখানে—সোভিয়েট রাষ্ট্র শুধু কোটি কোটি উৎপীড়িত শ্রমিক ও কৃষককে জারের অত্যাচার ও বুর্জোয়া প্রভুত্বের কবল হ'তে রক্ষা করেনি, নারীকেও বুর্জোয়া সমাজের ক্লেদক্লিষ্ট জীবন হ'তে মুক্তি দিয়েছিল। শৃঙ্খলিত, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে নারী এই প্রথম এসে দাঁড়ালো। প্রথম পরিচয় হ'ল বৃহত্তর জীবনের সাথে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতার স্পর্শে নারী তার বিরাট দায়িত্বকে উপলব্ধি কর্‌ল। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আপনার প্রয়োজন অনুভব করল। স্বীয় কর্ম্মশক্তি বিকাশের এই অপূর্ব সুযোগকে গ্রহণ কর্‌লো। সোভিয়েট রাষ্ট্রও নারীর প্রতি তার কর্ত্তব্য হতে বিচলিত হয়নি। পুরুষের সাথে সমানভাবে স্বীকৃত হ'ল নারীর রাজনৈতিক ও আইন-অনুমোদিত অধিকার। সোভিয়েট সমাজ-ব্যবস্থা নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে মেনে নিল। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে ঘোষিত হ'ল—এক কাজে, এক বেতন। বুর্জোয়া পারিবারিক জীবনের উচ্ছেদ হল। ট্রটস্কির ভাষায় সেই পারিবারিক জীবন আলোবায়ুহীন কারাগার—তারই অন্ধকারে কৃষক শ্রমিক রমণী আজন্মমৃত্যু অমানুষিক শ্রমের দাসজীবন যাপন করত। সামাজিক ব্যবস্থার পতন হ'ল। মাতৃসদন, সাধারণ ভোজনাগার, শিশুসদন ইত্যাদি খোলা হ'ল। পুরুষের সাথে সমানভাবে রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখার মূলভিত্তি হিসাবে নারী বিবাহ-বিচ্ছেদ ও গর্ভপাতের অবাধ অধিকার পেল।

পৃথিবীর ইতিহাসে নারী এই প্রথম রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে আত্মশক্তি প্রকাশের সুযোগ লাভ করলো। রাশিয়ার নারী এই সুযোগকে অবহেলা করেনি—সোভিয়েট রাষ্ট্রের উত্তরবিপ্লব সংস্কৃতিই তার সাক্ষ্য। সোভিয়েট শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান সব কিছুই নারীর দানে সমৃদ্ধ। সেখানে এক নতুন নারীর সৃষ্টি হয়েছে। এরা পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে গৃহিণীরূপে নয়, সহকর্মিণীরূপে। নারীত্বের ঐশ্বর্য্যে এরা জগতের নারী সমাজের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। এই শৃঙ্খলমুক্তা সোভিয়েট নারীই মানবসভ্যতার ইতিহাসে অক্টোবর বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ অবদান।

সোভিয়েট নারীর ভাগ্যাকাশে আবার কাল মেঘ দেখা দিল। নারীর ভাগ্যচক্রের এই আবর্তন সোভিয়েট-ডেমোক্রেসীর অভ্যুদয় ও পতনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ডেমোক্রেসীর আওতায় আমলাতন্ত্র শক্তি সঞ্চয় করছিল। বিশ্ববিপ্লবের ব্যর্থতা, লেনিনের মৃত্যু, ট্রটস্কি প্রমুখ নেতৃবর্গের কারাদণ্ড, নির্বাসন, বা হত্যায় তা সুপ্রতিষ্ঠিত হল। সোভিয়েট ডেমোক্রেসীকে স্থানচ্যুত করে সেখানে স্থাপিত হ'ল ষ্ট্যালিনের আমলাতন্ত্র। ব্যুরোক্রেসীর প্রতিষ্ঠায় শুধু যে সোভিয়েট জনসাধারণ তাদের রাজনৈতিক অধিকারচ্যুত হ'ল তা নয়, রুশ নারীও একে একে বিপ্লবে অর্জিত অধিকারগুলিকে হারাতে লাগল। গোয়েবল্‌সের প্রথম "মাতৃত্বের আনন্দ" নিয়ে কলতান উঠলো। "কেবল বয়নশিল্পের কর্মী, ছাত্রসৈনিক বা ইঞ্জিনিয়ার বলে নয়, ভবিষ্যৎ জননী বলেই তরুণীকে সমাদর করতে হবে। একটী সন্তানের যে প্রসূতি, আটটী ভবিষ্যৎ শিশুর প্রসূতি হিসাবে তার মূল্য।" (প্রাভদা, ৭ই জুন, ১৯৩৫)। মাতৃত্বের দোহাই দিয়ে নারীকে আবার দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার চেষ্টা চললো। ১৯৩৭ সালের জুন মাসে নারীর গর্ভপাতের অধিকার রদ হল। শ্রমিক নারীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকারে ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর বসানো হ'ল। বুর্জোয়া পারিবারিক জীবনের পুনঃ প্রবর্তনার প্রচেষ্টা চললো। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে ব্যুরোক্রেসীর এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতি উগ্রতর হয়ে উঠেছে। জনযুদ্ধ (?) ১৯৪৩ সালে রাশিয়ার নারীকে ১৯১৪ সালের জারের রাশিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করতে বাধ্য করলো। সোভিয়েট রাশিয়ার নববিধান ১৯৪৩ সালের ২৭শে আগষ্ট টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া ও ২৩শে আগষ্ট বিলাতের সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয়। সে বিধানে প্রতিক্রিয়ার রূপ আরো স্পষ্ট। নববিধান জারীর বলে সোভিয়েট রাশিয়া কেবলমাত্র সহ-শিক্ষার উচ্ছেদ করেনি, নারীর স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রথা প্রচলনের ব্যবস্থাও করেছে। এই

নূতন শিক্ষাপদ্ধতির উদ্দেশ্য হবে নারীকে সুগৃহিণী ও সুমাতা করে তোলা। নরনারীর জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থার অর্থ অক্টোবর বিপ্লবকে অস্বীকার। ষ্ট্যালিনিষ্ট ব্যুরোক্রেসীর এই নববিধান ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের কম্যুনিষ্ট দলগুলির মনে সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থার যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্বন্ধে কতটা আশা বা আনন্দের সঞ্চার করেছে জানিনা, এ বিষয়ে তারা একেবারে নীরব। সোভিয়েট নারী যে আজ প্রগতির উল্টা পথে যেতে বাধ্য হচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ক্রীতদাসীর জীবন সোভিয়েট নারী যে ব্যুরোক্রেসীর চাপে আবার গ্রহণ করছে, সে কথা নতুন করে বলার দরকার হয়না। অক্টোবর বিপ্লবের অর্জিত সোভিয়েট নারীর স্বাধিকারগুলিকে পুরোপুরি স্বীকার করতে, বা বজায় রাখতে ষ্ট্যালিনিষ্ট ব্যুরোক্রেসী অপারগ। সোভিয়েট নারী যতই আমলাতন্ত্রকে নীরবে স্বীকার করে নেবে, ততই তার দাসত্বশৃঙ্খল কঠিনতর হয়ে উঠবে—একথা আজ বোঝা প্রয়োজন। ব্যুরোক্রেসীর পতন ও আন্তর্জাতিক বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সফলতার উপর নির্ভর করছে সোভিয়েট নারীর ভাগ্য। অন্যান্য দেশের নারীর আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও শৃঙ্খলমোচনের দাবীও তখনই নির্দ্ধারিত হবে।

জীবনমৃত্যুর কাহিনী

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

এসব লোকই উনিশ শতকে জন্মালে এ-সময়টাতে কেশব সেনের সভায় বা রামকৃষ্ণের বৈঠকে গিয়ে অবধারিতভাবে হাজির হত। নেহাৎ এটা ১৯৪৪ সাল, তাই গৌতম অফিস থেকে এসে চীনে ঔপন্যাসিক লিন্‌ইউ-টাং-এর *The Importance of Living* কেতাবটা নিয়ে বসে। বাজারের দুটো নিম্‌কি আর ঘরে-তৈরী এক কাপ চা টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখে চাকর রাত্রির রান্নায় মেতে ওঠে আর তার ফাঁকে সদ্য-মুক্ত কোনো ছবির গানের ইজ্জৎহানিতে লেগে যায়। গৌতমের চোখে চায়ের কাপটাও পড়ে না অনেক সময় আর কোনো সময়ই গানের কসরৎ কানে যায় না। চোখ তুলে যখন তাকায় গৌতম, জানালার আকাশের বা দেয়ালের ছবিটারই সেখানে ছায়া পড়ে। ধূয়ো তুলে তুলে কাপের চা একসময় জুড়িয়ে যায় কিন্তু গরম হয়ে উঠ্‌তে থাকে গৌতমের চোখ—তাড়াতাড়ি সে ছবি থেকে বই-এর উপর চোখ টেনে নেয় পাছে তা জলে ভিজে ওঠে। চীনে দার্শনিককে ছেড়ে হয়ত রবি-ঠাকুরের কবিতা আউড়ে চলছিল তার মনঃ "তুমি শুধু ছবি! এ জীবনে আমার ভুবনে কত সত্য ছিলে!" মনটাকে গলাধাক্কা দিতে চায় গৌতম। চায় চোখদুটোকে বই-এর কালো কালো হরফগুলো গেলাতে। কিন্তু তবু যেন চোখ দেখ্‌তে পায় ছবির ভেতর থেকে শর্ব্বরী হাস্‌ছে—তেম্নি ম্লান সুন্দর হাসি বেঁচে থাকতে যেম্নি হাসত সে। তেম্নি কোনো হাসির জীবন্ত একটা মুহূর্ত্তকে স্থির করে তুলে রেখেছে এ-ছবি। শর্ব্বরী থেমে গেছে—কিন্তু এগিয়ে চলেছে গৌতম। চলার মধ্যে থেকেও সে শর্ব্বরীর স্থিরতায় একটু জায়গা খোঁজে বারবার। আর বারবারই চোখ ভিজে ওঠ্‌তে চায়।

তেতে-ওঠা তেলে শব্জীর আওয়াজ আর গানের হুঙ্কারই যখন কানের কাছে পাত্তা পায় না, খুট্ করে দরজায় একটু শব্দ আর গৌতম কি করে শুন্‌বে। বল্লরী এগিয়ে এসে গৌতমের প্রায় চোখের উপরই ঝুঁকে পড়ে। চম্‌কে ওঠে গৌতম—শর্ব্বরী যে আস্‌তে পারে না এ-কথা মনে রেখেও কেমন একটু চম্‌কে ওঠে। চম্‌কে ওঠার পর অবাক্ হতে সুরু করে সে। হঠাৎ বল্লরী এসে

কেন উপস্থিত হল! শর্ব্বরীর মৃত্যুর পর আর গৌতম ওদের বাড়ি যায়নি—দরকার ফুরিয়েছে বলে নয়, শর্ব্বরীকে সাংঘাতিক মনে পড়বে তাই। কিন্তু না-যাওয়ার অনুযোগ জানাতে সুহাসইত ছিল, সে-ই আস্‌তে পারত, বল্লরী কেন?

একটা চেয়ার দেখিয়ে অত্যন্ত নিস্তেজ গলায় বল্‌লে গৌতম : "বোসো"—

তার আগেই বসবার চেষ্টা করছিল বল্লরী—গৌতমের কথায় হাসিতে একটু উজ্জ্বল হয়ে চেয়ারে বসে পা দোলাতে সুরু করলে।

"আপনি আর যান না যে আমাদের ওখানে?" মুখে একটা অদ্ভুত হাসি নিয়ে জিজ্ঞাসা করল বল্লরী।

গৌতমের কাছে অদ্ভুতই মনে হল বল্লরীর হাসিটা। এ-রকম, ঠিক এ-রকম হাসি কি বল্লরী আগে কোনদিন হাসতে পারত? গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে গৌতম বল্‌লে : "ভালো আছ তোমরা, মা ভালো আছেন?"

"মা আর কি করে ভালো থাকেন!" ঠোঁট টিপে বল্লরী খানিকটা শাসন করে আন্‌লে হাসি।

চুপ করে গেল গৌতম। গলাটা উঁচু করে দেয়ালের দিকে উদাস-মত তাকিয়ে রইল।

থম্‌থমে বিশ্রী একটা আবহাওয়া। তিব্বতের কোনো অন্ধকার নির্জ্জন মন্দিরে যেন ঢুকে পড়েছে বল্লরী—একটু আগে যেন কেউ অদ্ভুত কি মন্ত্রপাঠ করে গেল, তার হুম্‌-হুম্‌ শব্দ এখনও দেয়ালে বাজছে। ছুটে বেরিয়ে আস্‌তে চাইল বল্লরী এ-আবহাওয়া থেকে। জুতোর হিল ঠুকে মেঝেতে খুট্‌-খুট্‌ আওয়াজ ফুটিয়ে তুল্‌লে।

"নাঃ" তিব্বতী মন্ত্রের মতই শোনাল গৌতমের গলা—একটু ভয় নিয়েই বল্লরী তাকিয়ে রইল গৌতমের দিকে—"ভালো থাকা মুস্কিল!"—কথার শেষ অর্দ্ধেকটায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচল বল্লরী।

"দিদির ছবিটা এনলার্জ করিয়েছেন?" খুসী-খুসী গলায় বল্লরী জিজ্ঞাসা করলে।

"হুঁ" আবার তিব্বতী মন্ত্র।

"মা বল্‌ছিলেন একদিন আপনার কথা—দাদা বল্‌লেন অপিসের কাজে ভীষণ ব্যস্ত আপনি।"

আবহাওয়াটাকে ভেঙে নড়ে-চড়ে উঠ্‌ল গৌতম—চেয়ার ঘুরিয়ে দেয়ালের

দিকে পিঠ দিয়ে বসল। বল্লরীর মুখের দিকে সম্পূর্ণ চেয়ে বল্‌লে : "চা খাও ত তুমি ? চা খাও।"

"আপনি ?"

"খেয়েছি একটু আগে খানিকটা—জুড়িয়ে গিয়েছিল। খাবো আরেক কাপ।"

বল্লরীকে দেখেই গান থামিয়ে কান পেতেছিল সীধু—শর্ব্বরী এলেও তাই করত। চায়ের প্রস্তাবে সীধুর হাতে কেৎলী বেজে উঠ্‌ল।

গৌতমের প্রায় মুখোমুখি বল্লরী বসে আছে—চোখের উপর হাত বুলিয়ে নিচ্ছে গৌতম কখনো বা কপালের রগ টিপে ধরছে। ঘরের আসবাবের উপর চোখ বুলিয়ে আন্‌লে বল্লরী, তাতেও সময় কাটে না—বিশ্রী লাগে, একটু লজ্জাও পায় যেন। কেন সে য়ূনিভার্সিটির ক্লাশের পর সোজা চলে এলো এখানে—গৌতমের ফ্ল্যাটে ? আস্‌বে যে ক'দিন থেকেই ত ভাবছিল বল্লরী আর একথাও সে জানে এসে গৌতমকে এমনি একটা অবস্থাতেই দেখ্‌তে পাবে। হয়ত ভালো করে কথা বল্‌বেনা গৌতম, কথা বল্‌লেও দিদির কথায় ফেঁপে, ফুলে, গদ্‌গদ হয়ে উঠ্‌বে—সবই আগে থেকে আঁচ করে রেখেছিল। একটা বিশ্রী আবহাওয়া ধরে নিয়েই এসেছে সে এখানে। তবে আর খাম্‌কা লজ্জিত হয়ে উঠ্‌ছে কেন সে মনে মনে ?

"আপনি রোগা হয়ে গেছেন—" আবহাওয়াটায় বেসুরো বেজে উঠ্‌ল বল্লরীর গলা।

"রোগা ?" রোগা হাসি গৌতমের মুখে : "একটু বোধহয় হয়েছি।"

"ডাক্তার দেখিয়েছেন ? কোনো অসুখ-বিসুখ হয়ে থাকে যদি !"

"অসুখ আমার হবেনা—" অভিমানের মতো শোনাল গৌতমের কথাটা। অনেক রকম প্রশ্ন, অনেক কথা ভীড় করে আস্‌ছিল বল্লরীর মনে আর কথা বল্‌বার সুযোগও তৈরী হয়ে গেছে—গৌতম যখন চুপ করে থাকছে না, তবু নিজেকে একটু শাসন করে নিলে বল্লরী। মনে হল তার দু-এক মিনিট চুপ করে থাকা হয়ত ভালো।

চা দিয়ে গেল সীধু। কাপের কান ধরে একটু-একটু দুলিয়ে বল্লরী বল্‌লে : "আপনার পড়ার ব্যাঘাত করলুম অনেকক্ষণ—"

"চা খাও।" চায়ের কাপ মুখে তুলে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এল গৌতম।

"আপনি মনে-মনে বিরক্ত হয়েছেন—" গলাটা বল্লরীর বিষণ্ণ শোনাবার কথা কিন্তু শোনাল আব্দেরে।

"তোমাকে দেখে বরং ভালো লাগছে।" গৌতম চায়ে অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে পড়ল।

"ভালো লাগছে"—কথাটা কেমন একটা ভালো লাগিয়ে তুল্‌লে যেন বল্লরীর বুকের ভেতর। হাসিতে ফুরফুরে হয়ে উঠ্‌তে চাইল তার ঠোঁট—খুসীতে চোখ চিক্‌-চিক্‌ করে উঠ্‌ল।

"কি বই ওটা?" হাত বাড়িয়ে দিল বল্লরী বইটার দিকে—কভারের উপর নামটা পড়ে হাত সরিয়ে এনে বল্‌লে : "ও ব্বাবা—ফিলসফি!"

ঠোঁটে একটা স্তিমিত হাসি নিয়ে চেয়ারের উপর নিঝুম হয়ে রইল গৌতম।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বল্লরী আর দাঁড়িয়ে থেকেই দুপায়ে ভীষণ অস্থিরতা দেখাতে লাগল : "যাই আজ গৌতমদা—"

চোখ বুঁজে ফেল্‌ল হঠাৎ গৌতম—শর্ব্বরীর গলা শুনে মনে-মনে সে শিউরে উঠ্‌ল কি না বলা যায়না।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বল্লরী—সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় এসে নাম্‌ল—খানিক দূর হেঁটে ট্রাম-স্টপে গিয়ে দাঁড়াল কিন্তু সব সময়ই সে ভাব্‌ছিল গৌতমের মুখের 'ভালো লাগ্‌ছে' কথাটা। ফুলের বাগান থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ যেমন ফুলের কথা ভোলা যায়না কতকটা তেম্‌নি।

মায়ের প্রতি কোনদিনই মনোযোগী ছিলনা বল্লরী। নিজেকে নিয়েই এত ব্যস্ত থাক্‌ত যে সেখান থেকে ছুটি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আস্‌তে পারতনা। হঠাৎ যেন মাকে আবিষ্কার করল সে এখন। গুটি থেকে বাইরের রোদে ঝলমল করে বেরিয়ে এল প্রজাপতি।

বৌদির হাত থেকে মাকে কেড়ে নিয়ে এসে বলে বল্লরী : "রোজ তুমি স্নানও করনা, মা—আর বৌদি বল্‌লেন খাও না কি এই চাট্টি ভাত?"

মা-র চোখ ভিজে উঠ্‌তে চায়, বল্লরী-তে শর্ব্বরীকে দেখতে পান তিনি।

"তোমার আছে ঐ এক কান্না—কেঁদে কেঁদে কি অবস্থা করেছ চোখের, দেখেছ আয়নায়?" মায়ের চুলে চিরুণি চালাতে সুরু করে বল্লরী। সুস্থ থাক্‌লে অবাক হতেন মা, মুখ-গোমরা মেয়েটা তাঁর এত ছট্‌ফটে হয়ে উঠ্‌ল কি করে? এখন শুধু আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিলেন তিনি, এ-ও না শর্ব্বরীর মতই তাঁকে ফাঁকি দেয়।

মাকে বাথরুমে পাঠিয়ে বল্লরী এসে দাদাকে ধরে।

"তুমিও, দাদা, মাকে কিছু বলনা।"

সুহাস বল্লরীর মুখের দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে, বুঝ্‌তে পারেনা কি বল্‌ছে সে।

"আলনায় আর টেবিলে দিদির যত শাড়ি ব্লাউস্ জুতো বই জড় করে রেখেছেন মা—এগুলো চোখের উপর সাজিয়ে রাখলে মা আর সুস্থ হ'তে পারবেন কোনদিন ?"

এতগুলো কথা বল্লরীর মুখে সুহাস কোনদিন শোনেনি তাই অভিভূতের মতো একটু তাড়াতাড়িই বলে ফেল্‌লে : "বাক্সয় বন্ধ করে রাখাই ভালো, না ?"

"নিশ্চয়—" বুদ্ধিমানের ভঙ্গীতে বল্‌লে বল্লরী : "আর ওই ফটোগুলোও।"

এক-এক করে বল্লরী শাড়ি-ব্লাউস্-বইগুলো গুছিয়ে ট্রাঙ্ক-বন্দী করতে সুরু করলে—সুহাস উদাস চোখে বল্লরীর হাত অনুসরণ করে চল্‌ল। গুছোনো শেষ করে সোজা হয়ে বল্লরী দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই মা এসে ঘরে ঢুক্‌লেন। সুহাস হয়ত পালাবার উপক্রম করছিল, মা কিছু একটা আশঙ্কা করে জিজ্ঞেস করলেন : "কি রে ?"

"ওর জিনিষপত্তরগুলো ট্রাঙ্কেই রেখে দেওয়া হল—" কথাটা কোনরকমে শেষ করে সুহাস পালিয়ে বাঁচল।

মা আলনার দিকে তাকালেন তারপর তাকালেন বল্লরীর দিকে, যেন বুঝ্‌তে পারছেন না কোথায় এসে তিনি দাঁড়িয়েছেন।

"দিদির জিনিষগুলো—" একটু থেমে নিয়ে বল্‌লে বল্লরী : "ট্রাঙ্কে রইল—মা !"

চারপাশটা এতক্ষণে যেন চিন্‌তে পারলেন মা—জলে ভিজে উঠ্‌ল তাঁর চোখ। খুকীর মতো মাকে জড়িয়ে ধরলে বল্লরী : "সব সময়ই তুমি কাঁদবে—আমরা কি করে থাকি বলত মা !"

মায়ের কানে হয়ত করুণ শোনাল বল্লরীর কথাগুলো, চোখ মুছে নিয়ে বল্‌লেন তিনি : "আমার চোখ থেকে ওকে তোরা মুছে দিতে চাস্ মা !"

"যে নিজেকে মুছে দিয়ে চলে গেল, তাকে তুমি চোখে ধরে কতদিন রাখবে ?"

মা হয়ত বুঝতে পারলেন না বল্লরীর কথা, হয়ত বুঝতে চেষ্টা করলেন না—কিন্তু চুপ করে গেলেন তিনি। চুপ করে গেলেন কিন্তু চুপ করে গিয়ে শুয়ে থাক্‌তে পারলেন না। ভাত খেতে বস্‌তে হল তাকে—যা খেতে ভালো-বাস্‌তেন তিনি পাথরের বাটিতে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে চারদিকে।

"এক বেলা ত খাওয়া, দুটো ভাত মাত্র দাঁতে কেটে উঠে পড়বে ভেবেছ ?—" সামনে বসে বল্লরী শাসন করতে সুরু করলে মাকে।

মা ভাতগুলোর দিকে অপলক চেয়ে আছেন।

"চেয়ে আছ কি ! পেশোয়ারী আতপ—খেতে খারাপ লাগবেনা !"

মা দুঃখিতভাবে হাসেন।

"তুমি খেতে চাওনা ভাত—আর দুটি ভাত খেতে না পেয়ে কতো লোক চোখের উপর মরে গেল দেখ্‌লে ত !"

"খেতে পাই বলে মরণ ত আমাকে ছেড়ে দিলেনা !" মার মুখ আবারও পাঁশুটে হয়ে উঠ্‌ল। তরকারির একটা বাটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সরিয়ে নিয়ে এলেন হাত।

বল্লরী হাঁ-হাঁ করে উঠ্‌ল : "আলু-কপির ডালনা ঠেলে দিচ্ছ যে ? তুমি ত ভাব্‌ছ আজকালও কপি পাওয়া যায়—পাওয়া কি আর যায়না, নইলে তুমি খাচ্ছ কি করে ! পাওয়া যায়, কিন্তু দাম জানো ? এইটুকু একটা কপি দেড় টাকা।"

ডালনার বাটিটা হাতে তুলে নিয়ে মা বল্‌লেন : "এইটুকু কপি ?"

"এটুকু হবে কেন, আমাদের জন্যেও আছে !" গম্ভীর গলায় বল্‌লে বল্লরী।

থালায় ভাতগুলো নড়ে চড়ে উঠ্‌ল। এক পলক তাকিয়ে দেখে নিলে বল্লরী রক্তের আভায় মার মুখ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

আবার একদিন গৌতমের ফ্ল্যাটে এসে হাজির হ'ল বল্লরী। অফিস-ফেরতা গৌতম আজ আর বই-এ ডুবে নেই, বিছানায় চোখ বুঁজে নিঝুম হয়ে আছে। এ-ও তার একটা বাতিক। চোখ-বোঁজা নিঃসঙ্গ অন্ধকারে শর্ব্বরীকে খুঁজে পাওয়া যায়। ভেসে আসে শর্ব্বরীর অনেক হাসির টুক্‌রো, অনেকদিনের অনেক বিষণ্ণ মুখ—অনেক কথা, অনেক প্রতিশ্রুতি। সবটুকু শর্ব্বরীকেই পাওয়া যায় শুধু দেহের উত্তাপ ছাড়া।

সন্তর্পণে ত নয়ই, স্বাভাবিকেরও বেশি আওয়াজ করে বল্লরী এসে খাটের পাশে দাঁড়াল। চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল আগেই গৌতম, এখন শোয়া থেকে উঠে পা ঝুলিয়ে খাটের উপর বসে গেল। কোনো ভূমিকা না করেই খাটের অপর কোণায় সামান্য একটু জায়গা নিয়ে বসে পড়ল বল্লরীও। আর এ অবস্থাটার যাতে নড়চড় না হয়—খাট থেকে চেয়ারে গিয়ে আশ্রয় নেবার সময়

যাতে না পায় গৌতম, আলাপ সুরু করে দিতে চাইলে: "ঘুমোবার চেষ্টা করছিলেন, না?"

"না, এ সময়ে কেউ ঘুমোয়!" সলজ্জ দেখালে গৌতমকে।

"ভালো লাগছিল না বাড়িতে, ভাবলুম আপনার এখানে বেড়িয়ে যাই—" একটু থেমে নিলে বল্লরী: "আপনি ত আর যাবেন না কোনদিন আমাদের বাড়ি!"

"বিশ্রী লাগ্‌বে, তাই যাইনা!" বাইরের দিকে তাকিয়ে ব্যথিত মুখটা লুকোবার চেষ্টা করল গৌতম।

বল্লরী জুতোর গোড়ালি দিয়ে তাল ঠুক্‌তে লাগ্‌ল মেঝেতে—বাইরের দিকে তাকিয়েই গৌতম আবার বল্‌লে: "একদিন হয়ত এত বিশ্রী লাগ্‌বেনা, তখন যাব!"

"কিন্তু বিশ্রী লাগাটা যে পুষে রাখছেন আপনি!"

"ওকে ভুলে যেতে ইচ্ছা হয়না।"

"তবু ভুলে যেতে হয়।"

গৌতম কথা বললনা, একটা দীর্ঘশ্বাসে একটু দুলে উঠল তার শরীর।

"বাঃ, বেশ আপনি—" হঠাৎ কলরব করে উঠ্‌ল বল্লরী: চা খাওয়াতেও আজ ভুলে গেলেন!"

"চা খাবে?" বিছানা থেকে নেমে পড়ল গৌতম: "সীধু কোথাও গেছে হয়ত, এসে নিক্!"

"আমি করব চা? খাবেন ত আপনিও?"

"কর!"

"অনুরোধে খেতে হলে থাক্। দরকার নেই আমার হাঙ্গামা করবার।" বল্লরী উঠ্‌লনা, বসেই রইল।

একটা চেয়ারে বসে অন্যমনস্কের মতো গৌতম চেয়ে রইল বল্লরীর দিকে। শর্ব্বরীর বোন হলেও অনেক তফাৎ শর্ব্বরীর সঙ্গে এর। আগে মনে হত চেহারায়ও মিল নেই যখন গম্ভীর দেখাত বল্লরীকে—হাসিখুসীতে শর্ব্বরীর মতোই অবশ্যি দেখায় ওকে এখন তবু যেন কোথায় ঢের তফাৎ। কোথায় ঠিক খুঁজে বার করতে পারেনা গৌতম, তার মনে না কি বল্লরীরই মনে—কিন্তু মনে হয় তফাৎ আছে।

ম্লান মতো সুন্দর একটু হাসি নিয়ে বল্লরীও চেয়ে থাকে গৌতমের দিকে।

চায় যেন চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে শুশ্রূষা করতে গৌতমকে। গৌতমের রোগা, নীরক্ত মনের স্পর্শ অনুভব করে তার চোখ।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে যায় গৌতম। দেয়ালে শর্ব্বরীর ফটো-টার দিকে এক পলক তাকিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারপর পায়চারি সুরু করে।

বল্লরী কথা বল্‌তে পারেনা, হয়ত বল্‌তে চায়না কথা। মেঝের দিকে তাকিয়ে দাঁতের উপর একটা আঙুল ঘষতে থাকে।

রান্নাঘরে খুট্‌খাট্ আওয়াজ শোনা যায়। সীধু এসেছে। শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লরী উঠে পড়ে: "চা খাওয়াতে পারো সীধু?" রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায় বল্লরী।

"অ্যাঁ"—অবাক চোখে সীধু দরজায় এসে উঁকি দেয়।

"চা—" বল্লরী ফের বলে।

"পারব!" খানিকটা নিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে বলে সীধু।

আশ্চর্য্য, সীধুও কি ভুল করেছিল যেন শর্ব্বরীর গলাই শুন্‌ছে!

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ব্রাশ করছিল গৌতম। অনেকক্ষণ ধরে ব্রাশ করে চলেছে। আর অনেকদিন পর গুণগুণ করে একটা গানের সুর টেনে যাচ্ছে আগেকার মত।

কেবল বেঁচেই চলেনি গৌতম, দিনের পর দিন বেঁচে উঠ্‌ছে সে। অথচ একদিন ভেবেছিল শর্ব্বরী মরে গেলে তার বেঁচে থাকবার কোনো মানে নেই। মনকে মৃত্যুর হাতে সত্যি-সত্যি ছেড়ে দিয়েছিল গৌতম কিন্তু তাঁর জন্যে কি? শরীরের জীবন্ততা তাতে একটুও ম্লান হয়নি। এইত আয়নায় দেখতে পাচ্ছে সে তার মুখ। কুৎসিত নয়। চুলগুলো আগেকার মতোই রোমান্টিক। ভাসা-ভাসা চোখ, হয়ত ভালোই দেখ্‌তে। ধরতে গেলে আগেকার চেয়ে স্বাস্থ্য তার ভালোই হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ গুণ-গুণ বন্ধ করে আয়না থেকে মুখ সরিয়ে আন্‌ল গৌতম। হয়ত সে অন্যায় করেছে। অপরাধী হয়ে উঠছে শর্ব্বরীর কাছে। দেয়ালের ছবিটার দিকে তাকাল গৌতম। শর্ব্বরী! শর্ব্বরী দেখতে যেমন ছিল! যেমন ছিল ঠিক তেম্নি কি দেখাচ্ছে এই ছবিতে? ঠিক তেমন? একটা কুয়াশায় কি জড়িয়ে যায়নি এখানে শর্ব্বরী? কতগুলো রেখা, প্রাণহীন রেখা শর্ব্বরীর মতো হতে

চেয়ে ঠাট্টা করছে গৌতমকে, শর্ব্বরীকেও। ছবিটাকে দেয়াল থেকে খুলে আনল গৌতম, চোখের সামনে তুলে ধরল শর্ব্বরীর মুখ। শর্ব্বরীর মুখ? তাহলে একটু উৎসাহ, একটু কামনা, একটু রোমাঞ্চ কি হতনা গৌতমের? অনুভব করতনা একটু উষ্ণতা? সিম্বল! রক্তমাংসের মানুষের একটা নিরুত্তাপ সিম্বল মাত্র এ-সব ছবি! আর এতেই কিনা গৌতম উৎসুক ছিল এত! এর চেয়ে —আলমারি খুলে ক্বচিৎ-ব্যবহার্য্য কতগুলো জামাকাপড়ের পাশে রেখে এল গৌতম ছবিটা—এর চেয়ে বরং বল্লরীর সান্নিধ্যেও অনেকটা উৎসাহিত হওয়া যায়।

অফিসের ট্র্যাম ধরবার পথে বল্লরীর কথাই খানিকটা ভেবে নিলে গৌতম। প্রায়ই আসে বল্লরী। ওর সম্বন্ধে ধারণা ক্রমেই বদলে যাচ্ছে তার। শর্ব্বরীর মতো না হলেও দশপাঁচজন মেয়ের মতো ও নয়। পরিশীলিত ওর মন, এই ভাঙা যুগের মেয়েদের কাছে যা আশা করা যায় না।

অফিসের কাজে যেন নিজেকে আজ গৌতম সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে পারছিল না। কাজের পরিমাণ বিরাট না হলেও দায়িত্ব তার প্রচুর। ছোট হলেও একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সে—টাকা-পয়সা লেনদেনের সবচেয়ে সূক্ষ্ম ব্যাপার নিয়ে তার কারবার—টাকা না দিয়েও খুসী করে দিতে হয় লোককে, টাকা দিতে হলেও ব্যাঙ্ককে খুসী রাখতে হয় সবদিক থেকে। অন্যমনস্কতা নিয়ে এ কাজ অসম্ভব। গৌতম অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল, শর্ব্বরী বেঁচে থাকতে মাঝে-মাঝে যেমন হত। যেন শর্ব্বরী বেঁচে আছে আর তারই সঙ্গে কি একটা কাজ, কোনো একটা কথা পড়ে আছে—এ রকমেরই একটা বোধ খুঁচিয়ে চলছিল গৌতমের মনকে। তবু অপেক্ষা করলে সে অনেকক্ষণ, ঘড়ির কাঁটা চারের ঘর আসা অবধি। কিন্তু তারপর আর এক মিনিটও না। একাউণ্টেণ্টকে দু'একটা কথা বলে রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। একটা ট্যাক্সি সামনে পেয়ে ঢুকে পড়ল তার ভেতর, কোথায় যেতে হবে তখনও ভেবে দেখেনি সে। সত্যি, কোথায় যাবে সে? কোথায় কি কাজ আছে তার? কাজ নেই। মীটারের হাতল ঘুরিয়ে দিলে ড্রাইভার। "ভবানীপুর—" না ভেবেই বল্‌লে গৌতম।

ভবানীপুর কোথায় যাচ্ছে গৌতম? শর্ব্বরীদের বাড়ি? শর্ব্বরী নেই, তার সব চিহ্ন পড়ে আছে—সেই সাংঘাতিক আবহাওয়ায়? শর্ব্বরী নেই অথচ পাঁচটা না বাজতেই সে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এল! অদ্ভুত! অদ্ভুত হয়ে উঠছে সে দিনের পর দিন। বাইরে তার কোনো কাজই নেই অথচ ব্যাঙ্কে

সে থাক্‌তে পারল না! থাক্‌তে যে পারছিল না এ কথাটা কিন্তু মিথ্যা নয়। কিন্তু কেন? বল্লরীর জন্যে? বল্লরীর সঙ্গে ত দেখাশোনার কথা নেই আজ। তাছাড়া বল্লরীর জন্যে কি তার বেরিয়ে আসা উচিত?

এল্‌গিন রোডের মোড়ে এসেই গৌতম বল্‌লে: "বালীগঞ্জ।" তার চেয়ে বাসায় ফেরাই ভালো। নিরিবিলি শুয়ে শুয়ে কয়েকটা বিলিতি ম্যাগাজিনের পাতা উল্টোন-ও বা মন্দ কি? সীধুকে পাওয়া গেলে এক কাপ চা-ও হয়ত পাওয়া যাবে। আর দুঘণ্টা পরে যদি বল্লরী আসেই তাহলে আবার এক কাপ। চা-টা আজকাল একটু বেশি খাচ্ছে গৌতম। কেন? কে বল্‌বে কেন! সব 'কেন'-র জবাব দেওয়া যায় না।

ঘরে ঢুকে একটা শুক্‌নো হাসিতে ভরে উঠ্‌ল গৌতমের মুখ, অবাক হয়েও খুসী হয়ে উঠ্‌লে যা হয়। বল্লরী!

"আমি আস্‌ব তুমি কি করে জান্‌তে গৌতমদা?" পা দোলাতে দোলাতে বল্‌লে বল্লরী।

"জান্তুম—" গৌতম এগিয়ে এল।

"ভেবেছিলুম তোমায় অবাক করে দোব। সীধুকে বাজারে পাঠিয়েছি চপের মাংস কিনে আন্‌তে!"

সাধারণ কথা। তবু কথাগুলো শুন্‌তে এত ভালো লাগ্‌ল গৌতমের! ডবল সীটারে বল্লরীর পাশে গিয়ে বসে পড়ল সে। অফিসের সাজ-সজ্জা বদলে ফেলবার সময়টুকুও বুঝি নষ্ট করা যায় না।

হাসিতে চিক্‌চিক্ করছে বল্লরীর চোখ—ঠিক শর্ব্বরীর মতো নয়—তবু সুন্দর। হাসির রোদ গৌতমের মুখে-চোখে এসে পড়ছে। যে রকম হাসিতে সবচেয়ে সুন্দর দেখায় গৌতমকে, ঠিক তেম্নি হাসি তার ঠোঁটে আর চোখে।

"সীধু হয়ত আস্‌বে না এক্ষুণি, তবু দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছি—" বল্লরী উঠে গেল। ফিরে এলো। দশ সেকেণ্ড সময়। কিন্তু গৌতমের মনে হল যেন অনেকক্ষণ। প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত তার অনুভবে গড়িয়ে গড়িয়ে চল্‌ছিল। অন্যমনস্ক হয়ে থাকা যায় না। অন্যমনস্ক হতে গিয়ে একটা আঘাত খেয়ে যেন ফিরে এলো সে।

"ভালো করিনি?" গৌতমের গা-ঘেঁসে এসে বস্‌ল বল্লরী।

সম্মতিতে ঘাড়টা নাড়তে চাইল গৌতম। উষ্ণতায় ভরে উঠেছে তার বুক—শক্ত হয়ে গেছে যেন স্নায়ুগুলো। একটা হাত—বল্লরীর হাতই টেনে নিয়েছে সে

হাতের মুঠোয়। এই হাতের উষ্ণতাই কি অনুভব করছে গৌতম তার সমস্ত শরীরে?

নরম, ঝাপসা একটু স্পর্শ এসে গৌতমের মুখে লাগ্‌ল। এ রকম স্পর্শের সঙ্গে পরিচয় আছে তার, তবু মনে হল এ যেন নূতন। বল্লরীর চুল। নূতন গন্ধ, নূতন স্বাদ। মুখটা ডুবিয়ে দিলে গৌতম নূতন পাওয়া পুরোনো অন্ধকারে।

কথা ওদের ফুরিয়ে গেছে, কথা বলে চলেছে ওদের অনুভবগুলো। তাদের তৃপ্তি-অতৃপ্তির আশা-নিরাশার ক্ষণ নিয়ে বাঁচতে সুরু করেছে তারা। যে ক্ষণ-গুলোতে জীবনকে নিবিড় ভাবে পাওয়া যায়, জটিল গ্রন্থি থেকে আল্‌গা হয়ে খসে পড়ে জীবন আমাদের চোখের উপর, তারই উত্তাপ গৌতমের আর বল্লরীর দেহে। প্রাণের রমণীয়তা ফুল হয়ে ফুটে আছে তাদের চারপাশে, তাকে অনুভব করা যায়, চোখে দেখা যায়। তাইত হৃদপিণ্ডের এই অস্থিরতা, অসহ্য আনন্দে চোখের এই অন্ধতা।

সময় ঝরে পড়্‌ছে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে—তীব্র দ্রুততায়। স্তব্ধ হয়ে উঠ্‌ছেনা একটিও মুহূর্ত্ত এদের ঘিরে। সময় নেই—একটি মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করবার অবসর নেই। হিংস্র হয়ে উঠছে তাই গৌতমের স্তিমিত রক্ত—প্রতীক্ষা করবার সময় নেই। হিংস্রতার কাছে নিজেকে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ছুঁড়ে দেয় বল্লরী, জীবনকে নিঃশেষে ফুরিয়ে ফেলবার জন্যে যেন অধীর তার চোখ।

সে-চোখ থেকে গৌতম জীবন পান করে চলে—গাঢ়, ঘন, নিবিড় জীবন।

সন্ধ্যার পর বল্লরীকে বাড়ি ফিরতে দেখে উদ্বিগ্ন হলেন মা। চেহারাটাও ওর কেমন যেন শুক্‌নো, রোগাটে দেখাচ্ছে।

"আমারত নানা ভাবনা—" কাতর হয়ে মা বল্‌লেন: "সৈন্য-ফৈন্যের যা ঘোরাফেরা রাস্তাঘাটে!"

"লাইব্রেরীতে ছিলুম।" হাস্‌তেও ক্লান্তি বোধ করছিল বল্লরী।

মা আশ্বস্ত হলেন কিন্তু চুপ করে থাকতে চাইলেন না: "হাঁ রে, গৌতম আর একদিনও এলোনা আমাদের এখেনে?"

"দাদাকে জিজ্ঞেস করলেই পারো—"

"তোর সঙ্গেত ট্যামে-বাসে দেখা হ'তে পারে!"

"হলেও বা কি?"

"বল্‌তে ত পারিস আস্‌তে। খুকী নেই বলে কি আমাদের ও ভুলে গেল ?"

বল্লরীর স্নান করা দরকার—তারপর একটু ঘুম। স্নান করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে কিনা কে জানে, বাথরুমের ঠাণ্ডা মেঝেতে হয়ত এলিয়ে পড়তে চাইবে তার শরীর। ব্লাউস্ খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্লরী তোয়ালেটা টেনে নিলে।

গৌতম কিন্তু ঘুমিয়েই পড়েছিল। সীধু এসে বারবার উঁকি দিচ্ছিল—ঘুম ভাঙল কিনা। রান্না হয়ে গেছে অনেকক্ষণ—এমন কি আনাড়ি হাতে আধঘণ্টা খরচ করে চপও তৈরী করেছে কয়েকটা। চপের মাংস আন্‌তে দিয়ে বেশ ফাঁকি দিয়ে পালাল কিন্তু দিদিমণি !

গৌতমের জাগবার আর কোনো আভাসই যখন দেখা গেলনা নিরুপায় হয়ে সাধু তখন গলা ছেড়ে সঙ্গীত-চর্চ্চায় লেগে গেল। তন্ময়তায় কখনো হয়ত সীধু এমন বেসুরো চীৎকারই দিয়ে উঠেছিল যাতে মরা মানুষের স্নায়ুও লাফিয়ে উঠ্‌তে পারে। জেগে গেল গৌতম। জেগে ঘুমোবার আগের কথাগুলোই কুড়িয়ে নিল তার মন।

একেই হয়ত অমানুষিকতা বলে। বলা যায় অজগরের হিংস্রতা। একদিন এই হিংস্রতা শর্ব্বরীকে ধীরে ধীরে টেনে এনেছে গৌতমের হাতের মুঠোয়—গৌতমের আকর্ষণের কাছে অসহায়ের মতো শর্ব্বরী নিজেকে সমর্পণ করেছে ! এ আকর্ষণ তৈরী করে চলেছে পুরুষ কখনো বাইরের চেহারা দিয়ে, কখনো বা মনের শালীনতা দিয়ে আর কখনো মগজের সংস্কৃতি দিয়ে। মেয়েদের টেনে আন্‌বার জন্যেই এ আকর্ষণ। মানুষের ভাষায় তার নাম দিয়েছি আমরা ভালোবাসা। এই মোহ তৈরী করা সুরু হয়েছে গৌতমের শর্ব্বরীকে পেয়ে—শর্ব্বরী নেই কিন্তু তার জন্যে তার সক্রিয়তা থেমে যায় নি। চুম্বকের বলক্ষেত্রে টেনে এনেছে সে বল্লরীকে। বল্লরী নিরুপায়। গৌতমের আকর্ষণের কাছে নিরুপায়। তিনঘণ্টা আগে নিরুপায় বল্লরীকে সমস্ত দেহে অনুভব করেছে গৌতম।

কিন্তু গৌতম কি প্রকৃতির এই নিয়মের মধ্যেই জড়িয়ে থাক্‌বে ? তার উপরে উঠে আস্‌তে পারবে না কিছুতেই ? ধীরে ধীরে ত সে উপরেই উঠে আস্‌ছিল—ভালোবাসাকে অক্ষত, পবিত্র রাখতে চেষ্টা করেছে তার মন। এখনও তার মন থেকে পবিত্রতার স্পর্শ ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। মনে হয় শর্ব্বরীর উপর অন্যায় করেছে গৌতম, তার স্মৃতির উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে তিনঘণ্টা আগে। মনে-মনে ক্ষমা চায় সে শর্ব্বরীর কাছে। চোখ বুঁজে মনে করতে চায়

শর্ব্বরীর মুখ—নিখুঁত স্পষ্ট রেখায় সে-মুখ ভেসে ওঠেনা—স্মৃতি-শক্তিকে প্রাণপণে খুঁচিয়ে চলে গৌতম শর্ব্বরীর নির্ভুল আবহাওয়া ফুটিয়ে তুলবার জন্যে।

দুঃসাহসে এগিয়ে আসে সীধু, ডাকে : "ভাত দোব বাবু?"

জলের পর্দ্দায় ঘোলাটে চোখ নিয়েও মা আজকাল যেন একটু উৎসুক হয়ে তাকান বল্লরীর দিকে। ভীষণ অনিয়মিত হয়ে উঠেছে বল্লরীর চলা-ফেরা। হঠাৎ করে সে এত ভালো ছাত্রী হয়ে ওঠেনি যে লাইব্রেরীতে বসে সন্ধ্যা অবধি পড়াশুনো করবে—মা ত মেয়েকে ভালো করেই চেনেন! আর বাড়ি ফিরেও যে কি বক্‌বক্ করে সারাক্ষণ, মা তাতে অস্বস্তি বোধ করেও শঙ্কিত না হয়ে পারেন না। শর্ব্বরীও শেষটায় ঠিক এম্নি হয়ে উঠেছিল! ইস্কুলের কাজের শেষে গৌতমের সঙ্গে সমস্ত বিকেল কাটিয়ে আস্‌ত কোথায় কোথায়। ভালো লাগত না ব্যাপারটা তাঁর চোখে, তবু খানিকটা শান্তি তাতে ছিল যেহেতু তিনি সঠিক জানতেন শর্ব্বরী গৌতমের সঙ্গেই আছে। কিন্তু বল্লরীকে নিয়ে তিনি একেবারে অন্ধকারে। মেয়েকে জেরা করতেও সাহসে কুলোয় না অথচ নিশ্চিত তিনি বুঝ্‌তে পারছেন বল্লরী পড়াশুনোয় মেতে ওঠেনি।

শেষটায় মা ছেলের শরণ নেন।

"হাঁরে, বুলুর সঙ্গে তোর রাস্তায় ঘাটে কখনো দেখা হয়?"

"বুলুর সঙ্গে? মানে?" সুহাস তার বুদ্ধিমান চেহারাটাও বোকার মতো করে তোলে।

"দেখা ত হতে পারে যখন কলেজ থেকে ফিরে আসে!" ঘোলাটে চোখ নিয়ে অবোধ্যভাবে তাকিয়ে থাকেন মা।

"কি সব আবোলতাবোল বক্‌ছ—" সুহাস মার অসুস্থতার প্রশ্রয় দিতে চায় না। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

অগত্যা মাকে বল্লরীর কাছেই সাহস করে এগোতে হয়। গৌতমের প্রশ্ন আর এখন মনে আসে না। গৌতমের চেয়ে বড়ো সমস্যা তৈরী করে তুল্‌তে পারে যুদ্ধের সময়কার রাস্তাঘাট। তবু গৌতমই এক সময় মার মনে বড়ো সমস্যা হয়ে উঁকি দিয়েছিল, গৌতম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে এখন তিনি পিচ্ছিল পথের কথাই চিন্তা করে চলেছেন।

"একে ত ব্ল্যাক-আউটের জ্বালাতেই অস্থির তার উপর মিলিটারী লরী, সৈন্য" মা ভণিতা সুরু করেন। গলার স্বরটা তাঁর তখনো রোগীর মতোই শোনায়।

"যুদ্ধের সময় এত হবেই!" বল্লরী ফ্যান খুলে দিয়ে রকিং-চেয়ারে দোল খেতে লেগে যায়।

"হবে বলে খুসীতে হাততালি দিতে থাক্‌ব আমরা!" কথাটায় ধার আছে কিন্তু গলায় ততটা ধার নেই মার।

"খুসী বা হব কেন? আর দুঃখিতও বা কেন হ'তে যাব!" বল্লরীকে অবিশ্যি খুসীই মনে হচ্ছিল।

"এই যুদ্ধই এসেছিল আমাদের সর্ব্বনাশের জন্যে।" কথাগুলো অভিশাপের মতো করে উচ্চারণ করলেন মা। বল্লরী কথা বল্‌লে না, মুখ টিপে হেসে চল্‌ল।

"চোখকান আছে বলেই আমাদের দেখতে হয়,—নইলে আর কি!"

এবারও বল্লরী চুপ করেই রইল। রকিং চেয়ারের নয়, ভেতর থেকেই কেমন একটা দোলা লাগ্‌ছিল তার সমস্ত শরীরে—মনে হচ্ছিল ভীষণ হাল্কা হয়ে গেছে শরীর, আপনা থেকেই হাল্কা হয়ে গেছে, জোরজবরদস্তিতে নয়। হাসিটা আরো পরিষ্কার হয়ে উঠ্‌ল বল্লরীর ঠোঁটে।

"দেখ্‌তে হয় বলেই ত—নইলে যা-খুসী করতিস্ তোরা—" নির্বাষ্প ঝন্‌ঝনে গলায় কথাগুলো বলে ছট্‌ফট্ করেই যেন মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শর্ব্বরীকেও এ ধরণের কথা শুন্‌তে হত, দেখ্‌তে হত মার এ ধরণেরই চোখ। বল্লরী গুণগুণ্ করে একটা গানের সুর টান্‌তে সুরু করে।

প্রাণপণ যুদ্ধ করে চল্‌ছিল গৌতম শর্ব্বরীকে মনের উপর তুলে আন্‌তে। মনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল বল্লরী, তাকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে শর্ব্বরীকে খুঁজে বেড়াতে সুরু করেছে সে এখন। একটু-একটু ফিকে আভাসে কোথায় যেন দেখা যায় শর্ব্বরীকে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি পরিচ্ছন্ন করে তাকে আর কিছুতেই আনা যায় না। আনবে—একসময় প্রতিজ্ঞাও করেছিল গৌতম, জড়িয়ে ফেল্‌বে সে শর্ব্বরীকে তার সমস্ত অনুভূতির সঙ্গে। ছবিটা খুলে এনে আবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দিতে চেয়েছিল—ছবিটার দিকে অনেকক্ষণ ধ'রে নিবিড়ভাবে তাকিয়েও ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, ছবি থেকেও পালিয়েছে শর্ব্বরী, সত্যি-সত্যি পালিয়েছে। একটা বিশ্রী অস্বস্তিতে গৌতম ছবিটা লুকিয়ে ফেলেছে আবার।

এখন শুধু ঘরময় পায়চারী করে গৌতম। ফাঁকা থেকে আবিষ্কার করে নিতে চায় শর্ব্বরীকে—এ-ঘরে অনেকবার এসে গেছে শর্ব্বরী, অনেক কথা

বলেছে, হাসিকান্নায় দুলে উঠেছে অনেকগুলো মুহূর্ত্ত ঢেউ-এর মতো। এই ঘরে, ওই সোফায়, এখানে এ-বিছানায়। এখান থেকে পারবে না গৌতম শর্ব্বরীকে খুঁজে বার করতে? কিন্তু পারে না।

একটা বই কোলে নিয়ে গৌতম দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে যেখানে শর্ব্বরী নিজের ছবিটা ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। এ দেয়াল থেকে কি কোনো মুখ ফুটে উঠতে পারে না? চোখের স্নায়ুগুলো কি তার ভুলে গেল শর্ব্বরীর মুখের স্বাদ? গৌতমের সমস্ত রক্তে একটা ঝিমুনি আসে—বিষণ্ণ হয়ে ওঠে সে ধীরে ধীরে।

বল্লরীর আওয়াজ হয় ঘরে। চোখ তুলে তাকাতে ইচ্ছা করে না গৌতমের। চেনা আওয়াজ, চোখ না তুলেও জানে সে বল্লরী এসেছে।

তাতে কিছু এসে যায়না বল্লরীর। হাতের মোড়কটা খুল্‌তে খুল্‌তে দেয়ালের কাছে সে এগিয়ে যায়। তখনও দেয়ালের দিকেই চেয়ে আছে গৌতম, বল্লরীর দিকে নয়। জুতোর পাতার উপর দাঁড়িয়ে দেয়ালের হুকটাতে বল্লরী নিজের একটা ক্যাবিনেট সাইজের ফটো ঝুলিয়ে দেয়, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বলে: "তোমার অনুমতি কিন্তু নেওয়া হলনা গৌতমদা—"

ওখানে দাঁড়িয়েই হাস্‌তে থাকে বল্লরী—ফটোর হাসিটার মতোই সুন্দর পরিষ্কার হাসি।

গৌতমও ম্লানমতো একটু হাসিতে বিষণ্ণ করে তুলতে চায় মুখ, কিন্তু হাসিতে মুখটা তার উজ্জ্বলই দেখায়।

আধুনিক সাহিত্য

বাঙলা সাহিত্যে সুবোধ ঘোষের নাম অপরিচিত নয়। অল্প দিনের সাধনায় যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। স্বকীয়তা ও প্রতিভার শক্তিতে আবির্ভাবের মুহূর্ত্তেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। "ফসিল" গল্প প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল যে বাঙলা কথাসাহিত্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও শিল্পীমন দেখা দিয়েছে। বহুদিন থেকে বাঙলা কথাসাহিত্যে নানা ধরণের পরীক্ষা চলছিল—সুবোধ ঘোষের আবির্ভাব সে পরীক্ষাকে নতুন এক স্তরে এগিয়ে নিয়ে গেল।

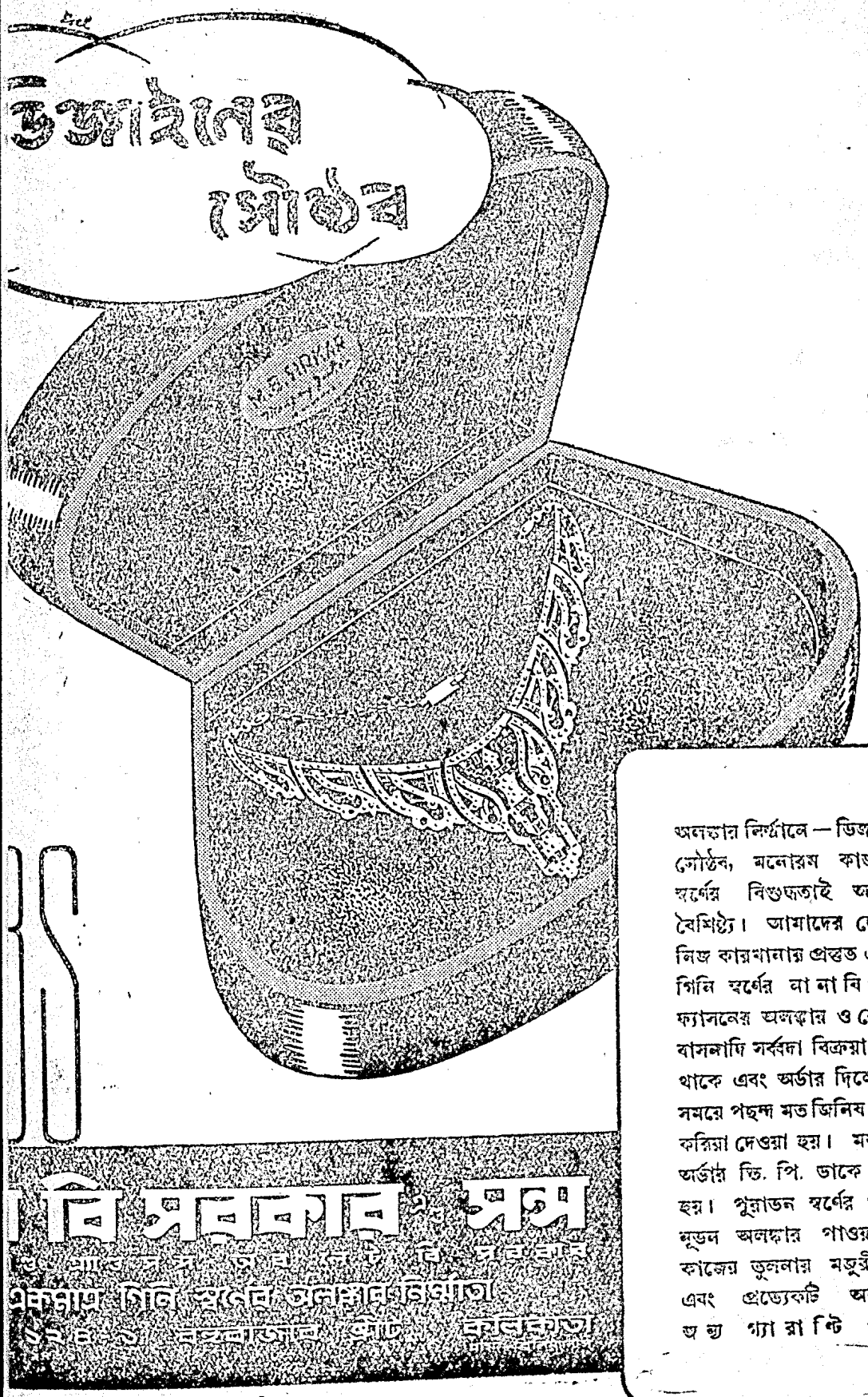
বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা কথাসাহিত্য ও উপন্যাসে প্রথম ইয়োরোপীয় ঢং আমদানী করেন। তাঁর চরিত্রগুলি তাই বহু ক্ষেত্রে রক্ত-মাংসের মানুষ হতে পারেনি, তাদের দেশ-কালও অনির্দ্দিষ্ট। দেশ কালচ্যুত অশরীরি আত্মার মত তারা কল্পনা রাজ্যের অধিবাসী। অবশ্য বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইলের মতন সামাজিক উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে এ কথা খাটে না—সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনার চেয়ে স্মৃতির উপরেই বেশী নির্ভরশীল।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে কিন্তু ছোট গল্প তেমন খোলে নাই। যে নাট্যরস ছোট গল্পের প্রাণ, বঙ্কিমের মধ্যে তার একান্ত অভাব। সেজন্য রবীন্দ্রনাথকেই বাঙলা ছোট গল্পের প্রথম সার্থক স্রষ্টা বলে মানতে হয়। কবির চোখে তিনি অভিজ্ঞতাকে দেখেছেন বলে অভিজ্ঞতার বিচ্ছিন্ন খণ্ডও তাঁর রচনায় পূর্ণতা পেয়েছে। খণ্ড অভিজ্ঞতাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেখাই বোধ হয় সার্থক ছোট গল্পের মর্ম্ম কথা। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের অপূর্ব্ব সাফল্যের ভিত্তি এইখানে।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প স্রোতস্বিনীর মত সহজগতি ও অবাধ ধারা। জীবনের কঠিন সমস্যাগুলিও তাই তাঁর রচনায় কবিত্বরসে দ্রব। সংঘাত ও দ্বন্দ্বকে তিনি অস্বীকার করেননি বটে, কিন্তু তাঁর রচনায় তাদের অস্তিত্ব ছায়াময় হয়ে উঠেছে। যে দ্বন্দ্বের ভিত্তি আবেগ ও কল্পনা, তারাই তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। বাস্তব সংঘাতে যে দ্বন্দ্ব, এবং তার ফলে জীবনের যে অপচয় ও ক্ষতি, রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে তার পরিচয় বেশী নাই।

রবীন্দ্রনাথের পরেও ছোট গল্প নিয়ে অনেক পরীক্ষা চলেছে—আজো চলছে। আবেগ ও কল্পনার দ্বন্দ্বের বদলে সামাজিক সংঘাতের ছবি আঁকবার চেষ্টাও হয়েছে। কখনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, কখনো সামাজিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে এ পরীক্ষা। বহু তরুণ সাহিত্যিকই এই দ্বন্দ্ব ও তার চিত্রণের মধ্যে নিজের সার্থকতা খুঁজেছেন।

সামাজিক দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত জীবনে কি ভাবে প্রতিফলিত হয়, তার রহস্য সন্ধান সুবোধ ঘোষেরও প্রধান সাধনা। তাই তাঁর প্রথম রচনার মধ্যেই ব্যক্তি ও সমাজের ঘাতপ্রতিঘাতের ছবি স্পষ্ট। "ফসিল" যে এত ব্যাপকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, শ্রমিক-ধনিকের সংঘর্ষ তার



অলঙ্কার নির্ম্মাণে—ডিজাইনের সৌষ্ঠব, মনোরম কাজ এবং স্বর্ণের বিশুদ্ধতাই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমাদের দোকানে নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ হালফ্যাসনের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার দিলেও অল্প সময়ে পছন্দ মত জিনিষ তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। মফঃস্বলের অর্ডার ভি. পি. ডাকে পাঠান হয়। পুরাতন স্বর্ণের পরিবর্ত্তে নূতন অলঙ্কার পাওয়া যায়। কাজের তুলনায় মজুরী সুলভ এবং প্রত্যেকটি অলঙ্কারের জন্য গ্যারান্টি থাকে।



খোঁপা করু, এলোচুল, কী তোমার
এলো করু খোঁপা, তুমি রাখ যাদুম

কেশবিন্যাস বিষয়ে অ
ভিন্নমত হইতে পারেন,
কেশতৈল কিনিবার
ভুলিবেন না যে আ
দরকার কেবল……





বাথগেটের
পুরাসিত
ক্যাষ্টর অয়েল

নকল হইতে সাবধান

Bathgate & Co.

CHEMISTS CALCUTTA

অন্যতম হলেও প্রধান কারণ নয়। শ্রমিক-ধনিকের সংঘর্ষ নিয়ে আরো বহু গল্প লেখা হয়েছে, কিন্তু পাঠকেরা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সে সব গল্প-লেখক ও গল্পের নাম পর্য্যন্ত ভুলে যায়। "ফসিলের" সার্থকতার প্রধান কারণ এই যে শ্রমিক-ধনিকের যে সামাজিক দ্বন্দ্ব, ব্যক্তি সম্বন্ধের মধ্যে তা মানবিক রূপ পেয়েছে। "যাযাবর" গল্পটী বোধ হয় এ হিসাবে সুবোধ ঘোষের কলাকৌশলের অতুলনীয় নিদর্শন।

ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক বা বাস্তব সংঘাতকে রূপায়িত করবার যে কৃতিত্ব, তার জন্য সুবোধ ঘোষের ভাষাও অনেকখানি দায়ী। তাঁর শব্দভাণ্ডার ব্যাপক ও স্বকীয়, তাঁর বাক্য রচনা পদ্ধতি বিশিষ্ট, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের রূঢ়তাকে ভাষায় দীপ্যমান করে তুলবার শক্তিও অসাধারণ। বহুক্ষেত্রে তাঁর ভাষাকে কবিত্বপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু জীবনের রূঢ় অভিজ্ঞতাকেও ভাষার মুন্সিয়ানায় তিনি রসবস্তু করে তুলেছেন। ইংরাজিতে যাকে বলে অ্যাটমসফিয়ার—সেই পরিবেশ সৃষ্টির কৌশল তিনি জানেন।

"তিলাঞ্জলীর" বিষয়বস্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সাধনা। পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাঙলাদেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী জীবন হারিয়েছে—যারা বেঁচে আছে, তাদের মধ্যেও সে মন্বন্তরের বিষক্রিয়া স্পষ্ট। বিমূঢ়তা ও নির্লজ্জ লোভের এমন তাণ্ডবলীলা ইতিহাসে বেশী মেলে না—অথচ পরাধীনতার নাগপাশে জাতি এমনভাবে বদ্ধ যে সে কথাও স্পষ্ট করে বলতে সাহস নাই। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সবচেয়ে বড় গ্লানি মনুষ্যত্বের পরাজয়। যাঁরা তরুণ, যাঁরা আদর্শবাদী—তাঁরাও যে কি ভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে সে কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। "তিলাঞ্জলী" সেই আদর্শচ্যুতি ও বিভ্রান্তিকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করেছে, কিন্তু মনুষ্যত্বের পরাজয়কে মানে নাই। তাই সেই অবসাদ ও অপমানের মধ্যেও যারা মানবতার জয়গান গেয়েছে, মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করেও জীবনকে জয়যুক্ত করবার সাধনায় সর্ব্বস্ব পণ করেছে, "তিলাঞ্জলী" তাদেরই স্মারক। সমসাময়িক ঘটনার বিবরণে আবেগ তীব্র হতে বাধ্য—"তিলাঞ্জলী"তেও আমরা সেই আবেগের শক্তি সর্ব্বত্র অনুভব করি।

"তিলাঞ্জলী"র গল্পাংশ সরল ও অব্যাহত। গল্পের চেয়ে কিন্তু চরিত্রসৃজনই উপন্যাসকারের প্রধান লক্ষ্য। সেদিক থেকেও সুবোধ ঘোষের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। শিশির, সীতা, জয়ন্ত, অবনী—এরা সকলেই চরিত্রবৈশিষ্ট্যে স্বকীয়। গল্প অথবা চরিত্রচিত্রণের চেয়েও কিন্তু মনে বেশী দাগ কাটে ঘটনার ছোট ছোট সমাবেশ। পরিবেশ রচনায় সুবোধ ঘোষের কৃতিত্বের কথা আগেই উল্লেখ করেছি—এ রকম ছোট ছোট ঘটনায় সে শক্তি পরিপূর্ণ বিকাশ পেয়েছে। বিপিন ও তার স্ত্রীর পুনর্মিলন, সীতার জন্মদিনের ভোজসভা—এ সমস্ত ছবিগুলি যেমন জীবন্ত, তেমনি অন্তর্দৃষ্টির সাক্ষ্য। শেষ অধ্যায়ের যে সুর, মনের মধ্যে বহুক্ষণ ধরে তার রেশ বাজে; দেশের বিপুল জনসাধারণের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে ইচ্ছা হয়, 'ভয় নাই, আমরা আছি।' বর্ত্তমানের সমস্ত দৈন্য ও পরাজয়ের মধ্যেও এই বিশ্বাস ও ভরসার সুর "তিলাঞ্জলী"কে দীপ্ত করে তুলেছে।

হুমায়ুন কবির

তিলাঞ্জলী—সুবোধ ঘোষ। এম, সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স। ৩৷৷০

সঙ্গীত

সঙ্গীত ও সমাজ

আমরা সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক গালভরা আলোচনা করি কিন্তু সমাজের সঙ্গে সঙ্গীতের সম্পর্ক কখনও তলিয়ে দেখি না। বস্তুত, সমাজের সহিত সঙ্গীতের কি ধরণের সম্পর্ক বিদ্যমান, সমাজবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেরও রূপ বদ্‌লায় কিনা, আজকের দিনে সমাজ-মানসে বৈপ্লবিক ভাবধারার যে-তরঙ্গ দেখা দিয়েছে তার অভিঘাতে সঙ্গীত নতুন পথে চালিত হবে কিনা সে সব জিনিষ ভেবে দেখা দরকার। শুধু টেক্‌নিক্যাল আলোচনাই সব নয়; সঙ্গীতের সামাজিক দিকটাকেও আলোচনার বিষয়ীভূত করে নেওয়া উচিত।

এটা দেখা গেছে, যে-যে পথ ধ'রে সভ্যতা ক্রমে এগিয়ে চলেছে অন্যান্য শিল্পকলার ন্যায় সঙ্গীতকেও সেই সেই পথ ধ'রে অগ্রসর হ'তে হয়েছে। সভ্যতা-বিকাশের প্রাথমিক অবস্থায় সমাজের যে-চেহারা ছিল তখনকার সঙ্গীতের মধ্যে সেই চেহারারই প্রতিফলন দেখতে পাই। সভ্যতার অবয়ব যতোই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর আকার প্রাপ্ত হ'য়ে চলেছে, সঙ্গীতও সেই অনুপাতে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর দেহ প্রাপ্ত হচ্ছে। যে-যুগে সমাজ প্রথমে হাঁটি-হাঁটি পা-পা ক'রে চল্‌তে শিখেছিল সেই যুগের সঙ্গীত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তারও তখন হামাগুড়ির অবস্থা। এ না হ'য়ে যায় না। সাহিত্য বল, সঙ্গীত বল, চিত্রকলা বল—এরা প্রত্যেকেই জাতীয় সংস্কৃতির এক একটা দিক। আর সেই সংস্কৃতি হ'লো সভ্যতার ওপরকার গাঁথুনি, অর্থনৈতিক শ্রেণীদ্বন্দ্ব যার ভিত্তি। শ্রেণীর দ্বারা শ্রেণীর শোষণের ইতিহাস যে যুগে যেভাবে বদ্‌লেছে সেই যুগে সেইভাবে তার সংস্কৃতিরও ভোল বদ্‌লেছে। সংস্কৃতির অন্যতম শাখা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যতিক্রম ঘটবার কোন কারণ ঘটে নি। যে কোন শিল্পকলার বিবর্তনের ইতিহাস যে সমাজবিবর্তনের ইতিহাসের ওপর নির্ভরশীল এ আজ পরীক্ষিত সত্য।

এবার সমাজবিবর্তনের বিভিন্ন অধ্যায়গুলি পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্। আমরা চ'লে যাই মানবসভ্যতার সেই আদি যুগে যখন গুহাবাসী মানুষ গুহা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখ্‌লো অপরূপ রহস্যে মায়াময়, বিচিত্র বর্ণজালে রঙীন পৃথিবী অপরিসীম বিস্ময়ের ডালি নিয়ে তার সম্মুখে প্রসারিত! আদিম মানুষ নিসর্গ শোভা দুইচোখ ভ'রে পান করলো; প্রকৃতির বিচিত্ররূপ তার মনে নেশা ধরিয়ে দিলো। সে অবাক হ'য়ে দেখলো বাজের কড়াক্কড় শব্দে আকাশ প্রায় চৌচির হবার যোগাড়, ঝড়ের দাপটে গাছের ডাল হুড়্‌মুড় ক'রে ভেঙ্গে চারিদিক প্রকম্পিত

ক'রে তুল্‌ছে। তার মুখে তখনও আধো আধো ভাষা, অথবা ভাষা একেবারেই ফোটে নি। কী ঘটেছে তা সে ভালো ক'রে প্রকাশ ক'রে বল্‌তে পারে না; শুধু বজ্রনির্ঘোষ কিম্বা শাখা-পতনের শব্দ মুখে অনুকরণ ক'রে যা ঘটেছে তার আভাস দিতে পারে মাত্র। এই ধ্বন্যাত্মক ইঙ্গিত থেকেই একদা মুকুলিত হ'য়ে উঠ্‌লো সঙ্গীত। মোক্ষমূলর কথিত Bow-vow অথবা Ding-dong তত্ত্বের মূল অই আদিম সঙ্গীতের মধ্যেই নিহিত। কিন্তু সে সঙ্গীতকে নামেই মাত্র সঙ্গীত বলা যায়; আজকের সূক্ষ্মতন্তু সুরের জালের তুলনায় সেই সঙ্গীত কতকগুলি স্থূল স্বরের প্রকম্পন-বিকম্পন ছাড়া আর কিছু ছিল না। মানবসভ্যতা যতোই এগিয়ে চল্‌লো সুরও ততো মার্জিত হ'তে লাগলো। হ'তে হ'তে আজকের পরিশীলিত সুচিক্কণ অবস্থা সে প্রাপ্ত হয়েছে। এই পরিশীলিত রূপই সঙ্গীতের চরম রূপ নয়। সঙ্গীতের সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্যময় বিকাশ এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সেই সম্ভাবনা একদা রূপ পাবে এই অতি সঙ্গত আশা প্রত্যেক প্রগতিশীল মনে আজ ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌ছে।

সমাজবিকাশের প্রাথমিক স্তরে মানুষ যখন গোষ্ঠীবদ্ধ অবস্থায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বিচরণ ক'রে ফিরতো, তার আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকামনা গোষ্ঠীবদ্ধ সঙ্গীতের মধ্যেই রূপ পেয়েছিল। সঙ্গীতের ব্যক্তিগত রূপের কথা কেউ তখন ভাব্‌তেও পারতো না। Caudwell-এর Illusion and Reality বইতে সেই যুগের Group dance ও Group song এর কথা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। মানুষ যখন যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ ক'রে কৃষিবৃত্তির তাগিদে এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করলো তখনও দেখি মিলিত সঙ্গীতের কলরব। সে যুগের ফসল-কাটার গানগুলি যূথবদ্ধ মনের যূথবদ্ধ সঙ্গীতপ্রয়াস—ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যে সঙ্গীতকে অবলম্বন করা যেতে পারে সে কথা তখন প্রায় অভাবিত ছিলো। যৌথ সমাজের গঠনে যখন থেকে ভাঙন দেখা দিলো, গোষ্ঠী বিভক্ত হ'য়ে আলাদা আলাদা পরিবার তৈরী হ'তে লাগলো, তখন কলরবও চৌচির হয়ে অর্ধস্ফুট কাকলিতে পরিণত হ'লো—গগনবিদারী শব্দ অস্পষ্ট হ'তে হ'তে শেষে মৃদুগুঞ্জনে এসে স্থিতি লাভ করলো।

আর্যরা যখন ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করেন তখন তাঁরা যে-সঙ্গীত সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন আজিকার সপ্তস্বরবিশিষ্ট সঙ্গীতের সঙ্গে তার অল্পই সাদৃশ্য আছে। আর্যদের সঙ্গীতে মাত্র তিনটি স্বরের দেখা মেলে—ঋগ্‌বেদের স্তোত্রগুলি সেই তিনটি স্বরের সাহায্যেই শুধু উদ্‌গীত হ'তো। কিন্তু স্বরসংখ্যা স্বল্প হ'লেও আর্যদের গানের আবেদন ছিলো গভীর। কেন না তার পেছনে ধর্মের প্রেরণা ছিলো। স্তোত্রগুলি যখনই গাওয়া হ'তো একটা শান্ত, সমাহিত, সৌম্য আবহাওয়া চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে যেতো। কাজেই তিন স্বর আজকের দিনের সাত স্বরের প্রভাবকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো আবেদনের দিক থেকে। তারপর আস্তে আস্তে আর্যরা যখন এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন, স্থিতিশীল অচঞ্চল আশ্রমিক আবহাওয়ায় গ'ড়ে উঠ্‌লো 'ব্রাহ্মণ' ও 'উপনিষদ' নামক সংহিতাগুলি। স্তোত্র ও মন্ত্রের সুর আরও বেশি সঙ্গীতময় হ'য়ে উঠ্‌লো; সুরের বিকাশে নিত্য নতুন অলঙ্করণ প্রশ্রয় পেতে লাগ্‌লো। রামায়ণ, মহাভারত যখন রচিত হ'লো তখন সঙ্গীত আরও বেশি সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। অতো বড়ো

রামায়ণ তা-ও আগাগোড়া সুরে গাওয়ার নিয়ম ছিল। লবকুশ শ্রীরামচন্দ্রকে রামায়ণ গান ক'রে শুনিয়েছিলো একথা কে না জানে? এইভাবে সঙ্গীতের বিকাশ হ'তে হ'তে তিন স্বর সপ্ত স্বরে এসে পরিপূর্ণতা লাভ করলো—সঙ্গীত-বিজ্ঞানে 'সপ্তক' নামক বস্তুটির দেখা আমরা পেলাম। সার উইলিয়াম হাণ্টারের মতে পাণিনির অভ্যুদয়ের পূর্বেই (খৃষ্টপূর্ব ৩৫০ সাল) এ দেশে স্বরসপ্তক আবিষ্কৃত হয়েছিলো এবং 'সা' 'রে' 'গা' 'মা' কথাগুলির উৎপত্তি তখন থেকেই।

আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সমাজে সঙ্গীত ওতঃপ্রোত ভাবে ধর্ম্মের মহিমার সঙ্গে জড়িত ছিল এই কথাটি বোঝাবার জন্যেই ওপরের অতগুলি কথা বলা। এ না হ'য়ে উপায় ছিলো না। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের কাঠামোটাই ছিল আগাগোড়া ধর্মীয়, কৃষিজীবিকার অপরিহার্য ফল অচঞ্চল স্থিতিশীল মনোভাব ও নিরুদ্বেগ শান্তি সেই ধর্মবোধকে আরও বেশি উদ্দীপিত করেছিল এ কথা সহজেই বোঝা যায়। ধর্মকে কেন্দ্র ক'রেই আমাদের প্রাচীন সঙ্গীত বিকশিত হ'য়ে উঠেছিলো এ তত্ত্ব তা হ'লে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। আর শুধু আমাদের দেশ কেন, যে কোন দেশের প্রাচীন সঙ্গীত আলোচনা করলে আমরা বুঝ্‌তে পারবো তার প্রেরণা মূলত ধর্মীয়। এ কথা প্রাচীন হিব্রু সঙ্গীত, গ্রীক সঙ্গীত সম্বন্ধে যেমন খাটে, প্রথম যুগের খৃষ্টানদের সঙ্গীত সম্বন্ধেও তেমনি খাটে। গির্জায় সঙ্গীতের প্রচলন হয় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষাশেষি। আর মধ্যযুগে ত ইউরোপের লোকেরা সঙ্গীত বল্‌তে ধর্মসঙ্গীতকেই শুধু বুঝ্‌ত।

সঙ্গীতের এই ধর্মীয় প্রেরণার ফলেই আমাদের দেশে ধ্রুপদের উৎপত্তি। আমাদের দেশের প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদিয়া ধর্মাত্মা ছিলেন এ কথা ঐতিহাসিক সত্য। আলাউদ্দিন খিলিজির সময়কার বিখ্যাত গায়ক বৈজু বাওরা, গোপাল নায়ক প্রভৃতি সকলেই ধর্মপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন ব'লে জানা যায়। তানসেনের গুরু স্বামী হরিদাস তো অধ্যাত্ম সাধনাতেই চিরটা জীবন অতিবাহিত ক'রে গেছেন। এমন কি স্বয়ং তানসেনও উত্তীর্ণযৌবন অধ্যায়ে ধর্মভাবদ্বারা গভীর ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে। ধ্রুপদ গানের উদাত্ত গম্ভীর স্বর ও নিরলঙ্কার স্বরক্ষেপের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা আছে, ভালো ধ্রুপদ গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই একথা মান্‌বেন। রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদের কাঠামোতে শতশত ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা ক'রে গেছেন বোধ হয় এই কারণেই। অপেক্ষাকৃত বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যযুক্ত খ্যাল গান—যা আজ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তার আপন বিশিষ্ট স্থান প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিয়েছে—ধ্রুপদের আধিপত্যের যুগে একেবারেই অপাংক্তেয় ছিলো। আলাউদ্দিন খিলিজির সভাগায়ক আমীর খস্রু খ্যাল গান আবিষ্কার করলেন বটে কিন্তু তাকে গায়কদের মধ্যে চালু করতে পারলেন না। খ্যাল গানের সুরবৈচিত্র্য ও চটুলতা সঙ্গীতের ধর্মভাবকে নষ্ট করবে এই আশঙ্কায় ওস্তাদরা খ্যালের প্রতি বিমুখ হ'য়ে রইলেন। পরে অবশ্য তাঁদের এই বিমুখতা ভেঙেছিল সদারঙ্গ ও অদারঙ্গের চেষ্টায়। কিন্তু সে বহু পরবর্তী সময়ের ঘটনা।

প্রথম অবস্থায় খ্যালের প্রতি ওস্তাদদের এই যে বিমুখতা ছিল তার শুধু একটিমাত্র মানেই হয়। সে-মানে হচ্ছে এই যে খ্যাল গানের গড়ণের মধ্যে ঐহিক ভোগতৃষ্ণা যে পরিমাণে বলবতী ছিলো অধ্যাত্মপ্রেরণা ঠিক সেই পরিমাণে দুর্বল ছিলো। ঠিক সেই কারণেই

পার্থিব সুখভোগপরায়ণ মুঘল বাদ্‌শাদের যুগে খ্যাল আস্তে আস্তে আপন প্রতিপত্তি বিস্তার করতে লাগ্‌লো আর ধ্রুপদও সেই অনুপাতে ধীরে ধীরে পেছনে স'রে যেতে আরম্ভ করলো। অবশ্য, আকবর বাদ্‌শার আমল পর্যন্ত এই পরিবর্তন প্রক্রিয়া তেমন প্রকট হ'তে পারে নি, কিন্তু তার পর থেকেই ধ্রুপদের বিশুদ্ধি ক্রমশঃ নষ্ট হ'য়ে খ্যালের পথ সুগম হ'তে লাগ্‌লো। তানসেন যে ধ্রুপদ গাইতেন তা ছিলো 'শুদ্ধবাণী' ধ্রুপদ,—ধীর স্থির গম্ভীর তার রূপ। কিন্তু তানসেনের তিরোভাবের পর অপেক্ষাকৃত চটুল 'খাণ্ডারবাণী' ধ্রুপদ আসর জুড়ে বস্‌লো এবং এইভাবে খ্যালের প্রতিপত্তির পথ প্রস্তুত ক'রে দিলো। ওস্তাদরাও মুঘল বাদ্‌শাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এবং সম্ভবত বাদ্‌শাদের প্রত্যক্ষ উৎসাহদানের ফলেই ধ্রুপদ ছেড়ে খ্যালের দিকে মনোনিবেশ করলেন। ধ্রুপদ গৌরবের আসন থেকে বিচ্যুত হওয়াতে খ্যাল ধীরে ধীরে সেই জায়গা দখল ক'রে বস্‌লো। ক্রমে খ্যালের বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ধ্রুপদের শ্বেতশুভ্র পবিত্রতাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করলো। সদারঙ্গ অবশ্য টিমা খ্যাল আবিষ্কার ক'রে ধ্রুপদ ও খ্যালের মধ্যে একটি সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দ্রুতলয়বিশিষ্ট খ্যালের অগ্রগতি রোধ করা আর সম্ভব ছিলো না।

মুঘল সাম্রাজ্যের অবসানের দিনে চারিদিকে ভৌমিক রাজারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌ছিলো ইতিহাস এ কথা বলে। ক্ষীণজ্যোতি নামমাত্রাবশিষ্ট মুঘল বাদ্‌শার কর্তৃত্ব অস্বীকার ক'রে এরা প্রত্যেকেই এক একজন ছোটো-খাটো বাদ্‌শা হ'য়ে উঠ্‌লো। আচরণে ও রাজ্যশাসনে পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক এই সব নবাবদের দরবারঅভ্যন্তরের বেলোয়ারি ঝাড়-লণ্ঠন বিলম্বিত, আতরসুবাসিত ও বিভিন্ন মূল্যবান উপকরণে সুসজ্জিত প্রমোদপ্রকোষ্ঠগুলিতে সঙ্গীতের অফুরন্ত স্রোত ব'য়ে যেতে লাগ্‌লো। কিন্তু সে সঙ্গীতের সঙ্গে জনগণের কোনোই সম্পর্ক ছিলো না, মুষ্টিমেয় মন্ত্রী, সভাসদ ও ওমরাহের দলকে কেন্দ্র ক'রেই তা গুঞ্জরিত হ'য়ে ফিরতে লাগ্‌লো। ওস্তাদরাও মাথায় বড়ো বড়ো লাল পাগড়ী বেঁধে, তক্‌মা এঁটে, গোঁফ চুম্‌ড়ে, হাজারবার নবাবকে কুর্নিশ ক'রে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করলো যাতে সঙ্গীত তার পূর্বের ধর্মীয় বিশুদ্ধতা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে ভোগসুখের প্রধান যোগানদার হ'য়ে দাঁড়ালো। অর্থাৎ সঙ্গীত পরিবেশিত হ'তে লাগ্‌লো সরাব রূপে, সুধারূপে নয়। নবাব ও রাজাদের মনোরঞ্জনের জন্যে এই সব ওস্তাদের দলও খ্যাল ও ঠুংরী গানে নিত্য নতুন অলঙ্করণ যোজনা করতে লাগ্‌লো—তাতে গানের চটক বাড়লো বটে কিন্তু অতিরিক্ত বৈচিত্র্যের চাপে প'ড়ে গানের প্রাণপাখি উড়ে পালাবার যোগাড় হ'লো। জনগণ আঙিনা থেকে দাঁড়িয়ে ভেতরকার এই বিলাসের দৃশ্য দেখ্‌লো, কেননা দরদালানের অভ্যন্তরে তাদের প্রবেশের অধিকার ছিলো না। কাজেই ওস্তাদি সঙ্গীত যে কী বস্তু তা তারা জীবনেও জান্‌লো না, দেশী সঙ্গীতের ছিঁটেফোঁটা নিয়েই তাদের জীবন অতিক্রান্ত হ'লো। জনসম্পর্কবিবর্জিত এই সামন্তযুগীয় সঙ্গীতের প্রভাব আজও সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নি। মধ্য ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন কিম্বা সে সম্বন্ধে যাঁরা খবর রাখেন তাঁরাই উপরোক্ত কথার সত্যতা স্বীকার করবেন।

শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের ফলে আস্তে আস্তে সামন্তযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থায় চিড় ধরলো; আমাদের দেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতির পত্তন হ'লো। অবশ্য পুঁজিবাদ এখনও আমাদের দেশে ভালো ক'রে শিকড় গেড়ে বস্‌তে পারে নি তা হ'লেও এটা স্বীকার্য যে ভারতীয় সহরগুলিতে এখন শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর যে সম্পর্ক বিদ্যমান সেটা পুঁজিবাদী সম্পর্কেরই চেহারা। শিল্পবিপ্লবের কল্যাণে ইংলণ্ডে সমাজসম্পর্কে আমূল পরিবর্তন সংসাধিত হয়েছিলো; ভিক্টোরীয় যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তারই অপরিহার্য ফল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেমন সাহিত্যে গীতিকবিতার (lyrics) জন্ম দিয়েছে তেমনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও আধুনিক সঙ্গীতের প্রবর্তন করেছে। এদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আধুনিক বাংলা গান যে পুঁজিবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মনোভাবকে কেন্দ্র ক'রেই গড়ে উঠেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই উভয় ধরণের সঙ্গীতই ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার দর্পণ এবং সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিচেতনার দ্বারা আচ্ছন্ন। পেছনে পুঁজিবাদের প্রশ্রয় না থাক্‌লে এই ধরণের সঙ্গীত রচনা যে সম্ভব হ'তো না সমাজসম্পর্কের ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরাই সেকথা স্বীকার করবেন।

কিন্তু বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে দেশ ক্রমেই সম্মুখে এগিয়ে চলেছে। সর্বত্র দেখা দিচ্ছে গণজাগরণ। ভবিষ্যতে ব্যক্তিগত স্বার্থের চেতনা লুপ্ত হ'য়ে দেখা দেবে সমষ্টির চেতনা, এই সামাজিক লক্ষণ ক্রমশঃ চতুর্দিকে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌ছে। ঘোর তমিস্রা অপসারিত হ'য়ে নূতন আশার সূর্যোদয়ে পূর্ব দিগন্ত বুঝিবা লাল হ'য়ে উঠ্‌লো! সেই ভবিষ্যৎ সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এ যুগের খণ্ড খণ্ড গান—ব্যক্তিগত স্বপ্নবাসনার রূপায়ন—নিরর্থক মনে হচ্ছে। সঙ্গীতের বাণী ও সুর নতুন ক'রে ঢেলে সাজবার প্রয়োজন তাই আজ সর্বাধিক হ'য়ে দেখা দিয়েছে। গণচেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ কিছু কিছু সঙ্গীত আজকাল রচিত হচ্ছে বটে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্য। এই দিকে সর্বব্যাপী প্রচেষ্টা হওয়া উচিত। কিন্তু কী ভাবে সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা চল্‌তে পারে। সে কথা আজ আর নয়, পরবর্তী সংখ্যার জন্যে তা তোলা রইলো।

নারায়ণ চৌধুরী

সিনেমা

উদয়ের পথে : নিউ থিয়েটার্স লিঃ।

বাংলা ছবির দর্শকদের অপরিসীম সহিষ্ণুতা অনেকদিন ধরে চিত্রনির্ম্মাতাদের বহু অপকীর্ত্তি সহ্য করে এসেছে, তাঁদের অপার উদারতা বহু অবাঞ্ছিত ছবিকে উৎসাহ-পুষ্ট করে তুলেছে। কিন্তু চিত্রনির্ম্মাতারা ব্যাপারটাতে দর্শকদের সহিষ্ণুতা কোনদিনই আবিষ্কার করতে পারেন নি, তাঁরা মনে করেছেন তাঁদের চিত্রাগার থেকে যখন যে ধরণের ছবি তৈরী হয়েছে তা-ই মোক্ষম, দর্শকদের উদার মনের প্রশংসাকে তাঁরা নিজেদের ন্যায্য প্রাপ্য বলে ধরে নিয়েছেন। আবার এ অবস্থাটায় কোনো কোনো চিত্রনির্ম্মাতা হৃষ্টচিত্তে একথা ভাববারও সুযোগ পেয়েছেন যে বাংলা ছবির দর্শকরা নেহাৎই মূর্খ, বোধশক্তিহীন। ফলে বাংলা ছবির গল্পে, প্রযোজনায় বা পরিচালনায় একটা কিছু নূতন ধারার প্রবর্ত্তন খুব অনায়াসে ঘটে ওঠেনি। নূতনের প্রতি আকর্ষণ বাংলা চিত্রাগারের মহাজনদের নেই বল্‌লেই চলে। একঘেয়েমিতে অতিমাত্রায় উত্যক্ত হয়ে মাটির মতো সহিষ্ণু দর্শকরাও যখন কালেভদ্রে প্রতিবাদের ভূমিকম্প তোলে, একমাত্র তখনই মহাজনদের যুগনিদ্রা ভাঙবার উপক্রম হয়—একমাত্র তখনই তাঁরা বাংলা ছবির ধরণ বদ্‌লাবার প্রয়োজন অনুভব করেন। আশ্চর্য্য এই যে শিল্পনির্ম্মাতার উঁচু আসনে বসে থেকে শিল্প সম্বন্ধে সর্ব্বস্বীকৃত তথ্যটাই এঁদের জানা নেই ; শিল্পরূপ ও শিল্পপদ্ধতি যে দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল, একথাটা ঢাক পিটিয়ে এঁদের কানে জানান দিতে হয়।

'উদয়ের পথে'র দর্শকদের হর্ষধ্বনি সম্প্রতি এই ঢাক পেটানোর কাজ করছে। সচকিত হয়ে চিত্রনির্ম্মাতারা হয়ত উপলব্ধি করবার সুযোগ পাচ্ছেন যে দর্শকদের যতটা মূর্খ ভাবা গিয়েছিল, ততটা মূর্খ তারা নয়, নূতনকে অভিনন্দন জানাবার বোধশক্তি তাদের আছে। আর সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়টিও হয়ত অনুধাবন করতে পেরেছেন যে পুরোণো একঘেয়েমিতে দর্শকরা এত বেশি উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল যে তাদের উৎসাহিত করে তুলবার জন্যে চিত্রাকাশের গ্রহ-উপগ্রহ-তারকাদের জড় করতে হয়নি, নূতন একজন পরিচালকের হাতে নূতন ধরণের একটি গল্পই যথেষ্ট হয়েছে।

কিন্তু চিত্রনির্ম্মাতাদের নিয়ে সবচেয়ে বিপদ এইখানে যে হয়ত 'উদয়ের পথে'র সাফল্যের সহজ কারণটাই তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন না। 'উদয়ের পথে'-কে এবার তাঁরা হিং-টিং-ছট মনে করে তার কপি তৈরীতে লেগে যাবেন—ঠিক 'উদয়ের পথে'র ধরণের গল্প না হলে মনে করবেন, সিনেমা-শিল্প রসাতলে গেল। প্রচলিত সিনেমার গল্পের ধারাকে উপেক্ষা করা ছাড়া যে

'উদয়েব পথে'র গল্পে আর কোনো বিশেষত্ব নেই এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করবার বিচারবোধ তাঁদের কাছে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

'উদয়ের পথে'র গল্প সম্বন্ধে আমার এই উক্তি হয়ত উৎসাহী দর্শকদের কানেও কিছুটা কঠোর শোনাবে। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী যাঁদের আছে, সম্ভবত তাঁরা 'উদয়ের পথে'-র গল্পকে এর চেয়ে বেশি মর্য্যাদা দিতে পারবেন না। জানিনে বোম্বে-ছবির অনুকরণে কিনা বাংলা ছবির গল্প ইদানীং বহু যুক্তিহীন ঘটনার সমাবেশে ঘোরালো হয়ে চল্‌ছিল—তবে 'উদয়ের পথে'র পর দেখা গেল অতি বেশি ঘোরালো গল্প ছাড়াও বাজার জমানো যায়। 'উদয়ের পথে'র গল্প সোজা রেখায় চলে গেছে—এটাই গল্পের গুণ, গল্পের নূতনত্ব এখানেই। এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে যে কেবলমাত্র এই সামান্য গুণটুকু নিয়ে 'উদয়ের পথে' এতটা বাজার জমিয়ে বস্‌ল কি করে! গল্পের এই সামান্য গুণে বাজার জমে না একথা সত্যি, চিত্রশিল্প যে কথাশিল্প নয়, ক্যামেরার কাজই যে চিত্রশিল্পের স্টাইল এ কথা জেনে নিয়েই আমরা বলি যে 'উদয়ের পথে'র সাফল্যের অনেকখানি অংশ গড়ে তুলেছে নিউ থিয়েটার্সের ক্যামেরা আর ক্যামেরার কাজে সুদক্ষ পরিচালক বিমল রায়। তাছাড়া নূতন (অথচ অপদার্থ নয়) নায়ক-নায়িকাও দর্শকের চোখকে কম মুক্তি দেয়নি। সুশ্রাব্যভাবে গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গানগুলো দর্শকের কানকে যথেষ্ট তৃপ্তি দিয়েছে। এই রসঘন পরিবেশে দর্শকরা পাত্রপাত্রীদের মুখের চাটিম্-চাটিম্ বুলি এক তরফা উপভোগ করেই গেছে, কথাগুলোর অসারতার দিকে মন দেয়নি।

'উদয়ের পথে'র গল্পকে সাহিত্য হিসেবে বিচার করতে গেলে নিরাশ হ'তে হয়। ছবির গল্পের যুক্তিহীনতা তাতে পরিপূর্ণভাবেই আছে। চরিত্রগুলো স্বাভাবিক পরিণতি কোনো সময়েই খুঁজে নিচ্ছে না, ঘটনা তৈরীর প্রয়োজনে অনেকসময় অসম্ভব, অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নায়কের চরিত্রটি লেখক পরিষ্কার তিনটি অংশে ভাগ করে দিয়েছেন; প্রথম অংশে নায়ককে পাই আমরা লেখক হিসেবে, দ্বিতীয় অংশে শ্রমিকনেতা হিসেবে, তৃতীয় অংশে প্রেমিক হিসেবে। এই তিনটি অংশে সম্পূর্ণ তিনটি পৃথক সত্তায় বাস করা অলৌকিক ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। অন্য সব চরিত্রকে দিয়ে লেখক এর চেয়েও বেশী অযৌক্তিক কাজ করিয়েছেন। দরিদ্র লেখক অনুপ বিত্তশালী সৌরীন্দ্রনাথের বাড়ি থেকে রাগ করে চলে আসবার পরও একটা অভিভাষণ লিখিয়ে নেবার জন্যে হ্যাংলার মতো সৌরীন্দ্রনাথ অনুপের পেছু ধাওয়া করবে কেন? এই গল্পের বাংলা দেশে কি অনুপ ছাড়া আর লেখক ছিল না আর সৌরীন্দ্রনাথের কি টাকাই আছে, মর্য্যাদাবোধ নেই? তাছাড়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিস্ট সৌরীন্দ্রনাথ কোন্ স্বার্থে প্রণোদিত হয়ে অনুপের একটি উপন্যাস নিজের নামে ছেপে বার করবে?—বড়লোকদের চোর প্রতিপন্ন করে বাহবা নেবার ইচ্ছাই যদি কাহিনীকারের ছিল, তাহলে তিনি এ না করে সৌরীন্দ্রনাথের হাতে সোজাসুজি একটা সিঁধকাঠি তুলে দিলেই পারতেন! একটা উপন্যাস ছেপে বার করা নূতন একজন লেখকের পক্ষে পরমার্থ লাভের সমান হ'তে পারে কিন্তু কোনো ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিস্টের ইচ্ছা বা কামনা সে-পথে বিচরণ করে না। তারপর আত্মসম্মানে ভরপুর সৌরীন্দ্রনাথের বোন গোপা যখন সে-উপন্যাসটি পড়ে ধনমানকূল ছেড়ে প্রায় সন্ন্যাসিনী হ'তে বস্‌ল, এই রাধা-ভাবকে হজম করে নিতে বিংশশতকীয়

মন সরাসরি তখন বিদ্রোহ করে বসে। অনুপের ঘরে এসে গোপার বাবার ওকালতির দৃশ্যটায় বোম্বে-ছবির কথা স্মরণ না করে আমাদের উপায় থাকে না। কিন্তু সবচেয়ে বিসদৃশ চুরির অপবাদে অনুপের বোনের অজ্ঞান হয়ে পড়া—দৃঢ়-চরিত্রের একটি কলেজে-পড়া মেয়ে যে চুরির অপবাদে মূর্চ্ছা যেতে পারে না সম্ভবত এ খবরটা কাহিনীকার রাখেন না। কারণে অকারণে বড়লোকদের গালাগালি করাই যে কেবল আধুনিকতা নয়, আধুনিকতার যে আরো অনেক লক্ষণ আছে—আধুনিক যুগের একটি গল্প লিখতে বসলে কাহিনীকারের সে-কথা স্মরণ রাখা উচিত।

মোটের উপর 'উদয়ের পথে'-র গল্পটি একজন মধ্যবিত্ত লেখকমন্যের ইচ্ছাপূরণের কাহিনী। লেখক বড়লোকদের খুসীমাফিক গালাগালি করবে কিন্তু বড়লোকেরা তার পেছু ছাড়া হবে না; বড়লোকের মেয়ে তার উপন্যাস পড়ে তার গলায় এসে বরমাল্য দেবে; শ্রমিকেরা মনে করবে লেখককে পীরপয়গম্বর। সংক্ষেপে বলতে গেলে সমাজে একজন মধ্যবিত্ত লেখককে নিয়ে বিরাট চাঞ্চল্য জেগে উঠবে, ধনিক এবং শ্রমিক লোফালুফি সুরু করে দেবে তাকে নিয়ে! এমন একটি বিকৃত মনের ইচ্ছাকে গল্পে সাজিয়ে দেখাবার মধ্যে আর যা-ই থাক্ বিন্দুমাত্র সুস্থতা নেই। দেয়ালে কার্ল মার্ক্সের ছবি টাঙিয়ে যে নায়ক-লেখক বিবেকানন্দীয় সেবা-ধর্ম্মের আদর্শে নিমজ্জিত, সে বিবেকানন্দকেও ফাঁকি দেয় আর কার্ল মার্ক্সকে ত সে বোঝেই-নি! গল্পের চরিত্রকে অবশ্য এ-কথা বলে লাভ নেই—একথা কাহিনীকার এবং পরিচালকের উপরই প্রযোজ্য।

পরিচালকের ত্রুটিগুলোর উল্লেখ করা উচিত মনে করছিনে। কেননা, এই তাঁর প্রথম ছবি আর তাছাড়া ক্যামেরার জাদুতে সাধারণ দর্শকের চোখ থেকে ত্রুটির দিকটা তিনি ঢেকে ফেলতে পেরেছেন।

আ

রেডিও

ক'লকাতার বেতার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আমাদের নালিশের অন্ত নেই। আজো সিনেমার মতো রেডিওর আলোচনা পথে ঘাটে না হলেও এ কথাটা জানতে আর কারো বাকি নেই। কিন্তু নালিশটা আর যাই হ'ক পরিবেশনে উপকরণের অভাব সম্পর্কে কিছুতেই নয়। প্রোগ্রাম খুললে কী না চোখে পড়ে!

কারণ এতে আছে, যুদ্ধের গায়ে-কাঁটা-দেওয়া বর্ণনা, এ, আর,পি,-র লাভজনক উপদেশ, আছে সাহিত্য-সিনেমা-খেলার তত্ত্ব, আছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার উপর কড়া আলোচনা, শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য আপরাহ্নিক চাট্‌নি, আছে 'ফসল বাড়াও' আন্দোলন, আছে গান, রবীন্দ্রনাথের নাটক, আছে রেকর্ড-সঙ্গীত এবং ঢোলসহ সানাই! ফর্দ্দ দেখে ভুরু কুচকায় কার সাধ্য? কিন্তু 'বেতার জগতে'র এই ফর্দ্দে চোখের বদলে কান নিয়োগ করলেই রহস্যের ভাগী হতে হবে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য কানকে বাঁচিয়ে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ; কিন্তু পথে ঘাটে চল্‌তেও যদি কর্ণপীড়ন হয়, তখন সে-সম্পর্কে দুটি-একটি কথা না বলে উপায় কি?

যুদ্ধের শেষ হবে, এবং তার শুভ ফল আগামী দিনের অপিঙ্গল আলোকে কল্যাণী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হবে, এ আশা অল্পবিস্তর সবাই করে। কিন্তু রেডিওতে বক্তা যখন তাঁর যাত্রা-গোত্রীয় কণ্ঠে সেই অতি সুখের কথাটি ব্যক্ত করেন, তখন আর যাই তাতে থাক্ বক্তব্যের গুরুত্ব যে নষ্ট হয়ে গেল এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। ছোটদের আসরে চরিত্র ও সংযমের লেফাফা বিতরণ, 'ফসল বাড়াও' আন্দোলনের প্রচার কার্য্যে ষ্ট্যাটিস্‌টিক্সের রাহাজানি বিষয়ের মাহাত্ম্য বাড়াতে পারে, কিন্তু শ্রোতার ধৈর্য্য হারায়। রেডিও-র সাথে বিদ্যায়তনের প্রভেদ আছে, এবং থাক্‌বেও। হাজার প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও রেডিও উপ-ভোগের উপকরণ। অনেকে চটবেন; বলবেন, এতে রেডিওর মূল্যহানি ঘট্‌ল। কারণ জনকল্যাণকর ধর্ম্মই তার প্রধান। মান্‌লাম। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় বহু গলদ আছে, বহু ক্লেদ আছে। আজকের এই ক্লিষ্ট পরিবেশ, তিক্ত স্বপ্ন, দীর্ণ আত্মা আগত পৃথিবী গঠনের যদি নিয়ন্তা হয়, তাহলে সে অনাগতের রূপে যে কি হবে তার অনুমান কঠিন নয়। পিতৃপাপে হয়ত সেই দুষ্ট ব্যাধিতে তারও সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে যাবে! কাজেই পূর্ব্বাহ্নেই যে তৎপরতার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে, তা অস্বীকার করব না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও অনিবার্য্যভাবে আস্‌ছে,

যে তার গাত্রাবরণ যদি শর্করা-সম্বলিত না হয়, তাহলে তা কারো মুখেই রুচ্‌বে না। ভালো কথা সে বলুক, কিন্তু যথেষ্ট ভালো করে বলুক, এটাও লক্ষণীয় হবে নাকি? কর্ত্তারা বল্‌বেন, উপযুক্ত লোকের অভাব। আমরা বলব, কথাটা আল্‌গা হল। সব বিষয়ে উপযুক্ত বিষয়ীর সন্ধান নাও যদি পাওয়া যায়, তবে বিষয়ের সংখ্যাকে কিছু ছেঁটে তাকে ব্যবহারযোগ্য করাই যুক্তিযুক্ত। অন্ততঃ এতেই বোধ করি বেতার কেন্দ্রের পরিচালকবর্গ সুচারু গৃহিণীপনা প্রকাশের অবকাশ পাবেন। মধুর অভাবে গুড় দেয়ার রেওয়াজ আছে; সেটা পরিমাণেও কিছু বেশি হয়; কিন্তু মধু থাক্‌তে কখনো এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে বলে শুনি নি! স্বীকার করি, মাঝে মাঝে মুখ বদলানোর জন্য নুন-ঝাল প্রয়োজনীয়। কিন্তু চুণ খেয়ে মুখ পুড়লে, ভবিষ্যতে কোন্ সুরাহা হবে? তর্ক যে ভাবেই তোলা হোক, রীতির প্রসঙ্গ অবান্তর মনে করলে তার তাল কাটবেই। চব্বিশ ঘণ্টার একটি দিনে ক'লকাতার বেতার কেন্দ্র থেকে আমরা অজস্র বিষয়ে নানান্ কথা শুনতে পাই; কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা তার বহু বিষয়ই বিরক্তিকর।

আধুনিক যুগে রেডিও বিজ্ঞানের এমনিতর একটি দান, যা পরম বিস্ময়ের। ছোট্ট একটি মুখে সে কত কথা বলে; যে কোন একটি নিঃসঙ্গ নাগরিকের প্রচুর তৃপ্তি দান করতে পারে সে। অসুস্থা পৃথিবীর বহু সামগ্রীর মত ইতিহাসের যাঁতাকলে এই মনোজ্ঞ যন্ত্রটিরও অনেক অঙ্গ আজ বিকৃত হচ্ছে। তাই যে ছিল কৌতূহলের, সে আজ কৌতুকের হয়ে উঠ্‌ছে।

সুরেশ মৈত্রেয়

নাটক

রাষ্ট্রবিপ্লব—মিনার্ভা থিয়েটার।

যে কারণেই হোক বাংলা দেশের নাটকে এবং রঙ্গমঞ্চে আজ ক্ষয়িষ্ণুতার ভাব সুস্পষ্ট। কলকাতায় যে কয়টি পেশাদার রঙ্গমঞ্চ আছে, সেখানে নিত্য নতুন নাটক মঞ্চস্থ হয়—দর্শক-সমাগমও কম হয় না বটে—কিন্তু বাংলা রঙ্গমঞ্চের শৈল্পিক উৎকর্ষ এবং অগ্রগতি আমাদের চোখে পড়ে না। স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে আমাদের রঙ্গমঞ্চের এই দুরবস্থার কারণ কি? আমার মনে হয় যে আমাদের রঙ্গমঞ্চের নিছক ঐতিহ্যবাদ এবং গতানুগতিকতার মিথ্যা মোহই এর জন্যে দায়ী। নাটকের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ একথা বল্‌লে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বিপ্লবী নাটক যেমন বিপ্লবী রঙ্গমঞ্চ সৃষ্টির সহায়ক হয়, তেমনই বিপ্লবী রঙ্গমঞ্চও বিপ্লবী নাটক সৃষ্টির প্রেরণা জোগাতে পারে। বাংলা দেশে বর্তমানে এদুটিরই একান্ত অভাব। তাই আমাদের রঙ্গমঞ্চ শিল্পের পুনরুজ্জীবন আজ একান্ত কাম্য। আমাদের শিল্প এবং সাহিত্যের সকল বিভাগ আজ জাতীয়তার আহ্বানে প্রাণ চঞ্চল হয়ে সমাজ-সচেতনায় মুখর হয়ে উঠতে চাইছে; বাংলা রঙ্গমঞ্চই বা সে আহ্বানে সাড়া দেবে না কেন? বাংলা রঙ্গমঞ্চ এবং নাটক যতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ সমাজ সচেতন হয়ে উঠে জনগণের সঙ্গে তার হারানো সংযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে, ততদিন পর্যন্ত তার উন্নতির আশা কম।

বাংলার আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে শচীন সেনগুপ্তের উপর বাঙ্গালীরা একদিন অত্যন্ত বেশী আশা করেছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে, শচীনবাবু একদিন বাংলা নাটকে হয়ত বা যুগান্তরের আভাস নিয়ে আসতে পারবেন। কিন্তু দেশবাসীদের সে আশা পূর্ণ হয় নি। শচীন সেনগুপ্তের কয়েকটি নাটক বাংলা রঙ্গমঞ্চে অসামান্য সাফল্য-মণ্ডিত হলেও তিনি দেশকে প্রত্যাশানুযায়ী দান দিতে পারেন নি। সম্প্রতি শচীনবাবুর বহু-প্রচারিত নাটক 'রাষ্ট্র-বিপ্লবে'র অভিনয় দেখে এসে মনে হল যে বহুদিন থেকে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের ভাড়াটে নাট্যকার হিসাবে কাজ করলেও, তিনি তাঁর বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে হারান নি। এটা নিঃসন্দেহে আশার কথা। 'রাষ্ট্র-বিপ্লব' ঐতিহাসিক নাটক। ভারতের ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়কে শচীনবাবু নাটকে রূপান্তরিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনে নাট্যকার মুহূর্তের জন্যেও ইতিহাসকে ভুলে যান নি। যে বিস্মৃত অধ্যায়টিকে তিনি নাটকের বিষয়-বস্তু করেছেন, তার সঙ্গে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির বেশ

কিছুটা সাদৃশ্য আছে। সেদিনের সেই রাষ্ট্র-বিপ্লবে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দারা শিকোহ্ এবং ঔরংজেব। আকবরের সুমহান সর্বধর্মসমন্বয় ছিল দারার আদর্শ—আর ঔরংজেবের আদর্শ ছিল অনুদার, সঙ্কীর্ণ—ভারতে ইস্‌লামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করতে গিয়ে তিনি সাম্রাজ্যিক স্বার্থকেও বিপন্ন করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। উভয়ের এই আদর্শগত বিরোধের থেকেই জ্বলে উঠেছিল বিপ্লবের আগুন। সে আগুনে দারা এবং তাঁর সহকর্মীরা পুড়ে ছাই হলেন—জয়ী হ'ল ঔরংজেবের প্রতিক্রিয়াশীল কূটনীতি।

আদর্শগত বিরোধ মূলত নাটকটির প্রধান উপজীব্য হলেও, নাট্যকার কোথাও একে প্রয়োজনানুরূপ প্রাধান্য দেন নি। 'রাষ্ট্রবিপ্লবে'র চরিত্র চিত্রণে অসঙ্গতি থাকলেও নাট্যকার ঘটনা-সংস্থানে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের সদ্ব্যবহার করতে তিনি কসুর করেন নি। কোন কোন ব্যাপারে তিনি পেশাদার রঙ্গমঞ্চে বিপ্লব সৃষ্টির প্রয়াস পেলেও, অনেক ক্ষেত্রে তিনি রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনের কাছে শৈল্পিক প্রয়োজন বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছেন। বন্দী দারা শিকোহ্‌কে উদ্ধারের জন্যে আমরা দিল্লীর ভিক্ষুকদের বিপ্লবের কথা বহুবার শুনেছি। কিন্তু গ্রীক নাটকের ধরণে পরোক্ষ উক্তি ছাড়া তিনি জনতার দৃশ্য অবতারণার দুঃসাহস দেখাতে পারে নি।

নাটকের প্রযোজনায় যথেষ্ট সুরুচি, শিল্প-জ্ঞান, এবং বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক সোভিয়েট থিয়েটারে সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ পদ্ধতিতে নাট্যাভিনয়ের কথা সর্বজনবিদিত। আলোচ্য নাট্যাভিনয়েও:সেই মনোভাবের পরিচয় পাই। ঐতিহাসিক নাটক বলে বিচিত্র দৃশ্যপটাদির অবতারণায় দর্শকের রসবোধকে পীড়িত হতে হয় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ দৃশ্যপটে প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। প্রযোজনার টেকনিকে এই অভিনবত্ব প্রকৃতই আমাদের প্রশংসার দাবী করতে পারে। এতে কোন ক্ষেত্রেই নাটকীয় রস-সৃষ্টির ব্যত্যয় হয় নি। নাচগানের একান্ত অভাবও এই নাটকটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঐতিহাসিক নাটকে এ দুটি জিনিসের প্রাবল্য দেখেই আমরা অভ্যস্ত। নাট্যকার এই সস্তা চটক সৃষ্টির পথ ত্যাগ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

অভিনয়ের দিক থেকে মিনার্ভার যশস্বী শিল্পীদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় হলেও তাঁরা সকলে চরিত্রানুগ অভিনয় করতে পারেন নি। তাঁদের অনেকের বাঁধাধরা ছাঁদে-ঢালা বাচন-পদ্ধতি পেশাদার রঙ্গমঞ্চের গতানুগতিকতা স্মরণ করিয়ে দেয়।

গোপাল ভৌমিক

সমালোচনা

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত (প্রথম খণ্ড) : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত। বিশ্বভারতী, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত 'সংস্কৃতগ্রন্থমালা'র দ্বিতীয় গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত কালিদাসের 'মেঘদূত' ওই গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ। কালিদাসের একখানি কাব্যের পরেই যে অশ্বঘোষের একখানি কাব্য প্রকাশিত হলো এটা খুবই শোভন ও সংগত হয়েছে। কবিখ্যাতিতে অশ্বঘোষের স্থান যে কালিদাসের পার্শ্বেই, সে বিষয়ে আধুনিক পণ্ডিতসমাজ একমত। অথচ কিছুদিন পূর্বেও অশ্বঘোষের নাম আমাদের দেশে অজ্ঞাত ছিল বললেই হয়। তার কারণ অশ্বঘোষ ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-বিরোধী বৌদ্ধ। স্বয়ং বুদ্ধদেব তাঁর বেদ ও ব্রাহ্মণবিরোধিতার ফলে এদেশে বিস্মৃতপ্রায় হয়েছিলেন। সুতরাং 'বুদ্ধচরিত'-প্রণেতা অশ্বঘোষের স্মৃতিও যে এদেশের চিত্ত থেকে মুছে গিয়েছিল, এটা কিছুই বিচিত্র নয়। বুদ্ধচরিতের মহিমা এদেশে অবজ্ঞাত হলেও বিদেশে শ্রদ্ধাসহকারে স্বীকৃত হয়েছে। অশ্বঘোষের কবিখ্যাতিও এদেশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু চীনে তিব্বতে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী আদৃত ও অনূদিত হয়েছে। 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে' একথা কালিদাসের পক্ষে প্রযোজ্য হলেও অশ্বঘোষের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। কালিদাসের 'মেঘদূত' স্বদেশে এবং বিদেশে সমাদর লাভ করেছে। কিন্তু অশ্বঘোষের শুধু 'বুদ্ধচরিত' নয়, পরন্তু তাঁর 'সৌন্দরনন্দ', 'শারিপুত্রপ্রকরণ' প্রভৃতি প্রায় সমস্ত গ্রন্থই এদেশে অনাদরে বিলুপ্তপ্রায় এবং বিদেশে সাদরে গৃহীত ও অনূদিত হয়েছে। এটা হচ্ছে তাঁর বৌদ্ধত্বের শাস্তি। যাহোক, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য পণ্ডিতগণের অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে বৌদ্ধ সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ঘটেছে। এরই ফলে অশ্বঘোষের গ্রন্থাবলীও স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। দেশবিদেশের এই আলোচনার ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে অশ্বঘোষের যে স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে, সেটা কম গৌরবের নয়।

জনপ্রসিদ্ধি অনুসারে সুবর্ণাক্ষীপুত্র সাকেত (অযোধ্যা)-নিবাসী আচার্য অশ্বঘোষ ছিলেন কুষাণ-সম্রাট কনিষ্কের (খ্রীঃ ৭৮-১০১) সভাকবি। সুতরাং কালের দিক্ থেকে তিনি বিক্রমাদিত্যের (খ্রীঃ পঞ্চম শতক) সভাকবি কালিদাসের পূর্ববর্তী। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙের (৬৭১-৯৫) বিবরণ থেকে জানা যায় সপ্তম শতকেও অশ্বঘোষের গ্রন্থসমূহের যথেষ্ট

পঠনপাঠন এদেশে হতো। সুতরাং কালিদাসের পক্ষে তাঁর কাব্যের সঙ্গে সুপরিচিত থাকা বিচিত্র নয়। এইজন্যেই হয়তো উভয়ের কাব্যর মধ্যে অনেক সাদৃশ্য এবং স্থলে স্থলে হুবহু মিল দেখা যায় (আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু উভয়েই কোনো তৃতীয় কবির রচনার কাছে ঋণী কিনা তাও বিচার্য। এখন পর্যন্ত যতদূর জানা যায় তাতে বাল্মীকিকে বাদ দিলে (বেদসংহিতা ও মহাভারতকে কাব্য বলে গণ্য করা হয় না) অশ্বঘোষকেই ভারত-বর্ষের আদি কবি বলে স্বীকার করতে হয়। সুতরাং অশ্বঘোষ যদি কারও কাছে ঋণী হয়ে থাকেন তবে সম্ভবত সেটা আদিকবি বাল্মীকির কাছেই। রামায়ণ কাহিনীর কেন্দ্রস্থল অযোধ্যা, অশ্বঘোষও ছিলেন সাকেত অর্থাৎ অযোধ্যানিবাসী। এইজন্যও রামায়ণের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ থাকার কথা। বস্তুত পণ্ডিতগণ বাল্মীকির রামায়ণ ও অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিতের মধ্যে কাহিনীগত ও ভাষাগত বহু সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। কালিদাসও যে রামায়ণের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন সেকথা বলাই বাহুল্য ; রঘুবংশ তো অনেকাংশে রামায়ণ কাহিনী নিয়েই রচিত। সুতরাং কালিদাস কোন্ অংশে বাল্মীকির কাছে এবং কোন্ অংশে অশ্বঘোষের কাছে ঋণী তা যথাযথভাবে নির্ণয় করা আবশ্যক।

অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' আটাশ সর্গে সমাপ্ত একখানি বৃহৎ কাব্য। এই কাব্যখানির কাহিনী ও বর্ণনায় রামায়ণকে যে-ভাবে অনুসরণ করা হয়েছে, তাতে মনে হয় বৌদ্ধকবি অশ্বঘোষ বুদ্ধদেবকে রামের স্থলবর্তী ও বুদ্ধচরিতকে রামায়ণের প্রতিরূপ করেই দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মীদের, বিশেষত রামাইতদের কাছে রাম ও রামায়ণের যে স্থান, বৌদ্ধদের কাছে বুদ্ধ ও বুদ্ধচরিতকে সেই স্থান দিতেই অশ্বঘোষ প্রয়াসী হয়েছিলেন। অর্থাৎ 'বুদ্ধচরিত' হচ্ছে আসলে একটি 'বুদ্ধায়ন'। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যসমাজ এ গ্রন্থটিকে সেভাবে গ্রহণ করতে রাজি হয়নি এবং রামচরিতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দান করে নবমহিমায় মণ্ডিত করতে প্রয়াসী হয়। এভাবে দেখলে বুদ্ধচরিতকে যেমন রামায়ণের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করা যায়, তেমনি কালিদাসের রঘুবংশকে ও বুদ্ধচরিতের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে গণ্য করা চলে।

যাহোক, আধুনিক দৃষ্টিতে বুদ্ধচরিতের এমন একটি বিশেষ গুণ আছে যা রামায়ণে নেই। সেটি এই যে, বুদ্ধচরিত একটি ঐতিহাসিক মহাপুরুষের জীবনচরিতকে আশ্রয় করে রচিত আর রামায়ণ অবলম্বন করেছে একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকাকে। অবশ্য তৎকালীন লোকেরা (বিশেষত প্রাচীনতর যুগে) রামকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলেই বিশ্বাস করতেন, এবং পরবর্তী-কালে রাম স্বয়ং ভগবান বলেই স্বীকৃত হয়েছেন—কালিদাসের 'রামাভিধানো হরিরিত্যুবাচ' স্মরণীয়। আধুনিক কালে রামের ঐতিহাসিকতা কেউ স্বীকার করেন না, পক্ষান্তরে বুদ্ধদেবের চেয়ে মহত্তর কোনো মহাপুরুষ পৃথিবীর ইতিহাসে আবির্ভূত হননি বলেই আধুনিক কালের ধারণা। এই হিসাবে বর্ত্তমান যুগে রামায়ণের গৌরব চলেছে এবং বুদ্ধচরিতের গৌরব বেড়েছে। কোনো পুণ্যচরিত মহাপুরুষের চারিত্র মহিমা যখন জনসমাজের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে কাব্যের শতদলরূপে ফুটে ওঠে, তখন সে কাব্য যে একটি বিশিষ্টতা পায় তা অন্যত্র পাওয়া সম্ভব নয়। বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্যের চারিত্র মহিমা বাঙালির হৃদয়কে এভাবেই অধিকার

করেছিল, তাই ওই চারিত্র মহিমা চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি কাব্যরূপ নিয়ে বিকশিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতে তেমনি বুদ্ধচরিত। আধুনিক কালে এই বুদ্ধচরিতের মহিমা ভারতবর্ষের তথা এশিয়ার সীমা ছাড়িয়ে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তার প্রমাণ পাই নানা দেশের ঐতিহাসিক আলোচনায়, এডুইন আর্ণোল্ডের Light of Asia নামক কাব্যে এবং অশ্বঘোষের বুদ্ধ চরিতের নানা বৈদেশিক ভাষায় অনুবাদে।

বুদ্ধচরিত কাব্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বলা আবশ্যক। ভারতবর্ষে এক সময়ে চরিতকাব্য লেখার প্রচলন দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাণভট্টের হর্ষচরিত, বিহ্লনের বিক্রমাঙ্কদেব চরিত, সন্ধ্যাকর নন্দীর রাম (পাল) চরিত্রের উল্লেখ করতে পারি। এই হিসাবে বুদ্ধচরিতকে ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম চরিত্রকাব্য বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু অন্যান্য চরিত্র কাব্যের সঙ্গে এই কাব্যখানির একটি পার্থক্য এই যে, অন্য কাব্যগুলির উপজীব্য হচ্ছে রাজ চরিত্র আর একখানির অবলম্বন হচ্ছে একজন রাজ্যত্যাগী মহাপুরুষের চরিত কথা।

অশ্বঘোষের অসাধারণ প্রতিভার দিক্ থেকেই হোক, কাব্যখানির বিষয়বস্তুর মহত্ত্বের দিক্ থেকেই হোক বা কাব্যকলার উৎকর্ষবিচারের দিক্ থেকেই হোক বুদ্ধচরিত গ্রন্থখানি যে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গৌরবের বস্তু, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেই জন্য এই কাব্যখানি আবিষ্কৃত হবার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। তাই অশ্বঘোষের স্বদেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষেই (বিশেষত বাংলা দেশে) এই কাব্যখানি আজ পর্য্যন্ত যথোচিত সমাদর লাভ করে নি। বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বাংলা সাহিত্যে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত এবং অন্যান্য গ্রন্থ যথোচিত স্থান পায়নি, এটা আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা নয়। সুতরাং একথা স্বীকার করতে হবে, অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধ চরিতের অনুবাদ প্রকাশ করে রথীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের একটা অভাব মোচন করলেন শুধু তা নয়, আমাদের একটা কলঙ্ক অপসারণেও অনেকখানি সহায়তা করলেন।

এ বইখানি সম্বন্ধে আরও একটা ঔৎসুক্যের বিষয় আছে। আমাদের দেশের বহু কবি, কাব্য এবং অনেক কীর্তি সম্বন্ধেই এই লজ্জার কথাটা স্বীকার করতে হয় যে, বৈদেশিক মনীষীদের দ্বারা আদৃত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা আমাদের প্রাচীন গৌরবের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারি না। 'বিদেশে পূজ্যতে আগে স্বদেশে পূজ্যতে পরে' এই কলঙ্কের কথাটা আমাদের বহু প্রাচীন কীর্তি সম্বন্ধেই খাটে। বহুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাই ক্ষোভ করে বলেছিলেন, "আমাদের দেশে বহুদিন অনাদৃত বৌদ্ধশাস্ত্র য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। ইহাই আমাদের পক্ষে দারুণতম লজ্জার কারণ। এই বৌদ্ধ শাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে।" তাই কাউয়েল সাহেবের সম্পাদিত বুদ্ধচরিত প্রকাশিত হবার কিছুকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ এই এই কাব্যের বাংলা অনুবাদের ভার দেন রথীন্দ্রনাথে উপর। প্রথম তিন সর্গের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংশোধিতও হয়েছিল। কিন্তু তখন এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। এতদিন পরে প্রকাশিত হওয়ায় এই একটা সুবিধা হয়েছে যে, ইতিমধ্যে বিভিন্ন মনীষীদের দ্বারা

বুদ্ধচরিতের যে পাঠোদ্ধার ও অর্থোদ্ধার হয়েছে এই পুস্তকে তার সহায়তা গ্রহণ করা গেল। সুতরাং পাঠক এই অনুবাদের উপর। নির্ভর করে মুল বুদ্ধচরিতের সৌন্দর্য্য অনেকাংশে উপলব্ধি করতে পারবেন।

অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত সমাপ্ত করেছিলেন আটাশ সর্গে। তার মধ্যে মোটামুটি প্রথম সাড়ে তেরো সর্গ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে প্রথম সাত সর্গের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আশা করি দ্বিতীয় খণ্ডে বাকি সাড়ে ছয় সর্গের অনুবাদ প্রকাশিত হবে। প্রথম খণ্ডের অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুগ হয়েছে; যেসব স্থলে মূলানুগ অনুবাদ সহজসাধ্য হয় না অথবা কোনো কাজ উহ্য থাকে সেসব স্থলে অনুবাদমুখেই যথোচিত টীকা অথবা উহ্য শব্দ গুলিকে বন্ধনীর মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। প্রাচীন সাহিত্যের অনুবাদে এটাই সুধীজনসম্মত আদর্শ। সুতরাং এই অনুবাদ সুধীজনের কাছে সন্তোষজনক বলেই গণ্য হবে আশা করা যায়। এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি নালিশ জানিয়ে রাখি। 'সংস্কৃত গ্রন্থমালা'র প্রথম পুস্তক 'মেঘদূতে' যে আদর্শ অনুসৃত হয়েছে এই দ্বিতীয় পুস্তকে সে আদর্শ রক্ষিত হয় নি। অন্তত পক্ষে যদি বাংলা অনুবাদের সঙ্গে সংস্কৃত মূল পাঠ দেওয়া থাকত তাহলে অনেকের পক্ষে সুবিধা হতো এবং গ্রন্থখানির উপযোগিতাও অনেকাংশে বর্ধিত হতো। যে শ্রেণীর পাঠকের জন্য 'মেঘদূত' প্রকাশিত হয়েছে সে শ্রেণীর পাঠকরা কতকটা নিরাশ হবেন। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থের ভূমিকায় যদি অশ্বঘোষের কবি-প্রতিভা ও তাঁর গ্রন্থসমূহের একটু সাধারণ পরিচয় থাকত (দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ভূমিকায় অশ্বঘোষের পৃষ্ঠপোষক সম্রাট কনিষ্কের উল্লেখ পর্য্যন্ত করা হয় নি) এবং বুদ্ধ চরিতের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করা হতো, তাহলে অনেক পাঠক উপকৃত হতেন এবং এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সাধারণের ঔৎসুক্য আরও বর্ধিত হতো।

প্রবোধচন্দ্র সেন

THE CENTURY OF THE COMMON MAN—Henry A. Wallace. Hutchinson. 5s.

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের ভিত্তিতে ১৯৪৪-এর রাষ্ট্রনীতির ইমারৎ খাড়া করে রাখা কোনো স্বাধীন দেশের পক্ষে সম্ভব কি না ভাববার কথা। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তা সম্ভব হয়েছে। হয়ত তার একমাত্র কারণ সে-দেশের কৃষি ও শিল্পের অদ্ভুত সমৃদ্ধি। রাষ্ট্র-পরিকল্পনায় যে ধরণের উদারনীতি যুক্তরাষ্ট্রের বিপ্লবে প্রেরণা দিয়েছিল, তারই মন্দির তৈরী করে যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ যুগে যুগে সেবায়েতের কাজ করে চলেছেন। থিয়োডোর রুজভেল্ট বা উড্রো উইলসনেরই রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার উত্তরসাধক প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট্ এবং ভাইস্-প্রেসিডেন্ট হেন্‌রি এ. ওয়ালেস্। এখানে একথা বল্‌লে হয়ত খুব বেশি বাহুল্য হবে না যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে জয়লাভ করে ধনতন্ত্র যখন রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অভিযান সুরু করে, তখন উদারনীতিই হয় তার ব্রহ্মাস্ত্র।

উদারনীতিপ্রসূত যুদ্ধকালীন কতকগুলো বক্তৃতার সারাংশ নিয়ে ওয়ালেস্ সাহেবের *The Century of the Common Man* বইটি তৈরী। কি উদ্দেশ্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে অবতীর্ণ

হয়েছে এবং যুদ্ধোত্তর যুগে কি উপায়ে পৃথিবীব্যাপী শান্তি স্থাপিত হতে পারে সে সম্বন্ধে উৎসুক পাঠক বইটি থেকে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারবেন। বলা বাহুল্য, ওয়ালেস্‌সাহেব ধনতান্ত্রিকতার পৃষ্ঠপোষক; তবে ধনতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে যতটা উদারনীতিক ও গণতান্ত্রিক হওয়া যায় তিনি তা-ই। ধনতন্ত্র যে কেবল মুনফাখোরই তৈরী করবে তাত নয় বরং তা করতে থাক্‌লে তার মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে ওঠে; দীর্ঘ পরমায়ু পেতে হলে ধনতন্ত্রের কর্ত্তব্য হচ্ছে জনসাধারণের জীবন ধারণের মান উঁচুতে তুলে দেবার চেষ্টা করা। তার জন্যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোকে আজ তাকাতে হবে জনসাধারণের দিকে, সাহায্য করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিতে হবে যন্ত্রশিল্পে অনুন্নত দেশগুলোর দিকে। গণতান্ত্রিক খ্রীষ্টীয় আদর্শে শান্তির ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে পৃথিবীর সমস্ত দেশ। লীগ-অব-নেশনস্‌ হৃতসম্ভ্রম হয়ে যে উইলসনী স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল তা শুধু এই কারণে যে আমেরিকা তার মর্য্যাদা দেবার জন্যে তখনও প্রস্তুত হয়নি; এবার আর সে-ভুল আমেরিকা করবে না। বিদ্রোহী মেম্বরকে শায়েস্তা করবার জন্যে লীগের থাক্‌বে শক্তিশালী বিমানবহর, উইলসনের স্বপ্ন সত্য করে তোলার সুযোগকে আমেরিকা উপেক্ষা করবে না।

ওয়ালেস্‌ সাহেবের এসব কথা অত্যন্ত সহজ, স্বাভাবিক ও প্রাঞ্জল। কিন্তু তার চেয়ে প্রাঞ্জল আমেরিকার নূতন মিত্র সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর উক্তিগুলো। ইদানীং কয়েকটি ছায়াচিত্রের মারফৎ আমেরিকার রাশিয়া আসক্তি আমরা লক্ষ্য করে এসেছি—ধনতান্ত্রিক দেশ হয়েও আমেরিকা এতটা রাশিয়া-প্রশস্তি কেন করছে এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর মন থেকে হয়ত অনেকেই পান নি। ওয়ালেস্‌ সাহেবের কথায় তার খানিকটা উত্তর পাওয়া যায়। সেখান থেকে আমরা জান্‌তে পারি যে পুরোণো (?) কম্যুনিজ্‌ম্‌ রাশিয়ার আর রুচি নেই বরং তাকে বাধা দিতে আমেরিকার মতো রাশিয়াও অগ্রসর হবে:

"The old democracy did not serve as a guarantee of peace. The new democracy in which the people of the *United States and Russia* are so deeply interested must give us such a guarantee. This new democracy *will be neither Communism of the old-fashioned internationalist type* (ইটালিক্স আমাদের) nor democracy of the old-fashioned isolationalist sort." (Page 33).

"If the Western democracies furnish full employment and an expanding production, they need have no fear of a revival of old-line communistic propaganda from within. If they do not furnish full employment, *communistic propaganda of this kind is inevitable and there is nothing which the Russian government or our government or any other government can do to stop it.*" (ইটালিক্স আমাদের) (Page 66).

ওয়ালেস্‌ সাহেব নিঃসন্দেহে আদর্শবাদী কিন্তু তা হলেও তাঁর লেখায় স্পষ্টবাদিতার অভাব নেই।

সুধাংশু আচার্য্য

ধারাবাহিক—হুমায়ূন কবির। ডি, এম, লাইব্রেরী। কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

অতীতের দিকে বিমুখ হোয়ে আদর্শের বিগ্রহ তৈরী করা দরকার হয়, নূতনকে স্বীকার করবার ক্ষমতা যখন লোপ পায়। বাঙালী মুসলমানের ধর্ম্মীয় গোড়ামির আসল কারণ এইখানে। ফিউডালিজম রাজনৈতিক শক্তিরূপে অনেক পূর্ব্বেই মৃত, কিন্তু তার সামাজিক শক্তির মৃত্যু আজও ঘটেনি। পশ্চিমের বিজ্ঞানের আবহাওয়া আজও বাঙালী মুসলমানের মজ্জাগত নয়। উত্তর-দেশীয় মুসলমানের সঙ্গে বাঙালী মুসলমানের পার্থক্য স্পষ্ট। স্যার সৈয়দ আহ্‌মদের নেতৃত্বে গত শতাব্দীতে মুসলমানদের মধ্যে নূতন রাজনৈতিক চেতনা কিছুটা সঞ্চার হোয়েছিল। বাংলা দেশে তার ঢেউ অনেক পরে আসে। বাংলা দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন তারাই, যারা ফিউডাল অভিজাতদের বংশ-চূর্ণ। জাপানে ফিউডাল অভিজাতেরাই পরে রাজশক্তি গ্রহণ করেছিল; সেখানে ধর্ম্মীয় গোঁড়ামির ছাপ শাসনযন্ত্রের কলকব্জা স্ক্রু। বিগত চল্লিশ বছরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, অতীতের খোলশের দিকেই আমাদের টান বেশী। হিন্দু মধ্যবিত্তরা তবু ব্রাহ্মধর্ম্ম গড়েছিল। বঙ্কিমবাবু যদিও এই ধর্ম্মকে ভুল বলে উপহাস করেছিলেন, তবু এই আন্দোলনের প্রগতিশীলতা কোন ঐতিহাসিক অস্বীকার করবে না। বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে এর আবলুপ্তি ঘটেছে। নবদীক্ষিত হিন্দুমধ্যবিত্তেরা পূর্ব্বতনদের চেয়ে অনেক দূর অগ্রসর হোয়েছে। বুর্জ্জোয়া সমাজের লুথারের মত তাদের আর কোন রামমোহন দরকার হবে না। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যবিত্ত সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম-জাতীয় কোন আন্দোলন দেখা দেয়নি। কারণ ইস্‌লামের গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ঐ-জাতীয় বিকাশ বহু পূর্ব্বেই রূপায়িত হোয়েছিল। নূতন প্রভু-প্রেমে অর্থনৈতিক নির্ব্বাণ-লাভের জন্যই হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ রঘুনন্দনকে সামান্য ঢেলে সেজেছিল। নূতন অর্থনৈতিক জীবনের তাগিদ, নূতন ধর্ম্মের পত্তন করেছিল। ওহাবী আন্দোলনকে ধর্ম্মীয় আন্দোলন বলা ভুল, তা পুরোপুরি রাজনৈতিক। গত চার শতকে মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ অনেকটা প্রসার লাভ করেছে। কিন্তু কোন ধর্ম্মীয় সংস্কার এখানে সচেতন নয়। নয়া মধ্যবিত্তদের জীবন-যাপন ধর্ম্মের অচেতন-সংস্কার ইতিমধ্যে সমাধান করেছে। কিন্তু সচেতন হওয়ার সময় তাদের মন পুরাতন সংস্কার আঁকড়ে থাকে। দ্বিতীয় তৃতীয় দশকে এই নয়া মুসলমানেরা মোল্লাদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু জেহাদ করেছে বৈকি। ধর্ম্মের আঁটসাঁট তাদের অর্থনৈতিক জীবনের প্রসারে বাধা, অচেতন মনের বিদ্রোহ তাই নানা ঘটনায় প্রতিভাত হয়। গত আঠাশ সালের দিকে কলিকাতা মাদ্রাসার আর্বী ও এ্যাংলো-পার্শী বিভাগের দাঙ্গা তার একটা নজীর রূপে গ্রহণীয়। শ্রেণীগত অর্থনৈতিক স্বার্থের বিবাদে মুসলমান আর একজনকে মুসলমান বলে ক্ষমা করবে, তা আশা করা স্রেফ পাগ্‌লামি। শোষকের ধর্ম্ম শোষণ। সেখানে হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন নিতান্ত গৌণ। সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আদর্শ, সমগ্র আন্দোলন বিচার করে যদি না দেখা হয়, তা-হলে সমাজের পশ্চাৎ-গতিকে আমরাই জোর টান দেব,—ধর্ম্মীয় গোঁড়ামির আওতায় মৃত্যু ডেকে আনব।

কবির সাহেবের প্রবন্ধের বই "ধারাবাহিক" অন্ততঃ এই চেষ্টার দিকে থেকে সার্থক। আমাদের সমাজের বিভিন্ন সমস্যা তিনি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। তাঁর মুক্ত-বুদ্ধির ছাপ প্রতি-জায়গায় স্পষ্ট। কোন ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার ঝোঁক-কে প্রশ্রয় দেন নি। সমাজের দিকে চোখ-না-রেখে যে কোন সমস্যার সমগ্র-উপলব্ধি হোতে পারে না, তা তিনি বার বার বলেছেন। গোঁড়ামির মধ্যযুগীয় অন্ধকারে যখন আমরা আদর্শ হাত্‌ড়াই, তখন উদারনৈতিকতার প্রশংসার দিকে মন স্বতঃই টানে।

পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধই সুখপাঠ্য। হিন্দু-মুসলমানের সমস্যার আলোচনা এই পুস্তকের বিষয় বস্তুর প্রায় বারো আনা। প্রবন্ধগুলি বারো-তেরো বছর আগে লেখা, তবু ঐ "চিরগুণ" সমস্যার অনেক নিখুঁৎ বিশ্লেষণ তিনি দেখিয়েছেন। স্পষ্ট ভাষনের জন্য কবির সাহেবের গদ্য-শৈলাতে কোন জড়তা দেখা যায় না। চিন্তার গোড়ায় গোল থাকলে ভাষায় তার আভাস ফোটে। সুধীন্দ্র দত্তের প্রবন্ধ তার জল-জ্যান্ত উদাহরণ। রাসেলের মত স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হওয়া অবশ্য সাধনা নয় শুধু, প্রতিভার প্রয়োজন। কবির সাহেবের উদার স্বচ্ছমুক্ত দৃষ্টিই তার প্রবন্ধের ষ্টাইলের প্রাণ। প্রবন্ধকারের প্রবন্ধকার আছে। কবিরও কবি থাকে। কবির সাহেব প্রবন্ধকারের প্রবন্ধকার নন শুধু, তিনি নিজেও প্রবন্ধ-রচয়িতা। এইটুকুই আমার শেষ বক্তব্য।

সওকত ওস্‌মান

D DAY—John Gunther. Hamish Hamilton. 10s. 6*d*.

আমেরিকা ও ইংলণ্ড হইতে যে কয়েকজন সাংবাদিক সিসিলি আক্রমণের পূর্ব্বে মাল্টায় সমবেত হইয়াছিলেন, জন গান্‌থার তাঁহাদের অন্যতম। টিউনিসিয়া বিজয়ের পরে ইয়োরোপ ভূখণ্ডে মিত্রপক্ষের অভিযান সুরু হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই অভিযানের পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট তারিখই সামরিক মহলে D Day নামে অভিহিত। কথাটীর উৎপত্তির সম্বন্ধে কল্পনার অবসর আছে। সে যাহাই হউক D Day মিত্রপক্ষের কাছে বিশেষ স্মরণীয়। উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষ ছাড়া দিবসটী পূর্ব্ব হইতে আর কাহারও জানা থাকিবার কথা নহে। যুদ্ধরত জাতিদের প্রত্যেক সৈনিক ও যোদ্ধা নিশ্চয়ই অতীব আগ্রহে এই দিনের প্রতীক্ষা করিয়াছে। যে যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর ইতিহাস নূতন করিয়া রচিত হইবে তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিবার যে গৌরব জাতি হিসাবে ভারতবাসী তাহা হইতে বঞ্চিত। কিন্তু আমরাও এই সৈনিকদের এই অসীম আগ্রহের ও উৎসাহের কথা কল্পনা করিতে পারি। কল্পনা করিতে পারি বলিয়াই আক্রমণের পূর্ব্বরাত্রে সমুদ্রতীরে আইসেনহাওয়ারের মূর্ত্তিটি আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে; একের পর একটি এরোপ্লেনের ঝাঁক উড়িয়া যাইতেছে, আইসেনহাওয়ার তাহাদের উদ্দেশ্যে একটী মঙ্গলবাণী উচ্চারণ করিতেছেন; সুদূরপ্রসারী তাঁহার দৃষ্টি সৌভাগ্যসূচক কয়েকটি মুদ্রা পকেটে আঙ্গুল দিয়া ধীরে ধীরে স্পর্শ করিতেছেন।

সাংবাদিক ও লেখক হিসাবে গান্‌থার প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার *Inside Europe, Inside Asia, Inside Latin America* পাঠক-সমাজে বিশেষ পরিচিত। আলোচ্য বইখানি একটু স্বতন্ত্র ধরণের। সাংবাদিকের রচনা বলিয়া ইহাতে সংবাদ পত্রের রিপোর্টের গন্ধ কিছু কিছু পাওয়া যায়। তথাপি একটী বিরাট ঘটনার প্রাক্কালে মাল্টার যে চিত্র আমরা ইহাতে পাই ব্যক্তিগত রচনা না হইলে তাহা পাওয়া সম্ভব হইত না।

এ যুদ্ধে মাল্টার উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিমান আক্রমণ হইয়াছে। সেইজন্য মাল্টার প্রধান সামরিক অফিস ও আবাসগুলি ভূগর্ভস্থ টানেলে। লর্ড গর্ট গান্‌থারকে You are *inside* Malta বলিয়া যে রহস্য করিয়াছিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। মাল্টার সামরিক ও অসামরিক—অসামরিক ব্যক্তিদের সংখ্যা নগণ্য—জীবনের পরিচয় Maltese Diary নামক অধ্যায়ে পাওয়া যায়। সিনেমার অসংখ্য ছবি সত্ত্বেও যুদ্ধ ক্ষেত্রের কাছাকাছি স্থানগুলির প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ। Maltese Diary হইতে এই জীবনের একটী বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কৃচ্ছ্রতা ও কষ্টের বর্ণনা আছে কিন্তু তাহা লইয়া কোন আলোচনা নাই। অর্থাৎ পরিবেশটাকে সম্পূর্ণ মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

আধুনিক যুদ্ধকে একটী বিরাট যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়া থাকে। বোতাম টিপিলেই কলে কাজ হয়। আধুনিক যুদ্ধের ব্যাপারও অনেকটা সেইরূপ। এ যুদ্ধে মানুষের বিস্ময়কর সংগঠন শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই অপূর্ব্ব সংগঠন সত্ত্বেও ছোট খাট ব্যাপারে এমন অনেক বিষয় প্রকাশ পায় যাহাতে সংগঠনের বহু ত্রুটী চোখে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ '947' এর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সাংবাদিকদের '947' এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন না করিলে কোন কাজই করা সম্ভব নয়। কিন্তু গান্‌থার ও গিলিংকে '947' এর সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে যে বেগ পাইতে হইয়াছে তাহার বর্ণনা কৌতুকাবহ।

Inside বইগুলিতে গান্‌থার কয়েকজন প্রসিদ্ধ লোকের চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সম্পূর্ণ না হইলেও এ চিত্রগুলিতে লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য গ্রন্থেও লেখকের এই ক্ষমতার প্রমাণ আছে। আইসেনহাওয়ার আমেরিকাবাসী; বোধ হয় সেই কারণেই গান্‌থার আইসেনহাওয়ার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই। কিন্তু এ যুদ্ধে অন্যতম হিরো মণ্ট গোমরি ও জেনারেল আলেকজাণ্ডারের চরিত্রাঙ্কণ সার্থক। ১৯৪২ সালে জার্ম্মানী যখন আলেকজান্দ্রিয়া উপকণ্ঠে উপস্থিত অর্কিনলেক সে সময়ে আফ্রিকা কমাণ্ডের নায়ক। এ যুদ্ধের ইতিহাসে ১৯৪২ এর মে মাস মিত্রপক্ষের নিকট বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটময় মনে হইয়াছে। ফ্রান্সের পরাজয়ের পরে চার্চ্চিল হাউস্ অফ্ কমন্সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। ১৯৪২'এর মে মাসে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশ সম্পূর্ণ জাপানীদের অধীনে; রোমেল ঈজিপ্টের সীমান্তে প্রবেশ করিয়াছে। রাশিয়াকেও ককেসিয়ার পশ্চিম ভাগ ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছে। এই সময় ব্রহ্ম বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল আলেকজাণ্ডার ও মণ্টগোমরিকে উত্তর আফ্রিকার কমাণ্ড দেওয়া হয়। তাহার পর হইতেই যুদ্ধের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে সুরু করে। মণ্টগোমরি ও আলেকজাণ্ডার আফ্রিকা হইতে জার্ম্মানদের বিতাড়িত করিতে সক্ষম

হন। সেই সঙ্গে আমেরিকার যান্ত্রিক সাহায্যের কথাও বিস্মৃত না হইয়াও মণ্টগোমরি ও আলেকজাণ্ডারের অধিনায়কত্বের কৃতিত্ব স্বীকার করিতে হয়। গান্‌থার মণ্টগোমরির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। আলেকজাণ্ডারের কল্পনা আছে; বহু লোকের সমবেত চেষ্টায় কি করিয়া সেই কল্পনা কাজে পরিণত করিতে হয় সে কৌশল মণ্টগোমরির জানা আছে। বস্তুতঃ আফ্রিকা অভিযানে এক'কে বাদ দিয়া অপরের কথা ভাবা যায় না।

গান্‌থার বলিয়াছেন : 'Alexander and Montgomery who are close friends, are something more than a team. They have been a kind of entity; the great point about their career is the way they interlock and complement each other.... Neither has ever done so well separately as together. One of their best officers put it nicely: 'Alexander is the cannon and Montgomery is his shell.' ''

'Battle Picture' 'Main 35' অধ্যায়গুলিও আর একদিক হইতে কৌতূহলোদ্দীপক। যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাংবাদিকের সুবিধা অসুবিধা, নিম্ন পদস্থ অফিসারদের দৈনন্দিন জীবন, প্রতিদিনকার যুদ্ধের খবর কি উপায়ে পাঠানো হয়—এ সবই কিছু কিছু এই দুইটী অধ্যায় হইতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ঈজিপ্ট, তুর্কী ও মধ্য প্রাচ্যের সামরিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিচয় বইখানিতে আছে। এই ধরণের বই সামরিক প্রয়োজনে লিখিত, সাধারণ পাঠকের কাছে কিছুদিন পরে এ বই সম্বন্ধে কোনও আগ্রহই থাকিবে না। এমন কি এখন ফ্রান্সে মিত্রপক্ষের সৈন্য অবতরণের পরে D Day বলিতে আর সিসিলি অভিযানকে বুঝায় না। অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী বিষয় লইয়া বইখানি লিখিত।

করালীকান্ত বিশ্বাস

কস্মৈ দেবায়—সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা লিঃ, পি ১৩ গনেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

মানুষের মন এগিয়ে গেছে অনেকখানি। তার চিন্তাধারায় ঘটেছে আমূল পরিবর্ত্তন, তার দৃষ্টি-ভঙ্গীতে পেয়েছে নোতুন রূপ—এক কথায় আজকের মানুষের রুচি গেছে বদ্‌লে। দশ বছর আগেকার মানুষের চেয়ে আজকের সাধারণ মানুষের ধারণা করবার শক্তি হয়েছে প্রখরতর, চিন্তা করবার ক্ষমতা হয়েছে বর্দ্ধিত। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"-মন্ত্র হয়ত আজ সাধারণের অবচেতন মনকে স্পর্শ করতে পেরেছে। আজ তাই কলেজের ছাত্রকে 'তরুণী-ভার্য্যার' পরিবর্ত্তে ক্যাপিটাল বা মার্কসবাদ নিয়ে আলোচনা করতে শুনতে পাই, আর দিনের শেষে কারখানার শ্রমিকের হাতে দেখতে পাই "তরুণের অভিযান" বা "পথের দাবী"। দীর্ঘ রজনীর সুপ্তিভঙ্গের পরে মানুষের মন হয়ে উঠেছে বুভুক্ষু। আজকের দিনে তাই তারাশঙ্করের মতো এমন শক্তিমান্ লেখকের প্রয়োজন যিনি লেখার মধ্যে নোতুন টেকনিক্ সংযোজনা করতে সক্ষম—যিনি পারেন আদর্শ

সৃষ্টি করতে—যিনি পারেন ভাষা ও ছন্দের তালে তালে টুকরো টুকরো কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পাঠকের মনকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করে নিতে আর তারপরে তাকে ছুটিয়ে দিতে সেই আদর্শের পথে। সেইখানেই তো লেখকের কৃতিত্ব। সেদিক থেকে এই আধুনিকতম উপন্যাসে সঞ্জয়বাবু পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছেন বলা চলে।

"কস্মৈ দেবায়" আদর্শ ও রাজনীতিমূলক উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র পরে ঠিক এ ধরণের লেখা বাংলায় সম্ভবত আর একখানিও প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয় না। যুগোপযোগী এই উপন্যাসখানি প্রণয়ন করে সঞ্জয়বাবু পাঠক সমাজের মনোরঞ্জন করতে পেরেছেন।

শ্যামল আর চিত্রা এই দুটী ছেলেমেয়ের আত্মকাহিনী নিয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে—শ্যামলের কথা দিয়ে সুরু আর চিত্রার কাহিনী দিয়ে পরিসমাপ্তি। উভয়েরই কর্ম্মক্ষেত্র হ'ল কলকাতা। যৌবনে রক্তের উষ্ণতায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে যারা স্বাধীনতা লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলে জেনে নিতে পারে নি, শ্যামল ছিল তাদেরই একজন। সে ছিল সন্ত্রাসবাদী—আদর্শের প্রতি তার প্রগাঢ় নিষ্ঠা। প্রাক্তন বিপ্লবী প্রশান্তদা তাকে হিংসার অসারতা বোঝাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে ছিল একরোখা। প্রশান্তদার স্ত্রী তাকে করতে চেয়েছিলেন সংসারী, কিন্তু সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, স্বদেশীর আবার বিয়ে! দীপালি নামে একটি মেয়ের প্রেম সে আকর্ষণ করতে পেরেছে কিন্তু আদর্শচ্যুত হবার ভয়ে প্রশ্রয় দেয় নি। প্রেমে পড়া বা ভালবাসা ছাড়াও মানুষের অনেক কিছু করবার আছে। যতীন দাসের অনশনে মৃত্যুবরণ, নিরুপদ্রব লবণ আইন অমান্যকারিগণের নিদারুণ নিগ্রহ প্রভৃতি তাকে সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে প্ররোচিত করলে। ফলে রাজঅতিথিরূপে সাত বৎসর হল তার দেওলি বাস। বন্দীশিবিরে অবস্থান কালেই সে বুঝতে পারল যে পথে সে গিয়েছিল সে পথে স্বাধীনতা আসবে না। দেশকে গড়ে তুলতে হবে। দেশের প্রাণস্বরূপ চাষী-মজুরকে শিক্ষিত করে বুঝিয়ে দিতে হবে তাদের মূল্য কতখানি—জাগাতে হবে আত্মোপলব্ধি—প্রচার করতে হবে মার্কসবাদ—কম্যুনিজম্—আদর্শ রাশিয়া। কলকাতায় ফিরে এসে শ্যামল নোতুন করে দেখে কলেজ-ছাত্রী চিত্রাকে—প্রশান্তদার মেয়ে, সেই প্রশান্তদা যিনি শ্যামলের রিভলভার রাখার অপরাধ নিজের মাথায় তুলে নিয়ে প্রেসিডেন্সী জেলে টাইফয়েডে প্রাণত্যাগ করেন। বয়সের দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও দুজনের দুজনকে ভালো লাগে। যৌনতাই মানুষের জীবনের পরমতম সামগ্রী নয়; কিন্তু তাই বলে তা একেবারে উপেক্ষণীয়ও নয়। এ তথ্য শ্যামল উপলব্ধি করে। তাই সে আজ চিত্রাকে নিয়ে নোতুন জীবন সুরু করতে চায়। বলে,—কি ক্ষতি তোমায় যদি আমি ভালবাসি! আমি সন্ন্যাসী নই চিত্রা—আমি জানি পৃথিবীতে সন্ন্যাসীর স্থান নেই। মানুষ হয়ে উঠতে চাই আমি—পরিপূর্ণ মানুষ। চিত্রাও শ্যামলের জন্যে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করতে চায়; কিন্তু পরিশেষে আত্মসুখকে, ভালবাসাকে ছাপিয়ে তার যুক্তি-তর্ক তার বিবেক বলে উঠে—কস্মৈ দেবায়—কোন্ দেবতার পায়ে জীবন নিবেদিত হবে? সে কি প্রেমের দেবতা পুষ্প-ধন্বা, না, মনের দেবতা মানুষ? চণ্ডীদাসের বাণী চিত্রার মনে পড়ে যায়। চিত্রা বোঝে—অনেক অনেক বড় হতে পারে শ্যামল—যা সে চায় হতে পারে তা—পারে সত্যিকারের মানুষ হতে—কিন্তু চিত্রা তাকে এগিয়ে দিতে পারে

না একটুও। তাই সে দূরে সরে যায়, বলে,—"ক্ষমা করো—তোমাকে ভালবাসি বলেই নষ্ট করতে চাইনে।" আত্মসুখকে অতিক্রম করে আদর্শ বড় হয়ে ওঠে।

গোড়া থেকে শেষ পৃষ্ঠা অবধি উপন্যাসখানির গতি ঠিক নির্ঝরের মতোই সমানভাবে বয়ে চলেছে, কোথাও একটুও ব্যাহত হয় নি। প্রত্যেকটি কথা সঞ্জয়বাবুর দরদ দিয়ে লেখা, তাই কোথাও একঘেয়ে বলে মনে হয় না।

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

Printed and published by K. C. Banerjee at the Modern Art Press, 1/2, Durga Pituri Lane, Calcutta. Edited by Humayun Kabir, Office: 123, Lower Circular Road.